কাহিনী সূচী

রাত্রি তখনও অনেক বাকী। শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, এবার দু'একটা ছোট গল্প শুনুন। তারপর কাল থেকে আবার বড় গল্প আরম্ভ করবো।

সুলতান শাহরিয়ার বললো, গল্পের যদুকর আমির ইবন মাসাদার কোনও কিস্‌সা তুমি জান শাহরাজাদ?

শাহরাজাদ মৃদু হেসে বলে, খুব জানি। বলুন তার কোন্ গ

ন?

শাহরিয়াব বলে, আবু ইসার একটা কাহিনী শোনাও।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে:

একদিন হারুন আল রসিদের পুত্র আবু ইসা তার এক মাসতুতো ইবন হিমাস-এর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। আলী বিত্তশালী ব্যক্তি। দাস দাসীর সে মালিক। আলীর এক অসাধারণ রূপ-লাবণ্যবতী বাঁ নাম তার স্থর্মা।

প্রথম দর্শনেই আবু ইসা সুর্মাকে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু চেপেই সে ঘরে ফিরে আসে। আলীর কাছে প্রকাশ করতে পারে ন যতই দিন যেতে থাকে ইসার বিরহ-বেদনাও ততই বাড়তে থাকে। স্থ মন থেকে মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে বারবার কিন্তু ভুলতে প আবার সে আলীর কাছে যায়। লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে সে তখন তার মনের গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করে ফেলে।

—মেয়েটিকে খুব পছন্দ, ভাইজান। যদি তুমি ওকে বিক্রি কর, আমি দাম দিয়ে কিনে নেবো।

কিন্তু আলী সে কথায় রাজী হয় না। বলে ও আমার হারেমের সেরা এমন কি সারা আরবেও তার জুড়ি খুব বেশি নাই। তাছাড়া ওকে াগ করার জন্যে কিনেছি—দশ হাজার দিনার দিয়ে। কেনা-বেচার রার জন্য তো রাখিনি, ভাই।

আর কথা চলে না। ব্যথিত মনে আবার সে ফিরে আসে প্রাসাদে। তেই সুর্মাকে মনের আড়াল করতে পারে না। শেষে একটা নতুন খেলিক তার মাথায়। তার বড় ভাই খলিফা অল-মামুনকে গিয়ে সব কথা

খুলে বলে, সুর্মাকে না পেলে আমার জিন্দগী বরবাদ হয়ে যাবে, চাই-ই।

ভাইয়ের মনের অবস্থা বিবেচনা করে অল মামুন বলে, ঠিক আছে, ঘোড়ায় চাপো, চল যাই দেখি তার কাছে। কী হয় দেখা যাক।

দুই ভাই ঘোড়া ছুটিয়ে আলীর প্রাসাদে এসে নামে। স্বয়ং খলিফা এসেছেন তার ঘরে—কী ভাবে তাকে আদর অভ্যর্থনা করবে, ভেবে পায় না। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায় আলী। তারপর বলে, আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন আমার গরীবখানায়।

বিরাট প্রশস্ত একখানা সভাকক্ষ। দামী দামী আসবাবপত্রে ঝকঝকে করে সাজানো। চারপাশের দেওয়ালে ঝোলানো বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা দুষ্প্রাপ্য সব ছবি। সারা ঘরটা বসরাহর কাজকরা সেরা কার্পেট মোড়া। বড়বড় মোটা মোটা থামের গায়ে ইমারতী নক্সা দেখে মনে হয় গ্রীক কারিগরদের হাতে গড়া এই বিশাল ইমারত।

খলিফা আর ইসাকে সঙ্গে নিয়ে চারপাশ ঘুরে দেখাচ্ছিল আলী। এক সময় খলিফা বললো, বাঃ বেশ। তা একটু খানা-পিনার ব্যবস্থা কর আলী। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

আলী লজ্জিত হয়। হাতের তুড়ি বাজাতেই প্রায় শ'খানেক সুবেশা নারী হাতে খাবারের রেকাবী নিয়ে সার বেঁধে এসে দাঁড়ালো। এক একজনের হাতে এক এক রকমের খানা। এলাহী ব্যাপার।

আহারাদি শেষ হয়ে গেলে, সরাবের পাত্র-পেয়ালা আসে। আর আসে নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে দশটি মেয়ে। সকলেরই সাজ-পোশাক এক—মিশমিশে কালো রেশমের পোশাক পরে এসে দাঁড়ালো চাঁপা কলির মতো সুতনুকারা। দশখানা সোনার কুর্শি বৃত্তাকারে সাজানো ছিল। একে একে এসে অধিকার করে বসলো তারা। নানারকম তারের বাদ্যযন্ত্র তাদের হাতে। বাজার তালে-তালে ধ্বনিত হতে থাকলো সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত লহরী।

এই দশজনের মধ্যমণি ছিল একটি মেয়ে। অল-মামুনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল তার দিকে। প্রশ্ন করলো, কী তোমার নাম ?

মেয়েটি বিনীত ভাবে বলে, আমার নাম লহরা, জাঁহাপনা।

খলিফা বলে, ওই নামেরই যোগ্য তুমি। আচ্ছা লহরা, এবার তুমি একা একখানা গান শোনাও দেখি—

কোকিলকণ্ঠী লহরা গাইতে থাকে ঃ

এই যে আমার কোমলতা
এই যে আমার চকিত চপল চাহনি
আর এই যে আমার ক্ষীণ কটি তনু ;
এর লোলুপতায় লুব্ধ হয়ে আসে যারা
বিশ্বাস করি না—বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না তাদের

কিন্তু ভালোবাসা যদি অন্তরীণ হয়,
আমিও মোমের মতো গলবো,
ধূপের সৌরভে মাতিয়ে দেব প্রাণ ;
সারা রাত ধরে সুদূর আকাশে শুকতারা হয়ে জ্বলবো,
ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবো হৃদয়, গাইবো শুধু ভালোলাগার গান···

খলিফা অল মামুন তারিফ জানায়, বহুৎ খুব। তোফা! বড় চমৎকার তোমার গলা লহরা। আচ্ছা বলতো, কার লেখা এই গান ?

—গীত রচনা অমরু ইবন মাদি করিব অল-জুবাইদী এবং সুর দিয়েছেন যাবিদ।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শূন্য করে নামিয়ে রাখে খলিফা। খলিফার দেখাদেখি ইসা এবং আলী পেয়ালা নিঃশেষ করে রেখে দেয়। মেয়ে দশটি কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নেয়। সংগে সংগে আরও দশটি মেয়ে সোনার জরির কাজ করা নীল রেশমী পোশাকে সেজে প্রবেশ করে। সকলের হাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্র সুরের ঝঙ্কার ওঠে ঘরময়। এই দশজনের মধ্যে সেরা যে মেয়ে তার দিকে নজর রাখে খলিফা।

—তোমার নাম কী ?

মেয়েটি জবাব দেয়, আমার নাম বন-হরিণী—

রাত্রির তমসা কেটে যায়, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো নব্বইতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয় ঃ

খলিফা বলে, তা তোমার একটা গান শুনতে চাই, বন-হরিণী—
বন-হরিণী বলে, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করছি, জাঁহাপনা।
গান ধরে সে ঃ

আমি উচ্ছল, উদ্দাম, নির্ভয়,
আমি এক মক্কার বন-বিহারিণী,
কোনও শিকারীই বিন্ধ করতে পারে না আমায়।
যারা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ব্যর্থ হয়
তারাই আমার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোষ ধরে,
কিন্তু ওরাও মনে মনে মানে, আমার মতো
নিখুঁত নিটোল সুন্দর দেহবল্লরী
এবং আমার কালো হরিণ চোখ
কারই বা আছে—

খলিফা প্রশ্ন করে, কার লেখা বল তো গানটা ?

বন-হরিণী বলে, কথা জাবির আর সুর সুরেজ-এর।

খলিফা আর একবার সরাবের পেয়ালা শূন্য করে নামিয়ে রাখে। মেয়েগুলো বিদায় হয়। সঙ্গে সঙ্গে আসে আর একদল—তারাও সংখ্যায় দশ। সকলের হাতেই বাদ্যযন্ত্র। ওরা সকলেই পরেছে টকটকে লালরঙের সিল্কের পোশাক। খলিফা সকলের সেরা সুন্দরীকে প্রশ্ন করে—কী তোমার নাম?

মেয়েটি জবাব দেয়, আমার নাম রমজানী।

—তোমার একখানা গান শোনাও, দেখি।

রমজানী শুরু করে:

অলঙ্কার আভরণ
তা সে লাল নীল হলদে অথবা সাদা
যে রঙেই রংদার হোক
কিছু যায় আসে না;
সব মেয়ের কাছে কদর তাদের সমান।
প্রতি রাত্রির শেষে সকাল বেলায়
যদি শয্যার পাশে
এমনি কিছু একটা কুড়িয়ে সে পায়
তার চাইতে আর কিছুই কাম্য থাকে না তার—

খলিফা জিজ্ঞেস করে, কে লিখেছে?

রমজানী বলে, গীতকার আদি ইবন জাইদ। বহু প্রাচীন গান।

খলিফা পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো বিদায় নেয়। একদল যায় কিন্তু আর একদল আসে। সোনালী রঙের সাজ পোশাকে সেজে দশটি মেয়ে এসে কুর্শিতে বসে পড়ে। সকলের সেরা মেয়েটিকে ডেকে খলিফা তার নাম জিজ্ঞেস করে। মেয়েটি বলে, আমার নাম শিশিরকণা।

খলিফা বলে, তোমার একটা গান শুনবো।

শিশিরকণা গাইতে শুরু করে:

আমি তার রক্তাক্ত গালের গুলোবী সরাব
বুদ হয়ে পড়ে থাকি নির্লিপ্ত নেশায়
আহা কী যে মধু কত সুখ, কী করে বোঝাই
পথে পথে ফিরি আমি
উদাস পাগল-প্রাণ
প্রেমের ভিখারী···

খলিফা করতালি দিয়ে বাহবা দেন, চমৎকার। এ গান কার লেখা, শিশিরকণা?

মেয়েটি বলে, গান লিখেছেন কবি আবু নবাস আর গেয়েছেন ওস্তাদ ইশাক।

মেয়েগুলো বিদায় নিলে খলিফা আলীকে উদ্দেশ করে বলে, খুব আনন্দ পেলাম। এবার তাহলে চলি, আলী।

আলী বলে, আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। আর একটি বাঁদীকে হাজির করতে চাই আপনার সামনে। আমার প্রাসাদের সব চেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে। দশহাজার মোহর দিয়ে কিনেছি তাকে। আমার বিশ্বাস সে আপনাকে মুগ্ধ করতে পারবে। যদি না পারে তা হলে তাকে বিদায় করে দেবো।

খলিফা বলে, ঠিক আছে; নিয়ে এস তাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সারা ঘর আলো করে এসে দাঁড়ালো এক পরমাসুন্দরী লাস্যময়ী নারী। খলিফা অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। এমন রূপবতী কন্যা সচরাচর চোখে পড়ে না। ধীর পায়ে এসে সে একখানা কুর্শিতে বসে পড়ে।

খলিফা লক্ষ্য করে তার ভাই ইসা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘনঘন মদের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে সে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে তার। দেহের রক্ত সবই বুঝি মুখে জমা হয়ে গেছে। অল মামুন জিজ্ঞেস করলো, কী, কী হলো?

ইসা ঘাড় নেড়ে কোনও রকমে বলতে পারে, না, কিছু না। সুন্দরী বাঁদীর রূপের ফাঁদে তার প্রাণপাখী আটকে গিয়ে ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। আবার জিজ্ঞেস করে, মেয়েটার সঙ্গে কী আগে তোমার আলাপ পরিচয় ছিল?

—না। কিন্তু আসমানের চাঁদকে কে না চেনে, ধর্মাবতার!

খলিফা এবার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

—সুর্মা, আমার নাম সুর্মা, জাঁহাপনা।

—তোমার একখানা গান শোনাও।

সুর্মা গান ধরে ঃ

ও আমার দিল্-এর মালিক
ও আমার, মনের মানুষ
তুমি কী নির্মম নিষ্ঠুর
তোমার কলিজা কী পাথরে গড়া?
কিন্তু আমি তো জানি
তোমার অন্তর পল্লবিত কুসুমের মতো
মধুর নির্যাসে ভরা—

খলিফার প্রশ্নের জবাবে সুর্মা জানায়, গানের কথা লিখেছে খুজাই আর সুরারোপ করেছে জুরজুর।

আলী এতক্ষণ ধরে আবু ইসা-কে লক্ষ্য করছিল। সুর্মাকে দেখা অবধি সে এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এবার সে বললো, ভাই ইসা তুমি আমার আজ মহামান্য মেহমান। তোমাকে অসুখী রাখলে আমার গুণাহ হবে। আমি বুঝেছি, সুর্মার জন্য তোমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুমি শান্ত হও, ভাই, সুর্মাকে আমি তোমার হাতেই সঁপে দিচ্ছি। আশা করবো, ওকে পেয়ে তুমি সুখের জীবন গড়ে তুলতে পারবে।

আবু ইসা বলে, কিন্তু এখানে মহামান্য ধর্মাবতার উপস্থিত। কোনও দানই দান করা যায় না তাঁর অনুমতি ছাড়া।

খলিফা মামুন বলে, আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, ইসা। সুর্মাকে তুমি বরণ করে ঘরে নিয়ে চল।

শাহরাজাদ বললো, এই কাহিনী থেকে আলী এবং তার সময় কালের মানুষের অতিথি সেবার কিছুটা ছবি পাওয়া গেল।

এরপর শাহরাজাদ বলতে থাকে আর এক কাহিনী।

এ কাহিনী পীর উমরঅল হুমসির ঃ

অতি প্রাচীন কালে বাগদাদ শহরে এক পরম বিদুষী রমণী বাস করতো। সেই সময়ের সারা ইরাকে তাবৎ গুণী-জ্ঞানীরা তাকে জ্ঞান গরিমার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছিল। আজও সে এক কিংবদন্তী হয়ে আছে। তার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির বহু কাহিনী আজও গাথায় গল্পে মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। লোকে তাকে গুরুর গুরু বলে ডাকতো। বহু দূর দেশ থেকে শত সহস্র নরনারী আসতো তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে। যখনই কোথাও কোনও কঠিন বিতর্ক উঠতো; মীমাংসার জন্য ছুটে আসতো তার কাছে। অনেক দুঃসাধ্য সমস্যার অতি সহজ সরল সমাধান করে দিতে পারতো সে। বিজ্ঞান, আইন, দর্শন, সাহিত্য তা যে কোনও বিষয়ের প্রশ্নই হোক না কেন, অত্যন্ত সাবলীল সহজ ভাবে উত্তর করে দিতে পারতো সে।

একদিন আমি আমার এক প্রবীণ বন্ধু অল সালিহানীকে সঙ্গে নিয়ে যথা নির্দিষ্ট এক সভাকক্ষে প্রবেশ করলাম। বিতর্ক শোনার জন্য বাগদাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন সেই সভাগৃহে সমবেত হয়েছিল।

বিদুষী রমণীর নাম দাহিয়া। সে বসেছিল একটা পর্দার আড়ালে।

আমি পূর্বাহ্নেই আমার নাম ধাম পাঠিয়েছিলাম তার কাছে। তার সঙ্গে আমি তর্কযুদ্ধে নামতে চাই। তাও তাকে জানিয়েছিলাম। বিষয়টা ধর্মের বিধান।

আমরা আসন গ্রহণ করলাম।

দাহিয়ার অনুজ ভাই দেখতে ভারি সুন্দর ফুটফুটে চাঁদের মতো বালক। আমার বন্ধু সদাশয় সালিহারী—ছেলেটিকে দেখামাত্র আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। চোখ আর ফেরাতে পারে না। ব্যাপারটা দাহিয়ার নজর এড়ায় না। আমার বন্ধুর পরিচয় জিজ্ঞেস করলো সে। তারপর বললো, বৃদ্ধেরা ছোট ছোট মেয়েদের চাইতে বালকদের বেশি পছন্দ করে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো একানব্বইতম রজনীর
মধ্য যামে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

আমার বন্ধু বললো, আপনি যথার্থই বলেছেন। কারণ আল্লাহ বালকদের দেহ-সৌষ্ঠব মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত এবং সুন্দর করে তৈরি করেন। আর আমার দৃষ্টি সব সময়ই সেরা সুন্দরের দিকে।

পর্দার আড়াল থেকে উচ্চকিত হাসির আওয়াজ আসে।

—চমৎকার। কিন্তু আপনি যদি আপনার গোঁ ধরেই বসে থাকেন, আমি আপনাকে ছাড়বো না। আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে হবে। আমার বক্তব্য—মেয়েদের দেহই বেশি সুন্দর হয়।

তার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব গ্রহণ করলো আমার সদাশয় বন্ধুটি। বললো, আমার প্রমাণের অর্ধেকটা যুক্তি দিয়ে বোঝাবো। বাকী অর্ধেকটা প্রমাণ করে দেবো পবিত্র গ্রন্থের বাণী এবং সুন্নী সূত্রাবলী থেকে।

কোরাণে আছেঃ পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেয়, কারণ আল্লাহ তাদের শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে একজন পুরুষ একজন নারী অপেক্ষা সম্পত্তির দ্বিগুণ ভাগ পাবে। ভাইএর অংশ বোনের দুই গুণ হবে। পবিত্র বাণীর নির্দেশ একজন নারী একজন পুরুষের অর্ধেকের সমান।

সুন্নী পয়গম্বর বলেছেন পুরুষের অবদান নারীর দ্বিগুণ।

তর্কের খাতিরেও বলবো, সমস্ত কাজে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পুরুষরাই প্রথমে এগিয়ে আসে। পুরুষরা সক্রিয় এবং নারীরা নিষ্ক্রিয়। সুতরাং অতীতের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বলা যায়, মেয়েরা সব সময়ই পুরুষের নিচে থেকেছে।

দাহিয়া বলেঃ আপনার যুক্তি যথার্থ, সন্দেহ নাই। আমি জানি আল্লাহ কোরাণে সাধারণ জ্ঞানে নারী অপেক্ষা পুরুষকেই বেশি পছন্দ করেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি। যদি আপনি সর্বাঙ্গ সুন্দরের কথাই তোলেন তবে শুধুমাত্র তা বালকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কেন? দাড়ি গোঁফওয়ালা বয়স্করা কী দোষ করলো? কিংবা কোনও সদাশয় প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ?

সুতরাং নিখাদ-সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ঐভাবে হতে পারে না।

আমার বন্ধু বলে ঃ

একশোবার বলবো আমি দাড়ি গোঁফওয়ালা, অথবা বুড়োদের চেয়ে সুকুমার কিশোর বালককেই বেশি ভালোবাসি। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, একটি নব-যৌবনা উদ্ভিন্না তরুণী অপেক্ষা একটি সুন্দর সুঠামদেহী তরুণ বালকের আকর্ষণ অনেক বেশি। তার বিস্তৃত বক্ষটি তার শাল-প্রাংশু বাহুভুজ তার গানের লালিমা তার বিনয় নম্র স্মিত হাসি তার মোলায়েম কণ্ঠস্বর—সবই সুন্দরের প্রতীক। পয়গম্বর নিজেও বলেছেন, দাড়ি গোঁফবিহীন উঠতি বয়সের ছেলেদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো না। ওদের চোখের লাস্য হুরীদের চোখের চাইতেও মারাত্মক।

কবি আবু নবাস বলেছেন ঃ

আমার হৃদয়ের ভালোবাসায়
সে চির-যৌবনা হয়ে বেঁচে থাক।
তার প্রস্ফুটিত শতদল,
আর কিশোরের মতো জঙ্ঘা,
আমার রক্তে তুফান তোলে—

কিশোরের দেহ-সৌষ্ঠব যদি না যুবতীর চেয়ে সুন্দরই হবে তবে কবি তার সঙ্গে তুলনা করবেন কেন?

কিশোরের রূপ-লাবণ্যই শুধু আমাদের মুগ্ধ করে না, তাদের বিনম্র ব্যবহার, কণ্ঠের সুললিত ভাষায় আমাদের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়ে দেয়।

দাহিয়া এবার জবাব দেয় ঃ

আপনার ঐ সব অদ্ভুত যুক্তি শুনে আমি হতভম্ব। যাই হোক, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমার মনে হয়, তামাশা করার জন্যেই আপনি এই সব ছেঁদো যুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু এটা তো রঙ্গ তামাশার মজলিশ নয়। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি কিছু সারগর্ভ আলোচনা করবো বলে। সত্যের অনুসন্ধান করাই এই বিতর্কের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বলছি, কাঠ গোঁয়ারের মত নিজের ফালতু জিদ ধরে বসে থাকবেন না, আমি যা বলছি তা মেহেরবানী করে মগজে ঢোকাবার একটু কোসিস করবেন।

আল্লাহ নামে কসম খেয়ে বলুন তো, কোথায় কোন্ তরুণকে আপনি দেখেছেন যার অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং রূপলাবণ্য এক সুন্দরী তরুণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ? একটি তরুণীর ত্বক শুধু শুভ্র আর হালকাই নয় রেশমের মতো কোমলও। তার বক্ষপ্রদেশ এক মনোরম উপত্যকা। তার মুখ প্রস্ফুটিত ফুলের কোরক। তার অধর শিশিরসিক্ত পাকা আঙ্গুরের মতো। আপেল সদৃশ গাল। তার স্তনযুগল যেন ছোট দুটি কচি লাউ। তার কপালের চেকনাই আর চোখের বান পুরুষের বুকে আগুন ধরায়। যখন সে কথা বলে—যেন মুক্তো ঝরে। আর যখন সে খলখল করে হেসে ওঠে, মনে হয়

শান্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে যেন কোন নদী গান গেয়ে বয়ে চলেছে। মধুর চেয়ে মধুময় এবং মাখনের মতো নরম তুল-তুলে সে হাসির বন্যা। কথা বলার সময় যখন তার গালে টোল খায়—সে সৌন্দর্যের তুলনা কোথায়? তার নাভিস্থল, জঙ্ঘা কী সুন্দর। তার উরু, পায়ের গোছা দেখে মনে হয় সন্দেশের ছাঁচে ঢালা। আপনি বয়সের ভারে ক্লান্ত, কী করে বুঝবেন এই সব যৌবনের জয়োল্লাস? তবে হয়তো খলিফাদের রোজনামচায় পড়ে থাকবেন, নারীর দেহরূপ বর্ণনায় তাঁরা কেমন পঞ্চমুখ ছিলেন। নারীর রূপ-লাবণ্যের গুণগান করতে করতে বহু জায়গায় তারা, তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভারে, অবনত হয়েছেন। যার প্রবল পরাক্রমে পৃথিবী পদানত সেই সিংহপুরুষরাও রূপবতী নারীর পায়ে মাথা কুটেছেন—সে কাহিনী কী আপনার অজ্ঞাত? শুধু একটি মাত্র নারীর জন্য কত শত সহস্র মানুষ, সারা জীবনের সঞ্চিত ধনরত্ন, মা বাবা, আত্মীয় পরিজন পরিত্যাগ করে আত্ম-নির্বাসন নিয়েছেন—তাও কী আপনাকে বলে দিতে হবে? শুধু তাদের মহিমাতেই দুনিয়া বেহেস্ত মনে হতে পারে। নারীর আকাঙ্ক্ষাতেই সূক্ষ্ম মসলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। যত সূক্ষ্ম সূচীকর্ম দেখেন তা শুধুমাত্র নারীর মনোরঞ্জনের জন্যেই তৈরি হয়। শুধু তাদেরই কল্যাণে আমরা নানা সুগন্ধী আতর সংগ্রহ করে রাখি। কী, সত্যি কিনা বলুন? নারীর রূপ ঘর আলো করে রাখে। আবার তাদেরই কারণে কত তখ্‌ত হাত বদল হয়। কত দেশের নদীর জল রক্তে লাল হয়ে যায়।

আপনি পয়গম্বরের বাণী উদ্ধার করে বললেন, কচিকাঁচা কিশোর তরুণদের চোখের পানে চেও না—ওদের চোখে এমন এক যাদু আছে যা বেহেস্তের পরীদের চোখেও নাই।

তবে দেখুন, তুলনা যখন তিনি করলেন, হুরীর সঙ্গেই করলেন। আর এই হুরী কোনও পুরুষ নয়—নারী।

আপনি সব সময়ই উঠতি বয়েসী কিশোর বালকের রূপ-লাবণ্যে পঞ্চমুখ হতে গিয়ে নারীর অঙ্গশোভার সঙ্গেই তুলনা করেছেন। বলিহারী যাই আপনার কদর্য রুচির! এ জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।

আপনি কী পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সেই বিখ্যাত উপদেশের বাণী বিস্মৃত হয়েছেন? 'ভালোবাসা করার জন্য ছেলে খুঁজে বেড়াবে কেন? আল্লাহ কী তোমার কাম চরিতার্থের জন্য নারী পয়দা করেন নি?' আমি আপনার ঐ ছোকরা-শিকারী কবি মশাইকে খুব ভালো করেই জানি। আবু নবাস তো ছোকরা-খেকোর বাদশা। তারই একটা কবিতা থেকে শোনাচ্ছিঃ

এমন চাঁদপনা মুখ তোমার
কিন্তু পাছাখানা ভারি কই?
চুলগুলোও ছেঁটে ফেলেছো?
কিন্তু তোমার ঠোঁটের ঐ টসটসে আঙ্গুর দুটো
চুষতে ভারি মিষ্টি লাগে।

শোন, খোকা, তোমার দেহে যে যাদু আছে,
তার দৌলতে, এই ধরায়
তুমি দু' জাতেরই মহব্বৎ কুড়াবে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো বিরানব্বইতম রজনী :

আবার গল্প শুরু হয় :

খোদা মেহেরবান, তিনি নারী ও পুরুষকে পরস্পরের আনন্দ বিধানের জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি যত পীর পয়গম্বর এবং ধর্মাত্মাদের ধরায় পাঠিয়েছেন তাদের সকলকেই আশ্বাস দিয়েছিলেন, তোমাদের যে কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি তা যদি যথাযথ ভাবে সমাধা করে আসতে পারো তবে ফিরে এসে এই বেহেস্তে সুন্দরী নারীর সুধাপান করতে পাবে। যদি সর্বমঙ্গলময় ভাবতেন, নারী সঙ্গ ছাড়াই পরমানন্দ পাওয়া যায় তবে তিনি কী দুনিয়ায় নারী সৃষ্টি করে পাঠাতেন? আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, এই তিনটি বস্তুর জন্য দুনিয়া আমার কাছে এত প্রিয়, নারী, সুগন্ধ এবং নামাজকালে আত্মার প্রশান্তি।

যাই হোক, আমি দেখছি এই তর্ক-আলোচনা আমাকে ক্রমশ উত্তেজিত করে তুলছে। কিন্তু আমিও এক নারী। উত্তেজনা নারীর সহজাত শিষ্টতা নষ্ট করে। আপনি বয়সে প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ, আপনার সঙ্গে অশোভন তর্কযুদ্ধে আমি মাতামাতি করতে চাই না। সুতরাং এ আলোচনার এখানেই ইতি হোক, এই আমার ইচ্ছা। আমি এখানে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছি তা-যদি কারো অন্তরে আঘাত হেনে থাকে তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত।

শাহরাজাদ তার গল্পের ইতি করে বললো, এই ছোট ছোট হাসি মজাকের কাহিনীগুলোর এখানেই ইতি করে দিচ্ছি, জাঁহাপনা। এরপর আবার অন্য জাতের কিস্সা শোনাবো।

সুলতান শাহরিয়ার বললো, তোমার এই ক্ষুদে গল্পগুলো বড় মজার, বেশ ভালো লাগলো। এবার তোমার বড় কিস্সা শোনাও।

একদিন রাতে খলিফা হারুন অল রসিদ-এর চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। উজির জাফর অল বারমাকীকে ডেকে তিনি বললেন, আমার বুকে যেন একটা পাথর চেপে বসে আছে, জাফর। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

আমি এখন বাগদাদের পথে পথে একটু ঘুরবো। তারপর চলো টাইগ্রিসের ধারে যাবো। বাকী রাতটুকু এইভাবে কাটানো ছাড়া আর উপায় নেই।

জাফর তখুনি খলিফাকে এক সওদাগরের ছদ্মবেশ পরালো। নিজেও আর এক সওদাগরের ছদ্মবেশ পরে মাসরুর-দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। চলতে চলতে একসময় তারা টাইগ্রিসের উপকূলে এসে পড়ে।

নদীর ঘাটে একখানা ছোট্ট নৌকা। তার মাঝি এক বৃদ্ধ। খানাপিনা শেষ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে নৌকার ছৈ-এর ভিতরে সে শোবার তোড়জোড় করছিল। জাফর এগিয়ে গেল, ও মাঝি ভাই, তোমার নৌকায় করে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসবে? আঃ এই চাঁদিনী রাত, আর এমন সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া, তোফা লাগবে, কি বল, বুড়ো কত্তা? বেশিক্ষণ তোমাকে কষ্ট দেবো না, একটু হাওয়া খেয়েই ফিরে আসবো, এই নাও ধরো এই দিনারটা রাখো—এই রাতে এত তখলিফ হবে তোমার—

—এ আপনি কি বলছেন সাহেব, বৃদ্ধ মাঝি ভীত চকিত হয়ে বলে, আপনারা কী সরকারের হুকুম জানেন না? ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন না, খলিফা নৌকা-বিহারে বেরিয়েছেন। এখুনি এদিকে এসে পড়বেন।

খলিফা হারুন অল রসিদ জিজ্ঞেস করেন, তুমি সত্যিই জান, ঐ নৌকায় খলিফা নিজে আছেন?

বৃদ্ধ বলে, আল্লাহ সাক্ষী, তামাম বাগদাদে এমন একজনও কী কেউ আছে, একথা জানে না? ঐ দেখুন, খলিফা তার উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মাসরুরকে নিয়ে নৌকাখানা এখানে এসে পড়লো বলে। এ ছাড়া নৌকায় আছে চাকর নকর বাঁদী এবং গাইয়ে, বাজিয়ে, নর্তকীরা। ঐ শুনুন, খলিফার ফরমান জারী করছে তাঁর সচিব; যে যেখানে আছো নদীর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও। তা-সে যেই হোক, ধনী, নির্ধন, ছোট বড়, জ্ঞানী বা নির্বোধ যে-ই এই হুকুম অমান্য করবে, তাকে নৌকার মাস্তুলে ঝুলিয়ে ফাঁসী দেওয়া হবে। সুতরাং যে যেখানে আছো শিগ্গির কূলে উঠে পড়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো চুরানব্বইতম রজনী ঃ
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খলিফা অবাক হয়ে জাফরকে বলেন, জাফর, এ কী তাজ্জব ব্যাপার! এরকম কোন ফরমান তো আমি জারি করিনি। তাছাড়া গত এক বছরের মধ্যে নৌকা-বিহারেও বের হইনি কখনও।

জাফরও হতবাক হয়ে পড়ে। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারে না। মাঝির হাতে সে দুটো দিনার গুঁজে দিয়ে বলে, নাও, নৌকা খোল। চল, ঐ যে দেখছো, নদীর ভিতরে কতকগুলো প্রায় ডুবুডুবু খিলান, ওর আড়ালে নিয়ে চল

নৌকাখানা। ওখান থেকে খলিফার নৌকার সবকিছুই দেখতে পারবো আমরা। কিন্তু ওদের কেউ আমাদের দেখতে পারবে না।

খানিকক্ষণ না না করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো বুড়ো। তিনজনকে নৌকায় তুলে বেশ চাতুর্যের সঙ্গে নৌকাটাকে ধীরে ধীরে ঐ খিলানের আড়ালে নিয়ে গিয়ে থামালো। একখানা কালো কাপড় এনে ঢেকে দিল ওদের সারা শরীর। এর ফলে একেবারেই আর দেখে ফেলার কোন আশঙ্কা রইলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অজ্ঞাত খলিফার বজরাখানা আরও নিকটতর হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো চারপাশ। বজরার পাটাতনে অসংখ্য ক্রীতদাস। লাল আর হলুদ রঙের উর্দি-পরা ছোট ছোট নফরগুলো বজরার ওপর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওদের মাথায় সাদা মসলিনের পাগড়ী। কতকগুলো বজরার চারপাশে চিরাগ হাতে পাহারা রত কয়েকজন। নদীর মাঝখানে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করছে—ধারে কাছে কোনও কেউ আছে কিনা।

এরা তিনজন খিলানের আড়ালে ঘাপটি মেরে সব দেখতে থাকে। তাদের অনুমান, নফর চাকর, ক্রীতদাসের সংখ্যা নেহাত কম করে হলেও দুশোর কম হবে না। বজরার পাটাতনের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট মঞ্চ। সেই মঞ্চকে বৃত্তাকারে ঘিরে তারা সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। মঞ্চের ওপারে সোনার তখত্। সেই স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন এক সুদর্শন যুবক। সাজে পোশাকে কায়দা-কেতায় সে যেন পুরোদস্তুর এক বাদশাহ। তার একপাশে ঠিক জাফর-এরই মতো চেহারার একটা মানুষ এবং অন্যপাশে একজন দেহরক্ষী তার হাতে খোলা তরোয়াল—মাসরুরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

খলিফা উত্তেজিত হয়ে বলেন, জাফর মনে হচ্ছে, এ আমাদেরই খানদানের কোনও ছেলে। হয় সে অল মামুন না হয় অল আমিন। আর দুজনের একজনকে কিন্তু বিলকুল তোমারই মতো দেখতে—না? আর ঐ লোকটা—আরে হ্যাঁ, ও তো মাসরুরই মনে হচ্ছে! তাজ্জব কাণ্ড! আর দ্যাখ, জাফর ওই যে মাইফেল বসেছে—ঠিক যেন আমার জলসাঘরে গাইয়ে বাজিয়েরা গান বাজনা করছে, তাই না?

জাফর বলে, ইয়া আল্লাহ, এতো বিলকুল একই রকম সব। আমি তো কোনই ফারাক দেখতে পাচ্ছি না, ধর্মাবতার।

আস্তে আস্তে সেই আলো ঝলমল বজরাখানা ওদের সামনে দিয়ে আরও আগে এগিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে তার দৃষ্টিপথের দূর সীমাও অতিক্রম করে এক সময়। বুড়ো মাঝিটা এতক্ষণ শ্বাস রোধ করে পড়েছিল। এবার সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, বাব্বা, বাঁচা গেল। ভাগ্যিস কারো নজর পড়েনি আমাদের দিকে!

নৌকাটা আবার এনে ঘাটে ভেড়ালো মাঝি। ওরা তিনজন নৌকা থেকে নেমে কূলে দাঁড়ালো। খলিফা মাঝিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আচ্ছা মাঝি, এই দৃশ্য কী রোজই দেখ তোমরা? রোজ রাতেই এই খলিফা নৌকা বিহারে আসেন এইদিকে?

—একদম ঠিক ; মালিক। রোজ রাতেই খলিফা তার সংগী সাথী দলবল নিয়ে এই নৌকা বিহার করেন। এবং এই কারণে রাতের বেলায় কোনও নৌকা নদীর মাঝে থাকতে পারে না। এই ফরমান গত এক বছর ধরে চলছে।

খলিফা বলেন, আমরা বিদেশী-মুসাফির, এতসব খবর তো কিছু জানতাম না। যাইহোক, তোমার জন্যে আজ এক নতুন জিনিস চোখে দেখলাম। এসব দেখতে পাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা মাঝি আমরা কাল আবার আসবো, তোমাকে যদি গোটাদশেক দিনার ইনাম দিই, তুমি আমাদের জন্য একটু কষ্ট করবে ?

মাঝির চোখ নেচে ওঠে, একশোবার মালিক, কষ্ট আর কী ? কাল ঠিক ঐ সময় আমি নৌকা নিয়ে এই ঘাটে তৈরি হয়ে থাকবো। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান।

জাফর আর মাসরুরকে সংগে নিয়ে খলিফা প্রাসাদে ফিরে আসেন। তারপর বাকী রাতটা তিনি এই অদ্ভুত অজ্ঞাত খলিফার কাণ্ডকারখানা নিয়ে জাফরের সংগে আলাপ-আলোচনা করে কাটালেন।

পরদিন সারাদিন ধরে খলিফা উজির আমির অমাত্য আমলা এবং সেনাপতি পরিবৃত হয়ে দরবারের বিচার আচার প্রভৃতি নানা কাজে ব্যস্ত ব্যাপৃত থেকে সন্ধ্যার পর আবার সেই সওদাগরের ছদ্মবেশ পরে তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর যথাসময়ে উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মাসরুরকে সংগে নিয়ে টাইগ্রিসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। নদীর ঘাটে মাঝি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আর দেরি না করে তারা নৌকায় চেপে বসলে মাঝি তাদের নিয়ে সেই খিলানের পাশে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। কখন সেই আলো ঝলমল বজরাটা আবার তাদের দৃষ্টি-গোচরে আসবে তারই প্রতীক্ষা করতে থাকলো তারা।

এই ভাবে অধীর আগ্রহে অনেকক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ তারা কান পেতে শুনলো, এক মধুর সংগীত আর নূপুর নিক্কনের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর এদিকটায় আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এবং প্রায় সংগে সংগেই দেখা গেল সেই বজরা। তেমনি ভাবে সাজানো গোছানো ঠিক যেমনটি দেখেছিল তারা গতকালে রাতে। সেই শ-দুই সুসজ্জিত নফর চাকর ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত মঞ্চোপরি স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট অজ্ঞাত খলিফা আর তার দুই পার্শ্বচর। সেই একই কায়দায় মাইফেল বসেছে মঞ্চের ওপর।

খলিফা বললেন,নিজের চোখে না দেখলে, কেউ আমাকে এই আজব কাহিনী শোনালে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না ; জাফর। এখনও আমি আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না !

এরপর মাঝির হাতে দশটা দিনার গুঁজে দিয়ে খলিফা তাকে বললেন, এই নাও ধর। এবার তোমার নৌকাখানা ঐ বজরার পাশে নিয়ে চল দেখি, কত্তা। তোমার কোনও ভয় নাই, আমরা আছি। ওরা আমাদের নজরই করতে পারবে না। কারণ আমরা অন্ধকারে আছি। আর ঝলমলে আলোয় ওদের চোখ

এখন ধাঁধিয়ে গেছে। আজ আমরা আরও কাছে থেকে দেখবো।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো পঁচানব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বুড়ো মাঝি দিনারগুলো হাত পেতে নিল। কিন্তু বজরার একেবারে কাছে ঘেঁষতে প্রথমে খানিকটা গররাজিই হয়েছিল কিন্তু বারবার অভয় পাওয়ার পর সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল নৌকাখানা। বজরার পিছনে পিছনে চলতে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে ওরা একটা বাগানের পাশে এসে পড়ে। এইখানে নদীর পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। একটা ঘাট। বজরা ভিড়লো সেই ঘাটে। অজ্ঞাত খলিফা তার সঙ্গী সাথী দল বল নিয়ে নেমে কূলে উঠে এল।

একটু পরে বুড়ো মাঝিও ভিড়িয়ে দিল তার নৌকাখানা। খলিফাও জাফর আর মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়লেন।

খলিফা দেখলেন অজ্ঞাত খলিফার দলবলের লোকেরা মিছিল করে চলেছে। তাদের পুরোভাগে সেই অজ্ঞাত খলিফা! ওরাও তিনজন ওদের অনুসরণ করে চলতে থাকে।

হঠাৎ কয়েকজন সিপাই তাদের দিকে তেড়ে আসে, এ্যাই, কোন্ হ্যায়? এখানে কেন এসেছো তোমরা? চলো; খলিফার কাছে চল।

তিনজনকেই পাকড়াও করে নিয়ে যায় সেই খলিফার কাছে। সে প্রশ্ন করে, কে তোমরা?

জাফর জবাব দেয়, আমরা বিদেশী বণিক। এদেশে সবে এসেছি। পথ-ঘাট সবই আমাদের অচেনা। তাই এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা তো বুঝতে পারিনি, খলিফার এই বাগিচা এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ? আমরা পথ হারিয়ে এখানে ঢুকে পড়েছি তারপরই আপনার সেপাইরা আমাদের পাকড়াও করেছে।

যুবকটি বলে, ঠিক আছে তোমরা যখন বিদেশী মুসাফির, তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা যদি মুসাফির না হতে তোমাদের গর্দান নিতাম আমি। যাক, এবার তোমরা আমার মেহেমান, আমাদের সঙ্গে এস, আজকে রাতটা আমরা একসঙ্গেই খানাপিনা, আনন্দ ফুর্তি করবো।

ওরা তিনজন ওদের মিছিলের সামিল হয়ে চলতে চলতে একসময় এক বিশাল প্রাসাদের আঙিনায় এসে পড়লো। খলিফা হারুন অল রসিদ অবাক হয়ে দেখলেন, এ প্রাসাদ তার টাইগ্রিস তীরের বিলাস মহল-এর চেয়ে কোনও অংশে খাটো নয়। সদর দরজায় খোদাই করে লেখা একটি শায়ের ঃ

একদিন ঝলমল করতো এই প্রাসাদ
রঙে আর বাহারে,
আজ রং ফিকে হয়ে গেছে,
বাহার নিয়েছে বিদায়।
তবু এর খানদানের জৌলুস কমেনি একটুও,
মেহমান আর মালিকের মধ্যে ফারাক নাই কোনও।

একখানা বিরাট প্রশস্ত মহল। সারা ঘর হলুদ রেশমের গালিচায় মোড়া। তার ঠিক মাঝখানে একখানা সোনার তখত্। নকল খলিফা গিয়ে বসলো। সবাইকে চারপাশে নিচে গালিচায় বসতে বললো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খানাপিনার আসর জমে উঠলো। নানারকম লোভনীয় মুখোরোচক খাবারদাবার এসে গেল। সকলেই হাতমুখ ধুয়ে বেশ পরিতৃপ্তি করে আহারাদি শেষ করলো। এরপর পরিবেশন করা হলো সরাব। সবারই সামনে পেয়ালা পূর্ণ করে দিয়ে গেল বাঁদীরা। কিন্তু খলিফার সামনে মদের পাত্র ধরতেই তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আমার এসব চলে না।' বাঁদী তখন জাফরকে দিতে যায়। নকল খলিফা জাফরকে উদ্দেশ করে বললো, আপনার দোস্ত নিলেন না কেন?

জাফর বললো, উনি এসব অনেক কাল আগেই ছেড়ে দিয়েছেন।

—তা হলে, অন্য কিছু খান তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে নকল খলিফার ইশারাতে পিস্তার শরবৎ এনে দেওয়া হলো খলিফাকে। এবার আর তিনি আপত্তি করলেন না। বেশ রসিয়ে রসিয়ে চুমুক দিতে থাকলেন।

যখন মৌতাত বেশ জমে উঠেছে, নকল খলিফা তার হাতের ছড়িখানা তিন বার নিচে ঠুকলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের দেওয়ালের একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। একটি হাতীর দাঁতের ছোট্ট একটি সিংহাসন কাঁধে করে নিয়ে এলো দুজন নিগ্রো ক্রীতদাস। নকল খলিফার সিংহাসনের পাশে নামিয়ে রাখলো। খলিফা আবার তাকিয়ে দেখলেন, সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট এক পরমাসুন্দরী শ্বেতাঙ্গিণী বাঁদী। তার সারা অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সূর্যকিরণমালা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সে। হাতে তুলে নিল একখানা ভারতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র। মধুর কণ্ঠে সে গান ধরলো ঃ

দূরে আমায় সরিয়ে রেখে কেমন করে শান্ত ছিলে প্রিয়?
বাঁচবো বলো কিসের টানে, মাঝে মাঝে সঙ্গ-সুধা দিও।
আতর দানী শূন্য আমার গুল বাগিচায় শুকিয়ে গেছে ফুল
হারিয়ে গেছে প্রেমের বাঁশী, তাইতো আমি পাইনে কোন কূল।

গান শেষ হতে না হতে নকল খলিফা বিকট আওয়াজ তুলে আর্তনাদ

করে ওঠে। নিজের দেহের বাদশাহী সাজ-পোশাক কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। দেহের দামী দামী রত্নাভরণ ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়লো চার ধারে। যুবকটি জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লো নিচে।

প্রহরীরা শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে। নিজেদের গায়ের লাল কুর্তা খুলে তার নগ্ন দেহে চাপা দিয়ে ঢাকে।

খলিফা ও জাফর দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক! একি কাণ্ড! ছেলেটার সর্বাঙ্গে কী সাংঘাতিক চাবুকের দাগ? সোনার বর্ণ শরীর কষাঘাতের কালো-কালো দাগে দাগে ছয়লাপ হয়ে গেছে! খলিফা জাফরের কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, দাগী ফেরারী আসামী। না হলে সারা গায়ে অত চাবুকের দাগ কেন?

জাফর একটা কিছু বলতে যাবে এমন সময় তারা দেখলো, আবার নতুন এক-প্রস্থ শাহী সাজ-পোশাক এনে নফররা তাকে নতুন করে খলিফার সাজে-সাজানো। তারপর যথা পূর্বং আবার তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। দিব্যি আবার সে সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেল। এমন একটা ভাব, যেন কিছুই ঘটেনি।

খলিফারা তিনজনে মিলে তখন ফিস ফিস করে কী সব বলাবলি করছিলেন। তাই দেখে নকল খলিফা জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, কানাকানি করে কী সব কথাবার্তা হচ্ছে?

জাফর জবাব দেয়, আমার দোস্ত বলছিলেন; তিনি নানা দেশ ঘুরেছেন, অনেক সুলতান বাদশাহও দেখেছেন, তাদের শখ-শৌখিনতা বিলাস-ব্যসনও কম দেখেননি তিনি। কিন্তু আজকের মতো এমন বিলাসিতা তিনি দেখেন নি কখনও। আপনি এক পলকের মধ্যে আপনার যে সাজ-পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন কমসে কম তার ইনাম দশ হাজার দিনার হবে। অথচ এই ক্ষতির জন্য আপনার কোনই ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তাই, তিনি আমাকে একটা শায়ের শোনাচ্ছিলেন:

তোমার ভাঁড়ার অফুরান, রিক্ত হয় না প্রভু।
আমার যাহা যায়, আর ফেরে না কভু॥

এই তোষামুদে গলে গেল যুবক। জাফরকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং দামী একটা বাদশাহী পোশাক বকশিস দেওয়ার জন্য তার লোককে হুকুম দিল সে।

এর পর আবার পান, গান এবং আলাপনের পর্ব চলতে থাকে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো ছিয়ানব্বইতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয়:

কিন্তু খলিফা হারুন-অল-রসিদ সেই চাবুকের দাগের কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না। যতই তিনি ভাবেন, এই মোহিনী মধুর

পরিবেশ-এ ওসব কথা মনে করবেন না। কিন্তু কিছুতেই মন মানে না। বার বার ঘুরে ফিরে ঐ একটা কথাই তাকে কুরে কুরে বলতে থাকে। জাফরকে সে আবার ফিস ফিস করে বলে, জাফর, ওকে একবার জিজ্ঞেস করে জানো তো—দাগগুলো কীসের, কীজন্য ?

জাফর বলে, আমার মনে হয়, এখন ওসব কথা না তোলাই ভালো। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন।

খলিফা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বড় বড় করে বলেন, এই মুহূর্তে, এখনই তুমি যদি তাকে সে-কথা জিজ্ঞেস না কর, জাফর, তবে আমার মাথা আর আববাসের তাজিয়ার কসম খেয়ে বলছি, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তোমার ধড়ে আর কাল্লা থাকবে না।

নকল খলিফা আবার নজর করলো, ওরা ফিস ফিস করছে।

—কী ব্যাপার, আবার কী গোপন শলা-পরামর্শ হচ্ছে ?

জাফর বলে, না, তেমন খারাপ কিছু নয়, জাঁহাপনা।

—যাই হোক, আল্লাহর নাম নিয়ে বলুন, সত্যিই কী কথা বলছিলেন আপনারা ?

জাফর বলতে থাকে, আমার দোস্ত বলছিলেন, আপনার সারা দেহে কালো কালো কীসের অত দাগ ? কোনও ডাণ্ডা অথবা চাবুকের কী ? দেখার পর থেকে তিনি অবাক হয়ে গেছেন। আসল ব্যাপারটা কী জানবার জন্য আমার বন্ধু বিশেষ ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর ধারণা, নিশ্চয়ই কোনও দুঃসাহসিক ব্যাপারে আমাদের জাঁহাপনা জড়িয়ে পড়েছিলেন।

যুবক হাসলো।—এই ব্যাপার ! আপনারা মুসাফির মেহেমান, আপনাদের খুশি রাখাই আমার কাজ। সেই কারণে আপনাদের আজ শোনাবো আমার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী।

সে বলতে থাকে ঃ

আজ আপনারা আমার মেহেমান, আমার মালিক। তা হলে সত্যি কথা শুনুন, আসলে আমি ধর্মাত্মা খলিফা হারুন-অল-রসিদ নই। আমার পিতৃদত্ত নাম মহম্মদ আলী। আমার বাবা এই বাগদাদ শহরের এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর—তিনি জহুরী সমিতির শাহবান্দর ছিলেন।

আমার বাবা মারা যাওয়ার সময় প্রচুর ধন সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন আমার জন্য। সোনা চাঁদী, হীরে, চুনী পান্না, মুক্তোয় বোঝাই করে রেখে গিয়েছিলেন সিন্দুক। এ ছাড়া অনেক ঘরবাড়ি ইমারৎ, জমি-জিরেৎ, বাগিচা, বাগান, দোকান গুদাম এবং এই বাদশাহী ঢংএর প্রাসাদখানার মালিক হলাম আমি। এই যে দেখছেন দাসী বাঁদী চাকর নফর পেয়াদা বরকন্দাজ এ সবই তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি।

একদিন আমি আমার দোকানে বসে আছি—এমন সময় দেখলাম একটি সুসজ্জিত খচ্চরের পিঠে চেপে এক পরমাসুন্দরী কন্যা তিনটি সখি সহচরী সঙ্গে করে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে স্বাগত জানাতে আমি শশব্যস্ত

হয়ে উঠে দাড়ালাম। সে নেমে আমার দোকানে এসে বসলো।

—আপনিই জহুরী মহম্মদ আলি ?

—আমি শুধু মহম্মদ আলিই নই—আপনার বান্দাও।

মেয়েটি মধুর হাসি হেসে বললো, আপনার দোকানে খুব বাহারী ছোট্ট মানতাসা আছে ?

আমি বললাম, আমার দোকানে যা আছে সবই আপনাকে দেখাচ্ছি ; যেটা পছন্দ, নিন। নিলে আমি খুব খুশি হবো। আর যদি আপনাকে খুশি করতে না পারি সে দুঃখ আমার জীবনে যাবে না।

সে-সময় আমার দোকানে সত্যিই খুব সুন্দর সুন্দর গহনাপত্র থাকতো। এক এক করে সব তাকে বের করে দেখালাম। সে-ও খুব আগ্রহ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সব। তারপর আমাকে বললো, আমি আরও ভালো কিছু খুঁজছিলাম। এর থেকে কিছু চলবে না।

আমার বাবা তার শেষ বয়সে একখানা হীরে বসানো সুন্দর কাজ করা মানতাসা কিনেছিলেন, মনে পড়লো। সেই সময়ে তার দাম নিয়েছিল একলক্ষ দিনার। অলঙ্কারখানা আমি সিন্দুকে যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিলাম। সিন্দুক খুলে সে-খানা বের করে দেখালাম তাকে। খুব একটু গর্বের ভাব করেই বললাম, দেখুন দেখি, পছন্দ হয় কিনা। অনেক সুলতান বাদশাহর ঘরেও এ বস্তুর জোড়া খুঁজে পাবেন না।

সুন্দরী দেখেই আনন্দে নেচে উঠলো, এই জিনিসই আমি জিন্দগীভর খুঁজে বেড়াচ্ছি—কত দাম ?

—আমার বাবা এটা এক লক্ষ দিনার দিয়ে খরিদ করেছিলেন। আপনার যদি পছন্দ হয় আমি ধন্য হবো। দাম কিছু দিতে হবে না।

সে আমার দিকে গভীর আয়ত চোখ মেলে অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকালো। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তারপর হো হো করে হেসে বললো, পুরো দাম দিয়েই আমি কিনতে চাই। আপনি যা দিয়ে কিনেছেন, তার চেয়ে আরও পাঁচহাজার বেশি দেবো আমি। এটা আপনার টাকার সুদ অথবা নাফা হিসেবেও ধরতে পারেন।

আমি বলি, এই অলঙ্কার এবং এর বর্তমান মালিক আজ থেকে দুই-ই আপনার হলো। এর বেশি কিছু আমার আর বলার নাই।

মেয়েটি আবার মধুর করে হাসলো, আমি তো দাম ঠিক করেই দিয়েছি আপনাকে। এর বাইরে কিছু হলে আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো। কিন্তু তা আমি চাই না।

সে আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়িয়ে দোকান থেকে নেমে সোজা গিয়ে খচ্চরে চেপে বসে চলে গেল। যাওয়ার আগে সে বেশ একটু গলা চড়িয়েই বলে গেল, মেহেরবানী করে গহনাখানা নিয়ে আপনি আমার প্রাসাদে আসুন, আমি আপনার দাম মিটিয়ে দেবো। আজ আমার এতদিনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে—তা সে শুধু আপনারই কল্যাণে।

আমি আর তার কথার ওপরে কোনও কথা বলতে সাহস করলাম না। কর্মচারীদের বললাম, দোকান বন্ধ করে মেয়েটিকে অনুসরণ করে যাও, দেখে এস তার প্রাসাদ।

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো সাতানব্বইতম রজনীতে
আবার সে শুরু করে ঃ

পরদিন আমি তাকে অলঙ্কারটা দিলাম। সে আমাকে তার বসার ঘরে একটা টুলের ওপর বসতে অনুরোধ করে অন্দরে চলে গেলো।

আমি বসে আছি, একটুক্ষণ পরে অন্য একটি মেয়ে এলো। মালিক, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটু ভেতরের ঘরে আসুন। অবশ্য আপনার মতো মানুষকে নিয়ে যাওয়ার মতো আমাদের ঘরদোর তেমন নাই।

তাকে অনুসরণ করে পাশের আর একটা ঘরে গিয়ে আর একটা টুলে বসলাম। সে চলে গেল।

তার কিছুক্ষণ পরে অন্য একটা মেয়ে এসে বললো, মালিক আপনি আমার সঙ্গে পাশের ঘরটায় আসুন। একটু বিশ্রাম করুন। তার মধ্যে আপনার টাকা তৈরি হয়ে যাবে।

সবে সে-ঘরে আমি ঢুকেছি, এমন সময় সামনের দরজার পর্দা ঠেলে চারটি কচি বাঁদী একখানা সোনার সিংহাসন বয়ে নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলো। সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা সেই মেয়েটি। গলায় গহনাটি পরে এসেছে।

বোরখা না-পরা অবস্থায় এই তাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। মনে হলো, তখুনি বুঝি আমি পাগলের মতো চিৎকার দিয়ে উঠবো।

সুন্দরী তার দাসীদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করতেই তারা পর্দার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন সে উঠে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে।

—তুমি আমার চোখের মণি, তোমার মতো সুন্দর আর কাউকেই দেখিনি আমার জীবনে। আমি তোমাকে দেখামাত্র মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি। আর তুমি কিনা নিষ্ঠুরের মতো আমাকে দূরে দূরে রাখতে চাইছো?

আমি কোনও রকমে বলতে পারি, দুনিয়ার সব রূপই তো তোমার দেহে বাধা পড়ে আছে, সুন্দরী। তুমি নিজে জানো না, কী ঐশ্বর্যের মালকিন তুমি। আমি তো এমন রূপ কখনও চোখে দেখিনি।

তারপর সে বললে, মহম্মদ আলি, আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি। প্রথম যখন দেখেছি তখনই। তোমার দোকানে যা বলেছি, সে-সবই আমার ছল—তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসার কৌশলমাত্র।

(সে আমার আরও কাছে সরে আসে। দুহাত বাড়িয়ে টেনে নেয় আমাকে। আমি তার বুকের কাছে বুক পেতে অধরে অধর রেখে তার চোখের অতলান্ত নীল সমুদ্রে অবগাহন করতে থাকি। বাহুর বন্ধনে তাকে আরও নিবিড় করে

নিঃশেষ করে চেপে ধরি আমার বুকে। চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিই ওর অধর কপোল চিবুক। সে-ও আমার দেহের সঙ্গে আরও একাত্ম হতে চায়। তার সুডৌল স্তন দুটি নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে ফেলতে চায় আমার বুকে। ওর দেহের স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারি আমার রক্তচঞ্চলধমনীতে। ওর মুখে তখন কোনও ভাষা নাই। কিন্তু আমি আমার সকল সত্ত্বা দিয়ে ওর না-বলা কথার প্রতিটি শব্দ বুকের মধ্যে শুনতে পাই। সে বলছে, আমি তোমারই—ওগো আমি একান্তভাবেই তোমার। আমার এই সুতনুকা দেহ, সে-তো এতকাল ধরে তিল-তিল করে একমাত্র তোমার জন্যেই গড়ে তুলেছি। আমার এই জাগ্রত যৌবনের উদ্দাম উচ্ছল কামনার তরঙ্গ, সে তো তোমারই যৌবন-সৈকতে আছাড় খেয়ে খানখান হতে চায়—তা কি তুমি জান না?

আমি এখন, এই অবস্থায়, আমার এবং তার দেহমন যা একান্তভাবেই কামনা-আকুল—তা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা করা, কোনওটাই সংগত মনে করি না।

মুহূর্তের মধ্যে আমরা দুজনে উত্তাল তরঙ্গ মালায় উথাল-পাথাল হ'তে হ'তে কোথায় কেমন করে তলিয়ে যাই—বুঝতে পারি না।)

কতক্ষণ কী ভাবে কেটে গেছে, জানি না। চোখ মেলে দেখলাম, আমরা জড়াজড়ি করে পাশের পালঙ্কে শুয়ে আছি। ওর দেহটা আমার দেহে লেপটে রয়েছে তখনও। সেও চোখ মেলে তাকালো, বাব্বা, কী মায়ের দুধই তুমি খেয়েছিলে, মহম্মদ আলি। আমার শরীরের আর কিছু নাই। আমার এত সাধের কুমারী যৌবন, আজ তোমার কাছে সঁপে দিয়ে সার্থক হলো। এর আগে আমি কখনও কোনও পুরুষের ছায়া মাড়াই নি। তুমিই আমার প্রথম পুরুষ—প্রথম ভালোবাসা।

আমি বলি, আমার জীবনেও তুমিই প্রথম মেয়ে—আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলে—ভালোবাসা করতে শেখালে—

—কিন্তু আমি কে? কী আমার পরিচয়, কই কিছুই তো জানতে চাওনি মহম্মদ? তুমি কি ভেবেছো, আমি বাগদাদের এক বোরখা পরা বেবুশ্যা—ইশারায় ডাকলেই যাদের অঙ্ক-শায়িনী করা যায়? অথবা ভারী পর্দার আড়ালের যে-সব কাম-কাতর বিবি-বেগম মালিকের অনুপস্থিতির মওকায় খিড়কীর দরজা খুলে জোয়ান মরদকে ঘরে ঢোকায়—তাদের কেউ একজন? না গো না, আমায় তুমি তেমন খারাপ ভেবো না। আমি তোমায় শুধু দেহ নয়, মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আজ সেধে তোমায় ঘরে ডেকে এনে স্বেচ্ছায় দেহ-দান করলাম বলে আমাকে খাটো করে দেখোনা, সোনা। আমি কোনও দিক থেকেই ছোটো নই। আমার বাবা—ইয়াহিয়া ইবন খালিদ আল-বারমাকী। আমি খলিফার উজির জাফরের ছোট বহিন।

এই কথা শোনামাত্র আমার সারা শরীর হীম হয়ে আসে। চোখে সর্ষে-ফুল দেখতে থাকি। ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরি। হায় আল্লাহ, একি করলাম আমি? কেন তার ডাকে চঞ্চল হয়ে ছুটে এলাম। এখন কী করে আমি জান বাঁচাই। এমন

খানদানী ঘরের ইজ্জৎ আমি নষ্ট করেছি—এ পাপ আমি কোথায় রাখবো ?

দারুণ দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠি আমি, এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছো ? আমি তো চাই নি ? আমার কোনও দোষ নাই, কিন্তু ! তুমিই আমাকে এই পথে নামালে—

মেয়েটি হাসে, কে তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে ? সব দায় আমার। তোমাকে যা বলেছি, তুমি তাই করেছ। এতে তোমার কোনও গুস্তাকী নাই। আমি তোমাকে শাদী করবো—তোমার আপত্তি আছে ?

আমি কেমন ভেবাচেকা খেয়ে যাই, শাদী ? আমার সংগে ? আপত্তি ? না না, আমার কেন আপত্তি থাকবে ? আমি রাজি। কিন্তু তুমি ? তুমি নিজে তোমার শাদী দিতে পারো নাকি ?

—হ্যাঁ পারি। আমি নিজেই আমার মালিক। আমার মতামতের উপরে কারো কোনও কথা বলার এক্তিয়ার নাই। আমার কথাই শেষ কথা। এখন তুমি বল, রাজি কি, না ?

আমি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বলি, বললাম তো আমি রাজি—রাজি—রাজি।

তক্ষুণি কাজী এল। শাদী নামা তৈরি হলো। আমার হবু বিবি কাজী এবং সাক্ষীদের বললো, এ হচ্ছে, মহম্মদ আলী, এই শহরের পূর্বতন শাহবানদরের ছেলে. একটি এক লক্ষ টাকার অলঙ্কার দিয়ে আমাকে শাদী করার প্রস্তাব করেছে। আমি তাতে রাজি।

সংগে সংগে সাক্ষীরা শাদী নামায় সই-সাবুদ করে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে বিদায় হলো।

আমরা তখন সেই নিভৃত নিরালা কক্ষে দুজনে একা। মুখোমুখি বসে রইলাম—অনেকক্ষণ। অনেক মনের কথা বললাম আমরা। এইভাবে আরও ঘনিষ্ঠ আরও নিবিড় হতে থাকলাম আমরা। আরও মনের কাছাকাছি হয়ে এলাম।

দাসীরা সুরাপাত্র এনে বসিয়ে দিল আমাদের সামনে। পেয়ালা পূর্ণ করে আমার অধরে ধরে সে। আঙ্গুরের মতো টসটসে রসে ভরা তার বিম্বাধর এগিয়ে আসে। আমি সুরাও পান করি, সুধাও খাই। একই সঙ্গে।

দুনিয়াটা আমার চোখের সামনে নানা রঙের ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। যা দেখি যা ভাবি—সবই মধুর সবই সুন্দর মনে হয়।

নেশাটা যখন বেশ জমে ওঠে, সে বীণা তুলে নিয়ে গাইতে থাকে। তার গানের মূর্ছনায় হৃদয়ে বসন্তের ছোঁয়া লাগে।

গান শেষ হলে খানা-পিনা শেষ করে আমরা বাসর-শয্যায় শুয়ে পড়ি।

রাত্রি শেষ হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো আটানব্বইতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এক এক করে তার দেহের সব আবরণ আমি খুলে দিই। অবাক নয়নে

আমি তার মুক্তোর মতো নগ্ন নিটোল নিখুঁত সুন্দর শরীরখানা দেখে মুগ্ধ হই। আহা, বিধাতার একি অপূর্ব যাদু!

সেদিনের সে মধু-যামিনীর স্মৃতি আমার জীবনে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু সেই একটি রাতই নয়, তারপর আরও অনেক রাত্রি মধুময় হয়ে উঠেছিল—তার হাসি, গানে, আদর, সোহাগ আর সুরত-রঙ্গে।

এইভাবে পুরো একটা মাস কেটে গেল। আমরা দুজনে দুজনকে এক পলকের জন্যও ছেড়ে থাকলাম না। সারা রাত শুধু নয়, সারাদিনও ছিল সে আমার শয্যাসঙ্গিনী। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, খদ্দের-মহাজন, কেনা-বেচা সব ভুলে তাকে বুকে করে পড়ে রইলাম সেই পালঙ্ক-শয্যায়।

এরপর একদিন সকালে সে আমাকে বললো, আজ আমি হামামে যাবো। গোসল করবো। কিন্তু প্রিয়তম, তোমাকে চোখের আড়াল করে আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবো না।

আমি বললাম, আমারও সেই দশা। যাইহোক, হামাম থেকে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমি তোমার জন্যে অধীর হয়ে বসে থাকবো।

সে আমাকে বলে গেল, আমি যাবো আর আসবো। তুমি সোনা, এখানে ঠিক এমনিভাবে চুপটি করে বসে থাকো। এক-পা কোথাও যাবে না। আমি এসে যদি দেখি, তুমি নাই, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবো কিন্তু।

আমি বললাম, তোমার ভাবনার এত কী দরকার। নিশ্চিন্ত মনে গোসল করতে যাও। ফিরে এসে দেখবে, বান্দা এখানে ঠিক এমনি করেই বসে আছে তোমার পথ চেয়ে।

আমার বিবি হামামে চলে যেতেই ও-পাশের দরজার পর্দা সরিয়ে এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকলো। আমার সামনে এসে বিনীতভাবে বললো, খলিফার বেগম জুবেদা আপনাকে তলব করেছেন। এখুনি আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা করুন। এই তাঁর ইচ্ছা।

আমি বললাম, কিন্তু এখন তো আমি এখান থেকে যেতে পারবো না কোথাও। আমার বিবি হামামে গেছেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার নড়ার উপায় নাই।

বৃদ্ধা শঙ্কিত হয়ে উঠলো, সর্বনাশ, আপনি তবে যাবেন না? বেগম জুবেদা একথা শুনলে আপনার গর্দান যাবে যে! আপনি কী তার মেজাজের কথা জানেন না কিছু?

আমি বললাম, আমি কেন, সারা বাগদাদের সবাই জানে বেগম জুবেদা ভীষণ জেদী একরোখা। তার জবান দিয়ে একবার যা বের হবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত না হয়ে কোনও উপায় নাই। কিন্তু এ অবস্থায়, আমি আমার বিবির কাছে প্রতিজ্ঞাবন্ধ, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার কী যাওয়া সঙ্গত হবে?

বৃদ্ধা বলে, নিজের ঘরের বিবি তাকে যা হোক করে বোঝালে ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু বেগম জুবেদা কুপিত হলে জানে বাঁচা মুসকিল হবে। এখন আপনিই

ভেবে দেখুন, কী করবেন ? যদি যেতে চান আমি আপনাকে সংগে করে নিয়ে যাবো। আর যদি না যান, আমি একাই ফিরে যাবো তাঁর কাছে। আমার যা বলার বলবো তাঁকে। তারপর···

আমার তখন হৃদকম্প শুরু হয়ে গেছে। আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন, আমি যাবো।

বেগম জুবেদা আমাকে স্মিত হেসে স্বাগত জানালেন। একটি আসন দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি আমি। কলের পুতুলের মতো একটি গদীআঁটা কুর্শিতে বসলাম। তাঁর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাবার মতো দুঃসাহস আমার ছিল না। আড়চোখে তাকিয়ে একবার দেখে নিলাম তাঁকে। মুচকি মুচকি হাসছিলেন তিনি। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম আমি।

—হ্যাঁ গো চোখের মণি, তুমিই নাকি আমাদের উজির-ভগ্নীর নাগর ?

—আমি আপনার বান্দা, বেগমসাহেবা।

—আহা চুক চুক, ওরা তবে এক বিন্দু বাড়িয়ে বলে নি দেখছি। যেমন তোমার গলার মিঠে আওয়াজ, তেমনি তোমার আদব কায়দা। নাঃ, জাফরের বোনের পছন্দ আছে বলতে হয়। বেছে বেছে আসলি হীরাই জোগাড় করেছে ! তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আরও খুশি করতে গেলে একটা গান শোনাতে হবে যে !

আমি বললাম, তেমন জানি না, তবে যা জানি তাই শোনাচ্ছি।

সেতার হাতে তুলে নিয়ে একটা ছোট্ট দেখে গান গাইলাম। ভালোবাসার গান। বেগম জুবেদা খুব খুশি হয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাকে কোনও দিকেই বঞ্চিত করেন নি। যেমন রূপ তেমনি গুণ ! এবার যাও, তোমার জানের কলিজা, প্রাণের বিবি হয়তো এতক্ষণে হামাম থেকে ফিরে তোমাকে দেখতে না পেয়ে বিরহে মূর্ছা গেছে। এখন যাও, পরে আবার সময় মতো ডেকে পাঠাবো। তখন এসো। যাও, তাড়াতাড়ি যাও তার কাছে। হয়তো সে ভাবছে, আমি তার ভালোবাসায় ভাগ বসাতে তোমাকে ভাগিয়ে এনেছি এখানে।

লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে আমার গাল। আমি আর তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। প্রায় ছুটেই বেরিয়ে যাই মহল থেকে।

আমি যখন আবার ফিরে এলাম আমার বিবি তখন মুখ গুঁজে পড়েছিল বিছানায়। আমি ভয়ে ভয়ে তার পায়ের কাছে বসি। মৃদু কণ্ঠে ডাকি, ওগো শুনছো ?

সে উত্তর দেয় না। আবার ডাকি, শুনছো, আমি এসেছি।

তবু সে কথা বলে না। আমি ওর পায়ের পাতায় ঠোঁট রেখে চুমু খাই— আদর করতে থাকি।

প্রচণ্ড জোরে সে একটা লাথি ছোঁড়ে। আমি ছিটকে মেজেয় পড়ে যাই। গর্জে ওঠে সে। তুমি একটা ঠগ প্রতারক। ভালোবাসা তোমার প্রাপ্য নয়। মহব্বতের মর্যাদা তুমি দিতে শেখোনি। কথার খেলাপ করে, ভালোবাসাকে

পায়ে দলে তুমি গিয়েছিলে বেগম জুবেদার মনোরঞ্জন করতে ? আল্লা কসম, তোমার মতো একটা অপদার্থ নির্লজ্জ বেহায়া মানুষের সংগে আমি আমার গাঁটছড়া বেঁধে আর থাকবো না। তা সে লোকে যে যাই বলুক। আমার ভাবতেই ঘেন্না করছে, তোমার মতো একটা নষ্ট-চরিত্রের লম্পটকে শাদী করেছি। আমি এক্ষুণি যাবো বেগম জুবেদার কাছে। মুখের ওপর আমি শুনিয়ে দিয়ে আসবো ; অন্য মেয়ের ভাতারকে নিয়ে অত ফষ্টি নষ্টি করা তার সাজে না।

এই বলে সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে হাতে তুড়ি বাজায়। সংগে সংগে সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে হাবসী নিগ্রো সাবাব। হাতে তার খোলা তরোয়াল।

—এই বিশ্বাসঘাতকের গর্দান চাই।

সে চিৎকার করে ওঠে। সাবাব এগিয়ে এসে আমার চোখে ফেটি বেঁধে ফেলে।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো নিরানব্বইতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয় ঃ

সেই সময় প্রাসাদের ছোট বড় কচি বুড়ো, সব দাস দাসী ছুটে আসে। এই এক মাস ধরে এরা সবাই আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। তারা সকলে একসংগে করুণভাবে কাকুতি মিনতি জানাতে থাকলো, মালকিন এবারকার মতো মাফ করে দিন। আমাদের মালিকের কোনও দোষ নেই। তিনি বুঝতে পারেন নি, আপনি এত ক্ষিপ্ত হতে পারেন। মালিক তো আর জানতেন না, বেগম জুবেদা আপনার দুষমন্। আপনার ক্ষতি করার জন্য তিনি রাতে ঘুমান না। আপনাদের এই হিংসা-হিংসীর খবর তিনি রাখবেন কী করে ? সুতরাং তাঁর কতটুকু দোষ ? তাই আমরা সবাই মিলে আপনার কাছে তাঁর প্রাণ-ভিক্ষা করছি।

—ঠিক আছে, আমার বিবি কিছুটা নরম হলো, তোমরা যখন বলছো, আমি ওকে জানে মারবো না। কিন্তু এমন সাজা দেবো, যা ওর জিন্দেগীভর ইয়াদ থাকে। আর যাতে সে কখনো জুবেদার ডাকে কুত্তার মতো ছুটে না যায় তার দরজায়, সেই ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

এরপর আমার বিবির হুকুম মতো সাবাব তলোয়ার রেখে ডাণ্ডা তুলে নেয় হাতে। সারা শরীরে পিটে পিটে আমার হাড়গোড় সব ভেঙ্গে চুর চুর করে দেয়। শুধু ডাণ্ডাই নয়, চাবুকের কষাঘাতেও জর্জরিত করে সে আমার সর্বাঙ্গ। তাও একটা দুটো নয়—পাঁচ পাঁচশো চাবুকের ঘা পড়েছিল আমার এই দেহে।

এরপরে আমার কী অবস্থা হতে পারে নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন। সারা শরীরটা আমার তালগোল পাকিয়ে একটা গোবরের ডেলার

মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় আমাকে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় জঞ্জালের বাক্সে ফেলে দিয়েছিল সে।

আমার জ্ঞান ফিরে এলে কোন রকমে দুপায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে, ছেঁচড়ে কোনও রকমে আমার বাড়িতে এসে পেঁছিতে পেরেছিলাম।

বেদম জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইলাম কদিন। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। একমাত্র তাঁর দয়াতেই প্রাণে বেঁচে গেলাম। দিন কয়েক পরে খানিকটা সুস্থ হয়ে একজন নাম করা হেকিমকে ডেকে আমার ভাঙ্গা হাড়-গোড়গুলো ঠিকঠাক করাতে পারলাম। তার মলম মালিশ আর দাওয়াই-এ আস্তে আস্তে সেরে উঠলাম একদিন।

অনেক দিন পরে আবার দোকান খুলে বসলাম। কিন্তু আমার মনে কোনও শান্তি ছিল না। সারাক্ষণ শুধু আমার বিবির নিষ্ঠুর আচরণ আমাকে হনন করতে থাকলো। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য আমি আমার দোকানের সব দামী দামী রত্নালংকার বেচে সেই পয়সায় চারশো নফর চাকর ক্রীতদাস কিনে তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রতি রাতে টাইগ্রিসে বজরা ভাসিয়ে নৌকা বিহার করতে লাগলাম। এর ফলে আমার মনের দীনতা অনেক কমে আসতে থাকলো। নকল খলিফার সাজে সেজে লোক লস্কর নিয়ে প্রতি রাতে এই প্রমোদ বিহারে বেরিয়ে নিজেকে একজন কেউ-কেটা মনে হতে লাগলো। আস্তে আস্তে আমি ভুলে যেতে পারলাম আমার বিবির দুর্ব্যবহার।

এই আমার দুঃখের কাহিনী। আর এই কারণেই আমার সারা অঙ্গে ঐ কালো কালো দাগ।

যাইহোক, আজ রাতে আপনাদের সঙ্গ পেয়ে অন্য রাতের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছি আমি।

সব শুনে খলিফা হারুন-অল-রসিদ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আল্লাহই একমাত্র সত্য, তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। আমাদের কার নসীবে কী যে তিনি লিখে রাখেন তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

খলিফা উঠে দাঁড়ান, এবার তাহলে আমরা চলি।

জাফর এবং মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রাসাদে ফিরে আসেন। জাফরকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা জাফর, বলতে পারো ঐ যুবকের এই দুর্ভাগ্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন্ নারীটি দায়ী?

জাফর বলে, আমার মতে আমার ভগ্নীর অন্যায় আচরণই এর জন্যে একমাত্র দায়ী।

পরদিন সকালে দরবারে প্রবেশ করে খলিফা জাফরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাল রাতে যে ছেলেটি আমাদের আদর আপ্যায়ন করেছিল তাকে এখানে হাজির কর।

উজির দরবার ত্যাগ করে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই নকল খলিফাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। যুবক যথাবিহিত কুর্নিশ করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো

খলিফার সামনে।

হারুন-অল-রসিদ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, এসো, আমার পাশে এইখানে এসে বসো। মহম্মদ আলি, আমি তোমাকে ডেকেছি কেন, জান? গতকাল রাতে তোমার প্রাসাদে তিনজন বিদেশী মুসাফিরকে তোমার জীবনের বড় অদ্ভুত এক করুণ কাহিনী নাকি শুনিয়েছিলে! সেই কাহিনী আজ আমি তোমার নিজের মুখে শুনতে চাই।

যুবক বললো, বলার আগে আমি আপনার কাছ থেকে অভয় প্রার্থনা করি, জাঁহাপনা! আপনি আমাকে সাজা দেবেন না। সেই জন্যে মেহেরবানি করে আমাকে আপনার অভয়-রুমাল দিন।

খলিফা একখানা রুমাল ছুঁড়ে দিল তার হাতে। এরপর যুবক তার জীবনের সেই সুখ-দুঃখের বিস্ময়কর কাহিনী আগাগোড়া খুলে বললো তাঁর সামনে। এবং বলা শেষ হলে খলিফা প্রশ্ন করলেন, তোমার বিবির জন্য এখনও কী তোমার প্রাণ কাঁদে, আলি? আবার তাকে ফিরে পেতে চাও? তোমার প্রতি যে-দুর্ব্যবহার সে করেছিল, সে-সব কী মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলে তাকে আবার আগের মতো করে গ্রহণ করতে পারবে?

যুবক বললো, এ ব্যাপারে ধর্মাবতার যা ভালো মনে করবেন তা-ই আমি মাথা পেতে নেবো।

খলিফা তখন জাফরকে বললেন, তোমার ভগ্নীকে নিয়ে এসো আমার কাছে।

'যথা আজ্ঞা' বলে জাফর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে বোনকে সংগে নিয়ে আবার দরবারে ফিরে আসে।

খলিফা বললেন, আমার সম্ভ্রান্ত আমির ইয়াহিয়ার কন্যা তুমি, ভালো করে এই যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখ তো, একে চিনতে পারো কিনা?

ধর্মাবতার, সে বলে, মেয়েরা পরপুরুষকে দেখে চিনবে কী করে?

খলিফা মুচকি হেসে বলেন, ঠিক আছে, আমি ওর নাম বলছি—মহম্মদ আলি। ওর বাবা এই শহরের এক সম্ভ্রান্ত জহুরী ছিলেন। সে যাক, যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে। এখন আমার ইচ্ছা, এই ছেলেটির সংগে তোমার শাদী হোক।

মেয়েটি বললো, জাঁহাপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনি যা আদেশ করবেন আমি তা শিরোধার্য করে নেবো।

তৎক্ষণাৎ কাজী এবং সাক্ষী-সাবুদদের ডেকে পাঠালেন খলিফা। তাঁর সামনে আবার তাদের শাদী হলো।

মহম্মদ আলিকে খলিফা তার একান্ত প্রিয় এক আমির করে নিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহম্মদ আলি খলিফার পাশে পাশে থেকে পরমানন্দে কালাতিপাত করেছিল।

এই কাহিনী থেকে খলিফার আর একটা দিক আমরা জানতে পারলাম।

বিচ্ছেদের মিলন ঘটিয়ে আবার সুখের জীবন ফিরিয়ে দিতে খলিফার চেষ্টার অন্ত ছিল না। এইভাবে কত ভাঙ্গা ঘর যে জোড়া লাগিয়ে ছিলেন তিনি তার সীমা সংখ্যা নাই।

শাহরাজাদ এক মুহূর্তের জন্য থামে। তারপর বলে, এ গল্পের এখানেই শেষ। এরপর আরও একটা ছোট কাহিনী শোনাবো আপনাকে। খুব চমৎকার গল্প—গুলাবী এবং রোশন এর কাহিনী বলছি শুনুন ঃ

কোনও এক সময়ে এক প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশাহর ইবরাহিম নামে এক উজির ছিল। এই উজিরের ছিল এক রূপবতী কন্যা। তার নাম গুলাবী। তাকে নিয়েই আমাদের আজকের কাহিনী।

মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ। তার মিষ্টি কথাবার্তায় সুন্দর আদব-কায়দায় সকলেই মুগ্ধ হতো। লেখাপড়াও সে যথেষ্টই করেছিল। বহু নামকরা কবির শায়ের-বয়েৎ অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতো সে।

শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো। বাদশাহ শাহরিয়ার দেখলো, রাত্রি অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

চারশোতম রজনীতে

আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

প্রত্যেক উৎসব অনুষ্ঠানে সুলতান গুলাবীকে ডাকতো। আনন্দের মুহূর্ত-গুলো সুন্দরতর হয়ে উঠতো তার উপস্থিতিতে। সুলতানের সে পাশে পাশেই অবস্থান করতো। তার রূপ এবং রসবোধ দুই-ই সুলতানকে মুগ্ধ করতে পারতো।

একদা সুলতানের অভ্যাগতরা প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বল খেলছিল। গুলাবী জানালার পাশে বসে বসে সেই খেলা দেখছিল। হঠাৎ তার নজর পড়লো সুঠাম দেহী সুন্দর সুপুরুষ এক যুবকের দিকে। গুলাবীর চিত্তে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। নিজেকে আর শান্ত করতে পারে না। ছেলেটির যেমন বাহুভূজ তেমনি বিশাল বিস্তৃত বক্ষপট, ক্ষীণকটি, বলিষ্ঠ গর্দান। আর কী সুন্দর হাসে সে—দাঁতগুলো যেন মুক্তোর মতো ঝিকমিক করে ওঠে।

গুলাবী মুগ্ধ নয়নে তার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। দেখে দেখে তার আর আশ্ মেটে না। ছেলেটিকে আরও কাছে পাওয়ার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রাণ আকুলি বিকুলি করতে থাকে। একটু পরে গুলাবী তার ধাইকে ডেকে বলে, ধাইমা ঐ যে খুবসুরৎ ছেলেটিকে দেখছো,

ওকে চেন ? নাম ধাম জান কিছু ?

—কার কথা বলছো বেটা, কিছুই তো ঠাওর করতে পারছি না। সব ছেলে-গুলোই তো দেখতে চাঁদের মতোন ?

গুলাবী বলে, সে কি ! তুমি বুঝতে পরছো না, ধাইমা। ঐ তো—ঐ যে দেখছো না ? আচ্ছা দাঁড়াও আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

একটা আপেল হাতে নিয়ে সে ছুঁড়ে মারে। ছেলেটির গায়ে লাগতেই সে জানালার দিকে তাকায়। গুলাবীর চোখে চোখ পড়ে। পলকে দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। ছেলেটির মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সেই মুহূর্তে, দুটি হৃদয়েরও বিনিময় ঘটে যায়। ছেলেটি আপনমনেই একটি কবিতার কয়েকটি কলি আওড়ায়—

তীর বিদ্ধ আমি—
আমি এক আহত সৈনিক।
কে তুমি ধনুর্ধর,
এমন অব্যর্থ তোমার শর ?
দুষমন, অথবা দুরন্ত প্রেমিক !

গুলাবী তার ধাইমাকে আবার জিজ্ঞেস করে, এবার তো বুঝতে পেরেছো, কার কথা আমি বলছি। ওর নাম কী ?

ধাইমা বলে, রোশন।

গুলাবী বলে, রোশনই বটে। সার্থক নাম রেখেছেন ওঁর মা-বাবা !

তারপর গুলাবী বিড় বিড় করে নিজের খেয়ালে কী সব আওড়াতে থাকে। একটু পরে সে বলে, ধাইমা কাগজ কলম নিয়ে এসো তো। আমি একটা কবিতা বানিয়েছি—লিখবো।

ধাইমা তাকে কাগজকলম এনে দেয়। গুলাবী লিখতে থাকে ঃ

প্রাজ্ঞ পিতার প্রিয়-পাত্র পুত্র,
তোমার নাম রেখেছেন তিনি রোশন—জগতের আলো।
তা জগতেরই আলো বটে—
তোমার রূপের রোশনাই-এ তামাম দুনিয়া আলোকিত হয়ে আছে।
পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদের মতো তোমার স্নিগ্ধ কোমল দ্যুতি
আমার মনের সব অন্ধকার কেড়ে নিয়ে গেছে।
তোমাকে দেখার পর থেকে আমি নিশ্বাসে আঘ্রাণ করছি
তোমার দেহের সুরভিত সুবাস। তুমি এস—

কবিতাটা লিখে কাগজখানা ভাঁজ করে সে একটা সুন্দর কাজকরা বটুয়ার মধ্যে পুরে বালিশের তলায় রেখে দেয়। ধাইমা দূর থেকে সবই লক্ষ্য

করছিল। গুলাবী ঘুমিয়ে পড়লে, সে অতি সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে বটুয়াটা বের করে। কবিতাটা পড়ে বুঝতে পারে, তার নবযৌবনাউদ্ভিন্না মালকিনের মনে এই প্রথম বসন্তের বর্ষণ শুরু হয়েছে। মহব্বতের ঢল নামতে আর বেশি দেরি নাই; চিঠিখানা আবার ভাঁজ করে বটুয়ায় ভরে যথাস্থানে রেখে দেয় সে।

যখন ঘুম ভাংগলো, বৃদ্ধা তার পাশে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করতে করতে বলে, বেটী, জন্মের পর থেকে তোমাকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। এখন তুমি বড় হয়েছ। তোমার দেহে নারীত্ব আসতে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থায় যা স্বভাবিক তাই তোমার মধ্যে ফুটে ওঠার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে। এ খুবই শুভ লক্ষণ। জীবনে যখন প্রথম প্রেম আসে, তার উদ্দাম উচ্ছলতা সহ্য করার শক্তি সকলের থাকে না। কেউ বা ভেসে যায়। কেউ বা তলিয়ে যায়। মহব্বতের আগুনে পুড়ে কত হৃদয় খাঁটি সোনা হয়। আবার কেউ অংগার হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রেমের চিন্তা বড় মারাত্মক, সে নিয়ত দহন করে। কিন্তু এই দহন জ্বালার কিছুটা উপশম হয় যদি তার প্রণয়-চিন্তার ভাগ দেয় সে অন্য কাউকে।

গুলাবী বলে, ধাইমা, তুমি কী জান এই মহব্বতের জ্বালার কী দাওয়াই?

ধাইমা বলে, জানি বাছা, জানি।

গুলাবী আকুল হয়ে বলে, বল না, ধাইমা, কেমন করে জুড়াবো আমার এ জ্বালা?

ধাইমা বলে, তুমি এক কাজ কর বেটী, তাকে খৎ লেখো। খুব সুন্দর করে খুব মোলায়েম করে তাকে জানাও তোমার প্রেমের আকুলতা। দেখবে, সে তোমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে। তোমার মন প্রাণ খুলে মেলে ধরো তার কাছে। কোনও কিছু গোপন রাখবে না। দেখবে—সেও উন্মুক্ত করে দেবে তার হৃদয়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো একতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে ঃ

বৃদ্ধার কথা শুনে গুলাবী পুলকিত হয়। ভাবে, যথার্থই বলেছে সে। তবু নিজেকে খুলে মেলে ধরতে পারে না তার কাছে। সে যে ছেলেটির প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে সে-কথা বিলকুল চেপে যায়। প্রথমে ছেলেটির কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, তার মনের কথা। যদি সে বুঝতে পারে, ছেলেটিও তাকে ভালোবেসে ফেলেছে, তবেই সে নিজেকে খুলে ধরবে তার কাছে। তার আগে নয়। সুতরাং এখনই এই বৃদ্ধাকে সে-কথা সে বলবে না।

বৃদ্ধা গুলাবীর মনের কথা আঁচ করে বলে, বেটী, গতকাল রাতে আমি এক

খোয়াব দেখেছি। একটি সুন্দর ছেলে আমার সামনে এসে বলছে 'তোমার মালকিন গুলাবী এবং রোশন প্রেমাসক্ত হয়েছে। তুমি ওদের গাঁটছড়া বাঁধার একমাত্র উপায়। আর দেরি করো না, গুলাবীর খৎ নিয়ে গিয়ে রোশনের হাতে পৌঁছে দাও তুমি। রোশন তার জবাব দেবে। এবং তা গুলাবীর কাছে পৌঁছে দেবার ভার তোমাকেই নিতে হবে। এই মহান কর্তব্য থেকে তুমি যদি বিচ্যুত হও তবে দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।' স্বপ্নে যা দেখেছি তোমাকে বললাম, এবার ভালো-মন্দ বিচারের ভার তোমার, বেটা।

গুলাবী আনন্দে নেচে ওঠে, ধাইমা, একটা কথা বলবো, কাউকে বলবে না, বল ?

—তোমার কী কোনও সন্দেহ হয়, বেটী ? আমি তোমাকে জান দিয়ে ভালোবাসি। তোমার কোনও ক্ষতি হয় তেমন কোনও কাজ কী আমার দ্বারা সম্ভব ?

গুলাবীর আর ধৈর্য মানে না। বালিশের তলা থেকে কাগজখানা বের করে সে বৃদ্ধার হাতে দেয়, পড়, আমি তাকে কবিতায় জানিয়েছি আমার মনের ভাষা। আমার এই মনের কথা তুমি তার হাতে পৌঁছে দাও, ধাইমা। সে যা জবাব দেয় আমাকে নিয়ে এসে দাও। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

তখুনি ধাইমা রোশন-এর বাড়িতে ছুটে যায়। তার হাতে তুলে দেয় গুলাবীর কাগজখানা।

রোশন খুলে পড়ে। আনন্দে ভরে ওঠে তার মন। সেও কবিতা করেই জবাব লেখে ঃ

আমার প্রাণ আজ পাখী হয়ে
দূর নীল নভে ডানা মেলে
উধাও হতে চায়।
আমি তো তাকে বাধা দিতে পারি না
সে যে আজ পিঞ্জর ছাড়া—
শুধু মুক্তির গান গায়।
এসো, ওগো আমার প্রিয়া
হৃদয় দুয়ার খুলেছি আজ
পরেছি দেখো নতুন সাজ
সঁপেছি তোমায় সকল হিয়া।

কাগজখানা ভাঁজ করে রোশন ধাইমার হাতে দিয়ে বলে, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, মা। সে যদি আমাকে একটু অনুগ্রহ করে সে আপনারই জন্যে করবে।

ধাই বলে, আমার যথাসাধ্য আমি করবো, বাবা।

বৃদ্ধা আর সেখানে দাঁড়ায় না। দ্রুত পায়ে ফিরে আসে গুলাবীর কাছে।

চিঠিখানা হাতে পেয়ে গুলাবী প্রথমে অধরে স্পর্শ করে। তারপর খুলে পড়ে।

সে আবার জবাব লিখতে বসে ঃ

ধৈর্য ধর,
একই জালে বন্দী হয়েছি আমরা,
তবু কি করে বুঝবো বলো
তোমার দিল্-ও টুকরো টুকরো
হয়ে যাচ্ছে আমারই মতো !
রাত্রির কালোছায়া তোমাকে আড়াল করে রেখেছে
আমার দৃষ্টিপথ থেকে,
কিন্তু আমি তো জানি
আমাদের দুজনেরই বুকে জ্বলছে তুষের আগুন।
নীরবে মুখ বুঁজে থাকাই শ্রেয় ;
আমার নাকাব নাই বা খোলা হলো
তোমার ইয়ার বন্ধুদের সামনে !
আমি তো তোমারই—একান্তভাবে।

রাত্রির অন্ধকার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো দুইতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

গুলাবীর লেখা শেষ হলে কাগজাখানা ভাঁজ করে আবার সে ধাইমার হাতে দিয়ে বলে, যাও ধাইমা, তাড়াতাড়ি জবাব নিয়ে এসো। আমি আর দেরি সইতে পারছি না।

ধাইমা দ্রুতপায়ে চলে যায়। কিন্তু সেবার বিধি বাম হলো. রোশনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে উজিরের প্রধান সচিবের মুখোমুখি হয়ে পড়ে সে।

—শোন, কোথায় যাচ্ছো এত রাতে ?

—হামামে।

বৃদ্ধা থতমত খেয়ে পালাতে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানাও আঁচল থেকে খুলে যায়। দরজার সামনে বারান্দায় গিয়ে পড়ে। একটা খোজা ছুটে এসে কুড়িয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। তারপর সোজা গিয়ে তুলে দেয় উজিরের হাতে। বলে, কাগজখানা দরজার সামনে পড়ে ছিল, হুজুর। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

উজিরের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। হাতের লেখা দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না—এ তার কন্যারই লেখা।

রাগে দুঃখে অপমানে উজিরের কান্না পায়। সে চীৎকার করতে করতে বেগমের কাছে ছুটে আসে। স্বামীর ঐ মূর্তি দেখে বেগম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার চোখে জল কেন, মালিক ?

উজির কাগজখানা বাড়িয়ে দেয়—দেখ, পড়।

বেগম কাগজখানা নিয়ে পড়ে। তারও বুঝতে কষ্ট হয় না—এ তারই কন্যার হাতের লেখা। তারও দুচোখ জলে ভরে যায়। কিন্তু নিজেকে সে সংযত করে নিতে পারে তখুনি। উজিরকে বলে, এ নিয়ে চোখের জল ফেলা বৃথা, মালিক। তার চাইতে এমন ভাবতে হবে কী ভাবে এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, কলংক থেকে রেহাই পাওয়া যায় কী ভাবে ?

তারপর নানা কথায় উজিরকে সান্ত্বনা দিতে থাকে বেগম।

—মেয়ের কথা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি। তুমি তো জানো, সুলতান স্বয়ং তাকে কতো ভালোবাসেন। এখন আমার দুদিকে ভয়। প্রথমতঃ সে আমাদের সন্তান। দ্বিতীয়তঃ সে সুলতানের ভীষণ পেয়ারের। এ ব্যাপারে তোমার কী মত ?

বেগম বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আগে আমাকে একটু আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে দিন।

বেগম যথাবিহিত রুজুআদি সেরে শুদ্ধাচারে নামাজ সারে।

প্রার্থনা শেষে সে বলে, বাহার অল কুনুজ সাগরের মাঝখানে একটা পাহাড় আছে। তার নাম 'নির্বাসিত মাতা'। দারুণ বিপদকাল ছাড়া কেউই সেখানে যেতে পারে না। ওখানে একখানা ইমারত বানিয়ে মেয়েকে রেখে আসুন আপনি। এতে সুলতানের রোষ এবং মেয়ের ইজ্জত দুই-ই বাঁচাবে।

বেগমের কথা উজিরের মনে ধরে। পাহাড়ের দুর্গম চূড়ায় একখানা প্রাসাদ বানাবে ভাবলো সে। সে-প্রাসাদে এক বছরের মতো খানা-পিনার ব্যবস্থা রাখা হবে। গুলাবীকে সেখানে নির্বাসিতা বন্দিনী করে রাখবে সে। অবশ্য দাসী বাঁদী চাকর নফর সবই থাকবে তার সঙ্গে—তার দেখা-শোনার জন্য।

বড় বড় রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী এবং ভাস্করদের ডেকে সেখানে কাজে পাঠিয়ে দিল উজির। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো এক সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে ফেললো সেখানে।

উজির যখন শুনলো, তার কথামতো সব তৈরি হয়ে গেছে, একদিন গভীর রাতে গুলাবীকে জাগিয়ে তুলে লোক লস্কর লটবহর সহ তাকে নিয়ে সেই পাহাড়-প্রাসাদে রওনা হয়ে গেল।

এতদিন সবকিছু গোপনে গোপনে সমাধা করেছে সে। গুলাবী এ সবের কিছুই বুঝতে পারেনি। আজ তার বাবা হঠাৎ তাকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার তোড়জোড় করছে দেখে সে বিরহ-ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লো। কান্নায় ভেসে যেতে লাগলো তার বুক। যাবার আগে দরজার পাল্লায় লিখে রেখে গেল।

তোমার জন্য আমার প্রাণমাতানো
চুম্বন রইলো, হে প্রিয়

জানি না, কোথায় চলেছি আমি
এই রাতে পাখীরা তরুশাখায় বসে
চোখের জল ফেলছে,
কিন্তু আমার নিয়তি
আমাকে ছাড়বে কেন ?

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চারতম রজনীতে
আবার বলতে শুরু করে ঃ

চোখের জলে সুর্মা গুলে হৃদয় নিঙড়ে এই ব্যথার বাণী সে দরজার ওপর লিখে রেখে ডুলিতে গিয়ে বসলো। মনে মনে বিদায় জানালো তার ভালোবাসাকে।

ঊষর মরুভূমি, বন্ধুর পাহাড় পর্বত, অনেক শহর গ্রাম অতিক্রম করে চলতে থাকে তারা। অবশেষে আল কুনুজ সমুদ্রতীরে এসে থামলো। সেখানে তাঁবু ফেলা হলো। দুমদাম কাজে লেগে পড়লো লোকজন, মিস্ত্রী। খুব চটপট একখানা বিশাল নৌকা বানিয়ে ফেললো তারা।

প্রহরী-পরিবেষ্টিত করে দাসী বাঁদী নফর চাকর সঙ্গে দিয়ে গুলাবীকে নৌকায় চাপিয়ে দিল উজির। প্রহরীদের বলে দিল, মেয়েকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়েই তারা যেন আবার সকলে এপারে ফিরে আসে। আসার পর নৌকাখানা পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিল সে।

এদিকে সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজাদি সেরে বেগম ঘোড়ায় চেপে সুলতানের দরবারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। পথে উজিরের প্রাসাদ, রোশন দেখলো, প্রাসাদে কোনও জনমানবের সাড়া নাই। অবাক লাগলো তার। ঘোড়া থেকে নেমে সে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার চোখে পড়ে, দরজায় লেখা গুলাবীর সেই কবিতার কয়েকটি ছত্র। বুঝতে আর বাকী থাকে না, নয়নতারা, তার বুকের কলিজা গুলাবী আর সেখানে নাই। মাথাটা তার ঘুরে গেল। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না, সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো রোশন।

অনেকক্ষণ পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বুকের মধ্যে হু হু করে যায়। এখন সে কী করবে, কোথায় যাবে, কোথায় তার প্রিয়তমার সন্ধান পাবে—কিছুই বুঝতে পারে না। এইভাবে ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগলের মতো সে পথে বেরিয়ে পড়ে। এক বস্ত্রে। উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে মরুপ্রান্তর পার হয়ে চলতে থাকে।

একটানা কত পথ যে অতিক্রম করে, কে তার হিসাব রাখে। এক নদীর ধারে এসে সে থামে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। অঞ্জলি ভরে জল পান করে। নদীর স্বচ্ছ জলে তার নিজের মুখের চেহারা দেখে আঁৎকে ওঠে। একি ছিরি হয়েছে তার চেহারার!

তা সে ক্ষণকালের জন্যই। রোশন ভাবে, হোক গে, কী হবে এই রূপ আর যৌবন দিয়ে? যদি সে তার প্রিয়তমা গুলাবীকেই না পেল, এ রূপ-যৌবনের কী বা প্রয়োজন?

আবার সে বিরাম বিহীন ভাবে চলতে থাকলো। কত পাহাড় পর্বত নদী নালা গ্রাম শহর পিছনে ফেলে সে শুধু একটানা পথ চলে। কোথায় চলেছে কিছুই জানে না। শুধু চলার নেশাতেই চলেছে।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে এক সমুদ্র-সৈকতের বালুকা-বেলায় এসে বসে পড়ে। দেহে আর কোনও শক্তি নাই। আর সে চলতে পারবে না। কয়দিন পেটে একটাও দানাপানি পড়েনি। খিদেটা শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। এখন আর অনুভবই করতে পারে না—সত্যিই তার খিদে বলে কিছু আছে কিনা।

বালীর ওপরে পড়ে পড়ে সে ধুঁকছিল, এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ায় এক দরবেশ ফকির। রোশনের অবস্থা নিরীক্ষণ করে সে বুঝতে পারে, এভাবে এখানে পড়ে থাকলে, নির্ঘাৎ মারা যাবে ছেলেটা।

কোনরকমে তাকে উঠে দাঁড় করায় সে। বলে, বেটা, এখানে তুমি কেন এসেছো? চলো, আমার ডেরায় চলো।

অদূরেই দরবেশ-সাহেবের আস্তানা। সমুদ্রের এক পাশে ছোট পর্বত-মালা। তার নিচে একটি গুহায় সে বাস করে। রোশনকে কোন রকমে গুহার ভিতরে নিয়ে আসে। কিছু ফলমূল এবং একটু সরবৎ খেতে দেয় সে। তারপর ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙগলে রোশন দরবেশকে জিজ্ঞেস করে, আমি কোথায়?

—তুমি আমার দরগায় এসেছো, বেটা। তোমার কোনও ভয় নাই!

—আপনি কে?

রোশনের প্রশ্ন শুনে দরবেশ-এর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে, আমি এক ফকির, বাবা। আল্লাহর নফর।

—আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন আপনি?

—তা না হলে তুমি যে মারা যেতে বাবা। জানি না কি কারণে, তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, পথশ্রমে তুমি বড় ক্লান্ত, অনেকদিন তোমার নাওয়া খাওয়া কিছু হয় নি। ঐ ভাবে ঐ সমুদ্রের চরে পড়ে থাকলে জন্তু-জানোয়ারদের শিকার হতে বাবা। তাই তোমাকে আমার ডেরায় নিয়ে এসেছি। এখন বলতো, কোথায় তুমি চলেছো, আর কেনই বা এত কষ্টের পথ অতিক্রম করে এসেছো।

রাত্রির অন্ধকার কেটে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পাঁচতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

পীর সাহেব জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী, বেটা?

—আমার নাম রোশন।

এরপর রোশন তার বিরহের উপখ্যান আদ্যোপান্ত সব শোনায় তাকে। কথা বলতে বলতে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে।

পীর সাহেব বলে, শোক করো না, বেটা। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি আজ বিশটা বছর এই গুহায় আস্তানা গেড়ে বসে আছি। এদিকে কোনও জনবসতি নাই। মানুষের মুখ ক্বচিৎ কখনও দেখতে পাই। তবে এই কয়েকদিন আগে মানুষের একটা দলবল এখানে এসেছিল। দেখে মনে হলো, অনেক বড় ঘরের ব্যাপার। অনেক লোক লস্কর, লটবহর সঙ্গে ছিল তাদের। এই সমুদ্রের তীরে বসে অনেক লোকজন মিলে ওরা একখানা নৌকা তৈরি করলো। তারপর সেই নৌকায় চেপে সমুদ্রের মাঝখানে ঐ যে দেখছো একটা পাহাড়—সেই পাহাড়ের দিকে চলে গেল। আমি আমার গুহার সামনে বসে বসে সব প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হলো না। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগলো, নৌকাটা যখন সমুদ্রের জলে ভেসে চলতে থাকলো তখন নারী-কণ্ঠের এক আর্তনাদ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। যাইহোক, নৌকাটা চলতে চলতে এক সময় গিয়ে ঐ পাহাড়ের পাদদেশে ভিড়লো। তারপর কিছু লোকজন নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলো এখানে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, ওরা নৌকা থেকে নেমে, অত মেহনত করে বানানো বজরাটাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

সেই থেকে এই হেঁয়ালীর কোনও অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি। এখন তোমার এই কাহিনী শুনে সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, বেটা। তোমার প্রিয়তমাকে ওরা ঐ পাহাড়ে বন্দিনী করে রেখে গেছে।

রোশন জিজ্ঞেস করে, নৌকাটাকে পুড়িয়ে দিয়ে লোকগুলো কোথায় গেল?

পীর সাহেব বললো, যে পথ দিয়ে এসেছিল আবার সেই পথ—এই মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ঐ দিকে চলে গেছে তারা।

রোশন কাঁদতে থাকে। কাঁদতে থাকে পীর সাহেবও। বলে, দুঃখ করো না, বাবা, আল্লাহ মেহেরবান। আজ রাতে আমি তাঁর কাছে তোমার জন্য মোনাজাত করবো। তারপর যা' আদেশ পাই, সেইভাবে তুমি কাজ করবে।

এখন রোশনের কথা থাক। গুলাবীর কাহিনী শুনুন ঃ

পাহাড়ের সেই সুরম্য প্রাসাদে প্রবেশ করে গুলাবী অবাক্ হয়। এত সুন্দর মনোহর ইমারত সে কখনও দেখেনি। সারা প্রাসাদটা বিলাস উপচারে ভরা—বেশ সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে। কিন্তু সবই তার কাছে বিষাদময় হয়ে ওঠে। প্রিয়তম ছাড়া কোনও কিছুই তার কাছে ভালো লাগে না। প্রাসাদের ছাতে গিয়ে দাঁড়ায় সে। সেখান থেকে দূর দিগন্তে যতদূর চোখ যায়—শুধু জল আর জল। অনন্ত জলরাশি। মাথার ওপরে নীল আকাশ। আর সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় নাম না জানা কত রকমের পাখী।

গুলাবী একখানা জাল পাতে। যদি ঐ পাখীরা এসে ধরা দেয়। যদি তাদের কেউ বন্দী হয়ে তার সঙ্গী হয়। কিন্তু কেউ ধরা দিতে আসে না। কেউ

তার বিরহ-ব্যথার ভাগ নিতে চায় না। সে এই নিঃসঙ্গ পুরীতে একা। বড় অসহায়। অথচ তার কোনও দীনতা নাই। খানাপিনা সাজ-পোশাক বিলাস-বৈভবের কোনও অভাব নাই। কিন্তু কী হবে এত ভোগের সামগ্রী দিয়ে। যেখানে তার প্রিয়তম নাই সেখানে সবই নিরর্থক। ঊষর মরুভূমির মতো সবই রিক্ত শূন্য মনে হয় তার কাছে।

গুলাবী তার বিরহ-ব্যথা নিয়ে দিন কাটাক, এবার আমরা আবার রোশনের দিকে চোখ ফেরাই :

পীর সাহেব বললো, আমি কাল রাতে তোমার কথা ভেবেছি। আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছি। তুমি এক কাজ কর, একটু এগোলেই সামনে একটা খেজুর-বন দেখতে পাবে। ওখানে অনেক মরা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। তার কয়েকটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে এসো এখানে।

ফকিরের কথা মতো রোশন খেজুর কাঠের গুঁড়ি এনে জড়ো করে সেখানে। একটার সঙ্গে আর একটা বেঁধে সে ভেলা তৈরি করে। কিছু খড় বিচালি এনে পাটাতন বানায়।

পীর সাহেব বলে, এবার আল্লাহর নাম করে উঠে বসো। খেয়াল রাখবে, সমুদ্রের মাঝখানের ঐ পাহাড়ে তোমাকে পৌঁছতে হবে।

ভেলা ভেসে ভেসে চলে।

সমুদ্র শান্ত ছিল। হঠাৎ সে উত্তাল হয়ে ওঠে। রোশন দিশাহারা হয়ে পড়ে। উন্মত্ত চৈত্রের তাণ্ডবে কোথায় যে সে চলে যায়, কিছুই বুঝতে পারে না।

এক সময় ঝড় থামে। রোশন চৈতন্য ফিরে পেয়ে দেখে ভেলা কোথায় ভেসে গেছে, সে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছেছে। সমুদ্র ঝঞ্ঝায় তার সারা দেহ ব্যথায় টনটন করছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নাই। দেখতে পেল, একটা খোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে।

—আপনি কে, মালিক? এখানে এইভাবে এলেন কী করে?

—আমি এক সওদাগর। সমুদ্র-ঝড়ে আমার জাহাজ ডুবে গেছে। আমি ভাসতে ভাসতে এসে ভিড়েছি এখানে। দেশ আমার ইস্পাহান।

রোশনের দুর্দশার কাহিনী শুনতে শুনতে খোজাটা কেঁদে ফেলে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে।

একমাত্র আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করবেন। ইস্পাহান আমারও স্বদেশ। আমার ভালোবাসা, আমার চাচার মেয়ে আজও আমার পথ চেয়ে বসে আছে সেখানে। একদিন আমাদের জাতভাইরাই আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। তখন আমার বয়স খুবই কম। ওরা আমার বীচি দুটো কেটে খোজা বানিয়ে বাজারে বেচে দেয়। এমনি বান্দা হিসেবে বেচলে যা দাম পেত, তার অনেক বেশি দাম তারা পেয়েছিল আমাকে খোজা বানিয়ে। সে থাক, আমার দুঃখের কিস্সা পরে শোনাবো আপনাকে। এখন আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

পাহাড়ের চূড়ায় একখানা বিশাল প্রাসাদ। তার বাইরের মহলে রোশনকে নিয়ে যায় সে।

—এইখানে আমি থাকি। খাইদাই ঘুমাই। বলতে গেলে প্রাসাদের সদর পাহারা দেওয়া ছাড়া আমার কোনও কাজ নাই। তা পাহারা দেবারই বা কী দরকার। সদর দরজা সারা বছর বন্ধ থাকবে। খুলবে শুধু একদিন।

রোশন বুঝতে পারে না। প্রশ্ন করে, মানে?

খোজাটা বলে, প্রাসাদের অন্দর থেকে বাইরে বেরুবার কোনও নিয়ম নাই। ভেতরে ঢোকারও তাই। পুরো একটা বছরের যাবতীয় খানাপিনা সামানপত্র একেবারে ভিতরে পুরে দেওয়া হয়েছে। এক বছর বাদে আবার আসবে নৌকা বোঝাই মালপত্র। সেইদিন আবার এ দরজা খোলা হবে, তার আগে নয়।

রোশন দেখলো, চারপাশে গাছ-গাছালিতে ঘেরা সুন্দর সাজানো গোছানো প্রাসাদ। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ফুলের বাগিচা। তার মাঝখানে একটা ফোয়ারা অবিরত ধারায় বর্ষণ করে চলেছে। কিন্তু এমন নয়নাভিরাম সৌন্দর্যও তার কাছে ম্লান মনে হয়—করুণ কান্নার আওয়াজ শুনে।

—কে কাঁদে?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো সাততম রজনী

আবার সে বলতে থাকে ঃ

খোজা বলে, এক বাদশাহর উজির তার কন্যার নির্বাসনের জন্য বানিয়েছেন এই প্রাসাদ। দিন কয়েক আগে তিনি রেখে গেছেন তাকে। এই প্রাসাদের হারেমে তিনি বসে বসে তার দয়িতের জন্য চোখের জল ফেলছেন। এ কান্নার আওয়াজ তারই।

রোশনের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে। স্বগতভাবে উচ্চারণ করে, যাক, এতদিনে আমি ঠিক জায়গাতে এসে পেঁছেছি। নিমেষে তার দেহ-মনের সব ক্লান্তি, সব অবসাদ দূর হয়ে যায়।

কিন্তু এখানে এইভাবে কতকাল তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে—কিছুই আন্দাজ করতে পারে না সে।

এই নির্বাসন-প্রাসাদে আসার পর থেকে গুলাবীর চোখে ঘুম নাই। মুখে আহার রোচে না। প্রায় এক রকম অনাহার অনিদ্রাতে কেঁদে-কেঁদে দিন কাটতে থাকে তার। প্রাসাদের কারাপ্রাচীরে মাথা কুটে সে, খোদা, আমাকে মুক্তি দাও এই কয়েদখানা থেকে।

কিন্তু কোনই ফল হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় গুলাবীর, ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে শেষ করে দেবে সে। ভালোবাসার এই বিরহযন্ত্রণা আর কতকাল সইতে পারে মানুষ? দূরে নীল আকাশের দিকে তাকায়। ওখানে মুক্ত বিহঙ্গরা ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়। গুলাবী ভাবে, বনের পাখী,

তারাও কত স্বাধীন, মুক্ত।

ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব নানা চিন্তায় সে বিভোর হয়েছিল। হঠাৎ একপাশে নজর পড়লো। একটা পাহাড়ী গাছের লম্বা ডাল ছাদের কার্নিশ ছুঁয়েছে প্রায়। গুলাবী আশার আলো দেখতে পায়। ডালটাকে ধরতে পারলে নিচে নামা যেতে পারে। কিন্তু কার্নিশের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাতে প্রাণ হারাবার ভয় আছে। তা থাক। গুলাবী আর প্রাণের মায়া করে না। এমন পোড়া ব্যর্থজীবন রেখেই বা কী হবে? সে মরিয়া হয়ে কার্নিশের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডালটাকে আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ে। অনেক কায়দা কসরত করার পর নিজেকে সে আয়ত্তে আনতে পারে। কোনও রকমে একটা মোটা ডালে উঠে বসে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে নিচে।

দুর্গম পাহাড়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে একসময় সে সমুদ্রের সমতটেও নামতে সক্ষম হয়।

তার সারা অংগে দামী দামী রত্নাভরণ, বাদশাহী জমকালো সাজপোশাক।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো নয়তম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

গুলাবী দেখতে পায় এক ধীবর নৌকায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জাল জলে ফেলছে। জেলেরও নজর পড়ে গুলাবীর ওপর। কপালের ভুরু কুঁচকে ওঠে তার। এখানে নির্জন সমুদ্র অঞ্চলে এমন রূপবতী সুন্দরী আমির সুলতান-তনয়া সদৃশ এই নারী এল কী করে? হয় সে বেহেস্তের হুরী পরী, নয় সে নির্ঘাৎ অন্য কোথাও থেকে এসেছে এখানে। নৌকাটাকে লগি দিয়ে ঠেলে সে কূলের কাছে নিয়ে আসে।

গুলাবী তাকে ইশারা করে ডাকে। লোকটা আরও কাছে এলে সে বলে, ভয় নাই, আমি কোনও দৈত্য-দানবী বা জীন-পরী নই। কিংবা ভেবো না সমুদ্রের নিচে আমার বাস। আমি এক রক্ত-মাংসে গড়া নারী। একান্তই মানুষের সন্তান। আমারও দেহে কামনা বাসনা ছিল। আমিও ভালোবেসেছিলাম আমার দয়িতকে। কিন্তু কি করবো বলো, কপালে আমার সুখ লেখা নাই। বিধি বাম হলো, আমি আজ নির্বাসিতা নারী। তোমার নৌকায় আমায় একটু জায়গা করে দেবে জেলের পো? আমি তোমায় সোনাদানা দেবো। দেবো এই মুক্তোর মালা। জান তো, এ মুক্তো পাওয়া যায় এই সমুদ্রেরই ঝিনুক খোলে? আর দেরি করো না জেলের পো। তাড়াতাড়ি কাছে এসো। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যাও। নইলে ওরা—যারা আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছিল, তারা যদি জানতে পারে, আবার আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুরবে ঐ পিঁজরাপোলে। দোহাই, তুমি আর দেরি করো না।

গুলাবীর রোদনভরা আকুলতায় বিচলিত হয় জেলে। তার চোখও জলে ভরে ওঠে। সেও ইয়াদ করতে পারে, তার প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমের বিরহ

যন্ত্রণা। বহুকাল পরে প্রায় বিস্মৃত সেই সব স্মৃতি আবার জেগে ওঠে মনে।

জেলে নৌকাখানা কূলে ভেড়ায়।

—এসো, আমার নায়ে এস। যেখানে তুমি যেতে চাও বল, নিয়ে যাবো আমি।

গুলাবী নৌকায় চেপে বসে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেলে দাঁড় টেনে সমুদ্রের কিনার ছেড়ে অনেক ভেতরে চলে যায়। এমন সময় সমুদ্রে তুফান ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে জেলে নিশানা হারিয়ে ফেলে। শক্ত হাতে হাল ধরেও সে আর নৌকাটাকে বাঁচাতে পারে না। প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় কোথা দিয়ে কী ভাবে ওলোট পালট খেয়ে কোথায় যে তলিয়ে যায় নৌকাখানা কিছুই ঠাওর করতে পারে না কেউ।

এক সময় সমুদ্র শান্ত হয়। এক শহর সমীপে সমুদ্রতটের বালির চড়ায় নৌকাখানাকে আটকে থাকতে দেখা যায়। সেইদিন বিকালে সেই শহরের সুলতান দিরবাস বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিল। একখানা নৌকা বালীর চড়ায় আটকে থাকতে দেখে সে তার পারিষদদের সঙ্গে নিয়ে নৌকাটার কাছে আসে। দেখে অবাক হয়, পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ে আছে এক পরমাসুন্দরী কন্যা। সুলতান ভাবে, এ নিশ্চয়ই কোনও সমুদ্র-কন্যা হবে। না হলে এত রূপ কখনও কোনও ধরার মেয়ের হয়?

—কে তুমি?

সুলতানের ডাকে গুলাবীর আচ্ছন্নভাব কেটে যায়। চোখ মেলে সে তাকায়। সুলতান আবার প্রশ্ন করে, কোন দেশের কন্যা তুমি, এখানেই বা এলে কী করে?

এবার গুলাবীর সব মনে পড়ে। উঠে বসে সে। বলে, আমার বাবার নাম ইবরাহিম। তিনি শাহেনশাহ সামিখের উজির। আমার এই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য বড় বিচিত্র। তা হলে আগাগোড়া সবটাই শুনুন, তবে বুঝতে পারবেন।

গুলাবী কোনও কথাই গোপন করলো না। তার প্রেম বিরহ বিচ্ছেদ, নির্বাসনের সব কাহিনীই তাকে বিস্তারিতভাবে বললো।

—আমার নসীব খারাপ, চোখের পানি ফেলে আর কী করবো। তবু তো পোড়া চোখে পানি বাধা মানে না। আমার ভালোবাসার এই যে অদ্ভুত কাহিনী এ কি তুচ্ছ অশ্রুধারায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো দশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

গুলাবীর মুখে তার জীবনের ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী শুনে সুলতান ব্যথিত হয়ে বলে, ভয় নাই। তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এবার আর কাঁদতে হবে না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো এবং আমার বিশ্বাস, তোমার 'ভালোবাসাকে' আমি পৌঁছে দিতে পারবো তোমার কাছে। এখন চল,

আমার প্রাসাদে চল। সেখানে তুমি অবস্থান কর। আমি তোমার 'ভালোবাসা'র সন্ধানে লোকজন পাঠাচ্ছি।

সুলতান তার উজিরকে বললো, নানারকম মূল্যবান সাজ-পোশাক উপহার উপঢৌকন এবং আমার একদল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ সামিখের দরবারে যাও তুমি। সেখান থেকে রোশন নামে এক নওজোয়ান যুবক প্রার্থনা করে নিয়ে আসবে। বাদশাহকে বলবে গুলাবীর জান বাঁচাবার জন্য রোশনকে অতি অবশ্য দরকার। তাকে যেন শাহেনশাহ সামিখ এখানে পাঠিয়ে দেন।

সুলতান দিরবাস বাদশাহ সামিখকে একখানা চিঠিতেও সে কথা খুলে লিখে দিল। যাওয়ার সময় উজিরকে সে বললো, তোমার কাজে যদি আমি খুশি হই, তবে তোমাকে আমি আরও দায়িত্ব ছেড়ে দেবো। কিন্তু যদি শূন্য হাতে ফিরে আস, তবে তোমার পদাবনতি ঘটবে, উজির। মনে থাকে যেন।

উজির যথাবিহিত কুর্নিশ করে বলে, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

বাদশাহ সামিখের দরবারে পৌঁছে উজির সুলতান দিরবাস-এর ভেট সওগাত এবং চিঠিখানা পেশ করে। বাদশাহ সামিখ চিঠিখানা পড়ে কাঁদতে থাকে, ইয়া আল্লাহ, রোশনকে কোথায় পাবো। সে যে কোথায় চলে গেছে, আমরা তো তার কোন হদিস জানি না। তাকে যদি তুমি ফিরিয়ে আনতে পারো উজির, তোমার সুলতান আমাকে যে ডালি পাঠিয়েছেন আমি তোমাকে তার দ্বিগুণ সওগাত দেবো। এখন তুমি এসব জিনিস ফেরত নিয়ে যাও তোমার সুলতানের কাছে। তাকে গিয়ে বল, আজ অনেক দিন হলো রোশন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেউ তার সন্ধান করতে পারছে না। বুঝতেই পারছি না, সে আজ কত দূরে—কেমন আছে, অথবা আদৌ সে বেঁচে আছে কি না।

উজির বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, রোশনকে সঙ্গে না নিয়ে আমি আমার সুলতানের সামনে যেতে পারবো না। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, যদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারি তবে আমাকে তিনি আর এই উজিরের পদে রাখবেন না। এখন আমি শূন্য হাতে কি করে দেশে ফিরে যাবো, জাঁহাপনা।

বাদশাহ তার নিজের উজির ইবরাহিমকে বললো, এই উজিরের দলের সঙ্গে এক রক্ষীবাহিনী নিয়ে রোশনের সন্ধানে নানা দেশে যাও। তামাম দুনিয়া তোমরা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বেড়াও। খুঁজে তাকে বের করতেই হবে।

ইবরাহিম বললো, জাঁহাপনার যা মর্জি।

ওরা অনেক দিন ধরে নানা দেশের নানা শহর প্রান্তর গ্রামগঞ্জ তল্লাস করে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু রোশনের কোনও সন্ধান পেল না।

ভোর হয়ে আসছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো এগারোতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

আবার তারা নগরে প্রান্তরে ঘুরতে লাগলো। পথের মধ্যে যাদের সঙ্গেই দেখা হয় সকলকেই জিজ্ঞেস করে রোশনের কথা। কিন্তু কেউই কোনও আলোর

নিশানা দেখাতে পারে না।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন তারা সেই সমুদ্র-সৈকতে এসে হাজির হয়। এই সমুদ্রের মাঝখানে সেই 'নির্বাসিত মাতা' পাহাড়। সুলতান দিরবাসের উজির ইবরাহিমকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ঐ পাহাড়টার ওরকম নাম রাখা হয়েছে কেন ?

ইবরাহিম বলে, এর পিছনে একটা মজার কাহিনী আছে। অনেক কাল আগে চীন দেশে এক জিনিয়াহ ছিল। সে ঘটনাক্রমে একটি মনুষ্য সন্তান-যুবকের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। জীনের রোষ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে সে তার দয়িতকে এই নির্জন দ্বীপ-পাহাড়ে এনে লুকিয়ে রাখে। জীনের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে সে আকাশ-পথে উড়ে এসে এই পাহাড়ে সেই যুবক প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতো। তার ঔরসে বার-কয়েক সেই জিনিয়াহ গর্ভবতী হয় এবং কয়েকটি ছেলেমেয়ের জন্ম দেয় এই পাহাড়েই। নাবিকরা জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় সেই ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেতো তখন।

সেই থেকে এই পাহাড়ের নাম 'নির্বাসিতের মা' হয়ে গেছে।

নৌকায় চেপে পাহাড়ের পথে যেতে যেতে ইবরাহিম এই কাহিনী শোনাচ্ছিল তার সঙ্গী সুলতান দিরবাসের উজিরকে। একটু পরে পাহাড়ের পাদদেশে এসে নৌকা ভিড়ালো। দ্বাররক্ষী খোজা এসে সালাম জানালো তাদের। ইবরাহিম যে তার মনিব, তা সে দেখেই চিনতে পেরেছে। দুজন উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রাসাদে উঠে এল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নফর চাকরদের মধ্যে এক ভবঘুরে যুবককে দেখে ইবরাহিম চিনতে পারে—এই সেই রোশন!

ইবরাহিম খোজাকে জিজ্ঞেস করলো, এই মুসাফির যুবকটি কে ? কী তার পরিচয় ? কেনই বা এখানে সে এসেছে ?

খোজা বলে, বেচারি এক সওদাগর। সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে। সহায়-সম্বলহীন হয়ে সে কোনমতে-প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। আমাদের এই ঘাটেই একদিন এসে ভিড়েছিল। তারপর থেকে এখানেই আছে। মানুষটি বড় ভালো। একেবারে ফকির দরবেশের মতো। কারো সাতে-পাঁচে নাই। নিজের মনেই সে ঘুরে বেড়ায়। খুব কম কথা বলে। নাওয়া খাওয়া করে না বললেই চলে।

ইবরাহিম তখন আর কিছু না বলে প্রাসাদের অন্দরে ঢোকে। কিন্তু হারেমের কোথাও তার কন্যা গুলাবীকে দেখতে না পেয়ে সে দাসী-বাঁদীদের প্রশ্ন করে, আমার মেয়ে কোথায় ?

তারা ভীত-চকিত হয়ে বলে, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এই দুর্গের মতো প্রাসাদ থেকে কী করে সে অন্তর্ধ্যান হয়ে গেল! শুধু এইটুকু জানি, সে আর এ প্রাসাদে নাই। আমরা তার কোনও হদিশ করতে পারিনি।

দাসী-বাঁদীদের কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে উজির ইবরাহিম। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে আক্ষেপ করতে থাকে, ইয়া আল্লাহ, তোমার লীলা বোঝা

ভার। যার কপালে যা লিখে রেখেছো, তা থেকে একচুল এদিক ওদিক হবার জো নাই।

ইবরাহিম ছাদের ওপরে উঠে আসে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে একটা গাছের ডালের দিকে নজর পড়ে। ডালখানা এসে ছুঁয়েছে প্রাসাদের কার্নিশ। ইবরাহিমের আর বুঝতে কষ্ট হয় না, তার কন্যা গুলাবী এই ডাল বেয়ে নিচে নেমে কোথাও চলে গেছে।

রক্ষী-বাহিনীকে বলা হলো সারা পাহাড়ের প্রতিটি কন্দর তন্নতন্ন করে খুঁজে-পেতে দেখতে।

কিন্তু রক্ষীরা অনেক খুঁজেও গুলাবীর কোনও সন্ধান আনতে পারলো না। ইবরাহিম ভাবলো ; পাহাড়ের জন্তু-জানোয়ারদের মুখে পড়ে তার কন্যা গুলাবীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

এদিকে এই সংবাদ রোশনের কানে যেতেই সে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার এই অনড় অসাড় অবস্থা দেখে প্রাসাদের নফর চাকররা ভাবে, যুবক ধ্যানস্থ হয়েছে। এখন সে খোদ খোদাতালার সংগে কথা বলছে।

অন্যদিকে সুলতান দিরবাসের উজির দেখলো, উজির ইবরাহিম কন্যার শোকে মুহ্যমান। এ অবস্থায় তার পক্ষে রোশনের সন্ধান করে বেড়ানো আর সম্ভব হবে না। তাই সে ভাবলো, একা একা উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে এদিক ওদিক ফালতু ঘোরাঘুরি করে কোনও ফয়দা নাই। সুতরাং শূন্যহাতে স্বদেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নাই। সুলতানের রোষে তার অশেষ ক্ষতি হবে জেনেও সে দেশের পথেই রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। প্রথমে সে গুলাবীর পিতা ইবরাহিমের কাছে গেল বিদায় নিতে। বললো, আপনার যা মনের অবস্থা তাতে আর আপনাকে বিরক্ত করবো না। আমি দেশে ফিরে চললাম। শুধু যাওয়ার সময় আপনার প্রাসাদের ঐ অসহায় যুবকটিকে সংগে নিয়ে যেতে চাই। ওর মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, জীবনে সে কোনও পাপ করতে পারে না। অথচ কী কপাল দোষে আজ তার এই দুরবস্থা। আমি রোশনকে সংগে নিয়ে যেতে পারলাম না, সে কারণে সুলতান আমার ওপর কুপিত হবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র এই ভরসা নিয়ে যাচ্ছি, এই যুবকের সুন্দর অপাপবিদ্ধ চেহারায় মুগ্ধ হয়ে যদি-বা তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে কিছু কম সাজা দেন। পরে আমি তাকে তার স্বদেশ ইস্পাহানে পাঠিয়ে দেব। আমাদের শহর থেকে ইস্পাহান তো বেশি দূরে নয়।

ইবরাহিম বলে, আপনার যা অভিরুচি। আমার কোনও আপত্তি নাই।

দুই উজির দুই পথ ধরলো। নিজের নিজের দেশের পথ।

দিরবাসের উজির রোশনকে একটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তার পাশে পাশে নিয়ে চললো। তখনও রোশনের আচ্ছন্ন ভাব কাটেনি।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। ধীরে ধীরে রোশন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উজিরের দিকে তাকায়, আমি কোথায় ?

একজন নফর ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে,আপনি সুলতান দিরবাসের উজিরের

সঙ্গে তাঁর শহরের পথে চলেছেন।

উজির বললো, এবার ওকে গুলাব জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে, খানাপিনা খেতে দাও। সময় সময় খেয়াল রাখবে, ওর কোন কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি না।

শহরের কাছে আসতে দূত দ্রুতগতিতে ছুটে গেল সুলতান দিরবাসের কাছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে ফিরে এসে উজিরকে জানাল, সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি হুকুম পাঠিয়েছেন, যেহেতু তুমি ওয়াদা মতো রোশনকে খুঁজে-পেতে সঙ্গে আনতে পারোনি, সেই কারণে আমি তোমার মুখ দর্শন করতে চাইনি। প্রাসাদে আসতে হবে না তোমাকে। তুমি শহরের ভিতরে ঢুকবে না।

দিশাহারা উজির বুঝতে পারে না, এখন কী করণীয়। বেচারী জানে না, যে-গুলাবীর জন্য উজির ইবরাহিম আজ শোকাকুল সেই গুলাবী এখন সুলতানের হেফাজতে। আর যে-রোশনকে খুঁজে আনতে পারেনি বলে আজ তার নিজের এই নির্মম দশা সেই রোশন তারই দলবলের সঙ্গে চলেছে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

সুলতান দিরবাসের হুকুম শুনে উজিরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। অনেক চিন্তা ভাবনা করেও নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোনও উপায় উদ্ভাবন করতে পারে না। ভাবে, ঐ যুবক খোদাতালার এক নিষ্ঠাবান ভক্ত। এ ব্যাপারে সে হয়তো তাকে কোনও নিশানা বাৎলে দিতে পারে।

রোশনের কাছে গিয়ে সে বলতে থাকে, এক কঠিন সমস্যায় পড়েছি আমি। নিজে নিজে ভেবে ভেবে কোন কুল-কিনারা করতে পারছি না। তুমি আল্লাহর সেবক, আমার বিশ্বাস তুমিই আমাকে পথ বলে দিতে পারবে। আমার সুলতান একটি কাজে আমাকে দূরদেশে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমার খারাপ নসীব, আমি কাজটা সমাধা করতে পারিনি। এখন তার দূত এসে আমাকে খবর দিয়ে গেল, যেহেতু আমি কাজটা করে আসতে পারিনি সেই কারণে তিনি আমার মুখ দর্শন করবেন না। তাঁর হুকুম, আমি যেন তাঁর শহরে প্রবেশ না করি।

—কী কাজে তিনি পাঠিয়েছিলেন আপনাকে?

তখন উজির তাকে আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললো। সব অবগত হলো রোশন। ভিতরে ভিতরে দারুণ বিচলিত বোধ করলেও বাইরে কিছু প্রকাশ করলো না সে। সহজ ভাবেই বললো, কিছু ভয় করবেন না, আমাকে সুলতানের সামনে নিয়ে চলুন। আমি তাঁকে বলবো, রোশনের সন্ধান আমি জানি।

উজিরের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, তুমি কী সত্যিই জান, বাবা?

রোশন বললো, আমি মিথ্যে বলবো কেন? সত্যিই জানি।

উজির আর তিলমাত্র বিলম্ব করতে পারে না। রোশনকে সঙ্গে নিয়ে সে সুলতানের দরবারে গিয়ে হাজির হয়।

উজিরকে দেখামাত্র সুলতান গর্জে ওঠে, রোশন কোথায় ? পেয়েছো কোনও সন্ধান ?

উজিরের বদলে রোশান জবাব দেয়, সুলতান মহানুভব, আমি জানি, রোশন কোথায় লুকিয়ে আছে।

সুলতান ইশারায় তাকে কাছে আসতে বললো। রোশন তাঁর সামনে এগিয়ে যেতে সে প্রশ্ন করে, সে-জায়গাটা কোথায় ? কতদূর ?

—খু-উ-ব কাছে। একেবারে আপনার নাকের ডগায় বলতে পারেন, জাঁহাপনা। আমি তার সন্ধান আপনাকে নিশ্চয়ই জানাবো। কিন্তু তার আগে মেহেরবাণী করে বলুন, কেন, কী কারণে তাকে আপনার প্রয়োজন ? অবশ্য আপনার যদি জানাতে কোনও আপত্তি না থাকে।

আপত্তির কিছু নাই। সবই তোমাকে বলতে পারি। তবে শুধু তোমাকেই। কারণ, এ আমার নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। দরবারের সবাইকে তা জানাতে চাই না। আমি তোমাকে নিভৃতে সব খুলে বলবো।

সুলতান রোশনকে সঙ্গে নিয়ে দরবার ছেড়ে এক গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করে। সমস্ত কথা সে খুলে বলে তাকে।

রোশন বলে, আপনি এক কাজ করুন, আমাকে জমকালো একটা সাজ-পোশাক এনে দিন। আমি ওটা পরে যখন দাঁড়াবো, তখনই রোশন এসে হাজির হবে আপনার সামনে।

সুলতান তাকে এক মহামূল্যবান সূক্ষ্ম কারুকার্যকরা সাজ-পোশাক এনে দিল। রোশন তার ছিন্ন বেশ-বাস পরিত্যাগ করে শাহী-সাজে সেজে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, আমি, আমিই সেই রোশন, জাঁহাপনা!

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তেরোতম রজনীতে

আবার কাহিনী শুরু হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

রোশন তার সমূহ বিরহ উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করলো সুলতানের কাছে। সুলতান বলে, খোদা হাফেজ, সত্যিকারের মহব্বতের কখনও মৃত্যু হয় না। তোমাদের দুজনের মধ্যেই যে তীব্র আকুলতা আমি দেখলাম, ভালোবাসার ইতিহাসে তা সোনার জলে লেখা থাকবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা থাকবে, তোমাদের এই অমর প্রেমের জ্যোতির্ময় শিখা দূর আসমানের ধ্রুবতারার মতো জ্বলতেই থাকবে।

রোশন জিজ্ঞেস করে, এখন গুলাবী কোথায় আছে, জাঁহাপনা ?

—সে আমার প্রাসাদেই আছে।

সুলতান কাজী আর সাক্ষী-সাবুদদের ডেকে পাঠালো। কাজী এসে শাদী-নামা তৈরি করে দিল। রোশনকে নানা মূল্যবান দান-সামগ্রী দিল সুলতান।

এবং বাদশাহ সামিখের কাছে এক দৌত্যদল পাঠানো।

বাদশাহ সামিখ সংবাদ পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হয়ে সুলতান দিরবাসকে এক পত্রে জানালো, আমি খুব আনন্দিত। আমার ইচ্ছা, শাদী উপলক্ষে খানা-পিনার উৎসব আমার প্রাসাদেই হোক।

বহু উট, গাধা, খচ্চর এবং ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করা হলো বিরাট দান-সামগ্রী। অনেক দাস-দাসী লোকজনের এক বিশাল বাহিনী পাঠালেন তিনি সুলতান দিরবাসের প্রাসাদে।

সেই স্মরণীয় দিন প্রায় এসে গেল। ওরা সকলে ইস্পাহানে এসে উপস্থিত হলো। সে-দিনের সেই আলোকসজ্জা, সেই সমারোহ ভুলবার নয়। সারা দেশের যত গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে—সবাই এসে জড়ো হলো বাদশাহর প্রাসাদে। তিন-দিনব্যাপী চলতে থাকলো সেই আনন্দ উৎসব। লোকে পেটপুরে খেয়ে সাজ-পোশাক উপহার নিয়ে খুশি মনে ঘরে ফিরে গেল।

উৎসবের শেষে রোশন গুলাবীর ঘরে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নেয়। এত-কালের এত বিরহবেদনার এইখানেই ইতি হয়ে যায়। দুজনের গাল বেয়ে ঝরে পড়ে আনন্দের অশ্রুধারা।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলতে পারে না। শুধু বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে তারা।

শাহরাজাদ বলে, এর পর আপনাকে অন্য ধরনের এক আশ্চর্য কাহিনী শোনাবো, জাঁহাপনা। আবলুস কাঠের এক যাদু-ঘোড়ার কাহিনী শুনুন এবার ঃ

সেকালে পারস্য দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশাহ ছিলেন। তাঁর নাম সাবুর। তাঁর তুল্য অতুল ঐশ্বর্য সে সময়ে আর কোনও সুলতান বাদশাহরই ছিল না। শুধু ধনে নয়, জ্ঞানে গুণে গরিমাতেও কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ও-রকম উদার মহৎ দানশীল মহামতি শাহেনশাহ বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর কাছে হাত পেতে কেউ কখনও বিমুখ হতো না। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, আর্তের সেবা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল। গরীব, নিরন্ন অসহায়ের তিনি একমাত্র সম্বল। তাঁর প্রাসাদের দ্বার সদাই উন্মুক্ত থাকতো তাদের জন্য। কিন্তু উদ্ধত অবিনয়ী, বিদ্রোহীকে তিনি কখনই বরদাস্ত করতেন না। সেখানে তিনি কঠোর, নির্মম, নিষ্ঠুর।

বাদশাহ সাবুরের তিন কন্যা। সকলেই পরম রূপ-লাবণ্যবতী। বেহেস্তের ডানাকাটা পরী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। যেন রাতের আসমানে একই

সঙ্গে তিনটি পূর্ণ চাঁদের হাট। অথবা বলা যায়, গুলবাগিচায় একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত তিনটি গুলাব। সাবুরের একটি পুত্র-সন্তানও ছিল—কামার অল্ আক্মর—অর্থাৎ চাঁদের মেলায় সব থেকে সেরা এক চাঁদ।

ফি বছর বাদশাহ সাবুর দুবার খুব জাঁকজমক করে উৎসবানুষ্ঠান করতেন। বসন্তকালে যে উৎসবটি করা হতো তার নাম নওরোজ। আর শরৎ-কালের নাম মীরগান।

উৎসব-কালে প্রাসাদের সমস্ত ফটক উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো। দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জমায়েৎ হতো প্রাসাদে। বাদশাহর হুকুমে দুহাতে দান ধ্যান করা হতো। পেট ভরে ফলার খাওয়ানো হতো। বাদশাহ খুশি হয়ে কোনও কোনও কয়েদীদের মেয়াদ কমিয়ে দিতেন। কেউ বা একেবারেই খালাস পেত। দরবার এবং দপ্তরের কর্মচারীদের পদোন্নতি হতো। বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার জন্য বিভিন্ন শাহীখেতাব বিলি করা হতো। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নানা ইনাম পুরস্কার বিতরণ করতেন তিনি। শাহেন-শাহকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সারা মুলুক থেকে হাজারো জ্ঞানী গুণী, ধনী নিধর্ন আসতো তাঁর কাছে। যারা সওদাগর আমির ওমরাহ্ জাতের—তারা বাদশাহকে মূল্যবান ধনরত্ন চাকর নফর দাসী-বাঁদী, খোজা এবং নানারকম বাহারী বস্তু নজরানা দিয়ে যেত।

বসন্ত সময়ে নওরোজ উৎসবে বাদশাহ এক বিদ্যোৎসভার আয়োজন করতেন। বিজ্ঞান, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল বাদশাহর।

এই রকম এক বসন্ত-উৎসবের দিনে নানা মুলুক থেকে তিনজন বিখ্যাত বিশারদ এসেছিল তাঁর কাছে। এবং এদের সকলেই অলৌকিক গুপ্তবিদ্যা এবং নানা কলা-কৌশলের অধিকারী।

তারা তিনজন তিনদেশের মানুষ। তাদের ভাষা আলাদা। একজনের হিন্দি, একজনের রুমি এবং অন্যজনের ভাষা পারসী।

প্রথমে হিন্দী-ভাষী পণ্ডিত কুর্ণিশ জানিয়ে বাদশাহকে বললো, আমি আমার দেশ এবং সম্রাটের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, জাঁহাপনা। আপনার আদর-আপ্যায়নে আমি আহ্লাদিত হয়েছি। আপনাকে একটি আশ্চর্য বস্তু উপহার দিতে চাই, শাহেনশাহ।

এই বলে সে বাদশাহ সাবুরের সামনে একটি অভিনব বস্তু স্থাপন করলো। একটি সোনার তৈরি মনুষ্যমূর্তি। বহু দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান হীরক-খচিত তার সর্বাঙ্গ। হাতে একটা স্বর্ণ-শিঙা।

বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, মূর্তিটা কীসের জন্য এনেছেন, পণ্ডিতজী?

পণ্ডিতপ্রবর জবাব দিল, এই মূর্তি এক অলৌকিক দৈব গুণের অধিকারী, জাঁহাপনা। একে যদি আপনি আপনার শহর-প্রান্তের সদর ফটকের মাথায় স্থাপন করেন, তবে এ এক দক্ষ অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দিবারাত্র আপনার শহর পাহারা দিতে থাকবে। বাইরের কোন শত্রুর ক্ষমতা নাই, যে আপনার শহরে

আক্রমণ করতে পারবে। দূর প্রান্তরে শত্রুর আবির্ভাবের সংগে সংগে তার হাতের এই শিঙায় সে মুখ লাগাবে। আর তৎক্ষণাৎ গভীর আর্তনাদ করে সমস্ত শহরবাসী, সৈন্য সামন্ত—সকলকে হুঁশিয়ার করে দেবে। এই শিঙার এমনই গুণ, এর সিংহনিনাদে শত্রুর কলিজা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। প্রাণভয়ে সেনাবাহিনী ছত্রাকার হয়ে পালিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু এর আওয়াজের এমনই যাদু, কেউই পালাতেও পারে না। দেহ অসাড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ভয়ে, আতঙ্কেই তারা অক্কা পায়।

বাদশাহ সাবুর আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, ইয়া আল্লাহ, তাজ্জব কি বাৎ। আপনি যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, পণ্ডিতজী, আপনার কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখবো না আমি।

এরপর রুমি-পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো। শাহেনশাহ মহানুভব, আমি এই রূপোর গামলায় চব্বিশটা স্বর্ণ-ময়ূরী পরিবৃত একটি স্বর্ণ ময়ূর উপহার দিতে এনেছি আপনাকে।

সাবুর জিজ্ঞেস করেন, এ দিয়ে কী হবে?

রুমি পণ্ডিত বলে, সারাদিন রাতে এই ময়ূরটা একঘণ্টা অন্তর অন্তর এই ময়ূরীগুলোর সংগে কাম-সংসর্গে মিলিত হবে। দিন-রাতে চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশটির সংগে সে রতি-রঙ্গ করবে। প্রতিবার রাগমোচনের সময় প্রচণ্ড শব্দে সে পাখা ঝাপটাবে। এবং তা থেকে প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির সময়-সংকেত বোঝা যাবে। এইভাবে দিনে দিনে যখন মাস ফুরিয়ে যাবে তখন ময়ূরটা মুখ ব্যাদন করবে একবার। আর সংগে সংগে তার মুখ থেকে নির্গত হয়ে আসবে প্রতিপদের একখানা চাঁদ।

বাদশাহ অবাক হয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ, এবার বললেন, আপনার কথা যদি সত্যিই ঠিক হয়, পণ্ডিতপ্রবর, তবে আপনারও কোন বাসনা অপূর্ণ রাখবো না আমি।

এবার উঠে দাঁড়ায় পারস্য-পণ্ডিত। বাদশাহকে যথারীতি কুর্ণিশ ও সৌজন্য দেখিয়ে সে বলতে থাকে, জাঁহাপনা আমি আপনার জন্যে এনেছি একটি সামান্য ঘোড়া। তাও আবার জ্যান্ত নয়। কাঠের তৈরি একটা খেলনা বলতে পারেন।

এই বলে পারস্য-পণ্ডিত বাদশাহর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ আবলুস কাঠের একটি ঘোড়া দাঁড় করিয়ে দিল।

—দুষ্প্রাপ্য আবলুস কাঠের তৈরি এই কালো ঘোড়াটি এক অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন।

বাদশাহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন, অতি মূল্যবান মণিমুক্তা হীরে-জহরতে খচিত জীনলাগামে সুসজ্জিত ঘোড়াটা দেখতে বড়ই বাহারী, চমৎকার! দেখতে দেখতে ভুলে যেতে হয়, জানোয়ারটা প্রাণহীন একটা কাঠের পুতুল মাত্র।

পারস্য-পণ্ডিত বলতে থাকে, এমনি আশ্চর্য ব্যাপার, ঘোড়াটার ওপর চেপে বসলে সোওয়ারকে নিয়ে সে ওপরে শূন্যে উঠে যায়। তারপর তার ইচ্ছা মতো

বায়ুবেগে উড়ে চলে। একটা জ্যান্ত ঘোড়ার এক বছরের পথ একলহমায় অতিক্রম করে যেতে পারে সে।

একদিনে একই সময়ে এই রকম তিনটি পরমাশ্চর্য বস্তুর সন্ধান পেয়ে বাদশাহ সাবুর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরে না। তারপর নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

—এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে সত্যি সত্যিই ঘটতে পারে আমি এখন ভাবতেই পারছি না। যাই হোক, যা আপনি বললেন তা যদি সত্যিই ঘটাতে পারেন, যা চাইবেন তাই আপনাকে দেব আমি।

তিনদিন ধরে এই তিনটি অলৌকিক বস্তুর প্রত্যক্ষ পরীক্ষা নিলেন তিনি। সোনার মূর্তি শিঙে ফুঁকলো। সোনার ময়ূর প্রতি ঘণ্টায় ময়ূরী সহবাস করে সময় নির্দেশ করলো। এবং সব শেষে পারস্য-পন্ডিত তার আবলুস কাঠের ঘোড়ায় চেপে শোঁ-শোঁ করে শূন্যে উঠে গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে এক বিশাল বৃত্ত পথপ্রদক্ষিণ করে আবার যথা নির্দিষ্ট স্থানে এসে অবতরণ করলো।

এই সময় রাতের আঁধার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ষোলতম রজনী সমাগত
আবার সে বলতে থাকে ঃ

তিন পন্ডিতের এই অলৌকিক বিদ্যা দেখে বাদশাহ সাবুর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আনন্দ শিহরণে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না তিনি। মাটিতে গড়িয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে পন্ডিতপ্রবরদের জিজ্ঞেস করেন তিনি, আপনাদের অপার দৈব ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ। এখন বলুন, আপনারা কী চান? আমি আপনাদের সব বাসনা পূরণ করবো।

তিনজনে সমবেতভাবে জানালো, বাদশাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে বড় আহ্লাদ হচ্ছে। আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চান তিনি। আমরা তিনজনেই এক বস্তুর প্রার্থী। বাদশাহ তিন কন্যার পিতা। আমরা তিনজনে তাঁর এই কন্যাদের পাণি-প্রার্থনা করছি। আমরা তাঁর জামাতা হতে চাই।

বাদশাহ সাবুর সানন্দে বললেন, আমি পরম আনন্দের সঙ্গে আমার কন্যাদের সঙ্গে আপনাদের শাদী দিয়ে দিচ্ছি। এবং এক্ষুণি। শুভ কাজে দেরি করতে নাই।

তখুনি কাজীকে ডাকা হ'লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো সে। সঙ্গে সঙ্গেই শাদীনামা বানানো হলো।

পর্দার ওপাশে বসেছিল তিনকন্যা। আর এপাশে বাদশাহ কাজী এবং তিন পন্ডিত। পর্দার আড়ালে বসে মেয়েরা তাদের স্ব স্ব হবু স্বামীকে নিরীক্ষণ করতে থাকলো।

সবচেয়ে ছোট কন্যার বরাতে জুটেছে লোলচর্ম পক্কিত কেশ এক বৃদ্ধ।

বয়সের গাছপাথর নাই তার। কম করে হলে একশ বছর হবে। মাথাটা বলতে গেলে একরকম ন্যাড়াই। পিছনের ঘেরে দু-চার গাছি সাদা রোঁয়া এখনও লেগে লেগে আছে। ভ্রূ দুটো একেবারে চাঁছা মোছা। ইয়া বড় বড় গাধার মতো তার কান। কিন্তু এই বুড়ো হাড়েও শখ মরেনি, দাঁড়ি গোঁফ কুচকুচে কালো রঙে রঙ করে এক অদ্ভুত সঙ সেজেছে। একেবারে বেমানান বিশ্রী লাগছে। তার ঘোলাটে চোখে ছানির পর্দা, নাকটা থ্যাবড়া, কপাল বলিরেখায় কণ্টকিত। জরায় বার্ধক্যে মুখের চামড়া কুঁচকে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। বুনো শুয়োরের মতো দাঁতালো দাঁত। নিচের ঠোঁটটা অস্বাভাবিক ভাবে ঝুলে পড়েছে। মনে হয়, ঠিক যেন উটের অন্ডকোষ! এক কথায় বলতে গেলে এই বৃদ্ধ পণ্ডিত এক মূর্তিমান আতঙ্ক বিশেষ। হত কুৎসিত বিভৎস-দর্শন একটা দানবের হতশ্রী তার সর্বাঙ্গে।

কিন্তু অন্যদিকে ছোট কন্যার রূপলাবণ্যের কোনও তুলনা হয় না।

তার মতো পরমাসুন্দরী সারা আরব দুনিয়ায় একশো বছরের মধ্যে কেউ জন্মায়নি। শুধু কি দেখতেই সে নিখুঁত সুন্দরী ; তার মতো কোমল স্বভাবের কন্যাই বা কটা মেলে। হরিণীর মতো চঞ্চল সে, ঝরণার মতো উচ্ছল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যাসমীরণ তার পায়ে মাথা কুটে। আসমানের চাঁদ সালাম জানায়। তরুশাখা আন্দোলিত করে আলিঙ্গন জানাতে চায়। বাগিচার ফুল বলে ; ধন্য আমরা শাহজাদী, তোমার স্পর্শ পেয়ে আমাদের ফুটে ওঠা সার্থক হয়।

ছোট কন্যা যখন তার হবু বরকে প্রত্যক্ষ করলো, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না কিছুতেই। ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

বোনের এই অবস্থা দেখে তার ভাই কামার অল আকমর সস্নেহে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বোন, কাঁদছিস কেন ?

—কী হয়েছে, কী হতে চলেছে, কিছুই কী জান না, বড় ভাই ?

কামার অল বলে, না বোন, কিছুই জানি না আমি। একটা দিন শিকারের সন্ধানে প্রাসাদের বাইরে ছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই এমন কী ব্যাপার ঘটতে পারে ? তোর চোখে পানি ? এতো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, বোন ? কিছুই বুঝতে পারছি না। আর দেরি না করে চটপট সব খুলে বল, দেখি!

—সবই বলবো, বড় ভাই। তোমার কাছে লুকোবার আমার কী আছে ? কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, এত বড় অন্যায় আমি কিছুতেই মেনে নেবো না। তোমার বাবা, নিশ্চিতভাবেই ক্রোধে ফেটে পড়বেন আমার এই ব্যবহারে। কিন্তু দাদা, এভাবে আমার এই জীবন-যৌবন ব্যর্থ হতে দিতে পারি না আমি। তোমার বাবার খামখেয়ালের পুতুল নই আমি। তিনি আমার জিন্দগীটা বরবাদ করে দেবেন, আর আমি তা মুখবুজে সহ্য করবো—সে কিছুতেই হয় না—হতে পারে না। তোমার বাবার খপ্পর থেকে আমি পালিয়ে যাবো—যাবোই। কেউ জানবে না, আমি এই ঐশ্বর্য-সুখের প্রাসাদপুরী থেকে চুপিসারে পালিয়ে যাবো।

এবং এও জেনে রাখো, দাদা, একেবারে শূন্য হাতে বেরিয়ে যাবো আমি। প্রাসাদের কোনও ধনদৌলত সঙ্গে নেব না।

কামার অল অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু কী, ব্যাপার কী? কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না, বোন! খুলে বল আগে, শুনি। হঠাৎ এতো উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন?

ছোট বোন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকে, তুমি আমার একমাত্র ভাই, তোমার কাছে কিছুই গোপন করবো না, দাদা। বাবা আমাকে একশো বছরের এক বুড়ো পণ্ডিতের সঙ্গে শাদী দেবেন। তিনি নাকি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন তিনি, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

কামার অল অবাক হয়, কিন্তু হঠাৎ ঐ বুড়ো পণ্ডিতকে কথাই বা দিতে গেলেন কেন শাহেনশাহ?

—সেই পারস্য পণ্ডিত বাবাকে যাদু করেছে। একটা কাঠের ঘোড়া এনে বাবাকে সে বললো, এর পিঠে চেপে বসলে সোয়ারকে নিয়ে সে আসমানে উঠে গিয়ে সহস্র যোজন পথ নিমেষে অতিক্রম করে যেতে পারবে।

পণ্ডিতের কথা শুনে বাবা বলেছিলেন, যদি সত্যিই তা হয়, তবে যা সে চাইবে তাই তিনি দেবেন তাকে। কি আশ্চর্য, পণ্ডিতের কী ভেল্কিবাজী, ঘোড়াটা সত্যি সত্যিই তাকে নিয়ে মহাশূন্যে উঠে বিশাল বিস্তৃত বৃত্তপথে কয়েকবার পাক দিয়ে আবার এসে নেমে পড়লো!

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই।'

পণ্ডিত আমাকে শাদী করতে চাইলো। বাবা, সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন। তোমাকে কি বলবো বড় ভাই, লোকটা কি কুৎসিত কদাকার, একটা বুড়ো-হাবড়া। তুমি নিজে চোখে একবার তাকে দেখে এস, তা হলেই সব বুঝতে পারবে।

কামার অল সান্ত্বনা দেয়, অধৈর্য হয়ো না, বোন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখনি বাবার সঙ্গে দেখা করছি।

ভাই-এর কথা শুনে ছোট বোন কিছুটা আশ্বস্ত হয়। কামার অল বাবার কাছে গিয়ে বলে, আব্বাজান, এসব কী শুনছি? আপনি নাকি একটা যাদুকরের ভেল্কীতে ভুলে ছোটকে তার সঙ্গে শাদী দেবেন, কথা দিয়েছেন? এমন কী অলৌকিক বস্তু সে আপনাকে উপহার দিয়েছে, যার জন্যে আপনি আমার বোনের জীবনটা বরবাদ করে দিতে উদ্যত হয়েছেন? এ আপনার ভীষণ অন্যায়, বাবা। এ ব্যাপার কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যেতে পারে না।

পারস্য-পণ্ডিত পাশেই ছিল। কামার অলের সব কথাই সে শুনতে পেল। প্রচণ্ড ক্রোধে সে ফেটে পড়তে চাইলো।

বাদশাহ সাবুর বললেন, কামার অল, তুমি তো সেই অলৌকিক ঘোড়ার দৈব ক্ষমতা দেখনি। একবার যদি নিজের চোখে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে, কী মহামূল্যবান বস্তু তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন। তার বদলে আমার কাছে

সামানাই চেয়েছেন তিনি।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পনেরোতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয়ঃ

বাদশাহ সাবুর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আসেন। ক্রীতদাসদের হুকুম করেন, ঘোড়াটা বাইরে বের করে নিয়ে আসতে।

কালো কাঠের ঘোড়াটাকে দেখে শাহজাদা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। এমন সুন্দর গড়ন সে খুব কমই দেখেছে। কামার অল দুর্ধর্ষ ঘোড়সোয়ার. পলকে সে ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে। লাগামে ঝাঁকানি দেয়। কিন্তু কাঠের ঘোড়াটা নড়ে না। খেলনার মতোই দাঁড়িয়ে থাকে। বাদশাহ পণ্ডিতকে বলে, কী ব্যাপার. নড়ে না কেন? নিশ্চল পুতুলের মতোই দাঁড়িয়ে রইলো কেন? আমার ছেলের মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিন. পণ্ডিতপ্রবর। তা না হলে যে তার কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে যাবো আমি!

পারস্য পণ্ডিত কামার অলের কথায় রুষ্ট হয়ে ছিল। তার কারণ বাদশাহ কন্যার সঙ্গে তার শাদীতে সে বাধ সেধেছে। গম্ভীর কণ্ঠে সে কামার অলকে বললো, জীনের ডান পাশে একটা সোনার বোতাম দেখছেন? ওটাই আসল চাবি কাঠি। টিপে ধরুন. দেখবেন ঘোড়া ওপরে উঠতে শুরু করেছে···

কামার অল তৎক্ষণাৎ সেই সোনার বোতামে মোচড় দিতেই শোঁ শোঁ শব্দ করে মহাশূন্যে উঠে যায় ঘোড়াটা। আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে সকলে. ঘোড়ার আকার ক্রমশই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর এক বিন্দুর মতো হয়ে পলকের মধ্যে দৃষ্টিপথের ওপরে চলে গেল।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। বাদশাহ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কামার অল ফিরে আসে না। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে সে পণ্ডিতের দিকে তাকায়, এখন কী উপায় পণ্ডিতপ্রবর, কী করে তাকে নামিয়ে আনা যায়?

পণ্ডিত বলে, জাঁহাপনা, আমার করার কিছুই নাই। আপনার পুত্রকে আর ফিরে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না আমি। একমাত্র শেষ বিচারের দিনেই তার সঙ্গে দেখা হতে পারবে।

বাদশাহ আর্তনাদ করে ওঠেন, সে কি?

পণ্ডিত বলে, জীনের বাঁ পাশে আর একটা সোনার বোতাম আছে। সেটা টিপে নিচে নেমে আসা যায়। কিন্তু আপনার পুত্র আমার সব কথা শোনার আগেই সে ডান পাশের বোতাম টিপে ওপরে উঠে গেল। আমি কী করবো বলুন. জাঁহাপনা? আমার কী গুস্তাকী?

বাদশাহ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। নিগ্রো নফরদের ডেকে হুকুম দিলেন এই পারসী বদমাইশটাকে বেদম প্রহার করে অন্ধকার কারাগারে কয়েদ করে রেখে দাও।

তারপর পুত্রশোকে বাদশাহ বুক চাপড়াতে লাগলেন। বাদশাহী সাজপোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে থাকলেন। মাথার মুকুট খুলে ফেললেন। দাঁড়ি গোঁফ ছিঁড়তে লাগালন। প্রাসাদে প্রবেশ করে সমস্ত দরজা জানালা রুদ্ধ করে দিলেন। মেজেয় পড়ে হাত পা ছুঁড়ে গোঙাতে লাগলেন। বেগম সাহেবাও তাঁর পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে সারা হতে থাকলেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে তিন কন্যা, উজির, আমির, আমলা দাস দাসী নফর চাকর বাঁদী সকলেই। সারা শহরে উঠলো কান্নার গগন-বিদারী আর্তনাদ। এমন যে আনন্দ উৎসবের হাট, পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। সারা প্রাসাদে সারা শহরে নেমে এল হতাশা, শোক দুঃখ তাপের এক কালো ছায়া।

শাহজাদাকে পিঠে নিয়ে ঘোড়াটা ঊর্ধলোকে একটানা উঠে যেতে থাকে। কোনও দিকেই তার গতি ফেরানো যায় না। এইভাবে উঠতে উঠতে সে এক সময় সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়ে। কামার অল বুঝতে পারে, মৃত্যু অবধারিত. কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের দাবদাহে সে দগ্ধ হয়ে যাবে। সেই ভয়াবহ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পড়েছে সে। এই তো মউৎ এড়াবার কোনও পথ নাই। কামার অল ভাবে, পণ্ডিত তার উপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। তার বাড়াভাতে ছাই দিতে গিয়েছিলাম আমি। তারই উচিত পুরস্কার সে আমাকে দিয়েছে। লোকটা মহা শয়তান। আমারই উচিত হয়নি, তার এই যাদুযন্ত্রে চেপে বসা। কিন্তু সে-সব কথা এখন ভেবে কী লাভ ? কী করে এখন নিজেকে বাঁচানো যায় ? একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও উপায় নাই।

হঠাৎ কামার অল-এর মাথায় এক প্রশ্ন জাগে ? আচ্ছা, ওপরে ওঠার জন্য যেমন এই বোতাম নিচে নামার জন্যও তো তেমনি কিছু একটা থাকবে ? তা না হলে ঐ পণ্ডিতই বা নেমেছিল কী করে ?

আতি-পাতি করে এপাশ ওপাশ হাতড়াতে থাকে সে। হাতড়াতে হাতড়াতে এক সময় জীনের বাঁ পাশে এক জায়গায় আর একটা ছোট্ট বোতাম তার হাতে ঠেকে। খুবই ছোট—একটা আলপিনের মাথার টুপির মতো প্রায়। আল্লাহর নাম নিয়ে সেই বোতামটায় সে চাপ দেয়। আর কী আশ্চর্য, তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার ঊর্ধগতি রুদ্ধ হয়ে আসে। ঘোড়াটা এক পলকের জন্য, সেই নিঃসীম মহা-শূন্যে অনড় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আবার শোঁ-শোঁ করে নিচের দিকে নামতে থাকে। যেমন তীরবেগে উঠছিল, তেমনি তীরবেগেই নামতে থাকলো। এইভাবে নামতে নামতে সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর পরিধির মধ্যে এসে পড়ে। তারপর যতই মাটির নিকটবর্তী হতে থাকে গতি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এবং মাটির তলদেশ স্পর্শ করার সময় এক চুল ঝাঁকানিও লাগে না তার।

কামার অল জামান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায়। তাঁরই অপার মহিমায় আজ তার জীবন রক্ষা পেল। এতক্ষণে সে ঘোড়ার কলকব্জার হদিশ পেয়ে গেছে। কী ভাবে উপরে নিচে ওঠা নামা করা যায় তা তার জানা হয়ে

গিয়েছিল। এবারে সে সামনে পিছনে চালাবার চাবিকাঠির সন্ধান পেয়ে গেল। নিচে নেমে আসার একটু পরেই সে আবার উঠে গেল। আর একটা চাবি টিপে সামনের দিকে এবং অন্য আর একটা চাবি টিপে পিছনের দিকে ইচ্ছা মতো চালনা করে সব ব্যাপারটা রপ্ত করে ফেললো।

এইভাবে সে বহু নদী সমুদ্র গিরিপর্বত অতিক্রম করে নানা সুন্দর সুন্দর দেশ পরিভ্রমণ করতে থাকলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আঠারোতম রজনী

আবার সে বলতে থাকে ঃ

চলতে চলতে এক সময় সে এক সুন্দর সাজানো গোছানো শহরের ওপর এসে পড়ে। বড় মনোরম সেই শহরের শোভা। কামার অল ভাবলো, এইখানে সে নামবে। শহরটার মাথার ওপরে বারকয়েক চক্কর দিল সে। তারপর একটা পছন্দসই জায়গা দেখে আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

সূর্য তখন পাটে বসেছে। দিনের আলো নিভে আসছে। প্রায় গোধূলি লগ্ন। শহরটার শোভা দেখে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় কামার অলের। মনে মনে ভাবে, সেদিনের রাতটা সে সেই শহরেই কাটাবে। কাল সকালে সে ফিরে যাবে নিজের মুলুকে, নিজের শহরে। বাবা, মা, বোনদের সে শোনাবে তার বিচিত্র অভিযানের অদ্ভুত এই কাহিনী।

মাটির কাছাকাছি আসতে সে দেখলো, একটা প্রাসাদের ঠিক ওপরে এসে গেছে তার ঘোড়া। যদি আর কোনও ভাবে না চালায় তবে সে ঐ বিশাল ইমারতের ছাদে গিয়ে নামবে।

প্রাসাদটা শহরের ঠিক মাঝখানে। তার চূড়ায় চল্লিশজন সশস্ত্র নিগ্রো প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। তাদের সকলের হাতেই উন্মুক্ত তরোয়াল, কাঁধে তীর ধনুক, বর্শা।

শাহজাদা কামার অল আকমর ছাদের এক প্রান্তে এসে নামলো। তখন সবে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শাহজাদা ছাদের ওপরে ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ বসে রইলো অনেকক্ষণ। রাত্রি আরও গভীর হলো। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন সে ঘোড়ায় পিঠ থেকে ছাদের ওপরে নেমে পড়লো।

সারাটা দিন কিছু পেটে পড়েনি। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু কীই বা উপায়? পিপাসাতেও গলা শুকিয়ে কাঠ। পানিই বা কোথায় পাবে সে?

অবশেষে মরিয়া হয়ে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে। নামতে নামতে একেবারে নিচে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নেমে আসে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এত বড় প্রাসাদে কোনও জন-মানবের অস্তিত্ব বুঝতে পারে না সে। মনে হয়, একে-বারে পরিত্যক্ত পুরী।

এদিক ওদিক বেশ ভালো করে খুঁজে পেতে দেখে সে। কিন্তু না; কোথাও কেউ নাই। কামার অল ভাবে, আবার সে ছাদেই ফিরে যাবে। আজকের

রাতটা কোনরকমে ছাদেই শুয়ে সে কাটাবে। তারপর সকাল হতে না হতে নিজের শহরে ফিরে যাবে।

এই ভেবে সিঁড়ির দিকে আবার ফিরে আসতে থাকে সে, হঠাৎ একটা ক্ষীণ আলোর রোশনাই এসে লাগলো তার চোখে। লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, প্রাসাদের একবারে অন্তরপ্রদেশ থেকে আসছে সেই আলোর রশ্মি।

আলোর নিশানা ধরে পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসতে থাকে প্রাসাদের অন্দরমহলে। একেবারে হারেমের দরজার সামনে। সেখানে একটা খাটিয়ায় শুয়েছিল একটা নিগ্রো খোজা। প্রচণ্ড নাসিকা গর্জন তুলে সে ঘুমোচ্ছে। তার মাথার কাছে রাখা একটা চিরাগ। এই বাতির আলোর নিশানা ধরেই আসতে পেরেছে সে।

দরজাটাকে আড়াআড়ি করে এমন ভাবে তার বিশাল লাশটা পড়ে আছে কার বাপের সাধ্যি, ডিঙিয়ে কেউ ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারে। পাশে একখানা খাঁড়ার মতো প্রকাণ্ড তরোয়াল—একেবারে খোলা। এবং মাথার ওপরে থামের আংটায় ঝুলানো একটা সিকেয় তার কিছু খাবার।

দৈত্যের মতো বিশাল বপু ঐ নিগ্রোটাকে দেখে কামার অলের বুক কাঁপতে থাকে। ওরে বাস, একেবারে সাক্ষাৎ দোজকের দূত। হায় আল্লাহ, এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে? তোমার দোয়াতে একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। কিন্তু এবার বোধহয় বেঘোরেই প্রাণটা হারাতে হবে। কিন্তু খিদেয় আমার পেট জ্বলছে, চোখের সামনে এইসব খাবার দাবার দেখে চুপ করেই বা থাকি কি করে। নসীবে যা থাকে হবে, খাবারের সিকেটা খুলে নিয়ে যেতেই হবে আমাকে।

অতি সন্তর্পণে সে সিকেটা খুলে নিয়ে আবার পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। নানা রকম মুখরোচক খাবার-দাবারে ঠাসা ছিল সিকেটা। চলতে চলতেই সে একটু একটু করে মুখে পুরতে থাকে। কী সুন্দর স্বাদ! প্রাসাদ প্রাঙ্গণের একপাশে একটা ফোয়ারা দেখতে পেয়ে সে-দিকে এগিয়ে যায়। খাবার-গুলো সব খেয়েদেয়ে ফোয়ারার কাছে এসে প্রাণভরে পানি খায়। তারপর আবার ফিরে আসে খোজাটার পাশে। খুব সাবধানে যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখে সিকেটা, এবং আলতোভাবে তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে আবার বেরিয়ে আসে। খোজাটা তখনও দৈত্যের মতো পড়ে পড়ে নাক ডাকাতে থাকে।

শাহারাজাদ দেখলো রাত শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো উনিশতম রজনী

শাহরাজাদ বলতে থাকে:

চলতে চলতে সে এক সময় আর একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজার সামনে একটা মখমলের পর্দা ঝুলছিল। পর্দাটা তুলে ভিতরে ঢুকতে দেখলো,

একটা প্রশস্ত শয্যাকক্ষ। মাঝখানে একটা শশাঙ্ক শুভ্র নয়নাভিরাম হাতীর দাঁতের পালঙ্ক। হীরে চুনী পান্না মুক্তো বসানো। চারটি ডাগর-ডাঁসা মেয়ে মেজেয় শুয়ে ঘুমে অচেতন। কামার অল পায়ে পায়ে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য—শয্যাশায়িনীকে দেখা।

নব-যৌবন-উদ্ভিন্না অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী এক কণক কন্যা আলুলায়িত কেশে সারা মুখ আবৃত, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সকাল বেলা সূর্য ওঠার কালে পূর্ব দিগন্ত যে অবর্ণনীয় রূপচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই অলোকসামান্য রূপের জেল্লা তার সর্বাঙ্গে।

কামার অল আকমর-এর সারা দেহে শিহরণ খেলে যায়। এমন সুন্দর মেয়ে সে এই প্রথম দেখলো। ধীরে মুখটা নামিয়ে এনে সে মেয়েটির গালে আলতো-ভাবে একটি চুম্বন এঁকে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। চোখ মেলে তাকায়। হরিণীর মতো কাজল-কালো টানাটানা চোখে এক নিদারুণ বিস্ময় ফুটে ওঠে!

—কে তুমি? কেন এসেছ, কতক্ষণ এসেছ, কেমন করে ঢুকেছ এখানে?

এক সঙ্গে এক রাশ প্রশ্ন। কোন্‌টার জবাব দেবে কামার অল?—আমি তোমার বান্দা।

—কে তোমাকে নিয়ে এল এখানে?

কামার অল বলে, খোদা, আমার নসীব, আমার সৌভাগ্য।

তরুণীর নাম সামস্ অল নাহার। খুব সহজভাবেই সে প্রশ্ন করে, তুমি কী হিন্দুস্থানের কোনও বাদশাহজাদা? গতকাল সে আমার বাবার কাছে এসে আমাকে শাদী করার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমার বাবা তাকে জামাতা করতে রাজী হন নি?

কামার অল জানতে চায়, কেন?

—সে নাকি দেখতে ভীষণ বিশ্রী ছিল, তাই। কিন্তু তোমাকে দেখে কুশ্রী বলবে কে? তোমার মন-ভোলানো রূপের বাহারে আমি তো প্রথম দর্শনেই মোহিত হয়ে গেছি।

সামস্ অল নাহারের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে কামার অলের মন খুশিতে ভরে যায়। মুগ্ধ হয়ে অপলকভাবে দেখতে থাকে ওকে। সামস্ অল দুহাত বাড়িয়ে কামার অলকে কাছে টেনে নেয়। তারপর দুজনে দুজনের বাহু বন্ধনে বাধা পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। দেহ দিয়ে দেহের সুধা পান করার এক অপার আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে ওরা।

তারপর রাত্রি গভীরতর হতে থাকে। কামনার আগুনও জ্বলে ওঠে ওদের দেহে। নানারকম আদর সোহাগ চুম্বনে মেতে ওঠে ওরা। হঠাৎ একসময় মেজেয় শোয়া একটি দাসীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবাক চোখে তাকায় সে। তাদের শাহাজাদীর শয্যায় অচেনা অজানা এক নওজোয়ানকে দেখে আঁৎকে ওঠে, আপনার পাশে কে, শাহজাদী?

সামস্ অল বলে, আমি জানি না। ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমার সামনে

দাঁড়িয়ে আছে এ। প্রথমে মনে হয়েছিল, কাল বাবা যে শাহজাদাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন, বুঝি সে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে জানলাম, না, তা নয়।

দাসীটা বলে, না না, সে হতে যাবে কেন? সে তো হত-কুৎসিত কদাকার ছিল দেখতে। আমি নিজে চোখে তাকে দেখেছি। আর এঁর তো চাঁদের মতো সুরৎ। মনে হয় কোনও এক বাদশাহর ছেলে। কাল যে আপনাকে শাদী করার জন্য এসেছিল সে আপনার নফর চাকর বান্দা হওয়ার যোগ্য নয়।

এরপর দাসীটা খোজাটার কাছে গিয়ে জাগালো তাকে।

—খুব তো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছো। এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল! এবার তোমার গর্দান যাবে।

খোজাটা ধড়মড় করে উঠে বসে, এঁ্যা! কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? কী হয়নি, তাই বলো! তুমি আছো হারেমের পাহারায়। অথচ নাক ডাকিয়ে সারারাত ঘুমাও। তোমার নাকের ডগা দিয়ে শাহজাদীর ঘরে ঢুকেছে এক শাহজাদা, সে খবর রাখ কী?

খোজাটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ তোলে? আঁ, কী বললে? শাহজাদীর ঘরে ঢুকেছে পর-পুরুষ?

তড়াক্ করে সে লাফিয়ে দাঁড়ায়। তলোয়ারখানা হাতে নিতে যায়। কিন্তু একি! কোথায় গেল তার তলোয়ার? খালি খাপখানা দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে? এবার সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। থর থর করে কাঁপতে থাকে সারা শরীর। দিশাহারা হয়ে ছুটে আসে শাহজাদীর ঘরে। কামার অল তখনও শাহজাদীর বাহুপাশে আবদ্ধ মধুর আলাপে রত।

এই প্রেমালাপনের দৃশ্য দেখে নিগ্রোটার মুখ হাঁ হয়ে যায়। কথা বেরোয় না কয়েক মুহূর্ত। তারপর ভয়ে জবুথবু হয়ে জিজ্ঞেস করে, মালিক, আপনি কী কোন জীন বা আফ্রিদি? না, মানুষ?

নিগ্রোটার কথায় রোষে ফেটে পড়ে কামার অল।—এত বড় স্পর্ধা তোর, তামাম পারস্য মুলুকের শাহেনশাহ আমার বাবা সাবুর। তাঁর একমাত্র পুত্র আমি। আর আমাকে বলিস কিনা—জিন, না, আফ্রিদি?

এই বলে সে সিংহবিক্রমে লাফিয়ে ওঠে শয্যা ছেড়ে। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে বলে, আমি তোর সুলতানের জামাতা। তার এই কন্যার সঙ্গে আজ রাতে আমার শাদী হয়েছে। তাই তার শোবার ঘরে তাকে নিয়ে আমি মধুযামিনী কাটাচ্ছি। এত বড় সাহস তোর, ঘরে ঢুকেছিস······

খোজা নিগ্রোটা এবার খানিকটা ধাতস্থ হয়।—মালিক, আপনি যদি সত্যি শাহজাদা হন তা হলে একশোবার বলবো, আমাদের শাহজাদীর যোগ্য বর হয়েছে। আপনার মতো এমন খুবসুরৎ শাহজাদা আমি আর দেখিনি কখনও। খুব ভালো হয়েছে—চমৎকার মানানসই হয়েছে।

এরপর খোজাটা ঘর ছেড়ে চলে গেল। চলে গেল একেবারে সোজা সুলতানের শোবার ঘরে। মাথার চুল ছিঁড়ে, কপাল বুক চাপড়াতে থাকলো, সর্বনাশ হয়ে

গেছে, জাঁহাপনা।

সুলতান তো অবাক, আরে, কী হয়েছে বলবি তো? শুধু শুধু হা-হুতাশ করে মাথার চুল ছিঁড়লে আর কপাল বুক চাপড়ালে বুঝবো কী করে? খুলে বল আগে। কী এমন বিপদ ঘটলো? যা বলার খুব চটপট সংক্ষেপে বল, একদম কোনও ভণিতা করবি না। তোর ঐ বিকট চিৎকারে আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। নে, যা বলার তাড়াতাড়ি বল।

শাহরাজাদ দেখলো, প্রভাত সমাগত। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো কুড়িতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

নিগ্রোটা বিকট আওয়াজ করে আর্তনাদ তোলে, জাঁহাপনা, আর এক মহূর্ত দেরি করবেন না। শিগ্গির চলুন, দেখবেন, আপনার কন্যার শোবার ঘরে এক আফ্রিদি জিন এসেছে। শুয়ে আছে শাহজাদীর সংগে। এক শাহজাদার রূপ ধরে এসেছে সে।

সুলতান তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। মনে হলো, তখুনি বুঝি বা তিনি নিগ্রোটার গর্দান নামিয়ে দেন।

—তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার মেয়ের ঘরের দরজায় নজর রাখিস না। তোর চোখের সামনে দিয়ে অন্য লোক তার ঘরে কী করে ঢোকে? সারাদিন রাতের জন্য পাহারা করে রাখা হয়েছে তোকে। পাহারা না দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাস নাকি, বাঁদর?

সুলতান আর বেশি বাক্য ব্যয় না করে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল শাহজাদী সামস্ অল নাহারের ঘরের দরজায়। দাসীগুলো ভয়ে বিবর্ণ, থর থর করে কাঁপছিল।

—শাহজাদীর কী হয়েছে?

সুলতান কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

দাসীদের মধ্যে একজন কাঁপতে কাঁপতে বললো, আমরা কিছুই জানি না, জাঁহাপনা। ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাংগতে দেখি, শাহজাদীর শয্যায় চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর এক শাহজাদা। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দুজনে গল্প করছিলেন। দেখে মনে হলো, কত কালের যেন চেনা জানা। সত্যি কথা বলতে কী, জাঁহাপনা, এমন রূপবান পুরুষ আমরা জীবনে কখনও দেখিনি। তবে সন্দেহ হয়, সত্যিই সে শাহজাদা, না, আফ্রিদি। যেই হোন তিনি, তাঁকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সুলতানের রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়ে আসে। খুব আস্তে আস্তে পর্দা উঠিয়ে তিনি দেখতে থাকেন, এক অপূর্ব সুন্দর যুবক তাঁর কন্যার বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন। তার মুখখানা বিলকুল চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর।

সুলতান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, এমন সময় ঘুমের ঘোরেই শাহজাদী

ছেলেটিকে আদর করতে থাকে। মুখখানা আরও কাছে টেনে এনে ছেলেটির একটা গালে অধর রাখে। এবার আর স্থির থাকতে পারেন না সুলতান। কোমর থেকে তলোয়ার খুলে বাগিয়ে ধরে ভিতরে ঢোকেন তিনি। পিতৃত্বের সহজাত ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে দুজনেরই তন্দ্রা কেটে যায়। কামার অল জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবা?

সামস অল ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

কামার অল তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে তলোয়ারখানা উঁচিয়ে ধরে গর্জে ওঠে। সুলতান মুহূর্তেই বুঝে নেয়, যুবকের সিংহবিক্রম প্রতিরোধ করার তাকত তার নাই। সঙ্গে সঙ্গে দুই কদম তিনি পিছিয়ে গেলেন। তলোয়ারখানা নামিয়ে নিলেন। মুখে মধুর সম্ভাষণ টেনে বললেন, বেটা, তুমি মানুষ না জিন—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ইয়া আল্লাহ, আপনি শাহজাদীর পিতা হতে পারেন। কিন্তু আপনার এই কথায় আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। আপনার কন্যাকে আমি প্রাণাধিক ভালোবেসে ফেলেছি। না হলে, আপনাকে এই মুহূর্তে আমি খতম করে ফেলতাম। শুধু রেহাই পেলেন। শাহজাদীর বাবা বলে আপনার এতবড় সাহস, আমি পারস্য অধিপতির পুত্র, আমাকে কিনা বলেন, জিন, না, দৈত্য? যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে এক লহমায় আপনাকে তখত্ থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি। আপনার এই প্রাচীর-প্রাকার সুরক্ষা, আর আপনার মান ইজ্জৎ সব মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি, সে কথা জানেন?

সুলতান এবার নিশ্চিত হন। না, এ কোনও জিন আফ্রিদি নয়। সাচ্চা এক সুলতান বাদশাহরই ছেলে। মনে মনে শ্রদ্ধা এবং ভয়—দুই জেগে ওঠে।

—যদি তুমি সত্যিই কোনও শাহজাদা হও, তবে আমার বিনা আমন্ত্রণে আমার প্রাসাদের হারেমে এসে ঢোকার দুঃসাহস কী করে হয় তোমার? তুমি এক বাদশাহর সন্তান হয়ে অন্য এক সুলতানের কন্যার ইজ্জতই বা নষ্ট কর কী করে? তুমি আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছ। কিন্তু তুমি কী জান, আমার এই কন্যার জন্য আমি কত সুলতান বাদশাহ এবং তাদের পুত্রদের প্রাণ সংহার করেছি। তারা আমার কন্যাকে জোর জবর-দস্তি করে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। এবং তারই ফলে এই সব কাণ্ড আমাকে করতে হয়েছে। আজ তুমি আমার মেয়ের ঘরে চোরের মতো ঢুকেছ। তাকে গোপনে শাদী করে তার ইজ্জত নিয়েছ।... কিন্তু ভেবে দেখ, এখন আমি যদি আমার লোকজনদের হুকুম দিই, তোমার গর্দান থাকবে?

কামার অল বলে, তা হলে এও জেনে রাখুন সুলতান, আপনার ঘাড়েও মাথা থাকবে না। আপনার মগজে যদি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু থাকে তাহলে ঐ ধরনের খামখেয়ালীর কাজ করতে সাহস পাবেন না আপনি। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আমার চেয়ে ভালো পাত্র আপনি কোথাও জোগাড় করতে পারবেন? আমার মতো বীর্যবান এবং সম্ভ্রান্ত শাহজাদা কী ভুরি ভুরি মিলবে

আপনার কন্যার জন্য ?

—সে কথা ঠিক। পাত্র হিসাবে তোমার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু কাজীকে ডেকে বিধান সম্মত ভাবে শাদী না হলে গোপন-শাদী আমি মানি না।

কামার অল বলে, আপনার কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই কারণে এখন আপনি যদি আপনার সেপাই পেয়াদাকে ডাকেন তাহলে কী আপনার আখেরে ভালো হবে ? একবার যদি সেই ভুল করেন, হাতের তীর ছিলা ছেড়ে চলে যায়, তবে হাজার চেষ্টা করেও আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না। আপনার তখত্, সলতানিয়ৎ, সম্মান সবই ধুলোয় মিশে যাবে, সুতরাং রাগ রোষে মাথা গরম করে কিছু করবেন না। খুব ঠাণ্ডা মগজে বেশ ভালো করে ভেবে দেখুন। পরে আমাকে কোনও দোষ দিতে পারবেন না। আমি আপনাকে যথেষ্ট সুপরামর্শই দিচ্ছি। এবং আপনার মঙ্গলের জন্যই।

রাত্রির অন্ধকার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো একুশতম রজনীর

দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে :

কামার অল বলতে থাকে, দুটো পথ আপনার সামনে খোলা আছে। হয় আপনি এখনি আমার সঙ্গে একা অসি-যুদ্ধে আসুন, আমি আপনাকে এক ঘায়ে কুপোকাৎ করে সিংহাসন অধিকার করবো, না হয় আজ সারা রাত আপনার কন্যার সঙ্গে আমাকে সহবাস করতে দিন। কাল সকালে আপনার তামাম সলতানিয়তের যত সৈন্যসামন্ত আছে, সব ডেকে আনুন, আমি লড়বো তাদের সঙ্গে। ভালো কথা, সংখ্যায় তারা কত হবে ?

সুলতান বলে চল্লিশ হাজার। এর মধ্যে আমার নফর চাকর ক্রীতদাস বা তাদের অনুচরদের ধরিনি। তারাও নেহাত নগণ্য নয়।

কামার অল বলে, অতি উত্তম, কাল ভোরে তাদের সকলকে ডাকুন। আমাকে দেখিয়ে তাদের বলুন, 'এই মানুষটি আমার কন্যার পাণি-প্রার্থী। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, আমার সমগ্র সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারাতে হবে। তবেই পাবে তাকে, তার আগে নয়।' তারা যদি রাজি হয়, আমার সঙ্গে লড়াই করার স্পর্ধা নিয়ে এগিয়ে আসে, এবং সম্মুখ সমরে আমাকে যদি নিহত করতে পারে তবে আপনার মান ইজ্জৎ সবই রক্ষা পাবে। আর যদি না পারে—? যদি তারা পরাজিত হয়ে পালায়, তবে ? তখন কিন্তু মাথা নুয়িয়ে আমাকে আপনার জামাতা করেই নিতে হবে, সুলতান।

সুলতান মনে মনে মতলব ভাঁজে। যুবকের এই প্রস্তাবই মেনে নিতে হবে। তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নামা বুদ্ধিমানের কাজ না। বয়সের ভারে সে এখন ক্লান্ত, যৌবনের শক্তি এবং সিংহবিক্রমে যখন ভাটা পড়েছে, এ অবস্থায় এই রকম এক নওজোয়ান যোদ্ধার সঙ্গে একা একা লড়াই-এ নামা উচিত হবে না। কিন্তু আমার গোটা সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে সে লড়বে ? লোকটা কী পাগল ?

যাক নিজের নির্বুদ্ধিতাতেই সে খতম হবে, কোনও চিন্তা নাই। সুলতান নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবে, কাল সকালেই বাছাধনের গর্দান গড়াগড়ি যাবে আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে। জাত মান কুল সবই রক্ষা পাবে।' সুতরাং এই পথই অনুসরণ করা শ্রেয়ঃ মনে করলেন তিনি।

—ঠিক আছে, আজ রাতটা তুমি যে ভাবে কাটাতে চাও কাটাও, আমি কোনও বাধা দেব না। কিন্তু কাল সকালে তোমার মউৎ কেউ রুখতে পারবে না।

সুলতান সদর্পে সেখান থেকে নিজের কক্ষে চলে গেলেন। খোজাকে বললেন এখুনি উজিরকে খবর দে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎকণ্ঠিত উজির হাজির হলে, সুলতান তাকে সব ঘটনা খুলে বলে বসলেন, আর তিল মাত্র দেরি করবে না, এখুনি যাও, সেনাবাহিনীকে তৈরি হতে বল। সকালেই তারা যেন আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে হাজির থাকে। আমি ঐ উদ্ধত শাহাজাদাকে সমুচিত সাজা দিতে চাই।

উজির আশ্বাস দিয়ে বলে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান, জাঁহাপনা। যা করার সব আমি করছি। লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, না হলে গোটা ফৌজের সঙ্গে লড়াই করার কথা বলে। আপনার সৈন্যবাহিনীতে এমন সব জাঁদরেল যোদ্ধা আছে, তাদের একজনের সঙ্গেই সে লড়তে পারবে না, তা আবার গোটা বাহিনী! ছোঃ!

সুলতান গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু তা বলে, তুমি শুধু সেনাপতিদেরই ডেকো না। আমি চাই আমার পুরো সেনাবাহিনীই হাজির থাকবে আমার প্রাসাদের সামনে।

উজির আর কথা বাড়ায় না, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে, জাঁহাপনা।

উজির সোজা চলে যায় ফৌজি দপ্তরে। সেখানে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থা সব পাকা করে রাখে।

সুলতান শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকেন, ছেলেটি ভারি সুন্দর। যেমন তার রূপ, তেমনি তার বীরের মতো সুঠাম দেহ। আর কী সুন্দর কথা বলার কায়দা। এমন খানদানী ব্যবহার রক্তে না থাকলে রপ্ত করে হয় না। আহা, এমন সুন্দর চাঁদের মতো ছেলেটা যদি তার জামাই হতো, কী-ভালোই না হতো! কিন্তু সবই নসীবের লেখা, তাকে আজ হাতের মুঠোয় পেয়েও চিরদিনের মতো হারাতে হচ্ছে। কাল সকালেই আমার ফৌজদের তলোয়ারের ঘায়ে লুটিয়ে পড়বে তার গর্দান। উফ্, ভাবতেও কষ্ট লাগে। কিন্তু উপায়ই বা কী? তার মতো গোঁয়ার ছেলের এ ছাড়া আর কী পাওনা থাকতে পারে? সে যদি আমার কাছে ক্ষমা চাইতো। না না, তাই বা কী করে সম্ভব? ক্ষমা করাই সে শিখেছে, ক্ষমা চাওয়ার কথা সে ভাববে কী করে? সে তো বাদশাহজাদা!

তবু আর একবার তার কাছে যাওয়া যাক। যদি সে মাথা নোয়ায়। তা হলে সব কুলই বজায় থাকে। মেয়েটাও সুখী হতে পারে, সে নিজেও জামাতা-

গর্বে গর্বিত হতে পারে। আর সবার ওপরে সম্ভ্রম ইজ্জৎ, জাত মান কুল সব রক্ষা হয়। কিন্তু তা কী হবে?

.সুলতান বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু না, আবার সেখানে যেতে পা চলে না। যদি সে ভাবে, আমি সন্ধির ছুতোয় তার কাছে গিয়েছি? না না না, আমি তাকে তেমন কিছু ভাববার সুযোগ দেব না। যাব না।

ভোর না হতেই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। রণসাজে সজ্জিত হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত এসে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে থাকে।

শাহাজাদা কামার অলকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান দরবার-কক্ষে প্রবেশ করে তখ্‌তে আরোহণ করেন। বান্দাদের হুকুম করেন, এই শাহজাদার জন্য আমার আস্তাবলের সবচেয়ে সেরা তাজা ঘোড়াটা নিয়ে এসে জমকালো যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দে।

সুলতানের এই হুকুম শুনে কামার অল বলে, আমার জন্যে কোন যুদ্ধের ঘোড়া দরকার হবে না।

সুলতান অবাক হয়ে তাকান, তবে কী তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে নাকি?

—না, আমার নিজেরই ঘোড়া আছে। আপনার ঘোড়ার কোনও দরকার নাই।

সুলতান আরও অবাক হন, তোমার ঘোড়া? কোথায় তোমার ঘোড়া?

কামার অল বলে, হ্যাঁ, আমার ঘোড়া! যাতে চেপে আমি এসেছি আপনার প্রাসাদে। আমি সেই ঘোড়ায় চেপেই লড়াই করবো।

—কোথায় তোমার ঘোড়া? কোথায় রেখে এসেছ?

—কামার অল ছাদের ওপরের দিকে তর্জনী তুলে বলে, প্রাসাদের ছাদে আছে সে।

সারা দরবার-কক্ষ ক্ষণ-কালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। কারো মুখে কোনও কথা সরে না। ছেলেটা বলে কী? সত্যিই ওর মাথার গোলমাল আছে। সুলতান ভাবে, শেষ পর্যন্ত একটা উন্মাদকে হত্যা করে কী সে মহাপাতক হতে যাচ্ছে?

সুলতান বললেন, এস আমার সঙ্গে এস। তোমার জন্যে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে কারা এসে হাজির হয়েছে, দেখবে, এস।

কামার অলকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান দরবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। হাজার হাজার বর্মশিরস্ত্রাণ পরা অসি-বর্শা-হাতে সৈন্যসামন্ত জড়ো হয়েছে প্রাসাদের সামনে পোলো-খেলার মাঠে। পুরোভাগে সেনা-বাহিনীর প্রবীণরা ঘোড়ার পিঠে চেপে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। সুলতান বললেন, এই আমার সমগ্র সেনা-বল। এদের সঙ্গে একা তুমি লড়বে বলে বড়াই করেছ। সে যাক, এখন তৈরি হয়ে নাও। আমার সৈন্যরা প্রস্তুত।

তারপর তিনি তাঁর সেনাপতিদের ডেকে বললেন, এই যুবক এসেছে আমার কন্যাকে শাদী করবে বলে। জামাতা হবার পক্ষে উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই।

যেমন এর রূপ-যৌবন তেমনি তার সাহস বিক্রম। কিন্তু এ আমার কাছে মাথা নোয়াতে রাজি নয়। বলে, এমনি না দিলে, জোর করে নিয়ে যাবে আমার মেয়েকে। এর ধারণা, আমার এই বিশাল সৈন্য-বাহিনীকে একাই জব্দ করতে পারবে। আমি একে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, আমার সৈন্যবল অসীম। কিন্তু সেকথা কানেই তুলতে চায় না এই বীরপুরুষ। যাক, এবার তোমরাই তৈরি হও। এখনই শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাবে। একটা কথা, তোমরা সংখ্যায় অনেক, আর এ একা। তোমাদের একমাত্র কাজ হবে, একে প্রতিহত করা—নিহত করা নয়!

তারপর সুলতান কামার অল-এর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, বেটা, বুকে সাহস সঞ্চয় কর, লড়াইএ তুমি জয়ী হলে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হবো।

কামার অল বলে, কিন্তু সুলতান, একি আপনার আচরণ! আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে, আর আপনার সেনাপতিরা ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করবে? একি মহারথী প্রথা?

সুলতান বলে, কিন্তু বেটা, আমার কী দোষ, আমি তো তোমাকে আমার আস্তাবলের সবচেয়ে সেরা লড়াকু ঘোড়াই দিতে চেয়েছিলাম? তুমিই তো নিলে না! এখনও বলছি; আমার অশ্বশালায় চলো, যেটা তোমার পছন্দ তুমি নিজেই বেছে নাও, আমি খুব খুশি হবো।

কামার অল বলে, আপনার কোনও ঘোড়া আমার প্রয়োজন নাই। আমার নিজের ঘোড়াতে চেপেই আমি লড়াই করতে চাই।

—কিন্তু কোথায় সে ঘোড়া?

কামার অল আবার প্রাসাদের ছাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ ছাদের এক পাশে রাখা আছে।

—ছাদের ওপরে রাখা আছে? তোমার ঘোড়া?

সুলতান অবিশ্বাসের হাসি হাসেন। সমবেত সেনাপতিরা, উজির আমির সকলে বিস্মিত হয়, লোকটা বলে কী?

কামার অল বলে, হ্যাঁ, আমার ঘোড়া। কাল সন্ধ্যায় আমি ঐ ঘোড়ায় চেপেই এই প্রাসাদে এসেছি।

সুলতান সেনাপতিদের বলেন, যাও তো, দেখে এস। ছাদের ওপরে ঘোড়া কি করে যেতে পারে! তাজ্জব কি বাত্!

সুলতানের নির্দেশে সেনাপতিরা প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়। একি, সত্যিই তো একটা তাগড়াই ঘোড়া ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে? কুচকুচে কালো, গা বেয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে এমন চমৎকার ঘোড়া তারা আগে কখনও দেখেনি। সেনাপতিরা আরও নিকটে যায়। কিন্তু একি, এতো একটা কাঠের ঘোড়া—খেলনা মাত্র! সবাই সমস্বরে হো হো করে হেসে ওঠে।

—যুবকটি নিশ্চয়ই এক বদ্ধ উন্মাদ। আহা, হয়তো কোনও সুলতান বাদশাহরই সন্তান। মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। প্রধান সেনাপতি বলে, সবাই মিলে ধরাধরি করে ঘোড়াটাকে সুলতানের সামনে নিয়ে চল।

তামাশাটা তিনি বুঝতে পারবেন।

সেনাপতিরা ঘোড়াটাকে কাঁধে করে নিচে নামিয়ে আনে। সুলতানের সামনে রেখে বলে. সব বুজরুকী, জাঁহাপনা। এটা একটা কাঠের খেলনা ঘোড়া।

রাত্রির অন্ধকার কেটে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো বাইশতম রজনী

সে শুরু করে ঃ

প্রধান সেনাপতি বলে. আমার মনে হচ্ছে. জাঁহাপনা ইনি কোনও সম্ভ্রান্ত সুলতান বাদশাহর সন্তান। কিন্তু কোনও কারণে এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তা না হলে এ ধরনের অদ্ভুত প্রস্তাব কেউ রাখতে পারে না। আমার সেনাবাহিনীর বিক্রম আমি জানি। তার সংগে পাঞ্জা লড়বে এই বাদশাহাজাদা — তাও এই কাঠের পুতুল নিয়ে? হা হা—

সুলতান থামিয়ে দিয়ে বলেন. থামো. আত্ম গর্বে ফুলে উঠো না। শত্রুকে কখনও খাটো করে ভাবতে নাই।

তারপর কামার অলকে উদ্দেশ করে বললেন. এই তোমার ঘোড়া? একটা কাঠের খেলনা? এই দিয়ে তুমি লড়বে আমার এই বিপুল বাহিনীর সংগে?

—কামার অল খুব সহজ শান্তভাবে জবাব দেয়. হ্যাঁ। এই আমার আজব ঘোড়া। এরই ভেল্কী দেখে আপনি ভিরমি খাবেন। একটু সবুর করুন. এখনই প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

এই বলে সে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে যায়। তার গলায় হাত রাখে। শুনুন সুলতান, এই কাঠের ঘোড়ায় চেপে আমি আপনার সেনাবাহিনীকে—ডাইনে বাঁয়ে ঘায়েল করতে থাকবো।

সুলতান হাসতে হাসতে বলে. একশোবার। সব বীরপুরুষই তাই করে। শত্রুকে শায়েস্তা করাই বীরের ধর্ম। সেখানে কেউ কাউকে রেহাই দেবার কথা ভাবে না। তুমিও কাউকে রেহাই দেবে না. মনে রেখ. তারাও তোমাকে রেয়াত করবে না।

এরপর কামার অল এক লাফে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসে। হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত. শত সহস্র প্রাসাদ-পুরবাসী নরনারী — সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে ঘোড়সওয়ার কামার অল-এর দিকে। সবাই সংশয়ে দোদুল্যমান। একটা কাঠের ঘোড়া সজীব হয়ে লড়াই করবে—এমন তাজ্জব কথা কী—শুনেছ কেউ? সেই অভাবনীয় অলৌকিক দৃশ্য আজ তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। দারুণ কৌতূহলের চাপা গুঞ্জনে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ গমগম করতে থাকে।

তাকে প্রতিরোধ করার জন্য অশ্বারোহীরা আরও সামনে এসে সারিবদ্ধভাবে তলোয়ার বাগিয়ে দাঁড়ায়। একজন নির্দেশ দেয়, যখনই সে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে আর তিল মাত্র অপেক্ষা করবে না তোমরা। ঝোপ বুঝে কোপ মেরে একেবারে সাবাড় করে দেবে।

কিন্তু অন্য একজন বলে, ইয়া আল্লাহ, এমন চাঁদের মতো ছেলে, একে

আমরা হত্যা করবো কি করে ? এমন সুন্দর ফুলের মতো নরম শরীরে খাড়ার ঘা বসাবো কি করে ? সারা আরব দুনিয়া ঢুঁড়লে এমন সুঠামদেহী সুন্দর সুপুরুষ ক'টা পাওয়া যাবে ?

আর একজনের মন্তব্য ঃ আমরা যত সহজে ওকে কাবু করতে পারবো ভাবছি, ব্যাপারটা, আমার মনে হয়, তত সহজ নয়। আমরা ভাবছি, সে পাগল, কিন্তু তার আদব-কায়দা, কথাবার্তায় তো আদৌ মনে হয় না ? মাথার কোনও গোলমাল আছে ? আর তা যদি না থাকে, তবে সে কি এতই মূর্খ, আমাদের এই বিশাল সৈন-বাহিনীর সংগে লড়ার পাঁয়তারা করবে ? হারাতে ওকে হবেই, কিন্তু খুব সহজে আমরা জিততে পারবো তাও ভাবা উচিত না। যাই হোক, প্রাণপণ লড়ে আমাদের মান ইজ্জৎ বাঁচাতেই হবে।

জিনের ওপর ঠিক হয়ে বসে, রেকাবীতে পা ঢুকিয়ে, লাগাম হাতে ধরে কামার অল আকমর। তারপর ডানদিকের বোতামটায় আংগুল রাখে। অল্প একটু চাপ দিতেই, সকলকে স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক্ করে দিয়ে ঘোড়াটা ঈষৎ কেঁপে উঠে। শোঁ শোঁ করে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যেতে থাকে। সুলতান, উজির আমির এবং তাবৎ সৈন্যবাহিনীর সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁ করে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। সকলেরই বাহ্যজ্ঞান তখন লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

স্বল্পক্ষণের মধ্যে সুলতান সম্বিত ফিরে পান। চিৎকার করে ওঠেন তিনি, পালিয়ে গেল, পাকড়াও ! জলদী—

সেনাধ্যক্ষ শান্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, ডানাওলা পাখীকে কি তাড়া করে ধরা যায় ? সে তো আমাদের তীর বর্শার পাল্লা ছাড়িয়ে অনেক—অনেক ওপরে উঠে গেছে। তাকে পাকড়াও কী ভাবে করা সম্ভব।

সমগ্র সৈন্য-বাহিনী আকাশের দিকে চোখ রেখে দেখতে থাকলো, ঘোড়াটা উঠতে উঠতে এক সময় তীরবেগে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

উজির বললো, এ কোনও সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। নিশ্চয়ই কোনও জিন আফ্রিদি অথবা কোনও যাদুকর। যাক, চলে গেছে, বাঁচা গেছে। আল্লাহ রক্ষা করেছেন।

দুর্বোধ্য এক বিস্ময় নিয়ে সুলতান প্রাসাদের অন্দরে যান। সামস্ অল নাহারকে সমস্ত ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে বলে বোঝাবার চেষ্টা করেন, আসলে সে কোনও মনুষ্যসন্তান নয়, মা। হয় কোনও জিন আফ্রিদি, নয় কোনও যাদুকর।

কিন্তু শাহজাদী সে কথা বিশ্বাস করে না। অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সুলতান তাকে আদর করে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকেন।

—আল্লাহকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানাও, মা। তিনি আমাদের এই অলৌকিক দৈব-দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করেছেন। কে জানে, তার খেয়াল হলে এক লহমাতে সে আমার গোটা সৈন্যবাহিনীই খতম করে দিতে পারতো কিনা ! লোকটা একটা আস্ত শয়তান, ঠগ, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, শুয়োর !

কিন্তু এতেও শাহজাদী শান্ত হয় না। আরও আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে।

—খোদা মেহেরবান, সে আর যদি ফিরে না আসে, এই আমি বলে রাখলাম, আব্বাজান, নাওয়া-খাওয়া কিছুই আমি করবো না। যতদিন না সে এসে আমাকে গ্রহণ করে, আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরবো।

সুলতান ভাবলেন, বৃথাই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া। কোনই ফল হবে না। সারা দুনিয়া তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো। বিড়বিড় করে কী সব আবোল তাবোল আওড়াতে থাকলেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো তেইশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

উল্কার গতিতে ঘোড়াটাকে উপরে মহাশূন্যে তুলে এনে কামার অল সামনের দিকে ছুটে চললো। এই দিকে তার স্বদেশ। চলতে চলতে সে ভাবে, প্রিয়া রইলো তার পিতার প্রাসাদে বন্দী হয়ে। তাকে সে একদিন উদ্ধার করে নিয়ে যাবেই। তা সে যে ভাবেই হোক। প্রিয়তমার বাবার সলতানিয়তের নাম সে জেনেছে ইয়ামান। আর শহরটার নাম সানা।

বলতে গেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই, বায়ু বেগে ছুটতে ছুটতে, ঘোড়াটা তার নিজের শহর-সীমায় এসে পড়ে। বিরাট একটা চক্কর দিয়ে সে নিচে নেমে পড়ে। একেবারে তার নিজের প্রাসাদের ছাদের ওপর। ঘোড়াটাকে সেইখানেই দাঁড় করিয়ে তরতর করে সে নিচে নেমে যায়—সিঁড়ি বেয়ে।

সারা প্রাসাদে তখন করবের নিস্তব্ধতা। কামার অল বুঝতে পারে না, কেন এই নীরব নিঃঝুম আবহাওয়া! এ-ঘর ও-ঘর সে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোথাও কোনও টুঁ শব্দটি নাই। মনে হয় এক নিদারুণ শোকের ছায়া ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। কামার অল ভাবে, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয়তো কেউ মারা গিয়েছে। আর ভাবতে পারে না সে। হন হন করে সে তার বাবার একান্ত ব্যক্তিগত কামরায় ঢুকে পড়ে। বাবাকে জীবিত দেখে খানিকটা সে আশ্বস্ত হয়। সেই একই ঘরে তার মা এবং তিন বোনও শোকে দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিল। কামার দেখলো, তার মায়ের চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হয়ে চলেছে। বাবা সন্দিগ্ধ চোখে মুখ তুলে তাকালেন। নিজের চোখকে নিজেই তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না—এই কী তার কামার অল? কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব! তিনি হয়তো জেগে জেগেই খোয়াব দেখছেন।

—আব্বাজান, আমি কামার অল, আমি ফিরে এসেছি—

হঠাৎ কামার অল-এর আবেগ উচ্ছ্বসিত একই কণ্ঠস্বরে সারা প্রাসাদ গম গম করে ওঠে। সুলতান সবিস্ময়ে উঠে ব'সে চোখ রগড়াতে থাকেন। তাইতো এতো কোনও স্বপ্ন নয়। এ যে তার বুকের কলিজা—কামার অল। বাদশাহ

সাবুর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না—পুত্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন তিনি। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে।

মা এবং বোনরা আকুল হয়ে উঠে এসে কামার অলকে জড়িয়ে ধরে, হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন মা। কপালে চিবুকে চুমায় চুমায় ভরে দিতে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন তারা খানিকটা ধাতস্থ হলো, কামার অল তার অদ্ভুত লোম-হর্ষক এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী বলতে লাগলো তাদের কাছে। সে কাহিনী আবার এখানে পুনঃ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

বাদশাহ্ সাবুর ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন। সারা দেশে ঢ্যাঁড়া পিটে জারি করা হলো, সুলতানের প্রাসাদে সাত দিন ব্যাপী খানা-পিনা গান-বাজনা নৃত্যের উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। বাদশাহজাদা কামার অল আকমর সশরীরে সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে—এ উৎসব তারই জন্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপামর সকল মানুষের সাদর নিমন্ত্রণ রইলো প্রাসাদের এই উৎসবে।

সারা শহর, প্রাসাদ, জলপথ সুন্দর করে সাজানো হতে লাগলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো হলো তোরণ-মঞ্জিল। দোকানপাট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আলোর মালায়।

প্রাসাদকে সাজানো হলো এক মনোহারী সাজে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল দেওয়াল কার্নিশ। হাজারো বাতির ঝাড় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো সদর ফটকের সামনে। লোকে লোকারণ্য। মহা ধুমধামে দান ধ্যান খানা পিনা নাচ গান হৈ-হল্লা চলতে থাকলো সাত দিন ব্যাপী। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে নানা মর্যাদার খেতাব বিলি করলেন সুলতান। কয়েদীদের মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হলো। যাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে ছিল তাদের অনেককে খালাস করে দেওয়া হলো।

বাদশাহ সাবুর শাহজাদা কামার-অল-আকমরকে সঙ্গে নিয়ে শহরের প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে এলেন। সবাইকে জানিয়ে এলেন তাঁর হারানো মণি কামার অল আবার বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছে!

প্রজারা স্বচক্ষে আবার দেখতে পেল তাদের ভাবী বাদশাহকে। আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলো শহরের আকাশ বাতাস।

তারপর একদিন আনন্দ উৎসব শেষ হয়ে যায়। কামার অল বাবাকে জিজ্ঞেস করে, যে-পারসী-পণ্ডিত আপনাকে এই ঘোড়াটা দিয়েছিল, সে কোথায় গেল, আব্বাজান?

পণ্ডিতের কথা উঠতেই বাদশাহ ক্ষেপে ওঠেন, ওর নাম মুখে এনো না, লোকটা একটা সাক্ষাৎ শয়তান, যাদুকর। ওরই জন্যে আমি এত দুঃখ শোক ভোগ করলাম। ওকে আমি প্রহার করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেছি। জানি না, বেঁচে আছে কি নাই। আল্লাহ ওকে খতম করুন। তোমার সঙ্গে আমার এই ছাড়াছাড়ির একমাত্র কারণ সে। তার ধোঁকাবাজীতে না ভুললে, আমাকে

এত দুঃখ আর তাপ সইতে হতো না। আমি তাকে ক্ষমা করতে পারবো না কখনও।

কামার অল বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো আমি ফিরেই এসেছি আব্বাজান! তাছাড়া দোষটা যে পুরোপুরি তারই, তাই বা কী করে বলা যায়? আমারও তো উচিত ছিল, ঘোড়াটা চালাবার সব কায়দা কৌশল তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া। তখন সে-ধৈর্য তো আমার ছিল না। ঘোড়াতে চেপেই, তার কথা শেষ না হতেই, আমি বোতাম টিপে ধরেছিলাম। দোষ বলতে গেলে পুরোটাই আমার বাবা। আপনি ওকে জানে মারবেন না, ছেড়ে দিন, এই আমার আর্জি।

কামার অল-এর ইচ্ছায় না করতে পারলেন না বাদশাহ। পারসী-পণ্ডিতকে কারাগার থেকে মুক্ত করে প্রচুর অর্থ ও এক নতুন সাজপোশাক উপহার দিয়ে বললেন, এবার তুমি দেশে ফিরে যেতে পার।

কিন্তু ছোট কন্যার সঙ্গে শাদীর কথাটা বেমালুম চেপে গেলেন তিনি। পণ্ডিতও সে ব্যাপারে আর কোনও কথা তুললো না। বাদশাহ ভেবে রেখেছিলেন, পন্ডিত যদি তার ছোট কন্যাকে শাদী করতে চানও, তৎক্ষণাৎ তিনি 'না' বলে দেবেন, তাতে জবান যদি নষ্ট হয়, হবে। কিন্তু তাই বলে একটা যাদুকর শয়তান শঠের হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন না তিনি। পণ্ডিত জেনে শুনে তার পুত্রকে ঘোড়ায় চাপতে দিয়েছিল—মেরে ফেলার জন্য। না হলে, গোড়াতেই সে বলতে পারতো। সব কিছু না শিখে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপাই চলবে না। কিন্তু তা সে করেনি। যেহেতু কামার অল তার ছোট বোনের সঙ্গে পণ্ডিতের শাদীতে বাধ সেধেছিল সেই কারণে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে, সে তাকে মরণের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহ মেহেরবান, তাই কামার অল ফিরে আসতে পেরেছে। অন্য কেউ হলে জ্বলন্ত সূর্যের গোলার মধ্যে ঢুকে পড়ে নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এমন শয়তানের হাতে কেউ মেয়ে দেয়!

বাদশাহ সাবুর ঘোড়াটার কি বিধি ব্যবস্থা করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারেন না। তাই তিনি কামার অলকে ডেকে পাঠালেন।

—বল তো বাবা, ঐ অপয়া কালো-ঘোড়াটাকে নিয়ে কী করা যায়? আমার মনে হয়, অমন সর্বনেশে জিনিস ঘরে না রাখাই ভালো। ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিই, কী বল?

কামার অল বলে, কেন আব্বাজান, এখন তো আমি ওর সব কায়দা কৌশলই রপ্ত করে নিয়েছি। তখন কিছু জানা ছিল না বলে অমনটা হতে পেরেছিল। কিন্তু এখন তো আর সে ভয় নাই!

বাদশাহ সাবুর কিন্তু পুত্রের কথায় সায় দিতে পারে না।

—না বেটা, আমার মনে হয় এখনও ওর অর্ধেক কলাকৌশল তোমার জানা হয় নি। তার চেয়ে বলি কি, ওটার পিঠে তুমি আর চেপো না। ও আমার আতঙ্ক, আমার দুশমন। ওতে চড়া মোটেই নিরাপদ নয়, বাবা।

কামার অল তখন সানার সুলতান প্রাসাদে শাহজাদীর সঙ্গে এক রাতের সহবাস, সুলতানের ক্রোধ, এবং তার হাত থেকে, এই কালো-ঘোড়ার দৌলতে,

অব্যাহতি পাওয়া— সব খুলে বললো।

বাদশাহ সাবুর তবু বুঝতে চান না, সবই নিয়তির খেলা, বাবা। মৌৎ যেভাবে লেখা থাকে, কেউ খণ্ডন করতে পারে না তা। তোমার মৃত্যু সানার সুলতানের হাতে ছিল না বলেই সে তোমাকে হত্যা করতে পারে নি। অথবা এরপর অন্য কোনও সময় তারই হাতে তোমার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে! তখন তুমি যেখানেই থাকো, ঘটনাচক্রে তার সম্মুখে তোমাকে যেতেই হবে। এবং সে তোমাকে নিহত করবেই। সুতরাং তুমি যা বলছো, সে কোনও কথা নয়। যাই হোক, আমি চাই না, ঐ ঘোড়াটায় তুমি আবার কখনও চড়ো।

দিন যায়। কিন্তু সামস অল নাহারকে কিছুতেই ভুলতে পারে না কামার অল আকমর। প্রতিটি পল স্মৃতি কুরে কুরে খায় তার বুকের পাঁজর। কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না—সেই একটা রাতের মধুর মিলন-স্মৃতি। এক হলেও, সহস্র রজনীর স্বাদ সে কামার অলকে দিয়েছে। তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে খুলে ধরেছিল সামস্ অল নাহার। সেই রাতের আধো আলো আধো অন্ধকারে সব সে দেখেছে; সব সে চেখেছে। সামস্ নিজেকে সঁপে দিয়েছে তার হাতে। এখন সে তার। সুতরাং এইভাবে, তাকে ছেড়ে দূরে দূরে থাকা তো তার পক্ষে সম্ভব না। যে ভাবেই হোক, যেমন করেই হোক, তাকে ওখান থেকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সেখানে সে যাবে কেমন করে। তার বাবা বাদশাহ সাবুরের নির্দেশ সে যেন আর ঐ কালো ঘোড়ায় না চাপে। সে ঘোড়ায় না চেপে সে কী করে যাবে তার প্রাসাদে? তাকে চুরি করে আনা ছাড়া অন্য কোনও পথ নাই। কারণ তার বাবা সানার সুলতান এবং সারা শহরবাসী তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাকে একবার কব্জায় পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবে।

একদিন বাদশাহ সাবুর এক গান বাজনার মাইফেলের আয়োজন করেছিলেন। শহরের নামকরা বাঈজীরা এসেছিল মুজরো করতে। মাইফেলের আসরে বসে সেদিন সন্ধ্যায় একখানা বিরহ-সঙ্গীত শুনে কামার অল-এর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে সামস্ অল নাহার-এর বিরহে আরও বেশি কাতর হয়ে পড়ে সে। শত চেষ্টা করেও মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। তাই বাবার নির্দেশ অমান্য করেই সে আবার কালো ঘোড়ায় চেপে বসে। ডান দিকের বোতাম টিপে ধরতেই ঊর্ধাকাশে উঠে চলে যায় এক নিমেষে। তারপর উড়তে উড়তে এক সময় সে চলে আসে সানায়। সেই প্রাসাদ-এর ছাদে গিয়ে নামে। রাত তখন গভীর। সবাই ঘুমে অচেতন! কামার অল সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচে। তারপর পায়ে পায়ে চলে আসে নিগ্রো খোজাটার খাটিয়ার পাশে। সেই একই দৃশ্য। দৈত্যের মতো বিশাল লাসখানা এলিয়ে দিয়ে সে বিকট আওয়াজ তুলে নাসিকা গর্জন করছে। মাথার কাছে সিকেয় ঝোলানো খাবার-দাবার এবং দেয়ালে দাঁড়করানো একখানা তরোয়াল।

কামার এবার আর সিকেটাও খুলে নিল না, নিল না তলোয়ারখানাও। পাটিপে টিপে সে পেরিয়ে গেল দ্বিতীয় দরজার সামনে। যথারীতি সেই

মখমলের পর্দা ঝুলছিল। কামার অল পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢোকে। শয্যার চারপাশে বসে দাসী মেয়েগুলো সামস্ অল নাহারকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, দুঃখ করবেন না শাহজাদী, আমাদের বিশ্বাস তিনি আবার আসবেনই। যে ভালোবাসার স্বাদ তিনি পেয়েছেন, তা কখনই ভুলতে পারবেন না। আপনি কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন! এ ভাবে না খেয়ে না ঘুমিয়ে যদি কাটাতে থাকেন ক'দিন বাঁচবেন? কিন্তু বাঁচতে যে আপনাকে হবেই, মালকিন? আপনার ভালোবাসার জনই আপনাকে ভালোভাবে বাঁচতে হবে। আর বাঁচতে গেলে খেতে হবে, ঘুমাতেও হবে। নিন, উঠুন, কিছু একটু মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমরা বলছি, তিনি বেশিদিন আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চব্বিশতম রজনী

আবার সে কাহিনী শুরু করে ঃ

এদিকে সকালে বাদশাহ সাবুর খবর পান, কামার অল প্রাসাদে নাই। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বাদশাহ স্বয়ং সারা প্রাসাদ তন্নতন্ন করে খুঁজলেন! কিন্তু না, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। হঠাৎ তার খেয়াল হলো কালো ঘোড়ার কথা। ছাদের ওপরে উঠে এসে দেখলেন, ঘোড়া নাই। কামার অল তার কথা অমান্য করে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে। রাগে তিনি কাঁপতে লাগলেন। আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করতে থাকলো। আবার যদি তার কোনও বিপদ ঘটে? নিশ্চয়ই সে সানার প্রাসাদে গেছে। শাহজাদীর সঙ্গে মুলাকাত করতে। কিন্তু সে-মেয়ের বাবা, সেখানকার সুলতান নাকি এক-রোখা মানুষ। যদি তার কোপে পড়ে সে প্রাণ হারায়—। না না, সে কথা ভাবতে চান না তিনি। ভাবতে পারেন না তিনি—

সাবুর মনে মনে ঠিক করলেন, এবার কামার অল ফিরে এলে ঐ ঘোড়াটাকে আগে তিনি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবেন, তার পরে অন্য কথা। তার মনের সব শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে ঐ ঘোড়াটা।

পর্দা উঠিয়ে কামার অল কান পেতে শুনতে থাকে দাসী মেয়েদের সান্ত্বনার কথাগুলো। কিন্তু সে-সান্ত্বনায় সামস্ অল নাহার এতটুকু শান্ত হতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে থাকে; না না, তোরা আমাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছিস, সে আর ফিরে আসবে না। আমার বাবা তাকে পছন্দ করে না।

সে জানে—এখানে এলে আর তাকে আস্ত রাখবে না আমার বাবা।

কামার অল পায়ে পায়ে পালঙ্কের পাশে দাঁড়ায়। কেউ তাকে লক্ষ্য করতে পারে না। সবাই তখন সামস্ অল নাহারকে নিয়ে ব্যস্ত।

শাহজাদীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেছে, কামার অল মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললো, এই তো আমি এসেছি পিয়ারী। তুমি কি ভেবেছিলে, তোমার বাবার ভয়ে আমি আসবো না? কিন্তু আসল মহব্বৎ কোনও কিছুর তোয়াক্কা করে না। মৃত্যুভয়ে সে ভীত হয় না। জন্মালে একদিন মরতেই হবে। এতো সবাই জানে। তাই বলে কেউ কি সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করে না? এও আমার ভালোবাসার জন্যে যুদ্ধ মনে কর, সামস্। তোমাকে একবার দেখতে পাবো, তার জন্যে যদি আমাকে মরতেই হয়, হাসিমুখে বরণ করে নেবো, সে মরণ আমার মহব্বৎকে আরও মহৎ করবে, জান্।

বাঁদীরা সব পলকে সরে যায়। সামস্ অল নাহার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কামার অল-এর মুখের দিকে। ভাবতে পারে না সে—এ দৃশ্য আবার সে দেখবে। কামার অল—তার প্রিয়তম আবার এসে দাঁড়াবে তার পালঙ্কের অতি পাশে, তা সে ভাববেই বা কি করে? তার বাবা কামার অলের ওপর খড়্গ হস্ত হয়ে আছে। একবার সে তার কব্জা থেকে পালিয়ে গেছে, কিন্তু আর একবার যদি সে ফিরে পায় তবে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে। একথা কামার অলও খুব ভালো করেই জানে। তাই, সে যে আবার ফিরে আসতে পারে, ভাববে কি করে!

তবুও তো সে এসেছে। অনেক বিপদ খাঁড়া মাথায় করে সে তো এসে দাঁড়িয়েছে? সামস্ আর ভাবতে পারে না; দুহাত বাড়িয়ে কামার অলকে টেনে নেয় বুকে। কেঁদে কেঁদে বুকের ব্যথা হাল্কা করে। কামার অলও চোখের জল রাখতে পারে না।

—জান সামস্, তোমার জন্য সারা দিন-রাত কী ভাবে কেটেছে আমার। মুখে খানা রুচৌনি, শুয়ে ঘুম আসেনি একদিনও। তুমি কেমন ছিলে?

সামস্ অল নাহার চুমায় চুমায় ভরে দেয় কামার অল-এর অধর গাল বুক।

—কেমন ছিলাম, কেমন থাকতে পারি বুঝতে পারছো না মণি, তোমার বিরহে আমার কী চেহারা হয়েছে একবার চেয়ে দেখ। আর ক'দিন যদি তোমাকে না দেখতে পেতাম, তাহলে তুমি ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পেতে না, সোনা। তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না। জীবনে যদি ভালোবাসা এল আর সে ভালোবাসাকে যদি ধরেই না রাখতে পারলাম, তবে কাজ কী বল এই ব্যর্থ জীবনে? তাই ঠিক করেছিলাম তুমি যদি আর ফিরে না আস জহর খেয়ে খতম করে দেব এ ছার জীবন।

কামার অল, সামস্-এর মুখে হাত চাপা দেয়, ওকথা মুখে আনতে নাই সামস্। আমি যেখানেই থাকি আর যত দূরেই থাকি, তুমি নিশ্চিত জেনো, আমি তোমারই আছি—তোমারই থাকবো। আমাদের এই নিখাদ ভালোবাসায় কোনও দিন চিড় খাবে না।

এক অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ খেলে যায় সামস্ অল নাহারের সারা শরীরে। আরো নিবিড় করে কামার অলকে জড়িয়ে ধরে সে।

কামার অল বলে, সামস্, বড্ড খিদে পেয়েছে, অনেকদিন খাওয়া-দাওয়া নাই। খিদেও ছিল না, কিন্তু এখন পেট চুঁই চুঁই করছে। মেয়েদের বল, কিছু খানাপিনা আনুক। আমরা দুজনে একসঙ্গে খাবো, কেমন?

সামস্ অল হাসে, বেশ তো!

তখনই নানারকম খানাপিনায় মেজ সাজিয়ে দেয় মেয়েরা। কামার অল নিজে হাতে সামসকে খাইয়ে দিতে থাকে। সামস অল-ও কামার-অলকে। অনেক দিন বাদে আবার তারা প্রাণভরে খানাপিনা করে।

হাসি আনন্দ আদর সোহাগে রাতের প্রহর কাটাতে থাকে। খুশিতে উপচে ওঠে দুজনের হৃদয়। একসময় কামার অল বুঝতে পারে, রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলেছে। এবার বিদায়ের পালা। ভারাক্রান্ত মনে সে সামস্কে বলে, ভোরের আগেই আমাকে পালাতে হবে। না হলে খোজাটা জেগে গেলে মুসকিল হবে। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, সোনা, প্রতি সপ্তাহে একবার এসে তোমাকে দেখে যাবো।

—না না, সে হবে না নয়নমণি, আর আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। একটি দিনও না—একটি মুহূর্তও না।

সামস্ অল নাহারের এই আকুলতায় সব গোলমাল হয়ে যায় কামার অল-এর। বলে, কিন্তু এখানে আমার থাকা কি নিরাপদ হবে সামস্। তোমার বাবার রোষ তো তুমি জান।

সামস্ অল বলে, জানি, খুব ভালো করেই জানি এখানে তুমি আমার কাছে রয়ে গেলে, কাল সকালেই তোমাকে চিরকালের মতো হারাবো আমি। সে-কথা আমি বলবো না, কামার অল। কিন্তু তোমাকে ছেড়েও আমি থাকতে পারবো না। আমি তোমার সঙ্গেই যাবো। তা সে যদি আমাকে জাহান্নামেও নিয়ে যাও, আমার কোনও আপত্তি নাই। তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমি কোন কষ্টই কষ্ট বলে মনে করি না। সোনা, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার বাবা পারস্যের শাহেনশাহ, তাঁর মান-ইজ্জৎ আমি খোয়াতে চাই না। তিনি যদি আমাকে ঘরে নিতে নারাজ হন কোনও দুঃখ করবো না। তুমি আমাকে অন্য কোথাও রাখবে। তা সে যত কষ্টকর জায়গাই হোক, সুলতান-দুহিতা প্রথম প্রথম হয়তো একটু আমার অসুবিধা হবে, দেখে নিও, হাসিমুখে আমি সব সয়ে নেবো। তোমার মহব্বতের কাছে আমার সে কষ্ট তুচ্ছ হয়ে যাবে।

কামার অল আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে, তুমি যাবে সামস্? আমার সঙ্গে যাবে তুমি? এই বিত্ত-বৈভব, এই অঢেল সুখ-সাচ্ছন্দ্য, তোমার বাবা, তোমার সুলতানিয়াৎ সব ছেড়ে যেতে পারবে আমার সঙ্গে? আমি সত্যিই কোনও কথা দিতে পারি না সামস্ অল। আমার বাবা তামাম পারস্যের শাহেন শাহ, একথা ঠিক। কিন্তু আমার তো নিজস্ব কোনও সম্পদ নাই, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন তবে আমি অতি সাধারণ এক বিত্তহীন কামার অল। সে ক্ষেত্রে তুমি বাদশাহজাদী, আদরের দুলালী, হয়তো সত্যিই অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

সামস্ অল নাহার কামার অলকে থামিয়ে দিয়ে বলে, সে সব কথা আমিই তোমাকে বললাম, সোনা। ভালোবাসার জন্য আমি সব হাসিমুখে কেমন করে সইতে পারি, একবার না হয় পরীক্ষা করে দেখ।

কামার অল বলে, ভোর হতে চললো ; তাহলে আর দেরি নয় সামস্, তৈরি হয়ে নাও, এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। না হলে খোজাটা জেগে গেলে, বিপদ হবে।

শাহজাদী শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে। সিন্দুকের তালা খুলে বের করে কিছু সাজ-পোশাক, রত্নাভরণ এবং মহামূল্যবান বিলাস-বস্তু। একটা থলেয় ভরে বলে, চল, আর কিছু নেবার নাই।

দাসী-মেয়েরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কোনও বাধা দিতে পারে না—সোরগোল তুলে সাড়া জাগাতেও পারে না।

সামস্ অলকে হাতে ধরে কামার অল ছাদের ওপরে ওঠে আসে। ঘোড়াটার জিনের সংগে ঝুলিয়ে দেয় থলেটা। তারপর দুহাতে তুলে শাহজাদীর হাল্কা দেহখানা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে নিজেও চেপে বসে তার পিছনে। সামসের পাতলা শরীরটা কামার অল-এর বিশাল বিস্তৃত বক্ষপটের মধ্যে হারিয়ে যায়।

ডানদিকের বোতামটা টিপে ধরতেই শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠতে থাকে কালো ঘোড়া। উল্কার বেগে। কামার অল সামসের কানের কাছে মুখ রেখে বলে, খুব ভয় করছে!

সামসের কণ্ঠে শিশুর সারল্য.—ভয় করবে কেন ? আমি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছি। তামাম দুনিয়ায় এর চাইতে নির্ভয় জায়গা তো আমার আর নাই, সোনা।

কামার অল-এর বুক ভরে যায়। ভালোবাসার কথা এত ভালো করে বলতে পারে সামস্—

একটুক্ষণের মধ্যেই তারা পারস্যের প্রাসাদ-শিখরে এসে নেমে পড়ে।

কামার অল-এর ঘোড়া আকাশে ওড়ার সংগে সংগে দাসী মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে ঃ ওরে বাবারে, কী সর্বনাশ হলো রে। কই গো, কে কোথায় আছ, ছুটে এস, শাহজাদীকে চুরি করে পালিয়ে গেল সেই লোকটা—

ধড়মড় করে উঠেই তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে খোজাটা। হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে, ছুটে আসে। ছুটে আসে সুলতানও আলু থালু বেশবাস, খালি পা, ঘুমে চোখ জড়ানো।

—কী ? হয়েছেটা কী ? এত চেঁচামেচি চিৎকার কেন এই রাতে ?

মেয়ারা তখনও ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। একজন বললো, সেই মানুষটা আবার এসেছিল, শাহজাদীকে চুরি করে নিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল।

সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে, তোরা কোথায় ছিলি ?

—জী হুজুর, আমরা ঘুমে অচৈতন্য হয়েছিলাম —

—আর এই বাঁদর খোজাটা—?

নিগ্রোটার হাতে তখন ইয়া বড় তলোয়ারখানা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

সুলতান ক্ষণকাল আর অপেক্ষা করলেন না সেখানে। ছুটতে ছুটতে ছাদের ওপরে উঠে এলেন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ঘোড়াটা ততক্ষণে মেঘের কাছাকাছি। সুলতান চিৎকার করে বলতে থাকেন, শোন শাহজাদা কামার অল, আমার একটা মিনতি শোন, দোহাই বাবা, আমার একমাত্র নয়নের মণি বুকের কলিজাকে এইভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যেও না। ফিরিয়ে দিয়ে যাও, ফিরিয়ে দিয়ে যাও। নেমে এস, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে শাদী দিয়ে দেব। ফিরিয়ে দাও তাকে।

কিন্তু সুলতানের সে আকুল আবেদনে সাড়া দিল না কামার অল। কী করেই বা দেবে? তখন তারা মানুষের কণ্ঠস্বরের নাগাল ছাড়িয়ে আরো অনেক ওপরে উঠে গেছে।

সুলতান ভাবেন, কামার অল তার কথায় সাড়া দেবেন না। তারপর তিনি আরও জোরে চিৎকার তোলেন, সামস্ অল—ফিরে আয় মা, তোমার বুড়ো মায়ের মুখ চেয়েও একটিবারের জন্য ফিরে আয়, বাছা। আজ বাদে কাল সে দেহ রাখবে, একবার তাকে দেখে যা। আমি কথা দিচ্ছি মা, তোরা যা চাইবি তাই হবে। শুধু একটি বারের জন্য ফিরে আয়।

কিন্তু ফিরে এল না কেউ। শুধু নিজেরই প্রতিধ্বনি বার বার ফিরে ফিরে এসে বিদ্রূপ করতে থাকলো।

রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁচিশতম রজনী

আবার সে বলতে থাকে ঃ

কামার অল বলে, এই আমাদের প্রাসাদ। কিন্তু তোমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাই, সেই কথাই ভাবছি। সোজা যদি বাবার সামনে হাজির করি তোমাকে আর তিনি যদি রুষ্ট হয়ে তোমাকে কোনও কটুকথা বলেন, সে তো আমি সইতে পারবো না সোনা। সুতরাং ভাবছি, এখনই প্রাসাদে না ঢুকে তার চেয়ে বরং চল বাগিচামহলে গিয়ে উঠি। তোমার কী মত?

আমার আবার আলাদা মত কী হবে? তোমার মতেই আমার মত। তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। তবে একটা কথা, তোমাকে ছাড়া আমি একটা রাতও থাকতে পারবো না।

কামার অল হেসে সামস্-এর পাপড়ি নরম গালে আস্তে একটা ঠোনা মারে।

—আমিই কী ভাবছো, তোমাকে ছেড়ে একটা রাত কাটাতে পারি? চল আমরা এই প্রাসাদে ঢুকবো না। বাগিচা বাড়িতেই যাই।

আবার সে ঘোড়াটাকে খানিকটা ওপরে ওঠায়। তারপর অদূরে অবস্থিত সুরম্য বাগিচা-মহলের সামনে গিয়ে নেমে পড়ে। বড় মনোরম জায়গা। যে দিকে তাকায় সামস্, শুধু ফুলে ফুলে ভরা। কত সহস্র রকম জানা অজানা ফুলের গাছ। বাগিচার মাঝখানে একটি স্ফটিকের ফোয়ারা। তার চার পাশে স্বচ্ছ নীল জলে কেলি করে মাছেরা। সামস্ অল নাহারের দুচোখ

জুড়িয়ে যায়। কামার অল বলে, এখানে দুএকটা দিন তুমি থাকো—আমিও থাকবো। তারপর সুযোগ মতো বাবাকে বলবো তোমার কথা। আমি তার একমাত্র পুত্র সন্তান। তার মনে বড় আশা, আমার শাদী হবে খুব জাঁকজমক করে। দেশ-বিদেশ থেকে আসবে হাজার হাজার অতিথি অভ্যাগতরা। তাদের সামনে শাদী হবে তার পুত্র—পারস্যের ভাবী শাহেন শাহর। আমি এখন যাচ্ছি, বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কাল রাতে তাকে না বলে চলে গেছি, না জানি কত দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে আছেন তিনি। ঘোড়াটা এখানে রইলো। একটু নজর রেখো, কেমন ?

সামস্ অল নাহার বলে, ঠিক আছে, বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

ছেলেকে দেখে বাদশাহ সাবুরের ধড়ে প্রাণ আসে। সারাটা রাত বিনিদ্র রজনী কেটেছে তাঁর। নানা অশুভ চিন্তায় দেহমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল, কামার অলকে দেখে তিনি খুশিতে উপচে পড়েন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, এইভাবে বুড়ো বাপের মনে কষ্ট দিতে আছে, বেটা ?

কামার অল বলে, আপনার জন্যে একটা মজার জিনিস আনতে গিয়েছিলাম, আব্বাজান।

—কী জিনিস বাবা ?

—আপনিই বলুন, আব্বাজান, কী হতে পারে ?

বাদশাহ সাবুর হদিশ করতে পারেন না কিছু। অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, খোদা হাফেজ, আমি তো কিছুই ঠাওর করতে পারছি না বাবা। কী ব্যাপার, কী এমন বস্তু আনতে গিয়েছিলে আমার জন্যে ?

—সানার সুলতান-কন্যাকে সঙ্গে এনেছি, আব্বাজান। সে আপনার ছেলের বেগম হবে। তার মতো খুবসুরৎ মেয়ে তামাম আরব পারস্যে মিলবে না আর একটা। যেমন রূপ তেমনি তার আদব কায়দা !

বাদশাহ চিৎকার করে ওঠেন, কোথায় সে ?

—আমি তাকে বাগিচামহলে রেখে এসেছি, আব্বাজান। তাকে আপনি জাঁকজমক করে ঘরে আনবেন। সেইজন্যে সরাসরি আপনার কাছে হাজির করিনি।

বাদশাহ সাবুর ছেলের বুদ্ধির তারিফ করেন, ভালো করেছ। সে আমার ছেলের বেগম হবে। লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে, শাদী-কেতায় তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে হাজার হাজার মানুষের মিছিল করে প্রাসাদে আনতে হবে তো। তাকে নিয়ে তুমি যদি জীবনে সুখী হও তার চেয়ে আনন্দ আর কী হতে পারে আমার ? তোমার মুখে হাসি দেখলে আমার সব চিন্তা ভাবনা মুছে যায়।

তখুনি তিনি উজিরকে নির্দেশ দিলেন, উজির আর দেরি নয়, মিছিলের আয়োজন কর, প্রাসাদ শহর পথঘাট সাজাতে বল। আমার ছেলের বেগম বরণ করে আনতে হবে।

বাদশাহ নিজ হাতে রত্ন-সিন্দুক খুললেন। এই সিন্দুকেই রাখা আছে পারস্যের সেরা সম্ভার। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত করে গেছে এতাবৎ কালের বাদশাহ। সাবুর বেছে বেছে বের করলেন সবচেয়ে দামী দামী জড়োয়ার সব গহনাপত্র। সবই হীরা মণি মুক্তাখচিত অমূল্য রত্নালঙ্কার। বংশানুক্রমে এই প্রাসাদের বেগমরা যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে এসেছে এই রত্ন আভরণ—।

অলঙ্কারগুলো ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আমাদের খানদানের অলঙ্কার। অধিকার সূত্রে এসব এখন তারই প্রাপ্য। তুমি তাকে নিজে হাতে সাজিয়ে নিয়ে আসবে প্রাসাদে।

উজির আয়োজন করেছিল শোভাযাত্রার। বিশাল বিরাট। প্রায় গোটা শহরের মানুষই বুঝি বা সেই মিছিলে সামিল হয়েছে। ধীরে মন্থর-গতিতে চলেছে শোভাযাত্রা। কামার অল-এর আর সহ্য হচ্ছিল না এই বিলম্ব। তার প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে সামস্-এর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে।

কামার অল মিছিলের সঙ্গ পরিহার করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য একটা সরু পথ দিয়ে সরে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে পেঁছে যায় বাগিচা মহলে—সামস্ অল নাহারের বিশ্রামকক্ষে। কিন্তু একি! সামস্ অল কোথায়—ঘরে তো নাই সে! ফিরে তাকিয়ে দেখে, ঘোড়াটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সে, সেখানে ঘোড়াটাও নাই! তবে? আর ভাবতে পারে না কামার অল? মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। সম্বিৎ ফিরে আসে। কিন্তু তখনও সে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা, সামসের পক্ষে ঘোড়া চেপে অন্য কোথাও চলে যাওয়া কী সম্ভব? না না, সে কী করে হতে পারে। কলের ঘোড়া চালাবার কায়দা কসরৎ না জানলে চালাবে কী করে? এবং এ পর্যন্ত সামস্ অল কখনও জানতেও চায়নি, কী ভাবে চালাতে হয়। অন্য কোনও মানুষের পক্ষেও তাই। চলাবার কৌশল একমাত্র সেই পারস্য-পণ্ডিত ছাড়া তো কারোই জানা নাই। তবে কী সে-ই?

রাতের অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসে। প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ছাব্বিশতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয়ঃ

বাগিচার মালীর কাছে ছুটে যায় কামার অল।

—বাগিচায় অন্য কোনও লোককে ঢুকতে দেখেছো? কোন ঝুট বলবে না, তা হলে তোমার গর্দান যাবে—

ভয়ে থর থর করে কাঁদতে থাকে লোকটা। আল্লাহ কসম, অন্য কাউকেই দেখিনি। শুধু সেই পারসী-পণ্ডিত একবার ঢুকেছিলেন। দু'একটা ফুল তুলেছিলেন নজর করেছি। কিন্তু সে এখনও বাইরে যায়নি। ভিতরেই কোথাও আছে।

এবার আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না কামার অল-এর। আর কেউ নয়, সেই শয়তানটাই তার প্রিয়তমাকে উধাও করে নিয়ে পালিয়েছে। দুঃখে বিষাদে সারা দেহমন ছেয়ে যায়। এখন সে কী করবে, কী করা উচিত কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। দিশাহারা হয়ে মিছিলের দিকে ছুটে চলে। বাদশাহ সাবুরের সঙ্গে দেখা করে বলে, আব্বাজান, সর্বনাশ হয়েছে! সেই শয়তান পণ্ডিতটা সামস্ অল নাহারকে নিয়ে পালিয়েছে। মিছিল ফিরিয়ে নিয়ে আপনি প্রাসাদে চলে যান। আমি চললাম, যতদিন না তাকে খুঁজে পাই, আমি ফিরবো না।

বাদশাহ আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে।

—আমার কথা শোন বাবা, প্রাসাদে ফিরে চল। তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারবো না। ফিরে চল, তারপর আমি একটা ব্যবস্থা করছি।

—সে হয় না বাবা, আমি এর শেষ দেখে নিতে চাই। কত বড় শঠ শয়তান সে, আমি একবার দেখবো।

বাদশাহ বলেন, কিন্তু বাবা, ও যে যাদুকর। তার ভেল্কিবাজীর কাছে তোমার দেহবল তুচ্ছ। সে তোমাকে মন্ত্রবলে নিমেষে হত্যা করে ফেলবে। তার চেয়ে তুমি প্রাসাদে ফিরে চল। আমি তোমার জন্য তামাম আরব বাদশাহদের সুন্দরী কন্যা জোগাড় করে আনবো। তার মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় তার সঙ্গে শাদী দিয়ে দেব।

কামার অল রুদ্ধকণ্ঠে বলে, এ আপনি কী বলছেন, আব্বাজান! সামস্ ছাড়া আমি অন্য নারীর চিন্তাও করতে পারবো না। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না বাবা, কেউ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আল্লাহ যখন আমাকে রক্ষা করেছেন আমি আর কাউকেই ডরাই না।

বাদশাহকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসায়। তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে যায় কামার অল। হাপুস-নয়নে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসেন বাদশাহ সাবুর।

নিমেষের মধ্যে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে সারা শহরে। প্রাসাদে বিরাজ করতে থাকে কবরের নিস্তব্ধতা।

একেই বলে নিয়তি। সেই পারসী যাদুকর সেইদিন ঘটনাক্রমে বাগিচায় ঢুকেছিল কিছু ফুল সংগ্রহ করতে। কিন্তু বাগানে ঢুকেই সে বুঝতে পারলো কাছে-পিঠেই এমন কেউ আছে—যার গায়ের অতি মূল্যবান আতরের খুশবু সারা বাগানে ভুর ভুর করছে। পায়ে পায়ে সে বাগিচামহলের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে ঘরের পালঙ্ক-শয্যা পরিষ্কার চোখে পড়ে। যাদুকর দেখলো, এক পরমাসুন্দরী রমণী শয্যায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো বোজা। হয় বা ঘুমিয়ে গেছে, হয়ত নয়; এমনিই চোখ বন্ধ করে অস্বস্থ হয়ে আছে। ওপাশে নজর পড়তেই দেখলো, তার সেই যাদু ঘোড়া—দরজার একপাশে দাঁড় করানো। এবার বুঝতে কষ্ট হলো না, ঘোড়াটা কামার অলই রেখে গেছে এখানে। এবং এই অলোক-সামান্যাও তারই এক সংগ্রহ।

বুড়ো যাদুকরের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। মাথায় এক বদবুদ্ধি খেলে যায়। ঘোড়াটার পাশে গিয়ে সে ভালো করে দেখে নেয়। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক আছে কিনা। তারপর আস্তে আস্তে এসে সামস্ অল-এর ঘরে ঢুকে আভূমি নত হয়ে সশব্দে লম্বা একটা কুর্ণিশ জানিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সামস্-এর তন্দ্রাভাব কেটে যায়। চোখ মেলে দরজার দিকে এক পলক তাকিয়েই আঁৎকে উঠে আবার সে বন্ধ করে নেয় চোখ দুটো।

—কে তুমি ?

—আমি শাহজাদা কামার অল আকমর-এর বান্দা, বেগমসাহেবা ? তার একটা খবর বয়ে এনেছি আপনার কাছে।

—কী খবর ?

সামস্-অল ঐ কুৎসিত কদাকার বুড়োটার দিকে তাকাতে পারে না।

—যাদুকর বিগলিত কণ্ঠে বলে, শাহজাদা আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, এই শহরেই অন্য আর একটা বিলাসমহলে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

এখানে আপনার কষ্ট হতে পারে সেইজন্যে তিনি আরও সুন্দর আরও ভালো একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক করছেন। সেখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি, মেহেরবানী করে আমার সঙ্গে চলুন আপনি।

সামস্ অল নাহার বিরক্ত বোধ করে, তা তিনি নিজে না এসে তোমাকে পাঠালেন কেন ?

—সে কি! আপনি জানেন না ? তার মা-এর অবস্থা খুব খারাপ। তাঁকে ছেড়ে এখন তিনি ওঠেন কি করে ? তাই আমাকে পাঠালেন। আমি আপনাকে সেখানে পোঁছে দেবো।

সামস্ অল বলেই ফেলে,...তা আর কোনও লোক পেলেন না তিনি ? তোমার মতো একটা ভয়ংকর জীবকে পাঠিয়েছেন ? উফ্, তোমার কী বিশ্রী চেহারা। দেখলে গা গুলিয়ে যায় !

যাদুকর আরও বিনয়াবনত হয়ে বলে, জী—সেই কারণেই তো আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকালে কোনও মেয়ের চরিত্র নষ্ট হবে না—সে কথা জেনেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। তা না হলে প্রাসাদে কী চাকর নফরের অভাব ছিল ? কিন্তু অন্য কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। উনি জানেন, আমার দিকে লোভের নজর দিয়ে তাকাবে না কোনও মেয়ে। আর আমি একশো বছরের একটা বুড়োহাবড়া—সে-সব বালাই তো আমার দেহমন থেকে বিদায় হয়েছে অনেককাল। তা আর বিলম্ব করবেন না, বেগমসাহেবা। দেরি দেখলে শাহজাদা আবার চিন্তিত হতে পারেন।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো সাতাশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

যাদুকরের এই সব মধুঢালা কথাবার্তায় সামস্ অল নিঃসন্দেহ হতে পারে।

—ঠিক আছে, চলো যাচ্ছি। কিন্তু যাবো কিসে? কী এনেছো?

যাদুকর বলে, যে ঘোড়ায় চেপে আপনি এসেছেন, সেই ঘোড়াতেই নিয়ে যাবো।

সামস্ অল না না করে ওঠে, ওরে বাবা, ও ঘোড়ায় আমি একা চাপতে পারবো না।

যাদুকর হাসে। মনে মনে ভাবে, এবার যাবে কোথায়, বাছাধন। এখন তুমি আমার কব্জায়। যেখানে তোমাকে নিয়ে যাবো, সেখানেই যেতে হবে। দাঁড়াও একবার তোমাকে জিনের ওপরে চাপাই আগে, তারপর দেখবে আমার খেল্—

—সেজন্যে আপনি কিছু ভয় করবেন না, বেগমসাহেবা, আমি আপনার সঙ্গে চাপবো। তা না চাপলে, এ তো আর জ্যান্ত ঘোড়া নয়, আপনি চালাবেন কী করে?

যাদুকর সামস্ অলকে জিনের ওপর চাপিয়ে নিজে তার পিছনে বসলো। তারপর ডানদিকের বোতামটা টিপে ধরে বললো, কোন ভয় নাই, বেগমসাহেবা, একটুও নড়াচড়া করবেন না। আমি আপনাকে ধরে থাকছি। এক লহমাতেই পৌঁছে যাবো।

শোঁ শোঁ করে আকাশের ওপরে প্রায় মেঘের কাছাকাছি উঠে যায় যাদুকর। তারপর আর একটা বোতাম টিপে সে তীরবেগে সামনের দিকে ছুটে চলে। সামস্ অল দেখে, নিচে শহরের প্রাসাদ ইমারত ছাড়িয়ে ঘোড়াটা ছুটে চলেছে মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে। তারপর এক সময় বিশাল বিস্তৃত মরুভূমিও পার হয়ে যায় ঘোড়াটা। গাছপালা, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, নদী, জনবসতি আসে। নিমেষেই তারা পিছনে পড়ে থাকে। তখন ঘোড়াটা উল্কার বেগে ছুটে চলেছে।

সামস্ অল নাহার বুঝতে পারে না এ সে কোথায় চলেছে? লোকটা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ভয়ার্ত কণ্ঠে সে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, একি? এদিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? আমাকে তো শোনালে, শহরের কাছেই যেতে হবে। কিন্তু কত নদী, মরুভূমি ছাড়িয়ে এলাম, এখনও কী দেরি আছে?

যাদুকরের চোখে শয়তানের হাসি।

—এই তো এসে পড়েছি।

কিন্তু এসে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সামনে ছুটেই চলতে থাকলো। এবার সামস্ অল বুঝতে পারে যে সে, শয়তানের খপ্পরে পড়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে ফুঁসে ওঠে সে, এ কেমন চালাকী! তুমি না শাহজাদার বিশ্বাসী চাকর? এই তোমার ব্যবহার?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যাদুকর, হো হো হো করে। আমি চাকর?

তোমার নাগরের চাকর ? আহা, কী এমন সুখের কথা ?

নিমেষে মুখে ফুটে তার ভয়ংকর এক হিংস্রতা।

— শোন, সুন্দরী, তুমি যেই হও, এখন থেকে আমার পেয়ারের বাঁদী হয়ে থাকবে। এই আমার শেষ কথা।

একটা নদীর পাড়ে একটা বাগানের পাশে এসে ঘোড়াটা নেমে দাঁড়ায়। যাদুকর বলে, উফ্ বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। চল, একটু পানি খাবো।

সামস্ অল নাহার ঘোড়া থেকে নেমে এসে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

—এত বড় শয়তান তুমি, ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে তোমার আস্তানায় নিয়ে যেতে চাইছো ? সে কিছুতেই হবে না।

—আহা-হা, অত চটছো কেন সুন্দরী। তোমাকে আমি তোমার নাগর কামার অল-এর চাইতে আরও বেশি সুখে রাখবো। জানো, আমি কে ? তামাম আরব পারস্য দুনিয়ার মানুষ আমার যাদুর কথা জানে। আমি মন্ত্রবলে অসাধ্য-সাধন করতে পারি। আমার প্রাসাদে চলো, দেখবে। বাদশাহ সাবুর সে-প্রাসাদ জিন্দগীতে বনাতে পারবে না। আমি মন্ত্রবলে তৈরি করেছি এক নতুন বেহেস্ত। তুমি হবে তার মালকিন। কত-শত সহস্র দাসী বাঁদী তোমার সেবা যত্ন করবে। যে সুধা পান করলে মানুষ অমর হয় সেই সুধা আছে আমার কাছে। তোমাকে দেব, তুমি খেয়ে চির-যৌবনা হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। বল তোমার নাগর কামার অল পারবে এসব দিতে ? পারবে কী করে, বল ? এ বস্তু তো কড়ি দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। যাদুবলে সংগ্রহ করেছি আমি। আমার বয়স কত জান ? একশো বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু দেখ, আমার শরীরে কী তাকত। হাজার পালোয়ানকে এক লহমায় কুপোকাৎ করে দিতে পারি। ভাবছো, আমি বুড়ো হয়েছি, তোমার যৌবন-কাম ব্যর্থ হয়ে যাবে ? তবে জেনে রাখ সুন্দরী, আমি দেখতে কুরূপ হতে পারি, বয়েস আমার একশোরও বেশি হতে পারে, কিন্তু এখনও আমি তোমার মতো শত সুন্দরীকে সমানভাবে তুষ্ট রাখতে পারি। সুতরাং মন থেকে ওই সব ভালোবাসার প্যান-প্যানানি মুছে ফেল। মেয়েরা চায় বিলাস-ব্যসন, আর চায় রতি-রঙ্গের জাঁদরেল যন্তর। ও দুটো আমার কাছ থেকে যা পাবে, কামার অল এর কাছ থেকে তা কখনই পাবে না। কামার অল একটা লম্পট, চোর। আজ যে মেয়েকে নিয়ে নাচে, কাল তাকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দেয়। এই যে কলের ঘোড়াটা দেখছো, এটার মালিক কে জানো ? আমি। সে আমার জিনিস চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে ভুলিয়ে ভাগিয়ে আনতে।

সামস্ অল নাহার চিৎকার করে ওঠে, থামো! তোমার অনেক বুজরুকি আমি শুনেছি, আর শুনতে চাই না। এখন জানে বাঁচতে চাও তো কেটে পড়। না হলে কপালে তোমার দুঃখ আছে।

যাদুকর হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে, আমার কপালে দুঃখ জিনিসটা লিখতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, সুন্দরী। আমি সুখের সাগরে ভেসে বেড়াই। তোমাকেও অবশ্য সঙ্গী করে নেব, ভয় নাই।

এমন সময় দুজন জাঁদরেল সেনাপতি গোছের লোক পিছন দিক থেকে অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো যাদুকরের ওপর।

—এ্যাই, ওঠ, চল, শাহেনশাহর কাছে যেতে হবে।

পারস্যের সীমানা ছাড়িয়ে রুমমুলুকে এসে ঘোড়াটাকে নিচে নামিয়েছিল যাদুকর। উদ্দেশ্য ছিল খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে পানি পান করে আবার আকাশে উড়বে। রুম ছাড়িয়ে, আরও সুদূরে, অন্য কোনও দূরদেশে পাড়ি জমাবে। কিন্তু তা আর হলো না।

কাছেই রুমের শাহেনশাহর শহর। বাদশাহ প্রতিদিন বিকালে মুক্ত বায়ু সেবন করতে আসেন এই নদীর ধারে। সে-দিনও যথারীতি উজির আমির সেনাপতি নবাব বান্দা সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে এল নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ। ভালো করে নজর করতে, বুঝতে পারলেন অনেকটা দূরে একখণ্ড সবুজ ঘাসের ওপর বসে আছে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে, আর তার পাশে এক বুড়ো। তরুণীর আর্তকণ্ঠ শুনে তিনি ভাবলেন. নিশ্চয়ই লোকটা কোনও দুর্বৃত্ত, বদমাইশ। অসহায় অবলাকে জোর করে কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সেনাপতিদের বললেন, ঐ লোকটাকে ধরে নিয়ে এস।

বুড়ো যাদুকর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। হঠাৎ এখানে কেউ এসে পড়তে পারে, মনে হয়নি।

—এ্যাঁ, আমাকে কেন পাকড়াও করছেন? কী করেছি আমি।

সেনাপতিরা বলে, সে কৈফিয়ৎ শাহেনশাহর কাছেই. দেবে, চল।

কিন্তু তবু যাদুকর নড়তে চায় না। সেনাপতিদ্বয় তার দুই গালে বিরাশি-সিক্কার দুখানা ঘুষি লাগাতেই বাছাধন ক'কিয়ে ওঠে, যাচ্ছি-যাচ্ছি।

বাদশাহ দেখে অবাক হন, লোকটা কী ভয়ংকর কুৎসিত কদাকার। এমন হত-কুৎসিত মানুষ তিনি জীবনে দেখেননি কখনও। আর এ-রকম অলোক-সামান্যা সুন্দরী যুবতীও তিনি কমই দেখেছেন। বাদশাহ সামস্ অলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাপ-মা কী নিষ্ঠুর পাষণ্ড। তোমার মতো এক অপূর্ব রূপসী মেয়েকে এই কবরের মড়া একটা বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে?

পারসী যাদুকর বলে, জাঁহাপনা, ও আমার চাচার মেয়ে, আমি ওকে শাদী করেছি।

—মিথ্যে কথা, সমস্ অল নাহার ফুঁসে ওঠে। একদম ডাহা মিথ্যে কথা, জাঁহাপনা। লোকটা মহা শয়তান, বদমাইশ যাদুকর। আমাকে ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও আমি ওকে চিনতাম না। জীবনে কখনও দেখিনি। পারস্যের শাহজাদা আমার স্বামী। সেখান থেকে ও আমাকে ধাপ্পা দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছে।

বাদশাহ বললেন, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে এক্ষুনই দাওয়াই দিচ্ছি।

বাদশাহর হুকুমে সেনাপতিরা বেদম প্রহার করতে থাকলো যাদুকরকে।

তাদের এক একটা ঘুষিতে তার হাড় পাঁজর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগলো। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে সে। কিন্তু মুখে দোষ স্বীকার করে না।

বাদশাহ বললেন, আচ্ছা এখন ওকে কারাগারে কয়েদ করে রেখে দাও। পরে আবার দেখা যাবে।

সামস্ অল নাহার এবং সেই আজব কাঠের ঘোড়াটাকে সংগে নিয়ে বাদশাহ প্রাসাদে ফিরে এলেন। বাদশাহ ভেবে অবাক হন এই কাঠের ঘোড়ায় করে তারা এল কী করে। অদ্ভুত ব্যাপার তো, মাথার মধ্যে শুধু এই একটা চিন্তাই ঘোরাফিরা করতে থাকে।

এবারে বাদশাহজাদা কামার অল আকমরের কথা শুনুন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে মরুপ্রান্তর, নদী নালা পাহাড় কন্দর। কত সবুজ ফসলের মাঠ অতিক্রম করে, কত গ্রাম গঞ্জ পিছনে ফেলে বিরাম-বিহীনভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে থাকে সে।

রাত্রির অন্ধকার হাল্কা হতে থাকে। প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটাশতম রাত্রি

আবার সে বলতে থাকে :

এইভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হয়। অনেক শহর গ্রাম পার হয়ে যায় সে। পথের মাঝে যাকে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করে, সেই আজব ঘোড়া, সেই বুড়ো যাদুকর আর এক সুন্দরী কন্যার কথা। কিন্তু কেউই তার জিজ্ঞাসার কোনও জবাব দিতে পারে না। সবাই একই কথা বলে, না তেমন কোনও ঘোড়া বা নর-নারীকে দেখেনি তারা—শোনেও নি কারো মুখে তেমন কিছু।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন সে সানা-শহরে এসে পড়ে। কামার অল ভেবেছিল, যদি সামস্ অল এখানে ফিরে এসে থাকে। কিন্তু সানা-বাসীরা বললো, শাহজাদীর শোকে বাদশা-বেগম শয্যাশায়ী হয়ে আছে। না, তিনি ফিরে আসেন নি। ফিরলে সারা সলতানিয়ৎ আবার আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়বে না?

হতাশ মনে কামার অল আবার অন্য পথে চলতে থাকে। এইভাবে চলতে চলতে কপালক্রমে একদিন সে রুম মুলুকে এসে হাজির হয়। জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে থাকে সে। যদি কেউ কোনও সন্ধান দিতে পারে, সেই

আশায়। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে না। কেউ দেখাতে পারে না কোনও আশার আলো।

একদিন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়, কামার অল একটা সরাইখানায় এসে থামে। রাতটা সেখানেই সে কাটাবে—সেইরকম ইচ্ছা। সরাইখানার সামনের ঘরে এক দল সওদাগর গোল হয়ে বসে খানাপিনা আর গল্প-গুজব করছিল। কামার অলও তাদের কাছাকাছি একটা আসনে বসে পড়লো।

সওদাগরদের একজন বলতে থাকে, এক আজব কাহানী শুনে এলাম। কামার অল কান খাড়া করে শোনে।

সওদাগররা সবাই উৎসুক হয়ে তাকায়, কী এমন আজব কাহিনী ভাই সাহেব ?

—আমি রুমের শহরে সওদা বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই ফিরছি। সেখানকার লোকের মুখে মুখে ফিরছে শুধু একটাই কথা।

—কী কথা ?

বাদশাহ নাকি একদিন নদীর ধারে এক জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটা কদাকার বুড়োর সঙ্গে একটা অসাধারণ সুন্দরী রূপসী মেয়েকে ধরে এনেছেন।

সওদাগররা চুপসে গেল, তারা ভেবেছিল এমন কথা শোনাবে যে যাতে একেবারে তাক্ লেগে যায়। সবাই সমস্বরে বললে, এ আর এমন কী ঘটনা। এমন কাণ্ড আজকাল আকছার হচ্ছে। কত মেয়ে কত মানুষের সঙ্গে ভেগে যাচ্ছে—তা নিয়ে আবার গল্প কী—?

সওদাগরটি বলে, আহা র'সো, আসল কথা তো এখনো বলিনি।

আবার সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকায়। সওদাগরটি বলে, ঐ বুড়োটা আর সুন্দরী মেয়েটা নাকি একটা আজব কাঠের ঘোড়ায় চেপে আসমান দিয়ে উড়ে এসে নেমেছিল। ঘোড়াটা আর মেয়েটিকে বাদশাহ প্রাসাদে রেখে দিয়েছেন। আর বুড়োটাকে রেখেছেন কয়েদখানায়।

সওদাগরটি অনেক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রসিয়ে রসিয়ে নানা রকম রঙিন বর্ণনা সহকারে কাহিনীটা বলতে থাকে। তার বিস্তারিত বিবরণ এ কাহিনীর উদ্দেশ্য নয়।

কামার অল-এর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। এতদিন ধরে সে যার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে আজ তার হদিস্ পেয়ে মন চনমন করে ওঠে। গায়ে পড়ে সে সওদাগরটিকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা জনাব, কোন্ শহরের কথা বললেন ?

—এখান থেকে কতদূর। কোন্ পথে যাওয়া যায় ?

সওদাগর তখন তাকে রুমে যাওয়ার সোজা পথের নিশানা বাতলে দিল।

আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে সে রাতেই সে বেরিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে-চলতে এক-সময় রুম শহরের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছয়। ফটকের পাহারাদার বিদেশী কামার অলকে দেখে বলে, এখানকার নিয়ম অন্যদেশের

কোনও মানুষ এ-শহরে ঢুকতে চাইলে আগে তাকে বাদশাহর দরবারে যেতে হবে। বাদশাহ যদি অনুমতি দেন তবেই সে শহরে ঢুকতে পারে।

কামার অল বলে, বেশ তো আমাকে নিয়ে চল, তোমাদের বাদশাহর দরবারে।

কিন্তু রাত তখন অনেক। পাহারাদার বলে, এত রাতে তো বাদশাহর সঙ্গে দেখা হবে না। আজ আপনাকে এখানেই আমাদের কয়েদখানায় রাত কাটাতে হবে।

কিন্তু ফটকের কোতোয়াল কামার অল-এর অদ্ভুত সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ভাবে, আহা এমন খুবসুরৎ নওজোয়ান—একে সে কয়েদখানায় ঢোকাবে?

কোতোয়াল কামার অলকে তার নিজের ঘরে বসায়। একসঙ্গেই খানাপিনা করে। এক সময় সে জিজ্ঞেস করে, তা সাহেব, কোথা থেকে আসছেন?

—আমি পারস্য থেকে আসছি।

কোতোয়াল হেসে ওঠে, কিছু মনে করবেন না, পারসীদের সম্বন্ধে ধারণা আমাদের খুব খারাপ। শুনেছি তাদের মধ্যে ভালো লোক খুব কমই আছে। ঠগ, জোচ্চোর, বদমাইশ, শয়তানদের সংখ্যাই নাকি বেশি। এই তো কিছুদিন আগে একটা বুড়ো পারসী এসেছে আমার এই কয়েদখানায়। অনেক পারসীকে দেখেছি, আলাপও করেছি অনেকের সঙ্গে। নানারকম মিথ্যা আজগুবি কিস্‌সা তারা শোনায়। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে এই বদখদ বুড়ো কয়েদীটা। লোকটা চোখে মুখে মিথ্যে কথা বলে। এমন ঠগ শয়তান আমি জীবনে দেখিনি কখনও।

কামার অল উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী রকম? কী ধরনের মিথ্যে কথা সে বলেছে।

—লোকটা হামবড়াই। তার ধারণা সে একটা পীরপয়গম্বর। তার মতো ধন্বন্তরী হেকিম নাকি সারা দুনিয়ায় নাই। আমাদের বাদশাহ একদিন শিকারে বেরিয়ে এক জঙ্গলের পাশে এই বুড়োটাকে দেখতে পান। লোকটা এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে পালাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে একটা কাঠের ঘোড়া পাওয়া গেছে। এই কালো কাঠের ঘোড়াটা এক তাজ্জব জিনিস। কাঠের ঘোড়াটায় কল বসানো আছে। সেই কল টিপলে নাকি সে আকাশে উঠে ছুটতে থাকে। প্রাসাদেই রাখা আছে ঘোড়াটা।

কামাল জানতে চায়, আর সেই মেয়েটা?

—শুনছি, তাকে তো বাদশাহ শাদী করবেন। তার মতো সুন্দরী নাকি তামাম আরব পারস্যে দুটি নাই। বাদশাহ তার রূপের মোহে মাতাল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মেয়েটার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সব-সময় বিড়-বিড় করে আপন মনেই কী সব বলতে থাকে। খায় না, নায় না। কারো সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলে না। বাদশাহ তাকে সারিয়ে তোলার জন্য দুহাতে অকাতরে পয়সা খরচ করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে নামজাদা হেকিম বদ্যিরা আসছেন। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারছেন না। বুড়োটা সারা দিন-রাত তড়পায়,

আমাকে নিয়ে চল বাদশাহর কাছে। এক লহমায় আমি তার সব রোগ সারিয়ে দেব। কিন্তু ঐ উন্মাদের কথা কে শুনবে? লোকটা রাতেও ঘুমায় না। সারারাত ধরে চেঁচামেচি চিৎকার করেই চলেছে। আমাদের এক পলক স্বস্তিতে থাকতে দেয় না ব্যাটা।

কামার অল ভাবে, যাক একটা হদিশ পাওয়া গেল। তখন সে কী ভাবে এগুবে তারই মতলব করতে লাগলো। রাত যখন আরও গভীর হয়ে এল তখন কোতোয়াল বললো, এবার সাহেব, আপনাকে কয়েদখানার ভিতরে ঢুকতে হবে যে।

কামার অল বলে, আমি তো প্রস্তুত। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।

ভিতরে ঢুকেই সে একটা গোঙানী শুনতে পেল। সেই বুড়ো যাদুকরটা নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বকে চলেছে।

—হায় হায় একি সর্বনাশ করলাম আমি। কেন মরতে ঐ নদীর পাশে নামতে গেলাম! অমন সুন্দর কচি ডাগর ছুঁড়িটা রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করবো আশা করেছিলাম—কিন্তু শয়তান বাদশাহটা তা হতে দিল না। আমার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে দিল! একটুখানি চালের ভুলের জন্য আমার এই সর্বনাশ হয়ে গেল। উঃ!

কামার অল আকমর কাছে সরে এসে চোস্ত পারসী ভাষায় বুড়োকে জিজ্ঞেস করে, অমন চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করছো কেন, কী হয়েছে? তোমার কী ধারণা, দুনিয়াতে একাই তুমি দুঃখী হতভাগ্য!

কামার অল-এর এই সহৃদয় সহানুভূতি পেয়ে বুড়োটা নড়ে চড়ে বসে। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে কামার অলের মুখখানা দেখতে পায় না। হয়তো বা দেখতে চায়ও না। গলাটা খাটো করে কামার অল-এর কানের কাছে সরে এসে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলতে থাকে। কী ভাবে সে মেয়েটিকে ধাপ্পা দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল, এবং কী ভাবেই বা বাদশাহর হাতে ধরা পড়ে প্রচণ্ড প্রহার খেয়েছিল এবং তার বিস্তারিত কাহিনী শোনালো তাকে। কানে কানে ফিস ফিস করে বললো বটে কিন্তু কয়েদখানার কোনও কয়েদীরই একাহিনী শুনতে আর বাকী নাই। যখনই কোনও নতুন কয়েদী আসে, বুড়ো ছলে ছুতোয় তার কাছে যাবেই এবং তার এই মহান্ কীর্তি-কলাপের কিস্‌সা তাকে শোনাবেই।

বুড়োর কাহিনী শুনতে শুনতে রাত কাবার হয়ে যায়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো উনত্রিশতম রজনী

আবার গল্প শুরু হয়:

পরদিন সকালে কয়েদখানার কোতোয়াল কামার অলকে বের করে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। যথাবিহিত কুর্নিশ করে বলে, এই

নওজোয়ান কাল রাতে এই শহরে এসে পৌঁছয়। তাই কাল আপনার দরবারে হাজির করতে পারিনি, জাঁহাপনা। সারারাত ওকে কয়েদখানায় রেখেছিলাম। আজ সকালে হুজুরের সামনে পেশ করছি।

বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, কী তোমার নাম? কোথা থেকে আসছো? তোমার ব্যবসাই বা কীসের। আমার শহরে কেন ঢুকতে চাও?

কামার অল বলে আমার নাম হরজা—শুদ্ধ পারসী শব্দ। পারস্য আমার দেশ। জাত-ব্যবসা হেকেমী। আমি দেশে-বিদেশে মানুষের রোগ সারিয়ে বেড়াই। এই আমার কাজ। যে-সব দুরারোগ্য ব্যাধি—বিশেষ করে মানসিক ব্যাধি অন্য কোনও হেকিম বদ্যি সারাতে পারে না তখনই আমার ডাক পড়ে। লোকে বলে আমি নাকি ধন্বন্তরী। আমার হাতে রুগী সারেনি—এমন একটাও হয়নি। আমার নিজের গুণ-কীর্তন আমি আদৌ পছন্দ করি না, জাঁহাপনা। দেশ-বিদেশের সুলতান বাদশাহরা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে যে-সব মোহর ফলক উপহার দিয়েছেন সেগুলোর মালা করে গলায় ঝোলাবার সাধ্য আমার নাই। তার ওজনের ভারে আমি চলতেই পারবো না। আর তাছাড়া ওসব ভড়ং আমার পছন্দও নয়। আমাকে দুনিয়া সুদ্ধু মানুষ চেনে। খাতির করে। ওসব গলায় পরে সং সেজে কী হবে? আমি কোনও মন্তর-তন্তর পড়ে রোগ সারাই না। স্রেফ দাওয়াই দিয়েই সারিয়ে তুলি। অনেকে আছে ঝাড়ফুঁক করে, রোগীর বুকে পীঠে মুখে কীল চড় থাপ্পড় ঘুষি চালায়, চুল কান ধরে টানা হেঁচড়া করে। কিন্তু আমার ওই ফেরেব-বাজীর ব্যবসা নয়। রোগী দেখবো। রোগ ধরবো। দাওয়াই দেব। সেরে যাবে। ব্যস্, আমার ইনাম নিয়ে আমি ঘরে ফিরে যাবো। আর যদি না সারাতে পারি, একটি পয়সা নেব না। নাকে খত দিয়ে বিদেয় হবো। বান্দার এই পরিচয়, জাঁহাপনা।

বাদশাহ বাহবা দিলেন, বহুত বড়িয়া বাত! চমৎকার। তুমি যথা-সময়েই এসে পড়েছো আমার কাছে। ঠিক এই রকম একজনকেই আমি খুঁজছিলাম, হেকিম।

এরপর বাদশাহ তার বেড়াতে যাওয়ার কাহিনী দিয়ে শুরু করে বৃদ্ধকে কয়েদ করা পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বললো কামার অলকে। তারপর. মেয়েটির মাথার গোলমাল শুরু হলে, কোন্ হাকিমকে দিয়ে কবে কবে দেখিয়েছিলেন তারও লম্বা ফিরিস্তি দেন।

—এখন তুমি যদি সত্যিই তাকে সারিয়ে তুলতে পার, তোমার কোনও ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখবো না হেকিম। যা চাইবে তাই পাবে। আমার কী মনে হয় জান, মেয়েটির রূপে পাগল হয়ে কোনও একটা জিন বা আফ্রিদি তার কাঁধে ভর করে আছে।

কামার অল বলে, আল্লাহর অপার করুণা বর্ষিত হোক; এখন আমাকে রোগের লক্ষণ-গুলো ঠিক ঠিক বলুন তো, জাঁহাপনা। কী কী উপসর্গ তার দেখেছেন? এবং কবে থেকে এরকমটা হচ্ছে।

—হচ্ছে সেই প্রথম দিন থেকেই। যেদিন তাকে আর সেই যাদুকর

বুড়োটাকে এবং সেই আবলুস কাঠের ঘোড়াটাকে নিয়ে এলাম সেইদিন থেকেই সে অসুখে পড়ে।

কামার অল জিজ্ঞেস করে, সেই বুড়োটা এখন কোথায়?

—তাকে আমি এখনও কয়েদখানাতেই রেখে দিয়েছি।

—আর সেই ঘোড়াটা?

—ওটা আছে আমার খাজাঞ্চীখানায়। অমন মহামূল্য সম্পত্তি তো আর বাইরে রাখা যায় না।

—তাতো বটেই।

মনে মনে ঠিক করলো, সবকিছু করার আগে আর একবার ঘোড়াটাকে স্বচক্ষে দেখে নিতে হবে। বলা যায় না, বুড়ো শয়তানটা কোনও কারসাজী করে রেখেছে কিনা। যদি দেখি, ঘোড়াটা ঠিক আছে, তা হলে আমার বাজী মাৎ করতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু ঘোড়াটা যদি কোনক্রমে বিকল হয়ে থাকে, তা হলে সামস্‌কে উদ্ধার করার অন্য উপায় বের করতে হবে। বাদশাহর দিকে ফিরে কামার অল বলে, আগে আমি ঐ ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। হয়তো রোগের আসল কারণ ওর মধ্যেই নিহিত আছে।

বাদশাহ বললেন, বেশ তো, এ আর এমন কি কথা, এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি।

কামার অলকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ খাজাঞ্চীখানায় চলে আসেন। কামার অল এক এক করে সব বোতাম যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখে নেয়। না, ঠিক আছে। কামার অল খুশিতে নেচে ওঠে।

—আমার মনে হচ্ছে এই ঘোড়া থেকেই তার রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। যাক, এবার আমি রুগীকে দেখবো! আমার বিশ্বাস, রোগ আমি ধরতে পেরেছি। দাওয়াই আমি নিজে হাতেই বানাবো। কিন্তু তার জন্যে রুগীর সঙ্গে এই ঘোড়াটাকে আমার দরকার হতে পারে জাঁহাপনা।

বাদশাহ কামার অলকে নিয়ে সামস্‌ অল নাহারের শয্যাকক্ষে আসেন। সামস্‌ অল, কামার অলকে লক্ষ্য করে, তাদের দেখামাত্র তার পরণের সাজ-পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে থাকলো। কখনও বা হা হা হি হি করে হাসতে লাগল, আলুথালু চুল, অসংবৃত বেশবাস। কখনও সে হাততালি দেয়, গান গায়। আবার কখনও বা কপাল বুক চাপড়াতে থাকে।

কামার অল বুঝলো, এ-সবই তার চালাকী। কী করে সুলতানকে সেখান থেকে সরানো যায় তারই কায়দা খুঁজতে থাকে সে।

কামার অল সামসের কাছে এগিয়ে যায়। খুব ধীরে ধীরে বলে, দিন দুনিয়ার মালিক যিনি তারই দোয়ায় আপনার সব রোগ সেরে যাবে।

কামার অল-এর কথা শেষ হতেই সামস্‌ তার মুখের দিকে ফিরে তাকায়। বুকের মধ্যে এক অসহ্য আনন্দের জোয়ার ঠেলে উঠতে চায়, কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারে না। হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে মেজেয় লুটিয়ে পড়ে যায়।

বাদশাহ ভাবলেন, হেকিম বদ্যিদের সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে তার। কোনও মানুষকেই সে বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে হেকিমদের

একেবারে না। কামার অল সামস অলকে ওঠাবার চেষ্টা করে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, সামস্ অল নাহার, আমার চোখের মণি, সোনা, ওঠো, এইভাবে জীবনটাকে বরবাদ করে দিও না। আমার দিকে চোখ মেলে তাকাও। দেখ, আমি এসেছি। আর তোমার ভাবনা কী। এতদিন কষ্ট করে আছ, আর দু একটা দিন কষ্ট করে কাটাও, আমি তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবোই, সোনা। এখন খুব সাবধানে—সতর্কভাবে চলতে হবে আমাদের। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কোনও রকম সন্দেহ না করে। অনেক ধৈর্য ধরে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ হাসিল করতে হবে। চালে একটু ভুল হলেই সব মাটি হয়ে যাবে। তা হলে আমি আর জান নিয়ে ফিরতে পারবো না। যদি আমরা এই নারী-মাংস-লোভী অত্যাচারী বাদশাহর মনে একবার গভীর আস্থা এনে দিতে পারি, তা হলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। এজন্যে তোমার সাহায্য সবচেয়ে বেশি দরকার। বাদশাহ পাশের ঘরেই বসে আছেন, আমি তাকে গিয়ে বলছি তোমাকে জিনে ধরেছে। সেই কারণেই তোমার মধ্যে একটা উন্মাদের ভাব দেখা গেছে। এবং এও তাকে আমি আশ্বাস দেবো, আমার চিকিৎসায় থাকলে ও নির্ঘাৎ সেরে যাবে। তুমিও—এরপর যখন বাদশাহর সঙ্গে কথা বলবে, অপেক্ষাকৃত একটু শান্তভাবে, সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো বলবে। এর ফলে বাদশাহ ভাববেন আমার চিকিৎসাতে অনেকটা ফল হয়েছে।

সামস্ অল নাহার মৃদু হেসে বলে, ঠিক আছে, দেখো কেমন পাকা অভিনয় করি। এতদিন যে পাগলী সেজে ছিলাম, কেউ কি এক বিন্দু সন্দেহ করতে পেরেছে ?

শাহজাদা কামার অল পাশের ঘরে এসে বাদশাহকে বলে, জাঁহাপনা আমি একেবারে নিঃসন্দেহ, ওকে জিনে ধরেছে। আল্লাহ অনেক মেহেরবান, যথাসময়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি। আর যদি ক'টা দিন দেরি হতো, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেত সে। তবে আমি যখন এসে পড়েছি, আর কোনও ভয় নাই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারেন, শাহজাদীকে আমি নির্মূল করে সারিয়ে দেবো। আমি একটা দাওয়াই তাকে দিয়ে এলাম। ফল হাতে হাতেই বুঝবেন। যান, ও-ঘরে যান, নিজের চোখেই দেখে আসুন, ওর সঙ্গে কথা বলুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন, কতটা উপকার হয়েছে।

বাদশাহ অবাক হয়, বল কী হেকিম ? তোমার ওষুধের এত গুণ ?

—আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আপনার মনের ইচ্ছা তার কাছে খুলে ধরুন। দেখবেন সে কী জবাব দেয়।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাদশাহ পাশের ঘরে ঢোকেন। বাদশাহকে দেখা মাত্র সামস্ অল নাহার যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

—বাঁদীকে যে এই অসময়ে স্মরণ করেছেন, এ জন্য আমি ধন্য হলাম, জাঁহাপনা।

রাত্রির অন্ধকার কাটে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তিরিশতম রজনী

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

হঠাৎ তার এই অসাধারণ পরিবর্তন দেখে বাদশাহর আনন্দ আর ধরে না। দাসী বাঁদী খোজাদের ডেকে তিনি হুকুম করেন ; শিগ্গির—ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে ভালো করে ঘষে মেজে গোসল করাও। খুব জমকালো সাজপোশাকে সাজাও। আমার প্রাসাদের খানদানী রত্নাভরণে মুড়ে দাও ওর সর্বাঙ্গ।

দাসী বাঁদী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়। সামস্ও তাদের কথার যথারীতি জবাব দেয়। ওরা ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসল করিয়ে সুন্দর করে পরীর সাজে সাজায়। সত্যিই রূপের তুলনা মেলা ভার। বেহেস্তের ডানাকাটা পরীই বটে!

শাহজাদা কামার অলের প্রতি বাদশাহ অপরিসীম প্রসন্ন হয়ে ওঠেন।

—তোমাকে কী বলে সম্বোধন করবো বুঝতে পারছি না হেকিম। তুমি সামান্য এক চিকিৎসক নও, তোমার ভিতরে যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে তা কেবলমাত্র পীর পয়গম্বরদেরই থাকতে পারে। তুমি এক বিরাট দার্শনিক—একথা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। অনেকদিন পরে আজ আমার এবং তার মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছে সে তো শুধু তোমারই কল্যাণে। আল্লাহ তোমাকে চিরায়ু করে রাখুন। দুনিয়ার অনেক মানুষের দুঃখ মোচন করতে পারবে তুমি।

কামার অল বললো, জাঁহাপনা আপনি আর দেরি করবেন না। লোক লস্কর দাস দাসীসহ শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে আপনি আজই কোনও স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশে চলুন। সেখানেই আমি চিকিৎসার শেষ পর্ব শুরু করবো। ঐ কাঠের ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিতে হবে। ওটা আসলে কিন্তু কাঠের ঘোড়া নয়, রোগের আসল উৎপত্তিই ওখানে। ওই হচ্ছে জীনের বাহন। এ অবস্থায় এখানে এই প্রাসাদে থেকে ঐ জীনকে একেবারে তাড়ানো শক্ত হবে। আপাততঃ সে হয়তো শাহজাদীকে ছেড়ে প্রাসাদের কোনও কক্ষে লুকিয়ে থাকবে। তারপর আমি ফিরে এলেই আবার এসে ভর করবে তার ওপর। সেই কারণে আমার পরামর্শ, ঘোড়াটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। ফাঁকা জায়গায় তাকে আমি কব্জায় আনতে পারবো। হয়তো কিছু সময় লাগবে, কিন্তু আমি যখন তাকে পুরোপুরি হাতের মুঠোয় আনতে পারবো তখনই তাকে জালার মধ্যে পুরে দরিয়ার জলে ফেলে দেবো।

রুম অধিপতি সেইদিনই রওনা হয়ে গেলেন। অনেক লোকলস্কর দাসদাসী সঙ্গে নিলেন। কামার অল-এর কথামতো কাঠের ঘোড়াটাও বয়ে নিয়ে চললো বাহকরা।

এক পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম পরিবেশে তাঁবু ফেলা হলো ! কামার অল বাদশাহকে বললো, কাল সকালে আমি শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চাপবো। জীনের সঙ্গে তখনই হবে আমার বোঝাপড়া। সে আমাকে খতম করার কায়দা করবে। কিন্তু আমাকে ঘায়েল করার সাধ্য জীনের হবে না। প্রথমে খুব দাপাদাপি করবে, কিন্তু আমি তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরবো, কিছুতেই পালাতে পারবে না। একটা কথা, জাঁহাপনা, আপনি বা আপনার সৈন্যসামন্ত, লোকজন কেউ যেন ওই জীনের নজরবন্দীর আওতায় যাবেন না। তা হলে সে হয়তো তখন শাহজাদীকে ছেড়ে আপনাকে অথবা অন্য কাউকে ভর করতে পারে। আমি যখন ওকে পুরোপুরি ভাবে কব্জায় আনতে পারবো, তখন আপনাকে কাছে ডাকবো। তার আগে—আপনারা অনেকটা দূরে দূরে থাকবেন।

বাদশাহ বললো, কতটা দূরে কোথায় আমরা থাকবো, তুমি বলে দেবে। তার এক পা এদিক ওদিক যাবো না কেউ।

পরদিন সকালে তাঁবু থেকে ক্রোশখানেক দূরে কাঠের ঘোড়াটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কামার অল একটা জায়গা দেখিয়ে বাদশাহকে বললো, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। আপনার সৈন্যসামন্ত লোকজনদের বলুন, তারা যেন এখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে না যায়। আমি শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়াটার কাছে যাচ্ছি। শাহজাদীকে দেখে জীনটা হয়তো খানিকটা বেগড়বাই করতে পারে। হয়তো সে ছুটে এসে আপনার সেনাদেরও ঘায়েল করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। আমি ওকে সামলে নেব।

বাদশাহর বুক দুরু দুরু করতে থাকে। যদি জীনটা হেকিমকে হারিয়ে দিয়ে ওকে মেরে ফেলে! তা হলে তো সে আর শাহজাদীকে ছেড়ে যাবে না! আবার এও ভাবে, হেকিমের যা হিম্মৎ—তার সঙ্গে জীনটা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না। নির্ঘাৎ সে ঐ জীনটার জান খতম করতে পারবে।

অনেক দূরে একটা ফাঁকা প্রান্তরে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কামার অল আর শাহজাদী হাঁটতে হাঁটতে একসময় তার কাছে এসে দাঁড়ালো। কামার অল দেখে নিল, সেখান থেকে বাদশাহ আর তার সৈন্যবাহিনীকে দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নজর করলে তবে বোঝা যায় অনেক দূরে একদল মানুষ নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কামার অল প্রথমে সামস্ অলকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিল, তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে তার সামনে বসলো।

—সামস্ অল, আমার বগলের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আমার কাঁধ দুখানা বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকো। আমি এক্ষুনি বোতাম টিপবো।

সামস্ বলে, ঠিক আছে, তুমি চালাও।

তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটা একবার নড়ে চড়ে ওঠে। তারপর শোঁ শোঁ করে আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকে।

বাদশাহ দূর থেকে আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিল, ঘোড়াটা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। তখনও তাঁর মনে অণুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। হেকিমের ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা তাঁর। তিনি ভাবলেন, জীন হয়তো তাকে ঘায়েল করার কসরৎ করছে। কিন্তু সে তো পারবে না, এখুনি হেকিম তাকে শায়েস্তা করে ফেলবে।

ঘোড়াটা ততক্ষণে মহাশূন্যে সুদূর নীলিমায় বিলীন হয়ে গেছে। আর কিছুই দেখা যায় না। তখনও বাদশাহ ভাবলেন, হেকিম নিশ্চয়ই এখনই তাকে আবার মাটিতে এনে ফেলবে।

প্রধান সেনাপতি বললো, কিন্তু ফেরার তো কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, জাঁহাপনা।

বাদশাহ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন, সবুর কর সেনাপতি, এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে। এখুনি বাছাধন জীনের কী দশা হয়, দেখতে পাবে। ওখানে যে পেল্লাই একটা তামার জালা দেখছো, ঐ জালায় তাকে ভরা হবে।

কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর এবং দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো, তখনও ঘোড়াটা ফিরে এল না দেখে বাদশাহ চিন্তিত হলেন।

— তাইতো, ব্যাপারটা স্থবিধের মনে হচ্ছে না !

সেনপাতি বললো, আমার কিন্তু গোড়া থেকেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল, জাঁহাপনা। কিন্তু আপনার মুখের সামনে সাহস করে বলতে পারিনি তখন। এই হেকিম লোকটা আসলে একটা ঠগ। ও আপনাকে ধোঁকা দিয়ে শাহজাদীকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

বাদশাহ আঁৎকে উঠলেন, এ্যাঁ, বল কী ? এখন কী করা যায়।

সেনাপতি বলে, এখন হা-হুতাশ ছাড়া করার আর কিছুই নাই, জাঁহাপনা। পাখী পালিয়েছে।

বাদশাহ ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, এ সবই সেই কদাকার বুড়োটার কারসাজী। গর্জে উঠলেন তিনি, ওই শয়তানটাকে পাকড়াও করে নিয়ে এস আমার সামনে।

তখুনি বাদশাহ প্রাসাদে ফিরে গেলেন। বুড়ো যাদুকরকে হাজির করা হলো সেখানে। বাদশাহ হুংকার ছাড়লেন, এ্যাই ব্যাটা বাঁদর, বল, কেন তুই আমার কাছে গোপন করে রেখেছিস্—ঘোড়াটা আসলে একটা জীন ? হায় হায়, হেকিমটা শাহজাদীকে সারিয়ে তুললো, কিন্তু তা আর আমার কপালে জুটলো না। না-জানি ওদের কী হলো ? আমার অতগুলো মহা মূল্যবান রত্নালংকার পরিয়েছিলাম শাহজাদীকে—সবই খোয়া গেল শুধু তোর জন্য ? আমি তোর গর্দান নেব, শয়তান। সেই তোর উপযুক্ত সাজা।

বাদশাহর হুকুমে তখুনি ঘাতকের খাড়ার ঘায়ে পারসী যাদুকরের ধড় মুণ্ডু আলাদা হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

এবার কামার অল আর সামস্ অল-এর কথা শুনুন ঃ

বোতাম টিপতেই নিমেষে ঘোড়াটা আকাশের ওপরে উঠে গেল। কামার অল আর একটা বোতাম টিপে তীরবেগে চলে এল পারস্যে তার নিজের শহরের উপরে। তারপর নেমে পড়লো তার প্রাসাদের ছাদে।

পুত্রকে আবার ফিরে পেয়ে বাদশাহ সব শোক তাপ ভুলে গেলেন। আবার প্রাসাদ ভরে উঠলো হাসি আর গানে। সানার শাহজাদী সামস্ অল নাহারকে সাদরে তিনি বরণ করে নিলেন। খানা-পিনা দান-ধ্যানের মহোৎসব আরম্ভ হয়ে গেল।

ভবিষ্যতে আর যাতে মনের শান্তি ব্যাহত না হতে পারে সেজন্য বাদশাহ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুম দিয়ে সেই আবলুস কাঠের কালো ঘোড়াটাকে ভেংগে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তার কলকব্জা যন্ত্রপাতি সব দরিয়ার জলে ফেলে দেওয়া হলো।

প্রভাত আগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বত্রিশতম রজনীতে

আবার সে শুরু করলো ঃ

কামার অল সানার সুলতানকে একখানা খৎ লিখে পাঠালো। চিঠিতে তার দুঃসাহসিক অভিযানের সব কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলো সে। আরও লিখলো শাহজাদী সামস্ অল নাহারকে সে শাদী করে তার বেগম করেছে। পারস্যের ভাবী বাদশাহ সে। তাঁর কন্যা পরম আদর যত্নেই তার কাছে থাকবে। তিনি যেন কোনও দুশ্চিন্তা না করেন। চিঠির সংগে নানা মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সংগে দিয়ে দূত পাঠালো সে সানায়।

সানার সুলতান কন্যার খবর পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কামার অল-এর পাঠানো উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে জামাতাকেও অনুরূপ উপহার পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

কামার অল-এর মনে আশংকা ছিল, হয়তো সামস্ অলের বাবা তাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন না। হয়তো তিনি তার উপহার প্রত্যাখ্যান করে ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু দূত যখন ফিরে বললো, তিনি খুব খুশি হয়েছেন তখন কামার অল এবং সামস্-এর মন আনন্দে নেচে উঠলো।

সেই থেকে যতদিন সানার সুলতান জীবিত ছিলেন ফি বছর নানা নতুন নতুন উপহার উপঢৌকন পাঠিয়েছিল কামার অল। তার বাবা বাদশাহ একদিন দেহ রাখলেন। কামার অল সারা পারস্য মুলুকের শাহেনশাহ হলো। সানার নতুন সুলতানের সংগে ছোট বোনের শাদী দিয়ে দিয়েছিল কামার অল আকমর।

কামার অল-এর শাসনকালে প্রজারা সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটিয়েছিল। তার

ন্যায় বিচার এবং সুশাসন প্রজাদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল। বাদশাহ কামার অলকে তারা প্রাণাধিক ভালোবেসেছিল। এইভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিপুল গৌরবে স্বদেশ রক্ষা এবং প্রজাপালন করে সময় কালে সে দেহ রক্ষা করেছিল। তার প্রাণাধিক প্রিয় বেগম সামস্ অল নাহারেরও ইন্তেকাল হলে, তার মরদেহও কামার অল আকমরের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়েছিল।

শাহেন শাহ কামার অল আকমরের গুণগাথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। মহৎ মানুষের কখনই বিনাশ হয় না। মরেও সে মানুষের অন্তরে অমর হয়ে থাকে।

উজির-কন্যা শাহরাজাদ কাহিনী শেষ করে থামলে, সুলতান শাহরিয়ার তারিফ করে বললো, দারুণ কিস্সা শোনালে শাহরাজাদ! কালো কাঠের অদ্ভুত ঐ ঘোড়াটাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। জানতে ইচ্ছে করে, কী ভাবে তৈরি করা হয়েছিল তাকে। আজকের দিনে কী এমন কোনও কারিগর নাই, যে তৈরি করে দিতে পারে ঐ রকম একটা উড়ন্ত-যান।

শাহরাজাদ বলে, ঘোড়াটা যদি না ভেঙে দিতেন বাদশাহ সাবুর তা হলে আমার মনে হয়, আজকের মানুষ ওটা দেখে আরও অনেক উড়ন্ত ঘোড়া তৈরি করতে পারতো। কিন্তু তার আর আশা নাই।

হতাশ কণ্ঠে শাহরিয়ার বলে, ঘোড়াটা যখন বাদশাহ সাবুর ভেঙে চুরমার করে দিলেন, বড় আঘাত পেয়েছিলাম মনে। সেই থেকে বড্ড খারাপ লাগছে।

শাহরাজাদ বলে, আপনার খোস-মেজাজ যাতে আবার ফিরে আসে তার জন্যে এবারে একটা অন্য ধরনের মজার কিস্সা শুনুন, জাঁহাপনা। এ কাহিনী শুনতে শুনতে এমনি নেশায় মশগুল হয়ে যাবেন আপনি যে, মনে আর কোনও আক্ষেপ হতাশা থাকবে না।

ডিলাইলাহ নামে এক ধূর্ত বুড়ি আর জাইনাব নামে এক মেয়েছেলের ঠগের কাহিনী।

শাহরিয়ার বলে, বল বল, শুনি। এই সব কিস্সা শুনতে আমার দারুণ মজা লাগে।

খলিফা হারুন অল রসিদের সময়ে বাগদাদ শহরে আহমদ এবং হাসান নামে দুই মহা ধড়িবাজ চোর-কুল-শিরোমণি বাস করতো। চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা— সেই বিদ্যায় তারা দুজনেই মহা ওস্তাদ। তাদের কায়দা কৌশল বড়ই বিচিত্র; অদ্ভুত। চুরি করার নিত্য নতুন অভিনব ফন্দী তাদের মাথায় গজাতো।

তাদের লোক ঠকানো, প্রতারণা, জালিয়াতির বহু বিচিত্র কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে—আজও।

খলিফা ভাবলেন, এই চোর দুটোকে কিছুতেই হাতে-নাতে ধরা যাচ্ছে না। এমনই তাদের কায়দা কৌশল এবং প্রখর বুদ্ধি যে, আইনের ফাঁক দিয়ে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যায় প্রতিবারই।

অবশেষে তিনি ঠিক করলেন, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। তাই, আহমদ আর হাসানকে ডেকে খলিফা তাদের দুজনকে কোতোয়ালের দুই প্রধান পদে বহাল করলেন। শহর রক্ষার ভার পড়লো দুই চোরের হাতে। খলিফা বললেন, আমার শহরের সব চোর বদমাইশদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি চাই আমার প্রজারা নিশ্চিন্তে ঘুমাক। তাদের বিষয় সম্পত্তি যাতে খোয়া না যায়, তার পুরো দায় তোমাদের দুজনের ওপর।

খলিফা দুজনকে মূল্যবান সাজ-পোশাক এবং প্রতিমাসে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রত্যেকের চল্লিশজন করে ঘোড়সওয়ার সিপাই এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের বরাদ্দ করা হলো। আহমদের ওপর ন্যস্ত হলো স্থলের শান্তি ও সুরক্ষার দায়িত্ব। আর হাসান পেল জল-পথের ভার।

সেইদিনই তারা দুজন কোতোয়াল খালিদকে সঙ্গে করে শহর পরিক্রমায় বের হলো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললো চল্লিশ চল্লিশ আশিটি ঘোড়সওয়ার সিপাই। কোতোয়াল পথে পথে ঘুরে ঘোষণা করলো, আজ থেকে মহামান্য খলিফার আদেশে আহমদ আর হাসানকে স্থল ও জল কোতোয়ালের দুই প্রধান পদে বহাল করেছেন। শহরবাসীরা শুনুন, আপনাদের ধন-সম্পদের নিরাপত্তার জন্য আজ থেকে এরা দুজন প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। যদি কখনও কারো কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় এদের সঙ্গে মোলাকাৎ করবেন। এরা আপনাদের সেবা করতে পারলে কৃতার্থ মনে করবেন!

এই সময়ে বাগদাদ শহরে এক ধূর্ত বুড়ী ডিলাইলাহ আর তার প্রতারক মেয়ে জাইনাব বাস করতো। ডিলাইলাহর দুটি মেয়ে। বড়টির সে শাদী দিয়েছে। কিন্তু ছোটটি বিয়ে বা শাদী কিছু করেনি। নানা ছলা-কলায় লোক ঠকানোই তার একমাত্র ব্যবসা। এই মা-মেয়ের কুখ্যাতি সারা শহরের প্রতিটি মানুষই জানতো।

ডিলাইলাহর স্বামী সে সময়ে একজন বেশ নামজাদা মানুষ ছিল। খলিফার সারা মুলুকে সে চিড়িয়া সরবরাহ করতো, এই কারণে খলিফা তাকে খুব খাতির করতেন। সে সময়ে বাগদাদের সম্ভ্রান্ত সমাজে তার বেশ নাম ডাক ছিল। কিন্তু সে সবই অতীত স্মৃতি। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব প্রতিপত্তিও মুছে যেতে দেরি হলো না। কালক্রমে মানুষ একেবারেই বিস্মৃত হলো তাকে। মরার সময় সে তার দুই কন্যা আর বিবিকে রেখে গিয়েছিল। আজ তার বিধবা বিবি ডিলাইলাহ এবং ছোট মেয়ে জাইনাব লোক ঠকিয়ে, প্রতারণা করে দিন কাটায়। জাইনাবের মতো শয়তান মেয়েছেলে খুব

কম দেখা যায়। তার শিরায় [illegible]ধ। সাপের মতো সে হিংস্র। ছলে বলে কৌশলে যেন তেন প্রকারেণ সে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করবেই করবে। যদি কারো পিছনে লাগে, তা সে যদি সাক্ষাৎ শয়তানও হয়, তার কোনও ভাবেই নিস্তার পাওয়ার জো নাই। তাকে সে সমুচিত শিক্ষা দেবেই—এই তার পণ।

কোতোয়াল যখন আহমদ আর হাসানকে নিয়ে তাদের দপ্তরের ফরমান জারি করে বেড়াচ্ছিল, সেই সময় বুড়ি ডিলাইলাহ আর তার মেয়ে জাইনাব জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করলো সব। জাইনাব বলে, জান মা এই আহমদ লোকটা কে? একটা নাম-করা দাগী আসামী। অন্য এক দেশ থেকে পালিয়ে এখানে এসে ঢুকেছে। ওর কীর্তি-কলাপ আমি সবই জানি। ওর স্বদেশ মিশর। সেখানকার কোতোয়াল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। এখানে আসার পর সে যে ধরনের চুরি, প্রতারণা জালিয়াতি চালিয়েছিল তাতে খলিফাও চিন্তায় পড়েছিলেন। হালে পানি না পেয়ে তিনি চোরকেই বহাল করেছেন চুরি রাহাজানি বন্ধ করতে। আর ঐ হাসানটা তার দোসর। ওরা দুজনে আজ খলিফার ডান হাত আর বাঁ হাত। খলিফার প্রাসাদে তাদের জন্যে এখন পাতা পড়ে। তোফা আছে বটে—চল্লিশটা করে সাগরেদ, হাজার দিনার মাসোহারা, তা ছাড়া কত কী ইনাম উপহার নিত্য জুটছে। আর আমরা কী কষ্টে কাল কাটাচ্ছি, দেখ মা। খলিফার প্রাণে এতটুকু দয়া মায়া নাই। অথচ বাবা যখন বেঁচেছিল, কি খাতির না করতেন খলিফা। বাবাকে কত ইনাম উপহার দিতেন। বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে গেছেন তিনি। অবাক দুনিয়া। এখন আমাদের কী ভাবে দিন কাটছে, খেতে পরতে পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, একটিবার খোঁজ খবরও করেন না।

বুড়ি ডিলাইলাহ মাথা দুলিয়ে বলে, খোদাতালা মাথার ওপরে আছেন। তিনি সবই দেখছেন। তবে দুনিয়াতে কৃতজ্ঞ লোকের সংখ্যা খুবই কম। এই-ই জগতের নিয়ম। এই রকমই হয়! ও নিয়ে মন খারাপ করিস না।

জাইনাব ক্ষেপে ওঠে, না মা এ সব মুখ বুজে আর বরদাস্ত করা সম্ভব না। একবার তুমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াও দেখি। তোমার ছল-চাতুরীর কাছে ওরা সব নস্যি। তোমার জালিয়াতির জাল একবার মেলে ধরো তো। খলিফার থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে হবে। এমনভাবে লোক ঠকানোর ফন্দী ফাঁদবে, যা শুনে খলিফার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে! তখন বুঝবেন তিনি, কত ধানে কত চাল। তোমার শয়তানী বুদ্ধির বহর দেখে তিনি তাজ্জব বনে যাবেন। তখন দেখে নিও, খলিফার টনক নড়বে। তোমাকেও তাঁর দরবারে ভালো চাকরীতে বহাল করতে বাধ্য হবেন তিনি।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তেত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে:

ডিলাইলাহ কন্যার কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এই আমি আমার মাথার

বেণী ধরে কসম খাচ্ছি, জাইনাব, এমন শয়তানীর চাল আমি চালবো—এক চালেই বাজী মাৎ হয়ে যাবে। বাছাধন আহমদ আর হাসান হালে পানি পাবে না।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে তখুনি সে উঠে পড়ে কাজে লেগে গেল।

এক সুফী দরবেশের মতো করে লম্বা গেরুয়ার আলখাল্লা পরলো সে। তার উপরে চাপালো একখানা জবর জং বোরখা। গলায় পরলো নানা রঙের রকমারী পুঁতির একখানা মালা। রেশমী সুতোয় বেঁধে জলে ভরে একটা বদনা ঝুলিয়ে নিল গলায়। তার মধ্যে তিনটি সোনার দিনার রেখে বদনার মুখে এক গোছা খেজুরের ছোবড়া গুঁজে দিল। নানারকম আকার এবং ওজনের অনেক-গুলো ধাতব চাকতি আর মড়ার খুলী দিয়ে গাঁথা বিদঘুটে বিচিত্র আজানু এক জগঝম্প মালা গলায় ধারণ করলো সে। তার সাকুল্যে ওজন হবে এক আঁটি জ্বালানী কাঠের সমান। যুবতীরা যে ধরনের নিশান নিয়ে চলে সেই রকম লাল হলদে আর সবুজের ডোরাকাটা একখানা নিশান নিল এক হাতে।

এই কিম্ভূত কিমাকার এক ছদ্মবেশ ধারণ করে সে পথে নামলো। জোর চিৎকার করে আওয়াজ তুলতে থাকলো, আল্লাহ—আল্লাহ। মাঝে মাঝে সে নানারকম প্রার্থনার বুলি কপচাতে থাকে। এক কথায় প্রথম দর্শনে সবাইকে আঁৎকে উঠতে হবে—এমন তাব সাজ-পোশাক, চাল-চলন এবং গলার বিচিত্র আওয়াজ।

সারাটা শহর এইভাবে সে চলতে চলতে এক সময় এক গলির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিশাল একখানা শ্বেত পাথরের ইমারত—তার সদর ফটকে সুসজ্জিত এক মুর প্রহরী। বিরাট দরজার চৌকাঠ আর পাল্লা আগাগোড়া সুগন্ধী চন্দন কাঠে তৈরি। সুন্দর সুন্দর নানারকম কাজ করা পিতলের বলয় বসানো। বড় বাহারী দেখতে।

বাড়িখানা খলিফার দেহরক্ষী মুসতাফার। লোকটা ভীষণ ভয়ংকর। লোকে বলে বাঘ। কথার আগে তার ঘুষি চলে। একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে শাদী করে সুখে দিন কাটাচ্ছে। নিজের ঘরের বিবি ছাড়া পর-নারীর দিকে তার কদাচ নজর নাই। কোনও দিনই সে বাড়ির বাইরে রাত কাটায় না। কিন্তু তার এমনই নসীব, রোজ রাতে বিবির সঙ্গে সহবাস করেও এযাবৎ একটা সন্তান পয়দা করতে পারেনি সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মাথার সাদা চুলের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। দিনে দিনে বয়স বাড়ছে। বুড়ো হতে আর বেশি দেরি নাই। অথচ আজও তার একটি ছেলেপুলে কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ কি তাকে এই রকম নিঃসন্তান করেই রাখবেন? মনটা কেমন যেন বিষিয়ে ওঠে। এই সময় তার বিবি এসে দাঁড়ায় সামনে। এক সময়ে প্রাণের-পিয়ারী এই বাঁজা মেয়েমানুষটাকে দেখে আজকাল তার পিত্ত জ্বলে যায়। তার ধারণা তারই দোষে সে আজ সন্তান-সুখ বঞ্চিত। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঝাঁঝালো গলায় চিৎকার করে ওঠে, এখানে কী? কেন এসেছিস্ আমার সামনে, হতচ্ছাড়ী অপয়া কোথাকার! যেদিন থেকে তুই আমার ঘরে

এসেছিস সেইদিন থেকে আমার সব সুখ শান্তি উবে গেছে। যা ভাগ, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, সে কি আমার দোষে ?

—আলবৎ তোর দোষে। প্রথম শাদীর রাতে, মনে পড়ে ? আমাকে দিয়ে হলফ করিয়ে নিয়েছিলি, জীবনে আমি যেন অন্য মেয়েকে ঘরে না আনি, মনে পড়ে ? আমি তো আমার কথা রেখেছি। কিন্তু তাতে লাভটা কী হলো ? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকতে বসেছে, আজ পর্যন্ত একটা বাচ্চা বিয়োতে পারলি না! দরবারের যত দেওয়ান আমির সবাইকেই দেখছি—কী সুন্দর সুন্দর ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছে তারা। আমি আমি ? দুনিয়ার অযাত্রা একটা অপুত্রক হয়ে হা-হুতাশ করে মরছি। এ সংসারে যে বংশরক্ষা করে যেতে পারে না সে তো সমাজের পতিত ঘৃণ্য জীব। আমাকে সেই অখ্যাতি মাথায় বয়ে বাঁচতে হচ্ছে। এর চাইতে জহর খেয়ে মরাও অনেক ভালো। দুঃখ বল আর রাগই বল, সবই আমার শুধু এই একটা কারণে। তুই একটা বাঁজা-বেহদ্দ মেয়েমানুষ ; আমার সারা জীবনের বীর্যপাতই বিফলে গেল।

স্বামীর এই ধরনের দোষারোপে মুহূর্তে মধ্যে মুখ নীলবর্ণ হয়ে গেল তার।

—মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। আমার একবিন্দু দোষ নাই। সন্তান ধারণের সব ক্ষমতাই আমার আছে। আসলে তোমারই মরা বীর্য।

মুসতাফা বলে, ঠিক আছে, প্রমাণ আমি করে দিচ্ছি। আজই আমি আর একটা শাদী করে ঘরে অন্য এক মেয়েছেলে নিয়ে আসছি। তারপর যথাসময়ে প্রমাণ করে দেবো, আমার বীর্য মরা, না জ্যান্ত।

বৌটা বললো, আমার নসীবে যা লেখা আছে তা তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না। সতীনের সংগে যদি ঘর করা কপালে থাকে, তাই হবে।

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সে সে-ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু মুসতাফা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকলো সে। বারবার মনে হতে লাগলো, মানুষটাকে অত শক্ত শক্ত কথা না বললেই বুঝি ভালো হতো।

এতক্ষণ আপনারা বাড়িটার ভিতরের কিছু ঘটনা শুনলেন। এবার শুনুন, ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহর কথা।

ডিলাইলাহ জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল আমীরের বিবি বিষণ্ণ বদনে বসে বসে কী যেন চিন্তা করছে। তার গা ভর্তি গহনা ; পরণে মূল্যবান

সাজপোশাক। ডিলাইলাহ আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখে নেয়। নিজের মনে মনেই বলে, শোন ও ডিলাইলাহ, এই তোমার সুবর্ণ সুযোগ। এবার . তোমার ঝুলি থেকে বুদ্ধির প্যাঁচ-পয়জার বের করে কাজে লাগাও। মেয়েটাকে ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে গিয়ে তার গায়ের গহনাপত্র এবং সাজ-পোশাক যদি তুমি খুলে নিতে পারো তবেই বুঝবো তোমার কেরামতি।

ডিলাইলাহ হঠাৎ উচ্চৈস্বরে আল্লাহ—আল্লাহ করতে থাকে। আশে-পাশের বাড়ির জানলার পর্দা সরে যায়। বাড়ির মেয়েরা উৎসুক হয়ে দেখতে থাকে। এক সুফী দরবেশ এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বুড়ির দোয়া মাগে।

মুসতাফার বিবি ভাবে, আল্লাহ বুঝি মুখ তুলে চেয়েছেন. তাই বোধহয় তিনি আমারই জন্য একে এখানে পাঠিয়েছেন। একটা বাঁদীকে ডেকে বলে, যা তো দরজার পাহারাদার আবু আলীকে একটু তোয়াজ করে বল গিয়ে যে. আমি ঐ বুড়ি মার সংগে একটু কথা বলতে চাই! সে যেন মেহেরবানী করে তাঁকে ভিতরে আসতে দেয় একবার। আমি তার দোয়া নেবো।

বাঁদীটা ছুটে আসে পাহারাদার আবু আলীর কাছে। বলে, ও আবু আলী ভাই. মালকিন খাতুন আপনাকে অনুরোধ করছেন, এই বুড়ি মাকে যদি তুমি একটিবারের জন্য ভিতরে ঢুকতে দাও। তিনি তার আশীর্বাদ নিতে চান।

দ্বাররক্ষী আবু আলী বুড়ির কাছে গিয়ে তার হাতে চুম্বন করতে যায়। কিন্তু বুড়ি নাক সিটকে দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, আমাকে ছুঁয়ো না। ঠিক মতো রুজু করে নামাজ করো না তুমি। তফাৎ যাও—আল্লাহ যেন তোমাকে এই গোলামী থেকে মুক্তি দেন, এই প্রার্থনা করি। তফাৎ যাও—। তবে শোন ও আবু আলী, তুমি আল্লাহর সুপুত্র। আজ নসীবের ফেরে তোমাকে এই খারাপ কাজ করতে হচ্ছে। তুমি সদাই তার নামগান কর। দেখবে, সব দুঃখ ঘুচে যাবে। মনে শান্তি পাবে।

আবু আলী হাত পেতে বললো, মা জননী, আপনার ঐ পানি আমাকে একটুখানি দিন।

বুড়িটা বদনার মুখ থেকে খেজুরের ছোবড়াগুলো টেনে বের করে। হঠাৎ ঝন ঝন আওয়াজ তুলে সেই দিনার তিনখানা নিচে পড়ে যায়। এমন একটা ভাব দেখালো সে, যেন আল্লাহর আশীর্বাদে—আসমান থেকে পড়লো।

তাড়াতাড়ি আবু আলী দিনারগুলো কুড়িয়ে তুলে ভাবে, এ তো যে সে পীর নয়। একেবারে সাক্ষাৎ আল্লাহর দূত। কে জানে কী অলৌকিক ক্ষমতা-ধারিণী সে। আবু আলী দিনার তিনটে ফেরৎ দিতে যায়. এই নিন মা, আপনার হাত থেকে বোধ হয়ে পড়ে গেল।

—পয়সা? পয়সা কড়ি নিয়ে কী করবো আমি? এই সব তুচ্ছ পার্থিব সম্পদে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, বাছা। ওতে আমার মন ভরে না। আমি চাই এমন অমূল্য বস্তু, যা পয়সা কড়ি দিয়ে কেনা যায় না। তার নাম খোদাতালার মহব্বৎ। ওগুলো তোমার কাছেই রেখে দাও, কাজে লাগবে।

আবু আলী মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সব যেন কেমন গোল পাকিয়ে যায়।

খাতুনের বাঁদী ডিলাইলাহকে পথ দেখিয়ে বাড়ির অন্দরে নিয়ে যায়। বুড়ি দেখে অবাক হয়। এমন রূপবতী নারী সে কমই দেখেছে। খাতুন সত্যিই অসামান্যা সুন্দরী।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চৌত্রিশতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু করে:

সুন্দরী খাতুন বুড়ির পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

বুড়ি বলে, আহা, যাট বাছা, উঠে বসো। আল্লাহ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে, আমাকে তোমার দরকার। কিছু বলবে?

খাতুন বুড়িকে খুশি করবে কি ভাবে ভেবে পায় না। শরবৎ, ফল এনে সামনে ধরে। কিন্তু বুড়ি বলে, আমি তো কিছু খাবো না বাছা। আমার রোজা চলছে! সারা বছর ধরে চলে আমার রোজা। মাত্র পাঁচটা দিন বাদে। ও সব থাক, এখন বল মা, কী তোমার দুঃখ। কী তুমি আমাকে বলতে চাও, নির্ভয়ে বল। আমি তাঁর নির্দেশেই তোমার কাছে এসেছি। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার দুঃখ মোচন করতে।

খাতুন বলতে থাকে, শাদীর প্রথম রাতে আমি আমার স্বামীকে শপথ করিয়েছিলাম, জীবনে সে আর দ্বিতীয় বিবি ঘরে আনবে না। আজ পর্যন্ত কথার খেলাপ সে করেনি। আমরাও যথারীতি প্রতি রাত্রে সহবাস করে আসছি। কিন্তু খোদা মুখ তুলে চাইলেন না। আমাদের কোনও বাল-বাচ্চা হলো না। আমার স্বামী দারুণ দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। অন্য পাঁচজনের ছেলেপুলে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না। আজ আমাকে সাফ সে বলে দিয়েছে, অন্য একটা শাদী করবে। কিন্তু মা, আমার কী দোষ, সতীন নিয়ে ঘর করবো কী করে আমি? আমার স্বামীর ধারণা আমি বাঁজা। কিন্তু জানি আমার শরীরে কোনও খুঁত নাই। তার বীর্যেই কোনও তেজ নাই কিন্তু সে-কথা মানতে চায় না। রাগে সে আমার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ে আজ বলে গেছে, ফেরার সময় সে আর একটা মেয়েকে শাদী করে নিয়ে আসবে. তার ধারণা, তার গর্ভে সে বাচ্চা পয়দা করতে পারবে। পয়সা কড়ি ধনদৌলতের কোনও কমতি নাই আমার স্বামীর। দরবার থেকে মোটা মাইনে পায়। অনেক জমি জিরেৎ বাড়ি ঘর আছে। এখন অন্য মেয়ে ঘরে আসলে সে-ই তার মালকিন হয়ে বসবে। আমার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবো আমি। আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন মা। একটা উপায় বাৎলে দিন।

বুড়ি অভয় দিয়ে বলে, তুমি মনে কোনও ভয় রেখ না, মা। আমি কে, এবং কী আমার ক্ষমতা কিছুই তোমার জানা নাই। তবে এটা জেনে রাখ, আমি স্বয়ং আল্লার দূত। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। তোমার হাতে

কোনও দুঃখ কষ্ট না থাকে তারই ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছেন তিনি। তুমি কিছু ভেবো না, মা। আমি সব সমস্যার সুরাহা করে দেব। শুধু যা বলবো, সেই মতো তোমাকে চলতে হবে।

খাতুন বলে, আপনি যা বলবেন, মা, আমি তাই করবো। বলুন কী করতে হবে?

—এই শহরে এক পীরের দরগা আছে। আমি তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে। তোমার মনের যা কামনা বাসনা, সেখানে জানাবে তুমি। মানত করবে। তা হলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, মা। ঐ দরগার এমন মাহাত্ম্য সেখানে যে যা মানত করে তাই সে পায়। কত দীন ভিখারী ঐ পীরের দরগায় সিন্নি দিয়ে বিরাট বড়লোক হয়েছে, কতো বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয়েছে তার সীমা সংখ্যা নাই। তুমি চলো, তোমার মনের বাঞ্ছা পূরণ হবে।

খাতুন বলে কিন্তু মা, সেই যে শাদীর দিন আমি এ বাড়ির অন্দরে ঢুকেছি, আজ পর্যন্ত কোনও কারণেই বাইরে বেরোই নি। এ বাড়ির পর্দা বহুৎ কড়া। মেয়েদের বাইরে যাওয়ার কোনও নিয়ম নাই। তা সে উৎসব আনন্দের আমন্ত্রণই হোক, কিংবা শোক তাপের সঙ্গ দানের কর্তব্যই থাক, কোনও কারণেই বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি মেলে না আমার।

বুড়ি ডিলাইলাহ বলে, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাকে একটি বারের জন্য সেখানে যেতেই হবে মা। পীর তো তোমার কাছে আসবে না, দরকার হলে তোমাকেই যেতে হবে সেখানে। তোমার কোনও চিন্তা নাই, বাছা। শুধু একবার সেখানে যাবো আর ফিরে আসবো। কতটুকুই বা সময় লাগবে। তোমার স্বামী ঘরে ফেরার অনেক আগে তুমি ফিরে আসবে। কেউ জানতে পারবে না। আর এ-সব কাজ বাড়ির মরদ মানুষদের জানিয়ে কখনও করতে নাই। তাতে কোনও সুফল হয় না। আমি তোমাকে পীরের সামনে হাজির করবো। তিনি তোমাকে একবার শুধু দেখবেন। তারপর তোমার মনের বাসনা জানাবে তাকে। ব্যস, আর কোনও ব্যাপার নাই। তিনি তোমাকে দোয়া করবেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে আজ রাতেই শুদ্ধ মনে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করো। দেখবে যথাসময়ে পুত্র সন্তান লাভ করবে। সহবাসের সময় মনে মনে যা কল্পনা করবে, সেই রকম সন্তানই পাবে তুমি। যদি ছেলে চাও, ছেলেই পাবে। যদি মেয়ে কামনা কর, মেয়েই হবে। মোটকথা, মিলনের সময়, তোমার কোলে যে আসবে সেই শিশুর আদলটা মনের মধ্যে ছবির মতো করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করো। দেখবে অবিকল সেই রকম খুবসুরৎ হবে সে।

খাতুনের মনে আশার আলো জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে বাক্স প্যাটরা খুলে সবচেয়ে সুন্দর সাজপোশাক এবং দামী-দামী রত্নালঙ্কার বের করে নিজেকে পরিপাটি করে সাজায়। বাঁদীকে ডেকে বলে, আমি একটু পরে আসছি। বাড়িটা খালি রইলো, নজর রাখিস।

সদর দরজার পাহারাদার আবু আলী প্রশ্ন করলো, আপনি কোথায় যাবেন, মালকিন?

খাতুন বলে, এক ধন্বন্তরী পীরের দরগায়। এই মা আমাকে মেহেরবানী করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে গেলে বন্ধ্যা মেয়েরা পুত্রবতী হয়।

আবু আলী বলে, আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে নির্ভয়ে যান, মালকিন। ইনি মানুষের রূপ ধরে নেমে এসেছেন। আসলে ইনি সাক্ষাৎ আল্লাহর দূত। আপনার সব মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিতে পারেন ইনি। এই দেখুন, উনি আমার ওপর খুশি হয়ে এই তিনটে দিনার দিয়েছেন আমাকে। এ আমি মাথায় করে রাখবো। উনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

দুজনে রাস্তায় নেমে চলতে থাকে, চলতে চলতেই কথা হয়। বুড়ি বলে, পীর-এর এমনই মহিমা সেখানে গেলে যে তুমি শুধু সন্তানবতী হবে তাই নয়, তোমার সঙ্গে তোমার স্বামীর আর কোনও ঝগড়া বিবাদ হবে না কখনও। তার বদলে সে তোমাকে মাথায় করে রাখবে। ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে।

খাতুন বলে, তাঁর চরণে মাথা রাখার জন্যে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে, মা। আর কতদূর যেতে হবে, একটু পা চালিয়ে চলুন।

চলতে চলতে ধূর্ত বুড়িটা ফন্দী আঁটতে থাকে, পথে তো বের করে এনেছি। এবার ওর গহনাপত্র কী করে হাতানো যাবে! চারপাশে এত লোকজন; জোর জবরদস্তি করে ছিনতাই করা সম্ভব হবে না। অন্য পথ দেখতে হবে।

ডিলাইলাহ এবার ফিস ফিস করে খাতুনকে বলে, তুমি আমার অনেকটা পিছনে পিছনে থাক। কারণ লোকে দেখলে নানারকম সন্দেহ করতে পারে।

খাতুনের মনে তখন একই চিন্তা। কখন সে পীরের দরগায় পৌঁছবে। কখন জানাবে তার বাসনা। সে বললো, ঠিক আছে মা, আমি দূরে দূরেই থাকছি।

একটু পরে তারা বড়বাজারে এসে পৌঁছয়। বাজারের বিখ্যাত তরুণ সওদাগর সিদি মুসিন-এর দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বুড়ির কানে আসে, সওদাগর সিদি মুসিন খাতুনের রূপে মুগ্ধ হয়ে আপন মনেই তারিফ করছে, ইয়া আল্লাহ, এ যে বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী!

বুড়ী খাতুনকে বলে, বাছা তুমি এখানে একটু দাঁড়াও তো। এই দোকানী আমার এক শিষ্য, ওর সঙ্গে দুএকটা কথা বলে আসি।

বুড়ি এসে সিদি মুসিনের দোকানে ঢোকে। খাতুন দূরে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ি জিজ্ঞেস করে, বাছা, তুমি তো সওদাগর সিদি মুসিন?

যুবক সসম্ভ্রমে বুড়িকে স্বাগত জানায়, জী হাঁ। আপনি আমাকে জানলেন কী করে?

রাত্রির শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে:

এক সদাশয় সওদাগরই তোমার কাছে পাঠিয়েছে আমাকে। ঐ যে মেয়েটিকে দেখছো, ও আমার কন্যা। ওর বাবা এককালে শহরের এক নাম-

জাদা সওদাগর ছিল। কিন্তু সে আজ নাই। মরার আগে বিষয়-আশয় যথেষ্টই রেখে গিয়েছে। আমি, দেখতে পাচ্ছ, সংসারের মায়া কাটিয়ে অনেক ওপরে চলে গেছি। এখন ঐ মেয়েই হয়েছে আমার পথের একমাত্র বাধা। নিশ্চিন্ত মনে প্রাণ-ভরে আল্লাহর সাধন ভজন করবো, তাও পারছি না। এখন তার শাদীর বয়স হয়েছে, ভাবছি তোমার মতো কোনও সুপাত্রর হাতে যদি ওকে সঁপে দিতে পারি, তবে আমি নিশ্চিন্ত হই। আল্লাহর দরবারে আমি আমার আর্জি জানিয়েছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ করলেন, তোমার কাছে আসতে। এখন দেখ, তোমার যদি পছন্দ হয় মেয়েটিকে, আমি এই দায় থেকে রেহাই পাই। অন্য কোনও ব্যাপারে চিন্তা করো না বাবা। টাকা পয়সার আমার কোন অভাব নাই। আমি আল্লাহর পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। অর্থে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। ওকে শাদী করলে, আমার যা সম্পত্তি ধনদৌলত আছে সবই পাবে তুমি। সে টাকায় এই বাজারে আরও দুখানা দোকান কিনে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। সাধারণ মানুষের কী কাম্য বাবা? পয়সা, আরাম এবং নারী। ওকে শাদী করলে সবই পাবে তুমি।

সিদি মুসিন বলে, মা, আপনার প্রথম দুটো কথা বড় চমৎকার। পয়সা এবং আরাম। এ আমি সত্যিই চাই। এবং পেয়েছিও। কিন্তু নারী সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই। আমার মা, এখন তিনি বেঁচে নেই, বলেছিলেন, বাবা, বিয়ে করে সংসারী হও। জীবনে সুখ পাবে। আমার তখন পয়সা বানাবার নেশা। মাকে বলেছিলাম, এখন না মা, আগে পয়সা রোজগার করতে দাও, তারপর ওসব ভাববো। আজ আমার পয়সা যথেষ্টই হয়েছে। কিন্তু মায়ের সাধ আমি পূরণ করতে পারিনি।

ধূর্ত বুড়ি বলে, তা হলে আর দেরি করে কী লাভ বাছা। আমাদের সঙ্গে চল, আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেখে নাও, তার শরীরে কোনও খাদখুঁত কিছু আছে কিনা। হ্যাঁ বাবা, একটা কথা, পথে চলার সময় একটু দূরে দূরে চলবে। লোকে যাতে বুঝতে না পারে, তুমি আমাদেরই সঙ্গে যাচ্ছো।

তরুণ সওদাগর সিদি মুসিনের চোখে রঙ লাগে। মনের মধ্যে বহুদিনের সুপ্ত কামনার দীপশিখা দপ করে জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে একহাজার দিনারের একটা বটুয়া জেবে পুরে উঠে দাঁড়ায়। নিজের মনেই বলে: মানুষের ভাগ্য কখন যে কী ভাবে খুলে যায় কেউ বলতে পারে না।

সওদাগর রাস্তায় নেমে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে শয়তান বুড়িটার পিছনে পিছনে চলতে থাকে। ডিলাইলাহ ভাবতে থাকে, এখন কী ভাবে জাল গুটিয়ে ওপরে ওঠান যাবে।

যেতে যেতে সে রঙের কারবারী হজ মহম্মদের দোকানের সামনে এসে পড়ে। এই হজ মহম্মদ লোকটা ভীষণ বদ। মেয়েছেলে দেখলে তার জিভে জল আসে। তা সে ছুঁড়িই হোক আর বুড়িই হোক।

খাতুনকে দেখে লোকটার চোখের তারা নেচে ওঠে। খাসা মাল!

ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহর কিছুই চোখ এড়ায় না। ভাবে, এখানেই কাজ হাসিল হবে। ওদের দুজনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সোজা সে দোকানের ভিতরে ঢুকে যায়।

—আপনার নাম হুজ মহম্মদ ?

—জী হাঁ। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

বুড়ি বলে, পারবেন না, বাবা। আমরা এ শহরের বাইরে থাকি। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে আসছি। ওই যে বাইরে ওদের দেখছেন, ওরা আমার ছেলে আর মেয়ে। এই শহরের বাইরে আমার একখানা বাড়ি আছে। বাড়িখানা আদ্যিকালের। আমার ঠাকুর্দার বাবার আমলের। একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। সব সময় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। কখন বুঝি বা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। পাড়া-পড়শীরা পরামর্শ দেন, এভাবে ও-বাড়িতে থাকা আর ঠিক না। ভালো করে মেরামত না করে ওখানে বাস করতে থাকলে কবে আত্মঘাতী হতে হবে। আমিও ভাবলাম, কথাটা ঠিক। তাই মিস্ত্রী লাগিয়েছি—বাড়িটাকে ঠিকঠাক করার জন্য। কিন্তু মুসকিলে পড়েছি এই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে। এখন উঠি কোথায় ? শহরের এতটা পথ এলাম, কোথাও কোনও খালি ডেরা নাই। তবে লোকে আপনার নাম করে বললো, আপনার কাছে গেলে আপনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই।

হুজ মহম্মদ হাসে। সে হাসি শয়তানের। বলে, লোকে আমাকে জানে তো, আমার দয়ার শরীর। কারো দুঃখ কষ্ট আমি দেখতে পারি না চোখ মেলে। কেউ কোনও বিপদে পড়ে আমার সামনে এসে একবার হাজির হলে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। আমার যত অসুবিধাই হোক একটা কিছু ব্যবস্থা আমাকে করে দিতেই হয়। ঐ যে বললাম, দয়ার শরীর, কারো দুঃখ কষ্ট চোখ মেলে দেখতে পারি না। কিন্তু মা, আমি আপনাদের রাখবো কোথায় ? এই আমার দোকান আর ওপরে আমার একটাই শোবার ঘর। তা আমি না হয় দোকানেই শোবো। কিন্তু একটা অসুবিধে দাঁড়াচ্ছে, গ্রাম থেকে চাষীরা আসে আমার কাছে নীল বিক্রী করতে। ওদের দিয়েই আমার এই রঙের কারবারটা চলে। সুতরাং তাদের একটু আদর যত্ন করতেই হয়। তাই মাঝে-মধ্যে ওরা যখন এসে আটকে যায় আমার ঐ ঘরেই রাত কাটায়। সে-ঘর যদি আপনাদের ছেড়ে দিই, তা হলে আমার চাষী-ভাইরা থাকবে কোথায় ?

বুড়ি বলে, মামলা তো মাসখানেকের। তার মধ্যে বাড়ির মেরামতীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই একটা মাসের জন্য ওপরের ঘরখানা যদি দুটো ভাগ করে একদিকে আমাদের থাকতে দেন, বড় উপকার হয়।

হুজ মহম্মদ এই তালই ভাঁজছিল।

—তা কথাটা মন্দ বলেন নি, মা। ঘরটার মাঝখান দিয়ে যদি একটা দরমার বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া যায়, তা হলে দুদিকই রক্ষা হয়। ঠিক আছে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বুড়ি বললো, আপনার চাষী-ভাইরা আপনার যেমন মেহেমান, আমাদেরও

তারা মেহেমান হয়ে যাবেন। কোনও সংকোচ করার কিছু নাই। আমরা সবাই মিলে-মিশে থাকতে পারবো। এক সঙ্গে খানাপিনা করতে পারবো, কোনও অসুবিধা হবে না।

হজ্জ মহম্মদ দেরাজ থেকে তিনটি চাবির একটা গোছা বুড়ির হাতে দিয়ে বললো, এই সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে যান। এই চাবিটা দিয়ে সামনের দরজা খুলবেন। তারপরে এই চাবিটায় খোলা যাবে বসবার ছোট্ট বৈঠকখানাটা। আর এটা দিয়ে খুলবেন শোবার ঘরখানা।

বুড়ি চাবিগুলো নিয়ে খাতুন আর সওদাগরকে সঙ্গে করে ওপরে উঠে যায়।

রাত্রির অন্ধকার হালকা হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ছত্রিশতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে :

সামনের দরজা খুলে খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে বুড়িটা ভিতরে ঢুকে যায়। সওদাগরকে চোখের ইশারায় বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে। শোবার ঘরে ঢুকে বুড়ি বলে, বেটা, এইখানে তুমি বসো। একটু পরে পীরসাহেব আসবেন। তিনি এই বাড়িরই নিচতলায় এখন নামাজ করছেন। কোনও লজ্জা সংকোচ করার ব্যাপার নাই, মা। খোদ আল্লাহর দরবারে এসে গেছ তুমি। বোরখাটা খুলে আরাম করে বসো এখানে। আমি এখুনি আসছি।

বুড়িটা আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না। বাইরে বেরিয়ে গেল।

সওদাগর বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে পাশের ছোট্ট খুপরী মতো বসার ঘরটায় নিয়ে গিয়ে বললো, এইখানে তুমি আরাম করে বসো, বাবা। আমি আমার মেয়েকে একটু বাদেই তোমার কাছে নিয়ে আসছি। নিজের চোখে তাকে বাজিয়ে দেখে নিও।

এরপর সে খাতুনের কাছে ছুটে আসে।

—পীরসাহেব এসে গেছেন, মা। এবার আমরা তাঁর দর্শন পাবো।

খাতুন আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে, আমার কী সৌভাগ্য, মা।

বুড়ি বলে, কিন্তু মা পীর সাহেব এসব জাকজমক আড়ম্বর দুচক্ষে দেখতে পারেন না। সাজগোজ, রত্ন অলঙ্কার, এসবই তার চোখের বিষ। এসব পরে তো তার দর্শন পাওয়া যাবে না। তার সামনে যেতে গেলে পার্থিব সব সম্পদ ত্যাগ করে যেতে হবে। তোমার কোনও লজ্জা করার কারণ নাই। তিনি কোনও মানুষ নন, তাঁর কাছে লজ্জা কীসের ? এক কাজ কর মা, তোমার সাজ-পোশাক গহনাপত্র সব খুলে এখানে রেখে তার কাছে যাও। আমি আছি, আমি তোমার জিনিসপত্র সব দেখবো।

খাতুন-এর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগলো না। তৎক্ষণাৎ সে একটি মাত্র রেশমী শেমিজ ছাড়া সব সাজ-পোশাক এবং গহনাপত্র পরিত্যাগ করে একেবারে

প্রায় নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো।

খাতুনের পরিত্যক্ত সাজ-পোশাক আর গহনাপত্র একটা পুঁটুলি করে বেঁধে ডিলাইলাহ বলে, আমি এ-গুলো পীরের পায়ে ঠেকিয়ে এনে এখানে রেখে দিচ্ছি। তাঁর ছোঁয়া পেলে পবিত্র হবে।

ডিলাইলাহ পুঁটুলিটা সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ির এক জায়গায় গুঁজে রেখে সে সওদাগরের কাছে যায়। ছোট্ট একটা খুপরীতে বসে বসে তখন তরুণ সওদাগর ঘামছিল। ধৈর্য আর কিছুতেই বাঁধ মানছিল না। বুড়িকে একা দেখে সে জিজ্ঞেস করে, কী হলো, মা? এত দেরি হচ্ছে কেন?

—আর বলো না, বাছা আমার নসীবের দোষ।

বুড়ি কপাল চাপড়াতে থাকে। সওদাগর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকায় কেন, কী হয়েছে?

—আর কী হয়েছে? তোমাকে বলেছিলাম না, একটু তফাৎ রেখে চলতে। কিন্তু তুমি বোধ হয় তা পারনি। কিছু লোকের সন্দেহ হয়েছে। একটু আগে তারা এসে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেল। তুমি কে, তোমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক এই সব প্রশ্ন। আমার মেয়ে সোজাসুজিই তাদের বলেছেঃ ছেলেটির সঙ্গে আমার শাদী হবে। আমার মা তাকে পছন্দ করেছেন। আমার পছন্দ অপছন্দের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তারা বললো, ঠিক আছে, শাদী হবে উত্তম কথা। কিন্তু সওদাগর ছেলেটার শরীরে যে কুষ্ঠ আছে—সে কথা কী·সে কবুল করেছে?

সত্যি কথা বলতে কি বাছা, এই কথা শুনে মেয়ে আমার কেঁদে আকুল। আমি তাকে ভরসা দিয়েছি, তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি যেমন তার কাছে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে, সেও তেমনি সব সাজপোশাক খুলে তোমার সামনে দাঁড়াবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সর্বাঙ্গ তুমি পরীক্ষা করে নেবে। যদি কোনও অসুখের দাগ দেখতে পাও, আমিই রাজি হবো না। কী বল বাবা, খারাপ বলেছি?

সওদাগর তাজ্জব বনে যায়। এমন ডাহা মিথ্যে কথা কে বলে গেল? আল্লা সাক্ষী মা, আমার দেহে কোনও রোগ নাই। আমি সব সাজপোশাক খুলে ন্যাংটা হয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন।

সিদি মুসিন উত্তেজিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বুড়ি বলে ঠিক আছে, আমি তোমাকে মেয়ের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, সে-ই নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখুক। হ্যাঁ বাবা, তোমার এই সাজপোশাক পয়সা কড়ি এখানে রেখে যাওয়া তো ঠিক হবে না। এগুলো আমি ভালো জায়গায় রেখে আসি। তুমি এখানে বসো। আমি এখুনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

ধূর্ত ডিলাইলাহ সওদাগরের সাজপোশাক এবং টাকার থলেটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সে খাতুনের সাজপোশাক এবং গহনার পুঁটুলিটাও সঙ্গে নিতে ভোলে না। রাস্তায় নেমে সে অদূরে অবস্থিত একটা মশলাপাতির দোকানে ঢুকে বলে, দোকানী আমার এই পুঁটুলি দুটো একটু রাখতো ভাই, আমি একটা গাধা ডেকে আনি।

তারপর বুড়িটা হন হন করে চলে আসে হজ মহম্মদের দোকানে। হজ মহম্মদ বুড়িকে দেখে বলে, কী গো বুড়িমা, ঘর পছন্দ হয়েছে?

—খুব হয়েছে, বাবা চমৎকার ঘর আপনার। কী বলে যে আশীর্বাদ করবো। আমি যেমনটি আশা করেছিলাম. আপনার ঘরখানা তার চেয়ে ঢের ভালো, বাবা। এখন দেখি যাই একটা কুলিটুলি পাওয়া যায় কিনা। সামান পত্রগুলো তো আনতে হবে এখানে। আমার বাড়ি থেকে ফিরে আসতে তো খানিকটা সময় লাগবে, বাবা। সেইজন্যে বলছি. এই দিনার ক'টা রাখুন. কিছু রুটি গোস্ত এনে ওদেরও খেতে দিন, আপনিও খান। আমি যাবো আর আসবো।

হজ মহম্মদ বলে, তা তো বুঝলাম, কিন্তু দোকানে তো অন্য কোনও লোক নাই মা. দোকান ফেলে আমি যাবো কী করে?

বুড়ি বলে. এখনকার দোকান-পাট তো আমার চেনা নাই. বাবা। তা হলে আমিই এনে দিয়ে যেতাম। আচ্ছা, আমি আপনার দোকান পাহারা দিচ্ছি. আপনি যান, খাবারটা নিয়ে আসুন। কতক্ষণ লাগবে?

হজ-মহম্মদ বলে একটু ভালো খাবারের দোকান খানিকটা দূরে। তবে বেশি দেরি হবে না, আপনি এখানে বসুন, আমি তাড়াতাড়িই ফিরবো।

হজ মহম্মদ আর অপেক্ষা করে না, বুড়িকে বসিয়ে, একখানা রেকাবী এবং একটা বাটি সংগে নিয়ে সে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে যায়। বুড়িটাও ছুটে যায় মশলাপাতির দোকানটায়। পুটুলি দুটো নিয়ে আবার ফিরে আসে হজের দোকানে। দোকানের যা কিছু দামী দামী জিনিসপত্র দেখতে পেল, একটা বস্তায় চটপট ভরে নিল সে।

এই সময় একটা ছেলে একটা ভাড়াটে গাধা নিয়ে ভাড়ার সন্ধান করতে করতে সেই দোকানের সামনে এসে পড়ে। বুড়ি জিজ্ঞেস করে, ভাড়া যাবে?

ছেলেটি বলে, যাবো না কেন? ভাড়া যাওয়াই তো আমার কাজ। কী সামান যাবে?

ছেলেটির কথায় জড়তা। বুড়ি বুঝলো চরস খেয়ে ছোকরাটা বুঁদ হয়ে আছে। যাক ভালোই হলো।

—তুমি আমার ছেলেকে জান? এই দোকানের মালিক হজ মহম্মদকে চেন?

ছেলেটি বলে, কী যে বলেন, বুড়িমা, খুব আচ্ছা তরা জানি। আমার চাইতে তাকে আর ভালো করে কেউ জানে না। কিন্তু ব্যাপার কী? কী হয়েছে। দোকানের সামানপত্র এমন লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছেন কেন?

রাত্রি শেষ হয়ে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাঁইত্রিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দুঃখের কথা আর বলো না, ছেলে। আমার বেটার কারবার ডকে উঠেছে।

দেনার দায়ে সে আজ দেউলিয়া। পাওনাদাররা শুনবে কেন, কাজীর কাছে মামলা দায়ের করে দিয়েছে। কাজী আমার ছেলেকে কয়েদ করেছে। দোকানের সামানপত্র ক্রোক করার পরোয়ানা আসবে এখুনি। তার আগে যতটা পারি জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলি। কিন্তু এতসব বড় বড় রঙের জালাগুলো তো আর সড়ানো যাবে না। আমার বাছার এমন সাধের দোকান কাজীর পেয়াদা এসে লুঠ করে নিয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।

ছেলেটা বোকার মতো তাকায়, তা হলে কী করে এই সব পেল্লাই পেল্লাই রঙের জালাগুলো সরাবে ?

—সরাতে পারবো না। তবে ভেঙে গুঁড়িয়ে নষ্ট তো করে দেওয়া যায় ?

ছেলেটি বুড়ির বুদ্ধির তারিফ করে ভারিক্কি চালে ঘাড় নাড়ে। হুঁ, তা অবশ্য যায়।

বুড়ি বলে, কিন্তু ছেলে, আমার গায়ে তো বেশি জোর নাই। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে ?

—কী করতে হবে বলুন ?

—এই ডাণ্ডা দিয়ে জালাগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। আমি ততক্ষণে এই বস্তাটা তোমার গাধার পিঠে চাপিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসি। কিছু ভেবো না ; তোমার যা ভাড়া—তার অনেক বেশিই দেবো। নাও, এই বস্তাটা তোমার গাধার পিঠে বেঁধে দাও।

ছেলেটি বুড়িকে বিদায় করে ডাণ্ডা দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে মাটির জালাগুলো গুঁড়ো করে দেয়। সারা ঘর নীলের গোলায় কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। এমন সময় হজ মহম্মদ দূর থেকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেটার হাতের ডাণ্ডা চেপে ধরে বলে, এ্যাই, এসব কী হচ্ছে ?

ছেলেটি হজ মহম্মদকে চেনে। দাঁত বের করে খিকখিক করে হাসতে হাসতে সে বলে, এবার আসুক না ব্যাটারা, ঘণ্টা পাবে। আমি সব খতম করে দিয়েছি—

হজ মহম্মদ কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। তার সারা জীবনের সাধনা এই রঙের দোকান, আজ কয়েক পলকের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল কী করে :

—এ্যাই ব্যাটা উল্লু বাঁদর বদমাইশ কাঁহাকা, এ তুই কী করেছিস। আমার যে সব শেষ হয়ে গেল !

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়। হজ মহম্মদকে কখনও চোখের জল ফেলতে দেখেনি সে। আজ সে কাঁদছে।

—কিন্তু আমার কী দোষ ; শেখসাহেব। আপনার মা-ই তো আমায় সব ভাঙতে বলে গেলেন।

—আমার মা ? আমার মা তো অনেকদিন গত হয়েছে।

ছেলেটি আরও অবাক হয়, তবে যে এক বুড়িমাকে দেখলাম এই দোকানের জিনিসপত্র বস্তায় ভরছিল ? সে তবে কে ? সেই তো আমাকে বলে গেল, তার ছেলে—মানে আপনাকে কাজী নাকি কয়েদ করেছে। দেনার দায়ে আপনার দোকান আজ ক্রোক করতে আসবে তার পেয়াদা। তাই তো বুড়িমা আমাকে

বললো, 'যতটা পারি বাঁচাই, বাকীটা তুই ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে রাখ—যাতে কাজীর পেয়াদা এসে কিছু না নিয়ে যেতে পারে।' সবুর করুন শেখসাহেব, সামানপত্র সামলে রেখে এখুনি ফিরে আসবে বুড়িমা। এসে আমার গাধা আর ভাড়া মিটিয়ে দেবে।

—তোর মুণ্ডু দেবে। যাকে আমি দোকানে বসিয়ে গিয়েছিলাম সে আমার মা হতে যাবে কেন? তাকে তো আমি আমার ওপরের ঘরখানা ভাড়া দিয়েছি আজ।

—আপনি তাকে আগে থেকে চিনতেন?

—না না, চিনবো কি করে। সবে আজ সকালেই তো সে এসেছে আমার কাছে। তার ছেলে আর মেয়েকে সঙ্গে করে। আমি তো তাদেরই জন্য খাবার কিনতে গিয়েছিলাম। হায় আল্লাহ এ কী সর্বনাশ হলো আমার। এখন আমার দিন চলবে কী করে? ও বাবা গো, মা গো, আমি এখন কী করবো?

হজ মহম্মদের চেঁচামেচি চিৎকারে পথচারী দোকানদার প্রতিবেশী সবই এসে ভীড় করে। সকলের মুখে একই জিজ্ঞাসা—কী ব্যাপার, কী হয়েছে?

হজ মহম্মদ বলে, আমার নতুন ভাড়াটের ছেলেমেয়ের জন্য আমি খানা কিনতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি আমার দোকানের এই হাল করেছে এই ছেলেটা। রঙো সব জালাগুলোকে দেখুন, ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আমার এত সাধের আলমারী। টেবিল তাক সব টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। এখন আমি কী করবো।

একজন প্রশ্ন করে, দোকানে কাকে বসিয়ে গিয়েছিলেন? সে কোথায়?

—সে-ই তো আমার নতুন ভাড়াটে—এক বুড়ি।

—সে কী আপনার চেনা-জানা?

হজ মহম্মদ বলে, আজ সকালের আগে কখনও দেখিনি আমি।

একজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, একবেলার পরিচয়, তার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে বাইরে গেলেন, আপনি?

সে যে আমার ভাড়াটে হয়েছে। ওপরে তার ছেলেমেয়ে রয়েছে এখনও। আমি তাদের জন্যই খাবার আনতে গিয়েছিলাম।

হজ মহম্মদ কপাল বুক চাপড়াতে থাকলো।

ছেলেটাও এতক্ষণে বুঝতে পারে, গাধাটাও আর ফেরত পাওয়ার আশা নাই। সেও হা-হুতাশ করে কপাল চাপড়াতে থাকে। আমার গাধা—আমার গাধা পাবো কোথায় গো?

ছেলেটা হজ মহম্মদকে পাকড়াও করে, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। আপনার দোকানের লোক আমার গাধা নিয়ে পালিয়েছে। এজন্যে আপনিই একমাত্র দায়ী। আমাব গাধাটা ফেরত দিন।

হজ মহম্মদও রুখে আসে, তবে রে হতচ্ছাড়া, আমার সর্বনাশ করে, আবার বলে কিনা গাধা ফেরত দাও।

তৎক্ষণাৎ দুইজনের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়ে যায়। হজ বলে

কেন আমার দোকানটার সর্বনাশ করলি—তোকে আমি ফাটকে দেবো। আর ছেলেটা বলে, ওসব বুজরুকী ছাড়ো. আমার গাধা ফেরত দাও, না হলে তোমাকে আমি কাজীর কাছে নিয়ে যাবো।

উপস্থিত জনতা ওদের মারামারি দেখে মজা অনুভব করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন বলে, হজ মহম্মদ, বুড়িটা যখন তোমার ভাড়াটে. আর সে যখন ছেলেটার গাধাটা নিয়ে পালিয়েছে, আমার মতে গাধাটা অথবা একটা গাধার খেসারত তোমাকেই দিতে হয়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা, তখন হজ মহম্মদ আর ছেলেটার মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটত্রিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এবার শুনুন, সওদাগর সিদি মুসিন আর খাতুনের কথা ঃ

সিদি মুসিন সাজ-পোশাক খুলে দিয়ে একেবারে দিগম্বর হয়ে অধীর আগ্রহে বসে থাকে সেই ছোট্ট খুপরীটাতে। বুড়ি তাকে বলে যায়, এখুনি সে এসে তার মেয়ের ঘরে নিয়ে যাবে তাকে। কিন্তু তিলে তিলে অনেক সময় কেটে যায়। বুড়ি ফিরে না। সিদি মুসিন অধৈর্য হয়ে বৈঠকখানা ছেড়ে বাইরে বেরিরে পড়ে।

এদিকে খাতুনের অবস্থাও তাই। বুড়িটা তাকেও ধোঁকা দিয়ে, সাজ-পোশাক গহনাপত্র নিয়ে, প্রায় বিবস্ত্র করে, বসিয়ে রেখে সেই যে বেরিয়ে গেল আর ফিরলো না। খাতুন ভাবে নিচে থেকে ফিরে আসতে এত দেরি হওয়ার কারণ কী? অধৈর্য হয়ে সেও ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ পিছন থকে একটা কর্কশ আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকায়। কিন্তু চোখ আর খুলে রাখতে পারে না। সেই নওজোয়ান সওদাগর একেবারে বিবস্ত্র —উলঙ্গ।

সিদি বেশ তেজের সঙ্গেই কৈফিয়ৎ চায়, তোমার মা কোথায়? এক্ষুণি ডাকো তাকে। আমি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করবো না। এখুনি শাদীর ব্যবস্থা করতে হবে।

খাতুন অবাক হয়ে বলে, আমার মা? সে তো কতকাল আগে মারা গেছে! তুমি কী সেই পীরের সাগরেদ নাকি?

সিদি এবার ভেঙ্গে পড়ে, এ তুমি কী বলছো. মণি, তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। তোমার মা আমাকে কথা দিয়েছে, আজই এক্ষুনি তোমার সঙ্গে শাদী করিয়ে দেবে আমার।

খাতুন-এর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে ওঠে। তবে কি বুড়িমা—আর সে ভাবতে পারে না কিছু।

সিদি মুসিনও বুঝতে পারে, ব্যাপারটা বড় সুবিধের না। এখন এই অবস্থায়

সে কী করবে, কী করা উচিত কিছুই ঠাওর করতে পারে না।

খাতুনও আতঙ্কিত হয়ে নির্বোধের মতো সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়। ভাবখানা এই—যেন সিঁড়ি দিয়ে নামলেই বুড়িটার সঙ্গে দেখা হবে। সিদিও তার পিছনে পিছনে নামতে থাকে।

এই সময় হজ মহম্মদ আর ছেলেটার কাজিয়া তুঙ্গে উঠেছে। ওপরে উঠে আসার জন্যে তারা সিঁড়ির কাছে ছুটে আসে। পিছনে বিরাট জনতা। সিঁড়িতে পা দিয়েই হজ মহম্মদ দেখে, মেয়েটি আর ছেলেটি দুজনেই উলঙ্গ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। হজ মহম্মদ আর তার পিছনে একরাশ জনতাকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে খাতুন। শেমিজটাকে প্রাণপণে টেনে হাঁটুর কাছে নামাতে চায়। আর সিদি মুসিন—সে বেচারা দুহাত দিয়ে ঢেকে কোনও রকমে লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াস করতে থাকে।

হজ মহম্মদ গর্জে ওঠে, এই খানকির বেটি খানকি, তোর মা মাগী কোথায় আগে বল?

খাতুন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, আমার মা তো বহুদিন আগে মারা গেছে! আমাকে যিনি সঙ্গে করে এনেছেন তিনি তো এখানকার পীরের শিষ্যা।

তার এই কথা শুনে হজ মহম্মদ তার দোকানের শোক ভুলে গেল, ছেলেটা তার হারানো গাধার দুঃখও ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো পিছনের জনতাও। কারুরই আর বুঝতে বাকী রইলো না তারা সবাই ঐ ধূর্ত ঠগ বুড়িটার শিকার হয়েছে।

হজ মহম্মদ, ছেলেটা আর সওদাগর সিদি মুসিন তিনজনে ঠিক করলো, শয়তান বুড়িটাকে শায়েস্তা করতেই হবে। কিন্তু তার আগে এই অসহায় মেয়েটার লজ্জা নিবারণের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা পোশাক এনে পরতে দেওয়া হলো খাতুনকে। খাতুন তখন লজ্জা ভয় শঙ্কায় দিশাহারা। কোনও রকমে পোশাকটা পরে দ্রুত পায়ে সে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

হজ মহম্মদ ছেলেটাকে বললো, সবই নসীবের লেখা, বিবাদ কাজিয়া করে আর ফয়দা কী বল। তার চাইতে কোতোয়ালের কাছে চল, নালিশ করে আসি।

সওদাগরের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে কোতোয়াল খালিদের কাছে। এজাহার দিয়ে আসবেন।

সব শুনে আমির খালিদ বললো, এতো বড় তাজ্জব কাণ্ড, আল্লার নাম নিয়ে বলছি, তোমরা যে কাহিনী শোনালে সবই আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু একটা কথা, এই বিরাট বাগদাদ শহরে সেই শয়তান বুড়িটাকে কী করে আমি ধরবো? হারেমে হারেমে ঢুকে সব মেয়ের বোরখা খুলে পরীক্ষা করে দেখা কী আমার পক্ষে সম্ভব? আমার পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

—তা হলে কী উপায় হবে?

ওরা তিনজন হা-হুতাশ করতে থাকে। হজ মহম্মদ কপাল চাপড়ায়, আমার দোকান—

ছেলেটা কেঁদে ফেলে, আমার গাধা—

আর সওদাগর সিদি মুসিন মাথা ঠুকতে থাকে, আমার এক হাজার দিনারের বটুয়া—

কোতোয়াল খালিদ বলে, তোমরা যদি বুড়িটাকে ধরে এনে দিতে পার, আমি তার যোগ্য সাজা দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। এমন দাওয়াই তাকে দেবো, বাছাধন সব কবুল করতে পথ পাবে না। কিন্তু তাকে যদি হাতের মুঠোয় না পাই, আমার কিছু করার নাই।

খালিদের কথায় তারা আপাততঃ শান্ত হয়ে যুক্তি করে, যেভাবেই হোক তাকে তাকে থাকতে হবে, বুড়িটার হদিশ করতেই হবে।

এবারে ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহর কথা বলি ঃ

মালপত্র চাপিয়ে সে গাধাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। একেবারে সোজা বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছয়। আল্লাহর কৃপায় পথে কোনও ঝঞ্ঝাট হলো না, নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে বুড়িটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক্ বাবা, ভালয় ভালয় পেঁছে গেছি!

জাইনাব জানলার ধারে মা-এর প্রত্যাশায় বসেছিল। আনন্দে সে লাফাতে লাফাতে এসে দরজা খুলে দেয়।

—মা, মাগো, তুমি দেখি বাজী মাৎ করে এসেছো?

—তবে কী ভেবেছিলি কোতোয়ালের হাতকড়া পরে ফাটকে যাবো?

ডিলাইলাহর চোখে শয়তানীর হাসি নাচতে থাকে। দেমাক করে বলতে থাকে, আমার নাম ডিলাইলাহ। তোর কোতোয়াল খালিদ বল, আর আহমদ হাসান বল, সাতঘাটের পানি খাইয়ে দিতে পারি আমি। আমার সঙ্গে খলিফা যে 'ব্যাভার'-খানা করলো তাতে কি আমি চুপ করে বসে থাকবো ভেবেছিস? ওর সুলতানী করার সাধ আমি ঘুচিয়ে দেব। আমার সঙ্গে চালাকী!

জাইনাবের আনন্দ আর ধরে না। মা, মা গো, তোমার কেরামতির কাহিনীটা একবার শোনাও না, মা।

ডিলাইলাহর মুখে দুর্গ জয়ের অহংকার ফুটে ওঠে, এক ঢিলে চার পাখী মেরেছি। এক আমিরের বিবি আর এক ছোকরা সওদাগরের সাজ-পোশাক গহনাপত্র টাকাকড়ি লোপাট করে একেবারে উদাম করে রেখে এসেছি। আর এক দোকানদারের দোকানের সব ভালোভালো দামী দামী জিনিসপত্র ফাঁক করে দিয়েছি। আর এই গাধাটা দেখছিস, এটাও বাগিয়ে নিয়ে এসেছি একটা ছেলের কাছ থেকে।

জাইনাব শিউরে ওঠে, বল কী মা, এতগুলো কাজ একবেলার মধ্যে সেরে ফেললে ?

—তবেই বোঝ, আমার কারসাজী ?

—কিন্তু মা, তোমার কী ধারণা, ওরা তোমাকে পথে-ঘাটে দেখে চিনতে পারবে না ? তখন ? তখন কী করে বাঁচবে তুমি। একবার ধরা পড়লে, জন্মের সাধ তো তোমার ঘুচিয়ে দেবে কোতোয়াল।

—তুই থাম তো জাইনাব। তোর ঐ আমির খালিদকে আমি ট্যাঁকে গুঁজে রাখতে পারি। খালি ভয় আমার ঐ গাধার ছোঁড়াটাকে। বেটাচ্ছেলে, আমাকে চেনে। সে যাক গে, ও-নিয়ে আমি চিন্তা করি না।

ডিলাইলাহ একটু দম নেয়। তারপর আবার বলতে থাকে ঃ এ আর কী দেখলি আমার কেরামতী। আসল কাজে তো এখনও হাতই দিইনি।

জাইনাব আতঙ্কিত হয়ে বলে, কিন্তু মা, আমার বড্ড ভয় করছে। যদি তুমি ধরা পড়ে যাও—

—আমাকে যে ধরবে সে এখনও মায়ের গর্ভে। ওসব ভয় আমাকে দেখাস নে। জানিস আমি হচ্ছি পাকাল মাছ, হাতে মুঠো করে ধরেও ধরে রাখা যায় না। পালিয়ে আমি যাবোই।

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো উনচল্লিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সুফী দরবেশের আলখাল্লা ছেড়ে সে আমির উজিরের বাড়ির হারেমের আয়ার সাজ পরে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। আবার কাকে ঘায়েল করা যায়, তারই ফন্দী আঁটতে আঁটতে বাগদাদের শহর পথ পরিক্রমা করে চলে সে।

বাজার। রাস্তার দুধারে বাহারী রঙদার বিলাসদ্রব্যের দোকান। নানারকম কায়দায় সুন্দর সুন্দর জিনিস সব এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে, দেখে চোখ ঝলসে যায়। ডিলাইলাহ এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, একটা বড় লোকের চাকরানীর কাঁধে ফুটফুটে সুন্দর একটা ছেলে। এক নজরেই বোঝা যায়, কোনও আমির বাদশার খানদানী ঘরের দুলাল। সারা অঙ্গে তার সাজের কী বাহার। জমকালো জরির কাজ করা কুর্তা কামিজ। মাথায় শিরোপা। হীরা চুনী পান্না মুক্তা বসানো—মহামূল্যবান টুপী। তার গলায় ইয়া বড় একটা মুক্তোর মালা। মাঝে মাঝে হীরা বসানো। একটা বাড়ি থেকে চাকরানীটা ছেলেটিকে কাঁধে করে রাস্তায় নামলো। এই বাড়িটা বাগদাদ শহরে বিখ্যাত। শহরের সওদাগর-সমিতির সভাপতির, বাড়ি। সুতরাং প্রায় সব লোকেই চেনে। এই বাচ্চা যে সওদার সভাপতির সে-কথা হয়তো না বললেও বোঝা যায়।

ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে চাকরানীটা তার সঙ্গে গপ্পো করতে করতে বাড়ির সামনেই পায়চারী করতে থাকলো। তাদের কথাবার্তা থেকে একটা

কথা পরিষ্কার সে জানতে পারে, সওদাগরের বাড়িতে আজ উৎসব আছে। তার কন্যার বাগদানের উৎসব। ছেলেটা বড় দামাল। বাইরের অভ্যাগতদের সামনে ওর মাকে নাজেহাল করবে, এই আশঙ্কায় চাকরানীর কাছে দিয়ে বলেছে, বাইরে নিয়ে যা। মেহেমানরা চলে গেলে, নিয়ে আসবি।

ডিলাইলাহ ভাবে, যেভাবেই হোক ছেলেটাকে গায়েব করতে হবে। সচ্ছন্দভাবেই সে চাকরানীটার সামনে এগিয়ে যায়। আর বোলো না বাছা, আমার বড় দেরি হয়ে গেল।

চাকরানীটা কিছুই বুঝতে পারে না। ডিলাইলাহর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। এই ফাঁকে ডিলাইলাহ তার হাতে একটা অচল দিনার গুঁজে দিয়ে বলে, এটা রাখো, তোমার মালকিনকে গিয়ে একবার খবর দাও, বাছা, তার পুরোনো আয়া উম অল খায়ের এসেছে দেখা করতে। আজ এই শুভ দিনে আমার দোয়া জানাতে এসেছি আমার বেটিকে। আমার নিজ হাতে মানুষ করা লেড়কী। আজ তার শাদীর পাকা দেখা। এ আনন্দ আমি কি চেপে রাখতে পারি। তাই না ডাকলেও ছুটে এসেছি, যাও তুমি মালকিনকে একবার গিয়ে বল, তাহলেই তিনি সব বুঝতে পারবেন।

চাকরানীটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; এ তো ভারি আহ্লাদের কথা মা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুণি মালকিনকে আপনার কথা বলছি।

কিন্তু মুহূর্তে মধ্যেই চুপসে যায় চাকরানীটা। বলে, কিন্তু কী করে ভিতরে এখন যাবো, মা?

—কেন?

—এই বাচ্চাটা বড়ই দুরন্ত দামাল। মালকিন আজ বাদশাহী সাজ-পোশাকে সেজে আছেন, ওকে ভিতরে নিয়ে গেলে এক পলকে তার মা-এর সাজ-পোশাক একেবারে মাটি করে দেবে। সেই ভয়েই তিনি আমাকে বাইরে পাঠিয়েছেন। এখন তো একে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবো না মা।

—ওঃ, এই কথা! তা দাও ওকে আমার কোলে, আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে আলাপ জমাই। তুমি চটপট খবর দিয়ে চলে এস, কেমন?

সহজ সরল নির্বোধ চাকরানীটা অতশত প্যাঁচ-পয়জার ভাবতে পারে না। বলে, তা হলে তো খুব ভালো হয় মা। আপনি একটু ধরুন। আমি যাবো আর আসবো।

সরল বিশ্বাসে চাকরানীটা তার কোলে শিশুটিকে তুলে দিয়ে দোতলায় উঠে যায়।

এদিকে তক্ষুণি ধূর্ত শয়তান বুড়িটা শিশুটিকে কোলে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূরে বাঁ পাশের একটা সরু অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে, সদর রাস্তার গোচর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঝটপট সে শিশুটির গা থেকে মূল্যবান হীরে জহরতগুলো খুলে নিয়ে বটুয়ায় ভরে ফেলে। তারপর ভাবে, একে দিয়ে আরও অনেক রোজগার করা যাবে।

দ্রুতপায়ে সে বাজারের স্যাকরা-পট্টিতে চলে আসে। এখানকার নামজাদা জহুরী এক ইহুদী। লোকটা পয়সার কুমির। কিন্তু বাগদাদের ব্যবসায়ী মহলে তার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই।

দোকানের গদীতে বসে খদ্দেরের আশায় পথের দিকে তাকিয়েছিল। ডিলাইলাহর কোলে সওদাগর-সভাপতির পুত্রকে দেখে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। এই সওদাগর-সভাপতির ওপর তার মনে মনে দারুণ হিংসা। পয়সায় ইহুদী অনেক বড়, কিন্তু তার মতো ইজ্জৎ সে পায় না। লোকে তাকেই সম্মান করে সমিতির সভাপতি বানিয়েছে। কিন্তু ইহুদীকে ডাকেনি।

ডিলাইলাহ দোকানের ভিতরে ঢোকে। ইহুদী স্বাগত জানিয়ে বসতে বলে। ভাবে, সওদাগর-সভাপতির বাড়ির বায়না—মোটা মাল বিক্রি হবে। কণ্ঠে মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করে, কী চান মা?

—আপনিই তো আমাদের মহাজন, ইহুদী আজারিয়াহ?

—আপনি ঠিকই চিনে এসেছেন।

ডিলাইলাহ বলতে থাকে, এই বাচ্চাটার বড় বোনের আজ শাদীর পাকা কথার উৎসব হচ্ছে বাড়িতে। ওহো, আমি কোন্ বাড়ি থেকে এসেছি, দেখুন তাই-ই বলতে ভুলে গেছি।

ইহুদী আজারিয়াহ বলে, আমি জানি, আপনি আমাদের সওদাগর শাহবান্দার-প্রাসাদ থেকে আসছেন। এই বাচ্চা দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা বলুন, কী কাজে লাগতে পারি আমি?

ডিলাইলাহ বলে, অনেক আত্মীয় ইয়ার দোস্ত আমির ওমরাহ সওদাগর আসবেন আজ। খুব জাঁকজমক করছে আমাদের মালিক।

—জানি। আমারও নেমন্তন্ন আছে সেখানে। দোকানপাট বন্ধ করেই যাবো।

ডিলাইলাহ মুহূর্তের জন্য মিইয়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার নিজেকে সহজ করে নিয়ে বলে, মালকিনের ইচ্ছা তার এই বাচ্চাটাকে একেবারে শাহজাদার মতো করে সাজাতে হবে। তিনিই আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে। আপনার দোকানের সেরা জহরৎ দিয়ে সাজিয়ে দিন—মালকিনের তাই ইচ্ছে।

ইহুদী শুনে গদগদ হয়, এ আর বেশি কথা কী। এমন সব দামী-দামী জড়োয়া-জহরৎ দিচ্ছি, আপনার মালকিনের পছন্দ হবেই হবে।

জহুরী বেছে বেছে দুখানা বাহুর তাগা, দুখানা বালা, এক জোড়া মুক্তোর কানবালা, একখানা কোমরের দোয়াল, দুই রকম জামার বোতাম এবং হাতের কয়েকটি আংটি ডিলাইলাহর হাতে তুলে দিয়ে বললো, দেখান আপনার মালকিনকে। আমার মনে হয় অপছন্দ হবে না।

ডিলাইলাহর চোখ নেচে ওঠে। সবগুলো গহনায় হীরে চুনী পান্না প্রভৃতি নানারকম রত্ন বসানো। অনেক দাম হবে বোধ হয়। জহুরীকে বলে, বহুৎ

বাহারী চমৎকার জিনিস সব। আমি মালকিনকে দেখিয়ে দামটা দিয়ে যাচ্ছি। কত লাগবে, আপনি ক'ষে বলে দিন।

জহুরী বলে, দামের জন্য চিন্তা কী। সে পরে হবে 'খন। আগে তো তাঁর পছন্দ হোক। তারপর দামের জন্য কী আটকাবে?

মুখে এই রকম বললেও কাগজ কলম নিয়ে হিসেব কষে সে বলে, এই আপনার গিয়ে সব সুদ্ধ দাম পড়ছে একহাজার দিনার মতো। ও-জন্যে কিচ্ছু ভাববেন না। দাম না হয় আমি পরে নিয়ে আসবো। আপনি নিয়ে যান; তিনি পছন্দ করুন—সেইটেই আমার কাছে বড় কথা।

ডিলাইলাহ বলে, বাচ্চাটা এখানে ততক্ষণ থাক, আমি দৌড়ে যাবো আর ছুটে আসবো।

ইহুদী হাসে, বুঝেছি আপনার কোথায় আটকাচ্ছে। ওসব কিচ্ছুর দরকার নাই। ছেলেকে জমা রেখে আপনি গহনা নিয়ে যাবেন, আর আমি তাই হতে দেবো? ছিঃ ছিঃ ছিঃ. এসব আপনি ভাবলেন কী করে। যান, চলে যান। আপনাকে এ নিয়ে আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। ছেলেকে যদি এমনিই রেখে যেতে চান, থাকুক। এখানে খেলা করুক। কিন্তু আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

ছেলেটিকে ইহুদীর দোকানে বসিয়ে রেখে ডিলাইলাহ সোজা বাড়ির পথে হন হন করে হেঁটে চললো।

জাইনাব ঠগের সেরা মাকে ফিরতে দেখে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, আবার কাকে ফাঁসিয়ে এলে, মা?

মা নির্বিকারভাবে বলে, এমন বড় কিছু না, ছোট্ট একটা কারবার করে এসেছি। শাহবানদরের ছোট ছেলেটার গায়ের কিছু জহরৎ খুলে নিয়ে ওকে স্যাকরা-বাজারের জহুরী আজারিয়াহ ইহুদীটার হেপাজতে রেখে তার বদলে ওর কাছ থেকে এই সামান্য হাজার খানেক দিনারের মতো জড়োয়া গহনা নিয়ে এসেছি।

কিন্তু মা, জাইনাব শঙ্কিত হয়ে বলে, এই রকম বেপরোয়া হয়ে এমন সব কাজ তুমি করে আসছ, এরপর ভেবে দেখেছো বাগদাদের হাটে বাজারে আর তুমি বেরুতে পারবে?

—তুই থাম তো ছুঁড়ি! আমাকে আর জ্ঞান দিস নি। বলি, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছিলাম। আমার কাজে বাধা দিবি না। যা আমি করবো ভেবেছি, তার এক কণাও এখনও করা হয়নি আমার।

এদিকে সেই নির্বোধ চাকরানীটা দোতলায় উঠে যায়। বিরাট বিশাল ভোজসভার আয়োজন হয়েছে মাঝের বড় ঘরে। সওদাগর বিবির কানে ফিস ফিস করে সে বলে, মালকিন, আপনার পুরোনো আয়া উম অল খ্ইর এসেছে। নিচে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। শাদীর পাকা-দেখা শুনে সে মেয়েকে দোয়া জানাতে এসেছে।

এই কথা শুনে সওদাগর-বিবি প্রায় চিৎকার করে ওঠে, তোর ছোট মালিককে

কোথায় রেখে এলি ?

মেয়েটা ভ্যাবচাকা খেয়ে গেল. ঐ আয়ার কাছে তাকে রেখে এসেছি. মা। ভাবলাম, ওকে ওপরে আনলে আপনি রাগ করবেন। ও আপনার সাজ-পোশাক নষ্ট করে দেবে, তাই। এই দেখুন আপনার আয়াটা আমাকে একটা দিনার বকশিশ দিয়েছে।

সওদাগর-বিবি দিনারটা হাতে নিয়ে দেখে, জাল। পিতলের তৈরি। সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে সে, শিগ্গির ছুটে যা, খানকি মাগী, নিয়ে আয় আমার বাছাকে।

চাকরানীটা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হুড়পাড় করে সে নিচে নেমে এসে দেখে পাখী পালিয়েছে। কোথায় আয়া ? কোথায় তার ছোট মালিক ? হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। তার চিৎকার শুনে অন্যান্য মেয়েরা ছুটে নেমে আসে নিচে। নিমেষের মধ্যে দারুন চেঁচামেচি-চিৎকার মহা-সোরগোল পড়ে যায়। সওদাগর-সভাপতি নিজেও ছুটে আসে, কী ব্যাপার ? কী হয়েছে ? এত গোল কীসের ? যখন তার বিবির মুখ থেকে শুনল, ছেলেকে নিয়ে ভেগেছে একটা শয়তানী ছেলে-চোর, সওদাগর পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে খুঁজতে থাকলো। তার সহগামী হলো উপস্থিত অভ্যাগত আমন্ত্রিত সকলেই। নানা দিকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়লো তারা শিশুর সন্ধানে। শত সহস্র পথ-চারীদের জিজ্ঞেস করলো, কেউ একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেকে কোনও বুড়ির কোলে দেখেছে কি না। কিন্তু কেউ কোনও হদিস দিতে পারলো না। দোকানদার, ফিরিওলা, ভিস্তিওলা কাউকেই জিজ্ঞেস করতে বাদ রাখলো না তারা। কিন্তু কেউই আশার কথা শোনাতে পারে না। অবশেষে অনেক্ষণ পরে তারা স্যাকরা-বাজারে এসে ছেলের সন্ধান পেল। ইহুদী আজারিয়াহর দোকনের দরজার পাশে বসে সে একমনে খেলা করছিল। তার সাজ-পোশাক এলোমেলো, গায়ের হীরে জহরৎ কিচ্ছু নাই। শাহবান্দার ক্রোধে আনন্দে অধীর হয়ে ইহুদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ্যাই শয়তান পাজী বুড়ো, আমার ছেলে তোর কাছে কেন, বল ? কী করে এল এখানে ? নিশ্চয়ই গহনার লোভে চুরি করিয়ে এনেছিস। তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো, বদমাইশ। বল, ওর গায়ের হীরে জহরৎ কোথায় রেখেছিস ?

বুড়ো ইহুদী ভয়ে কাঁপতে থাকে। শাহবান্দারের দাপট সে জানে। তার ওপর এখন তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল জনতা। তার একটা ইশারাতে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে তারা।

—দোহাই, মালিক, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি কোনও দোষ করিনি, কোন চুরি ছেনতাই আমার ব্যবসা নয়।

সওদাগর রাগে ফেটে পড়ে, ওরে আমার পীর রে। তুমি চুরি করনি তো আমার ঘরের ছেলে তোমার দোকানে এল কী করে ? ঐটুকু দুধের বাছা, হেঁটে হেঁটে একাই চলে এল এতটা পথ ?

— জী না, একা আসবে কী করে ? আপনার বাড়ির এক বুড়ি আয়া তাকে সংগে করে নিয়ে এসেছিল। আজ আপনার মেয়ের বাকদান। অনেক অতিথি মেহেমান আসবেন। তাই মালকিনের কথামতো সে আমার দোকানে এসে হাজারখানেক দিনারের গহনাপত্র নিয়ে গেছে তাঁকে দেখাতে। আপনি বিশ্বাস করুন শাহবান্দার সাহেব, আপনার ছেলেকে জামানত রাখতে চাইনি আমি। আমার কী দরকার, আপনি পাঠিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করে গহনা ছেড়ে দেবো না ?

শাহবান্দার এবার জ্বলে ওঠে, ওহে কালাবাঁদর, আমার মেয়ের গহনাপত্রের কী কিছু অভাব আছে ? তোমার দোকানে লোক পাঠিয়ে গহনা না নিয়ে গেলে আমার মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়াতে পারবে না ! ও সব বুজরুকী রাখ, ছেলের গায়ের হীরে-জহরৎ কোথায় রেখেছ, বের কর ?

এমন সময় সেখানে সেই হজ মহম্মদ, গাধার মালিকটা আর সওদাগর সিদি মুসিন এসে হাজির হয়। ঘটনার বিবরণ শুনে তারা সকলে কীভাবে সেই শয়তান বুড়িটার কাছে প্রতারিত হয়েছে তার বিস্তারিত কাহিনী বলে। সব শুনে শাহবান্দারের প্রত্যয় হয়, ইহুদীটার কোনও দোষ নাই। সে তাকে বলে, ঠিক আছে, হীরে-জহরৎ যা গেছে তার জন্য আমি তোয়াক্কা করি না। আমার ছেলেকে ফিরে পেলাম এই যথেষ্ট। তবে এও বলে রাখলাম আপনাদের, সে বুড়ি শয়তান মাগী আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। আজ আমার বাড়িতে কাজ—এখন এ নিয়ে আর হৈ-হুজ্জৎ করতে চাই না।

শাহবানদার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। ইহুদী জহুরী সেই তিন প্রতারিতকে প্রশ্ন করে, আপনারা এর কোনও বিহিত করবেন না ?

তারা জানায়, সকালে তারা কোতোয়াল খালিদের কাছে এজাহার দিয়ে এসেছে। কিন্তু সে তাকে খুঁজে বের করে সাজা দেবার কোন ভরসা দিতে পারেনি। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার হাতে তুলে দিলে সে তাকে উপযুক্ত সাজা দেবে, এই কথা দিয়েছে।

ইহুদী বলে, তা হলে আসুন আমরা সবাই একজোট হয়ে তাকে ধরে ফেলার ব্যবস্থা করি। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কেউ কী আগে ঐ বুড়িটাকে চিনতেন ?

গাধার মালিকটা এগিয়ে এসে বলে, আমি চিনতাম।

ইহুদী বলতে থাকে, সবাই মিলে একসংগে দল বেঁধে তাকে খুঁজে বেড়াতে থাকলে কোনও কাজ হবে না। চারজন চারদিকে নজর রাখুন। পথে-ঘাটে যত বুড়ি মেয়েছেলে চোখে পড়বে তাদের সবাইকে ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন না বুঝতে পারে আমরা কিছু লক্ষ্য করছি।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো একচল্লিশতম রজনীর
মধ্যযামে আবার সে বলতে আরম্ভ করলো ঃ

. গাধার মালিকটাই প্রথমে দেখা পেল ডিলাইলাহর। যদিও সে সে-দিন আর এক অভিনব ছদ্মবেশে সেজে পথ চলছিল, তবুও কিন্তু তার নজর এড়াতে পারলো না। বুড়িটার অদ্ভুত ধরনের চলার ভঙ্গী তার অনেক দিনের চেনা। দৌড়ে এসে সে বুড়িটার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, হুঁ হুঁ আমার চোখকে ফাঁকি, এবার কোথায় পালাবে গাধা-চোর? তোমার লোক-ঠকানোর ব্যবসা আমি বের করে দিচ্ছি।

ডিলাইলাহ ফিস ফিস করে বলে, আঃ অত চেঁচাচ্ছো কেন? মামলাটা কী বাবা?

—মামলা আবার কী? আমার গাধা কই—গাধা?

ডিলাইলাহ আরও নরম সুরে বলে, আস্তে কথা বল, বাবা। আচ্ছা, শুধু তোমার গাধাটা ফেরত পেলেই তুমি খুশি হবে, না অন্য সকলের সামান-পত্রও চাও?

ছেলেটি বলে, অন্য লোকের জিনিসে আমার কী কাম? আমার গাধা, আমি ফেরত পেলেই খুশি হবো।

. ডিলাইলাহ কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে, আমি জানি তুমি গরীব লোক। তোমার জিনিসে আমার কোনও লোভ নাই, বাবা। আমি ছিনতাই করতে চাই আমির বাদশাহদের ধন-দৌলত। তোমার গাধাটা আমি তোমাকে ফেরত দেবো বলেই ঐ মুর-নাপিতের দোকানের সামনে বেঁধে রেখে দিয়েছি। তুমি যাও, পাবে। দোকানের মালিকের নাম হজ মাসুদ। ওকে বলা আছে, গিয়ে চাইলেই তোমাকে দিয়ে দেবে। আচ্ছা, তোমাকে যেতে হবে না, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি। এই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বাঁক ঘুরলেই তার দোকান। একটুক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর, আমি তোমার গাধাটাকে নিয়ে আসছি।

ছেলেটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ডিলাইলাহ নাপিতের দোকানে ঢোকে। চোখে ততক্ষণে অশ্রুধারা নামিয়ে ফেলেছে সে। নাপিতের হাত ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলে, হায় হায় আমার সব শেষ হয়ে গেল।

—কেন? কেন, কী হয়েছে বুড়ি মা?

নাপিত হজ মাসুদ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে। বুড়ি বলে, আমার ছেলে তোমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবা। এই গাধাটাকে ভাড়া খাটাতো সে। কিন্তু একদিন দারুন খরাতে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ ওর মাথাটা বিগড়ে যায়। তারপর থেকে অনেক চেষ্টা করেও ওর মাথার দোষ সারাতে পারিনি। বরং দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। উপসর্গ বলতে অন্য কিছু নয়, সারাদিন তার মুখে একই বুলি, আমার গাধা, আমার গাধা কোথায় গেল? আমার গাধা আমাকে ফেরত দিয়ে দাও—এই সব আর কি! শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে তার ঐ এক কথা, আমার গাধা আমাকে দিয়ে দাও—। আমি ওকে অনেক

হেকিম-বদ্যি দেখিয়েছি। কিন্তু কেউই সারাতে পারেনি। তারপর এই শহরের সবচেয়ে নামজাদা হেকিমের কাছে আমি গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে এক মোক্ষম দাওয়াই বাৎলে দিয়েছেন। কিন্তু সে-দাওয়াই ওকে দেবার সাধ্য আমার নাই। তোমার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হবে না, বেটা।

হজ মাসুদ বলে, কী এমন কাজ মা, যা আপনি পারবেন না—অথচ আমি পারবো? যাক, বলুন, আমি জান দিয়েও করে দেবো আপনার কাজ।

ডিলাইলাহ হজ মাসুদের হাতে একটা দিনার গুঁজে দিয়ে বললো: হেকিম জী বলেছেন: ছেলের এই পাগলামীর আসল কারণ ওর দুটো শ্বাদন্ত। এই দুখানা উপড়ে ফেলে সেখানে গরম দুখানা লোহার গজাল গেঁথে দিলেই ওর পাগলামী ভালো হয়ে যাবে।

ডিলাইলার কথা শুনে মাসুদ বলে, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার ছেলের পাগলামী আমি এক্ষুণি সারিয়ে দিচ্ছি।

মাসুদ তার দুই সহচরকে হুকুম করলো। দুখানা পেরেক উনুনে পোড়াতে দাও। আমি ওকে ডেকে আনি।

মাসুদ দোকানের বাইরে এসে গাধার মালিককে দেখতে পেয়ে বলে, ও ছেলে, দোকানে চলো। তোমার গাধা ফেরত নিয়ে এসো।

ছেলেটা হন্তদন্ত হয়ে মাসুদের পিছনে পিছনে দোকানে ঢোকে। মাসুদ তাকে পাশের কামরায় নিয়ে গিয়ে আচমকা পেটের ওপর এক ঘুষি মারে। ছেলেটা চিৎপটাং হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনুচর দুটো এসে তাকে চেপে ধরে। এর ফলে আর সে নড়া-চড়া করতে পারে না। মাসুদ ওর বুকের ওপর চেপে বসে, গলাটা টিপে ধরে। ছেলেটার দম বন্ধ হয়ে আসে। আপনা থেকেই মুখটা হাঁ হয়ে যায়। তখন একখানা সাঁড়াশী দিয়ে পটাপট দুখানা শ্বদন্ত তুলে ফেলে সে। গজাল দুখানা ততক্ষণে তেতে লাল হয়ে গিয়েছিল। মাসুদ নির্মম হাতে সেই দাঁতের গর্তে দুখানা গজাল ঠুকে বসিয়ে দিয়ে বলে, এই তো হয়ে গেল। এবার তুমি তোমার গাধাকে নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি চলে যাও, কেমন! দাঁড়াও তোমার মাকে ডাকি, যা যা বলেছিলেন, ঠিক ঠিক মতো করতে পেরেছি কি না তাঁকে দেখাই।

নাপিতের সাগরেদ দুটো তখনও ছেলেটাকে চিৎপটাং করে ধরে রাখলো। আর ছেলেটা দারুণ যন্ত্রণায় হাঁপাতে থাকলো। নাপিত তার মাকে ডাকতে চলে গেল পাশের ঘরে।

কিন্তু একি! ঘরতো ফাঁকা। কেউ নাই। বুড়ি মা কোথায় গেল? এই তো সে এখানেই বসেছিল!

নাপিত মাসুদ অবাক হয়। দোকানের বাইরে এদিক-ওদিক উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু না, কোথাও সে নাই। হঠাৎ তার খেয়াল হয় দোকানের ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, সাবান, আয়না চিরুনী বদনা গামলা—কিছুই নাই। সব সাফ করে নিয়ে গেছে। বুঝতে আর বাকী থাকে না—এতক্ষণ সে এক শয়তান বুড়ির পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে।

সে এক জাঁদরেল সিদেঁল চোর। ওর অন্য কোনও দরকার নাই, মা। ওরই নাকের ডগা দিয়ে তার দোকানের সর্বস্ব লোপাট করে কিনা, থাকে যতো মেয়েছেলে? এতবড় ক্ষমতা—রাগে গরগর করতে থাকে সে। নাপিতের ঘরে ছুটে গিয়ে রেগে ছেলেটার দুই গালে প্রচণ্ড মুষ্ঠ্যাঘাত করে কৈফিয়ৎ তলব করে, বল, তোর মা মাগী কোথায় গেছে? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। আমার ভয়ে গৃহস্থের চোখে ঘুম আসে না, আর আমার দোকানেই বাটপাড়ি! এখনও বাঁচতে চাস তো তোর মা কোথায় থাকে আস্তানার পাত্তা বল।

ছেলেটির তখন মৃতকল্প দশা! বলে, আল্লাহ কসম, আমার মা অনেক কাল আগে দেহ রেখেছে। আমি অনাথ। গাধা খাটিয়ে খাই।

মাসুদ বলে, ওসব কসম আমি বিশ্বাস করি না। ঐ বুড়ো খানকিটা আলবাৎ তোর মা। বল সে কোথায়? সে আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেছে।

যখন তারা এই রকম তর্ক-বিতর্ক করে চলেছে, এমনসময় দোকানের সামনে দিয়ে সেই তিন প্রতারিত হজ মহম্মদ, সওদাগর সিদি আর জহুরী ইহুদী ধূর্ত বুড়ির অনুসন্ধান করে ফিরছিল। গাধার মালিকের আর্তনাদ শুনে তারা নাপিতের দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়লো।

ছেলেটার তখন দুগাল বেয়ে রক্ত-নদীর ধারা বয়ে চলেছে! যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছিল। ওর তিন সতীর্থকে দেখতে পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে; আমাকে মেরে ফেললো, এই বিধর্মী বদমাইশটা। আপনারা আমাকে বাঁচান।

ওরা দেখলো ছেলেটার মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। দুখানা তাজা দাঁত উপড়ে তুলে ফেলেছে তার। উত্তপ্ত লৌহশলাকার ছেঁকায় তার মুখের প্রায় আধখানাই পুড়ে আংরা হয়ে গেছে। নাপিতের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তারা মারমুখী হয়ে উঠতে হজ মাসুদ আদ্যোপান্ত সব ঘটনা তাদের সামনে খুলে বলে। তখন ওরা বুঝতে পারলো, আসল দোষী সেই ধূর্ত শয়তান বুড়িটা। তাকে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত তাদের গায়ের ঝাল যাবে না। সবাই মিলে আবার হলফ করলো, যেভাবেই হোক, যতদিনেই হোক এর বিহিত তারা করবেই।

শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বিয়াল্লিশতম রজনী

আবার সে বলতে থাকে:

অনেকদিন ধরে অনেক পথ ঘুরে, অবশেষে একদিন তারা বুড়ি ডিলাইলাহকে পাকড়াও করতে পারলো। গাধার মালিকই চিনতে পেরেছিল তাকে। সংগে সংগে চেঁচামেচি চিৎকার করে সে লোকজন জড়ো করে ফেললো। হজ মহম্মদ সওদাগর সিদি মুসিন এবং ইহুদী জহুরী আজ্জারিয়াহ আর মুর নাপিত হজ মাসুদও এসে পড়লো ঘটনাস্থলে। ওরা পাঁচজনে মিলে বুড়িকে টানতে-টানতে

কোর্ম-বাঁদী দেখিয়েছি। কিন্তু কেউই নিয়ে আসে।

খাঁ-নামজাদা হেকিমের, করে নাক ডাকিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। পাহারাদার বললো, কী ব্যাপার? এখন সাহেবের সঙ্গে মুলাকাত হবে না। তিনি এখন শুয়েছেন। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আর এই জেনেনা লোককে আমি অন্দরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর কোতোয়াল সাহেব ঘুম থেকে উঠলে তাকে আপনাদের মামলা জানাবেন।

ওরা পাঁচজন বৈঠকখানায় বসে রইলো, আর একটি খোজা এসে বুড়ি ডিলাইলাহকে প্রাসাদের অন্দরমহলে নিয়ে গেল।

এক সাদশয় শুভ্রকেশ বৃদ্ধাকে এই সময়ে কোতোয়ালের কাছে আসতে দেখে কোতোয়াল-বিবি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, আপনার কী মামলা, মা? কেন এসেছেন তাঁর কাছে?

বুড়ি হেসে বলে, না, আমার কোনও মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার নাই। খালিদ সাহেবের সঙ্গে আমার কথাবার্তা সব হয়ে গেছে! আমার স্বামীর বান্দা কেনা-বেচার ব্যবসা। তিনি কাজের তাগিদে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। এবার যাওয়ার আগে আমার কাছে পাঁচটা ম্যামলুক রেখে বলে গেলেন, ঘরে পয়সা কড়ি যা রেখে গেলাম, আমার দেশে ফেরার আগে যদি তা ফুরিয়ে যায় তবে এই পাঁচটা বান্দা কোনও আমির বাদশাহর কাছে বিক্রি করে সংসার চালিও। খালিদ সাহেবকে বলতেই তিনি বললেন, পাঁচটাই তার দরকার। তাই ওদের আজ নিয়ে এসেছি। ওই দেখ মা, বৈঠকখানার বারান্দায় ওরা বসে আছে—ওই পাঁচটি আমার সেরা বান্দা। দারুন কাজের লোক। আর বুদ্ধি-সুদ্ধিও ঢের!

খালিদ-বিবি জানলার পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, সত্যিই পাঁচটিই বেশ ভালোজাতের মানুষ। বললো, তা কত দাম কিছু ঠিক হয়েছে মা?

বৃদ্ধা বেমালুম বলে ফেললো, এক হাজার দুশো দিনার—একেবারে জলের দাম। নেহাত বিপদে পড়েছি, পয়সাকড়ির দরকার তাই! না হলে বাজারে নিলামে তুললে অনেক বেশি ইনাম পাওয়া যেত।

আমির-বিবিরও তাই ধারণা। মাত্র বারোশো দিনারে এই রকম পাঁচ পাঁচটা ম্যামলুক মেলানো ভার। বাজারে গেলে, চাই কি, এক একটার দাম হাজার দিনার হাঁকবে।

খালিদ গৃহিণী আদর যত্নর মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দেয়। ইশারা করতেই একটি চাকরানী এসে এক গেলাস পেস্তার শরবৎ এনে রাখে। খালিদ বৌ বলে, মেহেরবানী করে চুমুক দিন। আচ্ছা মা, দাম নেওয়া ছাড়া কী আর কোনও দরকার আছে তাঁর সঙ্গে? তিনি এইমাত্র খানা-পিনা সেরে শুয়েছেন। ঘুম থেকে উঠতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। এতক্ষণ কী আপনি অপেক্ষা করবেন? না, আমি দামটা দিয়ে দেব, নিয়ে যাবেন? পরে সময় মতো একবার এসে ভেট করে যাবেন?

বৃদ্ধার তীর অব্যর্থ। এইভাবেই সে তাকে গেঁথে ফেলতে চেয়েছিল।

বললো, কী ? যাও, তা তো তার সংগে আমার অন্য কোনও দরকার নাই, মা।

—তা আছে তো আমি দেখি আমার কাছে আছে কিনা, থাকে যদি আপনাকে দিয়ে দিই দামটা। না হলে স্রেফ এই টাকাটার জন্যে আপনি এতটা সময় বসে বসে হয়রান হলেন ?

অন্য ঘরে চলে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত পরে একটা বটুয়া এনে বললো। কিন্তু পুরো বারোশো তো এখন হচ্ছে না, মা। এতে এক হাজার আছে।

প্রায় ছোঁ মেরেই থলেটা হাতে নিয়ে বুড়ি ডিলাইলাহ বলে, ঠিক আছে। এতেই আমার একটা দিন দিব্যি চলে যাবে। আমার ফেরার সময় হয়ে এসেছে।

—কিন্তু আপনার আরও দুশো দিনার বাকী রয়ে গেল যে মা ?

—তা থাক। ধরো একশো দিনার দিলাম তোমার শরবতের দাম। আর একশো না হয় পরে কখনও নিয়ে যাবো।

খালিদ-গৃহিণী ভাবে, যাক, মুফতে দুশো দিনার বাণিজ্য হয়ে গেল। ভাগ্যে খালিদ-সাহেব গতকাল তাকে টাকাটা দিয়েছিল অন্য একটা সামান কেনার জন্য!

ধূর্ত বুড়ি এবার পলায়নের পথ খোঁজে।—তা হলে মা, আমি আর অপেক্ষা করবো না। কিন্তু ঐ সদর দরজার সামনে আমার এতদিনের চেনা-জানা-বান্দাগুলো বসে আছে। দিনে দিনে মায়া-মমতা জড়িয়ে গেছে, এখন এখানে ফেলে রেখে ওদের মুখের সামনে দিয়ে চলে যেতে আমার কলিজা ফেটে যাবে। তুমি বরং আমাকে খিড়কীর দরজা দিয়ে বের করে দাও মা।

খালিদ-গৃহিণী নিজে তাকে সংগে করে খিড়কীর দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বাইরে বের করে দেয়।

ডিলাইলাহ হন হন করে হেঁটে বাড়িতে ফিরে আসে। জাইনাব এসে হেসে জিজ্ঞেস করে, আজ আবার কাকে জগ দিয়ে এলে মা ?

ডিলাইলাহ বলে আজ বড় মজার কাণ্ড করে এসেছি রে। সেই গাধার মালিক রঙের কারবারী হজ মহম্মদ, সওদাগর ছেলে সিদি মুসিন, ইহুদী জহুরী, আর নাপিত হজ মাসুদকে আজ কোতোয়াল খালিদের বিবির কাছে এক হাজার দিনারে বেঁচে দিয়ে এসেছি। ওই কুত্তার বাচ্চা গাধার মালিকটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। বার বার ঐ ছোঁড়াটাই আমাকে চিনে ফেলছে। এবারও ওরই জন্যে আমি ধরা পড়েছিলাম। আমাকে ধরতে পেরে ওদের কী আনন্দ! কোতোয়ালীতে নিয়ে গিয়ে তুললো। তা আমিও পাঁকাল মাছ। ওদের গায়ে কাদা লেপে দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এসেছি! নে, এখন ঠ্যালা বোঝ। শয়তানের বেহদ্দ যখন শুনবে, ওদের জন্যেই তার হাজার দিনার খোয়া গেছে, তখন ও কী আর ওদের আস্ত রাখবে, ভেবেছিস!

জাইনাব এবার সত্যিই ভয়ে কেঁপে ওঠে, মা, ঢের হয়েছে, এবার ক্ষান্ত দাও, একেবারে সাক্ষাৎ কোতোয়ালকে চোট করে এসেছো তুমি। ভেবেছো, সে তোমাকে ছেড়ে দেবে ? কথায় আছে না 'স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।' তুমি লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দিনে দিনে যা সংগ্রহ করছো, খালিদ

তোমাকে একবার কব্জায় পেলে তার দশগুণ বের ক[illegible] থেকে।

এইভাবে অনেক উপমা উদাহরণ দিয়ে মাকে [illegible] চ্ছিল। [illegible]াস করতে থাকলো জাইনাব, অনেক হয়েছে। এই পয়সাই [illegible] না আমরা খেতে পারবো না। আর বেশি ঝুঁকি নিয়ে কাজ নাই। অতি[illegible] তাঁতী নষ্ট!

এদিকে কোতোয়াল খালিদ নিদ্রা পরিহার করে যখন বাইরে [illegible]লেন, তার বিবি এসে তাঁকে সুখবরটি পরিবেশন করে বললো। খোদা মেহেরবান, আশা করি তোমার সুখ-নিদ্রা হয়েছে। তা, তুমি বেশ ভালো সওদা করেছো তো! কিন্তু আমাকে জানাও নি কেন গো?

খালিদ বোকার মতো বিবির মুখের দিকে তাকায়, ভালো সওদা? কীসের সওদা?

—আহা, কী তোমার ভুলো মন, তুমি যে পাঁচ পাঁচটা ম্যামলুক বান্দা কিনেছো, সে কথা কী বেমালুম ভুলে বসে আছো?

—বান্দা! আমি কোনও বান্দা ফান্দা কিনিনি কারো কাছ থেকে। কে তোমাকে এই সব আজগুবি খবর দিল?

—বা বা, বলিহারী তোমার স্মরণ শক্তি! একটা বৃদ্ধার কাছ থেকে তুমি বারোশো দিনারে পাঁচটা বান্দা কেনোনি? আজ তো, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে সেই বুড়ি এসেছিল, ঐ দেখ বাইরের বৈঠকখানায় বান্দাগুলো বসে আছে। তা আমি তাকে দাম মিটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছি। বুড়ো মানুষ, কাঁহাতক তোমার জন্যে বসে থাকবে? কিন্তু যাই বলো, এত সস্তা—যেন একেবারে···

—থামো, গর্জে ওঠে খালিদ, বারশো দিনার দিয়ে দিয়েছো তাকে?

বৌটা বুঝতে পারে না, অন্যায়টা সে কী করেছে। বলে, হ্যাঁ।

কোতোয়াল আর এক তিল বসে না। প্রায় ছুটেই বাইরে চলে আসে। কিন্তু সেখানে সেই পাঁচটি প্রতারিত সন্তান ছাড়া অন্য কোনও নফর বান্দাকে দেখতে পায় না সে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ গোল করে খালিদ পাহারাদারকে প্রশ্ন করে, বান্দাগুলো কোথায়?

—পাহারাদার বোকার মতো এদিক ওদিক তাকায়, জী বান্দা?

—হ্যাঁ পাঁচটি বান্দা, তোমার মালকিন, আজ দুপুরে এক বৃদ্ধার কাছ থেকে কিনেছে। সেই পাঁচটা বান্দা কোথায়?

—হুজুর, আমি তো তেমন কোনও খবর জানি না।

খালিদ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে তড়ফায়, আমি তো কোনও খবর জানি না—তা কিছুই যখন খবর রাখ না, তো এখানে সুরৎ-এর বাহার দেখাবার জন্যে থাকার কী দরকার? বিদেয় হও—যত্তোসব বাঁদর কা বাচ্চা—

পাহারাদার কাচুমাচু মুখে বলে, আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন, সেই সময় এই পাঁচজনের সঙ্গে এক বুড়ি এসেছিল। সে-বুড়িকে আমি অন্দরে পাঠিয়ে দিয়েছি, হুজুর।

খালিদ বলে, ওঃ, তোমরা? তা এখানে নবাবের মতো বসে আছো কেন?

গতর তোল ? যাও কাজে হাত লাগাও। তোমাদের মালকিন আমার কাছে বিক্রি করে গেছে তোমাদের।

খালিদের কথা শুনে ওরা পাঁচজনে সোরগোল তুলে কেঁদে ওঠে।—এ আপনার কেমন তরো বিচার হলো আমির সাহেব ? আপনার নামে খলিফার কাছে নালিশ করবো আমরা। আমরা খলিফার অনুরক্ত প্রজা। নিয়ম মাফিক কর দিই—আমরা স্বাধীন—মুক্ত মানুষ। আমরা কি নফর বান্দা যে, আমাদের নিয়ে কেনাবেচার বেসাতি করবেন ? ঠিক আছে, আগে খলিফার কাছে চলুন, তারপর যা বিধি-ব্যবস্থা তিনিই করবেন।

গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে গেল। শাহরিয়ার দেখলো, রাত শেষ হয়ে আসছে।

চারশো তেতাল্লিশতম রজনীতে

আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

খালিদ গর্জে ওঠে, যদি তোমরা নফর বান্দা না হবে, তাহলে তোমরা কী ? নিশ্চয়ই চোর ছ্যাঁচোড় বদমাইশ গুণ্ডা ? ঐ শয়তান বুড়িটার সংগে সাট করে আমার বিবিকে ধোঁকা দিয়ে পয়সা বের করে নিয়েছ। আমি কী তোমাদের অত সহজে ছাড়বো, ভেবেছো ? বিদেশী মুসফীরদের কাছে প্রত্যেককে একশো দিনারে বেচে দেবো।

খালিদ আর ঐ পাঁচজন প্রতারিতের মধ্যে যখন এইরূপ বাকবিতণ্ডা বচসা চলছে, এমন সময় খলিফার দেহরক্ষী শেরকা বাচ্চা মুস্তাফা সেখানে এসে হাজির হয়।

ইতিপূর্বে মুস্তাফা এসে তার বিবির প্রতারিত হওয়ার সমস্ত বিবরণ দিয়ে খালিদের কাছে এজাহার দিয়ে গিয়েছিল। সে সম্পর্কে খালিদ কী হদিশ করতে পারলো কি পারলো না, তারই খোঁজ নিতে এসেছে সে।

সেইদিনের সেই ঘটনার পর থেকে প্রতিনিয়ত খাতুন তাকে খোঁচাচ্ছে, 'শুধু তোমার জন্যে আজ আমার এই দশা হলো। তুমি যদি আমাকে ভয় না দেখাতে —অন্য মেয়ে ঘরে আনবে বলে, তাহলে তো আমি সেই পীরের দরগায় যাওয়ার জন্যে ঐ বদমাইশ বুড়িটার সংগে পথে বের হতাম না। তুমি যদি সে-দিন আমাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত না করতে তা হলে এই সর্বনাশ আমার হতো না।

খালিদকে দেখামাত্র সে জ্বলে ওঠে, কী খালিদ, সেই শয়তান বুড়িটার খোঁজ পেলে ?

খালিদ মাথা হেঁট করে থাকে। মুস্তাফা এবার গর্জে ওঠে, তুমি একটা অপদার্থ কোতোয়াল। সারা শহরটা চোর বদমাইশ-এর আস্তানা হয়ে গেল, সে দিকে তোমার কোনও হুঁশ নাই। শুধু নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছো ! যেমন তোমার অপদার্থ পাহারা পেয়াদা তেমনি তোমার গোবর-ঠাসা মগজ। একেবারে অকম্মার ঢেঁকি। তা না হলে, সাত সকালে দিনের আলোয় খলিফার আমিরের বাড়িতে ঢুকে তার বিবিকে রাস্তায় বের করে নিয়ে সর্বস্ব লুটে নেবার সাহস

হয় কী করে হয় ঠগ চোরদের ? আমার যা লোকসান হয়েছে, তার জন্যে আমি একমাত্র তোমাকেই দায়ী করবো—আর কাউকে জানি না আমি।

তখন বুকে সাহস পেয়ে ঐ পাঁচ প্রতারিতও চিৎকার করে ওঠে, আমির সাহেব, আমাদের সকলের অবস্থাও ঠিক একই রকম। আমরাও সেই ধূর্ত বুড়ির ধাপ্পায় ভুলে যথাসর্বস্ব খুইয়েছি। তারই নালিশ করতে এসেছিলাম আমরা এই কোতোয়ালের কাছে—আর্জি ছিল ন্যায্য বিচার।

—কীসের বিচার ?

তখন পাঁচজনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতারিত হওয়ার করুণ কাহিনী শোনালো তাকে।

আমির মুস্তাফা গম্ভীর হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, হুম্, তোমাদের দশাও দেখছি একই রকম। সবই এই কোতোয়ালের অকর্মণ্যতা—কোনও গুরুত্বই সে বুঝতে পারেনি।

খালিদ বিনীত হয়ে বলে, আমির সাহেব, আপনার বিবির কাছে আপনি খাটো হয়ে যাচ্ছেন, এটা আমি বুঝি। আপনি খলিফার দরবারের এখন একজন জাঁদরেল আমির। এই সামান্য একটা ঠগ জোচ্চোরকে শায়েস্তা না করতে পারলে ইজ্জৎ থাকে কী করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমির সাহেব, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, যেন-তেন প্রকারে সেই শয়তান বুড়িকেই আমি ধরবোই।

আমির তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলে, তোমার কেরামতী আর দেখতে চাই না। আমি নিজেই এর ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা শোন, মুস্তাফা প্রতারিত পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের মধ্যে কেউ আছ যে, ঐ বুড়িটাকে দেখলে চিনতে পারবে ?

সবাই সমস্বরে বলে, আমরা সকলেই তাকে চিনতে পারবো, হুজুর।

গাধার মালিক বিশেষভাবে বলে, হাজারটা শয়তানীর মধ্যেও যদি সে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে, আমি তাকে এক নজরেই টেনে বার করতে পারবো! আমি বলি কি, হুজুর, আমার সঙ্গে আপনি মেহেরবানী করে জনা-দশেক সিপাই দিন। তারপর দেখুন, আমি তাকে আপনার কাছে হাজির করতে পারি কি না।

সঙ্গে সঙ্গে দশজন সিপাই সঙ্গে দিয়ে ওদের পাঁচজনকে, শয়তান বুড়িটাকে পাকড়াও করে আনার উদ্দেশ্যে, পাঠানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়ির সন্ধানও তারা পেয়ে গেল। ওদের দেখামাত্র ঊর্ধশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সিপাইরা তাকে ধরে ফেলে। পিঠমোড়া করে বেঁধে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে আসে।

কোতোয়াল খালিদ গর্জে ওঠে, চুরির মাল-পত্র সব কোথায় রেখেছো ?

ডিলাইলাহ অবাক হওয়ার ভান করে বলে, জীবনে আমি কারো একটা কুটো চুরি করিনি। বুঝতেই পারছি না, কেন আমাকে ধরে এনেছেন আপনি ?

খালিদ ক্রোধে কাঁপতে থাকে, বুঝিয়ে আমি দিচ্ছি। এ্যাই, এই মেয়েছেলেটাকে আজকের রাতের মতো কয়েদখানার আঁধার ঘরে বন্ধ করে রাখ।

কিন্তু কয়েদখানার সর্দার বললো, আমাকে মাফ্ করবেন, হুজুর, আমি পারবো না ?

খালিদ চিৎকার করে ওঠে, কেন, কেন পারবে না ?

সর্দার বলে, এই বুড়ির ছলচাতুরী বড় মারাত্মক। সে যে কী ভাবে আমার লোকজনদের চোখে ধুলো দিয়ে হাওয়া হবে, তা কেউ জানে না। তাই আমি এত বড় ঝুঁকি কাঁধে নিতে পারবো না, হুজুর।

খালিদ গুম মেরে গেল কিছুক্ষণ। তারপর পঞ্চ প্রতারিতদের প্রতি নির্দেশ করে বললো, ঠিক আছে, আজ সারারাত একে তোমরা সকলে মিলে পাহারা দেবে। তারপর কাল সকালে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। চলো, বুড়িটাকে আমরা বাগদাদ শহরের সীমানার বাহিরে নিয়ে গিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখি।

খালিদ ঘোড়ায় চাপলো। সিপাইরা বুড়ি ডিলাইলাহকে টানতে টানতে নিয়ে চললো। শহরের প্রাচীর সীমা পার হয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে ডিলাইলাহর চুল জড়িয়ে বাঁধা হলো। তারপরই পাঁচজন প্রতারিতকে পাহারায় মোতায়েন করে বাকী লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়াল ফিরে এল তার বাড়িতে।

সবাই মিলে, বিশেষ করে গাধার মালিক বুড়ির আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগলো। যত রকম মুখ খারাপ করে গালাগাল, খিস্তি খেউর সম্ভব—কিছুই বাদ করলো না।

কিন্তু কতক্ষণ আর এইভাবে এক ঘেয়ে গালিগালাজ করে কাটানো যায়। গত কয়েকটা দিন বুড়ির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে সকলেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে রাত বাড়তে থাকে। ওদেরও চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। খানাপিনা শেষ করে নেয় সকলে। তারপর আর একদণ্ডও তারা চোখ মেলে থাকতে পারে না। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

নিশুতি নিঃঝুম রাত। ডিলাইলাহকে বৃত্তাকারে ঘিরে পড়ে পড়ে নাক ডাকাতে থাকে সেই পঞ্চ-প্রহরী। তখনও কিন্তু ধূর্ত বুড়ি জেগে। রাত আরও গভীর হতে থাকে। হঠাৎ ডিলাইলাহ দেখলো, দুটি দস্যু ঘোড়ায় চেপে এইদিকে আসছে। রাতের নিস্তব্ধতায় ওদের অনুচ্চ আলাপও বেশ পরিষ্কার শুনতে পায় সে।

একজন বলছে ঃ আচ্ছা ভাইসাব এই সুন্দর বাগদাদ শহরে সব চাইতে মজার কাজ তুমি কী করেছো ?

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে

চারশো চুয়াল্লিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

—আল্লাহর দোয়ায় আমি আমার সব চাইতে পেয়ারের খানা বেশ পেট ভরে

খেয়েছি। খুব খাঁটি মধু-মাখানো পিঠে আর মাখন আমার খুব প্রিয় খাদ্য। এখনও তার সুবাস নাকে লেগে রয়েছে।

এই সময় তারা ডিলাইলাহর আরও কাছে এসে পড়ে।

—কে তুমি ? এখানে এসেছো কেন ?

ডিলাইলাহ গলায় মধু ঢেলে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে, শেখ সাহেব, আপনারা আমাকে বাঁচান।

আরব দস্যুদের একজন বলে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাকে ডাকো। তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা। কিন্তু এই খুঁটির সঙ্গে কে তোমকে বেঁধে রেখেছে ?

—তা হলে আমার দুঃখের কাহিনী শুনুন মুসাফির, আমার একটি দুশমন আছে। সে মধু দিয়ে পিঠে আর মাখনের মিঠাই বানাতে ওস্তাদ। সারা বাগদাদ শহরে এইজন্যে তার খুব নাম-ডাক। তার মতো জিভে জল আনা মধু আর সরের মিঠাই আর কেউই বনাতে পারে না। এই লোকটা আমাকে একদিন খুব মারধোর করেছিল। তারই প্রতিহিংসায় জ্বলছিলাম আমি। ওর দোকানে গিয়ে মিঠাই মন্ডার বারকোষে থু থু ছিটিয়ে দিলাম। কোতোয়ালের কাছে সে আমার নামে নালিশ করেছিল। তারই সাজা হিসেবে সে আমাকে এই খুঁটিতে বেঁধে রেখে গেছে। একমাত্র একটা শর্তেই সে আমাকে খালাস দিতে পারে। সে হলো, কোতোয়ালের সামনে দশখানা থালা-ভর্তি মধু-পিঠা খেতে হবে। যতদিন আমি তা খেতে না পারবো, ততদিন আমাকে এইভাবে সাজা পেতেই হবে। সকাল হতে না হতেই কাল আমার সামনে দশথালা মধু-পিঠা এনে ধরা হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন শেখ সাহেব, কোনও মিঠাই-এর গন্ধ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। বমি এসে যায়। বিশেষ করে ঐ মধুর পিঠা দেখা মাত্র আমার কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসে। অথচ ভাবুন, ঐ অখাদ্য খাবার একটা দুটো নয়, দশ-দশ থালা আমাকে উদরস্থ করতে হবে। তবে আমি ছাড়া পাবো ! ইয়া আল্লাহ, আমার কপালে আরও ক'দিন এই সাজা লেখা আছে একমাত্র তুমিই জান। না খেয়ে খেয়ে একদিন এখানেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হবে।

বাদাবী-দস্যু টোপ গিললো, আমরা আরব, তুমিও আরব। তোমার দুঃখে আমাদের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমরা বাগদাদ শহরের নামজাদা মধু-পিঠের লোভেই এখানে এসেছি। আর সেই পিঠের গন্ধ তুমি সহ্য করতে পার না ? যাই হোক, তোমার কষ্ট দেখে আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে। যদি চাও, তবে তোমার হয়ে আমরা তোমার পিঠেগুলো উদরস্থ করতে পারি।

কিন্তু ওরা তো আপনাদের তা খেতে দেবে না। কোতোয়ালের হুকুম আছে ; শহরের বাইরে একটা খুঁটিতে বাঁধা আছে যে, তাকে খাওয়াতে হবে দশথালা মধুর পিঠা। মধু-পিঠা যদি খেতে চান তবে এই খুঁটিতে বাঁধা থাকতে হবে।

বাদাবীদের একজন অপরজনকে বললো, আমি তো অনেক মধুর পিঠে খেয়ে পেট ডাঁই করে এসেছি। আমি চলি, তুমি বরং খাও।

সে চলে গেল। অন্য বাদাবীটা তখন বললো, কিন্তু আমি যদি তোমার

জায়গায় বাঁধা হয়ে থাকি, তবে তো. কাল সকালে কোতোয়ালদের লোক এসে আমাকে দেখে চিনে ফেলবে। তারা ভাববে, মেয়েছেলেটা গেল কোথায় ?

ডিলাইলাহ বললো, আমিও সে-কথা ভেবেছি। শুনুন, আপনি আপনার সাজপোশাক আমাকে দিন, আর আমি আমার এই সাজপোশাক আর বোরখা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। বোরখায় তো আপনার সর্বাঙ্গ ঢাকাই থাকবে। ওরা চিনবে কী করে—আপনি পুরুষ না মেয়ে ?

বাদাবী বললো, হুঁ, ঠিক বলেছো।

তারপর দুজনে পরস্পরের সাজপোশাক বদলে নিল। বাদাবীর পোশাক পরে ডিলাইলাহ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে। আর বাদাবী ডাকাতটা বোরখা পরে সেই খুঁটিটার সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বাঁধে।

সকাল হতে পণ্ড-প্রহরীর ঘুম ভেঙে যায়। গাধার মালিক এগিয়ে গিয়ে বন্দীকে প্রশ্ন করে, কী গো বুড়ি, তোমার ঘুমটুম কেমন হলো ?

বাদাবীটা তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করে, মেরা পিঠা কাঁহা. পিঠা লে আও।

—এ্যাঁ ! এ যে পুরুষ মানুষের গলা ! একি হলো ?

গাধার মালিক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, এখানে তুমি কী করছো ? আর ঐ বুড়িটাকেই বা ছেড়ে দিলে কেন ?

কিন্তু বাদাবী দস্যু সে কথার জবাব দেয় না। তার সেই এক কথা। আমার পিঠে কোথায়, জলদি নিয়ে এসো। আমার বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। সারাটা রাত আমার কিছুই খাওয়া হয়নি। সুতরাং ঝটপট নিয়ে এসো।

গাধার মালিক তবু প্রশ্ন করে, বুড়িটা গেল কোথায় ?

—তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। সে তো মধু-পিঠে খেতে পারবে না। খামোকা তাকে আটকে রেখে কী লাভ ? তাই আমি তাকে খালাস করে দিয়েছি।

পণ্ড-প্রতারিত বুঝতে পারে, এই দুর্ধর্ষ বাদাবী ডাকাতকেও বুড়িটা প্রতারণার ফাঁদে আটকে রেখে হাওয়া হয়ে গেছে। ওদের চোখে মুখে হতাশার করুণ ছবি ফুটে ওঠে। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, আল্লাহ যাকে ছেড়ে দেবে, মানুষ তাকে কী বেঁধে রাখতে পারে ?

এরপর কী করা যায়, কী তারা বলবে কোতোয়ালের কাছে, তাই ভেবে সবাই তখন আকুল। এমন সময় ঘোড়ায় চেপে কোতোয়াল এসে হাজির হলো সেখানে। তার সঙ্গে একদল সশস্ত্র সিপাই।

বাদাবী তখন কোতোয়ালকে উদ্দেশ্য করে হুংকার ছাড়ে, কই, আমার মধুর পিঠে কোথায় ?

খালিদ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার, এ সব কী ? বুড়িটা কোথায় গেল ? এ তো একটা দামড়া।

পণ্ড-প্রহরী মাথা চুলকায়, বলে, এই হচ্ছে নসীব। ঐ ধূর্ত বুড়িটা এই বাদাবীকে বোকা বানিয়ে এখানে বেঁধে রেখে সে তার ঘোড়া নিয়ে হাওয়া হয়ে

গেছে। আপনার দোষেই সে আজ পালিয়ে গেল। চলুন, আপনাকে আমরা খলিফার দরবারে নিয়ে যাবো। আপনি যদি জনকয়েক সিপাই আমাদের সংগে দিতেন, সে তো এইভাবে পালাতে পারতো না। সুতরাং এর জন্যে একমাত্র আপনিই দায়ী। আপনি কী ভেবেছিলেন, আমরা আপনার কেনা গোলাম? সারারাত জেগে আপনার হুকুম তামিল করবো?

তখন খালিদ বাদাবীকে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কী বল তো? তুমি এখানে এলে কী করে?

বাদাবী-দস্যু সমস্ত কাহিনী খুলে বললো তাকে।

—আমাকে সে বলেছে, এখানে এই খুঁটিতেই বাঁধা থাকলে সকাল বেলায় থালা-থালা ভর্তি মধু-পিঠে আর মাখন পিঠে খেতে পাওয়া যাবে। তা সকাল তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। কোথায়, আমার পিঠে কোথায়, নিয়ে এসো।

বাদাবীর কথা শুনে খালিদ আর তার সিপাইরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু পঞ্চ প্রতারিতরা রাগে গর্‌গর্‌ করতে থাকে।

—ওসব হাসি-টাসি রাখুন। এখন খলিফার কাছে যেতে হবে আপনাকে। আমরা এর একটা বিহিত চাই।

বাদাবীটা তখন তড়পাতে থাকে, এখনও বলছি, ওসব ধোঁকাবাজী ছাড়ো, মধু-পিঠা নিয়ে এসো।

কিন্তু তার কথায় কেউ-ই কর্ণপাত করলো না। সবাই শুধু হাসতে থাকে। অবশেষে বাদাবী বুঝতে পারে, ঐ বুড়িটা তাকে ধোঁকা দিয়ে তার সাজ-পোশাক আর ঘোড়াটা নিয়ে কেটে পড়েছে। মধু-পিঠা আর মাখন-পিঠার গল্প—সব বানানো।

খালিদ দেখলো, মামলা বড় জটিল আকার ধারণ করছে। এ অবস্থায় কানে তুলো দিয়ে বসে থাকলে ভবিরা ভুলবে না। তাই সে বাধ্য হয়ে সকলকে সংগে নিয়ে খলিফার দরবারে এসে হাজির হয়।

রাত্রি শেষ হতে চলেছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁয়তাল্লিশতম রজনী

শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে:

খলিফার সাক্ষাৎ মঞ্জুর হলো। খালিদ তার দলবল নিয়ে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করে। খলিফা হারুন অল রসিদ তখ্‌তে আসীন। তাঁর একপাশে দেহরক্ষী মুস্তাফা দণ্ডায়মান। উজির আমিরে ঠাসা পরিপূর্ণ দরবার মহল।

খলিফা নিজেই জিজ্ঞাসবাদ করতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি সেই গাধার মালিককে জেরা করতে শুরু করলেন। এবং শেষ করলেন কোতোয়াল খালিদকে দিয়ে। প্রত্যেকে যে-যার কাহিনী বলে গেল। খলিফা হারুন অল রসিদ বিষম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

—তাজ্জব কাণ্ডখানা! যাইহোক, আমার পূর্ব-পুরুষদের সুনাম যাতে রক্ষা হয়, সে-জন্য যার যা খোয়া গেছে সবই পূরণ করে দেওয়া হবে আমার ধনাগার

থেকে। গাধার মালিক তার গাধা পাবে। সওদাগর পাবে হাজার দিনারের বটুয়া. রঙের কারবারীর দোকানের যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে দেবো আমি। ইহুদী জহুরীর সোনাদানা যা গেছে, তাও সে পাবে। নাপিতের জন্য একটা দোকান তৈরি করে দেওয়া হবে, আর এই বাদাবী—সেও ফেরত পাবে তার সাজ-পোশাক এবং একটি আরবী ঘোড়া। এ ছাড়াও তাকে দিতে হবে দশখানা থালা-ভর্তি বাগদাদের বিখ্যাত মধু-পিঠা। খেয়ে যাতে তার প্রাণ ভরে যায়। কিন্তু সবার আগে আমার হুকুম—সেই বুড়িটাকে আমার সামনে হাজির করতে হবে। শোন খালিদ এবং মুস্তাফা, তোমরা এখন বেরিয়ে পড়। আজ সন্ধ্যার আগে সেই বুড়িকে এখানে ধরে নিয়ে এসো। তারপর আজ রাতে আমার এইখানেই খানা-পিনা করবো। কিন্তু খালি হাতে ফিরবে না। মনে রেখো রাতের খানা তোমাদের এখানেই খেতে হবে। যাও, এই আমার হুকুম।

আমির খালিদ প্রমাদ গুনলো। খলিফার এই কথা অর্থ সে ভালোভাবেই জানে। নিজের অক্ষমতা জানিয়ে সে নিষ্কৃতি চায়, আমাকে রেহাই দিন, জাঁহাপনা। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। ঐ ধূর্ত শয়তানীকে কব্জায় আনা আমার কম্মো নয়। ও যে কী-ভাবে কখন চোখে ধুলো দিয়ে বুড়বাক বানিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে তা কল্পনারও অতীত। মেহেরবানী করে এ ভার আপনি অন্য কাউকে দিন। আমি পারবো না।

খলিফা হো হো করে হেসে উঠলেন।—তাহলে আর কোতোয়াল হয়ে বসে থেকে কী করবে। অন্য কোনও কাজ দিতে হবে তোমাকে, কী বল?

খালিদ বলে, ধর্মাবতার! আপনার সুযোগ্য দক্ষিণ হস্ত শহরের সেরা সিপাই-প্রধান আহমদকেই এই দায়িত্ব দিন। আমার মনে হয় তার চোখে ফাঁকি দিয়ে সে বুড়ি নিস্তার পাবে না। তার বিচক্ষণতা এবং বেতন আমার চেয়ে অনেক বেশি। এ কাজ তারই উপযুক্ত। এতদিনে সে শুধু আপনার কাছ থেকে দামী দামী উপহার আর মোটা অঙ্কের ইনাম নিয়ে আসছে। কাজের নমুনা কিছুই দেখায়নি। এবার তাকে এই ভারটা দিন, জাঁহাপনা। তারপর বোঝা যাবে তার এলেম।

খলিফা মাথা নাড়লেন, ঠিক, ঠিক বলেছো খালিদ। কই, আহমদ, এদিকে সামনে এসে দাঁড়াও।

তৎক্ষণাৎ আহমদ খলিফার সামনে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো।—মহামান্য ধর্মাবতার, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য, আদেশ করুন, জাঁহাপনা!

—শোন আহমদ, খলিফা বলতে থাকেন, একটি ধূর্ত ঠগ বুড়ি মেয়েছেলে এই বাগদাদ শহরের নিরীহ মানুষকে প্রতারণা করে বেড়াচ্ছে। সে-সব কাহিনী তুমিও নিশ্চয়ই এখানে শুনেছো। এখন আমার কথা হচ্ছে, এ ধরনের ব্যাপার আমার শহরে চলতে দিতে পারি না। আমি তোমাকে ভার দিচ্ছি, যে ভাবে পারো আজই ঐ মেয়েছেলেটাকে আমর সামনে হাজির কর।

আহমদ বললো, যো হুকুম জাঁহাপনা, আজই ধর্মাবতারের কাছে এনে দিচ্ছি তাকে।

আহমদ আর বিলম্ব করলো না। চল্লিশজন সিপাই ঘোড়-সওয়ার নিয়ে সে শহরের পথে বেরিয়ে পড়লো। বাদাবী দস্যু এবং সেই পঞ্চ প্রতারিতরা দরবারেই রয়ে গেল।

আহমদের প্রধান সাগরেদ চল্লিশ সিপাই-এর সর্দার আলী এইসব তল্লাসী এবং গ্রেপ্তারে মহা-ওস্তাদ। তার প্রধান কারণ এক সময়ে সে-ও চোর ডাকাত-দলের পাণ্ডা ছিল। আটঘাট তার সবই নখদর্পণে। সে বললো, আহমদ সাহেব, ঐ বুড়িকে পাকড়াও করা খুব একটা সহজ কাজ হবে মনে করবেন না। সারা বাগদাদে অমন হাজার-হাজার বুড়ি মেয়েছেলের দেখা পাবেন আপনি। তার মধ্যে কে যে শয়তানী কী করে ধরবেন?

আহমদ পাল্টা প্রশ্ন করে, তাহলে কী করবে, ভাবছো?

—আমার মনে হয় কী জানেন, এ বিষয়ে হাসান সাহেবের যুক্তি-পরামর্শ নিলে ভালো হতো। তাঁর মাথায় অনেক ভালো বুদ্ধি খেলে। এই ধরনের ধূর্ত শয়তান ঠগদের সেই কাবু করতে পারবে। কারণ আমরা বরাবরই ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই লুঠপাঠ করে কামিয়েছি, আর হাসান সাহেব তো পয়সা কামিয়েছেন লোককে ধোঁকা দিয়ে, ঠকিয়ে, চালাকী করে, বুদ্ধি খাটিয়ে। সুতরাং এ ব্যাপারটা তিনিই ভালো রপ্ত করতে পারবেন।

—না না না, আহমদ প্রায় চিৎকার করে ওঠে, এতবড় নাম কেনার সুযোগ যখন আমার কপালে জুটেই গেছে সে সৌভাগ্যের বখরা আমি অন্য কাউকে দিতে চাই না।

এই সময় তারা চলতে চলতে হাসানের বাড়ির সামনে এসে পড়েছিল। কিন্তু আহমদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে গলা ফাটিয়ে তখনও বলে চলেছে, একটা বুড়িকে পাকড়াও করা এমন কী শক্ত কাজ। অথচ তার জন্যে দরবারে আমার কী ইজ্জত বাড়বে একবার ভাবো তো! আর এই জিনিসের ভাগ দেবো আমি হাসানকে? সে কখনো হতে পারে না।

আহমদের অশ্বারোহী বাহিনীর খুরধ্বনি শুনে সে জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই সে আহমদের সব কথা স্পষ্ট শুনতে পেল। মনে মনে ভাবলো, ঠিক আছে আহমদ, তুমি আজ খলিফার বড় পেয়ারের লোক হয়েছো। কিন্তু আমারও নাম হাসান, দেখি তোমার দৌড় কতদূর।

শহরের মাঝখানে এসে আহমদ তার সেপাইদের চারভাগে বিভক্ত করে শহরের চারদিকে অনুসন্ধান করতে পাঠিয়ে দিল। বললো, তোমরা তল্লাসী চালিয়ে সবাই মুস্তাফার বাড়ির গলির মুখে চলে আসবে সবাই। আমি সেখানে অপেক্ষা করবো।

নিমেষের মধ্যে সারা শহরময় রটে গেল; আহমদের সিপাইরা শহরের বাড়ি বাড়ি খানাতল্লাসী করে সেই ধূর্ত বুড়িকে গ্রেপ্তার করতে বেরিয়েছে। কথাটা ডিলাইলাহ জাইনাবের কানে পৌঁছতেও দেরি হয় না। জাইনাব বলে মা, এখন কী উপায় হবে?

ডিলাইলাহ বলে, ঘাবড়াসনে বেটা, কিছু ভয় নাই। আমি খবর পেয়েছি,

আহমদের সঙ্গে হাসান নাই। সে একা তার দলবল নিয়ে বেরিয়েছে। এই আহমদটা একটা মাথা-মোটা। ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি নাই, ওকে আমি আদৌ ডরাই না। হ্যাঁ, ভয়ের কথা হতো, যদি হাসান ওর সঙ্গে থাকতো। লোকটা মহা ঠগবাজ। আর লোক ঠকাতে গেলে মগজে বুদ্ধি ধরতে হয়। তা তার আছে। সেইজন্যেই ওকে আমার ভয় ছিল। খলিফা যদি আমাকে পাকড়াও করার জন্য হাসানকে ভার দিত, আমি বলতে পারি আমাকে সে গ্রেপ্তার করতে পারতো। কিন্তু আহমদের চৌদ্দ পুরুষেরও সাধ্য হবে না, আমাকে কব্জা করতে। তবে আজকে আমার শরীরটা ভালো নাই বাছা, আমি আর পথে বেরুবো না। এক কাজ কর, আজ তুই একটু খেল দেখিয়ে দে ওদের। প্রমাণ করে দে দেখি, মা-এর চেয়ে মেয়ে কিছু কমতি যায় না! ঐ চল্লিশটা সিপাইকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যা তারা জীবনে ভুলতে পারবে না। কী, পারবি না?

জাইনাব হাসে, তোমার দোয়া থাকলে কোন্ কাজ আটকায়, মা?

রাত্রি শেষ হয়। অন্ধকার কেটে আসে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ছেচল্লিশতম রজনীতে

আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

জাইনাবের শরীরখানা সাপিনীর মতো লকলকে। গভীর আয়ত টানাটানা চোখ, সুন্দর মুখের গড়ন, উদ্যত বুক, সরু কোমর, ভারী নিতম্ব। এক কথায় কামনার বহ্নিশিখা। খুব জমকালো সাজ-পোশাকে সাজগোজ করলো সে। আর খুব পাতলা রেশমী বোরখায় ঢাকলো তার অঙ্গ। বলা যায়, আরও বেশী করে দেখাবার জন্য, প্রলুব্ধ করার জন্যই এই ঢাকনা পারলো সে। এইরকম মোহিনী মূর্তি ধরে মায়ের কপালে চুমু খেয়ে সে বললো, মা, আমার এই কুমারী যৌবনের কসম খেয়ে তোমাকে বলছি, ঐ চল্লিশটা সিপাইকে আজ আমি বাঁদর নাচ নাচাবো, তবে ছাড়বো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে সোজা মুস্তাফার বাড়ির দিকে রওনা হলো। মুস্তাফার বাড়ির কাছাকাছি মসুলের হজ করিমের শরাবখানা। দজার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে। জাইনাব মিষ্টি করে হাসির বান ছুঁড়লো তার দিকে।

হজ করিম ধন্য হয়ে গেল। সে বারবার মাথা হেলিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে থাকলো। জাইনাব কাছে এগিয়ে গিয়ে হজ করিমের হাতে পাঁচটা দিনার গুঁজে দেয়।

—এই পাঁচটা দিনার রাখুন করিম সাহেব। আমি আপনার বড় ঘরটা এক দিনের জন্য ভাড়া নিচ্ছি। আমার কিছু ইয়ারদোস্তরা ফুর্তি করতে আসবে। সেইজন্যে আপনার কাছে আমার আর্জি, এই একটা দিনের জন্য আপনি আপনার উটকো খদ্দেরদের ঢোকাবেন না। আপনার কোনও লোকসন হবে না, সে ভরসা আপনাকে দিচ্ছি।

ইলাহর

হজ করিম বললো, শুধু আপনার জন্য, আপনার ঐ সুন্দর চো

আমি আপনাকে মাঙনায় ঘরখানা ছেড়ে দিচ্ছি। শুধু আমার একটা অনুরোধ, আপনার মেহেমানদের আপ্যায়ন করার জন্য শরাব খাওয়াতে কার্পণ্য করবেন না।

জাইনাব হেসে বলে আমার দোস্তরা এক একটা মদের পিপে। শরাবে তাদের অরুচি নাই। আপনার দোকানে যত মদ আছে সবই সাবাড় করে দেবে তারা।

এই বলে জাইনাব আবার নিজের বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে বাঁধা ছিল সেই ছেলেটার গাধা আর বাদাবীর ঘোড়া। সে ভাড়া নিয়ে তাদের পিঠে বোঝাই করে গালিচা, আসন, তাকিয়া, পেয়ালা, পিরিচ এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। তার পর আবার ফিরে আসে হজ করিমের শরাবখানায়।

সে খুব কায়দা করে সরাইখানার সদর দরজা থেকে আরম্ভ করে ভিতরের ঘর পর্যন্ত চমৎকারভাবে সাজায়। ঘরের মেজেয় দামী গালিচাখানা বিছিয়ে দেয়। আর বড় বড় মদের বাহারী ঝারি বসিয়ে দেয় সদর দরজার দুইপাশে। তার সংগে নানারকম লোভনীয় বাদশাহীখানার রেকাবীও থরে থরে সাজিয়ে রাখে সেখানে। নিজেও দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আহমদের দশজন অশ্বারোহী সিপাই এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের সংগে আহমদের প্রধান সাগরেদ আলীও ছিল। তার সাজগোজ একেবারে জাঁদরেল সেনাপতির মতো। ন'জন অনুচরকে সংগে নিয়ে সে শরাব-খানার ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে, ক্ষিপ্র হাতে জাইনাব তার মুখের নাকাব সরিয়ে দেয়। আলী অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, তুমি এখানে কী করছো খুকী?

আলীর শরীরে রক্ত চনমন করে ওঠে। মেয়েটার দেহে যাদু আছে। জাইনাব বলে, আপনিই কী কাপ্তান আহমদ?

— খোদা হাফেজ, না, আমি নই। কিন্তু আমি ওই সিপাইদলের সেনাপতি। আমার নাম আলী। তা, আহমদকে খুঁজছো কেন? শোন সুন্দরী, তোমার জন্য আমি যা করতে পারি, স্বয়ং আহমদ তা করতে পারবে না। বল তোমার কী চাই?

জাইনাব ফিসফিস করে বলে, আপনিই তো জাঁদরেল, কেন পারবেন না আপনি? নিশ্চয়ই পারবেন। তা এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন ভিতরে চলুন। একটু আরাম করবেন।

জাইনাব দশজনকেই সংগে করে বড় ঘরের ফরাশে নিয়ে গিয়ে বসায়। গোল হয়ে বসে সকলে। তাদের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট বড় মদের ঝারি বসিয়ে দেয় সে। এই ঝারির শরাবে সে মিশিয়ে রেখেছিল এক ঢেলা আফিং। পর পর দু পোয়ালা পেটে যেতেই বাছাধনরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো। তারপর পলকের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তারা। জাইনাব তাদের পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল খিড়কীর দরজায়। দরজা খুলে কী ড়ে গড়িয়ে দিল কদর্মাক্ত নোঙরা আস্তাবলে। এইভাবে এক এক করে ডিল। টেনে নিয়ে এসে সে গাদা করে রাখলো সেখানে।

এরপর আবার সে ফরাশ-টরাশ ঠিকঠাক করে ঝেড়ে-পুছে আবার এসে দাঁড়ালো সদর দরজার পাশে। কিছুক্ষণ বাদে আরও দশজন আহমদের সিপাই এসে দাঁড়ায় সেখানে। ঠিক একই কায়দায় তাদেরও কুপোকাৎ করে একইভাবে শরাবখানার পিছনে গাদা দিয়ে রেখে দেয় সে। এইভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ বাহিনীর কুড়িজনকেও সে চোখের বান মেরে, আফিং-মেশানো মদ খাইয়ে অচৈতন্য করে শরাবখানার পিছনে গাদা করে রেখে আসে।

জাইনাব আবার ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে সদরে এসে দাঁড়ায়। আসল মক্কেল এখনও আসেনি। কিন্তু জাইনাব জানে, ফাঁদ যখন সে পেতে বসে আছে, আসতে তাকে হবেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়ালো সে। তার চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছিল। চোয়াল পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছিল। ইয়া বড় হাতের চাবুকখানা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে সে গর্জে ওঠে, কোথায় সেই সব কুত্তার বাচ্চাগুলো।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো আহমদ। শরাবখানার দেয়ালের একটা গজালে [illegible]টকে দিল লাগামটা।—আমি তাদের তো এই রাস্তার মুখটায় জড়ো হয়ে থাকতে বলেছিলাম। তা শরাব-এর লোভ আর ছাড়তে পারেনি বেল্লিকরা। [illegible] নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে।

[illegible] দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে এমন মায়াবিনীর হাসি হাসে, তার টাল আ[illegible]তে পারে না বেচারা আহমদ। ওর চোখ দুটো চেটে চেটে খেতে থাকে জাইনাবের কামলোভাতুর শরীরখানা। তাক বুঝে জাইনাবের সরু কোমর-খানা দুলে ওঠে। তার ভারী নিতম্ব আর কচি কদু-সদৃশ স্তনদুটি আহমদের বুকের রক্তে তুফান তুলে। চোখের বিদ্যুৎ হেনে জাইনাব এক অপূর্ব লাস্যময়ী ঢং করে জিজ্ঞেস করে, কার কথা বলছেন, মালিক?

আহমদের অবস্থা তখন সপ্তমে। বুকের রক্তে নাচন ধরেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে, সারা শরীর কেমন শিরশির করছে।

জাইনাব তখন দুই পা ফাঁক করে এমন একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে দাঁড়িয়েছে যা দেখে আহমদের সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। কোনও রকমে বলতে পারে, আমার চল্লিশজন সিপাই এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু সুন্দরী, আমি বুঝতে পারছি না, তারা এখনও এল না কেন? কিম্বা এসে তোমার দোকানে ঢুকে মদ গিলতে শুরু করেছে কিনা?

জাইনাব একদম সামনে নেমে এসে আহমদের হাত ধরে ওপরে তুলতে তুলতে বলে, আপনি ভিতরে বিশ্রাম করুন। আপনার চল্লিশজন সিপাই-ই এসেছিল। আপনার জন্যে অপেক্ষাও করছিল। হঠাৎ ওরা দেখতে পেল, রাস্তার ওপাশ দিয়ে ডিলাইলাহ বুড়ি হনহন করে পালাচ্ছে। তাই সবাই তার পিছনে ধাওয়া করেছে। আপনার প্রধান সাগরেদ আলীসাহেব আমায় বলে গেছেন, আপনি আসবেন। আপনি এলে যেন আপনাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করি, তাও আমাকে হুকুম করে গেছেন। আর এও বলে গেছেন, ডিলাইলাহর

জন্য আপনি যেন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেন। একবার যখন তার হদিশ করতে পেরেছে, ধরে তাকে নিয়ে আসবেই আপনার কাছে। শুনলেন তো সব, এবার তা হলে চলুন, ভিতরে গিয়ে আরাম করে বসবেন! তারপর একটু পরেই বামাল সুদ্ধ এসে হাজির হবে আপনার লোকজন।

মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মতো আহমদ জাইনাবের কাঁধে ভর দিয়ে শরাবখানার ভিতরে ঢুকে পড়ে। জাইনাব ওকে বড় ঘরের ফরাশে নিয়ে গিয়ে বসায়। আহমদের রক্তে তখন আগুন ধরে গেছে।

—শরাব লে আও!

জাইনাব পেয়ালা ভরে সেই আফিং মেশানো মদ এনে আহমদের মুখে ধরে। এক চুমুকেই সাবাড় করে দেয় সে। আর এক পেয়ালাও খেয়ে ফেলে। তারপরই ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। জোর করে চোখ খুলে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে দু-একবার। হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে জাইনাবকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। প্রায় অস্পষ্ট জড়ানো কণ্ঠে মিনতি করে ডাকে, আমার বুকে এসো গো সুন্দরী, তোমাকে গড়িয়ে দেবো—সতনারী হার—

ওর কথা আর শেষ হয় না। জাইনাব নিজেকে সরিয়ে নেয়। আহমদের বিপুল বিশাল দেহখানা এলিয়ে পড়ে যায় ফরাশে। আহমদ-এর গায়ে অনেক রত্নাভরণ ছিল। এক এক করে সব সে খুলে নেয়—এমন কি তার দামী সাজ-পোশাকটা পর্যন্ত। শুধু একটা ইজার রেখে দেয় তার কোমরে। তারপর একই কায়দায় টানতে টানতে নিয়ে যায় খিড়কীর ওপারে। তার অনুচর চল্লিশ-জনের গাদার উপর চাপিয়ে দেয় তার দেহটাও।

এরপর যাবতীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে খিড়কীর ওপাশে বেঁধে-রাখা সেই গাধা আর ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে সোজা বাড়ির পথে পাড়ি দেয় জাইনাব।

মেয়ের কীর্তি শুনে মা ডিলাইলাহর আর আনন্দ ধরে না।

—এই না হলে আমার মেয়ে। ধন্যি আমি, তোকে গর্ভে ধরেছিলাম বেটি!

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতচল্লিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

আহমদ আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা পুরো দুটো দিন পড়ে পড়ে ঘুমালো। তৃতীয় দিনের সকালে যখন তারা জাগলো, প্রথমে বুঝতেই পারলো না, কোথায় তারা পড়ে আছে। কিছুক্ষণ বাদে ঘুমের জড়তা কেটে গেলে একে একে সবই মনে পড়তে থাকলো। লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে কারো মুখে আর কোনও কথা নাই। সবাই মাথা নিচু করে বসে থাকে। কারো পরণেই পোশাক-আশাকের কোনও বালাই নাই। একটি মাত্র ইজার ছাড়া সবই লোপাট হয়ে গেছে। এখন

এই প্রায় ন্যাংটো অবস্থায় তারা পথেই বা বের হবে কী করে। সেই চিন্তাতেই সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে হাসানকে তাদের দলে নেওয়া হয় নি। এ দশা দেখলে এখন সে টিট্‌কারি দিতে কসুর করবে?

কিন্তু উপায়ই বা কী? অগত্যা আহমদ ঐ অবস্থাতেই দলবল নিয়ে রাস্তায় নামলো। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। তা পড়বি তো পড়—একেবারে সেই হাসানেরই সামনে পড়ে গেল তারা। পলকেই বুঝে নিল সে ব্যাপারখানা। আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গান গেয়ে ওঠলো। কিন্তু ভাবখানা এই—যেন সে কিছুই লক্ষ্য করেনি।

ডবকা ছুঁড়ি ভাবে মনে, সব পুরুষই এক
কারণ পাগড়ী পরে মাথায়, সবাই সাজে শেখ
কিন্তু সে কি জানে, কেউ বা তাদের গেঁয়ো ভূত কেউ বা কেতায় চোস্ত ;
কেউ বা তাদের সফেদ গোরা জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ,
আবার কেউ বা তাদের হাঁদা বোকা উজবুক ভোঁদড়
গড়ুরের মতো সুন্দর কেউ ; আবার কেউ শকুনের দোসর।

গান শেষ করার পর সে চমকে ওঠার ভান করে। যেন এতক্ষণ আহমদকে আর তার ধনুর্ধরদের নজরই করেনি সে।

খোদা মেহেরবান, একি জাঁদরেল আহমদ ভাই, আজ এই সাত সকালে একি দৃশ্য দেখতে হলো আমাকে।

আহমদ বলে, হাসান তুমি বড় রসিক। তবে জেনে রাখো কেউই নিয়তি এড়াতে পারে না। নসীবে যা লেখা আছে তা খণ্ডন করবে কী করে? একটা সামান্য মেয়ের পাল্লায় পড়ে আজ আমাদের এই হাল, ভাবতে পারো? একেবারে বুড়বাক বানিয়ে দিয়েছে আমাদের। চেন তুমি তাকে?

হাসান বলে, আমি তাকে চিনি, তার মাকেও চিনি। ওদের দুজনকে ধরে এনে দিতেও পারি। দেখতে চাও?

আহম্মদ অবাক হয়, সে কী করে সম্ভব?

—সম্ভব। সবই সম্ভব। কী করে যে সম্ভব হতে পারে তা তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতে পারি মাত্র একটি শর্তে।

—কী শর্ত?

—তুমি শুধু খলিফার কাছে অক্ষমতা জানিয়ে বলবে তোমার হিম্মতে কুললো না। ওদের তুমি পাকড়াও করতে পারবে না এবং তুমি আমার হয়ে ওকালতী করে খলিফাকে বলবে, হুজুর হাসানের ওপর দায়িত্ব দিন, সে এর বিধি ব্যবস্থা করতে পারবে।

হাসানের পরামর্শ মতো আহম্মদ তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে আসে। সাজ-পোশাক পরে মাথা হেঁট করে সে খলিফার সামনে দাঁড়ায়।

খলিফা প্রশ্ন করেন, সেই বুড়িটা কোথায়? তাকে ধরে এনেছো?

আহম্মদ মাথা চুলকায়, দোহাই ধর্মাবতার, আমার অপরাধ নেবেন না, এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। আপনি হাসানকে এ কাজে বহাল করুন, ও আপনার সামনে হাজির করে দেবে তাকে। এসব কাজ ও-ই আমার চেয়ে ভালো বোঝে। ও শুধু ঐ ধূর্ত বুড়িকেই ধরে আনতে পারবে না, সারা শহরের যত ঠগ জোচ্চোর—সবাইকে সে শায়েস্তা করে দিতে পারবে।

খলিফা প্রশংসার দৃষ্টিতে হাসানের দিকে তাকান, তাই নাকি হাসান? ওই বুড়িকে তুমি চেন? তোমার কী ধারণা, ঐ বুড়িটা শুধু মাত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এত সব বিচিত্র কাণ্ডকারখানা করে চলেছে?

—আপনি যথার্থই বলেছেন, ধর্মাবতার। তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

খলিফা অবাক হয়ে বলেন, তোমার কথা যদি সত্যি হয় হাসান, তবে জেনে রাখ, আমি আমার পূর্বপুরুষদের নামে কসম খেয়ে বলছি, যে সব টাকা পয়সা গহনা-পত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী সে লোক ঠকিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে, সেগুলো যদি সব আবার ফেরত দিয়ে দেয়, তা হলে, তার সব গুনাহ আমি মাফ্ করে দেবো।

হাসান বললো, আপনার জবান যে সাচ্চা—তার প্রমাণ আমার হাতে দিন, জাঁহাপনা।

খলিফা তার একখানা রুমাল হাসানের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। হাসান সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে দরবার মহল ত্যাগ করে বেরিয়ে সোজা চলে গেল ডিলাইলাহর বাড়ি।

জাইনাব দরজা খুলে দিল। হাসান জিজ্ঞেস করে, মা কোথায়?

জাইনাব বলে, ওপরের ঘরে।

হাসান বললো, তাকে গিয়ে বল, সিপাহশালা হাসান এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এই দ্যাখো, স্বয়ং খলিফার রুমাল, তিনি ভরসা দিয়েছেন, তোমার মা লোক ঠকিয়ে যে সব টাকা-কড়ি সোনা-দানা এবং অন্যান্য সামানপত্র হাতিয়ে নিয়েছে, সেগুলো যদি আবার তাদের ফেরত দিয়ে দিতে রাজি থাকে তবে তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এরকম সুযোগ আর পাবে না সে। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাও, তা না হলে আমাকে বল-প্রয়োগ করতেই হবে।

জাইনাবের মুখে সব কথা শুনে ডিলাইলাহ নিচে নেমে এসে হাসানকে বলে, রুমালখানা আমাকে দিন। আমি সব সামানপত্র সঙ্গে নিয়ে খলিফার কাছে যাচ্ছি।

হাসান খলিফার রুমালখানা ডিলাইলাহর দিকে ছুঁড়ে দেয়। ডিলাইলাহ সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে গলায় বাঁধে। গাধা আর ঘোড়াটার পিঠে বোঝাই করে সেই সব সামানপত্র আর কন্যা জাইনাবকে সঙ্গে করে খলিফার দরবারের পথে রওনা হয়।

হাসান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব সামানপত্র পরীক্ষা করে বলে, সবই ঠিক আছে দেখছি কিন্তু আহমদ আর তার চল্লিশটি ধনুর্ধরের সাজ-পোশাকগুলো তো দেখছি না।

ডিলাইলাহ হাসে, ওগুলো তো আমি হাতাই নি হাসান সাহেব।

হাসান হো হো করে হেসে ওঠে,—বিলকুল ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় তার পিছনে জাইনাবের হাত আছে—কী? ঠিক না? ঠিক আছে ওগুলো এখন থাক।

হাসান তাদের সঙ্গে নিয়ে খলিফার দরবারে এসে হাজির হয়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটচল্লিশতম রজনীতে

আবার সে গল্প শুরু করে:

সেই ধূর্ত বুড়িকে দেখামাত্র খলিফা হারুন অল রসিদ গর্জে ওঠেন, তুমিই সেই ঠগ! এত বড় স্পর্ধা তোমার, আমার মুলুকে বাস করে আমারই নাকের ডগা দিয়ে এই সব প্রতারণা ধান্দাবাজী চালিয়ে যাচ্ছো? এখুনি তোমার আমি গর্দান নেবো।

ডিলাইলাহ অবাক হয়ে হাসানের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি না আমাকে বলেছিলেন হাসান সাহেব, ধর্মাবতার এই রুমাল দিয়ে অঙ্গীকার করেছেন!

হাসান তখন এগিয়ে এসে খলিফাকে কুর্নিশ করে বলে; ধর্মাবতার, বোধ হয় আপনার অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছেন। আপনার দেওয়া ঐ রুমালখানা ডিলাইলাহর গলায় বাঁধা আছে, জাঁহাপনা। আপনি কিছুতেই অন্য রকম হুকুম দিতে পারেন না।

খলিফা আত্মস্থ হন। - ওঃ, হ্যাঁ, তাই তো! আমি তো তোমাকে জবান দিয়েছিলাম—। ঠিক আছে, জবানের তো নড়চড় হতে পারে না, হাসানকে যখন কথা দিয়েছি, সেইজন্যে তোমাকে মাফ্ করে দিলাম। কী নাম তোমার?

—আমার নাম ডিলাইলাহ। আপনার আগেকার চিড়িয়া সর্দারের বিধবা বিবি আমি।

খলিফা বললেন, তোমার নামের সঙ্গে একটা যোগ্য খেতাব থাকা দরকার। আমি তোমার নাম দিতাম ধূর্ত ডিলাইলাহ। সে যাক, এখন সাফ সাফ বলতো এই ক'দিন ধরে সারা শহরের নিরীহ মানুষের মনে এমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার করেছো কেন তুমি? তোমার ভয়ে লোকে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না। আমার বাগদাদ শহর—সুখের শান্তির জায়গা। এখানে মানুষ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটায়। কিন্তু তোমার দাপটে তো সব তছনছ হয়ে যাবার দাখিল হয়ে পড়েছিল। কী ব্যাপার, কেন এরকম আরম্ভ করেছিলে? আসলে কারণটা কী?

ডিলাইলাহ বলে, তবে শুনুন ধর্মাবতার, আমার কোনও লোভ-লালচ নাই! বাঁচতে গেলে পয়সার প্রয়োজন আছে ঠিকই, তাই বলে ধনদৌলতে ঘরবাড়ি ভরে ফেলবো—আমির বাদশাহ হবো, এমন লালসা আমার কোনও দিনই ছিল না, আজও নাই। আমি যা চাই, তা হল যশ, মান, খ্যাতি। খলিফার দরবারে

স্বীকৃতি। আমার মৃত স্বামী একদিন আপনার দরবারে এক উঁচু পদে বহাল ছিলেন, দেশের মানুষের কাছ থেকে অনেক সুনাম আদায় করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা আমাদের একেবারেই ভুলে গেছেন। আমাদের আজ আর কোনও বাদশাহী স্বীকৃতি নাই। আমি তারই প্রত্যাশী, জাঁহাপনা। টাকা পয়সার আমার তেমন প্রয়োজন নাই। আমি ধর্মাবতারের দরবারে সামান্য একটু জায়গা পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এই সময় সেই গাধার ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে চাপা আক্রোশে বলতে থাকে, আল্লাহ এর বিচার করবেন, এই বুড়ি আমার একমাত্র সম্বল গাধাটাকে লোপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি। আমাকে এই মুর নাপিতের দোকানে ঢুকিয়ে আমার দু' দুখানা দাঁত উপড়ে নিয়ে তার জায়গায় দুখানা তপ্ত লোহার গজাল বসিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ এর বিচার করবেন।

এরপর সেই বাদাবী দস্যু উঠে বলতে থাকে, এত বড় সে ধাপ্পাবাজ, আমাকে পেটপুরে মধু-পিঠা খাওয়ার মিথ্যা লোভ দেখিয়ে আমার সাজ পোশাক আর ঘোড়াটা নিয়ে সে চম্পট দিয়েছিল।

এরপর সেই রঙের কারবারী, সওদাগর সিদি মুসিন, জহুরী ইহুদী, কাপ্তান মুস্তাফা এবং কোতোয়াল খালিদ সবাই এক এক করে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষয়ক্ষতির কথা জানিয়ে অভিসম্পাত দিতে থাকলো!

সকলের বক্তব্য শোনার পর উদার মহৎ-প্রাণ খলিফা যার-যা খোয়া গিয়েছিল সব তিনি ফেরত দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় সেই সংগে নিজের ধনাগার থেকে প্রত্যেককে তার যোগ্যতা মতো ইনামও দিলেন তিনি। গাধার মালিককে গাধার সংগে আরও এক হাজার দিনার নগদ অর্থ দিয়ে বলা হলো, এই টাকায় সে তার নতুন দাঁত বাঁধিয়ে নেবে। এছাড়াও তাকে একটা চাকরী দিলেন তিনি। সারা দেশের যত গাধার রাখাল আছে সে হবে তাদের সর্দার।

সকলেই তাদের মনের দুঃখ ব্যথা ভুলে গিয়ে খুশি মনে দরবার থেকে বিদায় নিল। খলিফার ন্যায় বিচার এবং বদান্যতার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো সকলে।

তখন খলিফা ডিলাইলাহকে প্রশ্ন করলেন, এবার ডিলাইলাহ, তোমার কী চাই বল?

ডিলাইলাহ যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার, আপনি আমার মৃত স্বামীপদে আমাকে বহাল করুন এই আমার এক মাত্র বাসনা। পাখীদের কী ভাবে বশ করতে হয়, আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি তা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছি। পাখিদের খাওয়ানো ধোয়ানো—পরিচর্যার সব কায়দা-কানুন আমার নখদর্পণে। তা ছাড়া ওদের শেখানো পড়ানোর ব্যাপারেও আমি দারুণ ওস্তাদ। ওদের মুখে চিঠি ধরিয়ে, ইশারা করে তালিম দিয়ে উড়িয়ে দিলে ঠিক জায়গাতে চিঠি বিলি করে আসবে তারা। আমার স্বামী বেঁচে থাকতে আপনি যে বিরাট চিড়িয়াখানাটা বানিয়ে দিয়েছিলেন, আপনি জানতেন আমার স্বামীই সেটা দেখা শোনা করতেন, কিন্তু আসলে আমিই তার সবকিছু তদারক

করতাম। সেই চিড়িয়াখানাটা পাহারা দিত চল্লিশজন নিগ্রো আর চল্লিশটা আফাগন কুকুর। এই কুকুরগুলো যুদ্ধবিদ্যায় ওস্তাদ।

খলিফা চিৎকার করে ওঠেন, সাবাস! তুমি তো সবই জান দেখছি! আর দেরি নয়, আজই, এক্ষুণি তোমাকে আমি আমার প্রধান চিড়িয়া-রক্ষকের পদে বহাল করলাম। চিড়িয়াখানার সব ভার তোমার ওপরেই রইলো। এখনও সেই চল্লিশটা নিগ্রো আর চল্লিশটা আফগান যোদ্ধা কুকুর সেখানে আছে। আজ থেকে তারা সবই তোমার হেপাজতে গেল। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, ডিলাইলাহ, আমার ঐ শেখানো পড়ানো পায়রাগুলো আমার প্রাণ। ওদের একটা খোয়া গেলে তোমাকে তার জবাবদিহি করতে হবে। অবশ্য তোমার এলেম সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমিই এর যোগ্য।

ডিলাইলাহ বললো, আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার মেয়ে জাইনাবকে আমি সঙ্গে নিতে চাই, জাঁহাপনা। সে আমার সঙ্গে চিড়িয়াখানাতে থেকে কাজকাম দেখাশুনা করতে পারবে।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে, আমি অনুমতি দিলাম।

ডিলাইলাহ খলিফাকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নেয়। বাড়ি ফিরে এসে সে তার ঘরের সমস্ত সামানপত্র বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে চিড়িয়াখানার পথে রওনা হয়।

আজ ডিলাইলাহর শাহী সাজ-পোশাক। মাথায় সোনার তাজ পরে সে সদর্পে পথ চলে। সবাই তাকে দেখুক, সে আজ বাদশাহর কত বড় সরকারী কর্মচারী! গোটা চিড়িয়াখানার সে সর্বময় কর্তা। তার কথায় চল্লিশজন ইয়া তাগড়াই নিগ্রো নিয়ত উঠ্ বোস করছে। চল্লিশটা লড়াকু কুকুর আজ তার দখলে। বলতে গেলে, তার হাতে অসীম ক্ষমতা। খলিফার বিশাল মুলুকের নানা সুবাদারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার সে-ই একমাত্র চাবিকাঠি। তার ইশারাতেই পায়রা আকাশে উড়বে। যথানির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে নেমে চিঠি বিলি করে আবার ফিরে আসবে।

রাত্রিবেলায় ডিলাইলাহ চল্লিশটা কুকুর চিড়িয়াখানার চারপাশে ছেড়ে দিয়ে রাখে। কার সাধ্য, কোনও চোর বদমাশ ভেতরে ঢোকে। একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ফেলে দেবে না তারা?

প্রতিদিন সকালে বিকালে সে দরবারে গিয়ে খলিফার সঙ্গে দেখা করে। কোথায় কোন্ সুবাদারকে কী খৎ পাঠাতে হবে বলে দেন তিনি। ডিলাইলাহ যথানিয়মে কাজ করে যেতে থাকে।

চিড়িখানার ভিতরে তার সুরম্য আবাসগৃহে বসে দেওয়ালে ঝুলানো আহমদ আর তার চল্লিশ ধনুর্ধরের সেই সাজ-পোশাকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে মনে কী এক অপূর্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ডিলাইলাহ।

এইভাবে এককালের ঠগ প্রবঞ্চক ডিলাইলাহ এবং ছলনাময়ী জাইনাব বাদশাহী মর্যাদার শিখরে বসে দেশজোড়া নাম যশ খ্যাতি আর প্রচুর ইনামের অধিকারিণী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এভাবেও সব দিন চলে না। বিধাতার ইচ্ছা বোধহয় অন্যরূপ ছিল।

তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের চাকাও ঘুরে যায়।

এরপর জাঁহাপনা, শাহরাজাদ গল্পের প্রথম অধ্যায় শেষ করে বলে, আলী-চাঁদ আর তার অভিযানের কাহিনী বলার সময় এসে গেছে। ডিলাইলাহ এবং জাইনাবের সঙ্গে এই আলীচাঁদ-এর কাহিনী অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এদের সঙ্গে ডিলাইলাহর ভাই মাছের কারবারী জুরেক এবং সেই ইহুদি জহুরী ও যাদুকর আজারিয়াহর কাহিনীও শুনুন। সব মিলে এমন মজাদার কিস্‌সা—এর আগে কখনও শোনেননি আপনি।

শারিয়ার ভাবে, মেয়েটাকে তো মারা যাবে না কিছুতেই। এমন কিস্‌সার শেষটুকু না শুনলে তো চলছে না। দেখাই যাক, আলীচাঁদকে নিয়ে সে কি—কিস্‌সা বানায়।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখে প্রভাত সমাগত, গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ঊনপঞ্চাশ রজনী

আবার সে যথারীতি গল্প শুরু করলো ঃ

বাগদাদে আহমদের সময়ে আর একজন সেয়ানা চোর ছিল। তার নাম আলীচাঁদ। তাকে কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যেত না। পাঁকাল মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে যেত। আলীচাঁদের আসল বাস কাইরোয়। এবং এই নামটাও তার তার নিজের নাম নয়।

বাগদাদে আসার আগে সে কাইরোতেও এই চুরি ডাকাতিই করতো। কেন তাকে স্বদেশ ছেড়ে বাগদাদে পালিয়ে আসতে হয়েছিল আগে সেই কাহিনী শুনুন।

একদিন আলীচাঁদ দুঃখিত এবং বিষণ্ণ মনে তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে বসেছিল তাদের আস্তানায়। দলের সবাই কাঁচা খিস্তি খেউর-এ মত্ত ছিল, কিন্তু সেদিন আলীচাঁদের কিছুই ভালো লাগছিল না। সে এক কোণে বসে বসে অন্য কথা ভাবছিল।

ওস্তাদ, একজন এগিয়ে এসে বললো, এইভাবে বসে না থেকে চলো কাইরোর পথে বাজারে একটু ঘুরি। হয়তো ভাল মতো মালকড়ি কিছু মিলেও যেতে পারে।

নিরাসক্তভাবে আলী বললো, তোরা থাক, আমি একাই চলি।

আলী রাস্তায় নামে। চলতে চলতে সে লালপথে চলে আসে। কাছেই একটা শরাবখানা—এইখানেই ওরা নেশাভাঙ করে। ভিতরে ঢুকতে যাবে সে, এমন সময় দেখা হলো এক ভিস্তিওলার সঙ্গে। লোকটার কাঁধে চামড়ার থলে ভর্তি জল, হাতে দুখানা তামার পেয়ালা। লোকটা সারাদিন শহরের পথে পথে জল বিক্রি করে। সদাই তার মুখে নানা সুরের নানা ঢংএর গান শহরবাসীরা নিত্য শোনে। সেদিনও সে গান গাইছিল মুখে আর বোল বাজাচ্ছিল পেয়ালায় পেয়ালা ঠুকে।

আলী এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়ে। বুড়োটা বেশ মজার গান ধরেছে আজ। হঠাৎ তার মেজাজখানা অনেকটা শেরিফ হয়ে ওঠে। ভিস্তিওলাকে ইশারায় কাছে ডাকে।

লোকটা কাছে এসে একটা পেয়ালায় জল ঢালতে উদ্যত হয়, কী সাহেব দেব নাকি? আমার পানী শহরের সেরা। একবার যে খেয়েছে, সেও পস্তাবে আর যে না খেয়েছে, সেও পস্তাবে। বিলকুল চিড়িয়া কা আঁখো কা তরা সাফা। দেখুন খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।

আলী ইশারায় বলে, দাও।

কিন্তু জলের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে সে পান করে না। ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ভিস্তিওলা অবাক হয়, ইয়া আল্লা ফেলে দিলেন, সাব?

—আর এক পেয়ালা দাও।

দ্বিতীয়বারও সে একই কায়দায় জলটুকু ফেলে দেয়।

এবার ভিস্তিওলা চটে যায়। যদি পিয়াসই না পেয়ে থেকে তবে ঝুটমুট নিয়ে ফেলে দিচ্ছেন কেন, মালিক?

—এমনি, মজা লাগছে। দাও, আর এক পেয়ালা দাও।

ভিস্তিওলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেয়ালা পূর্ণ করে আলীর হাতে দিতে দিতে বলে, এইভাবে পিয়াসের পানি নিয়ে যদি ছেলেখেলা করতে থাকেন তবে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার কাজে চলে যাই।

এবার আলী জলটুকু গলায় ঢেলে দেয়। তারপর জেব থেকে একটা সোনার মোহর বের করে ভিস্তিওলার হাতে দিয়ে বলে, এবার হয়েছে তো?

আলী ভেবেছিল সোনার দিনারটা হাতে পেয়ে লোকটা খুশিতে গদগদ হয়ে তাকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে চলে যাবে। কিন্তু সে-সব কিছুই করলো না সে। দিনারটা হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে আলীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েক বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বললো।

—খানদান দুসরা চিজ! পয়সা থাকলেই বা ছড়ালেই তা কব্জায় আনা যায় না।

ভিস্তিওলার এই রকম কথায় আলীর হাড়পিত্ত জ্বলে ওঠে। ঠাই ঠাই করে গোটাকতক রদ্দা বসিয়ে দেয় তার মাথায়।

—ওরে বুড়ো বোকা বেহুদা, তোর তিন পেয়ালা পানির দাম কতো? তিন পয়সাও হবে না! তার জায়গায় আমি তোমাকে নগদ একটা সোনার দিনার দিলাম, তার বদলে আমাকে এই রকম খারাপ কথা বলছো? তোমার টুঁটি আমি ছিঁড়ে ফেলবো, বদমাইশ, জানো আমি কে?

রাগে তার মাথায় খুন চেপে যায়। আলীর এক একটা ঘুষির ওজন নেহাৎ কম নয়। মারতে মারতে লোকটাকে সে ফোয়ারা-বাগিচার দেওয়ালের কাছে এনে ফেলে।

—খানকির বাচ্চা, তোকে আজ আমি খতম করে ফেলবো। জিন্দগীতে একটা সোনার দিনার চোখে দেখেছিস কখনও? তোর কতটুকু পানি আমি

খেয়েছি বা নষ্ট করেছি ? সব মিলে একটা পোয়াও হবে না। তার দাম কত ?

বুড়ো ভিস্তিওলা বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার পানির দাম তিন দিরহামের বেশি হবে না।

—তবে ? তবে কেন তুমি ঐ রকম খানদান তুলে কথা শোনালে আমাকে ? আমার মতো এই রকম দিল-দরিয়ার মানুষ কোথাও দেখেছো কখনও ?

বুড়ো বলে, আল্লাহ সাক্ষী, দেখেছি, এমন দরাজ দিলের মানুষ আমি দেখেছি যা তামাম দুনিয়া ঢুঁড়লে তার জুড়ি মিলবে না !

আলীচাঁদ জিজ্ঞেস করে, কে সে ? কার কথা বলছো ?

আলীচাঁদের হাতের মুঠিতে তখনও লোকটার চুলের গোছা ধরা। ভিস্তিওলা বললো, মেহেরবানী করে আমাকে যদি ছেড়ে দেন, কোথাও গিয়ে একটু বসেন তবে শোনাতে পারি সে-কাহিনী ঃ

এই সময় রাত্রি শেষ হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঞ্চাশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

আলী আর ভিস্তিওলা বাগিচার ভিতরে ঢুকে ফোয়ারার পাশে শান-বাঁধানো চবুতরায় সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসে। তারপর সেই বুড়ো তার কাহিনী বলতে শুরু করে।

শুনুন মালিক, আমার বাবা ছিলো এই শহরের সব ভিস্তিওলাদের সর্দার। শুধু যারা ধরাবাঁধা বাড়ি বাড়ি পানি দিয়ে বেড়াতো তারা নয়, আমার মতো পথে পথে যারা যেসব ভিস্তিওলা পানি ফিরি করে ফিরতো তাদের সকলেরই প্রধান ছিল সে। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে আমি পেলাম পাঁচটি উট একটি খচ্চর, একখানা দোকান এবং একখানা মকান। আমার মতো লোকের পক্ষে এই-ই অনেক। কিন্তু গরীবরা কিছুতেই তুষ্ট হতে পারে না। যদি কখনও কোনও কারণে তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে তখন আর তারা তা ভোগ করে যেতে পারে না। আনন্দের চোটেই অক্কা পায়।

আমি ভাবলাম, আমার এই বিষয় আশয়কে আরও অনেক বাড়াতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য যাহোক একটা কিছু করতে হবে।

আমাকে শহরের অনেক খানদানী মানুষ এবং সওদাগররা খুব বিশ্বাস করতো। মক্কায় হজ-এ যাবার দিন এসে গেল। আমি আমার উটগুলো আর খচ্চরটা ভাড়া খাটানোর জন্যে হজে যাবো বলে ঠিক করলাম।

কিন্তু ঐ যে বললাম, গরীব মানুষ কখনও বেশি পয়সার মুখ দেখতে পায় না, আর যদি কখনও দেখেও ভোগ করতে পারে না। তার আগেই তার মৃত্যু হয়।

সেবার আমার এমনই বরাত, আমি যখন মক্কার পথে যাবো ঠিক করলাম, তার আগেই তীর্থযাত্রীরা রওনা হয়ে গিয়েছিল। পথে আমি একা পড়লাম।

তার অবশ্যম্ভাবী-পরিণাম ডাকাতের হাতে পড়ে মালপত্র সব খুইয়ে বসলাম। কিন্তু মহাজনরা শুনবে কেন, তাদের দেনা শোধ করতেই হবে। তাই আমার উটগুলো আর খচ্চরটাকে বিক্রি করে মোটামুটি জনাকয়েক পাওনাদারের দেনা চুকালাম। কিন্তু আরও অনেকে রয়ে গেল। তখন ভাবলাম, এই অবস্থায় আমি যদি দেশে ফিরি, আমার মহাজনরা আমাকে রেহাই দেবে না। দেনা চুকিয়ে দিতে না পারলে তারা আমাকে ফাটকে দেবে। সুতরাং আমি সিরিয়ার এক তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে দামাসকাসে চলে গেলাম। তারপর সেখান থেকে আলেপ্পো হয়ে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছলাম।

বাগদাদের ভিস্তিওয়ালা সমিতির সভাপতির সঙ্গে দেখা করে তাকে আমার দুঃখের কাহিনী শোনালাম সব। আর শোনালাম, আমার চোস্ত আরবী-উচ্চারণে কোরাণ পাঠ। মিয়াঁ সাহেব আমার ওপর খুব সদয় হলো। তার পয়সায় আমাকে একখানা চামড়ার ভিস্তি আর দুখানা তামার পেয়ালা কিনে দিয়ে বললো, যাও, পথে পথে পানি বিক্রি করে খাওগে।

কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। সারা বাগদাদ শহরের দোরে দোরে পথে পথে ঘুরেও আমি দুখানা রুটির পয়সা রোজগার করতে পারলাম না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, কাইরো আর বাগদাদের মানুষের মধ্যে অনেক ব্যাপারে আদপেই কোনও মিল নাই। বাগদাদের মানুষ পয়সা দিয়ে পানি কিনে খেতে অভ্যস্ত নয়। পিপাসার্ত কেউ যে-কোনও বাড়িতে বা দোকানে যদি পানি চায়, সাগ্রহে দেয় সকলে। তারা বলে, পানি মানুষের প্রাণতুল্য—এবং এ-বস্তুটি আল্লাহ তৈরি করে পাঠিয়েছেন মানুষের প্রাণ ধারণের জন্য। পয়সার বিনিময়ে যারা তা বিক্রি করে, তারা কাফের। এবং এই কারণে এ ব্যবসা যেমন কেউ করেও না, তেমনি বড় একটা দরকারও হয় না।

যাকেই জিজ্ঞেস করি, 'পানি খাবেন?' সেই 'না' বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একজন আমাকে কিছুটা করুণা করেই উপদেশ দিয়ে গেল, তুমি বড় বাজে ব্যবসায় সময় নষ্ট করছো। এ ধান্দা ছেড়ে অন্য কিছু করার উপায় দেখ।

আর একজনকে বলতেই সে প্রায় ক্ষেপে গেল আমার ওপর, তুমি কি আমাকে খানা-খাইয়েছ, যে পানি দিতে চাইছো? আগে খেতে দাও, তারপর তোমার পানি দিও।

আর একজনের মন্তব্য, আল্লাহর তৈরি পানি বিক্রি করে নাফা করছো? ঠিক আছে, এখানে সুবিধে হবে না, পথ দেখ।

এত সত্ত্বেও আমি কিন্তু হাল ছাড়তে চাইলাম না। বাজারের দোকানে দোকানে ফিরি করে বেড়াতে থাকলাম। কিন্তু লাখোপতি সওদাগর থেকে কুলি মজুর কেউই আমার খদ্দের হতে এগিয়ে এল না। কেউ দয়া দেখিয়েও বললো না, আচ্ছা, এসেছো যখন, দাও এক পেয়ালা।

এইভাবে দুপুর গড়িয়ে গেল। কিন্তু তখনও সামান্য দুখানা রুটির পয়সা রোজগার হলো না আমার। গরীবদের খিদে পায় বেশি। কিন্তু খিদের চাইতে লজ্জা-সংকোচ তাদের আরও বেশি। বড়লোকদের লজ্জা-শরম গরীবদের চাইতে কম। আমি আপনার ব্যবহারে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছি। আপনার পয়সা আছে, আপনি বড় লোক। কিন্তু একটা কথা ইয়াদ রাখবেন, পানি পয়দা করেছেন খোদাতাল্লা। তাঁর জিনিস, যা না পেলে আপনি জীবন ধারণ করতে পারেন না, এমনি ভাবে খেয়াল খুশিমতো নষ্ট করলেন কেন? আপনাকে হয়তো কড়াভাবেই কথাগুলো বললাম, কিছু মনে করবেন না। ঘরে গিয়ে একা একা চিন্তা করবেন। দেখবেন, আমি যা বললাম তার অর্থ মালুম হবে।

যাই হোক, আমার কিস্‌সা শুনুন ঃ বাগদাদের পথে পথে পানি ফিরি করে সাকুল্যে কিছুই রোজগার হলো না। সারাদিন পেটে দানা-পানি পড়েনি। খিদের জ্বালায় ছটফট করতে থাকলাম।

—ইয়া, আল্লাহ, এই কী তোমার বিচার? এক টুকরো রুটিও কী আমার বরাতে লেখোনি? এর চাইতে আমার নিজের দেশে ফাটকে কয়েদ খাটাও তো ভালো ছিল? এই বিদেশ বি-ভুঁই-এ অনাহারে মারা যাবো? এখানে কেউ পয়সা দিয়ে পানি কিনে খায় না।

রাস্তার ধারের একটা বাড়ির রোয়াকে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী রোমন্থন করতে করতে আপন খেয়ালে বিড়বিড় করে চলেছি, এমন সময় দেখলাম বাজারের লোকজনের মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো। নানা দিক থেকে ছেলে বুড়ো সবাই ছুটে আসতে লাগলো রাস্তার মোড়ে। যেখানেই বেশি লোকের ভীড় অতি স্বাভাবিক কারণেই সেদিকে আমার নজর। তাই আমিও পানির ভিস্তিটা কাঁধে ঝুলিয়ে সেইদিকে ছুটে যাই। মানুষের ভীড় ঠেলে যখন রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালাম, দেখি, এক বিরাট জমকালো মিছিল চলেছে। একই সাজের বাহারী পোশাক পরে রাস্তার দুপাশ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে চলেছে সিপাইবাহিনী। সকলের হাতে ইয়া বড় বড় লাঠি। কোমরে ঝোলানো তলোয়ার। সিপাইদের সর্দারকে দেখলাম—পেল্লাই চেহারা। মুখের দিকে তাকালে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। রাস্তার ওপরে দুপাশের দণ্ডায়মান মানুষ মাথা নুইয়ে তাকে সালাম জানাতে লাগলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করি, কীসের মিছিল? আর ইনিই বা কে?

লোকটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো, একটা ছোট ছেলেও জানে, আর তুমি জান না? ওঃ, তুমি তো পরদেশী, তাই! তোমার কথার টান শুনেই বুঝেছি, তুমি মিশরের বাসিন্দা। তা শোন, ঐ যে সিপাইদের সেনাপতি দেখছো, ওঁর নাম আহমদ। খলিফার একেবারে ডান হাত। সারা শহরের শান্তি বজায় রাখার ভার ওঁকে দিয়েছেন খলিফা। মাসে হাজার দিনার ইনাম পায়। হুঁ হুঁ বাবা, যে সে আদমী নন। খোদ খলিফার খাস পেয়ারের লোক। আহমদ সাহেবের মতো আর একজন সেনাপতি আছে খলিফার। তার নাম হাসান। তিনিও মাসে হাজার দিনার পান। আর এই সিপাইরা পায়-প্রত্যেকে

একশো দিনার। প্রাসাদ থেকে ওরা এখন শহর দেখতে বেরিয়েছেন। এরপরে খানা-পিনা করতে যাবেন।

আমি আর কাল-বিলম্ব না করে আমার স্বদেশী টানে জোরে জোরে হাঁকতে থাকি। পানি চাই—পা—নি—

তামার পেয়ালা দুটো ঠুকে ঠুকে ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। একটু আগে আপনি যেমন শুনেছিলেন ঠিক তেমনি মিঠে আওয়াজ।

সেপাই সেনাপতি আমার গলার স্বর শুনে আমার পাশে এগিয়ে এলেন. তুমি তো মিশরের লোক, তাই না ভাইসাব? আমি তোমার কথার টান শুনেই বুঝতে পেরেছি। দাও, আমাকে এক পেয়ালা পানি দাও।

আমি পর পর তিনবার তাঁকে তিন পেয়ালা পানি ভরে দিলাম। কিন্তু ঠিক আপনারই মতো তিনিও দু-দুবার পেয়ালার পানি মাটিতে ফেলে দিলেন। খেলেন শেষ পেয়ালা। একেবারে এক ঢোকে—ঠিক আপনারই মতো করে। তারপর বললেন, আমার কাইরো ভাইরা দীর্ঘজীবী হোন। আচ্ছা. তুমি কেন পানি বিক্রি করতে স্বদেশ ছেড়ে এই বাগদাদে এসেছো? এদেশের মানুষ এ ব্যবসাটাকে ভালো নজরে দেখে না। আর পয়সাও রোজগার হয় না এতে।

আমি সংক্ষেপে আমার ধার-দেনার কাহিনীটুকু বললাম তাকে। সেনাপতি সাহেব দয়া-পরবশ হয়ে আমাকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দিলেন। তারপর সিপাইদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এই ভিস্তিওলা ভাইটি আমার দেশের লোক। দায়ে ঠেকে আজ সে বাগদাদে এসে এই কাজ করছে। তোমরা যে যা পারো, একে একটু খয়রাতি করো।

সেনাপতি সাহেবের অনুরোধ মানেই হুকুম। তাই প্রত্যেক সেপাই এক পেয়ালা করে পানি খেয়ে একটা করে দিনার হাতে তুলে দিল আমার। এক দণ্ডের মধ্যে আমি শতাধিক দিনারের মালিক হয়ে গেলাম। সেনাপতি আহমদ বললেন, আমরা রোজই এই সময় এই পথ দিয়ে যাই। তুমি দিনকয়েক এখানে দাঁড়িয়ে থেকো। তা হলেই অনেক টাকার জোগাড় হয়ে যাবে। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে তোমার দায় দেনা শোধ করে দিও।

এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমার থলেটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। গুনে দেখলাম হাজারেরও বেশি হয়ে গেছে। বুকে বল ফিরে পেলাম। যাক, এবার তাহলে দেশে ফিরতে পারবো। সব মানুষের কাছে তার নিজের দেশই সেরা। তার চাইতে মধুর আর কিছুই হতে পারে না। ভাবলাম, দেশে ফিরে সব আগে আমি দেনা পরিশোধ করবো।

ভিস্তি-সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশের পথে রওনা হলাম একদিন।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একদল যাত্রী কাইরোর দিকে যাচ্ছিল, আমি তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। হ্যাঁ ভালো কথা, বলতে ভুলে গেছি, সেনাপতি আহমদ সাহেব আমাকে একটা তাগড়াই খচ্চর আর একশোটা মোহর দিয়ে বলেছিলেন, শোন ভাই, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে।

—বলুন মালিক কী কাজ, আলবৎ করে দেবো।

আহমদ বললেন, কাজটা খুব গোপনীয়। কেউ যেন টের না পায়। আচ্ছা তুমি কাইরোর কী অনেক মানুষকে চেনো?

—তা চিনি বইকি। শেরিফ আদমিদের সবাইকে চিনি আমি।

—ঠিক আছে, এই খৎখানা ধরো। কাইরোর চাঁদ আলীকে দিতে হবে। সে আমার পুরানা দোস্ত। খুঁজে বের করতে পারবে তাকে? চিঠিখানা দিয়ে শুধু তাকে বলবে, তোমাদের ওস্তাদ এখন বাগদাদে স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদের দক্ষিণ হস্ত হয়ে বহাল তবিয়তে আছে। সে যেন আর দেরি না করে বাগদাদ শহরে চলে আসে আমার কাছে।

কাপ্তান আহমদের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে তাকে সালাম জানিয়ে আমি কাইরোর যাত্রীদলের সঙ্গে সামিল হয়ে গেলাম।

পুরো পাঁচ দিনের পথ। বাগদাদ থেকে কাইরো। দেশে ফিরে এসে জনে জনে ডেকে তাদের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে আমি ঋণমুক্ত হলাম। কাপ্তেন আহমদকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম। একমাত্র তাঁরই কল্যাণে আজ আমি দেশে ফিরে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলাম।

আবার আমার জাত-ব্যবসায় নেমে পড়লাম। কাঁধে পানিভর্তি ভিস্তি ঝুলিয়ে দুটো তামার পেয়ালায় ঠুনঠুনি বাজিয়ে আবার পথে পথে পানি ফিরি করে বেড়াতে থাকলাম। দিবারাত্র সব সময় আমি আহমদ সাহেবের খৎখানা বয়ে বেড়াচ্ছি। চাঁদ আলীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে চিঠিখানা। কিন্তু তামাম বাগদাদ শহর ঢুঁড়েও তার কোনও হদিস করতে পারিনি আজ পর্যন্ত।

ভিস্তিওলা এই পর্যন্ত বলে থামলো। চাঁদ আলী আনন্দের আতিশয্যে ভিস্তিওলাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এলোপাতাড়ি চুম্বন করতে থাকে, আল্লাহই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আমি—আমিই সেই চাঁদ আলী। কই, দাও আমার ওস্তাদের চিঠিখানা।

ভিস্তিওলাও বিস্মিত হয়। এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে চাঁদের মুখের দিকে। তারপর আনন্দে ভরে ওঠে ওর মুখ। বলে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই দেব। দেবার জন্যেই তো এতদিন ধরে সঙ্গে সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছি, মালিক, এই নিন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে চাঁদ আলী বলে, তোমার সঙ্গে হয়তো খানিকটা খারাপ ব্যবহার করেছি! তার জন্যে কিছু মনে করো না, ভাই। আহমদ সাহেব আমাদের দলের ওস্তাদ ছিলেন। আমি তাঁর পেয়ারের সাগরেদ।

চিঠির বয়ান ঃ

প্রাণাধিক পুত্রসম চাঁদ আলীর প্রতি মহামান্য খলিফার সিপাই-প্রধান আহ্‌মদের আন্তরিক অভিনন্দন।

চাঁদ, আসমানের চাঁদ, আমার দিল-কা কলিজা, তোমার কাছে উড়ে যাবো, আমার প্রাণের কথা বলবো, সে ক্ষমতা আমার নাই। আল্লাহ্ আমাকে পাখীর মতো দুখানা ডানা দেননি।

তুমি হয়তো শুনে খুশি হবে, এখানে আমি চল্লিশটা কেতা-দুরন্ত পাজি-বদমাইশের কাপ্তান বনে বহাল-তবিয়তে দিন কাটাচ্ছি। আমার সাগরেদ সিপাইগুলো সবাই পুরোনো দাগী-আসামী। হাজারো রকমের চুরি ডাকাতি ছিনতাই-এ তারা চোস্ত ছিল এক সময়। আজ সুলতানের অনুগ্রহে সবাই শাহী তক্‌মা পেয়েছে। খলিফা আমাকে শহর রক্ষার ভার দিয়েছেন। তিনি হাজার দিনার বেতন দেন আমাকে। এছাড়া উপরি রোজগার তো আছেই।

পেয়ারের চাঁদ, যদি তুমি গুছিয়ে নিতে চাও, আর কাল-বিলম্ব না করে পত্রপাঠ আমার কাছে চলে এসো। তোমার যা শয়তানী বুদ্ধি আমি দেখেছি, তাতে তুমি এখানে এলে, বাজী মাৎ করে দিতে পারবে। বাগদাদের পথেঘাটে পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। তোমার মতো চৌকস্ নওজোয়ান আমার পাশে এসে দাঁড়ালে আমরা কামাল করে দিতে পারবো। তুমি আমার মনের মতো সাগরেদ। তোমাকে যে-সব ফন্দী-ফিকির প্যাঁচ-পয়জার আমি হাতে কলমে শিখিয়েছি তার দু চারটে নমুনা যদি এখানে একবার ছাড়ো, খলিফা তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। আর তাছাড়া আমি তো আছিই, খলিফার কাছে তোমার গুণগান আমি গাইবো, যাতে তিনি তোমাকে একটা উঁচু পদে বহাল না করে পারবেন না।

আর দেরি করো না, খুব তড়ি-ঘড়ি চ'লে এসো, বেটা। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন।

চাঁদ আলী চিঠিখানা পড়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। হাতের ছড়িখানা ঠুকে ঠুকে সে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে নাচন-কোদন শুরু করে দেয়। আজ তার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তার গায়ের ধাক্কায় রাস্তার ভিখিরিরা হুমড়ী খেয়ে পড়ে। চাঁদ শুধু নেচেই চলে। আর ঘন ঘন চিঠি-খানায় ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খায়।

ভিস্তিওলা বলে, তা হলে এবার আমি চলি, মালিক।

চাঁদ ওর গলা জড়িয়ে ধরে। জেবে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো মোহর বের

করে ভিস্তিওলার ঝুলিতে ভরে দেয়। তারপর ছুটতে ছুটতে চলে যায় তার মাটির তলার গুপ্ত ডেরায়।

—শোন, সাগরেদ দোস্তরা! আমি ঠিক করেছি, বাগদাদে চলে যাবো। সেখান থেকে আমার ওস্তাদ আহমদ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এখন বল, তোমাদের কি মত?

চোরচোট্টাগুলো সমস্বরে প্রতিবাদ জানায়, সে কী করে হয়, ওস্তাদ? ভাঁড়ারে রেস্ত বলতে কিছু নাই। এই অবস্থায় আমাদের এখানে ফেলে রেখে তুমি কেটে পড়বে?

চাঁদ বলে, কী করবো বলো, নিয়তি আমাকে ডাকছে। আমার পুরানো সাথী ওস্তাদের ডাকে আমাকে সাড়া দিতেই হবে।

সাঙ্গপাঙ্গরা ক্ষোভ জানায়, এ অসহায় অবস্থায় আমাদের ফেলে তুমি বাগদাদে চলে যাবে, ওস্তাদ, একী তোমার ধর্মে সইবে?

চাঁদ বলে, না; একেবারে সহায়-সম্বলহীন করে তোমাদের ছেড়ে যাবো না। আমি বাগদাদে যাবার পথে দামাসকাসে কাটাবো কয়েকটা দিন। সেখান থেকে কিছু মালকড়ি বাগিয়ে তোমাদের জন্যে পাঠিয়ে দেবো। তা দিয়ে তোমাদের যাতে বছরখানেক চলে যায়, তার ব্যবস্থা আমি করে যাবো।

মুসাফিরের সাজ-পোশাকে সেজেগুজে তৈরি হলো চাঁদ। কোমরে দুখানা ছুরি গুঁজে নিল। মাথায় পরলো বিচিত্র ধরনের এক টুপী, হাতে নিল ইয়া বড় একখানা বাঁশের লাঠি। তারপর তেজি ঘোড়ার পিঠে চেপে সংগী-সাথীদের কাঁদিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বাহান্নতম রজনীতে

আবার সে গল্প শুরু করে:

কাইরো ছেড়ে দামাসকাসের পথে চলতে চলতে এক তীর্থযাত্রীদলের সংগে দেখা হয়ে গেল চাঁদের। দলের কর্তা দামাসকাসের বণিক-সভার শাহবান্দর। বহুৎ খানদানি মানুষ। মক্কা থেকে হজ্জ করে দেশে ফিরছিল।

আলী নওজোয়ান, খুবসুরৎ তরুণ। এখনও তার দাড়ি গোঁফ গজায়নি। হাজী সাহেবের নজরে ধরে গেল দেখা মাত্র। শাহবান্দর সাহেবের দলের লোকজনরাও চাঁদকে পেয়ে ভুলে গেল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। অবশ্য তার একাধিক কারণও ছিল। দামাসকাসের পথ বড় বিপদ-সঙ্কুল। মাঝে মাঝেই ডাকাতি রাহাজানি হয়। বিশেষ করে বাদাবী দস্যুদের আক্রমণে যাত্রীদল সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এই রকম কয়েকটি ডাকাতদল আর বাদাবী দস্যুদের আক্রমণ থেকে চাঁদআলী তাদের রক্ষা করেছিল। তার অসীম সাহস এবং সিংহ-বিক্রমের সামনে ডাকাতরা কাছে এগোতে পারেনি। এছাড়া মাঝে মাঝে জঙ্গলের জানোয়ার সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল সে। এই সব কারণে হাজী সাহেবের মাথার মণি হয়ে ওঠে চাঁদ আলী।

দামাসকাসে পৌঁছে সে নিজের দলের লোকজনদের প্রত্যেককে পাঁচটি করে দিনার ইনাম দিল। আর চাঁদ আলীকে দিল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

চাঁদ ভাবলো, এত টাকা সঙ্গে নেবার কোনও প্রয়োজন নাই। সামান্য কিছু রাহাখরচ রেখে বাকী সবটাই সে পাঠিয়ে দিল কাইরোয় তার সাগরেদদের আস্তানায়।

এইভাবে সে একদিন বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছল। এবার তার প্রথম কাজ—তার শিক্ষাগুরু ওস্তাদ আহমদের বাড়ি খুঁজে বের করা। শহরে ঢুকেই সে যাকে সামনে পেল তাকে জিজ্ঞেস করলো, আহমদের ঠিকানা। কিন্তু পরদেশী ভেবেই হোক, কিংবা অন্য কোনও আশঙ্কাতেই হোক, কেউ তার কথার জবাব দিল না বড় একটা।

জনে-জনে জিজ্ঞেস করতে করতে এক সময় সে অল-নাফ্‌জ চৌমাথায় এসে পড়লো। চাঁদ দেখলো একপাশে একটা ফাঁকা মাঠে কতকগুলো খুদে মস্তান গুলতানী করছে। তাদের দলের পাণ্ডাটি আরও খুদে—কিন্তু বিচ্ছু। এর আসল পরিচয়—ঠগের সেরা জাইনাবের বড় বোনোর আটাশে ছেলে মহম্মদ।

আলী ভাবলো, বাচ্চারা অনেক বেশি খোঁজ-খবর রাখে। এদের দিয়েই কাজ হতে পারে। ওদের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে সে ডাকলো, এই শোন।

আটাশে ছেলে মস্তান মহম্মদ ভারিক্কি চালে এগিয়ে এল চাঁদের সামনে ?

—কী, ডাকছো কেন ?

কাছেই একটা মণ্ডা-মিঠাই-এর দোকান ছিল। বারকোষে সাজানো নানা হালওয়া মণ্ডা। চাঁদ সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে মহম্মদকে বলে, নেবে তোমরা ? হালওয়া খাবে, চলো।

মহম্মদ বলে, তা দিলে, না করবো কেন ?

—তবে চলো আমার সঙ্গে।

চাঁদ আলী দোকানে ঢুকে একখানা রেকাবীর পুরো হালওয়াটা কিনে মহম্মদের হাতে তুলে দেয় এবং দেবার সময় কায়দা করে একটা দিনারও গুঁজে দিতে যায়। কিন্তু মহম্মদ ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়ায়, এ কী ? আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চাইছেন ? নিন ধরুন, আপনার পয়সা আর হালওয়া। চাই না আমরা। ভেবেছেন পয়সা দিয়ে আমাদের কিনে নেবেন। আমরা অত কচি ছেলে নই—হুঁ হুঁ বাবা—

চাঁদ মহম্মদের এবম্বিধ অসভ্য আচরণে বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু মনের রাগ মনে চেপে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, ও হো হো; পয়সা দেখে তোমাদের গোসা হয়ে গেল। তাজ্জব কি বাত্, তা আমি তো তোমাকে ঝুট-মুট পয়সা দিচ্ছি না। তার বদলে আমার একটু কাজ করে দিও।

গম্ভীর চালে সে প্রশ্ন করে, কী কাজটা শুনি ?

আমাকে একটা বাড়ির নিশানা বলে দিতে হবে। আমি পরদেশী মানুষ। তোমাদের শহরে এসেছি—এইটুকু সাহায্য কি করবে না ?

আটাশে ছেলে ঠোঁট উল্টে বলে, ওঃ, এই কথা। তা কার বাড়ি যাবে ?

—খলিফার সিপাই-সর্দার কাপ্তান আহমদের বাড়ি।

—অঃ! আচ্ছা, আমার পিছনে পিছনে এসো।

মহম্মদ এমন একটা ভংগী করলো, যা দেখে মনে হয়, আহমদের বাড়িটা যেন সে নেহাৎ করুণা করেই তাকেই দেখাবে। একটু এগিয়ে নিচে থেকে তুলে নিল একটা মাটির ঢিল। ঠাঁই করে ছুঁড়ে মারলো একটা বাড়ির দরজায়।

—ঐ। ঐ হচ্ছে আহম্মকের—থুড়ি আহমদের আস্তানা।

দরজায় ঢিল পড়ার আওয়াজে পাল্লা খুলে বেরিয়ে আসে আহমদ। চোখে মুখে ক্রোধ। কিন্তু তার আগে মহম্মদ তার সাংগ-পাংগ নিয়ে সেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। আহমদ এদিক ওদিক উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সামনে চাঁদ আলীকে ছাড়া আর কাউকেই নজরে পড়ে না।

—আরে চাঁদ আলী তুমি!

আহম্মদ ছুটে এসে আলীকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

চাঁদ আলী বলে ওস্তাদ, তোমার বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। যাকে জিজ্ঞেস করি, কেউই কোনও জবাব দেয় না। কেন বল তো?

—ভয়ে। স্রেফ ভয়ে। আমি শহরের সেপাই সেনাপতি। আমার নাম শুনলে লোকের হৃদকম্প জাগে। তারা ভেবেছে, কী বলতে কী বলে ফেলবে, শেষে আমার রোষে পড়বে। তাই পাশ কাটিয়ে গেছে। তা চলো, বাড়ির ভিতরে চলো। দেখবে কি পেল্লাই আমার বাড়ি—যেন একখানা প্রাসাদ।

সত্যিই, আহমদের বাড়িখানা চমৎকার সাজানো গোছানো। বাহারী গালিচা পর্দা আর দামী মেহগনি কাঠের সব আসবাবপত্র। বাড়ির ভিতরে বড় ঘরখানায় আহমদের চল্লিশজন সিপাই থাকে। তাদের সকলের সংগে চাঁদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়।

—এ হচ্ছে আমার দেশোয়ালী সাগরেদ। এমন তুখোড় ধড়িবাজ মস্তান সারা কাইরোতে নাই।

তারপর আহমদ চাঁদকে তার শোবার ঘরে নিয়ে আসে।

—এই হচ্ছে সেই বাদশাহী সাজ-পোশাক। খলিফা যেদিন আমাকে এই শহরের সেপাই-সেনাপতির পদে বহাল করেছিলেন সেদিন তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। এমন জমকালো সাজ তোমার মতো খুবসুরৎ নওজোয়ানকেই মানায়। তাই তোমার জন্যেই তুলে রেখেছি। আমি জানতাম, একদিন না একদিন তোমার সংগে আমার ভেট হবেই। আমি খলিফার ডান হাত। আমার তাঁবে চল্লিশজন সেপাই-সান্ত্রী ওঠ্‌ বোস্‌ করে।

সেইদিন সন্ধ্যায় চাঁদ আলীর সম্মানে আহমেদ এক ভোজসভার আয়োজন করলো। সে উৎসবে আহমদের সিপাইরাও সামিল হলো। খুব হৈ-চৈ আনন্দ করে কাটলো চাঁদ আলীর।

পরদিন সকালে আহমদ সেজেগুজে খলিফার দরবারে যাওয়ার সময় আলীকে বলে গেল, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবে না কোথাও। নতুন জায়গা—পথ-ঘাট বা ঘাঁৎ-ঘোঁৎ কিছুই জানা নাই তোমার। একা একা পথে বেরুলে নানারকম

বিপদ আপদ ঘটতে পারে। সুতরাং কয়েকটা দিন এই ঘরে বসেই বিশ্রাম কর। তারপর আমি সব বিধি-ব্যবস্থা করবো। কিন্তু সাবধান, যা বলে গেলাম তার এদিক ওদিক করো না। চারদিকে আমার শত্রু। আর বাগদাদের বদমাইশ মানুষগুলো সব সময় ওৎ পেতে বসে আছে, আমাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে। তোমাকে দেখলেই তাদের মগজে বদ ফন্দী চেপে উঠবে। ওসব ঝামেলায় না গিয়ে চুপটি করে ঘরে বসে থাক ক'টা দিন। মনে রেখ, বাগদাদ শহরটা কাইরো নয়। এখানে খলিফার চর কাইরোর মাছির মতো ভনভন করছে সর্বত্র। আবার কাইরোয় যেমন যত্রতত্র হাঁস মুরগী মরাল চরে বেড়ায়,তেমনি ছুঁচো পাজি লোচ্চা বদমাইশ গিজ-গিজ করছে এই বাগদাদের পথে ঘাটে।

—কিন্তু ওস্তাদ, চাঁদ আলী ক্ষোভের সংগে বলে, ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে মেয়েমানুষের মতো বোরখা পরে বসে থাকার জন্যে তো আমি বাগদাদে আসিনি!

আহমদ হাসলো, না তা কেন, তোমার যেখানে খুশি যাবে, বেড়াবে। কিন্তু আমি বলি কি, মাত্র দু'একটা দিন চুপচাপ থাকো। তারপর আমিই তোমাকে পথঘাট ডেরা-আস্তানা সব চিনিয়ে দেবো।

আহমদ আর দাঁড়ালো না। তার ধনুর্ধরদের নিয়ে দরবারে রওনা হয়ে গেল।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো তিপ্পান্নতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে:

পাক্কা তিন-তিনটে দিন চাঁদ আলী অনেক ধৈর্য ধরে আহমদের ঘরে বন্দী হয়ে কাটালো। কিন্তু চারদিনের দিন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে যেতে চাইলো। আহমদকে কাতরভাবে জানালো, ওস্তাদ আর তো পারি না। এবার আমাকে হুকুম দাও। আমি আমার চুরি বিদ্যার এমন সাংঘাতিক এক বাহাদুরী দেখাই খলিফা যাতে তাজ্জব বনে যান।

আহমদ আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাতখানা বাড়িয়ে বলে, ধৈর্য ধর বৎস, ধৈর্য ধর। সব জিনিসেরই একটা সময় আছে। অত তাড়াহুড়া করলে কী চলে? তোমার পুরো ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। দেখ, আমি কী করি। সময় সুযোগ মতো খলিফার কানে তোমার নাম আর কীর্তি-কলাপ পৌঁছে দেব। এমনভাবে তাঁকে টোপ দেব, যাতে তিনি নিজে থেকেই বলেন, 'তাকে নিয়ে এস আমার কাছে।' ব্যস, তারপর আর কিচ্ছুর দরকার হবে না। সোজা—দরবারে নোকরী হয়ে যাবে।

মুখের ওপর আর কিছু বলতে পারলো না চাঁদ আলী। কিন্তু মনে মনে খুব খুশি হতে পারলো না। আহমদ বেরিয়ে যেতেই বাইরে বেরুবার মতলব ভাঁজতে লাগলো সে। ভাবলো, এইভাবে কয়েদ হয়ে আর এখানে পড়ে থাকবে

না সে। তিলমাত্র অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ সে রাস্তায় নেমে পড়লো।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এপথে ওপথে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে একটা কাফের সামনে এসে দাঁড়ায়। খিদেও পেয়েছিল, ভিতরে ঢুকে ভালোমন্দ কয়েকটা পদ নিয়ে খেল। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, রক্তরাঙা রেশমীর পোশাকে সেজে-গুজে এক দল আবলুস কালো নিগ্রো সেই পথ দিয়ে আসছে। তাদের কোমরে চামড়ার পেটিকা, মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে ইস্পাতের ধারালো খাঁড়া। পাশাপাশি দুজন, তাদের পিছনে আরও দুজন এবং তাদের পিছনে কোনও হারেমের এক বৃদ্ধ জেনানা। তার পিছনে আরও চারজন নিগ্রো প্রহরী। বৃদ্ধার মাথায় মহামূল্যবান রত্নখচিত এক স্বর্ণমুকুট। মুকুটের ওপরে একটি রুপোর পায়রা বসানো।

এই বৃদ্ধাই ধূর্ত ডিলাইলাহ। সে এখন খলিফার চিড়িয়াখানার হর্তাকর্তা। দরবারের কাজকর্ম সেরে চিড়িয়াখানায় ফিরে চলেছে।

চাঁদ আলী কাফের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ডিলাইলাহ চাঁদকে চেনে না। এ শহরে তাকে সে কখনও দেখেনি। চাঁদপনা মুখের দিকে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। নিগ্রোদের একজনকে ফিসফিস করে বলে, ছেলেটি কে, একবার খবর নিয়ে এসো তো দোকানীর কাছে।

নিগ্রোটা ফিরে এসে বলে, দোকানী কিছু বলতে পারলো না, মালকিন। ছেলেটি মনে হয়, পরদেশী।

ডিলাইলাহ ফিরে এসে জানাইবকে বলে, আজ বাজারের কাছে একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলেকে দেখলাম। কিন্তু নাম ধাম পরিচয় কিছুই পাত্তা করতে পারলাম না। ছেলেটি দেখতে ভারি চমৎকার। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেবল চোট্টা আহমদের কথাই মনে পড়ছিল। আমার যাদুমেজ আর বালী নিয়ে আয় তো। আমি মন্তর পড়ে দেখবো—ছেলেটা কে? কেন যেন ছেলেটিকে দেখা ইস্তক আমার মনে হচ্ছে, ওর হাবভাব বড় সুবিধের নয়। মনে হয় কোনও বদ মতলবে অন্য দেশ থেকে এসেছে সে বাগদাদে। অথবা কোনও খারাপ কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে এ শহরে। যাইহোক, গুণে পড়ে দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের শত্রুর অভাব নাই, হয়তো কেউ শয়তানী করার জন্যেই তাকে লাগাবে আমাদের পিছনে।

জাইনাব বালী আর যাদুমেজ এনে রাখলো মায়ের সামনে। ডিলাইলাহ টেবিলের ওপর বালীগুলো ছড়িয়ে বিছিয়ে কি সব আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্রতন্ত্র আওড়াতে থাকলো। একটুক্ষণ পরে সে চিৎকার করে উঠলো, জাইনাব, বেটি, মিল গয়া!

জাইনাব কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকায়, কী মা? কী পেলে?

—ঐ সুঠাম সুন্দর ছেলেটির নাম চাঁদ আলী। কাইরো থেকে এসেছে। আহমদের সে পেয়ারের দোস্ত। সে-ই তাকে বাগদাদে ডেকে এনেছে আমাদের দুজনকে টিট করার জন্যে! তুই যে মদের সঙ্গে আফিং খাইয়ে ওদের কাপড়-

চোপড় খুলে নিয়ে বেআব্রু বেইজ্জৎ করেছিলি তারই বদলা নেবার জন্যে আহমদ তাকে কাইরো থেকে ডেকে এনেছে। ছেলেটি কাইরোর সবচেয়ে সেরা ঠগ ধড়িবাজ ধূর্ত। দেখছি, খোদ আহমদের বাড়িতেই উঠেছে সে।

—আচ্ছা মা, জাইনাব বলে, তুচ্ছ একটা দুগ্ধপোষ্য বালক—এখনও যার গোঁফদাড়ি গজায়নি, তাকে নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছো কেন?

ডিলাইলাহ মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়, উঁহুঁ হুঁ, দাড়িগোঁফ উঠুক আর নাই উঠুক, ছেলেটি কিন্তু ধারালো ইস্পাতের ফলা। কী ভাবে, কখন, কেমন করে বুকে গেঁথে বসবে কিছুই বলা যায় না। অন্ততঃ আমার গণনায় তাই বলছে মা। আর তুমি তো জানো, আমার যাদু-বিচার কখনও মিথ্যা হয় না।

জাইনাব বলে, তা জানি মা। কিন্তু কী এমন তালেবর যে, আমাদের ধোঁকা দিয়ে সে পার পেয়ে যাবে? যাইহোক, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি এখুনি তার সঙ্গে ভেট করে আসছি।

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চোখে সুর্মা কাজল পরে, দামী-রেশমী সাজপোশাক এবং রত্নালঙ্কারে সুন্দর করে সেজেগুজে জাইনাব রাস্তায় বের হলো।

খুব ধীর পায়ে সে বাগদাদের বাজার পথে চলতে থাকে। পাছা দোলে না, কোমর বাঁকে না এমনি শান্ত, সংযত তার পদক্ষেপ। রোয়াকবাজ ছেলেরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। কেউ বা একটু মুচকি হাসি, তেরছা নজর হানে। কেউ বা শিস দেয়, সিটি বাজায়। আবার কেউ বা বুক চাপড়ে গেয়ে ওঠেঃ

ও আমার ময়না,
আর তো প্রাণে সয় না···

জাইনাব কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করে না। চুড়ির ঠুনঠুন আর মলের ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি আওয়াজ তুলে সহজ স্বাভাবিক ভাবে পথ চলে। সে আওয়াজে রকবাজ ছোকরাদের বুকে তুফান তোলে।

আরও একটু এগোতে চাঁদ আলীর দেখা পায় জাইনাব। মা-এর বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল আছে ছেলেটির চেহারার। প্রায় নিখুঁত সুন্দর, চাঁদের মতো ফুটফুটে, সুগঠিত সুঠাম দেহ! জাইনাবের আর বুঝতে বাকী থাকে না, এই সেই চাঁদ আলী।

চাঁদ আলী আসছিল আর জাইনাব যাচ্ছিল। সামনা-সামনি হতেই জাইনাব আলীকে ইচ্ছে করেই কনুই দিয়ে ধাক্কা মারে। যেন হঠাৎ লেগে গেছে, এই রকম ভাব দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলে, কিছু মনে করবেন না, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম।

কোমল তনুর স্পর্শে আলীর সারা দেহে তড়িৎ প্রবাহ খেলে যায়। মুগ্ধ নয়নে সে জাইনাবের ঢলঢলে যৌবনের যাদু নিরীক্ষণ করতে থাকে।

জাইনাব মিষ্টি করে হাসতে জানে। সে হাসির শাণিত ছুরিকা পলকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে যে-কোনও পুরুষের বুকে। আলীই আজ তার শিকার।

আলী আর বুঝি নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। নিশ্বাস দ্রুততর হয়, কপালে স্বেদবিন্দু জমতে থাকে। কোনও রকমে সে বলতে পারে, তুমি কী সুন্দর! কার সন্ধানে পথে বেরিয়েছ?

খিল-খিল করে হেসে ওঠে জাইনাব। সে হাসি শব্দে মূক, কিন্তু অভিব্যক্তিতে মুখর। বলে. ধর, তোমার মতো কোনও এক সুন্দর সুপুরুষ নওজোয়ানের সন্ধানে—

আলির স্বর্ণচাঁপার মতো মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে ওঠে।

—শাদী করোনি?

—করেছি; আমি এখানকার এক সওদাগরের মেয়ে। আমার স্বামীও সওদাগর। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মাঝে মাঝেই তাকে বিদেশ যেতে হয়। এখন আমার স্বামী বাইরে গেছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। তাই আজ আমি প্রথম ঘরের বাইবে বেরিয়েছি—তোমার মতোই একজন নাগর খুঁজতে। মৌজ করে খানাপিনা করবো দুজনে। তারপর… .

আলীর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে। কান গরম হয়ে ওঠে। জাইনাব বলে, আমার চাকরকে নানারকম খানা পাকাতে বলে এসেছি। আজ আমার দেহমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তোমার মতো সুন্দর কারো সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে। এতটা পথ এলাম, অনেক ছেলে-ছোকরাই আমার পিছনে লেগেছিল, সত্যি কথা বলতে কি, তাদের কাউকেই আমার মনে ধরেনি। কিন্তু তোমাকে দেখামাত্রই আমি মোহিত হয়ে গেছি। এখন তুমি যদি মেহেরবানী করে আজ আমার ঘরে চলো, আমার সাথী হও, তাহলে রাতটা সুরা, সুধায় ভরে ওঠে। যাবে?

এই সময়ে ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চুয়ান্নতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

আলী বলে, তোমার মতো ষোড়শী সুন্দরীর আমন্ত্রণ কী আমি উপেক্ষা করতে পারি। যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। এতো আমার পরম সৌভাগ্য—

জাইনাবের পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলতে থাকে আলী। শহরের অনেক আঁকা-বাঁকা গলিপথ (সবই তার কাছে একেবারে অচেনা) অতিক্রম করতে করতে আলি ভাবে, এই শহরে সে সম্পূর্ণ নবাগত এক মুসাফির। এখানকার পথঘাট মানুষ জন কিছুই সে চেনে না। হঠাৎ এক সুন্দরীর আহ্বানে তার ঘরে যাওয়া কী ঠিক হবে। অন্যের শাদী করা বিবি সে। হয়তো সে এখন বাড়িতে নাই। কিন্তু ফিরতেই বা কতক্ষণ? আচম্বিতে মাঝ রাতে সে যদি এসে উপস্থিত হয়? যদি দেখে, তার বিবি অন্যের অঙ্কশায়িনী হয়ে পড়ে আছে! তখন অতি স্বাভাবিক কারণেই তার মাথায় খুন চেপে যেতে পারে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—অবধারিত মৃত্যু।

উফ্, আলী আর ভাবতে পারে না—না না, এসব সে ভাবতে চায়ও না। মহাজনরা বলে গেছেন, 'বিদেশে অচেনা নারীর সংগে অবৈধ সঙ্গম পরিহার করবে।'

—নাঃ, আর সে এগোবে না, আলী ভাবতে থাকে, এই রূপসী নারী তাকে কোন্ বিপদের গুহায় নিয়ে যেতে পারে, কে জানে?

আলী এতক্ষণ জাইনাবের সংগে অনেকটা দূরত্ব রেখে পথ চলছিল। এবার সে পা চালিয়ে তার পাশে এসে বললো, শোন সুন্দরী, আজকের মতো আমাকে ক্ষমা করো। তুমি বরং অন্য কাউকে সংগী করে নিয়ে যাও আজ। খুব সুরৎ নওজোয়ানের অভাব হবে না এ শহরে। কিন্তু আমাকে আজকের মতো ছেড়ে দাও। এ শহরে আমি সদ্য এসেছি। অন্যের আশ্রয়ে অতিথি হয়ে উঠেছি। এ অবস্থায় তাকে না জানিয়ে সারারাত বাইরে কাটানো কোনও মতেই উচিত কাজ হবে না। কথা দিচ্ছি, পরে একদিন তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবো আমি।

জাইনাব আব্দারের সুরে নাছোড়বান্দার বায়না ধরে, নাঁ—আঁ—, সে কিছুতেই হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। তোমাকে দেখার পর থেকে দিল আমার তড়পাচ্ছে। আজ আর আমি অন্য কাউকে নিয়ে রাত কাটাতে পারবো না। আমার সারা মন জুড়ে বসে গেছ তুমি। এখন না বললে হবে কেন?

এ আবদার উপেক্ষা করতে পারে না আলী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার জাইনাবের পিছনে পিছনে চলতে থাকে সে।

অনেক পথের গোলকধাঁধা পেরিয়ে এক সময় এক বিশাল ইমারতের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় দুজনে। ফটকের দরজা তালাবন্ধ ছিল। জাইনাব তার কামিজ কুর্তার মধ্যে হাতড়াতে থাকে। চাবিটা গেল কোথায়? তাজ্জব ব্যাপার! তবে কী পথে পড়ে গেল? আলীর দিকে তাকিয়ে একটু চড়া গলাতেই বললো সে, মনে হচ্ছে চাবিটা হারিয়েছে। তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তালাটা খোলার কিছু একটা ব্যবস্থা কর।

আলি বলে, চাবি ছাড়া তালা খুলবো কী করে?

—তবুও চেষ্টা তো করবে?

—গায়ের জোর দিয়ে হয়তো তালাটা ভেংগে ফেলতে পারি। কিন্তু তা চাই না।

—বাঃ, চাই না বললেই হলো, তা বলে ঘরে ঢুকবো না?

স্বচ্ছ নাকাবের তলা থেকে জাইনাব এমন এক কটাক্ষ বাণ ছুঁড়লো, যার ফলে আলীর হৃদয়ের সব বন্ধ তালাগুলো সব পটপট করে খুলে পড়ে গেল।

কলের পুতুলের মতো আলী তালাতে হাত রাখে। আর কী আশ্চর্য, তালাটা সংগে সংগে খুলে যায়।

জাইনাব আলীকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। সারা ঘর দামী পারস্য গালিচায় মোড়া। দেওয়ালে ঝুলানো নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র। জাইনাব একটা আসনে

বসে আলীকে পাশে বসতে বললো। সামনের টেবিলে সাজানো ছিল নানারকম মুখোরোচক খানাপিনা। দুজনে তৃপ্তি করে খেল! তারপর জাইনাব মদের পেয়ালা পূর্ণ করে আলীকে দিল এবং নিজেও নিল।' আলী লক্ষ্য করলো, জাইনাব সারাক্ষণ সহজ অথচ সংযতভাবে আলীর স্পর্শ, মর্দন এবং চুম্বন পরিহার করে চললো। যতবারই আলী তার অধরে চুমু এঁকে দিতে চায়, জাইনাব হাত চাপা দিয়ে ঢেকে ফেলে। ফলে, হাতের তালুতেই তার চুম্বন আবদ্ধ আহত হয়ে ফিরে আসে। জাইনাব বাধা দিয়ে বলে, ধৈর্য ধর সাহেব, ধৈর্য ধর। এমন জমকালো আলোয় কী কামনা-বাসনার দরজা খোলে? বাতি নিভাতে দাও, অন্ধকার আচ্ছন্ন করুক। তারপর দেখে নিও, আমার খেলা। তখন দেখবো, কেমন তোমার পৌরুষ।

খানাপিনা শেষ করে ওরা দুজনে ঘরের বাইরে প্রাঙ্গণে কুয়ার পাশে আসে মুখ হাত ধুতে। একটা বালতিতে করে জল তুলতে থাকে জাইনাব। হঠাৎ সে কপাল চাপড়াতে থাকে।

—হায় হায়, একি সর্বনাশ হলো আমার?

দারুণ আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসে আলী।

—কী ব্যাপার, কী হলো?

—আর কী হলো—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। পানির বালতি তুলতে গিয়ে আমার আঙ্গুল থেকে হীরের আংটিটা খুলে পড়ে গেছে। এখন কী হবে সোনা? গতকাল বাইরে যাবার আগে আমার স্বামী পাঁচশো দিনার দিয়ে কিনে এনে দিয়েছিল আমাকে। পরার সময়ই একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছিল। কিন্তু এইভাবে কুয়ার পানিতে পড়ে যেতে পারে, ভাবিনি। কুয়ায় অবশ্য বেশি পানি নাই। নেমে হাতড়ালেই পাওয়া যাবে। সমস্যা হলো, এই রাতে নামবে কে? লোকজন তো কাউকেই পাবো না। যাই হোক, সাজ-পোশাক খুলে ন্যাংটো হয়ে আমিই নামি, কী বল? তুমি বাপু দেওয়ালের দিকে মুখ করে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখো। একদম এদিকে তাকাবে না। আমি ন্যাংটো হবো।

আলীর পৌরুষে আঘাত লাগে, বলে, আমি থাকতে তুমি নামবে কুয়ার নিচে, সে কি হয়? আমি নেমে গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসছি তোমার আংটি। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।

জাইনাবকে আর কিছু বলা বা করার কোনও সুযোগ না দিয়ে পলকের মধ্যে সে সাজ-পোশাক খুলে ফেলে।

রশিটা ধরে তরতর করে নেমে যায় নিচে। জাইনাব লক্ষ্য করলো, আলী বালতিটার ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একমুহূর্ত কী যেন ভাবলো আলী! পা ডুবিয়ে জলের শীতলতা অনুভব করলো বোধহয়। তারপব ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের নিচে তালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জাইনাব বালতিটাকে ক্ষিপ্রহাতে টেনে উপরে উঠিয়ে এনে বললো, এবার তোর বাবা, আহমদকে ডাক রে হাঁদা। সে এসে তোকে বাঁচাক। আমি চললাম।

জাইনাব আর দাঁড়ালো না সেখানে। আলীর সাজ-পোশাকগুলো বোরখার তলায় বগল-দাবা করে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল সে।

এই বিশাল ইমারতখানা খলিফার দরবারের এক সম্ভ্রান্ত আমিরের। জাইনাব আগেই খোঁজ নিয়েছিল, বাড়ির ফটকে তালা দিয়ে সে কোথাও কোনও কাজে বেরিয়েছে।

একটু পরে আমির সাহেব তার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে দেখে সদর দরজা হাট করে খোলা। তালাটা ভাঙ্গা। আমির ভাবে ঘরে চোর ঢুকেছিল। কিন্তু সারা ঘর-দোর পরীক্ষা করে বুঝতে পারে, যেখানে যা যা ছিল সবই ঠিক-ঠাক আছে—একমাত্র টেবিলের খানাপিনা ছাড়া কিছুই খোয়া যায়নি! আমির অবাক হয়, এমন অদ্ভুত চোরের কথা তো কখনও সে শোনেনি!

মুখ হাত ধুতে কুয়ার কাছে আসে আমির। চাকরটা জল তোলার জন্য বালতি নামায়। কিন্তু সামান্য এক বালতি জল সে আর কিছুতেই টেনে তুলতে পারে না। পেল্লায় ভারি মনে হয়। কুয়ার নিচের দিকে নজর করে। কালো কিম্ভূত-কিমাকার একটা বস্তু বালতির ওপর বসে থাকতে দেখে সে আঁতকে ওঠে।

—হেই বাপ্, ওটা কী?

আমির অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী রে, কী হলো?

চাকরটার তখন কাঁপুনি ধরে গেছে, হুজুর, কুয়ার নিচে দৈত্য!

—দৈত্য?

আমিরও কেমন ভীতচকিত হয়ে ওঠে। চাকরটা বলে, ঐ দেখুন, বালতিটার মধ্যে বসে আছে—কালো দৈত্যের মতো কী একটা জিনিস, ঠিক বুঝতে পারছি না। বুনোশুয়োরও হতে পারে?

—তোবা তোবা, বলিস কী রে? যা শিগ্গির মৌলভী সাহেবদের ডেকে নিয়ে আয়। কোরাণশরীফ পাঠ করাতে হবে! তোবা তোবা—

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঞ্চান্নতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চাকরটা ছুটে গিয়ে চারজন কোরাণ-পাঠককে ডেকে আনে। ওরা সকলে কুয়ার চারপাশে দাঁড়িয়ে কোরাণশরীফ পাঠ করতে থাকে। সেই সময় আমির আর চাকর মিলে টেনে তোলে বালতিটা। আর সঙ্গে সঙ্গে কাদা-পাঁকে লেপা চাঁদ আলী লাফিয়ে দাঁড়ায়।

—আল্লাহ হো আকবর—

এতক্ষণে আমির বুঝতে পারে, আসলে সে কোনও দৈত্য আফ্রিদি নয়। রক্ত-মাংসে গড়া মনুষ্য-সন্তানই বটে। এতক্ষণ ভয়ে জড়সড় হয়েছিল, এবার সে গর্জে ওঠে, কী রে ব্যাটা, চুরি করতে ঢুকেছিলি?

আলী বলে, আল্লা কসম, আমি চোর না। গরীব বেচারা একজন জেলে। মাছ ধরতে গিয়েছিলাম টাইগ্রিসে। সারাদিন খেটে-খুটে পরিশ্রান্ত হয়ে নদীর ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর আর কিছু জানি না। ঘুম ভাঙলো দেখি, আমি জলের মধ্যে শুয়ে আছি। আমাকে আপনারা জানে বাঁচিয়েছেন, এজন্য বহুৎ সুক্রিয়া জানাচ্ছি। খোদা মেহেরবান, না হলে বে-ঘোরে পড়ে আজ জানে মারা যেতাম।

আমির ভাবলো, লোকটার কথা সত্যিও হতে পারে। হয়তো কোনও আফ্রিদি দৈত্য ওকে তুলে এনে ফেলে গেছে এই কুয়ার মধ্যে। চাকরটাকে বললো, যা তো, একটা পুরোনো পাতলুন নিয়ে এসে ওকে পরতে দে।

ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্য আলীকে সে শহর-সেনাপতি আহমদের কাছে পাঠিয়ে দিল।

আলীর জন্য সারাটা বিকাল-সন্ধ্যা আহমদ বাগদাদ শহর চষে বেড়িয়েছে। কিন্তু কোনও হদিশ করতে পারেনি। এখন এই শোচনীয় অবস্থাতেও তাকে ফিরে পেয়ে আহমদের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে।

অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করে, এ কী তোমার দশা হয়েছে আলী? কী করে হলো? কোথায় গিয়েছিলে? কার পাল্লায় পড়েছিলে?

আলী তার কাহিনী শোনালো। আহমদ মুখ টিপে হাসলো, হাসলো তার চল্লিশজন ধনুর্ধররাও। আহমদ ঠাট্টা করে বললো, তুমি না কাইরোর জাঁদরেল মস্তান! বাগদাদে এসে প্রথমেই কুপোকাৎ! কাপড়চোপড় কেড়ে নিয়ে বেমালুম ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছে!

হাসানও উপস্থিত ছিল সেখানে। হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ গো, কাইরোর কামাল, বাগদাদের একটা মেয়ের প্যাঁচে তুমি ধরশায়ী হয়ে পড়লে? জানো, ঐ মেয়েটি কে?

আলী বলে, জানি। সে এক সওদাগরের মেয়ে। তার স্বামীও সওদাগর।

—বিলকুল ঝুট্! ওর বাবা ছিল খলিফার চিড়িয়াখানার সর্দার। আর মা হচ্ছে বাগদাদের সেরা ধূর্ত মহিলা ডিলাইলাহ। এখন সে খলিফার চিড়িয়াখানার সরদারণী হয়েছে। ওর নাম জাইনাব! ঠগের সেরা ঠগ। এখনও সে কুমারী—একেবারে আনকোরা বুনো ওল। স্বামী-ফামীর তোয়াক্কা করে না সে। মা আর এই বেটি দুজনে মিলে সারা বাগদাদ শহরের মানুষকে পুতুল নাচাচ্ছে। কেন, তুমি কি শোননি, আমাদের এই কাপ্তান আহমদ সাহেব আর এর চল্লিশজন সাগরেদকে সে একদিন ন্যাংটো করে এক শরাবখানার আস্তাবলে ফেলে রেখে দিয়েছিল? যাই হোক, এখন তোমার কী ইচ্ছা, বল?

আলী বললো, আমি ওকে শাদী করবো। আপনি আমাকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করুন, হাসান সাহেব।

—বহুৎ আচ্ছা। করতে পারি সাহায্য, কিন্তু একটা শর্তে। অন্য কারো কথায় চলতে পারবে না। আমি যা যা বলবো তাই শুনতে হবে। আমি যা যা করতে বলবো, করতে হবে।

আলী বললো, আজ থেকে আমি তোমার সাগরেদ হলাম, ওস্তাদ। বলুন আমাকে কী করতে হবে?

হাসান বলে তা হলে আর সময় নষ্ট করে কী হবে। এখন থেকে কাজে নেমে পড়া যাক। শোন, সাজ-পোশাক খুলে একেবারে উদোম উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও তুমি। কী? লজ্জা করবে?

—আরে দূর, শরম কা কেয়া বাত—

আলী নিমেষের মধ্যে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো হাসানের সামনে! একটা কালো কালির ডিবা এনে হাসান নিজে হাতে তার সর্বাঙ্গ কালিতে লেপে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার চাঁপার বর্ণ দেহখানা আবলুস কালো এক নিগ্রোর মতো হয়ে গেল।

হাসান আনন্দে নেচে ওঠে, বেড়ে লাগছে দেখতে! একেবারে হাবসী এক নিগ্রো নফর, কী বল?

ঠোঁটে আর চোখের নিচে লাল সুর্মা লাগিয়ে দিল হাসান। একেবারে সোনায় সোহাগা হয়ে গেল। কেউ দেখে আর বুঝতে পারবে না, আসলে সে নিগ্রো কিনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙ শুকিয়ে গেল, হাসান একখানা কৌপীন-সদৃশ স্বল্পবাস কোমরে জড়িয়ে দিল আলীর। বললো, ব্যস! এবারে ষোল আনা নিগ্রো বনে গেলে তুমি। এখন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। পাচক সেজে ডিলাইলাহর রসুইখানার খানসামার সঙ্গে ভাব জমাতে যেতে হবে। পারবে তো?

আলী বলে, সে আর এমন কঠিন কী কাজ? খুব পারবো। আমার মতো চোস্ত নিগ্রো-ভাষা কম লোকেই জানে। এতকাল তো ওদের চরিয়েই খেয়েছি।

হাসান বলে, তবে তো আর কথাই নাই। তুমি শুধু ডিলাইলাহর নিগ্রো পাচকটার সঙ্গে আলাপ সালাপ করে ভাব জমিয়ে ফেলবে। এই পাচকটাকে ডিলাইলাহ খুব বিশ্বাস করে। সে শুধু ডিলাইলাহ আর তার মেয়ে জাইনাবেরই খানা তৈরি করে না, চিড়িয়াখানার পাহারাদার চল্লিশজন সিপাই, আর শিকারী কুকুরগুলোর জন্যও খানা পাকায়। ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে বলবে, 'দোস্ত অনেকদিন তাড়ি আর ভেড়ার বাচ্চার কাবাব খাইনি। খেতে বড় সাধ, কিন্তু একা একা জমে না। তোমার মতো একজন সমজদার ইয়ার পেলে আমি আসর বসাতে পারি। তখন সে বলবে, 'মালকিনের কড়া হুকুম, রসুইখানা ছেড়ে বাইরে কোথাও যেন না যাই। তা তোমার যখন এত ইচ্ছে, এসো না—আমার রসুইখানায়। খুব চমৎকার করে বানিয়ে দেবো ভেড়ার কাবাব। কত খাবে। এক পয়সা খরচা হবে না। সবই ডিলাইলাহর ওপরে চালিয়ে দেবো।' ব্যস! আর দেখতে হবে না, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তার নেমন্তন্ন মেনে নেবে। তা হলেই বাজী মাৎ হয়ে যাবে।

আলী বুঝতে পারে না, কিন্তু কী করে?

হাসান হাসে, বলছি। কায়দা করে তুমি কম খেয়ে পাচকটাকে আকণ্ঠ গেলাবে। লোকটার নেশা যত চড়তে শুরু করবে, দেখবে আপনা থেকেই সে

গড়গড় করে অনেক গুপ্ত কথা বলতে শুরু করে দেবে। তখন তুমি কথার ছলে এক এক করে সব গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নেবে তার কাছ থেকে। কী ধরনের খাবার-দাবার সে বানায় ডিলাইলাহ আর জাইনাবের জন্য, পাহারাদার সিপাই আর কুকুরগুলোর জন্যই বা কতটা কী খানাপিনার ব্যবস্থা আছে, রসুইখানায় ঢোকার পথ, কোথায় থাকে তার দরজার চাবী—এই সব খবরাখবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে হবে তোমাকে। নেশার ঝোঁকে সে তোমাকে সব বলে দেবে। এরপর তুমি একটা আফিঙের ডেলা ফেলে দেবে তার তাড়ির মগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে তার মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। বুঝবে দাওয়াই-এ কাজ হয়েছে। তখন লোকটাকে উলঙ্গ করে ওর সাজ-পোশাক তুমি পরে নেবে। ওর সব্জীকাটার ছুরিখানা গুঁজে নেবে তোমার কোমরে। এরপর একটা খালি ঝুড়ি নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়বে বাজারে। উদ্দেশ্য কিছু গোস্ত আর সব্জী কেনা।

সওদা শেষে আবার ফিরে যাবে রসুইখানায়। ভাঁড়ার থেকে তেল, মাখন, মসলা, চাল, ডাল ইত্যাদি যা যা দরকার সব পরিমাণ মতো বের করে নেবে! কতটা কী দরকার হতে পারে সে তো তুমি আগেই জেনে নিয়েছ। সুতরাং কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তারপর যা যা খানা পাকান হয় রোজ, সেই সব খাবারগুলো বেশ যত্ন করে তৈরি করে ফেলবে তুমি। হ্যাঁ, খাবার-গুলোর গন্ধ শুঁকেই জিভে জল আসে যেন। আর মনে রেখো, প্রতিটি খানায় এক ডেলা করে আফিং মিশিয়ে দেবে।

ডিলাইলাহ, তার কন্যা জাইনাব, চল্লিশজন অনুচর আর পোষা কুকুর-গুলোর জন্য খাবার সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবে। এর পরের খেলাটা জমবে ভালো। সবাই যখন খেয়ে-দেয়ে ঢলে পড়বে, তখন এক এক করে সকলের সাজ-পোশাক, গহনাপত্র সব খুলে নিয়ে সোজা চলে আসবে আমার কাছে। কেমন? পারবে তো?

আলী বলে, খুব পারবো।

হাসান বলে, হ্যাঁ, জাইনাবকে সত্যিই যদি তুমি তোমার বিবি বানাতে চাও, তবে হ্যাঁ, তোমাকে আরও একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ, ওস্তাদ?

হাসান বলে, চিড়িয়াখানা থেকে খলিফার সবচেয়ে প্রিয় চল্লিশটা শেখানো পায়রাকে একটা খাঁচায় পুরে নিয়ে আসতে হবে।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে বসে থাকে।

চারশো ছাপ্পান্নতম রজনী

আবার সে কাহিনী শুরু করে:

ফৌজী কেতায় আলী ডান হাত কপালের কাছে এনে পায়ের সঙ্গে পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর 'জো হুকুম, ওস্তাদ' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বাজারের মধ্যে দেখা হয়ে যায় পাচক নিগ্রোটার সঙ্গে। আলী স্মিত হেসে তাকে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে।

—এই যে দোস্ত, কেমন আছ?

—এই—চলছে আর কি।

আলী বলে, খেটে খেটে মরে গেলাম, মাইরী। তা একদিন একটু মৌজ-মৌতাত করা যাক না? এক হাঁড়ি তাড়ি আর কচি ভেড়ার মাংসের কাবাব, কী জমবে না?

নিগ্রো পাচকটা জ্বলজ্বল করে তাকায়, তা মন্দ কী?

— তা হলে তোমার সময় মতো এসো একদিন আমার ডেরায়।

নিগ্রোটা বলে, সে পারবো না, ভাই। আমার মালকিন বড় কড়া। বাইরে কোথায়ও যাওয়ার নিয়ম নাই! তার চাইতে তুমিই বরং চলে এসো আমার রসুইখানায়। নিজের গাঁট থেকে খরচা করে কী লাভ? মালকিনের ওপর দিয়েই মজাটা লুটা যাবে।

আলী সানন্দে সম্মতি জানায়। তখুনি সে নিগ্রোটার সঙ্গে চলে আসে তার রসুইখানায়। হাসানের কথামতো খানাপিনা চলতে থাকে। চলতে থাকে নানা কথাবার্তা। ধীরে ধীরে নেশায় বুঁদ হতে থাকে পাচকটা। সেই সুযোগে তার পেট থেকে সব কথা টেনে বের করে নেয় আলী। কোথায় ভাঁড়ার ঘরের চাবি থাকে, ডিলাইলাহ কী খায়, জাইনাব কী খায়, চল্লিশজন সিপাই বা ৎতটা কী খায় এবং কুকুরগুলোর খাবার কী দেওয়া হয়—সব সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেবার পর ওর তাড়ির মগে এক ডেলা আফিং ফেলে নিমেষের মধ্যেই ওকে বেহুঁশ অজ্ঞান করে ফেলে।

ডিলাইলাহর আর তার কন্যার জন্য দুপুরের খানা পাঁচ পদের তৈরি হয়। রাতেও হয় পাঁচ রকমের। শুধু আজ তারা আরও দুটি বাড়তি পদের ফরমাশ করেছে। রোজ হয় ডাল, কড়াইশুঁটি ভাজি, একটা ঝোল, মৃদু জ্বালে সেদ্ধ মাংস এবং গুলাবী মণ্ডা। শুধু আজকের জন্য দুটি বিশেষ পদের হুকুম হয়েছে—মধু আর জাফরান দিয়ে তৈরি চালের বিরিয়ানী এবং পেস্তা বাদাম আখরোট দিয়ে তৈরি বেদানার হালওয়া।

চল্লিশজন সিপাই-পাহারাদারের নিয়মিত খাবারঃ সেদ্ধ বরবটী মাখন দিয়ে ভেজে দিতে হয়। সঙ্গে কুচানো-পিঁয়াজ আর এক মগ করে তাড়ি। আর কুকুরদের জন্য বরাদ্দ—কুকুর পিছু আধ পোয়া মাংস। তার সঙ্গে মা-মেয়ের উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়।

পাচকটা মোষের মতো নাক ডাকাতে শুরু করলো। আলী ওর গায়ের বেশ-বাস খুলে নিজে পরে নিল। ভাঁড়ারের চাবিটা খুঁজে বের করে নিলো। পাচকের সব্জীকাটা ছুরিখানা কোমরে গুঁজে একটা খালি ঝুড়ি মাথায় করে বাজার-হাট করতে বেরিয়ে পড়লো সে।

কেনা-কাটা শেষ করে রসুইখানায় ফিরে এসে খুব যত্ন করে খানা পাকালো আলী। এবং প্রতিটি খাবারে এক ডেলা আফিং মিশিয়ে দিল। তারপর যথা

সময়ে ঘরে ঘরে খানাপিনা সাজিয়ে রেখে এল সে। কেউই কিছুমাত্র সন্দেহাকুল ভাবে তাকালো না তার দিকে।

আলী দেখলো, একমাত্র রসুইখানার বেড়ালটা ছাড়া সবাই অঘোর ঘুমে ঢলে পড়েছে। প্রথমে সে বুড়ি ডিলাইলাহকে ন্যাংটো করলো। উফ্, কী কুৎসিত কদাকার তার দেহ। আলী পাশের ঘরে ঢোকে। জাইনাব অসাড় হয়ে পড়েছিল। এক এক করে তার দেহের সব আবরণ ও আভরণ খুলে নেয় সে। মাখনের মতো নরম নিভাঁজ পেলব তার শরীর। কামনার আগুন জ্বলে ওঠে তার বুকে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে রাখে। আজ বাদে কাল যাকে সে ঘরের বিবি বানাবে বলে ঠিক করেছে, তার কুমারীত্ব হরণ করতে সে চায় না। শুধু ওর সারা দেহে হাত বুলিয়ে স্পর্শ-সুখ অনুভব করে। পায়ের তলায় বসে ওর সুন্দর পা দুখানা নিয়ে আদর করতে থাকে। এক সময় পায়ের তালুতে সুড়সুড়ি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ঘোরেই প্রচণ্ড বেগে একটা লাথি ছোঁড়ে জাইনাব। আর লাগবি তো লাগ—একেবারে আলীর মুখেই গিয়ে লাগে! যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে এবং হাসতে হাসতে সে সরে যায়।

এরপর আলী এক এক করে নিগ্রো সিপাইদের ন্যাংটো করে সাজ-পোশাক খুলে নেয়। তারপর ছাদের ওপরে ওঠে গিয়ে পায়রাগুলোকে একটা খাঁচার মধ্যে ভরে ফেলে। কাপড়-চোপড় গহনাগাঁটিগুলোকে একটা পোঁটলায় বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে, পায়রার খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে পথে নেমে পড়ে। সদর দরজাটা হাট হয়ে খোলাই পড়ে থাকে। আলী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। সোজা চলে আসে সে আহমদ হাসানের কাছে।

—সাবাস বেটা, হাসান আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, বাজী মাত্ করে দিয়ে এসেছো। এই না হলে আমার সাগরেদ! জাইনাবের সঙ্গে তোমার শাদী আমি দেবোই দেবো।

সকালে সব আগে ঘুম ভাঙ্গে ডিলাইলার। তখনও মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল তার। বুঝতে পারে, তার শরীরে কোনও আবরণ নাই। ধড়মড় করে উঠে বসে সে বিছনায়। গত রাতের কথা মনে করার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই তার খাবারের মধ্যে আফিঙ মিশিয়ে দিয়েছিল কেউ। তাড়াতাড়ি সে অন্য একটা সাজ-পোশাক পরে সোজা ছাদের ওপরে উঠে আসে। যা আশংকা করেছিল, ঠিক তাই ঘটেছে। খলিফার খবরবাহী পোষা পায়রাগুলোর একটাও নাই। ঘরগুলো সব ফাঁকা। মাথায় হাত দিয়ে সে ছাদের ওপরেই বসে পড়ে, এখন কী হবে? খলিফা শুনলে তার গর্দান যাবে।

নেমে এসে সে কুকুরগুলোর আস্তাবলে যায়। সবগুলো চিৎপটাং হয়ে মরার মতো পড়ে আছে। বুড়ি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে নিগ্রো প্রহরীদের ডেরায় ঢোকে। সেখানেও সেই একই দৃশ্য। উলঙ্গ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে সবাই। এরপর সে ছুটতে ছুটতে জাইনাবের ঘরে যায়। তার আদরের দুলালী—তার কী দশা করে গেছে, কে জানে।

জাইনাবের দেহেও কোনও বস্ত্রাবরণ নাই। কুসুমের মতো কোমল তনুলতা

এলিয়ে পড়ে আছে শয্যায়। ডিলাইলাহর বুক কেঁপে ওঠে। জাইনাব—তার কুমারী কন্যা। তবে কি তার কুমারীত্ব নষ্ট করে দিয়ে গেছে? ভয়ে ভয়ে সে আরও কাছে আসে ঘুমন্ত জাইনাবের। দেহের নিম্নাঙ্গ ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। না, লোকটা সে-সব কিছু করেনি। কিন্তু কেন করে নি। এমন ঢলঢলে যৌবন তার মেয়ের। এমন রূপ ও এমন লাবণ্য সারা বাগদাদেই বা আছে ক'টা। সেই মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তার সর্বনাশ করেনি—সে কে?

ডিলাইলাহ দেখতে পায়, একটুকরো কাগজ—জাইনাবের বুকের ওপর। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সে খুলে পড়েঃ

আমি কাইরোর চাঁদ আলী! আমার মতো সাহসী যোদ্ধা বীরপুরুষ সারা কাইরোতে কেউ নাই। আমার মনে হয় বাগদাদেও। এ ছাড়াও লোকে আমাকে ভদ্র বিনয়ী উদার বলে জানে। তুমিও তা বুঝতে পারবে, যখন জানবে, আমার পুরো কব্জাতে পেয়েও তোমার কুমারীত্ব আমি নষ্ট করিনি।

চিঠিখানা পড়ে আলীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার হৃদয়। সত্যি তো, ছেলেটি বড় সুন্দর। এমন কাঁচা ডাঁসা মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়ে কেউ কি কখনও ছেড়ে দেয়!

জাইনাব জেগে ওঠে। ডিলাইলাহ তাকে সব জানায়।

—তুই যা-ই মনে কর মা, এই ছেলেটার কথা যতই আমি ভাবছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, সে তোকে আস্ত রেখে গেছে। কিন্তু আমি তো তোকে নিজ হাতে পরীক্ষা করে দেখলাম। না, সে কিচ্ছু করেনি। এ জন্যে তোরও কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, মা। সে তোর কত ইজ্জৎ করেছে, বল! আমার সব চুরি করে নিয়ে গেছে। খলিফার দরবারে আমার বিচার হবে, জানি। তা হোক, তা সত্ত্বেও তাকে আমি কিছুতেই একটা সাধারণ ঠগ-প্রবঞ্চক বলে মনে করতে পারছি না, জাইনাব। ওর কলিজাটা বড় সাচ্চা। তা না হলে এই লোভ কেউ সামলাতে পারে না।

মায়ে ঝিয়ে বসে বসে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলো। ডিলাইলাহ বললো, আমি এখুনি যাবো আহমদের কাছে। একবার স্বচক্ষে দেখে আসবো তাকে।

দরজার কড়া নাড়তেই হাসান বলে, ঐ, ঐ বুড়ি ডিলাইলাহ এসেছে। আমি ওর খট খট আওয়াজেই চিনতে পেরেছি। যাও, দরজা খুলে দাও।

আলী গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ডিলাইলাহ এক মুখ হাসি ছড়িয়ে ঘরের

মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। মেজের এক পাশে কাপড় বিছিয়ে হাসান আহমদ আর আলী বসে খানা করছিল। রেকাবীতে সাজানো শশা রুটি আর পায়রার মাংস। হাসান এবং আহমদ দুজনেই এক সঙ্গে স্বাগত জানায় বুড়িকে, আসুন, আসুন, মেহেরবানী করে বসুন। গরীবের ঘরে যখন পা দিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে একটু পায়রার মাংস দিয়ে নাস্তা করে যান।

—পায়রার মাংস?

আঁৎকে ওঠে ডিলাইলাহ। তবে কী পায়রাগুলো—না, না, সে কথা সে ভাবতে পারে না। চিৎকার করে ওঠে সে, আপনাদের একটুও শরম হচ্ছে না? এই খবর-বওয়া পায়রাগুলো খলিফার প্রাণাধিক প্রিয়—কলিজার সমান। আর সেগুলো চুরি করে এনে আপনারা ফলার করছেন?

হাসান হাসতে হাসতে বলে, খলিফার পায়রা? কে, কে চুরি করেছে আপনার চিড়িয়াখানা থেকে?

—কেন, কিছুই জানেন না নাকি? এই কাইরোর মস্তান, আপনাদের চাঁদ আলীই চুরি করে এনেছে আমার হেপাজত থেকে।

চাঁদ আলী অবাক হওয়ার ভান করে বলে, সে কী? আমি ভেবেছিলাম এমনি সাধারণ পায়রা। কী করে জানবো ওগুলো খলিফার খবর চালাচালির পায়রা? হায় হায়, কী হবে? আমি তো মনের আনন্দে সবগুলোকে জবাই করে কড়াই-এ চাপিয়েছি···

ডিলাইলাহ রেকাবী থেকে একটা পায়রার ঠ্যাং ধরে ওপরে তুলে নাকের কাছে ধরে। কী যেন আঘ্রাণ করে। তারপর মুচকি হেসে আবার রেখে দেয়।

—ভালো তামাশা করতে জানতো, ছেলে? এ তো আমার সে পায়রা নয়!

হাসান আহমদ আলী সকলেই অবাক হয়।—সে কি? নাকে শুঁকে কী করে বুঝলেন, ও-পায়রা সে-পায়রা না?

ডিলাইলাহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, খলিফার সোহাগের পায়রাগুলোকে রোজ দামী আতর মাখানো হয়। সে-আতরের খুশবু সেদ্ধ করলে বা কাবাব করলেও নষ্ট হবার নয়। তা সুবাস থাকবেই। কিন্তু এ পায়রার মাংসে তেল মসলার গন্ধ ছাড়া অন্য কিছু নাই।

এবার সকলে হো হো করে হেসে ওঠে, বহুৎ আচ্ছা। চিন্তা করবেন না, আমরা অত আহাম্মক নই, খলিফার পেয়ারের পায়রাগুলোকে আদরেই রেখেছি।

ডিলাইলাহ বলে, আপনাদের যা খুশি করুন। খলিফার জিনিস নিয়ে তামাশা করবেন না। ওগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিন।

হাসান বলে, দেবো, নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবো। খলিফার সম্পত্তি জোর করে আটকে রাখার এক্তিয়ার কারো নাই। কিন্তু একটা শর্তে—

—কী শর্ত?

—আলীর সঙ্গে আপনার কন্যা জাইনাবের শাদী দিতে হবে।

ডিলাইলাহ হাসে, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে কি জানেন, মেয়ে

লায়েক হয়েছে। তার নিজস্ব একটা মতামত আছে। সে যদি রাজি থাকে, আমি পা বাড়িয়েই আছি। কিন্তু আমার ইচ্ছাতেও তো আমাদের বংশের কোনও শাদী-নিকা হতে পারে না। আমার মাথার ওপরে আছেন বড় ভাই, জুরেক—এই শহরেই শুঁটকী মাছের ব্যবসা করেন তিনি। তাঁর মত করাতে হবে আপনাদের। তবে আমি কথা দিচ্ছি, মেয়েকে এবং আমার বড় ভাইকে আমি আমার সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করবো।

হাসান ইশারা করতে চাঁদ আলী পায়রার খাঁচাটা এনে ডিলাইলাহর হাতে তুলে দেয়। ডিলাইলাহ আর দেরি করে না, দ্রুত পায়ে হেসে ফিরে আসে নিজের ডেরায়।

—জাইনাব মা, ডিলাইলাহ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আলী তোকে শাদী করতে চায়। বড় সুন্দর ছেলে।

জাইনাব বলে, আমার কোনও অমত নাই মা। ওর মতো ভালো ছেলে হয় না। তা না হলে যে সুযোগ সে পেয়েছিল তাতে আমার সর্বনাশ করে দিতে পারতো। কিন্তু তা সে করেনি।

ডিলাইলাহ বলে, তা তো হলো মা, কিন্তু তোর মামাকে রাজি করাবি কি করে? এই শাদীর কথা শুনলেই তো সে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেবে।

এদিকে আলী হাসানকে জিজ্ঞেস করে, ওর মাতুল জুরেক লোকটি কেমন? তার দোকানই বা কোথায়?

হাসান বলে, লোক যেমনই হোক, তাকে রাজী করাতেই হবে। তা না হলে জাইনাবকে পাওয়ার কোনও আশা নাই। যদিও বৃদ্ধ জুরেক আজ শুঁটকী মাছের ব্যবসা করে, এক সময়ে এই মহাবিদ্যার ব্যবসায়ে তামাম ইরাকে নাম ডাক ছিল তার। এক ডাকে চিনত সকলে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি প্রতারণা প্রবঞ্চনায় তার জুড়ি ছিল না কেউ। তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে নিত্য-নতুন লোক ঠকানোর ফন্দী-ফিকির বের হতো। আজ বুড়ো হয়েছে সে, গায়ের তাগদ কমে এসেছে। এখন আর ঐ সব ঝামেলার কাজে যেতে চায় না। সেই কারণে—শুঁটকী মাছের কারবার করছে বাজারে বসে বসে। তা এখনও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা সংগ ছাড়েনি বুড়োর। ঐ দোকানেই তাদের আড্ডা বসে। অনেক বদ কর্মের সলা-পরামর্শ চলে গোপনে গোপনে। এখনও এই বুড়ো হাড়ে সে অনেক ভেল্কীই দেখাতে পারে। আমি আর আহমদ তো চোর গুণ্ডা ধাপ্পা-বাজদের নাটের গুরু ছিলাম এককালে। আর তুমিও আমাদের যোগ্য সাগরেদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সবাইকে সে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারে এখনও। তার মতো শঠ শয়তান ধূর্ত ধড়িবাজ আমার জীবনে দুটি দেখিনি। সুতরাং সাবধান বৎস, খুব সাবধান। আমার মনে হয়, ও বুড়োর কাছে আর্জি পেশ করে কোনও ফয়দা উঠাতে পারবে না তুমি। লাভের মধ্যে হবে—এই কচি বয়সে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে। তোমার জায়গাতে যদি আমি হতাম আলী, তবে কসম খেয়ে বলছি, ঐ সুন্দরী জাইনাবের দিকে আমি হাত বাড়াতাম না। একেবারে গনগনে আগুন—পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে হবে।

তার চেয়ে বলি কি, জীবনে চলার পথে অনেক খুবসুরৎ মেয়ের দেখা পাবে। তাদের কাউকে না হয় বিবি করে ঘরে এনো। কিন্তু এ দুরাশা তুমি ত্যাগ কর আলী, আমার কথা শোন।

আলী বলে, কিন্তু ওস্তাদ, আমি যে তার কাজল-কালো চোখ দুটো কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সদা-সর্বদা আমাকে হনন করছে। না না না, জাইনাবকে না পেলে আমি বাঁচবো না। ওকে আমার চাই-ই। কিসের অত ডর, আমি যাবো তার দোকানে। দেখি কি করে সে!

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটান্নতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে:

বাজারে গিয়ে জুরেখের সঙ্গে দেখা করলো আলী।

—আমি আপনার ভাগ্নী জাইনাবের পাণি-প্রার্থী। তাকে আমার খুব পছন্দ। আমার মনে হয় সেও গররাজী নয়। সুতরাং আমি চাই, আপনি আমাদের শুভ-মিলন ঘটিয়ে দিন।

বৃদ্ধ জুরেকের চোখে শয়তানের হাসি। আলীর আপদামস্তক নিরীক্ষণ করে বলে, তা সাহেবের কী করা হয়?

—জী, 'বড় বিদ্যা'র ব্যবসায় করি। আপনি তো এ বিদ্যায় সবার সেরা ছিলেন এককালে, সে খবর আমি জানি। আপনার ভগ্নী এবং ভাগ্নী দুজনেই বাগদাদের সেরা ঠগ। আমার কাজকামের নমুনা অবশ্য এখানে সামান্যই দেখাতে পেরেছি। তবে কাইরো—আমার স্বদেশে আমাকে সবাই এক ডাকে চেনে। রোজগারপাতিও আপনাদের দোয়াতে কিছু কম করি না।

—হুম্, বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে যায়, তা তোমার কাজের খানিকটা নমুনা তো আমাকে দেখাতে হবে।

—হুকুম করুন, চাচা। কোনও কাজই আমি দুঃসাধ্য মনে করি না।

বৃদ্ধ বলে, শাদীর দেনমোহর দিতে হবে তো?

—নিশ্চয়ই দেবো। কি চান, বলুন?

বৃদ্ধ বললো, এই শহরে এক ইহুদী যাদুকর জহুরী আছে। তার নাম আজারিয়াহ। তার একমাত্র কন্যার একটি সোনার সাজ-পোশাক, একটি সোনার মুকুট এবং একজোড়া সোনার জুতো আছে। আমার মতে জাইনাবকে শাদী করতে হলে তোমাকে এই জিনিসগুলো দিয়েই দেনমোহর দিতে হবে। কী, পারবে?

আলী বলে, এ আর এমন কঠিন কী কাজ, কেন পারবো না?

—একটু উঁচুদরের ঠগবাজের কাছে, আপাতভাবে মনে হবে, ব্যাপারটা খুবই সহজ। আসলে কিন্তু অতটা সহজ নয়। ঐ ইহুদীটা মায়ামন্ত্র জানে। সে একটা বিরাট প্রাসাদে বাস করে। আগাগোড়া প্রাসাদটা সোনা আর রুপোর

ইট দিয়ে গড়া। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে তার ইমারত। কিন্তু আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত দিনের বেলায় কেউ খুঁজে পায়নি তার প্রাসাদ। জহুরী আজারিয়াহ যখন সকালবেলা বাজারে চলে আসে, তখন সে মন্ত্রবলে বাড়িটাকে অদৃশ্য করে রেখে আসে। ফলে, কোন চোর ডাকাতই তার প্রাসাদে ঢুকে কন্যার মহামূল্যবান আবরণ আভরণ চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যেতে পারে না। এখন তা হলে বোঝ, কাজটা কতখানি সহজ!

আলী বলে, সে আপনি কিছু ভাববেন না। আমার ফন্দী ফিকিরের কাছে আপনার যাদুকর নস্যি। এক চালে সব টেনে বের করে এনে দেবো আপনার কাছে।

বৃদ্ধ জুরেকের চোখে অবিশ্বাসের হাসি। কিন্তু মুখে বলে, সাবাস্ বেটা, এই না হলে কাইরোর কামাল!

আলী সোজা চলে আসে স্যাকরা-পট্টিতে—ইহুদী জহুরী আজারিয়াহর দোকানের সামনে। দূর থেকে দেখেই সে চিনতে পারে জহুরীকে। লোকটার চেহারা কদাকার। প্রথম দর্শনে আঁৎকে উঠতে হয়। সচরাচর এমন কুৎসিত মানুষ চোখে পড়ে না। মাথার চুল বকের পালকের মতো শাদা। খুদে খুদে চোখ দুটোর নিচের চামড়া জড়ো জড়ো হয়ে গেছে। আকর্ণ-বিস্তৃত মুখ। একটাও দাঁত নাই। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে। নাকটা অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ, টিয়াপাখির মতো। গায়ের রঙ এককালে সোনার মতো ছিল। কিন্তু জরা-বার্ধক্যে কিছুটা ম্লান হলেও বেশ গৌরকান্তিই বলা যায়। শরীরটা হাড্ডিসার। মাংস নাই বললেই চলে। চোখের দৃষ্টি শকুনের মতো।

বুড়ো আজারিয়াহ তখন একটা নিক্তিতে সোনা ওজন করে থলেয় ভরছিল। দরজার সামনে একটা খচ্চর দাঁড়িয়েছিল। বুড়োটা সোনা ভর্তি থলেগুলো এক এক করে খচ্চরটার পিঠে চাপিয়ে দিল। তারপর দোকানের দরজা বন্ধ করে খচ্চরটাকে মন্ত্র পড়ে অদৃশ্য করে তার পিছনে পিছনে চলতে থাকলো।

আলীও অনুসরণ করে চললো বুড়োটাকে। শহর ছাড়িয়ে মাঠ। মাঠের পথ ধরে বুড়োটা এগিয়ে চলে। পিছনে পিছনে আলীও। কিন্তু যতদূরই যায় কোনও জন-বসতির কিছুমাত্র দেখতে পায় না সে। চারদিকে শুধু ধু-ধু করা প্রান্তর। আলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ভাবে, লোকটা কি তার চলা শেষ করবে না আজ? ঠিক সেই সময় যাদুকর জহুরী দাঁড়িয়ে পড়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়। আর কী আশ্চর্য, তখুনি, সেই মাঠের মধ্যে বিশাল একখানা প্রাসাদ সাকার হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ জুরেক যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। আগাগোড়া প্রাসাদটা সোনা আর রুপোর ইটে গড়া। স্ফটিকের তৈরি অগণিত দরজা জানালা।

যাদুকর জহুরী খচ্চরটার পিঠে চেপে ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওকে দেখা গেল প্রাসাদের এক গবাক্ষে। তার হাতে একটা বড় বারকোষ। তাতে সাজানো একটি সোনার সাজ-পোশাক, একটি রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট, আর একজোড়া স্বর্ণ পাদুকা। বুড়োটা বেশ গলা চড়িয়েই বলতে থাকে এই যে,

শোন কাইরোর পীর মস্তান, তুমি নাকি তামাম ইরাক, পারস্য এবং আরবের আতংক! তা এসো, দেখি কত হিম্মত তোমার, চুরি করে নিয়ে যাও তো আমার মেয়ের এই পোশাক আভরণ। যদি তুমি সত্যিই তেমন গুণধর হও, আমি জবান দিচ্ছি, আমার এই বিশাল বিষয় সম্পত্তির একমাত্র মালিক আমার মেয়েকে শাদী দেবো তোমার সঙ্গে।

আলী ভাবলো, জুরেকের প্রস্তাব বুড়োকে জানানো দরকার। শুধু শুধু চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে তো সে তার পিছু ধাওয়া করে আসেনি। সে কথা তাকে জানানো উচিত মনে করলো আলী। ইশারা ইংগিত করে বোঝাতে চাইলো, সে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বুড়োটা ইশারা করে ডাকলো, ওপরে এসো।

আলী চলে এল দোতলায়, বুড়োর ঘরে।

জহুরী জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

—জী, চাঁদ আলী।

—কী বলতে চাও? কেন এসেছো আমার কাছে?

আলী বলে, আমি শহরের শুঁটকী মাছ ব্যবসায়ী জুরেকের ভাগ্নী জাইনাবকে শাদী করতে চাই। কিন্তু বুড়োটা আমার কাছে দেনমোহর হিসেবে দাবী করছে এক অদ্ভুত বস্তু।

—কী বস্তু?

—আপনার মেয়ের ব্যবহারের সোনার সাজ-পোশাক, সোনার মুকুট আর সোনার জুতো জোড়া সে চায়। শুধু এই কারণেই আমি আপনার পিছু ধাওয়া করে এসেছি। যেন তেন প্রকারে এই সামানগুলো আমাকে জোগাড় করতেই হবে।

বৃদ্ধ ভ্রূকুটি করে, জোগাড় করতেই হবে? তার মানে তুমি কী বলতে চাও, আমি দান-সত্র খুলে বসে আছি! যে যা চাইবে, তাই আমি দিয়ে দেবো তাকে?

আলী বলে, না, না তা আমি ভাবিনি। এমন অমূল্য ধন কেউ কাউকে প্রাণে ধরে বিলিয়ে দিতে পারে না। সে জন্য আমি তৈরি হয়ে এসেছি।

—তৈরি মানে? চুরি করবে?

চুরি না করতে পারলে ডাকাতিই করবো।

বুড়োটা ফোকলা মুখে বিকট করে হাসলো। তারপর যাদু টেবিলের দিকে এগিয়ে বললো, মরার যদি সাধ জাগে, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারো। আর যদি আমার কথা শোনও, তাহলে বলি, এসব বদ ফিকির ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তা না হলে, এর আগে যেসব মস্তানরা হাত বাড়াতে এসেছিল, তাদের যা দশা হয়েছিল, তোমারও তাই হবে। আমি যদি গুনে পাই দেখি, তোমার মউৎ আমারই হাতে লেখা আছে, তবে আর এক মুহূর্ত দেরি করবো না। এখুনি তোমার গর্দান মুন্ডু আলাদা করে দেবো।

বুড়োর এই বস্তাপচা তম্বি শুনে আলী ক্রোধে জ্বলে ওঠে। ক্ষিপ্র হাতে সে তলোয়ার খুলে যাদুকরের বুকে বসিয়ে দিতে উদ্যত হয়। দারুণ দীপ্ত

রোষে গর্জে ওঠে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে তোমার মেয়ের ঐ সামানগুলো যদি দিয়ে না দাও তবে শেষ করে দেবো তোমাকে।

বুড়ো দু পা পিছিয়ে গিয়ে দুহাত জোড় করে এমন ভংগী নিয়ে দাঁড়ায়, যেন মনে হয়, এক্ষুনি সে নতি স্বীকার করে আলীর ইচ্ছা পূরণ করবে। কিন্তু সে তার ছল মাত্র। পর মুহূর্তেই সে চিৎকার করে ওঠে, যে হাতে তুমি আমাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছো, সেই ডান হাত তোমার অবশ পাথর হয়ে যাক।

সংগে সংগে আলীর হাত থেকে তলোয়ারখানা খসে পড়ে। হাতখানা যেমন উদ্যত ছিল তেমনি অনড় থেকে যায়। আলী তক্ষুনি বাঁ হাত দিয়ে কুড়িয়ে নেয় তলোয়ারখানা। কিন্তু বুড়ো আবার বলে ওঠে, তোমার বাঁ হাতখানাও ঐ রকম হোক।

তৎক্ষণাৎ তার বাঁ হাত থেকেও তলোয়ারখানা নিচে পড়ে যায়। হাতখানা যেমন ওঠানো ছিল তেমনি ওঠানোই থাকে। আলী ক্রোধে ফেটে পড়ে। প্রচণ্ড জোরে সে তার পেটের ওপরে এক লাথি বসিয়ে দেয়। ছিটকে পড়ে যায় বুড়ো, কিন্তু পলকের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে বলে, তোমার ডান পাখানাও পাথর হয়ে যাক।

এরপর অসহায় আলী শুধুমাত্র বাঁ পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বাষট্টিতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলী তার অবশ অংগগুলোকে সচল করার অনেক ব্যর্থ প্রয়াস করে। বুড়ো বলে, এবার? এবার কোথায় যাবে চাঁদ? এখনও কী আমার মেয়ের সামানপত্র হরণ করার সাধ জাগছে প্রাণে?

আলী বলে, এখন আমি নিরুপায়। কিন্তু তবু আশা কী করে ছাড়বো? তা হলে তো জাইনাবকে পাওয়ার আশাও ত্যাগ করতে হবে আমাকে। সে আমি পারবো না। জাইনাব ছাড়া আমার জীবনের অন্য কোনও কামনা নাই। তাকে আমি চাই-ই। আর সেই কারণেই আপনার মেয়ের জিনিসগুলোও আমাকে পেতে হবে।

বুড়ো শয়তানটার মুখে এক বদমাইশের হাসি ফুটে ওঠে, অতি উত্তম কথা। তা হলে তুমি তো আমার মেয়ের জিনিসগুলো না নিয়ে এখান থেকে যাবে না। কিন্তু বলি, নেবে কী করে। মাথায় করে মোট বয়ে নিয়ে যাবে? আহা-হা, সে কী হয়। কাইরোর মালিক, কুলির কাজ করবে, সে কি হয়? তার চাইতে এসো, তোমাকে একটা গাধা বানিয়ে দিই। তখন দিব্যি পিঠে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে ওগুলো। লোকে দেখে কেউ আর ঠাট্টা-তামাশা করবে না।

এই বলে উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট পাত্রে করে মন্ত্র-পড়া জল নিয়ে এসে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে কি সব আওড়ালো সে এবং সংগে

সঙ্গে আমি একটা গর্দভের আকার ধারণ করলাম।

বুড়োর মুখে হাসি আর ধরে না, বলে এইতো দিব্যি সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার। কুলোর মতো কান, কি সুন্দর লেজ, আর মুখের সুরৎই বা কেমন চমৎকার হয়েছে। নিজের চেহারা তো নিজে দেখতে পাচ্ছো না, আহা যেন কোন্ সুলতান বাদশাহর পুত্র! রূপের জেল্লায় যেন ঘর ভরে গেল।

আলীর অন্তর আক্রোশে খাক হতে থাকে। কিন্তু কী করবে, মুখের ভাষা নাই, কিছুই বলতে পারে না সে।

যাদুকর ওকে নিচে নামিয়ে এনে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে কাঠকয়লা দিয়ে তার চারপাশে এক বৃত্ত এঁকে দেয়। অর্থাৎ এই বৃত্তের বাইরে সে পালাতে পারবে না!

ঐ উন্মুক্ত আকাশের নিচে অনাহারে অনিদ্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাটা রাত কেটে যায় তার। অনেক কসরৎ করেও ঐ দাগের বাইরে পা বাড়াতে পারলাম না সে।

সকালে যথারীতি দোকানে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বুড়ো আজারিয়াহ নিচে নেমে আলীর পিঠে চেপে বসে চাবুক মেরে বলে, চল, বাজারে চল। আজ তোকে বেচে দেবো। যাক্, আজকের মতো আমার বুড়ো খচ্চরটার তো একটু বিশ্রাম হলো। নে, জলদি চল।

আলী আর কী করবে, বুড়োটাকে পিঠে করে পথে নেমে পড়ে। এদিকে নিমেষের মধ্যে প্রাসাদটা হাওয়ায় মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দোকানের সামনে যে জায়গায় খচ্চরটাকে বেঁধে রাখতো জহুরী, আলীকেও সেই জায়গায় বেঁধে রাখলো। সারাদিন ধরে টাটা করা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলতে থাকলো সে। দানাপানি বলতে শুকনো কিছু ছোলা তাকে খেতে দিয়েছিল বুড়োটা। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, সেই অবস্থায় ঐ শুকনো ছোলাই সে গব গব করে খেল খানিকটা। যেমন করেই হোক, বেঁচে থাকতে হবে তাকে এবং জাইনাবের মাতুলের দাবী পূরণ করে জাইনাবকে পেতেই হবে।

বুড়োটা সারাদিন ধরে নিক্তিতে সোনা ওজন করে থলেয় ভরতে থাকে। আলীর মনে হয় শয়তানটাকে এক গুঁতো মেরে শেষ করে দেয়। কিন্তু নাগালের বাইরে বসে আছে সে। আলী মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার করে ওঠে। আশ-পাশের দোকানদার পথচারীরা চকিত হয়ে তাকায়। আলী জলের চাড়িতে নাক ডুবিয়ে জল টেনে নিয়ে ফরফর করে জহুরীর গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

আজারিয়াহ দাঁত কড়মড় করে বলে, দাঁড়াও, তোমাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করছি।

একটু পরে তার দোকানে একটা ইহুদী ছেলে এসে বলে, জহুরী সাহেব, বড় বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে। ব্যবসায় আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। এখন বিবি-বাচ্চাদের মুখে দানাপানি দেবো কী করে, তাই ভাবছি। এই নিন, আমার বিবির বাজুবন্ধ, এ দুটো রেখে আমাকে কিছু টাকা দিন,

আমি একটা গাধা কিনে পানির ভিস্তি বইয়ে বাড়ি বাড়ি পানি বেচবো।

বুড়ো জহুরী বলে, তোমাকে এই গাধাটা আমি দিতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত, এর পিঠে পেল্লায় বোঝা চাপাতে হবে। গাধাটা বড্ড বেয়াড়া, একেবারে খল, কিছুতেই নড়তে চায় না। ওকে বেধড়ক পিটে পিটে মোট বওয়াতে হবে। যদি রাজী থাক, আমি তোমাকে বিনি পয়সায় দিয়ে দিতে পারি।

ইহুদী ছেলেটা উৎসাহিত হয়ে বলে, সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, জহুরী সাহেব। এমন পিটানী লাগাবো, ওর বাপ ঠাকুরদার নাম ভুলিয়ে দেবো আমি।

আলীকে সঙ্গে করে সে বাড়ি নিয়ে যায়। বিবিকে বলে, গাধাটাকে নিয়ে এলাম। কাল থেকে ওকে পানির ভিস্তি বহাবো। আমি কিছু সামানপত্র কিনতে বাজারে যাচ্ছি। তুমি একে কিছু দানাপানি খেতে দাও।

ইহুদীর বিবি কিছু ছোলা এনে আলীকে খেতে দিতে ওর সামনে এগিয়ে আসে। আলী প্রচণ্ড জোরে নাক ঝেড়ে মাথা দিয়ে একটা গুঁতো মেরে মাটিতে চিৎপাট করে ফেলে দেয় ওকে। তারপর বুকের নিচে চেপে ধরে তার গাধাড়ে লম্বা জিভটা দিয়ে বৌটার নরম গাল চাটতে থাকে। পড়ে যাওয়ার সময় বৌটার কাপড়-চোপড় অসংবৃত হয়ে গিয়েছিল। গাধার কামোত্তেজনা দেখে সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। পাড়া কাঁপিয়ে চিৎকার করতে থাকে। তার আর্তনাদে পড়শীরা ছুটে এসে গাধারূপী আলীকে ঘা-কতক লাগিয়ে সরিয়ে দেয়।

একটু পরে স্বামী ফিরে আসতেই রাগে ফেটে পড়ে বৌটা। তোমার মতো শয়তান বে-আক্কেলে মরদে আমার দরকার নাই। সারা বাগদাদে এই মেয়ে-খেকো গাধা ছাড়া আর গাধা খুঁজে পেলে না তুমি?

স্বামীটা কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, কেন, কী হয়েছে, কী করেছে গাধাটা? লাথ-ফাৎ চালিয়েছে নাকি?

—আরে না, ওসব হলে তো কথা ছিল না। আসলে গাধাটা ভীষণ কামুক। আমাকে দেখামাত্র এক গুঁতো মেরে মাটিতে ফেলে দিল। আমি তো চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেছি। কাপড়-চোপড় সরে গেছে, এক রকম উদোম বললেই হয়। গাধাটা করলো কি জান, আমার বুকের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে ওর ওই খরখরে জিভ দিয়ে আমার এই গাল আর ঠোঁট চাটতে লাগলো। আমি প্রাণপণে ওঠার চেষ্টা করছি। ভয়ে শিটকে গেছি তখন। পরণের বেশ-বাস ঠিক নাই, কাউকে ডাকতেও পারছি না। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, গাধাটা আমাকে শেষ না করে ছাড়বে না। আমাকে সে ফেঁড়ে ফেলবেই। এবং তার বিক্রম ঠেকাবার বা সহ্য করার শক্তি আমার নাই। তাই শরমের মাথা খেয়ে নিরুপায় হয়ে চিৎকার করে পাড়ার লোককে জড়ো করতে বাধ্য হলাম। সময় মতো ওরা এসে গাধাটার লালচ থেকে আমাকে না বাঁচালে এতক্ষণে আমি শেষ হয়ে যেতাম। আমাকে ফেঁড়ে ফেলে দিত সে। এখন তুমি এর বিহিত কর। হয় গাধাটাকে তাড়াও, নয়তো আমি তোমাকে তালাক দেবো। আর এক দণ্ড দেরি করবো না আমি।

ইহুদী যুবক বললো, আমার দরকার নাই এমন গাধার। যার গাধা তাকে

ফেরত দিয়ে আসছি।

আলীকে মারতে মারতে সে ইহুদী জহুরীর দোকানে নিয়ে এসে বলে, আপনার গাধা আপনি ফেরত নিন, সাহেব। এমন বেয়াড়া জানোয়ার দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

তারপর সে জহুরীকে গাধার কাণ্ডকারখানা সব খুলে বলে চলে গেল। জহুরী আলীকে বললো, কীহে, সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে লোভ সামলাতে পারোনি? আচ্ছা চলো, আজ তোমাকে অন্য দাওয়াই দেবো।

দোকানের কাজ-কাম সমাধা করে গাধার পিঠে সামানপত্র চাপিয়ে প্রাসাদে ফিরে যায় জহুরী।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তেষট্টিতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

আলীকে প্রাসাদের একটা ঘরে এনে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে আবার তাকে আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনে।

—এবার বল, তোমার কিছু শিক্ষা দীক্ষা হলো? এখনও কী সেই গোঁ ধরেই বসে আছো? না, মতটত কিছু পালটেছো?

আলী বলে, মত আমার একটাই! জান থাকতে তা পালটাবো না।

বুড়োটার চোখ জ্বলে ওঠে, হুঁ, ভাঙ্গবে, তবু মচকাবে না দেখছি।

আলী বুড়োটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাক করতেই সে পলকের মধ্যে মন্ত্রবলে তাকে একটা ভল্লুকে রূপান্তরিত করে ফেলে।

গলায় একটা লোহার শিকল বেঁধে সারারাত প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয় আলীকে। সকাল বেলায় টানতে টানতে তাকে দোকানে নিয়ে যায় বুড়ো। সারাদিন ধরে টা টা করা রোদের মধ্যে দোকানের সামনে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখে। কত লোক আসে যায়, কত বেচা কেনা দেখে সে। কিন্তু কাউকেই কোনও কথা বলতে পারে না। জানাতে পারে না তার মনের বাসনা। বুড়ো যাদুকর তাকে বোবা করে রেখেছে।

একটি লোক আলীকে দেখে বুড়ো জহুরীটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, আপনার এই ভল্লুকটা বিক্রি করবেন? আমার বিবি খুব অসুস্থ। তাকে হেকিম দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন, ভল্লুকের মাংস খাওয়াতে হবে আর ভল্লুকের চর্বি মাখাতে হবে তাকে। এই ভল্লুকটা পেলে আমার কাজ চলে যাবে।

যাদুকর বলে, আজই তুমি একে জবাই করতে চাও? তবে দিতে পারি।

লোকটা বললো, হ্যাঁ, আজই। আমার বিবির জন্যে সারা শহরে হন্যে হয়ে খুঁজছি। কিন্তু মনের মতো একটাও পেলাম না। আপনার ভল্লুকটা আমার খুব মনে ধরেছে।

জহুরী বললো, উত্তম কথা। নিয়ে যাও, আমি বিনি পয়সাতেই তোমাকে দিয়ে দিলাম।

আলীকে বাড়ি নিয়ে গেল লোকটি। চাকরকে পাঠালো একটা কষাইকে আনার জন্য। কষাই এসে তার ছুরি শান দিতে দিতে বললো, ভল্লুকটা বেশ তাগড়াই, ভালো গোস্ত হবে।

মৃত্যুর মুখোমুখি হলে মানুষ তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শরীরে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চার করতে পারে। আলীও নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রচণ্ড বিক্রমে কষাইকে এক ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল। একটানা ছুটতে ছুটতে অবশেষে সে যাদুকরের প্রাসাদে এসে হাজির হয়।

বুড়ো যাদুকর ভল্লুককে ফিরে আসতে দেখে বললো, ফিরে যখন এসেছো, আর একবার বাঁচার সুযোগ আমি তোমাকে দেবো। কিন্তু এখনও তুমি যদি এক-গুঁয়ে হয়েই বসে থাক, আমার কিছু করার নাই।

এই বলে সে আবার মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে আলীকে মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে আনে। এবার সে তার কন্যা কামরকে ডাকে। যাদুকর-কন্যা আলীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এমন সুন্দর সুঠাম চেহারার নওজোয়ান সে জীবনে দেখেনি কখনও। আলীর সামনে এসে বলে, আচ্ছা সাহেব, সত্যি করে বল তো, তুমি শুধু আমার সাজ-পোশাকই চাও—আমাকে চাও না?

আলী বলে, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো, আমি তোমার সাজ-পোশাকই চাই—তা শুধু আমার জাইনাবের জন্য। ওগুলো না দিতে পারলে তাকে যে আমি শাদী করতে পারবো না।

ক্ষোভে অপমানে কামর-এর মুখ কালো হয়ে যায়। বুড়ো আজারিয়াহ হুঙ্কার ছাড়ে, দেখলি মা, দেখলি? কত দেমাক দেখলি? এতোতেও ওর এক রতি শিক্ষা হলো না।

এই বলে সে আবার আলীর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে বলে, কুকুর হয়ে যা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে আলী কুকুরের রূপ ধারণ করে। বুড়োটা ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে এক গোত্তা মেরে রাস্তায় বের করে দেয়, যা, পথে পথে ঘোর।

আলী কুকুর হয়ে বাগদাদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চরে বেড়ায়। কিন্তু অন্য কুকুরের তাড়া ছাড়া কোনও খাদ্যবস্তুই সে সংগ্রহ করতে পারে না। খিদের জ্বালায় পেট জ্বলতে থাকে। শেষে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একটা দোকানের সামনে এসে ধুঁকতে ধুঁকতে এলিয়ে পড়ে। তার এই অবস্থা দেখে দোকানীর মনে করুণার উদ্রেক হয়। সে তাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চৌষট্টিতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

সওদাগরের কন্যা কুকুররূপী আলীকে দেখা মাত্র নাকাব দিয়ে মুখ ঢেকে

সামনে থেকে আড়ালে সরে গিয়ে বলে, আব্বাজান, এ তুমি কাকে ধরে নিয়ে এসেছো অন্দরমহলে ?

সদাশয় বৃদ্ধ সওদাগর নিরীহ সরল মানুষ। কন্যার কথা কিছুই বুঝতে পারে না।

—তুই কার কথা বলছিস, মা ? আমার সঙ্গে তো অন্য কোনও পরপুরুষ আসেনি।

মেয়ে বলে, তুমি বুঝতে পারনি, আব্বাজান। যাকে তুমি কুকুর ভেবে অন্দরে এনেছো, আসলে সে এক নওজোয়ান পুরুষ। তার নাম চাঁদ আলী। কাইরোর বাসিন্দা। আজ নসীবের ফেরে পড়ে এই হাল হয়েছে। যাদুকর আজারিয়াহ তাকে কুকুর বানিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সওদাগরের বিশ্বাস হয় না। সে আলীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কী, যা বলছে আমার মেয়ে, সব ঠিক ?

আলীর মুখে ভাষা নাই। কিন্তু বুঝতে পারে সবই। মাথা হেলিয়ে সে জানায়—সব সত্যি।

—ইয়া আল্লাহ, সওদাগর চিৎকার করে উঠে, এখন উপায় ?

—উপায় আছে, আব্বাজন। আমি ওকে আবার মানুষের রূপে ফিরিয়ে আনতে পারি।

সওদাগর অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়, তুমি ? তুমি ওকে মানুষ বানিয়ে দিতে পারো ?

পারি, আব্বাজান। যদি সে আমাকে শাদী করবে কথা দেয়, এক্ষুনি আমি ওকে ওর আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিতে পারি।

হায় আল্লাহ, ওসব হিসেব নিকেষের কথা পরে হবে মা, যদি পারো, আগে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে আনো ওকে। তারপর শাদীর প্রস্তাব দেবো আমি। নিশ্চয়ই সে অকৃতজ্ঞ হবে না।

সওদাগর-কন্যা তখন একটি পাত্রে খানিকটা জল এনে আলীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলী আবার তার আগের রূপ যৌবন চেহারা সব ফিরে পায়।

সওদাগর অবাক হয়ে আলীকে দেখতে থাকে। এমন চাঁদের মতো সুন্দর ছেলেটাকে ঐ বুড়ো আজারিয়াহ একটা কুকুর বানিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল ?

সওদাগরের ক্রীতদাসী নিগ্রো মেয়েটা ছুটে আসে ; এ তোমার কী রকম ব্যাভার, ছোট মালকিন ? তোমার সঙ্গে আমার ওয়াদা কী ছিল ?

এই নিগ্রো ষোড়শী মেয়েটি সওদাগর-কন্যারই সমবয়সী। বাড়ির কেনা দাসী হলেও সখী-সহচরীও বটে। আগে সে যাদুকর আজারিয়াহর বাড়িতে কাজ করতো। সেই সময় কায়দা করে সে বুড়োর পাঁজিপুঁথি চুরি করে পড়ে পড়ে এই যাদুবিদ্যার কৌশল রপ্ত করেছিল। সওদাগরের বাড়িতে আসার পর তার মেয়ের সঙ্গে বেশ ভাব জমে যায় তার। তার অধিত বিদ্যার সবটাই সে শিখিয়ে পড়িয়ে দেয় তাকে। কিন্তু সে শেখানোয় একটা শর্ত ছিল। ওরা

দুজনে কসম খেয়ে হলফ করেছিল, জীবনে তারা কখনও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকবে না। এবং সেই কারণে দুজনেই একজন পুরুষকে শাদী করবে। কিন্তু আজ সওদাগর-কন্যা আলীকে শাদী করার প্রস্তাব দেবার সময় নিগ্রো সহচরীর কথা উল্লেখ করেনি বলে সে আহত হয়ে ক্ষোভ জানায়।—এ তোমার কেমনতর বিচার ছোটা মালকিন, কথা ছিল যাকে শাদী করবো, দুজনে এক সঙ্গে করবো?

আলী পুরোপুরি মানুষের আকৃতি ফিরে পেয়ে বলে, আমি তোমাদের দুজনকেই শাদী করবো। তোমাদের দয়াতেই আমি আমার আগের জীবন ফিরে পেলাম।

এমন সময় দরজা ঠেলে জহুরী যাদুকরের মেয়ে কামর প্রবেশ করে সেখানে। তার হাতে একখানা সোনার রেকাবী। তাতে সাজানো তার সোনার পোশাক, সোনার মুকুট এবং সোনার জুতো জোড়া। সে বলে, এই নাও, তোমার ভালোবাসা জাইনাবের দেন-মোহর দিয়ে যেতে এসেছি আমি। সত্যিই জাইনাবের সৌভাগ্য দেখে হিংসে হয়। তার জন্যে তুমি যে-অমানুষিক লাঞ্ছনা-কষ্ট সয়েছো, ভালোবাসার ইতিহাসে তার কোনও নজির নাই। জাইনাবকে পেয়ে তোমার জীবন মধুময় হোক, তাতেই আমি সুখী হবো।

চাঁদ আলী বলে, জাইনাব আমার জীবনের স্বপ্ন। তাকে আমি নিশ্চয়ই চাই। সেই সঙ্গে তোমাদেরও দূরে রাখতে পারবো না। তোমরা এই তিনজন আমার জীবনে আবার নতুন করে ফুল ফুটিয়ে দিলে। কামর, তোমার এই মহান ত্যাগের কাহিনীও সোনার জলে লেখা থাকবে। জানি, প্রথম দর্শনেই তুমি আমাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছো। আমার কষ্টে তুমি যন্ত্রণা ভোগ করেছো। আমার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য আজ তুমি নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছো তোমার সবচেয়ে প্রিয় মহামূল্যবান সাজ-পোশাক। সে পোশাক আমি আমার প্রিয়তমা জাইনাবকে পরাবো, সে তুমি ভালো করেই জানো। সব জেনে শুনেও, তুমি যে এইসব আমার হাতে তুলে দিতে এসেছো এর বদলে তোমাকে কী শূন্য হাতে ফেরাবো?

—আমি কোনও প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি, আলী? শুধু তুমি সুখী হবে বলে—

আলী বলে, আজ তুমি যে সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক ওপরে উঠে এসেছো, কামর। তাই আমি তোমাকে শাদী করবো। এরা দুজন আমার প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তুমি হবে আমার তৃতীয় বিবি।

—আর জাইনাব?

কামর জানতে চায়। আলী বলে, সে আমার চতুর্থ এবং শেষ বিবি। তারপরে আর আমার জীবনে কিছু নাই। তা হলে, আজকের মতো ছুটি দাও, আমি এই সাজ-পোশাক নিয়ে যাই জাইনাবের কাছে। তাকে দিয়ে আসি।

রাস্তায় বেরিয়ে আলী একটা বেঁটেখাটো মেঠাইওলার দেখা পায়। সে হালওয়া আর পেস্তার বরফি বিক্রি করে বেড়াচ্ছিল। আলী ভাবে, জাইনাবের কাছে কিছু মিষ্টি নিয়ে যাবে। মেঠাইওলাকে সে ডাকে, এই—শুনছো, এদিকে এস, নামাও, দেখি কী মেঠাই আছে তোমার ডালায়।

লোকটা তাড়াতাড়ি কাছে এসে ডালা নামায়, আমার মেঠাই সারা বাগদাদের সেরা, সাহেব। একবার মুখে দিয়ে দেখুন না!

লোকটার হাত থেকে একটুকরো হালওয়া নিয়ে আলী মুখে পোরে। এগাল-ওগাল করতেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। মাথাটা ধরে সে মাটিতে বসে পড়ে। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

এই বেঁটেখাঁটো মেঠাইওলাটি জাইনাবের বড় বোনের আটাশে ছেলে মহম্মদ। আলীকে ফাঁদে ফেলার জন্যই সে আফিং মেশানো মেঠাই নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আলী পথের মাটিতে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ার পর মহম্মদ সেই সোনার সাজ-পোশাকগুলো বগলদাবা করে চোঁ দৌড় দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাসান তার ধনুর্ধরদের নিয়ে সেই সময় ঐ পথ দিয়ে ফিরছিল। ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে পাকড়াও করে ফেলে। চড়-চাপড় লাগাতেই সে কবুল করে, হ্যাঁ সামানগুলো চাঁদ আলীরই বটে। সে তাকে প্রতারণা করে আফিং মেশানো মন্ডা খাইয়ে সে-গুলো নিয়ে সটকে পড়ার ফিকিরে ছিল।

অচৈতন্য আলীকে হাসান তার বাড়িতে নিয়ে আসে। আফিং-এর ঘোর কাটানোর দাওয়াই দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। আলী চোখ খুলেই চিৎকার করে ওঠে, আমার জাইনাবের সাজ-পোশাক কোথায়?

হাসান হাসে, আছে, আছে। তোমার এত কষ্টের সংগ্রহ করা জিনিস আর একটু হলেই লোপাট হয়ে যাচ্ছিল। সময় মতো আমার নজরে আসতে রক্ষা পেয়েছে, এই নাও।

চাঁদ আলী তার নিদারুণ অভিজ্ঞতার হৃদয়-বিদারক কাহিনী শোনালো হাসানকে। সব শুনে হাসান বলে, সাবাস, একেবারে কামাল করে দিয়েছো। কামরকে যখন শাদী করছো, তখন তো তুমি বুড়ো আজারিয়াহর দোকান-পাট প্রাসাদ সব বিষয় সম্পত্তির ষোল আনা মালিক হচ্ছো। তা হলে শাদীর উৎসবটা ঐ যাদুকরের প্রাসাদেই হবে, কী বল?

আলী হাসে, তাতে আর বাধা কী? যাই হোক, এখন আমি জাইনাবের মামা সেই পাজি শয়তান জুরেকের কাছে এই সাজ-পোশাক নিয়ে যাবো। মনে হয়, এবার আর সে 'না' করতে পারবে না। শাদীর পর জাইনাবের সেই বোনপোটাকে একটু টিট করে দিতে হবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁয়ষট্টিতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে:

হাসান জুরেককে খবর পাঠিয়েছিল, আমরা আপনার বায়না মতো দেন-

মোহর সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়াখানার বাসগৃহে ডিলাইলাহ এবং জাইনাবের কাছে যাচ্ছি। আপনি মেহেরবানী করে সেখানে আসুন।

আলীকে সঙ্গে নিয়ে হাসান সেই সাজ-পোশাকের রেকাবীখানা বয়ে নিয়ে চলে।

জাইনাব আর ডিলাইলাহ তখন পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছিল। জুরেক বসেছিল এক পাশে। হাসান সাজ-পোশাকের ডালাখানা তার সামনে নামিয়ে বললো, দেখুন জনাব, আপনি যা যা চেয়েছিলেন, সব ঠিক ঠিক আছে কিনা, দেখে নিন। এবার তো আপনার অমত হবে না! এর পরেও যদি আপনি অন্য ছুতো তোলেন, তাহলে কিন্তু ইজ্জতের লড়াই বেধে যাবে আপনার সঙ্গে।

জুরেক হাসলো, আমি লোকটা একটু কড়া ধাঁচের, সবাই জানে। কিন্তু তা বলে কথার খেলাপ করবো কেন? খুব খুশি হয়েছি আমরা। আব কোনও কিছু দাবী-দাওয়া নাই। জাইনাবও খুশি হয়ে শাদীতে মত দিচ্ছে।

পরদিন সকালে চাঁদ আলী জহুরী আজারিয়াহর প্রাসাদ অধিকার করে বসে। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় কাজীকে ডাকা হয়। আহমদ তার চল্লিশজন অনুচরদের সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যায়। পর পর চারটি শাদী-নামা তৈরি করে কাজী। ডিলাইলাহর কন্যা জাইনাব, আজারিয়াহ-তনয়া কামর, সওদাগর-নন্দিনী এবং তার নিগ্রো সহচরী এই চারজনের সঙ্গে আলীর শাদীপর্ব সমাধা হয়!

প্রথম রজনীতে বাসরশয্যায় এল জাইনাব। আলী বুঝলো; সত্যিই সে এতদিন অপাপবিদ্ধ কুমারীই ছিল। তার পরদিন থেকে প্রতিদিন এক এক বিবির সঙ্গে সহবাস করে সে খুশি হলো। তার চার বিবির সকলেই খুব চমৎকার।

এরপর পুরো এক মাস ধরে খানাপিনার মহোৎসব চলতে থাকে। অতিথি মেহেমান অভ্যাগতরা খানাপিনা, নাচগান বাজনা হৈ-হল্লা করে সারা প্রাসাদ মাতিয়ে রাখলো।

হাসান দরবার থেকে ফিরে এসে আলীকে বললো, চাঁদ একটা শুভ সংবাদ আছে। খলিফার চোখ পড়েছে তোমার ওপর। তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন তাঁর কাছে।

আহমদ আর হাসানের সঙ্গে আলী দরবারে এসে খলিফাকে কুর্ণিশ জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা আলীর রূপ দেখে মুগ্ধ হন।

প্রহরীদের একজন রুমালে ঢাকা একখানা রেকাবী হাতে করে সুলতানের সামনে এসে দাঁড়ায়। খলিফার ইশারাতে রুমালখানা তুলে নেয় সে। রেকাবীর ওপরে একটি কাটা মুণ্ডু। খলিফা হেসে আলীকে জিজ্ঞেস করে, দেখো তো, চিনতে পারো কিনা—কার মাথা?

—আলী বলে, খুব পারি, ধর্মাবতার। এ সেই শয়তান জহুরী যাদুকর আজারিয়াহর কাল্লা।

খলিফা বলেন, লোকটার অত্যাচারে বাগদাদের মানুষ অহর্নিশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই তার সমুচিত পুরস্কার—

আলী বলে, ধর্মাবতার যোগ্য সাজাই বিধান করেছেন। আর কিছুকাল ওকে বাঁচিয়ে রাখলে তামাম শহরটাকেই সে জ্বালিয়ে দিত।

এরপর আলী তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলো খলিফার সামনে। খলিফা শুনে একদিকে যেমন বিস্মিত হলেন আর এক দিকে তেমনি মুগ্ধও হলেন আলীর দুঃসাহসিক অভিযান আর অসীম সাহস দেখে। তৎক্ষণাৎ তিনি আলীকেও আহমদ হাসানের সম মর্যাদার পদে বহাল করলেন।

শাহরাজাদ থামলো।

সুলতান শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা শাহরাজাদ এ কাহিনী কী সত্যি সত্যিই ঘটেছিল? না, নেহাতই বানানো কিস্সা—।

শাহরাজাদ বলে. আমি যা বললাম, তার একবর্ণও বানানো নয়, জাঁহাপনা। সবই সত্যি ঘটনা। কিন্তু এরপর যে কাহিনীটা শোনাবো সেটা আরও চমক জাগানো, সত্যি ঘটনা। ধীবর যুদর অথবা আশ্চর্য যাদু-থলের কাহিনী শুনুন:

উমর নামে এক সওদাগর ছিল। তার তিন পুত্র। বড়টির নাম সালিম, মেজোটি সলিম আর ছোটছেলের নাম যুদর। সওদাগর তিন ছেলেকেই সমান আদর-যত্নে লালন-পালন করে বড় করলো। কিন্তু বড় দুই ভাই ছোটর প্রতি দুর্ব্যবহার করতো নিয়ত। সওদাগর বুঝলেন, তার মৃত্যুর পরও ছোটছেলের প্রতি অসদাচরণ করবে তারা। তাই সে কাজী এবং পরিবারের সকলকে ডেকে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললো, ভাই-এ ভাই-এ সদ্ভাব নাই। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর ছোটকে পথে বসাবে বড় দুই ভাই। সেই কারণে আজই আমি আমার বিষয় সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতে চাই।

উমরের নির্দেশে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি সমান চার-ভাগে ভাগ করে দিলেন কাজী। এক এক ভাগ পেল এক এক পুত্র। বাকী একভাগ নিজের দখলে রাখলো সওদাগর। বললো, আমার মনে হয়, এবার আর কোন ঝগড়া বিবাদ বাধবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার ভাগের সম্পত্তির মালিক হবে আমার বিধবা বিবি। শেষ বয়সে যাতে ছেলেদের হাত-তোলা হয়ে না থাকতে হয় তাকে, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা করে গেলাম।

আত্মীয়-পরিজন সকলেই সাধুবাদ জানিয়ে বললো, খুব পাকা কাজ করে গেল সওদাগর। এতে সকলেই সুখে শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। সওদাগরের মৃত্যুর পর নানা ছলছুতো

করে বড় দুই ভাই যুদরের বিষয়-সম্পত্তি বে-দখল করে নিল।

যুদর পাড়া-প্রতিবেশিদের স্মরণাপন্ন হলো! তারা এসে মিটমাট করার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সালিশের কোনও কথাই বড় দু'ভাই গ্রাহ্য করলো না। তারা বললো, ছোটর জন্যই আমাদের এই দুর্দশা। এত বড় সম্পত্তি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দোকান-পাট বিক্রি করে দিতে হয়েছে। এখন আমরা খাবো কী? সুতরাং ঐ সম্পত্তিরও ভাগ চাই আমরা।

প্রতিবেশিরা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, দেখ, এসব ফালতু যুক্তি, আইনের ধোপে টিকবে না। তোমার বাবা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কানুন-মাফিক তিনি কাজী এবং সাক্ষী-সাবুদ ডেকে সম্পত্তি ন্যায্যমতো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়ে গেছেন। আদালতে সেই দলিলই গ্রাহ্য হবে। এখন তোমরা বড় হয়েছো, বাপের বাক্য যদি অমান্য করতে চাও, আমাদের কিছু বলার নাই। তবে এটাও ঠিক, আমাদের পাঁচজনের কথা অগ্রাহ্য করে কোর্ট-কাছারী করলে, ফয়দা হবে না কারো।

এতেও বড় দুই ভাই-এর বোধোদয় হলো না। বাধ্য হয়েই যুদরকে আদালতে যেতে হলো। বিষয়-সম্পত্তির মামলা বড় জটিল ব্যাপার। অতি সহজে এর নিষ্পত্তি হতে পারে না। আর মামলা একবার রুজু করলে পিছনে হটাও সম্ভব না। আদালতে দাঁড়ানো মানেই উকিল মোক্তারকে জেবে পয়সা গুঁজে দেওয়া। এইভাবে কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন তা শেষ হতে বাধ্য। এছাড়া মামলা-মোকদ্দমার নেশা মদের নেশার চেয়েও মারাত্মক। মামলায় জেতার জেদ মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়।

উমর-সন্তানদেরও তাই হলো। মামলার খরচ জোগাতে জোগাতে এক এক করে সব বিষয়-সম্পত্তিই নিঃশেষ হয়ে গেল সকলের। শেষ পর্যন্ত কেউই আর টিকে থাকতে পারলো না। মামলাটা খারিজ হয়ে গেল।

এই সময়ে ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ছেষট্টিতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে :

তিন ভাই-এর এমন দুর্দশা—দিনান্তে একখানা রুটি আর একটুকরো পেঁয়াজ জোগাড় করতে পারে না তারা। বড় দুই ভাই এবার মা-এর বিষয়টুকু কেড়ে-কুড়ে নিয়ে উধাও হলো। মা বেচারী কাঁদতে কাঁদতে ছোটছেলে যুদরের কাছে এসে সাহায্য চায়। বড় দুই ছেলের নামে বার বার অভিসম্পাত দিতে থাকে।

যুদর বলে, অমন করে ওদের শাপ-শাপান্ত করো না, মা। হাজার হলেও ওরা তো তোমার পেটের সন্তান। উপরে আল্লাহ আছেন, তিনিই বিচার বিহিত করবেন। ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। তোমার এই ছোটছেলে যুদর তো এখনও জিন্দা আছে, মা। আমি যদি এক বেলা খেতে পাই, তুমিও

পাবে। আর—খঞ্জ অথর্ব তো নই। গায়ে তাগদ আছে, জোয়ান মরদ ছেলে, দুনিয়ার হাজারো মানুষ খেটে খাচ্ছে, আর আমি পারবো না? তবে এও ঠিক, মায়ের সম্পত্তি ছেনতাই করে ওরা পেট ভরাবে, তাও আমি সইবো না। লাঠালাঠি আমি পছন্দ করি না, কিন্তু তা বলে, অন্যায়, অধর্মও আমি বরদাস্ত করবো না। যা হয় হবে, আজই আমি আবার মামলা ঠুকে দেবো ওদের নামে।

মা বাধা দিয়ে বললো, অমন কথাটি মুখে আনিসনি, বাবা। একবার মামলা করে তো দেখলি, কী হলো। নিজেরা পথের ভিখিরি হয়ে উকিল মোক্তারদের পেট মোটা করালি। যা গেছে তা যাক, আর কখনও আদালতের ত্রি-সীমানা মাড়াস না—এই আমার উপদেশ বাবা। ওতে আখেরে কারো লাভ হয় না। ওপরে তিনি আছেন, শেষ-বিচারের দিন কেউ কিছু গোপন করতে পারবে না। কড়ায়-গণ্ডায় সব হিসেব নিকেষ নেবেন তিনি। তিনিই বিচার করবেন—সাজা দেবেন।

যুদর একখানা মাছধরা জাল কিনে আনলো। নীল নদের জলে মাছ ধরে বাজারে বেচতে লাগলো। প্রতিদিন সে বুলক পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে নদীর লজে· জাল ফেলে। কোনও দিন, নসীবে থাকলে, মোটামুটি কিছু মেলে. আবার কোনও দিন হয়তো বা শুধু চুনো পুঁটি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। যুদর-এর মনে কোনও ক্ষোভ নাই। একদিন সে শহরের এক বিত্তবান পরিবারের সন্তান ছিল, সে কথা ভেবে আজ সে বৃথা অনুতাপ করে না। কী ছিল, কী রাখতে পারলে কী হতে পারতো, সেই-সব অলীক চিন্তায় সে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চায় না। অবস্থা এবং সময়ের ফেরে আজ সে যেখানে দাঁড়িয়েছে তাকেই সে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে নিয়েছে।

প্রত্যেক দিনই হয়তো সমান রোজগার হয় না—তবে কেনও দিন দশ, কোনও দিন কুড়ি, আবার কোনও দিন ত্রিশ-চল্লিশটা তামার পয়সা সে ঘরে আনতে পারে। দুধে-ভাত না হলেও মোটামুটি খেয়ে পরে তাদের দুজনের দিন চলে যায়।

মা-এর সর্বস্ব অপহরণ করেও তার দু-ভাই বেশি দিন রাখতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আবার তারা দীন-ভিখারি হয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকে।

মায়ের প্রাণ মোমের পাথরে গড়া। স্নেহের উত্তাপে গলেগলে সারা হতে কতক্ষণ! অভুক্ত উপবাসী, রিক্ত-বস্ত্র, নগ্নপ্রায় সন্তানকে দেখে কোন্ মা-ই বা পাষাণ হয়ে থাকতে পারে? যুদরের অলক্ষ্যে সে খিড়কীর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্য পাটে বসে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। অশরীরী প্রেতাত্মার মতো সালিম সলিম দুই ভাই মাটির সরা হাতে করে এসে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছে মা কিছু রুটি আর মচ্ছী ঢেলে দিয়ে বলে, যা যা, এখানে আর দাঁড়াস নে, পালা। ছোট এসে দেখলে আমাকে বকাবকি করবে।

এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় দুই ভাই চুপিসারে খিড়কীর দরজায় এসে

মায়ের দেওয়া রুটি-তরকারী নিয়ে চলে যায়। একদিন কিন্তু যুদর দেখে ফেলে। সাধারণতঃ এই সময় সে বাড়ি ফেরে না। কিন্তু সে-দিন কী একটা কারণে সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার মা দুই ভাইকে খেতে দিচ্ছে। ছোট ছেলে দেখে ফেলেছে জানতে পেরে মা ভয়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে থাকে। যুদর কিন্তু হাসিমুখে মা আর ভাইদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কী ব্যাপার বড় ভাই, তোমরা এই অন্ধকারে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? এস, ভেতরে এস। কতকাল তোমাদের দেখিনি। এইভাবে ছোট ভাইকে ভুলে থাকতে আছে? আমি অনেক খোঁজ করেছি তোমাদের। কিন্তু কোনও হদিস করতে পারিনি। কেমন আছ, কোথায় থাক কিছুই জানি না।

সালিম সলিম বলে, কী করে আর তোমার সামনে এসে দাঁড়াই, বল? যে অন্যায় করেছি আমরা, তা কী অত সহজেই তুমি ভুলতে পারো? কী বলবো ভাই, সবই শয়তানের কারসাজী। তা না হলে, তোমার মতো ভাই-এর সঙ্গে আমরা ঝগড়া-বিবাদ করি? আজ আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি—কী দুর্ব্যবহারই না করেছি তোমার সঙ্গে। এখন এত বড় দুনিয়াতে তুমি আর মা ছাড়া আমাদের আপনজন বলতে কেউ নাই, যুদর।

মা বলে, একমাত্র খোদা-তালার ওপর ভরসা রাখ, বাবা। তিনিই সব বিপদ কাটিয়ে দেবেন। আবার সুদিন ফিরে আসবে।

যুদর বললো, পথে পথে কোথায় ঘুরবে, আমার কাছেই থাক তোমরা। আমাদের যদি কিছু জোটে, তোমাদেরও জুটবে।

এইভাবে সেদিন সন্ধ্যায় ভাই-এ ভাই-এ আবার মিলন ঘটলো।

পরদিন সকালে উঠে তিন ভাই একসঙ্গে বসে নাস্তা-পানি করলো। তারপর যুদর জাল কাঁধে করে নীলের দিকে রওনা হলো আর সালিম সলিম বেড়াতে বেরুলো। দুপুরবেলায় ফিরে এসে তারা দুজনে মা-এর সঙ্গে বসে আহারাদি সেরে আবার বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যায় ফিরে এল যুদর। সারাদিন মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সব্জী মাংস সওদা করে ঘরে এলো সে।

এইভাবে একটা মাস কেটে যায়। যুদর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে পয়সা রোজগার করে নিয়ে আসে। আর দুই ভাই খায় দায়, আর গুলতানি করে ঘুরে বেড়ায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতষট্টিতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয় :

একদিন নদীতে জাল ফেলে ফেলে সারাদিনে একটি পুঁটি মাছও তুলতে পারলো না। পরদিনও সেই একই ব্যাপার ঘটলো। এই কারণে তার পরদিন সে জায়গা বদল করে নদীর অন্যত্র জাল ফেলতে লাগলো। কিন্তু এমনই বরাত সারাদিন ধরে চেষ্টা করেও একটা ছোটখাটো মাছও সে তুলতে পারলো না।

পরদিন সে আবার স্থান পরিবর্তন করে। কিন্তু নসীব যখন সাধ দেয় না তখন কিছুতেই কিছু হয় না। এক এক করে অনেকগুলো জায়গায় জাল ফেলেও সে কিছু সংগ্রহ করতে পারলো না।

তবে কী পানিতে আর মাছ নাই? যুদর শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তা হলে কী উপায় হবে? ঘরে যা জমানো ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আজ কিছু না নিয়ে যেতে পারলে উপোস দিতে হবে। সে নিজে না হয় দু-একটা দিন না খেয়ে কাটাতে পারবে। যুদর ভাবে, কিন্তু তার মা—তার দুই ভাই? তাদের অভুক্ত রাখবে কী করে?

চলতে চলতে এক সময় সে রুটির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিন সে ফেরার পথে এই দোকান থেকে রুটি কিনে বাড়ি ফেরে। কিন্তু আজ তার কাছে একটা পয়সা নাই। কী করে কিনবে রুটি!

যুদর দোকানের এক পুরানো খদ্দের। প্রত্যেক দিন সে জাল কাঁধে করে সোজা দোকানে ঢুকে রুটি কেনে। কিন্তু আজ, দোকানী ভাবে, সে ঐ ভাবে সতৃষ্ণ-নয়নে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে কেন?

—যুদর ভাই, কী হলো? আজ বাইরে দাঁড়িয়ে যে? রুটি নেবে না?

যুদর কোন জবাব দিতে পারে না। দোকানী বলে, বুঝেছি, আজ জালে কিছু ধরা পড়েনি, এই তো? তা, এত সঙ্কোচ কেন, ভাই। এস, ভেতরে এস. যা দরকার নিয়ে যাও। কাল মাছ উঠলে দাম দিয়ে যেও।

যুদর বলে, আমাকে দশ পয়সার রুটি দিন। কাল জালে মাছ উঠলে দাম দেবো।

—আরে, তার জন্য অত ভাবছো, কেন? কাল না হয়, পরশু দেবে। না হয় আরও দু দিন পরে দেবে। মাছ তো একদিন উঠবেই।

দোকানী ওকে রুটি এনে দেয়। যুদর কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।—আপনি বরং আমার এই জালখানা বাঁধা রাখুন—

—পাগল ছেলের কথা শোন, জালখানা এখানে রেখে দিলে তুমি মাছ ধরবে কী দিয়ে? যাও, বাড়ি যাও, খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে। কাল সকালে তো আবার বেরুতে হবে।

যুদর স্বস্তি পায়। সে রাতটাও কোনরকমে কেটে যায়। কিন্তু পরদিনও সে একটা মাছ তুলতে পারে না। সেদিনও রুটিওলা ওকে ধারে রুটি দেয়। বলে, যুদর ভাই আমার, কোনও শরম করো না। যা দরকার আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। জানি, মানুষের সব দিন সমান যায় না। তা বলে মুষড়ে পড়লে তো চলবে না। বরং মনে আরও সাহস সঞ্চয় করতে হবে। খারাপ সময়ের মোকাবিলা করাই আদর্শ কর্ম।

যুদর বলে, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করবেন। দেখি, কাল আবার জায়গা বদল করে জাল ফেলবো।

কিন্তু তার পরদিনও যুদর কোনও মাছ ধরতে পারে না। সেদিনও সে রুটিওলার কাছ থেকে কিছু রুটি এবং দশটা নগদ পয়সা ধার করে নিয়ে যায়।

ভাবে, পরদিন নিশ্চয়ই সে মোটা মাছ পাবে। তা হলে প্রথমে সে দোকানীর ধার মিটিয়ে দেবে। মানুষটা বড় ভালো। তার সহৃদয়তা কখনও সে ভুলতে পারবে না! কিন্তু হায় রে পোড়া কপাল, সারাদিন চষে বেড়িয়েও সে দশ পয়সার মাছ ধরতে পারলো না। সেদিন সে আর দোকানের সামনে না দাঁড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে থাকে। দোকানী ছুটে এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

—এই তোমার ব্যবহার? পয়সা দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছো?

যুদর কী বলবে, ভেবে পায় না।

—উঁহুঁ, একটিও কথা নয় যুদর, এই ধর, রুটি নাও। আর এই নাও দশটা পয়সা। শুধু রুটি তো খাওয়া যাবে না, কিছু সব্জী কিনে নিয়ে যাও। খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে। শরীরটাকে তো ঠিক রাখতে হবে। তারপর কালকের ব্যাপার কাল দেখা যাবে। আমার যতটা সাধ্য আছে আমি তোমাকে দিয়ে যাবো। তোমার যখন সুবিধে হবে আমাকে ফেরত দিও। কোনও লজ্জা করো না, বুঝলে?

পরদিনও সে শূন্য হাতে ফিরে এসে দোকানীর কাছ থেকে রুটি আর পয়সা কর্জ করে বাড়ি আসে। এইভাবে আরও সাতটা দিন সে দেনা করেই কাটায়। রোজই জাল নিয়ে নদীতে যায়, কিন্তু একটা খলসে চাঁদাও জালে ওঠে না। ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে সে। এভাবে কতদিন চালাবে সে? না না না—মাছ তাকে ধরতেই হবে। এই নীল নদ তাকে আর কিছু দেবে না। সে একেবারে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তা নিক, তা বলে সে তো আর হাল ছেড়ে বসে থাকতে পারে না। নীল যদি নির্দয়ভাবে তাকে ফেরায়ও তবে সে অন্য কোথাও বা অন্য কোনওখানে গিয়ে জাল ফেলবে, মাছ তাকে তুলতেই হবে।

পরদিন সকালে সে জাল নিয়ে কারুণ হ্রদে যায়। এই হ্রদটা কাইরো থেকে বেশি দূরে নয়। সবে জলে জাল ফেলতে যাবে, এখন সময় সে দেখতে পেল, এক মুর একটি সুসজ্জিত খচ্চরে চেপে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। নিজেও সেজেছে মূল্যবান সাজ-পোশাকে। মুর তাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়, কী গো উমরের পো যুদর, কেমন আছ?

—এই—কেটে যাচ্ছে, হাজী সাহেব?

হাজী সাহেব আরও কাছে এসে বলে, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম উমরের পো। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে, বাবা!

যুদর বলে, কী দরকার বলুন, চাচা। আমি তো আপনারই বান্দা। আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনও কাজ হয়, এখুনি করে দেবো।

হাজী সাহেব প্রথমে কোরাণ শরীফের কয়েকটা বয়েৎ আবৃত্তি করলো। তারপর জীনের হাওদায় ঝুলানো একটা থলে থেকে একগাছি রেশমী সুতা বের করে বললো, শোন ও উমরের পো যুদর, এই রেশমী রশিটা দিয়ে তুমি আমার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধো। তারপর ঐ সাগরের পানিতে আমাকে ফেলে দাও। যদি প্রথমে আমার হাত ভেসে ওঠে, আমাকে তুমি জাল ফেলে

ওপরে তুলে আনবে। আর যদি দেখ, আমার পা দুখানা জলের ওপরে ভেসে উঠেছে বুঝবে, আমি মারা গেছি। তখন তুমি আমার এই থলেটা আর খচ্চরটা নিয়ে বাজারে যাবে। সেখানে ইহুদী সামাইয়াহর কাছে খচ্চরটাকে একশো দিনারে বেচে দেবে। খুব গোপন রাখবে এসব কথা। কাউকে বলবে না কিন্তু।

এই সময় ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো আটষট্টিতম রজনী

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

মুরের সেই কথামতো যুদর সুতোটা দিয়ে তাকে পিছমোড়া দিয়ে হাত দুখানাকে শক্ত করে বাঁধে। তারপর কাঁধে তুলে হ্রদের জলে ফেলে দেয় তাকে।

কিছুক্ষণ পরে দুখানা পা ভেসে ওঠে জলের ওপর। যুদর বুঝলো হাজী সাহেবের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। যুদর আর অপেক্ষা না করে খচ্চরের পিঠে চেপে বসে।

বাজারে ঢুকে সেই ইহুদী সামাইয়াহকে খুঁজে বের করে সে। লোকটা জ্বল-জ্বল করে খচ্চরটার দিকে তাকায়।

—হুম, তা হলে খতমই হয়ে গেল—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

ইহুদী সওদাগর যুদরকে খচ্চরের মূল্য বাবদ একশো দিনার দিয়ে বললো, ব্যাপারটা গোপন রেখ, কাউকে বলো না যেন।

যুদর সব আগে রুটিওলার কাছে ছুটে আসে। একটা গোটা দিনার তার হাতে দিয়ে বলে, এই নিন আপনার ধারটা কেটে নিন। আর যা থাকে আমাকে রুটি দিন।

দোকানী হিসেবপত্র করে বললো, আরও দুদিন রুটি দিলে তবে দিনারটা পুরো হবে।

এরপর যুদর কসাই ও সব্জীওলার কাছে গিয়ে তাদের দেনা পরিশোধ করে মাংস আর কাঁচা তরকারী সংগে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই যুদরের কানে এল তার দুই ভাই খাবারের জন্যে মাকে নানারকম কটু কথা শোনাচ্ছে। ছোট ভাই-এর হাতে খাবার-দাবার দেখে তারা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল রুটির ঠোঙাটা।

পরদিন আবার জাল কাঁধে করে যুদর কারুণ হ্রদে যায়। জলে জাল ফেলতে যাবে, এমন সময় আর এক মুর একটা খচ্চরে চেপে তার সামনে এসে হাজির হয়।

—হ্যাঁ গো, উমরের পো যুদর, গতকাল কী এই সময় এখানে আমার মতো আর একজন মুর এসেছিল? জান কিছু তুমি?

যুদর ভাবলো, লোকটা তার কাছ থেকে ধোঁকা দিয়ে কথা বের করে নিতে চায়। কিন্তু মুর সাহেব তাকে বারণ করে গেছে—কাউকে কিছু বলবে না।

—জী না, কই কেউ আসেনি তো—

—কেন মিথ্যে বলছো, উমরের পো যুদ্দর। আমি জানি, সে কাল এখানে এসেছিল। সে তো আমার বড় ভাই। তার কথা মতো তুমি তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে এই দরিয়ায় ফেলে দিলে। তারপর পা দুটো ভেসে উঠলে তার কথামতো খচ্চরটাকে বাজারের ইহুদী সওদাগর সামাইয়াহর কাছে একশো দিনারে বেচে দিয়ে চলে গেছ তুমি। আমার কাছে লুকাচ্ছো কেন? আমি সবই জানি।

—তা এতই যদি জানেন, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

মুরটা বলে, না, মানে—আমি তোমার কাছ থেকে এই কাজটুকুই চাই। আমার বড় ভাই-এর মতো আমাকেও বেঁধে তুমি পানিতে ফেলে দাও। যদি আমার পা ভেসে ওঠে, আমার খচ্চরটা নিয়ে গিয়ে ইহুদীটার কাছে একশো দিনারে বেচে তুমি বকশিশ নিও।

যুদ্দর মুর-এর হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে হ্রদের জলে ফেলে দিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকলো। একটুক্ষণের মধ্যেই দুখানা পা উঠলো জলের ওপর।

—ইয়া আল্লাহ, লোকটা খতম হয়ে গেল। বা, বেশ মজা তো! নিত্যি যদি এমনি একটা মক্কেল জোটে মন্দ হয় না।

ইহুদী সওদাগরটা আবার যুদ্দরকে খচ্চরে চেপে আসতে দেখে আফসোস করে ওঠে, আর একটাও গেল! লোভ যে মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়—

কথা আর শেষ করে না, ঝকঝকে একশোটা স্বর্ণমুদ্রা গুনে যুদ্দরের হাতে দেয় সে।

যুদ্দর পুরো টাকাটা এনে মা-এর হাতে তুলে দেয়। মা বুঝতে পারে না, এত সোনা তার ধীবর ছেলে পেল কোথায়? ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে খোকা, এসব পেলি কোথায়? আমার ডর লাগছে, বাবা।

যুদ্দর বলে, ভয়ের কোনও ব্যাপার নাই, মা। তোমার ছেলে যুদ্দর কাউকে ঠকিয়ে একটা পয়সা ঘরে আনবে না।

এরপর সব ব্যাপারটা খুলে বললো সে মা-এর কাছে। মা শঙ্কিত হয়ে বলে, কী জানি, আমার বুক কাঁপছে, বাবা। কাল থেকে আর ঐ কারুণ সায়রে তোমার যাওয়ার দরকার নাই। এই মুর জাতটাকে আমার বড় ভয়।

—কিন্তু মা, যুদ্দর বলে, ওদের কথামতোই আমি ওদের জলে ফেলে দিয়েছি। আমার দোষটা কোথায়? এমন একটা লাভের কারবার কেউ সাধ করে বন্ধ করে? ফি দিনে যেখানে নগদ একশোটা সোনার মোহর রোজগার হচ্ছে, সেই কাজ তুমি আমাকে বন্ধ করতে বলছো, মা? যাই-ই বল, আমি কিন্তু রোজই কারুণ সায়রে যাবো। এমন আশা কেউ ছাড়তে পারে?

পরদিন যথাসময়ে কারুণের তীরে গিয়ে বসে। সেদিনও আর এক মুর এসে হাজির হয়। দারুণ জমকালো তার সাজ-পোশাক, বাহারী জীন লাগামে সাজিয়েছে খচ্চরটাকে। যুদ্দর অবাক হয়ে দেখলো, জীনের দুপাশে দুটো

কাঁচের কলসী ঝুলছে। লোকটা কাছে এসে সেই একই ভাবে শুভেচ্ছা জানায়।

—হ্যাঁ গো উমরের পো যুদর, কেমন আছো ?

—এই, কেটে যাচ্ছে, আর কী।

যুদর অবাক হয়, এই লোকগুলোর সকলেই তার নাম ধাম জানলো কী করে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো উনসত্তরতম রজনী

আবার সে বলতে থাকে ঃ

—এর আগে আর কোনও মুর এসেছিল এখানে ? আগন্তুক প্রশ্ন করে।

যুদর বলে, দুজন।

—কোথায় গেল তারা ?

যুদর বলে, আমি তাদের বেঁধে এই সায়রের জলে ফেলে দিয়েছি। তারা দুজনেই অক্কা পেয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও এক পথের পথিক। তাহলে আর দেরি কেন, আসুন।

বৃদ্ধ মুর হাসে, অবোধ বেচারা, তুমি কি জানো না, প্রত্যেক মানুষেরই ভাগ্যলিপি আগে থেকে লেখা থাকে তার কপালে ?

এই বলে সে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে একগাছি রেশমী সুতো তুলে দেয় যুদরের হাতে। বলে, চটপট কাজ হাসিল কর, আমার আর তর সইছে না।

যুদর বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, হাত আমার রপ্ত হয়ে গেছে। এক্ষুণি আপনাকে আচ্ছা করে কষে বেঁধে ডুবিয়ে দিচ্ছি—যাতে আর আপনি জিন্দা ভেসে উঠতে না পারেন।

মুর বলে, সাবাস, এই না হলে তুমি উমরের সন্তান যুদর।

যুদর ওকে খুব মজবুত করে বেঁধে সায়রের জলে ফেলে দেয়। অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, কখন পা দুখানা ভেসে উঠবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, পা-এর বদলে ভেসে উঠলো দুখানা হাত। লোকটা খাবি খেতে খেতে চিৎকার করতে থাকলো, জলদি জাল ফেলে আমাকে টেনে তোল। না হলে, আমি সাঁতার জানি না, মরে যাবো।

যুদর ক্ষিপ্রহাতে জালখানা বৃত্তাকারে ছড়িয়ে তার মাথার ওপরে ফেললো। কিছুক্ষণের মধ্যে টেনে তুললো তাকে সাগরের তীরে এবং অবাক হয়ে সে দেখলো, লোকটার দুহাতে দুটো প্রবাল বর্ণের রঙিন মাছ। বৃদ্ধ মাছ দুটো শক্ত মুঠিতে ধরে উঠে দাঁড়ালো। খচ্চরের জিনে ঝোলানো সেই কাঁচের কলসী দুটোতে মাছ দুটো পুরে যুদরকে সে জড়িয়ে ধরে এন্তার চুম খেয়ে আদর করতে থাকলো।

—আজ তোমার জন্যেই আমি জানে বেঁচেছি। তুমি সাহায্য না করলে এ মাছ আমি কিছুতেই ধরতে পারতাম না, যুদর।

যুদর বললো, সত্যিই যদি আমি আপনার কোনও কাজে লেগেছি মনে করেন তবে মেহেরবানী করে এই হেঁয়ালীটা আমাকে একটু খুলে বলুন। সে-ই আমার ইনাম পাওয়া হবে।

বৃদ্ধ বলতে থাকে ঃ তোমার ধারণা ঠিকই। গত দুদিন যে দুজন এই সায়রে প্রাণ হারিয়েছে, ওরা দুজনই আমার বড় ভাই। প্রথম জনের নাম আবদ অল সামাদ। আর ঐ বাজারের যে ইহুদী সওদাগর সেজে তোমার কাছ থেকে একশো দিনার দিয়ে খচ্চরটা কিনেছে—ও আমার চতুর্থ ভাই, সাচ্চা মুসলমান। ওর আসল নাম আবদ্ অল রহিম। আমাদের বাবা, আবদ অল ওয়াদুদ, একজন ক্ষমতাবান যাদুকর ছিলেন। নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। তিনিই আমাদের চার ভাইকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। এছাড়াও আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক মন্তরতন্তর এবং গুপ্তধন আবিষ্কারের সূত্র পাঠ করতে শিখেছিলাম। এই সব অলৌকিক বিদ্যা এমনভাবেই আমরা রপ্ত করতে পেরেছিলাম যে, জিন মারিদ এবং আফ্রিদিরাও আমাদের ইশারায় উঠ বোস করে।

পরিণত বয়সে বাবা একদিন দেহ রাখলেন। তিনি যে বিশাল বিষয় সম্পত্তি এবং অমূল্য ধনরত্ন রেখে গিয়েছিলেন তা এক কথায় অপরিমেয়। আমরা বলতে পারবো না—টাকার অঙ্কে তা কত হতে পারে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, বাবার একখানা হাতে লেখা কিতাব ছিল। সেই ভীষণ ভারি কিতাবখানা একদিকে আর অন্যদিকে সমান ওজনের হীরে চাপালে সেই হীরের যা দাম হবে তাতে ঐ কিতাবের দামের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হতে পারে। তবেই বোঝ, ব্যাপারখানা কী!

এ হেন সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কলহ-কজিয়া বাধাই স্বাভাবিক। আমরা চার ভাই তাঁর রেখে যাওয়া ধন-রত্নাদি, আপোষে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করে নিতে পারলাম। কিন্তু মুশকিল হলো বাবার মহামূল্য কিতাব-গুলোর স্বত্ব নিয়ে। কে কোন্‌খানা নেবে, সেই নিয়ে ঝগড়া বিবাদ বাধলো। আগেই বলেছি, বাবার সবচেয়ে মূল্যবান কিতাবখানা—'এল্ড' নিয়ে বিবাদ চরমে উঠলো। কেউ ছাড়তে চায় না কারো অধিকার।

এমন সময় একদিন আমাদের বাড়ীতে এলেন আমার ওস্তাদ এক সদাশয় বৃদ্ধ। এঁর কাছ থেকেই বাবা সবকিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই পীর-সদৃশ বৃদ্ধের নাম অল-কাহিন অল-অবতান। তিনি সেই মহামূল্য কিতাব 'এল্ড' হাতে নিয়ে আমাদের উদ্দেশ করে বাণী দিলেন ঃ বৎস, তোমরা আমার প্রাণাধিক পুত্রসম শিষ্যের আদরের দুলাল। বিশেষ কারো প্রতি পক্ষপাত দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি ফরমান দিচ্ছি—যে অল শমরদলের গুপ্তধন আবিষ্কার করে তার সেই অলৌকিক গোলক, কাজললতা, তলোয়ার এবং সেই মোহর আঁকা আংটিটা নিয়ে আসতে পারবে সে-ই এই কিতাবের মালিক হওয়ার যোগ্য হতে পারবে। এই সব জিনিসগুলোর অলৌকিক যাদু ক্ষমতা আছে। সেই আংটিটা রক্ষা করছে আর এক জিন।

তার নাম বজ্রদানব। এই আংটি যদি কেউ ধারণ করতে পারে তবে সে সলতানিয়তের সুলতান না হয়েও দণ্ড-মুণ্ডে বিধাতার ক্ষমতা অর্জন করবে। সুলতানের সব ক্ষমতাই সে করায়ত্ত করতে পারবে। তার হুকুম তামাম দুনিয়া তামিল করবে। আর ঐ তলোয়ার যার হাতে থাকে সে আর কাকে ডরায়? এক বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ঐ একখানা তলোয়ারে সে কেটে কুচি কুচি করে দিতে পারবে। আর ঐ গোলকটা থাকবে যার দখলে সে ঘরে বসে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে এক মুহূর্তে। যে দেশের যে জায়গা দেখার ইচ্ছা হবে গোলকের সেই বিন্দুতে আঙ্গুল রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোলকটা বনবন করে ঘুরতে থাকবে এবং তখুনি তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেই দেশের গ্রামগঞ্জ পথঘাট নদী-নালা গাছ-পালা পশুপক্ষী মানুষ জন, সব। যদি এই গোলকাধিপতি পৃথিবীর কোন দেশ পর্যবেক্ষণ করতে করতে বুঝতে পারেন, কোথাও ঘোর অন্যায় অবিচার এবং পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে তখন তিনি সূর্যের রশ্মি আকর্ষণ করে সেই দেশকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারেন। আর ঐ কাজললতার কাজল যদি কেউ চোখে লাগান তবে পৃথিবীর তাবৎ লুকানো গুপ্ত ধনাগার তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। এই কিতাব 'এলড' যদি পেতে চাও তোমরা, তবে এই পরম আশ্চর্য ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করে এই জিনিসগুলো বের করে আনতে হবে। এখন দেখ চেষ্টা করে—কে আনতে পারো।

তখন আমরা চার ভাই-ই সমস্বরে বললাম, আমরা আপনার শর্তে রাজি আছি, পীর সাহেব। কিন্তু আমরা তো কেউই শমরদলের সেই অতুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সত্তরতম রজনী

আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

তখন সেই জ্ঞান-বৃদ্ধ পীর কাহিন বললেনঃ

সুলতান লাল শাহর দুই পুত্রের অধিকারে আছে এই শমরদল। তাদের দুজনকে পরাজিত না করতে পারলে সেই ঐশ্বর্য ভাণ্ডার অধিকার করা সম্ভব নয়। তোমাদের পিতা অনেক চেষ্টা করেছিল সুলতানের পুত্র দুটিকে কব্জায় আনার। শঙ্কিত হয়ে কিন্তু পূর্বাহ্ণেই সংবাদ পেয়ে ও আত্মরক্ষার জন্য তারা কারুণ সায়রে ঝাঁপ দিয়ে প্রবাল মাছের রূপ ধরে আত্মগোপন করে রইলো। তোমার পিতা আর ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইলো না। তখন আমি গুনে পড়ে দেখলাম, এই অবস্থায় শমরদলের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার তখন আর আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। বেশ কিছুকাল পরে কাইরোর যুদর নামে এক যুবকের সাহায্যেই শুধু এই সম্পদ উদ্ধার হতে পারবে। এই যুদর সওদাগর উমরের পুত্র। জাত-ব্যবসা তার মাছ ধরা নয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে এই

ব্যবসায়ই গ্রহণ করতে হবে এবং নিরুপায় হয়ে একদিন তাকে আসতেও হবে এই কারুণের উপকূলে। কবে সে আসবে তার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে হবে। তার আগমনেই শুধু ঐ সায়রের পানি যাদুমুক্ত হবে। যুদরকে দিয়ে হাত বাঁধিয়ে তাকে দিয়েই সায়রের মধ্যে নিক্ষেপ করাতে হবে নিজের দেহটাকে। পানির তলায় যাওয়া মাত্র তার বন্ধন মুক্ত হবে। সে তখন সন্ধান করে বেড়াবে শুধুমাত্র দুটি প্রবাল মাছ—সেই সুলতানের দুই পুত্রকে। যদি তার বরাত ভালো হয়, যদি সে ধরতে পারে তাদের, তবেই তার হাত দুখানা ভেসে উঠবে উপরে। তখন ঐ উমর-সন্তান যুদর জাল ফেলে তাকে কূলে তুলে আনবে। আর যে তা পারবে না, অর্থাৎ সেই প্রবাল মাছ দুটো ধরতে পারবে না, তার আর বাঁচবার কোন আশা থাকবে না। কারুণের পানিতে তার সলিল সমাধি ঘটবে। মরার পর তার পা দুখানা ভেসে উঠবে শুধু।

আমরা বড় তিনজন বললাম, ঠিক আছে মরতেও আমরা রাজি আছি। আমরা যাবো সেই কারুণ সায়রে। দেখবো, সেই প্রবাল মৎস্যরূপী শাহজাদাদের পারি কিনা ধরতে? যায় যাবে প্রাণ, যাক। মরতে তো একদিন হবেই।

কিন্তু আমাদের ছোটভাই, আবদ অল রহিম এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে রাজি হলো না এবং শুধু এই কারণেই আমরা তাকে ইহুদী সওদাগর বলে ক্ষ্যাপাতে লাগলাম। সেই থেকে লোকে জানে, সে ইহুদী সওদাগর। কিন্তু আসলে তার মতো সাচ্চা মুসলমান পাওয়া ভার।

আমাদের ওয়াদা ছিল, যদি কেউ কারুণের পানিতে প্রাণ হারায় তবে তার খচ্চর আর থলেটা যুদর নিয়ে যাবে ছোট ভাই-এর কাছে। সে তাকে প্রতিবারে একশো দিনার ইনাম দিয়ে খচ্চর আর থলেটা কিনে নেবে। এবং সংগে সংগে বুঝতে পারবে, তার কোন্ কোন্ ভাই-এর ইন্তেকাল হলো।

তুমি তো জানো যুদর, এর আগে আমার দুই ভাই-এর বরাতে কী জুটেছে। এই মাছ দুটো ধরতে গিয়ে তারা জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছে এখানে। একমাত্র আমিই আজ তোমার সহায়তায় এই শাহজাদাদের কব্জাগত করতে পেরেছি। আমিও এদের সংগে লড়াই-এ প্রায় কাবু হয়ে পড়েছিলাম। নেহাত বরাত ভালো, তাই ওদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেলতে পেরেছি। এই দুই শাহজাদা অনন্ত শক্তির অধিকারী দুই আফ্রিদি দৈত্য। আজ তাদের আমি এই কাঁচের কলসীতে পুরে ফেলেছি। আজ এদের ধরার ফলে সেই শমরদলের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আবিষ্কারের প্রথম পর্বটি আমার সমাধা হলো মাত্র। সেই পীর কাহিনের ঠিকুজীর নির্দেশ অনুসারে তোমার উপস্থিতি একান্তভাবে দরকার। তুমি কী আমার সংগে সেই ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের লক্ষ্যস্থান মারঘ্রিবে যেতে পারবে? ফেজ এবং মিকনাস থেকে জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়। সংগে থাকলে আমি সহজেই সেই পথ খুঁজে পাবো। এর জন্য যা চাও তুমি, আমাকে দেবো এবং সারা জীবন আমি তোমার দোস্ত হয়ে থাকবো। অভিযান শেষ হলে আবার তুমি তোমার ঘরে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

যুদর বললো, শুনুন সাহেব, আমি প্রথমে আমার মা এবং ভাইদের কাছে

বলবো সব। তারা যদি অমত না করে, আপনার সঙ্গে যেতে আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তাদের কথা অমান্য করে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, আমি সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ, আমি তাদের ফেলে চলে গেলে খাবে কী তারা?

মনুর বললো, এ তোমার কুড়েমির কথা। টাকা পয়সাই যদি সমস্যা হয়, তা আমি এক হাজার দিনার দিচ্ছি তোমাকে। যাও, দিয়ে এসে তাদের। আমাদের ফিরতে মাস চারেক সময় লাগবে। এক হাজার দিনারে চার মাস চালাতে পারবে না তারা?

মনুর-এর প্রস্তাব শুনে যুদর হাঁ হয়ে যায়। লোকটা বলে কী? এক হা—জা—র দিনার দেবে সে? বলে, তা হলে টাকাটা দিন, আমি আমার মা-এর হাতে দিয়ে চার মাসের ছুটি নিয়ে চলে আসি। টাকা পেলে তারা কেউ আমাকে আটকাবে না।

মনুর তাকে এক সহস্র মুদ্রা দিল।

যুদর দিনারের থলেটা মা-এর হাতে তুলে দিয়ে বললো, মা, এতে এক হাজার দিনার আছে। সংসার খরচের টাকা। আমি মারঘ্রিবের এক অধিবাসীর সঙ্গে চার মাসের জন্য এক অভিযানে বেরুচ্ছি। এই খরচাপাতি রইলো, কোনও চিন্তা ভাবনা করো না। আমি আবার যথাসময়ে ফিরে আসবো।

মা কেঁদে আকুল হলো, সে কি কথা বাবা। এমন দূরদেশে গেলে কেউ ফিরে আসতে পারে?

—কোনও ভয় নেই মা। যার সঙ্গে যাচ্ছি, সব পথঘাট তার ভালো করে চেনা। কিচ্ছু ভেবো না, তোমার ছেলে আবার তোমার কোলে ফিরে আসবে।

মা বললো, যা ভালো বুঝিস বাবা, কর। আমি আর কী বলবো? তবে বিদেশ বিভুঁই, একটু দেখে শুনে থাকিস। আল্লাহ মেহেরবান, তোর ভালো করবেন তিনি।

যুদর ফিরে আসতে মনুর জিজ্ঞেস করে, কী, মায়ের মত পেলে?

—পেয়েছি। মা আমাকে দোয়া করেছে, আমাদের কোনও বিপদ হবে না।

আর কালবিলম্ব না করে মনুর খচ্চরে চেপে তার পিছনে বসিয়ে নিল যুদরকে। তারপর সেই খাড়া দুপুর থেকে শুরু করে সূর্য পাটে বসা অবধি আকাশ পথে উড়ে চলতে থাকলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো একাত্তরতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

বায়ুবেগে চলতে চলতে যুদর ক্ষুধার্ত বোধ করে। কিন্তু ভেবে আতঙ্কিত হয়, তাদের সঙ্গে খাদ্যবস্তু বলতে কিছুই নাই। মনুরকে বলে, আমার মনে হয়, সঙ্গে খাবার দাবার আনতে আপনি ভুলে গেছেন, জনাব!

মুর বলে, কেন, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি ?

—তা পেয়েছে।

—কী খাবে বল ?

—কী আর বলবো, থলেয় তো দেখছি খানাপিনা কিছুই নাই !

—আরে, কী খাবে তাই বল না ? খিদে যখন পেয়েছে, খেতে তো হবে !

—যা হোক কিছু একটা হলেই হতো—

—তবু বল না, রসনা কী চাইছে ?

যুদের বলে, একটু রুটি আর পানি হলেই চলে।

বৃদ্ধ মুর হাসে, সে তো নেহাতই সাদা-মাঠা—শুধু পেট ভরাবার জন্যে দরকার হয়। ও সব নয়, তোমার সব চাইতে কী খেতে ভাল লাগে, তাই বল।

যুদের বললো, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে, এখন যা পাওয়া যাবে তাই অমৃত মনে হবে।

বৃদ্ধ বললো, তন্দুরী মুরগী চলবে ?

যুদের চোখ বড় বড় করে, চলবে মানে ? তার চাইতে আর কী ভালো হতে পারে ?

—কেন, মধুর বিরিয়ানী সঙ্গে হলে ভালো হয় না ?

—চমৎকার হয়।

—আর যদি পাখীর মগজ এবং বিলাতী বেগুনের টক-ঝাল পাও ?

—তোফা—!

—তুমি কী ধনেপাতা আর শালুক ডাঁটা দিয়ে সূর্যমুখী ফুলের শুখা চচ্চড়ি খেতে ভালবাসো ?

—খুব !

—ভেড়ার মগজের ঝাল ?

—জিভে পানি আসছে, জনাব।

—বার্লির পকোড়া ? আঙ্গুরপাতা ভাজা ? পিঠে-পুলি ইত্যাদি নানা রকম মেঠাই মণ্ডা ?

—হেই বাপ ! এতসব খাবার এক সঙ্গে ?

বৃদ্ধ বলে, হ্যাঁ এক সঙ্গেই দেবো। আরও কিছু চাও ?

যুদের ভাবে, লোকটা বদ্ধ পাগল ! তা না হলে এই পরবাসে এসে এইসব খানাপিনার কথা তোলে কেউ ? না আছে হাঁড়ি-পাতিল, না আছে রসুই-এর সাজসরঞ্জাম, অথচ আহার্য বস্তুর ফিরিস্তি শোনাচ্ছে হাজারো কিসিমের। সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কখনও এইসব আজগুবি কথাবার্তা বলতে পারে ? যুদের বলে, এই খিদের সময় আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন, সাহেব ? আপনার খানাপিনার ফর্দ শুনে আমার জিভে জল এসে গেছে। যা বললেন, তার একটা খাবারও কী আপনি এখানে যোগাড় করতে পারবেন ?

বৃদ্ধ বলে, আমি তো তাই চাইছিলাম, যুদের। ভালো ভালো খানাপিনার ছবি চোখের সামনে ভেসে না উঠলে ক্ষুধার উদ্রেক হবে কেন ? তা এখন

মনে হচ্ছে খিদেটা বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে, কেমন ? আচ্ছা এই ধর, থলেটা। হাত ঢুকিয়ে একএক করে বের কর সব থালাগুলো। যা যা খেতে চেয়েছিলে, দেখবে, এক একখানা থালায় ভর্তি করে সাজানো আছে সব। খাবারগুলো আগে বের কর। তারপর রসিয়ে রসিয়ে খাওয়া যাবে 'খন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় যুদর থলে থেকে খাবারের থালাগুলো এক এক করে বের করে। সব হাতে-গরম! খুসবুতে মদির হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস।

—নাও, শুরু কর।

যুদর চিৎকার দিয়ে ওঠে, এ সব কী, জনাব ? আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে না জানিয়ে এগুলো আগে থেকেই বানিয়ে এনেছিলেন ?

বৃদ্ধ বলে, না গো উমরের পো যুদর, না। আসলে এই থলেটাই অলৌকিক যাদুমন্ত্রপূত। এ সবই তার কল্যাণে। এই যে খানাপিনা যা বের করেছ, এক আফ্রিদি আমার হুকুম তামিল করে এনে দিয়েছে। এ তো সামান্য, তুমি যদি দুনিয়ার নানান দেশের হাজারো জাতের খানাপিনার ফরমাইশ করতে, তাও নিমেষে এনে দিত সে। এখনি যদি বল হাজার রকমের সিরিয়ার, হাজার রকমের মিশরের, হাজার রকমের হিন্দুস্তানের এবং হাজার রকমের চীনা খাবার তুমি খেতে চাও, এক পলকে সব সে এনে হাজির করে দেবে এখানে।

দুজনে মিলে বেশ তৃপ্তি করে, পেট পুরে আহার করলো। কিন্তু অত সব খাবার দুজনে নিঃশেষ করবে কী করে ? যতটা পারলো খেল, বাকীটা ফেলে দিয়ে সোনার থালাগুলো থলেটার মধ্যে ভরে রাখলো বৃদ্ধ। তারপর থলেটার আর একদিক থেকে একটা জল ভর্তি সোনার বদনা বের করে আকণ্ঠ পান করলো। তারপর হাত মুখ ধুয়ে বদনাটাকে থলেয় ভরে আবার তারা খচ্চরটার পিঠে চেপে বসে, আকাশ-পথে বায়ুবেগে ছুটে চলতে থাকলো।

বৃদ্ধ এক সময় জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা—বলতে পার যুদর, কাইরো থেকে আমরা কত দূরে এসে পড়েছি ?

যুদর বলে, খোদা জানেন, আমি বলতে পারবো না।

—এই দু ঘণ্টায়, বৃদ্ধ মুর বলে, আমরা প্রায় এক মাসের পথ পার হয়ে এসেছি। একমাত্র আফ্রিদি জিন ছাড়া এই বেগে আর কেউই চলতে পারে না। এইভাবে পুরো একটা দিন আমরা চলতে থাকলে এক বছরের যাত্রাপথ অতিক্রম করবো।

দিনের পর দিন ওরা আকাশ-পথে উড়ে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে খানা-পিনার জন্য বিরতি দিতে হয়। যুদরের রসনা মতো নানা উপাচারের আহার্য পাওয়া যেতে থাকে সেই আশ্চর্য থলেয়। এইভাবে পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি চলার পর মারাঘিবে এসে পৌঁছয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেজ আর মিকনাস শহরে অবতরণ করে ওরা।

শহরের পথে চলতে চলতে যুদর বুঝতে পারে, বৃদ্ধ মুরকে সেখানকার অনেকেই চেনে। জনে জনে কাছে এসে মুরকে কুশল অভিনন্দন জানাতে থাকে। অবশেষে এক সময়ে ওরা এক বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে থামে।

দরজায় কড়া নাড়তে খুলে যায়। হরিণ-নয়না পরমাসুন্দরী এক তরুণী হাসি-ভরা মুখে এসে দরজা ধরে দাঁড়ায়। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলে, কী আমার সৌভাগ্য, আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

—রহমা মা,—বৃদ্ধ সস্নেহে বলে, বড় ঘরখানা খুলে দাও, আমাদের জন্যে।

রহমা তাড়াতাড়ি মাঝের বড় ঘরখানা খোলার জন্য ছুটে যায়। তার ভারি নিতম্বের উথাল-পাথাল যুদরের বুকে চাঞ্চল্য জাগায়। ভাবে, এ মেয়ে তো যে সে মেয়ে নয়, নিশ্চয়ই কোনও শাহজাদী-টাহজাদী হবে।

থলেটা নামিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ খচ্চরটাকে বললো, এখন তুমি যাও। আবার যখন ডাকবো, এসো।

সঙ্গে সঙ্গে ধরণী দ্বিধা হয়ে গেল এবং খচ্চরটা মাটির নিচে চলে যেতে আবার জোড়া লেগে গেল মাটির ফাটল। যুদর হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—এ কী তাজ্জব কাণ্ড!

বৃদ্ধ বলে অবাক হওয়ার কিছু নাই, যুদর। তোমাকে তো আগেই বলেছি সে আসলে কোনও খচ্চর নয়—জিনিয়াহ্ দানবী।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো বাহাত্তরতম রজনী

আবার সে বলতে থাকে ঃ

বৃদ্ধের সঙ্গে যুদর এসে বসে একটা প্রকাণ্ড কামরায়। সারা ঘরটা মূল্যবান জিনিসপত্রে সাজানো গোছানো। চোখ ঝলসে যায়।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে যুদরের হাতে একটা মোড়ক তুলে দেয়। বলে, এতে সাজ-পোশাক আছে। আপনার ঐ পোশাক ছেড়ে এটা পরে নিন।

যুদর অবাক হয়ে যায়। অন্তত পক্ষে হাজার দিনার দাম হবে সেই সাজ-পোশাকের। যুদর যখন পরে দাঁড়ালো, মনে হতে লাগলো, না জানি কোন্ দেশের সে বাদশাহজাদা।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ মুর তার অলৌকিক থলে থেকে এক এক করে অনেক রকম খাবারের থালা বের করে টেবিলে সাজিয়েছে।

—আর দেরি নয় যুদর, এস, খাবে এস। অবশ্য জানি না এসব খানা তোমার মুখে রুচবে কিনা। আমার নিজের ইচ্ছেমতো এগুলো আনিয়েছি। তোমার যদি ভালো না লাগে বল, আবার ফরমাইশ মতো আনিয়ে দিচ্ছি।

যুদর বলে, এ আপনি কী বলছেন, জনাব। আমার মুখে সব খানাই ভাল লাগে। আপনার পছন্দ আমারও পছন্দ। চিরকালই আমি পেটুক মানুষ। খাবার দেখলেই লোভ হয়। ভালমন্দ বাছ-বিচার করতে জানি না। সব খাবারই আমার দারুণ ভাল লাগে। যা পাই পরিতৃপ্ত করে খাই।

কুড়িটা দিন বৃদ্ধের আদর আপ্যায়নে কাটালো যুদর। প্রতিদিন এ-বেলা ও-বেলা সে নতুন নতুন পোশাক বদলায়। আর খানাপিনা—তার তো তুলনাই

নাই। যা প্রাণ চায়, তাই সে খায়। শুধু একবার মুখ ফুটে উচ্চারণ করলেই হলো।

একুশ দিনের দিন সকালে বৃদ্ধ এল তার কাছে। তখন যুদর অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। সে ডাকে, এই যে উমরের পো, যুদর, ওঠ, ওঠ। চল এবার আমাদের কাজে নামতে হবে। আজই শমরদলের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের পথ খুঁজে পাওয়ার উপযুক্ত দিন।

দুজনে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে শহরের সীমানা প্রাচীরের পিছনে এসে দাঁড়ালো। যুদর দেখলো, দুটি খচ্চর এবং দুজন নিগ্রো ক্রীতদাস এসে হাজির হলো সেখানে। দুজনে খচ্চর দুটোয় চেপে বসতে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকলো জানোয়ার দুটো। আর পিছনে পিছনে আসতে থাকলো সেই নিগ্রো-নফররা।

ঠিক দুপুরে এসে পৌঁছলো একটা নদীর উপকূলে। খচ্চর থেকে নামলো ওরা। বৃদ্ধ ইশারা করতে নিগ্রো দুটো জানোয়ার দুটোকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিল। এবং একটু পরেই আবার ফিরে এল তাঁবু খাটানোর সাজসরঞ্জাম কাঁধে নিয়ে। চটপট একটা সুন্দর তাঁবু খাঁটিয়ে ফেললো। তাঁবুর ভিতরে গালিচা বিছিয়ে আসন পেতে দিল। আর এক পাশে বসিয়ে দিল সেই কাঁচের কলসী দুটো। প্রবাল বর্ণের মাছ দুটো তার মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। এরপর নিগ্রো দুটো অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল।

খানাপিনা শেষ হলে বৃদ্ধ মুর কাঁচের কলসী দুটোকে একটা ছোট টুলের উপরে স্থাপন করে অস্ফুট মন্ত্র আওড়াতে থাকলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলসীর মাছ দুটো ছটফট করে কঁকিয়ে উঠলো, আমরা এখানে আছি, যাদু-সম্রাট। দোহাই আপনার, আমাদের হত্যা করবেন না। আমরা আপনার দাসানুদাস—ক্ষমাপ্রার্থী।

কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ থামালো না। একটুক্ষণের মধ্যেই খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল কলসী দুটো। আর সঙ্গে সঙ্গে মাছ দুটো দুই শাহজাদার রূপ ধরে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে পড়লো তার সামনে।

—আপনি সর্বশক্তিমান যাদুকর, আমাদের প্রাণে মারবেন না, এই ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।

বৃদ্ধ গর্জে উঠলো, চোপরাও, একটা কথা বলবে না। আমি তোমাদের টুঁটি টিপে মেরে ফেলে দেবো। আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবো একেবারে। হুম্—বাঁচতে পারো, রেহাই দিতে পারি, যদি শমরদলের পথ বাৎলে দাও। তা না হলে, ঐ যা বললাম—একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলে দেবো। জ্বলন্ত অঙ্গারে ফেলে ভস্ম করে দেবো।

শাহজাদা-দ্বয় ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

—আপনি নির্দয় হবেন না; প্রভু। আমরা আপনার সব কথাই শুনবো। আপনি যা জানতে চান, বলে দেবো। কিন্তু যাদুসম্রাট, আপনাকে পথ বলে দিলেও তো আপনি শমরদলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। একমাত্র

যুদর নামে এক জেলেই সেখানে যেতে পারবে। তা-ও যে-কোন যুদর হলে হবে না। কাইরোর সওদাগর উমরের পুত্র যুদর হওয়া চাই। তাকে নিয়ে না আসলে তো আপনি ঐ অলৌকিক ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবেন না।

বৃদ্ধ বলে, আমি তা জানি। আর জানি বলেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তোমাদের সামনের দিকে তাকাও। দেখ, উমরের পুত্র যুদর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শাহজাদা-দ্বয় যুদরকে দেখে প্রসন্ন মুখে বললো, তা হলে তো আপনি প্রায় বাজিমাৎ করেই ফেলেছেন! এবার আমাদের ওপর সদয় হোন, যাদুসম্রাট। আমাদের মুক্তি দিন।

বৃদ্ধ তাদের বললো, ঠিক আছে, যেতে পারো।

দুই ভাই তখন নদীর জলে তলিয়ে গেল।

একটি ধূপদানীর ভিতরে দুটি রক্তরাগমণি রেখে তার উপর কিছু কাঠকয়লা চাপিয়ে দিল বৃদ্ধ। তারপর জোরে জোরে ফুঁ দিতে থাকলো। একটুক্ষণের মধ্যেই কয়লাগুলো গনগনে আগুন হয়ে উঠলো। খানিকটা ধুনোর গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে যেতে লাগলো ওপরের দিকে। বৃদ্ধ বললো, যুদর শোন। ধূপের ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। এবার আমি সাধনায় বসবো। তার আগে তোমাকে যা বলার বলে নিতে চাই। কারণ আমার মন্ত্রসাধন সময়ে কোনও কথাবার্তা বলা চলবে না। কোনও কারণে যদি আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই, তোমাকে কী কী করতে হবে, সেই কথাগুলো আগেই শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি। মন দিয়ে শোন, কাজের সময় এক চুল এদিক ওদিক করা চলবে না। তাতে প্রাণ-সংশয় ঘটে যেতে পারে।

যুদর বলে, আমি প্রস্তুত, জনাব।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তিয়াত্তরতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

বৃদ্ধ বলতে থাকে : আমি যখন এই ধূপের ধোঁয়ায় মন্ত্রপাঠ করতে থাকবো তখন, ঐ নদীর পানি আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসতে থাকবে। এইভাবে, দেখবে, কিছুক্ষণের মধ্যে সারা নদীটা শুকিয়ে ধু-ধু করে চর হয়ে যাবে। তুমি তখন এই ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নিচে নেমে যাবে। নেমেই দেখতে পাবে, নদীর পাড়ের নিচে এক বিশাল সিংহ দরজা। ও রকম দরজা একমাত্র সুলতান বাদশাহদের প্রাসাদ ফটকেই দেখা যায়। সে যাক, ঐ বন্ধ দরজার পাল্লায় দেখবে ইয়া বড় বড় দুখানা সোনার বলয়ের মতো কড়া। তুমি তার একটা ধরে একবার নাড়বে। আওয়াজ উঠবে, কিন্তু কেউ খুলবে না। একটু পরে আর একবার নাড়া দেবে কড়াটায়। সেবারও কেউ সাড়া দেবে না। এরপর

আরও একবার নাড়বে কড়াটা। এইবার দরজাটা খুলে যাবে। ভয় পেয়ো না, তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে এক জল্লাদের মতো প্রহরী। হাতে ধরা খোলা তলোয়ার। হুঙ্কার ছেড়ে বলবে, 'কে তুমি ?' তুমি তখন নির্ভয়ে বলবে, 'আমি উমরের পুত্র যুদর।' সে বিকটভাবে মুখ ব্যাদন করে বলবে, তুমি যদি যথার্থই যুদর হও তবে গর্দান বাড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি তোমার ধড় মুণ্ড আলাদা করে ফেলবো।' যুদর, খুব সাবধান, প্রহরীর হুঙ্কারে একটুও ভয় করো না বা পালাবার কোনও চেষ্টা করো না, অথবা তাকে আক্রমণ করারও কোন পাঁচ কষতে যেও না। যেমনটি সে বলবে, তেমনি ভাবে সুবোধ বালকের মতো গর্দানটা বাড়িয়ে দেবে তার তলোয়ারের সামনে। লোকটা তোমার ঘাড় তাক করে কোপ বসাতে যাবে, ঠিকই। কিন্তু তার আগে সে নিজেই ধরাশায়ী হয়ে পড়ে যাবে তোমার পায়ের তলায়। তারপর দেখবে, সে অক্কা পেয়েছে। তোমার কোন চোট লাগেনি। কিন্তু তুমি যদি তাকে বাধা দিতে চেষ্টা কর সে তোমাকে নির্ঘাৎ কোতল করে ফেলবে।

এইভাবে প্রথম দরজার ফাঁড়া কাটাবার পর তুমি এগিয়ে যাবে দ্বিতীয় দরজার দিকে। সে দরজাও দেখবে, বন্ধ। যথারীতি কড়া নাড়লে দরজা খুলে দাঁড়াবে এক ঘোড়সওয়ার সেনাপতি। তার হাতে থাকবে একখানা বর্শা। সে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কে তুমি ?' তুমি বলবে, 'আমি কাইরোর সওদাগর উমরের পুত্র যুদর।' সে বলবে, ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, এই বর্শা তোমার বুকে বসাবো আমি। তুমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানে। এক চুল নড়বে না। লোকটা বর্শাখানা ছুঁড়ে তোমার কলিজা বিদ্ধ করতে উদ্যত হবে। কিন্তু পারবে না। তার আগে নিজেই সে পড়ে যাবে ঘোড়া থেকে, একেবারে তোমার পায়ের তলায়। তারপর দেখবে, সেও বেঁচে নাই। এরপর তুমি তৃতীয় দরজাব সামনে গিয়ে কড়া নাড়বে। দরজা খুলেই রুখে দাঁড়াবে এক তীরন্দাজ। হাতে তার উদ্যত তীর ধনুক। কোনও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সে তোমাকে তাক করে তীর ছুঁড়বে। কিন্তু পারবে না। নিজেই পড়ে যাবে তোমার পায়ের তলায়। দেখবে, তারও ইন্তেকাল হয়ে গেছে। একটা কথা মনে রাখবে, কোন-কিছুতেই ভয় পাবে না। পালাবার চেষ্টা করবে না বা বাধা দিতে যাবে না। তা যদি কর, তুমিই মরবে।

এরপর চতুর্থ দরজার কাছে গেলেই দেখবে এক ভয়ঙ্কর সিংহ গর্জন করছে। মনে হবে, তখুনি বুঝি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু না, সে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসবে তোমার সামনে। তুমি কিন্তু যেমনটি দাঁড়িয়েছিলে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার সামনে এসে সিংহটা প্রকাণ্ড হাঁ বাড়িয়ে তোমার মাথাটা মুখের মধ্যে পুরে ফেলতে চাইবে। তখন তুমি বুকে সাহস বেঁধে সিংহটার হাঁ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে তোমার ডান হাতখানা। দেখবে সে স্তব্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে যাবে তোমার পায়ের কাছে। তোমার গায়ে আঁচড়টি বসাতে পারবে না সে।

পঞ্চম দরজাটি খুলে দেবে দৈত্যের মতো আবলুস কালো এক নিগ্রো।

ভাটার মতো জ্বলতে থাকবে তার গোলাকৃতি চোখ দুটো। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে তোমাকে প্রশ্ন করবে, 'কে তুমি?' তুমি ওর ঐ হম্বি-তম্বিতে একটুও ভয় পেয়ো না। শান্তভাবে বলবে, 'আমি ধীবর যুদর। আমার বাবা কাইরোর সওদাগর ছিলেন, তার নাম উমর।' তখন নিগ্রোটা বলবে, 'তুমি যদি সত্যিই সেই যুদর হও তবে যাও ঐ ষষ্ঠ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

এই ষষ্ঠ দরজায় এসে বোধহয় তুমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। একমাত্র খোদাতালার নাম জপ করতে থাকবে। দরজাটা আরও অনেক বড়। পাল্লা খুলে যেতেই দেখবে, দুটি ড্রাগন বিকট হাঁ করে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। ঐ ভয়াল-ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে স্বভাবতঃই সংজ্ঞা হারাবার কথা। কিন্তু আল্লাহর দোয়াতে তোমার সে-রকম কিছু হবে না। ওরা দুটিতে দু-পাশ থেকে তোমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে। যেই তারা থাবা বাড়াবে তোমার দিকে; তুমি বুকে সাহস এনে দু'হাতে দুটির দুখানা পা চেপে ধরবে। ভাবছো শাল বট উপড়ে ফেলার শক্তি যাদের থাবায়, তাদের হাত ধরে কী ফায়দা হবে? হবে হবে, ওতেই কাজ হবে। কাজ তো এই মন্ত্রে হবে, তুমি তো উপলক্ষ্য মাত্র। যাই হোক, তোমার হাতের ছোঁয়া পাওয়ামাত্র তারা গগন-বিদারী আর্তনাদ করে তোমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়বে। আর উঠবে না। তুমি দেখবে, তোমার দেহে কোনও আঘাত লাগেনি।

এরপর আরও একটি দরজার গণ্ডী তোমাকে পেরুতে হবে। এটি সপ্তম এবং শেষ দরজা। এই বন্ধ দরজার সামনে এসে কড়া নাড়ালেই বেরিয়ে আসবে এক হাস্যময়ী মাতৃমূর্তি। পক্কিত কেশ, বয়সের ভারে নুব্জ হয়েছে দেহ। সে তোমাকে ছলনায় ভোলাবার বহুবিধ চেষ্টা করবে, 'সে কি রে বেটা, আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি যে তোর গর্ভধারিণী মা? আয় বাবা, আমার কাছে আয়। আমি যে চোখে ভালো দেখতে পাই না রে, আয় আমার কাছে আয়, কত কাল পরে এলি, একবার নয়ন ভরে দেখি!' তুমি কিন্তু তার কথায় ভুলে কাছে যেও না। তা হলে তোমার এ জন্মের সাধ সে ঘুচিয়ে দেবে। নিজেকে শক্ত করে কঠিন কণ্ঠে বলবে, 'দাঁড়াও, আর এক পা এদিকে এগোবে না। শোন, তোমার সাজ-পোশাক খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়াও আমার সামনে।' ডাইনিটা তখন তোমাকে বলবে, সে কী বাবা, আমি তোমার মা, আমাকে উলঙ্গ হতে বলছো তুমি? আমি তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি, বুকের দুধ খাইয়ে লালন করেছি। তারই কী এই পুরস্কার, বাবা? তুমি আমাকে বিবস্ত্রা হতে বলছো? ধরিত্রী যে রসাতলে যাবে—

'—তা যাক; তুমি ন্যাংটো হবে কি না আমি জানতে চাই। এই মুহূর্তে এক্ষুণি যদি না তোমার কাপড়-চোপড় খুলে ফেল আমি তোমাকে সংহার করবো।'

এই বলে পাশের দেওয়ালে ঝুলানো অসংখ্য তলোয়ারের একখানা খুলে হাতে নেবে তুমি। তখনও সে তোমার দুর্বল জায়গায় আঘাত করার চেষ্টা করবে, করুণা চাইবে। কিন্তু তুমি টলবে না। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে তাকে ভয়

দেখাতে থাকলে একটা একটা করে সে জামা-কাপড় খুলতে থাকবে। কিন্তু সবটা খুলবে না। আবার সে তোমার দয়া ভিক্ষা করবে। কিন্তু তুমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। কেটে টুকরো টুকরো করার হুমকী দেখাবে। এর পর সে নিরুপায় হয়ে এক এক করে শেষ পোশাকটিও পরিত্যাগ করবে। কিন্তু আশ্চর্য হবে, সেই ডাইনীটার দেহের কোনও অস্তিত্ব দেখতে পাবে না তুমি। পলকে সে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যাবে।

আর কোনও বাধা নাই। এবার তোমার সামনে ঐশ্বর্যের সমুদ্র। কত কী নেবে তুমি? কত কী নিতে পারো তুমি? এত ঐশ্বর্য কখনও দেখেনি কেহ। তাল তাল সোনা, তাল তাল রূপা। হীরে জহরতের স্তূপ চারপাশে। তুমি কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। সোজা চলে যাবে ভিতরের ঘরে। সে ঘরে এক সোনার মসনদে শুয়ে আছেন যাদুসম্রাট অল শমরদল। ঘুমে আচ্ছন্ন, তার মাথায় এক রত্নমুকুট। মুকুটের শীর্ষে একটি মাণিক জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সেই আলোতে আলোময় হয়ে আছে সারা ঘর। লোকে বলে, সাত সম্রাটের ধন এক মাণিক। সেই মাণিক আছে অল শমরদলের মাথার মুকুটে। এত বিরাট মাণিক্য আর দুটি নাই দুনিয়ায়। আসলে এই মাণিকটিই আশ্চর্য গোলক। শমরদলের কোমরে আছে সেই তোলোয়ার, আর এক হাতের আঙ্গুলে পরা আছে আংটিটা এবং গলায় তক্তি করে ঝোলানো আছে সেই কাজললতাখানা।

এই চারটি পরমাশ্চর্য সম্পদ তোমাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে সেখান থেকে। আমি যা বললাম, আশা করি মন দিয়ে শুনেছো। দেখো, কোথাও যেন চালে ভুল করো না। একটু এদিক-ওদিক হলে কিন্তু তোমাকে চিরকালের মতো হারাবো আমি।

বৃদ্ধ মুর বললো,—হয়তো তোমার কোথায়ও বুঝতে ভুল চুক হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং মন দিয়ে শুনে নাও, আরও একবার বলছি তোমার কাছে।

বৃদ্ধ তোতা-পাখীর মতো করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিল যুদরকে।

এই সময় ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো চুয়াত্তরতম রজনী
আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

যুদর বলে, সবই বুঝলাম। কিন্তু আপনি যা বললেন, সেই সব ভয়ংকর ব্যাপার সহ্য করা কী মানুষের পক্ষে সম্ভব?

বৃদ্ধ বলে, আমি তো বলছি, তোমার কোনও ভয় নাই। যা যা বললাম, ঠিক ঠিক মতো করতে পারলে, তোমার একগাছি চুলও কেউ ছিঁড়তে পারবে না। দ্বার-রক্ষী হয়ে যারা তোমার সামনে দাঁড়াবে, আসলে তো তারা সকলেই ভূতপ্রেত—অপছায়া মাত্র। সে তো আমি এখান থেকে মন্ত্রবলেই শায়েস্তা,

করবো। মোট কথা, তোমার ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। বরং তাদের সামনে অত্যন্ত সহজ সাধারণ ভাবে দাঁড়াবে।

যুদর বলে, ঠিক আছে, একমাত্র আল্লাহই ভরসা।

ধূপদানীতে আবার নতুন করে ধূপের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল মুর। গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগলো ওপরে। বৃদ্ধ মন্ত্র-সাধনায় বসলো। যুদর লক্ষ্য করে নদীর জল ধীরে ধীরে কমছে। শেষে এক সময় একেবারেই শুকিয়ে চড়া পড়ে গেল। বৃদ্ধের নির্দেশ মতো সে নদীর নিচে নেমে দেখতে পেলো সেই বিশাল সিংহ-দরজা। বার বার তিনবার কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে আওয়াজ এল, কে তুমি?

—আমি কাইরোর সওদাগর উমরের পুত্র যুদর।

সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে এক জাঁদরেল প্রহরী। হাতে তার শাণিত তলোয়ার। বললো, তুমি যদি সত্যিই যুদর হও, তোমার গর্দান পেতে দাও আমার তলোয়ারের নিচে। আমি তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করবো।

যুদর বৃদ্ধের কথা স্মরণ করে গর্দান বাড়িয়ে দিল তার সামনে। কিন্তু কোপ সে বসাতে পারলো না। নিজেই লুটিয়ে পড়লো যুদরের পায়ের তলায়।

এরপর দ্বিতীয় দরজা। সেখানেও যথারীতি মুরের নির্দেশমতো, ঘোড়-সওয়ারকে ধরাশায়ী করে।

এইভাবে এক এক করে ছয়টি দরজার সংকট কাটিয়ে সে সপ্তম এবং শেষ দরজার সামনে গিয়ে সেই ডাইনী বুড়ির মুখোমুখি হয়। যুদর ভাবে বুড়িটা অবিকল দেখতে তার মা-এর মতো। তার চেহারা, চলা বলা সব—সব তার মতো। কিন্তু সে জানে, এ মায়া। আসলে ওটা একটা ডাইনীর প্রেতছায়া। কোনও সশরীরী মানুষই না সে। গর্জে উঠল যুদর, এই শোন, এক পা নড়বে না। তোমার সাজ-পোশাক সব খুলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও।

—সে কি বাবা, ছেলে হয়ে মাকে এই কথা বলে কেউ? আমি দশ মাস গর্ভে ধরেছি, বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি। লেখাপড়া শিখিয়েছি—এই কী তার পুরস্কার, বাবা!

ও-সব কোনও কথা শুনতে চাই না। সব কাপড় চোপড় খুলবে কী না, বল? না হলে, এই যে দেখছো তলোয়ার, একেবারে দুখানা করে ফেলবো।

ডাইনীটা বলে, খুলছি বাবা, খুলছি। মাকে যদি বেইজ্জৎ করতেই চাও, কর।

খানিকটা অঙ্গবাস খোলার পর আবার সে চুপ করে দাঁড়ায়।

যুদর আবার হুঙ্কার তোলে, কী হলো, কথা কানে ঢুকছে না? তা হলে বাঁচার সাধ নাই, মনে হচ্ছে!

—না বাবা, না। অমন করে ভয় দেখিও না। এক্ষুনি খুলছি।

আবার দু-একখানা খুলে ফেলে দেয়। আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

—না, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না দেখছি, খোল বলছি। নইলে এক ঘায়ে দেবো শেষ করে।

যুদর তলোয়ারখানা সাঁই করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে বুড়িটার নাকের ডগার ওপর দিয়ে। ভয়ে শিউরে ওঠে সে। ও বাবা গো, মরে যাবো গো? অমন করে নাকের ডগায় তলোয়ার নাচিয়ো না, বাবা। আমি খুলছি। এখুনি সব খুলে ন্যাংটা হয়ে দাঁড়াচ্ছি তোমার সামনে। ছেলে হয়ে যদি মায়ের বস্ত্রহরণ করতে চাও, করো। ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্নার কথা, দুনিয়াটা রসাতলে গেল—

প্রায় সবই সে খুলে ফেলেছে। মাত্র শেষ অন্তর্বাসটি রয়ে গেছে। বুড়িটা করুণ মিনতি করে বলে, দোহাই বাপ, মাকে এইভাবে বে-ইজ্জৎ করো না। এর চাইতে আমার যে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো ছিল।

যুদরের সব তালগোল পাকিয়ে যায়। ভুলে যায় সে মুরের সতর্কবাণী। কেবল তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি মাত্র অশ্রু-সজল মুখ—তার মায়ের মুখ। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, থাক, আর দরকার নাই।

সঙ্গে সঙ্গে ডাইনীর অট্টহাসিতে সারা কক্ষ ফেটে পড়ে, এই—কে আছিস, বেহদ্দটাকে বেধড়ক পিটিয়ে এখান থেকে বের করে দে।

ডাইনীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, চারদিক থেকে অজস্র ধারায় কিল চড় লাথি বর্ষণ হতে লাগলো যুদরের ওপর। কে যে তাকে মারছে কিছুই বুঝতে পারে না। কারণ সকলেই অদৃশ্য-লোক থেকে হাত পা চালাচ্ছিল। মারের চোটে যুদরের হাড় মাস আলাদা হবার দাখিল হলো প্রায়। কোনও রকমে সে পিছু হটতে হটতে এক সময়ে প্রথম দরজা পার হয়ে নদীর চরে এসে দাঁড়াতে পারে।

বৃদ্ধ মুর মন্ত্রবলেই বুঝতে পেরেছিল, সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। নদীর নিচে ছুটে এসে সে যুদরকে ওপরে নিয়ে যায়।

যুদর বলে, পারলাম না, জনাব। মায়ের বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই আর বলতে পারলাম না, খুলে ফেল তোমার ঐ শেষ অন্তর্বাসটুকু! আমি জানি, আমি ভুল করেছি। আমি জানি, সে আমার মা নয়—ডাইনী। তবু—তবু আমি পারলাম না। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় আমার মায়ের সেই রোদনভরা অশ্রু-সজল মুখখানাই বার বার দেখতে থাকলাম। আমাকে মাফ করে দিন, জনাব। আমি আপনার সব ভেস্তে দিয়েছি—

বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয় যুদরকে। আমি বুঝেছি, কোথায় তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলে। সে যাক, যা হবার তা হয়েছে। ও-নিয়ে এখন আর ভেবে কিছু লাভ নাই। আবার একটা গোটা সাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ঠিক এক বছর পর এইদিনে, এই তিথি-নক্ষত্রে আবার আমরা এখানে আসবো। সেদিন পর্যন্ত তোমার দেশে ফেরা হবে না। আমার কাছেই থাকবে তুমি। চল, আজ আর এখানে ফালতু বসে থেকে কাজ নাই। ঘরে ফেরা যাক।

সেই মুহূর্তে আবার সেই নিগ্রো নফর দুটো হাজির হলো সেখানে। বৃদ্ধের ইশারায় ওরা তাঁবুটা গুটিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে খচ্চর দুটোকে সঙ্গে নিয়ে আবার এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ এবং যুদর খচ্চরে চেপে বসলো। নিগ্রো দুটো পিছন পিছন চলতে থাকলো।

ফেজ শহরের সেই প্রাসাদ-তুল্য ইমারতে নানা সুখ-বিলাসের মধ্য দিয়ে গোটা একটা বছর কাটিয়ে দিল যুদর।

আবার ফিরে এল সেই তিথি-নক্ষত্র। ফিরে এল সেইদিন। মুর বললো, আজ আমাদের যেতে হবে।

সেই শহর-প্রাচীরের পাশে আসতেই নিগ্রো নফর দুটো খচ্চর সঙ্গে করে এল। যুদর আর বৃদ্ধ খচ্চরে চেপে নদীর কিনারে এসে দাঁড়ায়। নিগ্রোরা খচ্চর দুটো নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে তারা তাঁবুর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। তাঁবু খাটানো হয়। মুর ধূপদানীতে ধুনো ছড়িয়ে দিতে দিতে যুদরকে বলে, সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো? এবার আর ঐ রকম ভুল করবে না আশা করি।

যুদর বলে, ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়।

রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁচাত্তরতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

তবু বৃদ্ধ বলে, ভুলেও কখন মনে করবে না, ঐ ডাইনী বুড়িটা তোমার গর্ভধারিণী মা। সবই তার ছলনা মাত্র। মোট-কথা, তার ছলা-কলাতে তুমি কোনও মতেই ভুলবে না। প্রথমবার তুমি প্রাণে বেঁচে এসেছো। কিন্তু এবার যদি সেই ভুল করো, সশরীরে আর ফিরে আসতে পারবে না, আমার কাছে। তবে, তোমার প্রেতাত্মার সঙ্গে আমার মোলাকাত হতে পারবে।

যুদর বলে, এত কাণ্ডের পর আবার যদি আমি ভুল করি তবে তো আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা দরকার।

ধূপদানীতে ধুনো দিতে গলগল করে ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ করে চলে। নদীর জল শুকিয়ে শুকিয়ে এক সময় ধু ধু চর জেগে ওঠে। যুদর নিচে নেমে যায়। সেই রুদ্ধ দ্বারে কড়া নাড়ে। বার বার— তিন বার। ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে, কে?

—আমি উমর-সন্তান যুদর।

দরজা খুলে যায়। শাণিত তলোয়র বাগিয়ে প্রহরী হুকুম করে, গর্দান বাড়াও।

যুদর নিঃশঙ্ক চিত্তে মাথা পেতে দেয়। লুটিয়ে পড়ে প্রহরী। এইভাবে

এক এক করে ছয়টি দরজা অতিক্রম করে সপ্তম এবং শেষ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই ছলনাময়ী পেতনী মায়ের রূপ ধরে যুদরের সামনে এসে দাঁড়ায়। যুদর কিন্তু নির্মম নিষ্করুণ কণ্ঠে বলে, তোমার সব সাজ-পোশাক খুলে আমার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও।

ডাইনীটা নানা বাহানা করে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। মা-ছেলের সম্পর্ক টেনে এনে যুদরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু গত বছরের সে-কথা যুদর ভোলেনি। সেই হাড়-চুর করা কিল চড় ঘুসি লাথির ব্যথা এখনও সে কল্পনায় অনুভব করতে পারে। ডাইনীটা সাজ-পোশাক খুলতে খুলতে শেষ অন্তর্বাস-এ এসে থেমে যায়। যুদর খিস্তি খেউড় করে হুংকার ছাড়ে, এই হারামজাদী, খোল শীগ্‌গির। নইলে, এই দ্যাখ তলোয়ার, একেবারে সোজা ঢুকিয়ে দেবো—

ডাইনী শেষ বাসটুকু ছেড়ে ফেলে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যুদর আর ডাইনীটাকে দেখতে পায় না। পলকে সে উবে গেছে!

বাস, আর কোনও বাধা নাই। যুদর এবার বড় কামরায় ঢুকে পড়ে। এই প্রকাণ্ড ঘরখানা সোনার ইটে ঠাসা। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করে না যুদর। খানিকটা এগোতে আর একটা ঘরের দরজা। পর্দা ঝুলছিল। যুদর ঢুকে পড়ে। ঘরের এক পাশে একটি সোনার সিংহাসন। সেই সিংহাসনে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে যাদুসম্রাট অল-শমরদল। তার মাথায় নানা রত্নখচিত এক সুবর্ণমুকুট। মুকুটের শীর্ষে সেই আশ্চর্য গোলক। আসলে সেটা একটা মাণিক। শমরদলের ডান হাতের আঙ্গুলে পরা ছিল একটি মোহাবাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। সিংহাসনের মাথার কাছে রাখা আছে একখানা তলোয়ার। আর শমরদলের কণ্ঠে ঝোলানো ছিল একখানা তক্তি। আসলে এই তক্তিখানাই কাজললতা।

যুদর প্রথমে তলোয়ারখানা কোমরে বাঁধলো। তারপর শমরদলের আঙ্গুল থেকে আংটিটা খুলে দিয়ে নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখলো। এবং সব শেষে সে মুকুট থেকে তুলে নিল সেই আশ্চর্য গোলকটি।

তখন চারদিক থেকে জয়ধ্বনি হতে লাগলো, সাবাস যুদর, তুমিই কামাল করে দিলে!

নানারকম বিজয়-বাদ্য বাজতে লাগলো চারদিকে। যুদর ধীর পায়ে চলতে চলতে এক সময় নদীর চরে উঠে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ মুর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। যুদরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে, তা হলে পেরেছো, সত্যিই আসতে পেরেছো, যুদর?

সেই অমূল্য রত্ন-সম্পদগুলো দুহাতে চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে সে, আমার এতকালের স্বপ্ন আজ সফল হলো। দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে তার দু গাল বেয়ে।

—চল চল, আর এখানে দেরি করে কী লাভ? চল এবার প্রাসাদে যাই।

আবার সেই নিগ্রোরা আসে। তাঁবুর পাট গোটানো হয়। দুটো খচ্চর

আসে। তার পিঠে চেপে যুদর আর বৃদ্ধ মূর প্রাসাদে ফিরে আসে।

সে রাত্রে তারা দুজনে মিলে প্রাণভরে খানাপিনা করে। এতকালের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে বৃদ্ধ মূর আবদ অল সামাদ। এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়। যুদরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার জন্যেই আমার এতকালের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। বল বাবা, যুদর, কী চাও তুমি। আজ তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। তুমি যা চাইবে, তাই দেবো। দিতে পারবো। কারণ আজ আমি ত্রিভুবন বিজয়ের ক্ষমতা ধরি। বল, কী চাও ?

যুদর বলে, আপনার ঐ মজার থলেটার ওপর আমার ভারি লোভ। যদি মেহেরবানী করে ওটা আমাকে দেন—

বৃদ্ধ হাসে, বোকা ছেলে, সামান্য এই থলেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাও ?

—সামান্য কেন বলছেন, জনাব ? এমন কল্পতরুর মতো থলে—যা খেতে চাইবো তাই পাবো। এর চাইতে আর বেশি কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? পেট পুরে জিভের সাধ মিটিয়ে খানা-পিনা খেতে পেলে আমার আর কিছু চাই না।

'মূর বলে, কিন্তু খেতে পাওয়াই তো সব নয়, যুদর। খাওয়া ছাড়াও মানুষের আরও অনেক কিছুর দরকার হয়। তোমাকে এই যাদু থলের সঙ্গে আরও একটা থলে দিচ্ছি। এটা অবশ্য অলৌকিক না। তবে মণিমুক্তা হীরে-জহরত ভরা। সারা জীবন ধরে দুহাতে খরচাপাতি করেও ফুরাতে পারবে না। তুমি এক কাজ করো, কাইরোতে ফিরে গিয়ে একটা দোকান নিয়ে বসো। দেখবে শহরের সেরা সওদাগর হতে পারবে। তাছাড়া এই খাবারের যাদু থলে তো রইলোই। যখন যা খেতে ইচ্ছে করবে ব্যাগটা হাতে ধরে শুধু মনে মনে বলবে, শোনও থলের নফর, 'এখন আমি এই খানাপিনা চাই। তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে থলের মধ্যে এসে যাবে সেইসব খাবার ভর্তি' থালাগুলো। একটা কথা, খানাপিনা শেষ হয়ে গেলে সোনার থালাগুলো আবার থলের মধ্যে পুরে দিতে হবে। থলের নফর জিনিয়াহকে যদি তুমি একদিনে হাজার রকমের দুষ্প্রাপ্য খানাপিনারও ফরমাশ করো, সঙ্গে সঙ্গে সে এনে হাজির করবে সব।

আবদ অল-সামাদ শূন্যের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ডাকতেই সেই নিগ্রো দুটোর একটা এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে নিয়ে এল একটা খচ্চর। বৃদ্ধ মূর যুদরকে খচ্চরে চাপিয়ে দিল। সঙ্গে দিল সেই হীরে জহরৎ আর যাদু-থলে দুটো। বললো, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে এই নিগ্রো। এই খচ্চরটা এক জিনিয়াহ। যেমন ভাবে আমরা এসেছিলাম তেমনি বায়ুবেগে উড়ে যাবে সে। কাইরোতে একেবারে তোমার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে। তুমি নেমেই দেখতে পাবে এই নিগ্রোকে। এর হাতে আবার এই খচ্চরটাকে ফেরত পাঠাবে আমার কাছে। যাও, আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙছি, তিনি যেন সারা জীবন তোমাকে সুখে রাখুন। কতকাল পরে দেশে ফিরছো, তোমার মা পথ চেয়ে বসে আছেন। তোমাকে পেয়ে আবার হাসি গানে ভরে উঠবে তাঁর সংসার।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি উড়ে চলার পর যুদর কাইরোয় ফিরে আসে। মনে

তার কত আনন্দ, কতদিন পরে মাকে দেখতে পাবে সে ?

বাড়ির দরজায় ঢুকতে গিয়েই সে চমকে ওঠে। একী ব্যাপার ? তার মায়ের পরণে শতছিন্ন একখানি মাত্র বস্ত্র। কোনও রকমে সে লজ্জা নিবারণ করতে পেরেছে মাত্র। অনাহারে অনিদ্রায় তার চেহারার জৌলুস ধুয়ে মুছে গেছে। কেঁদে কেঁদে চোখের কোলে কত কালি পড়েছে !

—মা, মাগো, একি তোমার চেহারা হয়েছে, মা ? যেন মনে হচ্ছে—কতকাল তুমি অনাহারে আছো ?

—খুব মিথ্যে নয়, বাবা। রোজদিন তো পেটে দানাপানি পড়ে না। দয়া করে যেদিন লোকে দেয়, সেদিন খাই। অন্যদিন উপোস।

—উপোস ! সে কি ! আমি যে অনেক টাকা তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম, মা। একশো একশো করে দুবারে দুশো, তারপর এক হাজার—এই বারোশো দিনার তোমার কাছে সংসার খবচের জন্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। রেখে ঢেকে খেলে এ টাকায় মাত্র এক বছর কেন মা, বহুকাল চলার কথা ?

মা বললো, তোর সব কথাই ঠিক, বাবা। অত পয়সা থাকতে আজ আমাকে সানকী হাতে করে দোরে দোরে ফিরতে হবে কেন ? কিন্তু নসীবে লেখা থাকলে খণ্ডাবে কে ? তুই চলে যাওয়ার পরই তোর ভাই দুটো আমার কাছ থেকে টাকা পয়সাগুলো কেড়ে নিয়ে পথে বের করে দিল। তারপর কী করলো জানি না, দুদিনেই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আবার এসে আমার ঘাড়ে চাপলো ! সারাদিনে আমি ভিক্ষে করে যা পাই, মায়ের প্রাণ, ওদের না দিয়ে তো মুখে দিতে পারি না।

যুদর বলে, তোমার সব দুঃখের আজ থেকে ইতি হয়ে গেল মা। দেখ, তোমার জন্যে কী নিয়ে এসেছি। কত ধন-দৌলত, কত খানাপিনা। আচ্ছা মা তোমার তো আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি ? এখন কী খেতে চাও, বল তো ?

—গরীবের আবার বাছ-বিচার কী, বাবা। যা পাবো তাই খাবো।

—উঁহুঁ, গরীব কী বলছো, আমি এখন বিরাট বড়লোক। বল তুমি কী খেতে চাও। এক্ষুণি খাওয়াবো তোমাকে।

মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়।

—তা তুই কী খেতে দিতে পারবি, বাবা ? এতকাল পরে এলি, দুখানা থলে হাতে করে। তার আবার একটা খালি। অন্যটায় তো কই খানাপিনা কিছু দেখছি না।

—আছে আছে। তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। এখন বল, কী খেতে চাও ?

—কী আবার চাইবো। তুই বাপু, বাজে খরচ করিস নে। বাজার থেকে রুটি আর একটু পনির নিয়ে আয়। সবাই মিলে খাবো।

যুদর বলে, তুমি কী যে বল মা, শুকনো রুটি আর পনিরই খাবে শুধু কেন, মধুর বিরিয়ানী, মাংসের কোপ্তা, ভেড়ার কাবাব, মোরগ মসাল্লাম, পেস্তার বরফি, আফগানী হালওয়া, মধু—এসব তোমার পছন্দ নয় ?

ছেলের মুখে এই সব দুষ্প্রাপ্য খানাপিনার ফিরিস্তি শুনে মা ভাবে, হয় ছেলে তার সঙ্গে তামাশা করছে, নয়তো মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, যুদর এসব কী পাগলের মতো প্রলাপ বকছিস বাবা? তুই খোয়াব দেখছিস, না পাগল হয়ে পড়লি? এত সব বাদশাহী খানাপিনার ফর্দ দিচ্ছিস। বলি, তাদের একটাও কী আমরা চোখে দেখেছি কখনও?

—দেখনি! কিন্তু আজ থেকে দেখবে এবং এখনি দেখবে। এই মুহূর্তে যেসব খানার নাম করলাম, তার সব তোমার সামনে হাজির করছি, মা। তোমার ছেলে কী তোমার সঙ্গে হাসি মজাক করতে পারে? ঐ খালি থলেটা আমাকে একবার দাও তো—

মা ছেলের হাতে যাদু-থলেটা তুলে দিলে যুদর থলেটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে এক এক করে থালা ভর্তি সব খাবারগুলো বের করে মেজেতে কাপড়ের ওপর রাখে। সুগন্ধে ভরে ওঠে ঘর। মা হাঁ হয়ে দেখতে থাকে।

—হ্যাঁ বাবা, দেখে তো মনে হয়েছিল, থলেটা খালি! তা এত সব খাবার দাবার ছিল ওর মধ্যে?

যুদর বলে, ছিল না। কিন্তু এখনই এল। দেখছো না, ধোঁয়া উঠছে। বাস ছাড়ছে। সদ্য রান্না করা। হাত দিয়ে দেখ, কী গরম?

মা বেচারা ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়।

—বলিস কী বাবা, এ যে ভূতুড়ে কাণ্ড! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কী ব্যাপার বলতো, বাবা?

যুদর বলে, এই আশ্চর্য যাদু-থলেটা আমাকে সেই বৃদ্ধ মুর দিয়েছে মা। এর অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা। খানাপিনা বলতে যা বোঝায়—সব পাওয়া যাবে এই থলেয়। শুধু নামটা মনে করে থলেয় হাত ঢোকাতে হবে। ব্যস, আর কোনও ঝামেলা নাই। পলকের মধ্যে তোমার হাতে এসে যাবে গরমাগরম সেই সব খাবার ভর্তি থালা। তা সে হাজার কিসিমেরই হোক না কেন। সব এসে হাজির হবে এক পলকে। তবে একটা কথা, খানাপিনা শেষ হয়ে গেলে এই সোনার থালাগুলো আবার থলের ভেতরে পুরে দিতে হবে। সুতরাং বুঝতে পারছো মা, সারা জীবনে আমাদের আর খানাপিনার জন্যে কোনও চিন্তাভাবনা করতে হবে না।

মা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ বাবা ক'জন মানুষের খানাপিনা পাওয়া যাবে?

—কত জনের দরকার মা? তোমার ছেলেদের শাদী দাও। হাজারো মেহেমানকে নেমন্তন্ন কর। দেখো, কোনও অসুবিধা হবে না। তাদের সবাইকে পেট পুরে খাইয়ে দেব আমি। তোমার যাকে খুশি ডেকে যত খুশি খাওয়াতে পারো, মা। কিন্তু একটা কথা, এই আজব থলের কথাটা কারো কাছে ফাঁস করো না। মুর সাহেব বার বার করে বারণ করে দিয়েছেন। এর গোপন রহস্য কাউকে জানাবে না কোনও দিন।

—তুই কী পাগল হয়েছিস বাবা, এসব কথা কাউকে বলতে আছে?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতাত্তরতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এমন সময় সলিম সালিম দুই ভাইয়ে সদর দরজায় পা দিয়েই হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে ঘরে আসে।

—মা, বড় খিদে পেয়ে গেছে, শিগ্‌গির খেতে দাও—

কিন্তু মুখের কথা আর শেষ হয় না। নানারকম সুগন্ধী খাবারের থালায় সারা ঘর ভর্তি দেখে ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়ে। খাবারের থালাগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে। জীভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলে, হেই বাপ্‌, এসব কী? অঃ, ছোট এনেছে বুঝি!

তিন ভাই আর মা মিলে রসনার তৃপ্তি করে খেল সে রাতে। তার পরদিনও ঐ রকম বাহারী বাদশাহী খানাপিনায় সাজানো হলো কাপড়। সকলে বেশ তৃপ্তি করে খেল। তারপর দিনও একই ব্যাপার। সলিম সালিম অবাক হয়। রোজ রোজ এমন দামী দামী খানাপিনা খাওয়াচ্ছে তার ভাই যুদর। নিশ্চয়ই সে বিদেশ থেকে অনেক মাল-কড়ি নিয়ে এসেছে।

কয়েক দিন বিশ্রাম নেবার পর যুদর বাজারে যায়। এবার একটা দোকান-পাটের সন্ধান করতে হবে। বৃদ্ধ মুরের উপদেশ সে স্মরণ করে। সঙ্গে যা হীরে জহরৎ আছে তার অল্প কিছু দিয়েই একটা লাগসই দোকান সে কিনতে পারবে। ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে পারলে অচিরেই শহরের সেরা সওদাগর হতে পারবে সে।

যুদর-এর অনুপস্থিতির সুযোগে সলিম সালিম মাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা, যখন আমরা যা খেতে চাই, তুমি ও-ঘরে ঢুকেই তা নিয়ে আস কী করে? এত সব খাবার বানাও কখন?

—ও মা, বানাতে যাবো কেন?

—তবে?

কেন জানিস না, যুদর দুটো থলে এনেছে বিদেশ থেকে। তার একটা হীরে জহরতে ভর্তি। আর একটা খালি। কিন্তু খালি হলে কী হবে। থলেটা যাদুমন্ত্র করা। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যে খাবারই চাওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। তা না হলে এত হরেক রকমের গরম গরম খানাপিনা খাচ্ছিস কী করে?

সলিম সালিম গোপনে যুক্তি করে। সলিম বলে, একটা ফন্দী বের করতে হবে।

সালিম জিজ্ঞেস করে, কী রকম ফন্দী?

—মায়ের কাছ থেকে ঐ থলে দুটো লোপাট করতে হবে?

—কিন্তু যদুর জানতে পারলে—?

—জানতে যাতে না পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

—কী ব্যবস্থা ?

—সুয়েজ বন্দরের কাপ্তান আমার চেনা। চল, তার কাছে যাই। যদুরকে যদি সুয়েজে নিয়ে গিয়ে কাপ্তানের কাছে বিক্রি করে দিই, সে লুফে নেবে। ওরা জাহাজের দাঁড় টানবার লোক খুঁজছে। কিন্তু সমুদ্রের নোকরীতে কেহ যেতে চায় না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটাত্তরতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সালিম বলে, কিন্তু কী করে যদুরকে সেখানে নিয়ে যাবে ?

সলিম বলে, আমরা নিয়ে যাবো কেন ? কাপ্তানকে আমাদের বাড়িতে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করবো। বলবো, 'আপনি দুজন পালোয়ান খালাসীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তারপর কী করে কী করতে হয় তুমি দেখে নিও।

দুই ভাই সুয়েজে এসে কাপ্তানের সঙ্গে দেখা করে। সালিম বলে, আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

কাপ্তান বলে, বেশ, বল।

সলিম বলে, এ আমার ভাই। আরও একটি অপগণ্ড ভাই আছে আমাদের। বাবা মারা যাওয়ার সময় সকলকে সমান ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন তার বিশাল সম্পত্তি। কিন্তু আমাদের ঐ ছোট ভাইটি তার অংশের সবকিছু দু'দিনেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আমাদের ঘাড়ে ভর করেছে। প্রথম সে আমাদের নামে নানা রকম মিথ্যা কথা রটাতে থাকলো। পাড়া-প্রতিবেশিদের কাছে কাঁদুনি গাইতে লাগলো, আমরা নাকি তাকে ফাঁকি দিয়েছি। তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছি। কিছু খারাপ পড়শী তাকে বদবুদ্ধি দিল। তাদের কথায় নেচে আমাদের দুই ভাইয়ের নামে সে মামলা দায়ের করলো। অনেক দিন ধরে চললো সে মামলা। কাজী ব্যাটা ঘুষ খেয়ে আমাদের যথা-সর্বস্ব জরিমানা করলো। এতেও কিন্তু আমার ভাইটি ক্ষান্ত হলো না। পরপর আর দুটি মামলা রুজু করলো আমাদের নামে। সে মামলা দুটি অবশ্য ধোপে টেকেনি। কিন্তু তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমরা। আমাদের ঘাড়েই খাবে এবং আমাদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র আঁটিবে—এখন এই তার একমাত্র কাজ। এরকম কাল সাপ নিয়ে কতদিন বাস করা যায়, বলুন। তাই আমরা আপনার দ্বারস্থ হয়েছি আজ। একমাত্র আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন।

কাপ্তান বলে, কিন্তু আমি তোমাদের বাঁচাতে পারবো কী করে ?

সলিম বলে, যদুরকে আমরা আপনার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি। আপনি ওকে এনে জাহাজে দাঁড়টানার কাজে লাগান।

কাপ্তান বললো, তা মন্দ বলনি। এ রকম দুষ্ট গরুকে দাঁড়ে বসিয়ে দিলে শায়েস্তা হবে। কিন্তু ওকে এখানে নিয়ে আসবে কী করে?

—সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। আজ রাতে আপনি দুজন তাগড়াই খালাসীকে সংগে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসুন। সেখানে আপনার জন্যে খানাপিনার বন্দোবস্ত করবো আমরা। আপনি আমাদের মহামান্য মেহেমান হয়ে আজকের রাতটা আমাদের বাড়িতেই কাটাবেন। তারপর রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, ওকে বেঁধে আপনার লোকরা নিয়ে চলে আসবে।

কাপ্তান বললো, কিন্তু তাকে কাঁধে তুলতে গেলেই তো ঘুম ভেংগে যাবে তার। তখন তো চেঁচামেচি চিৎকার করবে!

—না তা করবে না। আমি সে ব্যবস্থা করেছি। তার খাবারের সংগে কিছু ঘুমের দাওয়াই মিশিয়ে দেবো। তা হলে সে আর জাগবে না।

কাপ্তান হাসলো, বাঃ, বেড়ে বুদ্ধি তো তোমার। ঠিক আছে, খানাপিনা ঠিক রেখ। আজ রাতেই যাবো। আচ্ছা—কি দাম নেবে, বল? চল্লিশ দিনার?

সলিম বললো, খুবই কম হলো। তবু আপনার কথাই মেনে নিলাম। কারণ, আমরাও তো আপদ বিদায় করে নিষ্কৃতি পাবো। তা হলে ঐ কথাই রইলো। আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা আপনার জন্যে বড় মসজিদের পাশে অপেক্ষা করবো।

কাপ্তান বললো, ঠিক আছে।

দুই ভাই তখন বাড়িতে ফিরে এসে দুপুর বেলায় খেতে বসে নানা খোস গল্প করতে থাকে। এক সময় সলিম বলে, যুদর, আজ তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই একটা কাণ্ড করে এসেছি।

যুদর অবাক হয়ে তাকায়, কী ব্যাপার?

—না না, ভয় পাওয়ার মতো কিছু না। আমার এক পেয়ারের দোস্ত প্রায়ই আমাদের দুজনকে তার বাড়িতে ডেকে প্রায়ই ভুরি ভোজ করায়। বেশ বড় লোক সে। পয়সা আছে—দেদার খরচা করে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে খানা-পিনা করে। কিন্তু আমরা তার বদলা দিতে পারি না। তা এখন যখন তোমার দৌলতে আমাদের অভাব বলতে কিছু নাই, তাই ভাবলাম বন্ধুটিকে ডেকে ভালো মন্দ কিছু খাওয়াই। সেই ভেবে আজ সকালে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। ইচ্ছে ছিল ওকে একাই আসতে বলবো আজ রাতে। আমাদের সংগে খাবে। কিন্তু ঐ সময় ওর ঘরে ওর দুই ভাই বসেছিল। বাধ্য হয়ে ওদেরও বলতে হলো। ভাবছি কাজটা বোধহয় ভালো করি নি। আগে অন্তত তোমার মতামত নেওয়া উচিত ছিল। নানা কাজের মানুষ তুমি, হয়তো আজ রাতে তোমার সময় সুবিধে নাও থাকতে পারে।

যুদর বলে, তাতে কী হয়েছে। আমি থাকি না থাকি তাতে কী তোমাদের মেহেমানদের খানা-পিনার কিছু অসুবিধে হবে? মাকে বললেই সে সব ব্যবস্থা

করে দিতে পারবে। যা যা খাওয়াতে চাও, সব গরম গরম পাবে। আর তা ছাড়া আমি তো থাকবোই।

সন্ধ্যা বেলায় দুই ভাই বড় মসজিদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরে কাপ্তান তার দুই সাগরেদকে সংগে নিয়ে এসে হাজির হলো।

নানা উপচারে খানাপিনা শেষ হলো। আশ্চর্য যাদু-থলের কল্যাণে প্রায় চল্লিশ রকম বাদশাহী খাবার-দাবার এনে দিল ওদের মা। সলিম কায়দা করে যুদরের অলক্ষ্যে তার খাবারের মধ্যে এক ডেলা আফিং মিশিয়ে দিল।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই যুদর ঘুমে টলে পড়ে। রাত গভীরতর হলে দুই ভাই যুদরকে একটা কালো কাপড়ের থলেয় ভরে কাপ্তানের চাকরদের কাঁধে তুলে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমন্ত যুদরকে নদীর ঘাটে বাঁধা ছোট একটা নৌকায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। তারপর সোজা সুয়েজে চলে যায়।

কাপ্তানের ডেরায় যুদর মূলত বন্দী হয়ে থাকে। তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে জাহাজের দাঁড় টানার কাজে লাগানো হয়। এইভাবে কপালের ফেরে বহু ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও যুদর আজ এক নগণ্য ক্রীতদাস হয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হলো।

রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো উনআশিতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়ঃ

সকাল বেলায় সলিম এবং সালিম ঘুম থেকে ওঠে ওদের মায়ের কাছে গিয়ে বললো, মা যুদর কী জেগেছে?

মা বলে, না বাবা আমি কোনও সাড়া পাইনি। বোধ হয় এখনও ঘুমিয়েই আছে। যা ডাক। আমি নাস্তা পানি দিচ্ছি। এক সংগে বসে খা তোরা।

দুই ভাই পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বলে, কই মা, ঘরে তো যুদর নাই।

মা বলেন, কিন্তু আমি অনেক ভোরেই জেগে গেছি। কই, তার ওঠার তো কোনও আওয়াজ পাইনি। এত ভোরে সে গেল কোথায়?

সলিম বলে, আমার মনে হয়, সে ঐ কাপ্তানের সংগে বন্দরে চলে গেছে। ওর কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম, সাগর অভিযানের খুব সখ। হয়তো জাহাজে চেপে সাগর পাড়ি দেবে। সাগর পারের কোন্ দ্বীপে নাকি অঢেল ধনরত্ন আছে। হয়তো সেই রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান করতে বেরিয়ে গেছে সে।

মা বললো, হতেও পারে। আমাকে বললে আমি রাজি হবো না, এই আশঙ্কাতেই কিছু না বলে চলে গেছে।

সলিম বলে, সে জন্য কোনও চিন্তা ভাবনা করো না, মা। যুদর ধনদৌলতের বরাত নিয়ে জন্মেছে। তুমি দেখে নিয়ো, আবার সে অনেক পয়সা কড়ি নিয়ে দেশে ফিরবে।

কিন্তু মায়ের প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

সলিম চিৎকার করে ওঠে, শোন মা, যদুর-এর জন্য তোমার দরদ খুব বেশি। কিন্তু আমরাও তোমার পেটের সন্তান। আমাদের জন্যে তো তোমার চোখে এক ফোঁটা পানি ঝরতে দেখিনি কোনও দিন? তুমি মা হয়ে আমাদের সঙ্গে সৎ মায়ের মতো ব্যবহার করো। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা একবারও ভাবো না। কিন্তু কেন? শুধু সে-ই কী তোমার সন্তান? আমরা নই?

মা কাঁদতে কাঁদতে বলে, নিশ্চয়ই, তোমরাও আমার পেটের সন্তান। কিন্তু আজ আমার ভাবতে কষ্ট হয়, তোমাদের মতো অপদার্থ শঠ শয়তান কুলাঙ্গার ছেলেদের আমি কী করে জঠরে ধরেছিলাম। তোমাদের বাপজান মারা যাওয়ার পর থেকে একটা দিনের তরে আমাকে শান্তিতে কাটাতে দাওনি। বাপের রেখে যাওয়া বিষয়-আশয় দুদিনে ফুঁকে দিয়ে তোমার ছোট ভাই আর আমার ভাগের বিষয়টুকুও আত্মসাৎ করেছ। একটা দিন রোজগার-পাতির ধান্দায় বেরুলে না। হয় আমার না হয় তোমার ভাই-এর ঘাড়ে চেপে রইলে। আমি বুড়ো হয়েছি, আমি তোমাদের গর্ভধারিণী মা, তোমাদের কী উচিত না—আমার ভরণপোষণ করা? সে চুলোয় যাক, নিজেদের খাওয়া-পরা জোগাড় করার যোগ্যতাও তো তোমাদের নাই। বড় ভাই হয়ে এইভাবে ছোট ভাই-এর ঘাড়ে বসে বসে খেতে তোমাদের শরম লাগে না?

এরপর সলিম সালিম বুড়ো মাকে বেদম প্রহার করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে যদুরের থলে দুটো ঘরের বাইরে নিয়ে আসে।

—এ সবই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুমি ছোট ছেলের জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলে।

মা বলে, আল্লা কসম, যদুর বিদেশ থেকে রোজগার করে এনেছে। ও জিনিসে তোরা হাত দিসনি।

—তুমি চুপ কর। ছোট ছেলের হয়ে আর তোমাকে দালালি করতে হবে না। এ-সব আমাদের বাবার বিষয়। হকের জিনিস। আমরা ছাড়বো না!

মা কাতরভাবে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, না না, শোন, ওই থলে দুটো যদুরকে দিয়েছে এক বৃদ্ধ মুর। তোদের বাবা এসব কিছু রেখে যায়নি—

—মিথ্যে কথা। তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক। এগুলো আমরা দু' ভাই ভাগ করে নেবো।

মায়ের কোনও কথায় ওরা কর্ণপাত করে না। নিজেরা ভাগ-বাঁটোয়ারায় মশগুল হয়ে পড়ে।

ধন-রত্নাদি ভাগ করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। কিন্তু গোলমাল বাধলো আসল বস্তুটি নিয়ে। দুজনেই দাবী করে বসে ঐ অলৌকিক যাদু-থলেটা। সালিম বলে, আমিই সব ফন্দী ফিকির বের করেছি যদুরকে সরাবার। সুতরাং থলেটা আমারই প্রাপ্য।

কিন্তু সলিম বলে, সে কি করে হয়? আমার সাহায্য ছাড়া তোমার প্যাঁচ-পয়জার কাজে লাগাতে পারতে? ওটা আমার চাই-ই চাই।

সলিম নাছোড়বান্দা, অসম্ভব। আমি কিছুতেই ছাড়বো না এই থলে।

তাতে যা ঘটে ঘটুক।

সালিম চিৎকার করে পাড়া মাথায় তোলে।

—ছাড়বে না মানে? ছাড়তে হবে তোমাকে। তা না হলে তোমার সব শয়তানীর কেচ্ছা আমি ফাঁস করে দেবো সকলের কাছে।

—কী, কী ফাঁস করে দিবি, শুনি? ভেবেছিস, বলে দিয়ে শুধু আমাকেই ফাঁসাতে পারবি? তোকে ধোয়া তুলসী পাতা বলে ছেড়ে দেবে লোকে? মরি তো তোকে সঙ্গে নিয়েই মরবো।

সালিম হুঙ্কার ছাড়ে, সে-ভি আচ্ছা। ফাঁসী যেতে রাজি আছি। কিন্তু তোর গুণের কীর্তি আমি বলবো সবাইকে।

সলিম বলে, সে তুই যাকে খুশি, যা ইচ্ছে বলতে পারিস। এই থলে আমি ছাড়বো না।

সালিম একটা ডাণ্ডা তুলে নিয়ে রুখে আসে, ছাড়বি না মানে; তোর 'বাপ' ছাড়বে—

সলিম বেগতিক দেখলো। সালিম তার মাথায় হয়তো ডাণ্ডাটা বসিয়ে দেবে। 'মা গো' 'বাবা গো' বলে চিৎকার করতে করতে দুটো থলেই বগলদাবা করে সে ছুটতে থাকে।

সালিমের মাথাতে তখন খুন চেপে গেছে। সে-ও পিছনে পিছনে তাড়া করে চলে। দুই ভাই-এর এই কেলেঙ্কারী কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য পটাপট বাড়ির দরজা জানালা খুলে মেয়েরা নাকাব সরিয়ে মজা অনুভব করতে থাকে। রাস্তায় লোক জমায়েৎ হয়ে যায়। এমন সময় সুলতানের দরবারে যাচ্ছিল কোতোয়াল। ব্যাপারটা তার নজরে পড়ায় সিপাইদের হুকুম করে, পাকড়াও করে নিয়ে এস ওদের।

দরবারে হাজির করা হয় দুই ভাইকে। সুলতান সামস অল দুলহা দেখলো, দুটো থলে বোঝাই হীরে জহরৎ। সে ভেবে অবাক হয়, এত অমূল্য ধন-রত্ন এরা কোথায় পেল? তার কোষাগারেও তো এ সম্পদ নাই!

—কোত্থেকে চুরি করেছিস?

—ধর্মাবতার, এ সব চুরির জিনিস নয়।

সুলতান গর্জে ওঠে, সাফ সাফ সত্যি কথা বল, কোথায় এবং কার ঘরে সিঁদ কেটেছিস।

—বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, এসব আমার ছোট ভাই যুদর···

—চোপ রও, সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে। আবার ছোট ভাই-এর ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে। কোতোয়াল, এদের দু'টিকে অন্ধকার ফাটকে কয়েদ করে রেখে দাও। যতদিন না সত্যি কথা কবুল করে ততদিন ওরা ঐ আঁধিরা ঘরেই বন্দী থাকবে।

উজিরকে বললো সে, এদের মাকে দিন-গুজরান-এর মতো একটা মাসোহারা পাঠিয়ে দিও।

❖ ❖ ❖

এবার যুদরের কাহিনী শুনুন।

সুয়েজ বন্দরের কাপ্তান যুদরকে খাটিয়ে খাটিয়ে ফর্দা-ফাঁই করে দিতে লাগলো। যুদর আর কী করবে। অদৃষ্টের ফের—অস্বীকার করবে কী করে সে? যতদিন কপালে দুর্ভোগ লেখা আছে, ভোগ করতেই হবে।

এইভাবে সাগরে পাড়ি দিতে দিতে একদিন এক পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে যুদরদের জাহাজখানা খান খান হয়ে যায়। সঙ্গী সাথীরা কে কোথায় তলিয়ে গেল, কে তার হদিশ রাখে। যুদর কোনও রকমে পাহাড়ের শিলাখণ্ড আঁকড়ে ধরে প্রাণ রক্ষা করতে পারে। অনেক কষ্টে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে সে তীরের সমতলভূমিতে পা রাখে। অচেনা অজানা দুর্গম মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে অবশেষে এক আরব তীর্থ-যাত্রীদলের তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয়। যাত্রীদলের প্রধান জিদ্দার এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর। যুদরের জাহাজ ডুবির নিদারুণ কাহিনী শুনে করুণা-পরবশ হয়ে তাকে একটা নোকরী দিতে রাজী হয় সে।

—তুমি কি আমাদের সঙ্গে জিদ্দায় যেতে রাজি আছ? তাহলে তোমাকে কাজে বহাল করতে পারি।

যুদর সম্মতি জানায়। সওদাগর যুদরকে সাজ-পোশাক দেয়। বলে, আমরা মক্কায় হজে যাচ্ছি। তুমি আমাদের ফাই-ফরমাস খাটবে। হজ শেষ করে আমরা জিদ্দায় ফিরে যাবো। তোমাকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে করে।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আশিতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

একদিন তারা মক্কায় এল। যুদর নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। কাবাহ্ প্রদক্ষিণ করার জন্য পুণ্যার্থীরা মিছিল করে অগ্রসর হতে থাকে। যুদরও ওদের সামিল হয়। এইভাবে কাবাহ-কে সাতবার প্রদক্ষিণ করার সময় হঠাৎ সেই বৃদ্ধ যাদুকর মুরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার!

—আরে, যুদর না? এই বয়সে তুমি এখানে? হজে এসেছো?

চোখের জল ফেলতে ফেলতে যুদর তার দুঃখের কাহিনী বলে বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ আবাদ অল সামাদ তাকে তার নিজের ডেরায় নিয়ে যায়। মূল্যবান সাজ-পোশাক পরায়। ভালোভাবে খানাপিনা খাওয়ায়।

—তোমার দুঃখের দিন ফুরিয়ে এসেছে, যুদর। আমি গুনে পড়ে দেখলাম, এবার তোমার সুখের দিন আসছে। সে সুখের তুলনা নাই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর কেউ তোমার পথে বাধা হতে পারবে না।

যুদর জিজ্ঞেস করে, আমার ভাইরা কেমন আছে, জনাব?

বৃদ্ধ বলে, তোমার ভাই-অন্ত প্রাণ। কিন্তু সেই শয়তান ভাইদের জন্যেই আজ তোমার এই হাল। তারা তোমার থলে দুটো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল। সেই সময় সুলতানের দরবারে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সুলতান থলে দুটো কেড়ে নিয়ে ওদের অন্ধকার ফাটকে কয়েদ করে রেখেছে।

—আর আমার মা ?

—তাকে সুলতান অনুগ্রহ করে সামান্য কিছু মাসোহারা দিচ্ছে। সে যাক, ও-নিয়ে এখন চিন্তা করো না। মক্কায় এসেছো, তীর্থ ধর্ম কর। যত দিন না ধর্ম-কর্মের পাট শেষ হয় ততদিন তুমি আমার সঙ্গেই থাক। তারপর আমি আমার দেশে ফিরে যাবো। তোমাকেও পাঠিয়ে দেব কাইরোয়।

যুদর বলে, আমাকে একবার আমার মনিবের সঙ্গে দেখা করে আসতে দিন, জনাব। তিনিই এই বিপদের দিনে আমাকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে এসেছি। এখন যদি নোকরী ছেড়ে দিয়ে আমি দেশে ফিরতে চাই, তবু তো তাঁর অনুমতি দরকার।

—আলবত দরকার। তুমি এক্ষুণি যাও তোমার মনিবের কাছে। তাঁকে গিয়ে বল, তোমার আপন-জনের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেছে এখানে। সে তোমাকে স্বদেশে পৌঁছে দেবে।

যুদর জিন্দার সওদাগরকে গিয়ে বলে, আপনার উপকার আমি ভুলবো না। কিন্তু আমি দেশে ফিরে যাবার একটা উপায় করতে পেরেছি। আপনি যদি মেহেরবানী করে আমাকে খালাস করে দেন—

—এতো বহুৎ আনন্দের কথা, বেটা। নিজের দেশে ফিরতে পারবে, তার চাইতে ভালো আর কী হতে পারে! আমি খুশি মনে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি চলে যাও। এই নাও কুড়িটা দিনার। তোমার মজুরীর পাওনা। এটা নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করে যাও।

যুদর দিনারগুলো হাত পেতে নিয়ে বলে, আপনার সব পাওনা-গণ্ডা আমি বুঝে পেলাম। আর কোনও দাবি দাওয়া রইলো না আমার।

মুর-এর বাসগৃহের পথে আসার সময় এক অতি দীন-দরিদ্র ভিখারীর হাতে ঐ কুড়িটা দিনার দান করে দিল যুদর।

এরপর তীর্থমেলার দিনগুলো আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে একদিন ঘরে ফেরার দিন সমাগত হলো। বৃদ্ধ মুর তার হাতের সেই মন্ত্রসিদ্ধ যাদু আংটিটি যুদরের আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে বললো, আজ থেকে এটার মালিক তুমি। এই অলৌকিক আংটির দৌলতে তুমি ইচ্ছা করলে বিশ্ব বিজয় করতে পারো। এর মোহরটায় হাত রেখে ঘষামাত্র এক জিন এসে দাঁড়াবে তোমার সামনে। তার নাম বজ্রদানব, সে তোমাকে সেলাম করে বলবে, 'বান্দা হাজির, মালিক। হুকুম করুন কী করতে হবে ? তখন তুমি যদি তাকে হুকুম কর, 'এখনই—এই মুহূর্তে তুমি এক নতুন শহর গড়ে তোল।' দেখবে পলকে সে তৈরি করে দিয়েছে এক মনোহর শহর-সভ্যতা। কিংবা যদি বল, 'আমি চাই অমুক সুলতানের সলতানিয়ৎ ধ্বংস করে দাও।' মুহূর্তে সে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে

সেই সলতানিয়ৎ। শত্রুকে পরাভূত করার এমন অস্ত্র আর দুটি হয় না।

যুদর বৃদ্ধ মুরকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিয়ে আংটির মোহরে হাতের তালু ঘষে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রদানব এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, বান্দা হাজির মালিক, হুকুম করুন, কী করতে হবে।

যুদর বলে, আমাকে আমার স্বদেশ কাইরোয় নিয়ে চল।

বজ্রদানব মাথা নুইয়ে বলে, আজই আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি, মালিক।

এই বলে সে যুদরকে তার পিঠে তুলে নিয়ে উল্কার বেগে আকাশ পথে ছুটে চলে কাইরোর দিকে। দুপুর বেলায় যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং মাঝ রাত্রে যুদরকে সে তার বাড়ির ছাদে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ছেলেকে আবার ফিরে পেয়ে মা-এর সে কি আকুল কান্না। কীভাবে বড় ছেলেরা তাকে প্রহার করে বেঁধে রেখে তার থলে দুটো লোপাট করে পালাচ্ছিল, এবং সুলতানের রোষে পড়ে আজ কয়েদখানায় কী দারুণ দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তাদের—সব বিস্তারিত ভাবে খুলে বললো যুদরকে।

মা ছেলেকে বুকে চেপে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। যুদর বলে, চোখের পানি মুছে ফেল, মা। এইবার দেখ আমার কেরামতি।

হাতের আংটি ঘষতেই বজ্রদানব এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো, বান্দা হাজির মালিক, হুকুম করুন।

—বজ্রদানব, আমার দুই ভাইকে কয়েদ করে রেখেছে এখানকার সুলতান। এক্ষুণি তাদের এখানে নিয়ে এস।

—জো হুকুম, মালিক।

পলকের মধ্যে সে সলিম-সালিমকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল যুদরের সামনে।

দুই ভাই কারাগারের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছিল। হঠাৎ বজ্রদানব তাদের পিঠে তুলে নিয়ে পাতাল প্রদেশ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই তারা ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষে যুদর এবং মাকে দেখতে পেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়।

যুদর বলে, তোমরা এতদিন মাকে ছেড়ে কোথায় ছিলে ভাই? এভাবে বুড়ো মাকে কষ্ট দিতে হয়?

ভয়ে দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায় ওরা। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। এমন যে তাদের ভাই—তার সঙ্গে তারা কি দুর্ব্যবহারই না করেছে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হতে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো একাশিতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে:

দু-ভাই অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে থাকে। যুদর সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেঁদো না

ভাই, শয়তান তোমাদের ওপর ভর করেছিল। তা না হলে জাহাজের কাপ্তানের কাছে আমাকে বেচে দেওয়ার দুর্মতি হবে কেন তোমাদের? যাই হোক, যা হবার তা হয়েছে, কেঁদো না। আমি মহামতি জোসেফের কাহিনী স্মরণ করে আমার নিজের দুঃখ কষ্ট কিছু হালকা করতে পেরেছি। জোসেফকেও একদিন তার ভাইরা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। তোমরা আমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছ তার অনেক বেশী খারাপ আচরণ তারা করেছিল জোসেফের সঙ্গে। তারা তাঁকে এক ঊষর মরুভূমির মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙো। তিনিই একমাত্র করুণা করতে পারেন। আমি তোমাদের সব গুণাহ ক্ষমার চোখে দেখেছি। তিনিও তোমাদের সব গুস্তাকী মাফ করে দেবেন। আজ থেকে তোমরা আমার শুধু সহোদর ভাই নও, পরম প্রিয় বন্ধুও হলে। তোমাদের কোনও ভয় নাই। আমার কাছে নির্ভয়ে থাকো। এই দেখো, আমার হাতে এক অলৌকিক যাদু আংটি আছে। এরই জোরে আজ সুলতানের কারাগার থেকে তোমাদের উদ্ধার করে এনেছি। এর অলৌকিক ক্ষমতায় তামাম দুনিয়া আমার হাতের মুঠোয় আনতে পারি। সুতরাং অন্য কাউকে পরোয়া করার দরকার নাই। কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের।

দুই ভাই আকুল হয়ে যুদরকে জড়িয়ে ধরে বলে, যা করেছি, তা করেছি। সব অপরাধ ক্ষমা কর ভাই। এরপর যদি কখনও আবার সে-রকম কোনও ব্যবহার করি তুমি আমাদের কঠোর শাস্তি দিও।

যুদর বলে, ওসব কথা থাক, এখন বল তো ঐ সুলতান তোমাদের কী ধরনের সাজা দিয়েছে?

সুলতান থলে দুটো কেড়ে নিয়ে কী অমানুষিক প্রহার করে কীভাবে তাদের এক দোজকখানায় কয়েদ করে রেখে দিয়েছিল তার মর্মন্তুদ কাহিনী যুদরকে শোনালো তারা।

যুদর হাতের আংটি ঘষতেই বজ্রদানব এসে দাঁড়ালো।

—সুলতানের কোষাগার থেকে আমার থলে দুটো উদ্ধার করে নিয়ে এস। আর সেই সঙ্গে কোষাগারের সব ধনরত্নও সাফ করে নিয়ে আসবে।

—জো হুকুম, মালিক।

বজ্রদানব অদৃশ্য হয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে যুদরের থলে দুটো নিয়ে এসে বললো, এই নিন, মালিক।

শুধু মাত্র যাদু-থলেটা নিজের কাছে রেখে হীরে জহরতের থলেটা এবং সুলতানের কোষাগারের সোনা-দানা টাকা-পয়সা সব মায়ের হেপাজতে রেখে দিল যুদর। তারপর বজ্রদানবকে বললো, আজ রাতের মধ্যে আমার জন্য একখানা বিশাল প্রাসাদ বানিয়ে দাও। প্রাসাদের বাইরেটা সোনা দিয়ে বাঁধানো থাকবে। ভেতরে ঢুকলে মনে হবে বেহেস্ত। সারা দুনিয়ার সেরা হওয়া চাই।

বজ্রদানব বললো, আজ রাতেই আমি বানিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে

আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন মালিক, কেমন হলো। এমন প্রাসাদ বানিয়ে দেবো তামাম দুনিয়ায় তার জুড়ি খুঁজে পাবেন না।

—আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পারো।

বজ্রদানব অদৃশ্য হয়ে গেল। যুদর তার দুই ভাই এবং মাকে নিয়ে নানা রকম সুগন্ধী মুখরোচক খানাপিনা খেয়ে শুয়ে পড়লো।

সকাল বেলায় বজ্রদানব এসে বললো, আপনার প্রাসাদ তৈরি, মালিক। আপনি চলুন দেখবেন।

যুদর দুই ভাই এবং মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন অনিন্দ্য-সুন্দর শিল্প-সৌন্দর্য কোন বাসগৃহের হতে পারে, সে কল্পনাও করেনি। অথচ এই চমৎকার প্রাসাদটির জন্য তার এক পয়সাও খরচ হয়নি।

মা জিজ্ঞেস করলো, বাবা, এখন থেকে তুই এখানেই থাকবি ?

যুদর বলে, শুধু আমি কেন, তোমরা সকলেই বাস করবে এখানে।

বজ্রদানবকে ডেকে সে বললো, চল্লিশজন সুন্দর সুঠামদেহী বান্দা, আর চল্লিশটি নিগ্রো আর সুন্দরী বাঁদী চাই, চল্লিশটি খোজাও আমার লাগবে।

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রদানব অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এল ঐ সব দাস-দাসীদের সঙ্গে নিয়ে। এক এক করে প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা করে দেখল যুদর। সবগুলোই বড় চমৎকার।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো বিরাশিতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

যুদর বললো, এই দাসী ও বাঁদীদের জন্য সুন্দর সুন্দর সাজপোশাক এনে দাও এবং আমার দুই ভাই, মা ও আমার নিজের জন্য নিয়ে এস এর চেয়ে জমকালো বাদশাহী সাজপোশাক।

বজ্রদানব মুহূর্তের মধ্যেই এনে হাজির করলো যথা-নির্দেশিত পোশাক-আশাক। যুদর শাহেনশাহর সাজে সেজেগুজে সোনার মসনদে গিয়ে বসলো।

সকাল বেলায় সুলতানের খাজাঞ্চী কিছু অর্থ বের করবার জন্য কোষাগার খুলতেই ভয়ে শিউরে ওঠে, একী সর্বনাশা কাণ্ড। সুলতানের ধনাগারে একটা কানাকড়িও নাই ?

সুলতান সমীপে ছুটে গিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে জানালো, ধর্মাবতার, আজ রাতে ধনাগারের সব সম্পদ চুরি হয়ে গেছে।

সুলতান গর্জে ওঠে, পাজি শয়তান, তোমাকে কোষাগারের ভার দিয়েছি, এই কথা শোনার জন্য ? এত কড়া পাহারা, চুরি কী করে সম্ভব ?

খাজাঞ্চী বলে, আমি এইসব ভূতুড়ে কাণ্ডের কিছুই বুঝতে পারছি না, হুজুর। খাজাঞ্চীখানার দরজা যেমন বন্ধ করেছিলাম তেমনি বন্ধ ছিল। আমি ভালো করে দেখেছি, কোনও সিঁদ-ফিঁদ কাটেনি কেউ। কিন্তু আশ্চর্য,

ঘরে একটা ফুটোও নাই।

—আমি তোমার গর্দান নেব। এসব তাহলে, তোমার নিজেরই কাজ। যুদরের ঐ দুই থলে? সে দুটোও গেছে?

খাজাঞ্চী মাথা নত করে বলে, হ্যাঁ জাঁহাপনা। সেগুলোও নাই।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে বলে, চল, আমি নিজের চোখে দেখবো।

ধনাগারে প্রবেশ করে তিনি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন সব। না, বাইরের কোনও লোক ভিতরে ঢোকেনি, ঢোকা সম্ভবও না। তবে? তবে কী করে সব উধাও হয়ে গেল রাতারাতি? কার ঘাড়ে দুটো মাথা, এতবড় দুঃসাহসের কর্ম করবে? ভেবে কোনও কূল-কিনারা করতে পারে না সে।

দরবারের উজির, দেওয়ান, আমির আমাত্য সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে শিউরে ওঠে। একী সর্বনাশ? সারা দরবার-মহলে কবরের নীরবতা নেমে আসে। কারো মুখে কোনও কথা নাই—চোখে কেবল আতঙ্ক, আর অনন্ত জিজ্ঞাসা।

এই সময় কারাগার-রক্ষী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়, জাঁহাপনা আমি সারারাত অতন্দ্র প্রহরায় ছিলাম। কারাগারের লৌহকপাট অটুট অক্ষুণ্ণই আছে। কিন্তু সলিম সালিমকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সব দরজা জানালা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, কোথাও একটা ফুটোও নাই। অথচ ওরা পালিয়েছে।

সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে, অপদার্থ! আমি সব্বাইকে আজ শূলে চড়াবো।

কারাগার-রক্ষী বললো, জাঁহাপনা অভয় দেন তো একটা কথা বলি!

—ভণিতা ছাড়ো, যা বলার তাড়াতাড়ি বল।

রক্ষী বলে, আমি দরবারে আসার সময় দেখলাম, বড় ময়দানের ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ—

ঐ নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও সকলের মুখে অবিশ্বাসের মুচকি হাসি ফুটে ওঠে।

সুলতান বলে, সারারাত ধরে গাঁজা-ভাঙ্গ টেনেছ, দেখছি—

—না জাঁহাপনা। অবিশ্বাসের কথাই বটে, একটা রাতের মধ্যে অত বড় পেল্লাই প্রাসাদ কেউ বানাতে পারে এ কথা তো নিজের চোখে না দেখলে মানা যায় না। তাই বান্দার আর্জি, ধর্মাবতার, আপনি নিজে একবার দেখে আসুন। তারপর আমার কথা মিথ্যে হলে যা খুশি সাজা দেবেন।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। উজিরকে উদ্দেশ্য করে সুলতান বলে, যাও তো, একবার সরজমিনে দেখে এসো, ব্যাপারখানা কী!

কিছুক্ষণ পরে উজির এসে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা। এমন অলৌকিক প্রাসাদ কোনও সুলতান বাদশাহর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। শুনলাম, এক উমরের পুত্র যুদর বানিয়েছে এই হর্ম্যমালা। কত লক্ষ কোটি মুদ্রা ব্যয় করলে এবং কত শতসহস্র মিস্ত্রি মজুর কত বছর ধরে কাজ করলে এই সুরম্য ইমারত বানানো সম্ভব তা হিসেব করা যায় না। কিন্তু জাঁহাপনা, শুনে অবাক হবেন, এই সবই সংঘটিত হয়েছে মাত্র একটি রাতের মধ্যে। গতকাল বিকালেও আমি ঐ ময়দানের পাশ দিয়ে চলে

গিয়েছি। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ এখন দেখলাম, প্রায় সারা ময়দান জুড়ে দাঁড়িয়ে এক বিশাল প্রাসাদ! একী ভুতুড়ে কাণ্ড, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা।

সুলতান চিন্তিত মুখে বললো, একই রাতে তিন তিনটি বিস্ময়কর কাণ্ড! খাজাঞ্চীখানা সাফ, কারাগারের কয়েদী হাওয়া আর ফাঁকা মাঠে এই ইমারত— এ সবগুলো কী বিচ্ছিন্ন ব্যাপার উজির?

উজির বললো, আমিও সেই কথাই ভাবছি। এইসব আজগুবি কাণ্ড-কারখানার মধ্যে নিশ্চয়ই এক যোগসূত্র আছে। শুনেছি, উমরের পুত্র বিদেশ সফর করে গতকাল ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় এসবই তার কারসাজী।

সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়ে, কী, এত বড় দুঃসাহস। উজির, তুমি এক্ষুণি চল্লিশজনের এক সিপাইবাহিনী পাঠাও। ধরে নিয়ে আসুক ওকে। আমি সদর রাস্তায় ফাঁসীতে ঝুলাবো শয়তানকে।

সুলতানের আদেশে শহরের কোতোয়াল তার বিশাল সিপাইবাহিনী নিয়ে দরবারে এসে হাজির হলো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তিরাশিতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে:

উত্তেজিত সুলতানকে উজির শান্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়। মহামান্য ধর্মাবতার, আপনি রাগ প্রশমিত করে ভালোভাবে ব্যাপারটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। যে মানুষ এক রাতে এত বড় ইমারত বানাতে পারে, সে নিশ্চয়ই তুচ্ছ সাধারণ শক্তির অধিকারী নয়। তার প্রতি আপনি কঠোর আচরণ প্রদর্শন করবেন না। আমার মনে হয়, তাতে কোনও সুরাহা হবে না।

—তুমি কী বলতে চাও, উজির?

উজির বলে, আপনি এখন ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত। প্রথমে নিজেকে শান্ত করুন। তারপর আপনা থেকেই সব বুঝতে পারবেন। যুদর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। কী সে ক্ষমতা, প্রথমে সেটা জানা দরকার।

সুলতান বলে, ওসব ভেল্কি-বাজি দেখিয়ে আমার কাছে কোনও সুবিধে হবে না, উজির। এক্ষুণি তাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে ওর সব ফেরেব-বাজী খতম করে দেব!

উজির দেখলো, সুলতান ক্রোধে দিশাহারা, এখন কোনও ভালো পরামর্শ তার কানে ঢুকবে না। তাই সে তাকে একটু অন্যভাবে মোচড় দেওয়ার মতলব আঁটলো।

—জাঁহাপনা, আমার একটা কথা শুনবেন?

—বল। তোমার কথা শুনে শুনেই তো আজ আমার এই হাল। তবুও বল দেখি, শুনি।

—শত্রুর শক্তির পরিমাণ না জেনে তাকে নিধন করার চেষ্টা করতে নাই।

তাতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। এ হচ্ছে সমর-নীতি। একথা আপনি মানেন তো?

— আলবত। কিন্তু আমার নগণ্য এক প্রজা কী আমার সমকক্ষ শত্রু হতে পারে?

উজির বলে, আপাত-ভাবে যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তাকে আর নগণ্য প্রজামাত্র বলা বোধহয় সঙ্গত হবে না, জাঁহাপনা। নিশ্চয়ই সে কোনও অপার্থিব ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। কী সে ক্ষমতা—সেইটেও আপনাকে যাচাই করে দেখতে হবে। সেই কারণে আমার ইচ্ছা, আপনি তাকে সম্মানীয় অতিথির মর্যাদা দেবেন, এক ছলনায় আপনার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে পাঠান। সে আসুক। তাকে পর্যবেক্ষণ করুন। তারপর যদি বোঝা যায়, সে আপনার তাঁবে থাকতে চাইবে না, আর কোনও দ্বিধা না করে সেই ভোজসভাতেই তাকে সাবাড় করে দেবেন। শত্রুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের কব্জায় আনতে হয় প্রথমে। তা না হলে তাকে জব্দ করবেন কী করে?

উজিরের কথাগুলো সুলতানের মনে ধরে, হুঁ, মগজে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি এখনও কিছু আছে দেখছি। তা, মন্দ বলনি। ঠিক আছে, তুমি আমার বিচক্ষণ আমির উথমানকে দৌত্য করতে পাঠাও তার কাছে। আজ রাতে আমার প্রাসাদে এক খানাপিনার আয়োজন কর, সেই ভোজসভায় আমি মোলাকাত করবো যুদরের সঙ্গে। কিন্তু উজির, আমির উথমানকে একা পাঠাবে না। সঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চাশজন সিপাই-সান্ত্রী দেবে। দরকার হলে, ও আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে, সে যাতে ওকে বলপ্রয়োগ করে ধরে আনতে পারে, সেজন্য তার সঙ্গে যথেষ্ট সশস্ত্র প্রহরী থাকা দরকার। যে ভাবেই হোক, যুদরকে ধরে আনতেই হবে।

সুলতানের এই আমিরটি সব সময় নিজেকে একজন বিচক্ষণ—বুদ্ধিমান মানুষ বলে জাহির করতো। আসলে সে একটা গবেট। মাথা মোটা লোক।

যুদরের প্রাসাদে এসে সে দেখে, প্রধান ফটকের সামনে বসে আছে এক বিকটাকৃতির প্রহরী। উথমান তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মালিককে একবার ডাকো। তার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

কিন্তু প্রহরী কোনও সাড়া দেয় না। এবার সে চিৎকার করে ওঠে, কী, কথা কানে যাচ্ছে না? তোমাদের মালিক কোথায়?

—তিনি প্রাসাদের ভিতরে আছেন।

প্রহরী নির্বিকারভাবে বসে থাকে। উথমান সুলতানের আমির, তাকে গ্রাহ্য করছে না প্রহরীটা। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, তোমাকে না বলছি, তোমার মালিককে ডাকো, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই?

প্রহরী সে কথায়ও কর্ণপাত করলো না। মুখ ফিরিয়েই বসে রইলো। উথমান এবার আর প্রহরীর বেয়াদপি সহ্য করতে পারে না। হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সে তেড়ে যায়।

—এত বড় স্পর্ধা তোর, আমার কথা কানেই তুলছিস না?

এই প্রহরী স্বয়ং বজ্রদানব। সাধারণ এক খোজা সেজে সে সদর পাহারা দিচ্ছিল। উথমানের হম্বিতম্বি দেখে সে এবার উঠে দাঁড়ায়। হাতের ডাণ্ডাটা উঁচিয়ে ধরে আমিরের প্রহারোদ্যত লাঠিটাকে প্রতিহত করে। এর পর উথমান মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বজ্রদানব তাকে ডাণ্ডা দিয়ে প্রহার করে মাটিতে শুইয়ে দেয়।

এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমিরের পঞ্চাশজন সিপাই তলোয়ার বের করে তেড়ে আসে।

বজ্রদানব গর্জে ওঠে, তবে রে, তলোয়ার খুলেছ? দাড়াও মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি।

পলকের মধ্যে প্রলয়-কাণ্ড ঘটে গেল। বজ্রদানব যাদু-বলে সিপাইদের ধরাশায়ী করে দিল। পটাপট পঞ্চাশখানা তলোয়ার এসে পঞ্চাশজনের পেটের মধ্যে গেঁথে গেল। বিষম আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো সকলে। রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগলো সেখানে।

এই সংবাদ যখন সুলতানের কাছে পৌঁছল, নিদারুণ ক্রোধে ফেটে পড়লো সে। উজিরকে হুকুম করলো, এক্ষুণি একশো সিপাই পাঠাও!

সুলতানের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ একশো সিপাই-এর এক সশস্ত্র-বাহিনী পাঠানো হলো। কিন্তু বজ্রদানবের দাপটে তারাও নিমেষে ধরাশায়ী হয়ে পড়লো।

সুলতানের হুকুমে আরও দুশো সিপাই গেল। কিন্তু বজ্রদানবের কাছে এসব নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার। এক লহমাতে সে দুশো সিপাইকেই নিধন করে ফেলে।

এরপর সুলতান ক্ষেপে উঠলো। উজিরকে বললো, পাঁচশো সেনা নিয়ে তুমি আক্রমণ কর ঐ প্রাসাদ। ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে আসবে।

উজির বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু জাঁহাপনা, আমার কোনও সিপাই-সেনার দরকার নাই। আমি একাই খালি হাতে যাবো তার কাছে।

সুলতান অবাক হয়, একা খালি হাতে যাবে তুমি? কী সাহসে?

উজির বলে, অস্ত্র-সজ্জায় যেখানে কাজ হয় না সেখানে এছাড়া আর কী উপায়, জাঁহাপনা?

উজির এক দরবেশের সাজ-পোশাক পরে রিক্তহস্তে এসে উপস্থিত হলো যুদরের প্রাসাদে। খোজাপ্রহরী-বেশী বজ্রদানবের সামনে গিয়ে বিনয়াবনত হয়ে বললো, সালাম জনাব।

বজ্রদানব উত্তর করে, বলুন নরবর।

নরবর? উজির অবাক হয়ে তাকায় বজ্রদানবের দিকে। উজিরকে সে 'নরবর' সম্বোধন করলো কেন? তবে প্রহরীর ছদ্মবেশে সে কোন দৈত্যদানব? মানুষ নয়? ভয়ে আতঙ্কে সে শিউরে উঠলো। তার হাত পা ঠক-ঠক করে কাঁপতে থাকলো।

—আমাদের মালিক—যুদর সাহেব কী ভিতরে আছেন?

বজ্রদানব বলে, জী হ্যাঁ। প্রাসাদেই আছেন।

উজির বলে, মেহেরবানী করে আমাকে একবার ভিতরে নিয়ে চলুন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে চাই। আমাদের সুলতান সামস্ অল দুলাহ আজ রাতে তাঁর সম্মানে এক ভোজ-সভার আয়োজন করেছেন। সুলতানের হয়ে আমি ওঁকে নেমন্তন্ন জানাতে এসেছি। যদি উনি অনুগ্রহ করে আজকের সন্ধ্যাটা আমাদের সুলতানের সঙ্গে কাটান, তিনি ধন্য হবেন।

বজ্রদানব বললো, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি মালিককে খবর দিচ্ছি।

এই সময় রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চুরাশিতম রজনীতে

আবার সে গল্প শুরু করে :

উজিরকে বাইরে বসিয়ে রেখে বজ্রদানব প্রাসাদের অন্দরে প্রবেশ করে যুদরকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, মালিক, সুলতান প্রথমে এক উদ্ধত আমিরকে পাঠিয়েছিল। আমি তাকে প্রহার করেছি। এতে তার পঞ্চাশজন সিপাই আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে আমি তাদের খতম করি। এর পর সুলতান একশো সিপাই-এর একটা বাহিনী পাঠিয়েছিল আমাকে তথা আপনাকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু তাদেরও আমি কোতল করে ফেলি। তারপর সে দুশো সেনার এক বাহিনী পাঠায়। তারাও আমার হাতে নিধন হয়! এর পর এখন সুলতানের উজির এসেছে। তার সঙ্গে কোনও সৈন্য-সামন্ত নাই। একাই এসেছে সে। সুলতান আপনার সঙ্গে ভেট করতে চায়। আজ রাতে আপনার সম্মানে সে এক ভোজসভার আয়োজন করেছে। সুলতানের তরফ থেকে তারই আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে এই উজির। এখন আপনি যা বলবেন, আমি সেই মতো করবো।

যুদর মণিমাণিক্য-খচিত এক স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন ছিল। তার পায়ের তলায় ছিল এক দুষ্প্রাপ্য গালিচা। মাথার ওপরে হাজারো মোমের ঝাড়বাতি। বাঁদীরা চামর দোলাচ্ছিল। একটি ফুটন্ত গোলাপের বাস আঘ্রাণ করতে করতে সে বললো, উজিরকে নিয়ে এস।

বাদশাহী কেতায় কুর্নিশ জানিয়ে এসে দাঁড়ালো উজির।

—মহামান্য মালিক, আপনার দোস্ত আমাদের সুলতান আজ রাতে তাঁর প্রাসাদে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনি যদি মেহেরবানী করে যান, তিনি কৃতার্থ হবেন।

যুদর বলে, তিনি যখন আমার দোস্ত, তাহলে তো আর কোনও কথাই নাই। আপনি গিয়ে তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানান। বলুন, আমার দরজা সুলতানের জন্য সর্বদা খোলা আছে। আজ রাতের ভোজ-সভার আয়োজন আমিই করবো আমার এই প্রাসাদে। তিনি যদি আসেন, ধন্য হবো আমি।

আংটিটা ঘষতেই বজ্রদানব এসে দাঁড়ায়। যুদর বলে, উজির সাহেবকে

বাদশাহী সাজ-পোশাক উপহার দাও।

পলকের মধ্যে বজ্রদানব এক জমকালো সাজ-পোশাক এনে উজিরের হাতে তুলে দেয়। যুদর বলে, আপনি পরুন। সুলতানের কাছে গিয়ে এখানে যা দেখে গেলেন, তাঁকে বলবেন।

উজির সেই মহামূল্যবান সাজ-পোশাক পরে যুদরের সামনে দাঁড়ায়। এমন পোশাক সে এই প্রথম চোখে দেখলো।

প্রাসাদে ফিরে এসে সুলতানকে উজির বলে, জাঁহাপনা, যুদর আপনাকেই নিমন্ত্রণ করেছে। আজ রাতে সে আপনাকে ভোজসভায় আপ্যায়ন করবে।

সুলতান বলে, ঠিক আছে, আমার এক সৈন্যবাহিনী সংগে নিয়ে আজ যাবো তার ভোজসভায়।

বজ্রদানব যুদরকে সংবাদ দিল, মালিক, সুলতান তার লোক-লস্কর, সিপাই-সেনাপতি সংগে করে আজ আপনার ভোজসভায় আসছে!

যুদর বলে, ঠিক আছে। তুমিও তোমার লোকজনকে এনে আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সারিবন্ধভাবে দাঁড় করাও। দেখেই যাতে সুলতানের হৃদকম্প ধরে যায়—সেইভাবে জাঁদরেল পালোয়ানদের নিয়ে এসে ভরে ফেল।

সুলতান ফটকে প্রবেশ করতেই দেখতে পায়, দুইদিকে সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' যোদ্ধা। একই বেশে, একই অস্ত্রে সুসজ্জিত সকলে! ভয়ে বুক শুকিয়ে যায় তার।

যুদর সিংহাসনে বসে তন্ময় হয়ে কী যেন চিন্তা করছিল। সুলতান তাকে সালাম জানালো। কিন্তু তখনও সে একমনে কী যেন ভাবছেই। সুলতানের উপস্থিতি সে গ্রাহ্যই করলো না। একবার তাকে বসতেও বললো না সে। সুলতান ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো—অনেকক্ষণ। দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকলো সে। এই অবস্থায় কী করা উচিত। কীই বা করতে পারে সে কিছুই বোধগম্য হলো না।

অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে যুদর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্নবাণ ছুঁড়লো।

—দুটি নির্দোষ যুবকের ওপর নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে হাজতের অন্ধকার-কক্ষে রুদ্ধ করে রেখে কী আপনি খুব বীরপুরুষের কাজ করে-ছিলেন? অন্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিজের ধনাগার ভরানোই বুঝি আপনার একমাত্র পেশা?

সুলতান করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, না জেনে যা অপরাধ করেছি তার জন্য

আমি অনুতপ্ত, মালিক। আপনি নিজগুণে ক্ষমা করে নিন। আমার অহঙ্কার এবং লোভই আমাকে এই খারাপ কাজ করিয়েছিল। আপনি মহানুভব, আমি ক্ষমাপ্রার্থী এক অপরাধী। তা দুনিয়াতে অপরাধ আছে বলেই তো ক্ষমার এত কদর।

এইভাবে নানা সার-গর্ভ বক্তৃতা দিয়ে যুদরকে সে খুশি করার চেষ্টা করে।

যুদর বলে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আসুন, আমার পাশে বসুন।

এরপর যুদর তার দুই ভাইকে ডেকে বলে, এবার আমাদের খানাপিনার ব্যবস্থা কর। এখানকার সুলতান আজ আমাদের অতিথি। এঁকে প্রসন্ন করাই এখন একমাত্র কাজ। দেখো, ব্যবস্থার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ভালো ভালো খাবার দাবার-এর আয়োজন কর। যেন কোনও নিন্দা না হয়।

দুই ভাই নিজ হাতে কাপড় বিছিয়ে দিল। যাদু-থলেব দৌলতে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য খানাপিনায় সুলতানকে পরিতৃপ্ত করলো যুদর। সুলতান খুশি হয়ে প্রাসাদে ফিরে গেল!

সেদিন ফিরে গেল, কিন্তু পরদিন আবার এল। তারপর দিনও। প্রতিদিনই যুদর সুলতানকে নতুন নতুন কায়দায় আদর অভ্যর্থনা জানাতে থাকলো! এক খানা সে দুদিন খেতে দেয় না তাকে। এক সাজ-পোশাক দ্বিতীয় দিন পরে না কেউ। প্রতিদিনই সুলতান যুদরের প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখে, সারা প্রাসাদটা আগাগোড়া নতুন সাজে সাজানো হয়েছে। গতকালের সাজ-সরঞ্জাম, গালিচা পর্দা আসবাব আবরণ আজ দেখা যায় না। আজকের গুলো আবার অদৃশ্য হয়ে যায় আগামীকাল। যুদরের সহৃদয় প্রীতি ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারে না সুলতান। প্রতিদিন সে নিয়ম করে আসতে থাকে তার প্রাসাদে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সুলতান উজিরকে বললো, যুদর যেভাবে দোস্তি করছে; শঙ্কা হয়, কোন্ দিন না সে আমাকে হত্যা করে আমার মসনদ অধিকার করে বসে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁচাশিতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে :

উজির বলে, আপনার আশঙ্কা অমূলক জাঁহাপনা। কারণ যুদর এমন সম্পদের মালিক যার কাছে আপনার এই সলতানিয়ৎ নিতান্তই নগণ্য। আপনার মসনদের ওপর তার কোনও লোভ হতে পারে না। তার মতো বিত্ত ও ক্ষমতাবান মানুষ তামাম দুনিয়ায় কেউ নাই! সে আপনার সম্পদে কোনও লোভ দেখাবে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আপনার মনে যদি ঐ আশঙ্কাই বাসা বেঁধে থাকে, তা হলে বলবো,আপনি তাকে অন্য ফাঁদে বেঁধে ফেলুন।

—কী রকম?

উজির বলে, আপনার একমাত্র কন্যা আসিয়াহ আপনার মসনদের ভাবী

উত্তরাধিকারিণী। যুদরকে আপনি জামাতা করে নিন। আসিয়াহর সংগে শাদী হলে সে আপনার প্রাণাধিক পুত্রসম আপনজন হবে। সুতরাং মনেও আর কোনও ডর থাকবে না।

সুলতান নতুন আলোর রোশনাই দেখতে পায়। বলে, কিন্তু কী ভাবে প্রস্তাবটা উত্থাপন করা যায়?

উজির বললো, আজ রাতে আপনিই যুদরকে আপনার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করুন এবং সেই ভোজ-সভাতে আসিয়াহকে উপস্থিত রাখুন। তারপর, আসিয়াহ মা-এর যা রূপ-যৌবন, আপনাকে আর মুখ ফুটে কোনও প্রস্তাব দিতে হবে না। সব আপসে সমাধা হয়ে যাবে, দেখবেন। আপনার কন্যা আপনার এবং যুদরের বিশাল বৈভবের একমাত্র মালিক হতে পারবে।

সেইদিন রাতেই যুদরকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলো সুলতান। ভোজ-সভায় আসিয়াহকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় যুদর। উজিরকে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি তো অসাধারণ সুন্দরী, উজির সাহেব। কার মেয়ে?

উজির বলে, আপনার দোস্ত—সুলতানের মেয়ে।

যুদর বলে, আমি ওকে শাদী করতে চাই। আপনি সুলতানকে আমার হয়ে প্রস্তাব করুন। তিনি যা দেনমোহর চান, আমি দেব।

উজির সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, আপনার কন্যা আসিয়াহকে শাদী করতে চাইছেন যুদর সাহেব। আপনি যা দেনমোহর চান, তিনি দেবেন।

সুলতান বললো, এতো আমার পরম সৌভাগ্য। আর দেনমোহর? ও নিয়ে আমার কোন দাবি-দাওয়া নাই। আমি জানি, যুদর সাহেব স্বেচ্ছায় যা দেবেন, আমার আকাঙ্ক্ষার চাইতে তা অনেক বেশি। তিনি যে মেহেরবানী করে আমার কন্যাকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তাতেই আমি ধন্য।

সেইদিনই কাজীকে ডাকা হলো। বিরাট জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে যুদর-এর সংগে আসিয়াহর শাদী সমাধা হয়ে গেল।

এর পর বহুদিন ধরে যুদর আসিয়াহকে নিয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিল। অবশেষে একদিন সুলতান দেহ রাখলো। উজির আমির প্রজাবৃন্দেরা যুদরকে সুলতান হতে অনুরোধ জানালো। যুদর প্রথমে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে মসনদে বসলো।

সুলতান হয়েই প্রথমে সে মৃত সুলতান সামস্ অল দুলাহর সমাধির ওপর বিরাট একটা মসজিদ বানালো। এই কবর এবং মসজিদটি বুনদাকানিয়াহ অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল। পরে এই অঞ্চলটি জুনারিয়াহ নামে পরিচিত হয়।

যুদর তার দুই ভাই সলিম সালিমকে দরবারের দুই উজির পদে বহাল করেছিল।

এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেল। কিন্তু তার বেশি নয়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ছিয়াশিতম রজনীতে

আবার সে গল্প বলতে শুরু করে ঃ

একদিন সালিমকে সলিম বলে, এইভাবে ছোট ভাই-এর গোলামী আর কতকাল করবে ?

সালিম বলে, কিন্তু যুদরের হাতে যতক্ষণ ঐ আংটি আছে—ওকে তো কিছুতেই কাবু করা যাবে না ! তুমিই একটা ফন্দী-ফিকির বের করতে পারো। কারণ আমার চাইতে বদবুদ্ধি তোমার অনেক বেশি।

সলিম বললো, শোন, আগেই বলে নিচ্ছি। আমি যুদরকে হত্যা করে ওর হাতের আংটি আর ওই যাদু-থলে কব্জাগত করবো। কিন্তু একটা কথা, আমি হবো সুলতান, আর তুমি হবে আমার প্রধান উজির ? কী, রাজি ? অবশ্য ঐ আংটি আর যাদু-থলে, তোমার যখন প্রয়োজন হবে, ব্যবহার করতে পারবে তুমি।

সালিম বললো, আমি রাজি।

সেইদিন রাতেই সলিম খাবারের মধ্যে জহর মিশিয়ে দিয়ে যুদরকে হত্যা করে সেই আংটি আর যাদু-থলেটা হাতিয়ে নিল।

আংটিটা ঘষতেই বজ্রদানব এসে দাঁড়ালো সলিমের সামনে।

—বান্দা হাজির হুজুর, হুকুম করুন, কী করতে হবে।

—আমার ভাই সালিমকে হত্যা কর। এক্ষুনি।

বজ্রদানব হুকুমের বান্দা। শমরদলের ঐ আংটি যার হাতে থাকবে তার আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য। তা সে-কাজ ভালোই হোক বা খারাপই হোক। তৎক্ষণাৎ সে সালিমকে গলা টিপে হত্যা করলো।

তারপর সলিম বজ্রদানবকে বললো, যুদর আর সালিমের এই শবদেহ দুটি প্রধান সেনাপতির হাতে দিয়ে বল, এদের দুজনেরই ইন্তেকাল হয়েছে। যথা-বিহিত সামরিক মর্যাদায় এদের সমাধিস্থ করতে হবে।

সেই সময় প্রধান সেনাপতি তার দলবল নিয়ে এক ভোজ-সভায় আমোদ-আহ্লাদ করছিল। আফ্রিদি দানব যুদর আর সালিমের নিষ্প্রাণ দেহ দুটি এনে তার সামনে রাখতেই সে হায় হায় করে উঠলো। মুহূর্তে খানা-পিনা নাচ-গান হৈ-হল্লা সব স্তব্ধ হয়ে গেল। সেনা অধ্যক্ষ ক্রোধে ফেটে পড়লো, কে, কে এই নৃশংস কাজ করলো ?

—আমি, হঠাৎ নাটকীয়ভাবে সলিম প্রবেশ করলো সেখানে, আমি হত্যা করেছি আমার এই দুই ভাইকে। পথের কাঁটা সরিয়েছি। এখন কানুন মতো আমিই মসনদের একমাত্র দাবিদার এবং মালিক। আমাকে তোমরা যদি নির্বিবাদে সুলতান বলে মেনে নাও তা হলে কোনই গোল থাকে না। আর তা যদি না কর, তবে আমাকেও আমার পথ দেখতে হবে। এই যে দেখছো যুদরের হাতের আংটি—এটা এখন আমার হাতে! সুতরাং বুঝতেই পারছো, পৃথিবী পদানত করার ক্ষমতাও আমার মুঠির মধ্যে।

প্রধান সেনাপতি বুঝলো, কোনও উপায় নাই। প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ মানেই

মৃত্যু। বললো, আমরা আপনাকে সুলতান বলে মেনে নিচ্ছি, জাঁহাপনা।

সলিম বললো, আজ রাতেই আমি যুদরের বিধবা পত্নী আসিয়াহকে শাদী করবো। তার আয়োজন কর।

আমিররা বললো, একশোবার, আপনি তাকে শাদী করতে পারেন। কিন্তু বিধিমতো আপনাকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হয়।

—গুলি মারো, তোমাদের বিধি-প্রথায়। আমি আজই শাদী করবো তাকে।

সেই রাতেই আসিয়াহকে শাদী করলো সলিম। রাত্রি গভীর হতে না হতে সে আসিয়াহর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। শাদীর প্রথম রাতে সে তার এতকালের প্রলুব্ধ কাম চরিতার্থ করবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতাশিতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে।

বিধবা আসিয়াহ নতুন শাদীর সাজ পরে সলিমকে স্বাগত জানায়। দরজা বন্ধ করেই সলিম আসিয়াহকে আলিঙ্গন তথা চুম্বন করতে উদ্যত হয়। আসিয়াহ বলে, আহা, অত তাড়া কিসের! আমি তো সারা জীবনের মতো তোমার বাঁদী হয়ে গেলাম। আর আজকের রাতটাও অনেক বাকী। এসো, বসো, আমি তোমায় শরাব ঢেলে দিচ্ছি, খাও, মৌজ কর। তা না হলে জমবে কেন?

সলিম ভাবে, তাইতো। আসিয়াহ ঠিকই বলেছে। তাড়াহুড়ার কী আছে। সে তো এখন থেকে চিরজীবনের মতো তার হারেমের বেগম।

পালঙ্কের এক পাশে গিয়ে বসে সে। পেয়ালায় পূর্ণ করা ছিল শরাব। আসিয়াহ অপূর্ব লাস্যময়ী ভঙ্গীতে পেয়ালাটা এগিয়ে দেয় সলিমের সামনে। এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলে সলিম।

ব্যস! মুহূর্তে মধ্যেই ঢলে পড়ে তার দেহ। সোনার বর্ণ মুখখানা জহরে নীল হয়ে যায়।

আসিয়াহ দরজা খুলে খোজাকে বলে, আমির সেনাপতিদের ডাকো।

তাদের সকলের সামনে আসিয়াহ সেই আংটিটা হাতুড়ির ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এবং থলেটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বলে, যত পাপ যত অশান্তির মূলে ছিল এরা। আমি সব শেষ করে দিলাম। এবার আপনারা মসনদের নতুন সুলতানের সন্ধান করুন···

শাহরাজাদ থামলো! কারো মুখে কোন কথা নাই। একটু পরে শাহরাজাদ বললো, এই হলো যুদর, তার ভাই, সেই থলে আর আংটির কাহিনী। এর পর আপনাকে অন্য কাহিনী শোনাবো, জাঁহাপনা।

দুনিয়াজাদ আনন্দে জড়িয়ে ধরে দিদিকে, কী চমৎকার কাহিনী দিদি আর কী মিষ্টি করেই না তুমি বলতে পার?

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা, এবার আপনাকে আবু কাইর আর আবু শাইর-এর মজাদার কাহিনী শোনাচ্ছি ঃ

এক সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে আবুকাইর নামে এক রজক আর আবু-শাইর নামে এক নাপিত বাস করতো। দুজনেরই শহরে দোকান ছিল।

আবু কাইর-এর মতো পাজি বদমাইশ আর দুটি ছিল না। চোখে মুখে সে মিথ্যে কথা বলতো। তার মতো অসৎ শঠ প্রবঞ্চক সে শহরে আর কেউ ছিল না। তার কুখ্যাতি ও কুকীর্তির নানা কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতো। লোকটা নানা ছল চাতুরী করে লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করতো। কেউ তার কাছে জামা কাপড় রং করতে এলে ধোঁকা দিয়ে পুরো টাকা আগাম নিয়ে নিত সে। বলতো, বাজারে রং পাওয়া যাচ্ছে না। চড়া দামে নগদে রং কিনতে হবে। লোকে বিশ্বাস করে অগ্রিম দিয়ে যেত। কিন্তু আবু কাইর সেই টাকা দিয়ে ভালো ভালো খানা-পিনা এনে স্ফূর্তি করে খেত। কিন্তু খদ্দেরকে মাল তৈরি করে দিত না। আগাম টাকাটাই আত্মসাৎ করে ক্ষান্ত হতো না, তাদের জামা কাপড়ও বেচে দিত। এইভাবে হাজার হাজার লোককে সে ঠকাতো। বেচারা খদ্দেররা দিনের পর দিন ফিরে যেত। রোজই লোকটা নতুন নতুন ছল করে তাদের ধোঁকা দিয়ে ফেরাতো। কাউকে বলতো, 'আমার বিবির বড় বিমার, কদিন কাজে একদম হাত দিতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না, দিন দুই পরে আসবেন।' দুদিন বাদে এসে তারা আবার এক নতুন কথা শুনে। 'আর বলবেন না, গতকাল থেকে এমনভাবে পেট ছেড়ে দিয়েছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারছি না। কথা দিচ্ছি, দিন কয়েকের মধ্যেই আপনার পোশাক রং করে দেব।' খদ্দের ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যায়। মুখে কিছু বলতে পারে না। মানুষের শরীর খারাপ হতেই পারে। কিন্তু তারা তো জানে না যে, পোশাক অনেক আগেই সে বেমালুম বেচে দিয়েছে।

এইভাবে দিনের পর দিন প্রতিটি নিরীহ খদ্দেরকে নানা ছল ছুতোয় ঘোরাতে থাকে। কিন্তু এমনভাবে বেশিদিন চললো না। একদিন একজন ফেটে পড়লো, সাফ সাফ সত্যি কথা বল, আমার কামিজ কোথায়? দিনের পর দিন তুমি আমাকে নানা ছলে ঘোরাচ্ছো। আজ আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না। আগে বের কর আমার কামিজ আর টাকা। তা না হলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, আমি দেখিয়ে দেবো।

আবু কাইর কান্নায় ভেঙে পড়লো, আপনি বিশ্বাস করুন মালিক, সত্যি কথাটা বলবো বলবো করে কিছুতেই আপনার কাছে বলতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন দেখছি, না বলে আর উপায় নাই।

খদ্দেরটি গর্জে ওঠে, ওসব ভণিতা রেখে কি বলতে চাও, বল।

ধোপাটা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, আমি আপনার কাজিমটা রং করে দোকানের বাইরে মেলে দিয়েছিলাম। এমন সুন্দর রং হয়েছিল, আপনাকে কি বলবো, কিন্তু সবই আমার নসীব—বিকাল বেলায় তুলতে গিয়ে দেখি, চুরি গেছে। শুধু আপনারটাই না, ঐ সঙ্গে আরও দুজনের সাজ-পোশাক ছিল—সবই নিয়ে চম্পট দিয়েছে ব্যাটা। এখন আমি কী করি? কী করে আপনাদের বোঝাই। এতে আমার কোনও হাত ছিল না। আর এসব বললেই বা আপনারা শুনবেন কেন বলুন। আপনারা আমার খদ্দের, উচিত মূল্য দিয়ে কাজ করাবেন। ক্ষয় ক্ষতি হলে আপনারা মানবেন কেন?

খদ্দেরটি বলে, কিন্তু তোমার দোকানের সামনে থেকে চুরি যাবে কি করে? কার এত বড় সাহস? তোমার নাকের ডগা থেকে চুরি করে হাওয়া হবে?

—আর বলবেন না সাহেব, আমার পাশেই একটা মহা চোরের ডেরা।

—কে সে?

আর বলবেন না মালিক, এই যে ছুঁচো নাপিতটা—ঐ ব্যাটাই আমার সর্বনাশ করছে। একটু বেসামাল হয়েছি কি রক্ষা নাই। ব্যাটা ওৎ পেতেই থাকে—লোকটা এমন অসৎ ছিঁচকে চোর—একবার যদি বাছাধনকে হাতে-নাতে ধরতে পারি, জন্মের সাধ ঘুচিয়ে দেব।

খদ্দেরটির সব রাগ জল হয়ে যায়। আহা, বেচারা গরীব মানুষ, এত দামী সাজ-পোশাকের খেসারত সে দেবে কি করে? আর কাজীর কাছে মামলা করেই বা ফয়দা কী? ওর দোকানে কী আছে? কী ক্রোক করে নেওয়া যাবে? শুধু-শুধু খাটুনিই সার হবে। সুতরাং মাল আদায়ের আশা ছেড়ে দিয়ে শুকনো সান্ত্বনা দিয়ে সে চলে যায়, দুঃখ করো না দোকানী। পাপের শাস্তি আল্লাহ দেবেন। তোমার ক্ষতিপূরণ তুমি একদিন সুদে আসলে পাবে।

লোক ঠকানোর ব্যবসা আর কত দিন চলে। এইভাবে একদিন তার সব খদ্দের সরে পড়ে। শহরে তার ভীষণ বদনাম, কেউ আর তার ছায়া মাড়ায় না।

রোজগারপাতি একেবারে বন্ধ, দিন আর চলে না। প্রতিবেশি সদাশয় নাপিত দেখলো, লোকটা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। একদিন সে আবু কাইরকে বললো, দেখ ভাই, দেখতে পাচ্ছি, তোমার ব্যবসা একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। এখন খাবে কী? এক কাজ কর, যতদিন না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পার, আমার বাসাতেই খানা-পিনা কর। তারপর যখন সুদিন আসবে, আবার পসার জমবে।

আবু শাইর-এর বদান্যতায় কোনও রকমে জীবন ধারণ করতে থাকে আবু কাইর। কিন্তু নাপিতের ব্যবসাও তেমন কিছু চলে না। তার ওপরে বয়স হয়েছে, তেমন খাটতেও পারে না। দিনকে দিন রুজি-রোজগার কমতেই থাকে। অথচ খরচ বেড়ে গেছে। ঘাড়ের ওপর ধোপার সংসার। নিজে যা খায়, তাদেরও তা খাওয়াতে হয়।

একদিন আবু কাইর বললো, দেখ বন্ধু, আমি বুঝতে পারছি তোমার রোজগার কমে আসছে। এই বাজারে তোমার নিজের সংসার চালিয়ে আমার

সংসারের ভার বয়ে চলা বড় শক্ত। আমি বলি কি, চল আমরা বিদেশে যাই। নতুন কোনও শহরে। হয়তো আল্লাহ মুখ চাইবেন। আমরা আবার নতুন করে দোকান-পাট সাজাবো। এখানকার দোকান তুমি বেচে দাও। চল, ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ি।

আবু শাইর বলে, তা কথাটা মন্দ বলনি, ভাই। এ পোড়া শহরে আমাদের আর কিছু হবে না। তাই চল, অন্য দেশেই চলে যাই।

আবু শাইর দোকান বিক্রি করে দিয়ে বিদেশ যাত্রার তোড়জোড় করতে থাকে। আবুকাইর বলে, কোরাণ ছুঁয়ে হলফ করছি, আজ থেকে তুমি আমার ভাই। আমরা যা লাভ করবো দুজনে সমান ভাগ করে নেব। তা সে যদি একা আমার খাটুনিতেও রোজগার হয় তারও সমান ভাগ তোমাকে দেব, কেমন?

আবু শাইর বলে, এর চাইতে ভালো কথা আর কি হতে পারে, ভাই।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো অষ্টাশিতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

জাহাজ ছাড়ার দিন দুই বন্ধুতে বন্দরে এসে আল্লাহর নাম করে জাহাজে চেপে বসে। সঙ্গে সামানপত্র বিশেষ কিছুই নাই। এমন কি রাহাখরচ বা খানাপিনা কিছুই সঙ্গে নিতে পারেনি তারা। পাবেই বা কোথায়। দোকানটা বিক্রি করে যা কিছু সামান্য পেয়েছিল তার থেকে বিবি বাচ্চাদের খাওয়া পরার জন্য কিছু দিয়ে এসেছে। বাকী টাকায় জাহাজের ভাড়া মেটাতে হয়েছে!

কিন্তু নসীব সাধ দিল। জাহাজের কাপ্তান, খালাসী, যাত্রী ও সওদাগরদের চুল দাড়ি কেটে খানাপিনার পয়সা রোজগার হতে লাগলো। আবু শাইর ছাড়া জাহাজে অন্য কোনও নাপিত ছিল না। তাই, সাদরেই তাকে দিয়ে তারা ক্ষৌর-কর্ম করায় এবং হিসেবের তুলনায় কিছু বেশি পয়সা দেয়। আবু শাইর বলে, পয়সার আমাদের তেমন প্রয়োজন নাই, আপনারা যদি আমাদের দুজনের খানাপিনার ব্যবস্থা করে দেন তা-ই যথেষ্ট হবে।

যাত্রীদের কেউ রুটি কেউ মাখন কেউ মধু কেউ বা একটু মাংস দেয়। যারা খানাপিনা কিছুই দিতে পারে না তাদের কাছ থেকে পয়সা নেয় আবুশাইর।

এইভাবে সে কয়েকদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে! স্বয়ং কাপ্তান একদিন তাকে ডেকে বললো, তোমার তো খুব সুখ্যাতি শুনছি। খুব সুন্দর করে নাকি কামাতে পার। তা আমার মাথাটা একবার কামিয়ে দাও তো দেখি।

খুব যত্ন করে আবু শাইর কাপ্তানের মাথা কামিয়ে দেয়। ক্ষুর চালাতে চালাতে সে তার এবং আবু কাইর-এর দুর্ভাগ্যের কাহিনী খুলে বলে।

—স্বদেশে আর খেতে পরতে পেলাম না সাহেব, তাই বিদেশে চলেছি ভাগ্য অন্বেষণে।

আবু শাইর-এর ব্যবহারে খুশী হয় কাপ্তান। বলে, আজ থেকে তোমার

দোস্তকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমার কামরায় যেও। যতদিন না তোমাদের এই জাহাজ যাত্রা শেষ হয় প্রতিদিন আমার সঙ্গে খানাপিনা করবে তোমরা, কেমন?

আবু শাইর এতটা আশা করেনি। কাপ্তানের বদান্যতায় সে গদগদ হয়ে বলে, আপনার এ ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না, সাহেব।

—তার দরকার নাই। তোমরা বিপদে পড়েছ, সাধ্যমতো সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

আবু শাইর কাজ-কাম শেষ করে ফিরে এসে দেখে, আবুকাইর নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। সারাদিন কাজ করে আজ তার অনেক রোজগার হয়েছে। রুটি মাখন, মধু, মাংস, সব্জী এনেছে অনেক।

আবু কাইরকে জাগাতেই সে লাফিয়ে ওঠে, ওরে বাস, এত খাবার? কোথায় পেলে?

— লোকে ভালোবেসে দিয়েছে।

আবুকাইর আর কোনও কথা বলে না। গোগ্রাসে মুখে পুরতে থাকে। আবু শাইর যে সারাদিন খেটেখুটে এসেছে, তার সঙ্গে বসে ভাগাভাগি করে খাওয়া দরকার, সেই সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু তার নাই।

আবু শাইর বলে, ধীরে বন্ধু, ধীরে। একদিনেই সব খেয়ে ফেললে কাল কী খাবে?

—কেন, কাল কি কাজে বেরুবে না?

—বেরুবো না কেন, কিন্তু যদি রোজগার না হয়। ভবিষ্যতের জন্য তো কিছু সঞ্চয় করে রাখা দরকার। কিছুই তো বলা যায় না। তা ছাড়া আরও একটা খবর আছে।

—কী?

কাপ্তান সাহেব আমাকে খুব সুনজরে দেখেছেন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর কামরায় তোমার আমার নেমন্তন্ন। সেখানেই পেট পুরে খেতে পারবো। সুতরাং এগুলো এখন না খেয়ে ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখাই বোধহয় ভালো।

আবু কাইর মাংসের একটা টুকরো মুখে পুরতে পুরতে বলে, সমুদ্রের এই নোনা হাওয়ায় আমার শরীরটা ভালো নাই। গা হাত পা ব্যথা ব্যথা করছে। আমি আর কাপ্তানের কামরায় যাবো না। তুমি একাই গিয়ে খানাপিনা করে এস। যদি পার, ভালোমন্দ খানিকটা আমার জন্যে নিয়ে এস।

আবু শাইর বললো, সে তুমি ভেবো না, ভালো জিনিস তোমাকে না খাইয়ে আমার মুখে রুচবে না।

আবু শাইর-এর সারাদিনের সংগৃহীত সমস্ত খানাপিনা একাই সাবাড় করে দিল আবু কাইর। একটা ক্ষুধার্ত রাক্ষস। যেন কতকাল খেতে পায়নি।

এই সময় কাপ্তানের লোক এসে বললো, খানা তৈরি, কাপ্তান আপনাদের খেতে ডাকছেন।

আবু শাইর আবু কাইরকে বললো, কী, যাবে না?

—তুমিই যাও ভাই, আমার শরীরটা বেজায় খারাপ। সমুদ্রের শয়তানটা

আমার ওপর ভর করেছে। উফ্ কী ব্যথা, সারা শরীরটা টনটন করছে। এক পাও নড়ার শক্তি নাই আমার।

সুতরাং আবু শাইর একাই গেল কাপ্তানের কামরায়। লম্বা একটা মেজের উপর সাদা কাপড় বিছানো হয়েছে। তার উপরে নানা ধরনের বাদশাহী খানা থরে থরে সাজানো। প্রায় গোটা কুড়ি রেকাবী ভর্তি মুখোরোচক খানা! কাপ্তান মেজের মাঝখানে বসে আবু শাইর এবং তার আরও দু-চারজন মেহেমানের প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নাপিতকে একা দেখে কাপ্তান প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার, তোমার দোস্ত কোথায়? সে এল না?

—জী না। তার বিমার হয়েছে। সমুদ্রের জল হাওয়া সবারই তো ধাতে সয় না। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। তবে দু'একদিনেই সেরে যাবে মনে হয়।

কাপ্তান বললো, ঠিক আছে, এই এখানে আমার পাশে এসে বস। একখানা বড় দেখে থালা নাও। যা যা পছন্দ, যত খুশি তুলে নাও। কোনও সঙ্কোচ করো না। খাবার লোক বেশি নাই। কিন্তু কম করে হলে জনা-দশেকের খানা সাজানো আছে। পেট ভরে খাবে কিন্তু। বুঝলে?

আবু শাইর ঘাড় নেড়ে জানায়, সে যতটা পারে খাবে।

প্রাণ ভরে তৃপ্তি করে খেল সে। কাপ্তান একখানা বড় থালা টেনে নিয়ে নিজে হাতে নানারকম খানায় ভর্তি করে আবুশাইর-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তোমার বন্ধুর জন্যে নিয়ে যাও। বেচারা, বিমারে কষ্ট পাচ্ছে।

আবু শাইর ফিরে এসে দেখে, আবুকাইর-এর পেটটা ফুলে যেন জয়ঢাক। ঘন ঘন ঢেকুর তুলছে। লোভে পড়ে খেয়েছিল। এখন তার ঠেলা সামলাতে পারছে না।

—তোমাকে তখনই পই পই করে বারণ করলাম, ঐ সব বাজে জিনিস খেয়ে শরীর খারাপ করো না। তা আমার কথা তো কানে তুললে না! এখন দেখ, কত সুন্দর সুন্দর জিভে জল আসা খানা নিয়ে এসেছি। তখন কম করে খেলে এখন কত রসিয়ে রসিয়ে খেতে পারতে—

আবু কাইর-এর লোভী চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলতে থাকে।

—আরে রাখ রাখ, আমার সামনে রাখ দেখি। আঃ, কী বাহারী-খানা গো! এ কি না খেয়ে থাকা যায়?

আবু শাইর আঁৎকে ওঠে, অ্যা, বল কী? এ অবস্থায় আবার তোমার গলায় নামবে?

—খুব নামবে। তুমি দেখই না, কেমন করে সাবাড় করে দিই। আহা, এমন সুন্দর শাহী কাবাব, কোর্মা, কালিয়া চাঁপ, তন্দুরী,—একি কালকের জন্যে ফেলে রাখা যায়। কাল যদি না-ই বাঁচি।

আবু শাইর-এর হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে রেকাবীখানা কেড়ে নিয়ে দুহাত চালিয়ে মুখে পুরতে থাকে সে। নেকড়ের মতো লোভী লোলুপ তার চোখের

দৃষ্টি। সিংহের মতো ক্ষিপ্রতায় সে হাত মুখ চালাতে থাকে। পলকের মধ্যে পুরো থালাটাই সাবাড় করে ফেলে। দু হাত দিয়ে থালাখানা মুখের সামনে তুলে ধরে জিভ দিয়ে চেটেপুটে ফর্সা করে আবু শাইর-এর হাতে ফেরত দিয়ে বলে, বেড়ে খেলাম।

আবু শাইর হতবাক। একটা লোক এত খেতে পারে? ভয় হয়, লোভে পড়ে খেল বটে, কিন্তু বাঁচবে তো?

আবু শাইর-এর আশঙ্কা বৃথা। দিব্যি আরামে মোষের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগলো আবুকাইর। সারা রাত ধরে তার নাসিকা গর্জন আর সমুদ্রের ভয়াল তর্জন মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতে থাকলো।

পরদিন সকালে উঠে আবার আবু শাইর জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে। কারো মাথা কামায়, কারো গোঁফ ছাঁটে। এইভাবে সারাদিন কাজ-কাম করার পর কাপ্তানের কামরায় হাজির হয়। আবুকাইর তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সমানে নাসিকা গর্জন করে চলেছে।

কাপ্তান সাহেব তাকে আদর আপ্যায়ন করে খানাপিনা করায়।

এইভাবে সপ্তাহ তিন কেটে গেল। জাহাজ এসে ভিড়লো এক নাম-না-জানা বন্দরে। আবু কাইর আর আবু শাইর তীরে নামে। বন্দরের পাশেই শহর। ওরা একটা কম দামী সরাইখানায় একখানা ঘর ভাড়া করে নিল। আবু কাইর কিন্তু তখন দরিয়া-বিমারে শয্যাশায়ী। সে আবু শাইর-এর মাদুরের এক পাশে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

আবু শাইর তার ক্ষুর কাঁচি সঙ্গে নিয়ে একটা জনবহুল রাস্তার চৌমাথার এক পাশে একটু জায়গা করে বসে পড়ে। প্রথমে একটা কুলি পরে গাধার সহিস, ভিস্তিওলা, ফলওলা, ফেরিওলা প্রভৃতি গরীব খদ্দেরগুলো জুটতে থাকে। তার কামাবার কায়দা দেখে পথচারীরা থমকে দাঁড়ায়। আপনা থেকে বাহবা শব্দ বেরিয়ে আসে, বাঃ চমৎকার হাত তো লোকটার!

আস্তে আস্তে পয়সাওলা লোকগুলিও পাছায় ইট নিয়ে আবু শাইর-এর সামনে কামাতে বসে পড়ে।

দিনের আলো শেষ হয়ে গেলে আবু শাইর সেদিনের মতো ক্ষুর কাঁচি জড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ে এবং ঘরে ফেরার পথে খানাপিনা কিনে নিয়ে যায়। বন্ধুবর আবু কাইর তখনও শয্যাশায়ী। নাসিকা গর্জনে কামরা কাঁপিয়ে তুলছে। আবু শাইর ওর নাকের কাছে মাংসের কালিয়াটা ধরতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলো সে।

—বাঃ, বেড়ে গন্ধ তো!

আবু কাইর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। লোলুপ চোখে খাবারের ভাঁড়ের দিকে তাকায়।

দুজনে মিলে ভাগ করে খানাপিনা করে। বলাবাহুল্য আবু কাইরই বেশীটা খায়।

এইভাবে প্রতিদিন কাজে বেরিয়ে যায় আবু শাইর আর কুড়েটা পড়ে পড়ে

ঘুমায়। জিজ্ঞেস করলে বলে, উঃ, সারা গায়ে কী দর্দ। এপাশ-ওপাশ করতে পারি না।

এমনি করে চল্লিশটা দিন কেটে গেল। সারাদিন খেটে খুটে ভালো মন্দ খানাপিনা নিয়ে আসে আবু শাইর আর তার ভাগ বসায় কুড়ের বাদশা ধোপাটা। আবু শাইর দু-একবার বলার চেষ্টা করেছে, ঘরের মধ্যে এইভাবে আবদ্ধ না থেকে শহরটা ঘুরে ফিরে একবার দেখে এস না। কি সুন্দর সব দোকান-পাট রাস্তা-ঘাট, ফুলের বাগিচা, ফোয়ারা—চোখ জুড়িয়ে যাবে।

আবু কাইর হঠাৎ কঁকিয়ে ওঠে, উ-হু-হু, গেলাম—

আবু শাইর ভীত চকিত হয়ে ওঠে, কী, কী হলো ?

—পায়ের রগে টান ধরেছে, একটু মালিশ করে দাও।

আবু কাইর কাতরাতে থাকে। সরল প্রাণ নাপিত বুঝতে পারে না ওর বাহানা। কাছে এসে পা-খানা ডলে দিতে থাকে।

—আহা-হা, থাক থাক, তুমি আর ওঠা বসা করো না। শুয়েই থাক। পা দুখানা টান করে রাখ। আমার আবার দেরি হয়ে গেল, চলি। খানা ঢাকা আছে ওপাশে, দুপুরবেলায় উঠে খেয়ে নিও।

আবু কাইর বলে, আচ্ছা। তুমি কিছু ভেব না, অসুখটা সারলেই আমি কাজে লেগে যাবো। তারপর দুজনে মিলে রোজগার করে চটপট অনেক টাকা বানিয়ে ফেলবো।

আবু শাইর তখনও দরজার চৌকাট পার হয়নি, আবু কাইর নাক ডাকাতে আরম্ভ করে।

দিনের পর দিন টাটা রোদ্দুরে খেটে খেটে একদিন আবু শাইর অসুখে পড়লো। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল, কী করে আর কাজে বেরোয়। সরাইখানার মালিককে ডেকে বললো, আমার তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ হয়ে পড়েছে। কাজে বেরুতে পারছিনা। যদি মেহেরবানী করে দিন দুই ভাইটাকে খেতে দেন, বড় উপকার হয়। আমি ভালো হয়ে আপনার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেব।

আবু শাইর-এর কথামতো আবু কাইরকে দুদিনের মতো খানাপিনা পাঠিয়ে দিল সে। কিন্তু আবুশাইর ইতিমধ্যে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকতে আরম্ভ করে। কিন্তু অপদার্থ ধোপাটার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। একবার ফিরেও তাকায় না তার দিকে। ক্ষিদের জ্বালায় তার পেট জ্বলছে, সরাইখানার মালিক আর খানা দেবে না, ঘরেও কিছু নাই, আবু কাইর ছটফট করতে থাকে, কী খাবে সে ? আঁতিপাতি করে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। কিন্তু না, কোথাও কিছু নাই। হঠাৎ একটা ছোট বটুয়া খুঁজে পেল সে। প্রতিদিন কিছু কিছু দিরহাম বাঁচিয়ে আবু শাইর এই বটুয়াটায় কিছু পয়সা জমিয়েছিল। আবু কাইর বটুয়াটা ট্যাকে গুঁজে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে। সেই সময় সরাইখানার মালিকও সে-দিকে ছিল না। সকলের অলক্ষ্যে সে শহরের পথে হন হন করে হেঁটে চলে। কিছু দূর যেতেই একটা হালুইকরের দোকান দেখতে পায়।

আর কোনও দিকে না তাকিয়ে সে দোকানে ঢুকে পড়ে! দোকানীকে বলে, খুব জলদি রুটি আর হালওয়া দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে।

পেটপুরে খেয়ে দেয়ে দাম চুকিয়ে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

চারশো উননব্বইতম রাতে

আবার সে শুরু করে ঃ

বাজারে গিয়ে আবু কাইর সুন্দর দেখে জামা কাপড় কিনে পরে নিল। রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে গজেন্দ্র-গমনে চলতে থাকে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হয়, রাস্তায় যত মানুষ চলা-ফেরা করছে তাদের সকলের সাজ-পোশাক মাত্র দুটি রঙে সীমাবদ্ধ। সাদা আর নীল। এর বাইরে অন্য কোনও রঙ তার চোখে পড়ে না।

আবু কাইর এক রজকের দোকানে ঢোকে। দোকানী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কী চাই জনাব।

আবু কাইর পকেট থেকে একখানা সাদা রুমাল বের করে বলে আমি এটা রঙ করাতে চাই! কত লাগবে?

দোকানী বলে, কুড়ি দিরহাম।

আবু কাইর-এর চোখ কপালে ওঠে, কুড়ি দিরহাম? কেন?

—কেন কী, কুড়ি দিরহামই বাঁধা দর। বিশ্বাস না হয় আর পাঁচটা দোকান যাচাই করে দেখুন!

—কিন্তু আমাদের দেশে তো এই রুমালখানা রং করতে আধ দিরহাম লাগে?

দোকানী নির্লিপ্তভাবে বলে, তাহলে আপনার দেশে গিয়েই করাবেন। আমরা ওর কমে করতে পারবো না।

আবু কাইর বলে, ঠিক আছে, তাই দেবো। আমাকে লাল রঙ করে দেবেন।

দোকানী অবাক হয়ে তাকায়, লাল?

—হ্যাঁ, লাল রঙই আমার পছন্দ!

—আপনার পছন্দমতো কাজ হবে না, সাহেব!

—মানে?

—মানে আবার কী? নীল ছাড়া অন্য কোনও রং করা যাবে না।

এবার আবু কাইর অবাক হয়, কেন? কেন করা যাবে না?

—এ দেশে নীল আর সফেদ এই দুটো রঙই হয়। আপনি পথে ঘাটে লক্ষ্য করেননি? কোনও মানুষের সাজ-পোশাকে অন্য কোনও রঙ দেখেছেন?

—না, তা অবশ্য দেখি নি। কিন্তু কেন অন্য রং করা যাবে না?

এখানে—এই শহরে আমরা চল্লিশ ঘর রঙের কারিগর আছি। বংশানুক্রমে

এই আমাদের জাতব্যবসা। বাবা একমাত্র ছেলেকে শিখিয়ে যায়। সেজন্য অন্য কোনও লোক এখন পর্যন্ত এ ব্যবসাতে নাক গলাতে পারেনি। আমরা শুধু জানি, নীল রঙ করতে। অন্য কোনও রঙের কাজ আমাদের বাপঠাকুর্দাও জানতো না, আমরাও জানি না।

আবু কাইর বললো, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি। আমি বিদেশী, আলেকজান্দ্রিয়াতে আমার ঘর। এখানে ভাগ্যান্বেষণে এসেছি। আমারও জাতব্যবসা এই কাপড় রঙ করা। আমি চল্লিশ রকম রঙের কাজ জানি। আমাকে যদি আপনার সঙ্গে নেন তবে সব কাজ আপনাকে আমি শিখিয়ে দেবো। তখন দেখবেন, আপনার দোকানে কী ভিড় জমে যায়।

দোকানী সন্দিগ্ধভাবে আবু কাইর-এর দিকে তাকায়। বলে, আমার ওসব ঝামেলার দরকার নাই। এই বেশ আছি।

আবুকাইর বলে, বেশ, আমাকে একটা চাকরীতেই বহাল করুন কোনও অংশ চাই না। আমি আপনাকে সব শিখিয়ে দেবো।

দোকানী বললো, সে হয় না। আমরা কোনও বিদেশীকে চাকরী দিতে পারি না। আমাদের রজক-সভার অনুমতি ছাড়া কোনও কাজ আমরা করি না। আমাদের সভাপতির নির্দেশ আছে, কোনও বিদেশীর সঙ্গে কারবার করবে না বা তাদের কাউকে কর্মচারী রাখবে না।

আবু কাইর হতাশ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আর একটা কাপড় রঙ করার দোকানে ঢোকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে দোকানীটাও ঐ একই কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে সে যতগুলো দোকানেই গেল, সবাই একই কথা বলে, না, কোনও বিদেশীকে তারা দোকানে ঢোকাবে না। এরপর সে গেল রজক-সভার সভাপতির কাছে। লোকটি বয়সে প্রবীণ। ব্যবহারও বেশ ভালো। কিন্তু তারও সেই এক কথা, আমাদের বাপঠাকুর্দার নির্দেশ আছে, সাহেব। হাত পা আমাদের বাঁধা, কোনও বিদেশীকে আমাদের দোকানে জায়গা দিতে পারি না!

অবশেষে আবু কাইর মরীয়া হয়ে সেখানকার সুলতানের দরবারে গিয়ে হাজির হয়। আবু কাইর বিদেশী, সুলতান তাকে সাদর স্বাগত জানায়। যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সে বলে, জাঁহাপনা, আমি আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী। হুজুরের দরবারে একটা আর্জি পেশ করতে চাই।

সুলতান বলে, বেশ বল, কী বলতে চাও?

—জাঁহাপনা, জাতে আমি রজক। কাপড় রঙ করে রোজগার করি। নিজের দেশে ব্যবসা চললো না, তাই ঘুরতে ঘুরতে আপনার শহরে এসেছি। উদ্দেশ্য গায়ে গতরে খেটে দুবেলার রুটি সংগ্রহ করবো। কিন্তু আপনার শহরে, চল্লিশটি রজকের দোকান আছে, প্রতিটি দোকানে আমি ঘুরেছি! কেউ আমাকে কাজ দিল না। আমার একমাত্র অপরাধ, আমি বিদেশী। কিন্তু আমাকে কাজে নিলে তারা লাভবান হতো, হুজুর।

সুলতান প্রশ্ন করে, কেন? লাভবান হতো কেন?

—আপনার শহরের প্রতি মানুষ এমনকি স্বয়ং সুলতান পর্যন্ত দেখছি দুটি রঙের সাজ-পোশাক পরেন। সাদা আর নীল। দোকানীদের কাছ থেকে জানলাম, নীল ছাড়া তারা নাকি অন্য কোনও রঙের কাজ জানে না।

সুলতান বাধা দিয়ে বলে, তা তারা অন্যায়টা কী বলেছে? সত্যিই তো, নীল ছাড়া অন্য রঙে সাজ-পোশাক রাঙানো যাবে কী করে?

—হুজুর যদি অভয় দেন তো বলি, আমি লাল, নীল, হলুদ, জাফরান, গোলাপী, বেগুনী, সবুজ প্রভৃতি চল্লিশটা রঙের কাজ জানি। একেবারে পাকা রঙ। আপনি যে রঙ বলবেন। সেই রঙে কাপড় রঙিয়ে দিতে পারি। কাপড় ছিঁড়ে যাবে, কিন্তু রঙ জ্বলজ্বল করবে।

সুলতান হতবাক। কয়েক মুহূর্ত তার মুখে কথা জোগায় না। সারা দরবার অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আবু কাইর-এর মুখের দিকে। লোকটা বলে কী। মাথাটাথা খারাপ? পাগল নয় তো?

সুলতান বলে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু তুমি বিদেশী, তাই তোমাকে অসম্মান করে একেবারে নস্যাৎ করে দিচ্ছি না। বেশ তুমি কী চাও বল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখ, বিদেশী, যদি তোমার কথা ঠিক হয় তবে তোমাকে আমি মাথায় করে রাখবো। আর যদি ধোঁকাবাজী কর, তোমার গর্দান যাবে।

আবু কাইর কুর্নিশ জানিয়ে বলে, তাই হবে জাঁহাপনা। আপনি আমাকে শহরের যে-কোনও রাস্তার ওপরে একখানা দোকান ঘর-এর ব্যবস্থা করে দিন। আর চাই কয়েকজন লোক, কিছু কাপড় আর রঙ তৈরি করার খরচা।

সুলতানের হুকুমে সেইদিনই শহরের চৌমাথার কাছে একখানা বিরাট দোকান ঘর ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো তাকে। যে কজন লোক দরকার সব পেয়ে গেল সে।

আবু কাইর লোকজনদের কাজে লাগিয়ে দোকানটাকে পরিপাটি করে সাজালো। সুলতান বললো, এই নাও, এক হাজার দিনার, এটা রাখ। যতদিন না কাজ শুরু হয়, তোমার হাত খরচা হিসাবে দিলাম। তোমার থাকার জন্য একখানা বাড়ি আমি সাজিয়ে গুজিয়ে দিতে বলেছি। এখন থেকে সেই বাড়িতেই থাকবে তুমি। চাকর নফর যা দরকার তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে উজির—আমার বলা আছে। তোমাকে অন্য কোনও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। শুধু কাজ নিয়ে মেতে থাকবে। কাজ শেষ হলে খানাপিনা আর ফূর্তি করবে।

দু-একদিনের মধ্যেই আনুসঙ্গিক সব কাজ সমাধা হয়ে গেল। ঝকঝকে করে সাজানো হলো দোকান। সুলতান বললো, এবার তাহলে কাজ শুরু করে দাও। কিন্তু পয়সা না হলে কী করেই বা শুরু করবে? এই নাও, পাঁচ হাজার দিনার। এ দিয়ে রঙ, মসলাপত্র সব কিনে নাও। আমি পাঁচশো গজ কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি—খুব ভালো করে বাহারী রঙ করে দেবে, বুঝলে?

আবু কাইর এত টাকা এক সঙ্গে জীবনে দেখেনি। মোহরের থলেটা

ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বিনয়ে গদগদ হয়ে বলে, সে আবার বলতে, হুজুর! এমন রঙ করে দেবো, দেখে লোকে ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে।

—লোকে যাক, কিন্তু আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো না তো, হে?

—কী যে বলেন, হুজুর। আমি তো আপনার কথা বলিনি।

সুলতান চলে গেলে আবু কাইর মোহরের থলে থেকে একটা মোহর বের করে থলেটা ভালো করে কোমরে জড়িয়ে বাঁধে। মনে মনে বলে, সুলতানটা কী আহাম্মক। এক দিনার লাগবে না রঙ কিনতে—পাঁচ হাজার দিয়ে গেল! বড় মানুষের পয়সা—যত ঠকিয়ে নেওয়া যায় ততই লাভ।

পরের দিনই সুলতান পাঁচশো গজ সাদা রেশমী কাপড় পাঠিয়ে দেয়। আবু কাইর নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর রঙে রাঙিয়ে দোকানের সামনে ঝুলিয়ে দেয় কাপড়গুলো। পথের লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এমন আজব চীজ তারা জীবনে কখনও দেখেনি। কাপড়ের এত রঙ কী করে করা সম্ভব, ভাবতে পারে না তারা। এখানকার মানুষ জন্ম থেকে দেখে আসছে মাত্র দুটি রঙ। সাদা আর নীল। হরেক রকম রঙের বাহার দেখে তাজ্জব বনে যায় শহরবাসী। অতি রক্ষণশীল বয়বৃদ্ধরা আশঙ্কা প্রকাশ করে, শেষ বিচারের দিন আসতে আর বাকী নাই। দুনিয়া এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। তা না হলে এই সব ভূতুড়ে আজগুবি কাণ্ডকারখানা শুরু হচ্ছে কেন?

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা কিন্তু বুড়োদের এই সব নাক-উঁচু কথায় আমল দেয় না। তারা বলে, দিন বদলাচ্ছে, মানুষের রুচি ও প্রয়োজন পালটাচ্ছে। নতুন নতুন কত কি আবিষ্কার হচ্ছে। এও একটা আবিষ্কার। তাতে দুনিয়া রসাতলে যাবে কেন?

সবচেয়ে খুশি হয় সুলতান নিজে। চল্লিশ রকমের রঙে রঙিয়েছে সে কাপড়গুলো। কোনওটা বেদানার দানার মতো, কোনওটা বা কমলা। আবার কোনওটা পাকা ন্যাসপাতির মতো। কোনওটার রঙ চাঁপার কলির মতো। কোনওটা বা পারিজাত অথবা গোলাপ-সদৃশ। আকাশের নীল, সমুদ্রের গভীর নীল, কচি কলাপাতা, তাল পাতা, জাম আর জারুল, জাফরান, দারুচিনি, কালোজিরে, পেস্তা, আখরট বাদাম প্রভৃতি যত রঙ ভাবা যায়, সব রঙেই সে রাঙিয়েছে।

গর্বে বুক ফুলে ওঠে সুলতানের। এ আবিষ্কার যেন তার নিজেরই। অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সে কাপড়গুলো। উজিরকে বলে, কাপড়গুলো প্রাসাদে নিয়ে চল। বেগমদের পরতে দাও। আর আবু কাইরকে আরও এক হাজার গজ কাপড় পাঠিয়ে দাও আজই।

কয়েকদিনের মধ্যে সে কাপড়গুলোও রঙ করে দিল আবু কাইর। সুলতান খুশি হয়ে দশ হাজার দিনার ইনাম দিল তাকে। সারা শহরে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। উজির আমির ওমরাহরা কাপড় পাঠাতে লাগলো। আবু কাইর চড়া দর হাঁকে। কিন্তু দামের কথা তখন আর কে চিন্তা করে। কিছুদিনের মধ্যেই আবু কাইর শহরের সেরা ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠলো।

মোহরের যেন শিলাবৃষ্টি হতে লাগলো তার দোকানে। এত টাকা সে রাখবে কোথায় ?

শহরের অন্য সব রজকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে। তাদের দোকানে লোক ঢোকে না। শেষে একদিন রজক-সমিতির সেই বৃদ্ধ সভাপতি সদলে আবুকাই-এর কাছে ক্ষমা চাইতে আসে।

—আমরা আপনাকে চিনতে পারিনি, সাহেব। আমাদের গুস্তাকী মাফ করে দিন। আমরা আপনার একান্ত অনুগত হয়ে আপনার অধীনে নোকরি করতে চাই। আমাদের কাজ দিয়ে বাঁচান। না হলে, বাল-বাচ্চা নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করার বান্দা আবু কাইর নয়। বললো, এখন কেন এসেছ ? কত কাকুতি-মিনতি করেছিলাম, তখন তো আমার কথা শোনও নি তোমরা। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এখন কেন এসেছ হাত জোড় করতে ? ওসবে আমার হৃদয় গলবে না। আমার দ্বারা কিছু হবে না। মানে মানে কেটে পড়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বিরানব্বইতম রজনী
আবার সে শুরু করে ঃ

আবু শাইর-এর যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল সবই চুরি করে পালালো আবু কাইর। তখন আবু শাইর জ্বরে অচৈতন্য। তিন দিন তিন রাত্রি একইভাবে পড়ে রইলো সে। দেখার কেউ নাই, কে দেবে দাওয়াই, কে দেবে এক বিন্দু পানি ! সরাইখানার মালিক অতটা খেয়াল করেনি, কিন্তু তিন দিনের মধ্যে কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। দেখে অবাক হয়। আবু শাইর জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, অথচ আবুকাইর পাশে নাই। ঘরের ভিতরে ঢুকে সে আবু শাইর-এর পাশে এসে বসে।

—কী হয়েছে শেখ, তোমার সাথী কোথায় ?

আবুশাইর-এর গলা দিয়ে আধা-স্পষ্ট একটা আওয়াজ বের হয়, খোদা জানেন। আজ একটু আগে আমার জ্ঞান ফিরেছে। জানি না, কতকাল ধরে আমি এই ভাবে এখানে পড়ে আছি। বলতে পারবো না, আমার সঙ্গীটি কোথায় গেছে। জ্ঞান হওয়ার পর আমি আর তাকে দেখিনি এখানে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু পানি দেবেন, ভাইসাব ? ওই যে ওখানে আমার যন্ত্র-পাতির থলেটা দেখছেন—ওর মধ্যে আমার জমানো কিছু পয়সা আছে। যদি মেহেরবানী করে ওর থেকে পয়সা বের করে আমার জন্যে কিছু পথ্যের ব্যবস্থা করে দেন, খুব উপকার হয়।

সরাইখানার মালিক যন্ত্রপাতির থলেটা নিয়ে এসে আবু শাইর-এর সামনে মেলে ধরে। আঁতি-পাতি করে খুঁজেও কোনও পয়সার বটুয়া পাওয়া যায় না।

—কই গো শেখ, এর মধ্যে তো কিছু নাই।

—নাই ?

অত জ্বরের ঘোরেও আবু শাইর চঞ্চল হয়ে ওঠে, নাই কী ? ওর মধ্যে যে আমার যথা-সর্বস্ব ছিল ?

সরাইখানার মালিক থলেটা উপুড় করে সব যন্ত্রপাতি মেজেয় ঢেলে দেয়, কই দেখ তোমার ক্ষুর কাঁচি-টাঁচি ছাড়া তো কিছুই নাই।

আবু শাইর হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।—সে নিয়ে ভেগেছে। আমাকে পথে বসিয়ে গেছে। ইয়া আল্লা, এ কী হলো, এখন এই বিদেশ-বিভূঁই-এ বেঘোরে মারা যাবো যে।

সরাইখানার মালিক বললো, আমি থাকতে তোমার কোনও ভয় নাই, শেখ। বিনা চিকিৎসায় বা না খেতে পেয়ে তুমি মারা যাবে না। আমার সাধ্যমতো আমি করবো। কিছু ভেবো না। তোমার কষ্টের পয়সা চুরি করে কেউ সুখী হবে না। যাক, চোখের পানি মুছে ফেল। আমি তোমার জন্য বার্লি তৈরি করে আনছি। মনে রেখ, আজ থেকে তুমি আমার সেবা-যত্নে থাকবে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।

একটু পরে সে এক বাটি বার্লি আর মুরগীর ঝোল নিয়ে এসে বললো, নাও, খেয়ে নাও তো। অসুখ সারাতে গেলে দেহের মনের জোর থাকা দরকার। খানাপিনা না করলে দেহের তাগদ হবে কী করে ? নাও, ওঠ।

নিজের হাতে ধরে খুব যত্ন করে সে খাওয়ালো তাকে। তারপর ভালোভাবে শুইয়ে গায়ে চাদর চাপা দিতে দিতে বললো, আমি মাঝে মাঝেই এসে দেখে যাবো। তবুও যদি কখনও দরকার হয়, কোনও দ্বিধা না করে আমাকে ডাক দেবে, বুঝলে ? আমি তো তোমার পাশেই আছি। হেকিমের কাছে যাচ্ছি, যা দাওয়াই পত্র তিনি দেন আমি তোমাকে খাইয়ে যাবো 'খন।

একটানা দুটি মাস সরাইখানার মালিকের অক্লান্ত সেবা-যত্নে সুস্থ হয়ে ওঠে আবু শাইর। খরচাপাতির কোনও কার্পণ্য করে না সে।

আবু শাইর-এর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, আপনার এ ঋণ আমি পয়সা দিয়ে কখনও শোধ করতে পারবো না। আপনি আমার পুনর্জন্ম দিয়েছেন। তবে যতদিন বাঁচবো আপনার এই সেবা এই যত্ন এই আদর কোনওদিন ভুলবো না আমি। আজ আমার কিছু নাই, কিন্তু আল্লাহ যদি কখনও দিন দেয় আপনাকে আমার মনে থাকবে। অবশ্য পয়সা-কড়ি আপনার অনেক আছে ও সব কথা তুলে আপনার এই ভালোবাসাকে ছোট করতে চাই না।

সরাইখানার মালিক বলে, একমাত্র খোদাতালাকেই ধন্যবাদ জানাও শেখ। তিনিই তোমাকে আরোগ্য করে তুলেছেন। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমি অন্তরে তাঁর নির্দেশ পেয়েছিলাম বলেই তোমার দেখাশুনা করেছি। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

আবু শাইর-এর চোখ জলে ভরে আসে। দুনিয়াটা শুধুই ঠগে ভরা নয়। ভালো মানুষও দু-চারটে আছে।

আরও কয়েকদিন পরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলে আবু শাইর ক্ষুর কাঁচি জড়িয়ে আবার বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে। রোজগারের ধান্দা দেখতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক জায়গায় বহু লোকের জটলা দেখে সেইদিকে এগিয়ে যায়। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। আবুকাইর-এর দোকানের সামনে শহরের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। হরেক রকম রঙের কাপড় দেখার কৌতূহলে ছুটে আসছে মানুষ। কাপড়ে এত বাহারী রঙ তারা এতকাল ভাবতে পারেনি।

আবু শাইর-এর শরীর দুর্বল। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারে না। একজনকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, এত জমায়েত কেন? কী হয়েছে এখানে?

লোকটা অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে।—সে কি, সারা শহর তোলপাড় করে ফেলেছে এই পরদেশী, কোনও খবর রাখ না কিছু?

আবু শাইর বলে, না ভাই, আমি বহুৎদিন বিমার ছিলাম। কিছুই জানি না।

লোকটা বলে, আরে সব ব্যাটাকে কানা করে দিয়েছে। আবু কাইর নামে আলেকজান্দ্রিয়ার এক রজক এসে এখানে দোকান খুলেছে। তার হরেক রকম রঙের বাহার দেখে লোকে লোকারণ্য। অন্য সব রজকের দোকান সাহারা হয়ে গেছে। একটা মাছি ঢোকে না এখন। আহা, লোকটা যাদু জানে, তা না হলে কে কবে শুনেছে, নীল ছাড়া আবার রঙ হয়! আর ঐ দেখ, কত মজাদার রঙের কাপড় সব ঝুলছে। লোকে এই কাপড় ফেলে ঐ বস্তাপচা নীল রঙের কাপড় পরবে আর?

আবু শাইর দেখলো দোকানের সামনে নানা রঙের অসংখ্য কাপড় ঝুলান। আনন্দে উল্লাসে নেচে উঠলো তার মন। এখানে তাহলে আবু কাইর জোর ব্যবসা ফেঁদে বসেছে! পয়সার থলেটা চুরি করে আবুকাইর তাহলে একটা কাজের কাজই করেছে। মুহূর্তের মধ্যে তার মন থেকে সব রাগ সব ক্ষোভ মুছে গেল। যাক, আল্লাহ এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। এবার তাদের দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে।

আবু শাইর কোনও রকমে ভিড় ঠেলে ঠেলে দোকানের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানের ভিতরে একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসেছিল আবু-কাইর। তার পিছনে দাঁড়িয়ে চারজন আজ্ঞাবহ হাবসী ক্রীতদাস চামর দোলাচ্ছে। দোকানের ভিতরে জনা-দশেক কর্মচারী কাপড় রঙ করাতে ব্যস্ত।

আবু শাইর দু পা এগিয়ে যায় সামনে। আবু কাইর কিন্তু তখন আরাম-কেদারায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে চামরের হাওয়া খাচ্ছিল। আবু শাইর ভাবে, এ অবস্থায় ওর তন্দ্রা কাটানো বোধহয় ঠিক হবে না। এখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করা যাক। যখন সে চোখ খুলবে, নজর পড়লেই সে অবাক হয়ে যাবে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আবার সে শুরু করে :

হঠাৎ আবু কাইর সজাগ হয়ে দরজার দিকে তাকায়। ক্রোধে জ্বলে ওঠে তার চোখ। চোর বদমাইশ কোথাকার, এখানে এসে আমার দোকানে হানা দিয়েছ! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। এই লোকটাকে পাকড়াও। ব্যাটা মহাচোর।

আবু কাইর-এর হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাবসী নফরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে আবু শাইর-এর ওপর। দমাদ্দম কিল চড় ঘুষি চালাতে থাকে! ধোপাটা উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছড়ি হাতে তেড়ে আসে, তোর এত বড় সাহস দিন-দুপুরে এসেছিস আমার দোকানে চুরি করতে। মেরে ছাল চামড়া খুলে নেব।

সপাং সপাং করে বেতের চাবুক কষাতে থাকে সে। কয়েক পলকের মধ্যেই যন্ত্রণায় নীল বর্ণ হয়ে যায় আবু শাইর-এর দেহখানা। সবে এতবড় অসুখ থেকে উঠেছে। গায়ে জুতসই বল হয়নি, তার উপর এই পাশবিক অত্যাচার। জোয়ান মর্দই সহ্য করতে পারে না, সে তো বয়সের ভারেই নুয়ে পড়েছে, তার এই রুগ্ন বার্ধক্য জর্জর দেহে এই আঘাত সে সইবে কি করে? আবু শাইর-এর অসাড় অচৈতন্য দেহখানা লুটিয়ে পড়ে গেল।

আবু কাইর হাঁপাতে হাঁপাতে ছড়িখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ফের যদি কখনও তোকে এ-মুখো আসতে দেখি, সুলতানকে বলে জন্মের মতো হাজতে ঢুকিয়ে দেবো, ঠগ জোচ্চোর কোথাকার।

তারপর হাবসীদের বললো, লোকটাকে রাস্তার ওপরে ফেলে দিয়ে আয়। আর কক্‌খনো ব্যাটাকে এই মহল্লায় ঢুকতে দিবি না।

সন্ধ্যার দিকে জ্ঞান ফিরে আসে আবু শাইর-এর। কোনও রকমে ব্যথা জর্জর দেহখানা টেনে নিয়ে সরাইখানায় ফিরে আসে। ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে সারা রাত ধরে কাতরায়।

সকাল বেলা অনেকটা সুস্থ বোধ করে আবু শাইর। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। অনেক দিন বাদে আজ সে হামামে গোসল করবে। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে এখানকার হামামটা কোন্ দিকে, ভাই?

—হামাম? হামাম আবার কী?

লোকটা অবাক হয়ে আবু শাইরকে প্রশ্ন করে।

আবু শাইর বলে, কেন হামাম জান না? যেখানে সাধারণ মানুষ গোসল করে। আমাদের দেশে প্রতি মহল্লায় সরকার থেকে হামাম ঘর বানিয়ে দেয়। যাতে সাধারণ মানুষ অল্প পয়সায় গোসল করতে পারে।

লোকটা বললো, গোসল করার জন্যে দরিয়ায় যাও। যত খুশি প্রাণ ভরে ডুব দিয়ে গোসল কর। হামাম আবার কী? আমরা সবাই তো দরিয়ার পানিতেই গোসল করি।

—কিন্তু দরিয়ার পানি তো নোনা। মিঠা পানি না হলে গোসল করা যায়?

লোকটা অবোধের মতো বলে, কি জানি হামাম বলতে তুমি কী বোঝাতে

চাইছ। আমি তো বাপের জন্মে হামাম বলে কিছু শুনিনি। আমাদের যখন ইচ্ছে হয় আমরা দরিয়ায় যাই।

আবু শাইর এই প্রথম বুঝতে পারলো এদেশের লোক গোসলের বিলাসিতা বোঝে না। তারা ঠাণ্ডা পানি গরম পানি দিয়ে গোসল করার মজা কখনও অনুভব করেনি।

আবু শাইর সুলতানের দরবারে যায়। বিদেশী একজন দর্শন-প্রার্থী শুনে সুলতান তাকে ডেকে পাঠান। আবু শাইর সুলতানের সামনে এসে যথাবিহিত কুর্নিশ করে বিনম্র ভঙ্গীতে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

—সুলতান মহানুভব, আমি এক বিদেশী। সুলতানের দরবারে আমি এক আর্জি নিয়ে এসেছি।

সুলতান বলে, বেশ বল তোমার আর্জি।

আবু শাইর বলে, জাতে আমি নরসুন্দর। হামামের সব কাজ জানি। যদিও আমাদের দেশে একটা হামামে পানি গরম করার এবং গোসল করানোর লোক আলাদা আলাদা, কিন্তু আমি একাই সমস্ত কাজ জানি। জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন আমি একটা হামাম ঘরের দায়িত্ব নিতে পারি।

সুলতান অবাক হয়। অবাক হয় উজির আমির সকলেই। এমন তাজ্জব কথা শুনেছে নাকি কেউ। হামাম ঘর—গোসলখানা—সে আবার কী বস্তু?

সুলতান বলে, তোমার কথা বুঝলাম না পরদেশী। হামাম কাকে বলে?

আবু শাইর বলে, সে আমি বুঝতে পারছি, জাঁহাপনা। আপনি হামাম ঘর কখনও দেখেননি। সেখানে গোসল করার যে কী আনন্দ আপনার দেশের মানুষ তা জানে না। আজ সকালে আমি হামামে গোসল করবো বলে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমার কথা বুঝতেই পারলো না। তখন জানলাম আপনার দেশে হামাম বলে কিছু নাই। আপনার এত বড় সুন্দর এই শহর, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ব্যবস্থারই ত্রুটি রাখেননি আপনি, অথচ অবাক লাগে, কোনও হামাম নাই। পথশ্রান্ত মানুষ একটু জিরিয়ে নেবে, তারপর গা হাত পা ঘষে মেজে সাফ করে, ঠাণ্ডা গরম পানি দিয়ে গোসল করে, শরীরটা ঝরঝরে চাঙ্গা করে তুলবে তার কোনও ব্যবস্থা নাই। হামাম ঘর সব সভ্যদেশের শহরের শোভা। যে শহরের হামাম ঘর যত সুন্দর আমরা সে-শহরের তত প্রশংসা করি। একটা শহরের হামাম ঘরে ঢুকলেই সে শহরের মানুষের পরিচ্ছন্নতা রুচি প্রকৃতির পরিচয় পাই। এক কথায় বলতে গেলে, আধুনিক মানুষের জীবনে হামামই বেহেস্ত। সারাদিনের খরতাপে দগ্ধ হয়ে দুদন্ডের শান্তি এনে দিতে পারে শুধু হামামই।

সুলতান বলে, কিন্তু তোমার কথায় তো কিছু ঠাওর করতে পারছি না পরদেশী। কি এমন আজব চীজ যাকে তুমি বেহেস্তের সঙ্গে তুলনা করছ?

আবু শাইর বোঝাতে থাকে, জাঁহাপনা, হামাম ঘর কী ভাবে বানাতে হয় বলছি, শুনুন: একখানা বড় ইমারত—বিশেষভাবে হামামের জন্যেই তৈরি করা হয়। তাতে থাকবে বিশ্রাম করার বড় জায়গা। গোসলের ঘর। পানির

চৌবাচ্চা। ঠাণ্ডা পানি গরম পানির ফোয়ারা। গোসলের পর সাজ-পোশাক প্রসাধনের ঘর। আর থাকবে খানা-পিনার কামরা। মোট কথা একটা মানুষ তেতে পুড়ে সেখানে ঢুকে,আগে খানিকটা বিশ্রাম করে নিজেকে ঠাণ্ডা করে নেবে। তারপর গোসল সেরে সাজ-পোশাক পালটে প্রসাধন করে অল্প কিছু হালকা সরবৎ পানি খেয়ে ঝরঝরে তাজা হয়ে বেরুতে পারবে। হামামে গোসল করাবার লোক ভাড়া পাওয়া যায়। তাদের কাজ সাবান ছোবড়া দিয়ে খদ্দেরের সারা শরীরের ময়লা সাফ করে দেওয়া। তারপর সুগন্ধী পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দেয় তারা। মেয়েদের জন্য মেয়ে এবং মর্দদের জন্য পুরুষ মানুষ ভাড়া পাওয়া যায়! হামামের বিশ্রামাগারে নাপিত বসে থাকে। যদি কেউ চুলদাড়ি কামাতে চায় কামিয়ে দেবে সে! তার জন্যে সামান্যই দক্ষিণা দিতে হয়। আপনি যদি আগ্রহ দেখান আমি আপনাকে আরও নিখুঁতভাবে সব বুঝিয়ে দিতে পারি জাঁহাপনা।

সুলতান মুগ্ধ বিস্ময়ে আবু শাইর-এর কথা শুনছিল এতক্ষণ।

—বড় আজব ব্যাপার। ঠিক আছে আমি রাজি। আজ থেকেই তুমি কাজে লেগে যাও পরদেশী! তোমার যা যা দরকার, আমি উজিরকে বলে দিচ্ছি, সব তোমাকে জোগান দেবে সে।

আবু শাইর বলে, আপনার রাজমিস্ত্রীকে ডাকুন। আগে আমি হামামের জন্য কি ভাবে ইমারত বানাতে হবে 'তাকে বুঝিয়ে দেব।'

সেইদিনই সুলতানের হুকুমে রাজমিস্ত্রীরা হাজির হলো। আবু শাইর হামামের নক্সা এঁকে তাদের বুঝিয়ে দিল—কী ভাবে কী ধরনের ইমারত বানাতে হবে।

সুলতান আবু শাইর-এর থাকার জন্য একখানা বড় বাড়ি কয়েকজন চাকর নফর দাসী. দামী দামী আসবাব পত্র, সুন্দর সুন্দর খচ্চর গাধা ঘোড়া, বাহারী সাজ-পোশাক আর প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দিল।

হামামঘরের জন্য শহরের ঠিক মাঝখানে এক জায়গা নির্বাচন করা হলো। সেখানে বানানো হবে আবু শাইর-এর নক্সা মত একখানা ইমারত।

দিনরাত খেটে মিস্ত্রীরা কয়েক দিনের মধ্যে একখানা বিশাল ইমারত বানিয়ে দিল। আবু শাইর নিজের পছন্দ মতো আসবাবপত্রে সুন্দর করে সাজালো সেই হামামঘর।

সাজানো-গোছানো শেষ হলে সুলতানের কাছে গিয়ে সে বললো, জাঁহাপনা আপনার হামাম তৈরি হয়ে গেছে। মেহেরবানী করে আপনি একবার পায়ের ধুলো দেবেন, চলুন।

সুলতান হামামে এসে খুশিতে উপচে পড়ে। এমন চমৎকার বস্তু যে মানুষ কল্পনা করতে পারে ভাবতে পারে না সে। ঘরের ভিতরে পা দিতেই এক অপরূপ প্রশান্তিতে ভরে যায় মন-প্রাণ। সত্যিই, আরামের জায়গা।

আবু শাইর বললো, সবই হয়ে গেছে. এখন আমার কিছু কর্মচারী চাই, হুজুর।

সুলতান বললো, কী কী ধরনের কর্মচারী চাও, বল। আজই আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—জনা কুড়ি তাগড়াই হাবসী ছোকরা চাই—এরা ডলাই-মলাই করে গায়ের ময়লা সাফ করবে। কী করে করতে হবে আমি তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।

—এ আর বেশি কথা কী। আমার প্রাসাদ থেকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। আর কী চাই বলো ?

—আর বিশেষ কিছু না, কিছু দামী সুগন্ধী আতর, গোলাপ নির্যাস, কিছু তুরস্কের তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি।

সুলতান বললো, ও সব তোমার পছন্দ মতো বাজার থেকে কিনে নেবে। এই রাখো দশ হাজার দিনার—হবে তো ঃ

—এত কী হবে, জাঁহাপনা !

—যা লাগে লাগবে, বাকীটা তোমার বকশিশ।

আবু শাইর কুর্নিশ জানায়, জাঁহাপনার অসীম দয়া।

সুলতান বললো একটা ভালো দিনক্ষণ দেখে শুভ উদ্বোধন করো। আমি হবো তোমার প্রথম খদ্দের, কী, রাজি ?

আবু শাইর বিনয়াবনত হয়ে বলে, আমি দিনক্ষণ দেখে আপনাকে জানাবো, হুজুর।

সারা শহরে লোকের মুখে মুখে একই কথা উচ্চারিত হতে থাকে, এক পরদেশী আজব জিনিস বানিয়েছে—গোসলখানা। স্বয়ং সুলতান সেখানে আসবেন গোসল করতে। দলে দলে মানুষ এসে জড়ো হতে লাগলো হামাম ঘরের সামনে। বিশাল পেল্লাই ইমারত। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে তৈরি। নানা কারুকার্য করা। বাইরে থেকে দেখেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ভিতরে না জানি কী আছে। সুলতান আজ গোসল করবেন এখানে। তারপর জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই হামাম। তখন সাধারণ মানুষ ঢুকতে পারবে ভিতরে।

সকালে উঠেই আবু শাইর উনুনে চাপিয়েছে পানি। গরম পানি ঠাণ্ডাপানি দুই-ই লাগে গোসলের সময়। সদর ফটকে শানাই বসানো হয়েছে। মালিকে বলা ছিল, নানা রকম বাহারী ফুলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে সারা হামামঘর।

উজির আমির বয়স্যদের নিয়ে সুলতান এল গোসল করতে। সামনে পিছনে সেনাপতিরা ভিড় সরাতে ব্যস্ত। সুলতান সদর ফটকে পা দিয়েই চমকে ওঠে।

—আঃ, কী মজাদার খুশবু !

যুঁই ফুলের সৌরভে মদির হয়ে গেছে চারদিক। আবু শাইর কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আজ জাঁহাপনার গোসলের পানিতে যুঁই-এর আতর মেশানো হয়েছে।

অন্দরে গোসলঘরে জলের ফোয়ারায় আতর দেওয়া হয়েছে। তার সুবাসে সারা বাড়ি ভরপুর। সুলতানকে সাদর অভ্যর্থনা করে বিশ্রামাগারে নিয়ে যায় আবু শাইর। দেওয়ালের চারপাশে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা নগ্ন নিরাবরণ

নারী-পুরুষের জলকেলি এবং রতিরঙ্গের দৃশ্যাবলী। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিরাট একখানা শ্বেত পাথরের গোলাকৃতি মেজ। সেই মেজ-এর উপরে ডাবর-সদৃশ একটা কারুকার্য-খচিত রূপার ফুলদানীতে এক ঝাড় নানা বর্ণের সুন্দর ফুল। ঘরের চারপাশে আরাম-কেদারা, কুর্শি, পালঙ্ক।

সুলতানকে পালঙ্কে বসিয়ে নিরাবরণ করলো আবু শাইর। দুখানা বড়বড় তোয়ালে দিয়ে সারা শরীর মুড়ে দিল তার। বললো, এবার মেহেরবানী করে গোসল ঘরে চলুন, জাঁহাপনা।

সুবোধ বালকের মতো সুলতান আবু শাইরকে অনুসরণ করে পাশের কামরায় চলে যায়। ধবধবে সাদা মসৃণ শ্বেত পাথরের মেজেয় শুইয়ে দেয় সুলতানকে। তারপর দুটি ছোকরা বান্দার সাহায্যে আবু শাইর সুলতানের সারাদেহ পানি সাবান আর ছোবড়া দিয়ে আচ্ছা করে সাফ করে। বহুকালের সঞ্চিত ক্লেদ ঘষা-মাজায় সাফ হয়ে যায়। ঠাণ্ডা-গরম পানি মিশিয়ে সুলতানকে নিজে হাতে গোসল করায় আবু শাইর।

স্নান পর্ব শেষ করে নতুন সাজ-পোশাক পরে যখন সরবতের টেবিলে এসে বসে মনে হয় তার দেহের ওজন বুঝি শূন্য হয়ে গেছে। ইচ্ছে হয়, ডানা মেলে দূর নীল নভে উড়ে চলে যায়। স্নানের যে এত অপার আনন্দ, এর আগে কখনও অনুভব করেনি সুলতান। খুশিতে ভরে যায় দেহ মন প্রাণ। আবু শাইর আজ তাকে নতুন জীবনের স্বাদ এনে দিয়েছে। এর বিনিময়ে কী মূল্য তাকে দেবে সে? আবু শাইর এক গেলাস পেস্তার সরবত এনে সামনে ধরে। আঃ কী সুন্দর সুবাস। সরবতে চুমুক দিয়ে সুলতান বলে, আজ যে সুখ-বিলাসের সন্ধান তুমি দিলে আবু শাইর তা আমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। এখন বল, কী ইনাম তুমি চাও।

আবু শাইর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও কথা বলে না।

—না না, চুপ করে থাকলে হবে না, আবু শাইর, বল তুমি কী চাও।

আবু শাইর মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার কিছুই চাইবার নাই, জাঁহাপনা। হুজুরের ভালো লেগেছে, এ-ই আমার সব চাইতে বড় পুরস্কার।

শুধু সুলতান নয়, উজির আমির বয়স্য—সকলেই অবাক হয়ে তাকায় আবু শাইর-এর দিকে। লোকটা বলে কী? স্বয়ং সুলতান তাকে দিতে চাইছেন। যা মুখ ফুটে চাইবে তাই সে পেতে পারে। এক মুহূর্তে সে লক্ষপতি হতে পারে। অথচ বলে কিনা—চাইবার কিছুই নাই!

সুলতান বলে, এ তুমি কি কথা বলছো, আবু শাইর! তুমি যদি আমার কাছে কিছু চাইতে, তা সে যত মূল্যের হোক, আমি দিতাম। কিন্তু কিছুই না চেয়ে তুমি আমাকে অনেক বেশি দেনার অঙ্গীকারে বেঁধে ফেললে। তোমার মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষ আমি খুব বেশি দেখিনি। যাক, তুমি যখন দেশে ফিরে যাবে সেই সময় তোমাকে আমি আমার সাধ্যমতো ইনাম দেবো—খুশি হয়ে নিয়ে যেও, কেমন?

আবু শাইর বলে, সুলতান মহানুভব, এর চাইতে ভালো আর কী হতে

পারে, জাঁহাপনা।

সুলতান বলে, আচ্ছা আবু শাইর তোমার হামামে যারা গোসল করতে আসবে তাদের কাছ থেকে কী নেবে তুমি।

—জাঁহাপনা, যদিও এই আমার রুজি-রোজগারের পথ, তবুও ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষকে দু-দণ্ডের শান্তি দেওয়াই এর আসল উদ্দেশ্য। লোক খুশি হয়ে যে যা আমাকে দিয়ে যাবে তাই আমি মাথা পেতে নেবো, হুজুর। আমার কোনও দাবি নাই।

সপারিষদ সুলতান আর একবার চমকে ওঠে। সত্যিই লোকটা অসাধারণ। উজির বলে, আচ্ছা ধর লোকে যদি এসে গোসলাদি সেরে পয়সা না দিয়েই চলে যায়—

আবু শাইর মুচকি হাসে, বেশ কাল আপনি আসবেন, আপনাকে দিয়েই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।

সুলতান সহ পারিষদরা সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। সুলতান বলে, কী উজির। তোমার থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে তো আবু শাইর। আমার সারা সলতানিয়তে তোমার চেয়ে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান আর কেউ নাই বলে তুমি আমার পরামর্শদাতা—উজির। কিন্তু আজ তুমি সামান্য এক নাপিতের কাছে হেরে গেলে?

উজির বলে, আমার চাইতে যে বিচক্ষণ—তার কাছে নতি স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নাই, জাঁহাপনা।

সুলতান হাসতে হাসতে বলে, এরজন্যে দশ হাজার দিনার জরিমানা হলো তোমার। টাকাটা পাবে আবু শাইর। আর যাবে আমার খাজাঞ্চীখানা থেকে। খাজাঞ্চীকে হুকুম দিয়ে দিও।

সবাই আমোদে হাসতে থাকে।

পর পর তিনদিন সাধারণের জন্য বিনামূল্যে হামামের দরজা উন্মুক্ত করে দিল আবু শাইর। লোকে আসুক, দেখুক—হামাম ঘর কী বস্তু। তারপর তারাই পাঁচজনের মধ্যে প্রচার করবে এর গুণগান।

আবু শাইর-এর এই চালে কয়েকদিনের মধ্যেই সারা শহরের সমস্ত মানুষ জেনে গেল হামামের মহিমা। যারা গোসল করে গেল, তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আত্মীয়-স্বজন ইয়ার-বন্ধুদের পাঠাতে থাকলো। ফলে, প্রতিদিন সকাল থেকেই হামামের সামনে বিরাট ভিড় জমতে লাগলো। আবু শাইর বললো, সবাই সমান সুযোগ পাবেন। আপনারা মেহেরবানী করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান।

বাঁধাধরা পয়সা দেবার কোনও ব্যাপার না থাকায় যার যা খুশি ইনাম দিয়ে যেতে লাগলো। এতে গরীব লোকরা যেমন অল্প পয়সায় আরাম আনন্দ পেতে থাকলো, বড়লোকরা তেমনি খুশি হয়ে আবু শাইর-এর ঝুলি ভরে দিয়ে যেতে লাগলো। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবু শাইর শহরের এক সেরা ধনী হয়ে উঠলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ছিয়ানব্বইতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয়:

শহরের উজির আমির সম্ভ্রান্ত সওদাগররা সকলেই হামামের নিয়মিত খদ্দের। তারা যতবারই গোসল করতে আসে আবু শাইরকে একশোটা সোনার মোহর একটি ফর্সা এবং একটি হাবসী বান্দা উপহার দিয়ে যায় এবং সেই সংগে একটি করে বাঁদীও দিয়ে যায় তারা। কয়েক দিনের মধ্যে আবু শাইর পেল চল্লিশটা ফর্সা, চল্লিশটা হাবসী বান্দা আর চল্লিশটা বাঁদী। এছাড়া সুলতান তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা, দশটা ফর্সা ছোকরা, দশটা হাবসী ছোকরা বান্দা, আর দশটা চাঁদের মতো সুন্দরী বাঁদী পাঠালো।

আবু শাইর সুলতানের কাছে গিয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনি মেহেরবান, শাহেনশাহ। আপনার অসীম কৃপায় আজ আমার অনেক হয়েছে। কিন্তু জাহাপনা, আমি এই বান্দা আর বাঁদীর বাহিনী নিয়ে কী করবো! গরীব মানুষ, খেটে খাই, এতগুলো লোককে বসে বসে খাওয়ানোর সামর্থ্য নাই আমার। সামর্থ্য থাকলেও প্রয়োজন নাই। আমি তো আর লড়াই করতে যাবো না কারো সংগে। আপনি ওদের ফেরত নিয়ে নিন, এই আমার আর্জি।

সুলতান বললো, এ সবই তো সম্পত্তি। যার ঘরে যত দাসদাসী বান্দা নফর থাকে, তাকেই আমরা তত বিত্তবান মনে করি। তোমার কাছে যদি এসব বোঝা বলে মনে হয়, কিছু চিন্তা করো না, যখন তুমি দেশে ফিরে যাবে, আমাকে সব দিয়ে যেও। আমি ন্যায্য দামে কিনে নেবো ওদের।

আবু শাইর বলে, দামের কোনও কথা ওঠে না, জাঁহাপনা। আমি ওদের আপনার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার ওসব ঝামেলা সহ্য করার অভ্যাস নাই।

সুলতান হাসলেন, তা ঠিক। তুমি সদাশয়, নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাও। বেশ ওদের পাঠিয়ে দাও। আমি প্রত্যেকটির জন্য একশো দিনার দাম দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

আবু শাইর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি, হুজুর।

সুলতান খাজাঞ্চীকে ডেকে বলে দিল, একশো দিনার হিসাবে একশো পঞ্চাশটা বান্দা বাঁদীর দাম দিয়ে দাও আবু শাইরকে।

আবু শাইর দুহাতে পয়সা লুঠতে থাকলো। এত পয়সা সে কী করবে? মোহরগুলো বস্তাবন্দী করে একটা ঘরে পরপর সাজিয়ে রাখতে লাগলো। কিছুকালের মধ্যে এত বস্তা জমে উঠলো যে, ঘরে আর রাখার জায়গা হয় না।

হামামের প্রবেশ দ্বারের এক পাশে বিরাট একটা বাক্স। গোসল শেষে যে যা ইচ্ছা করে সেই বাক্সে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আবু শাইর রাত্রি বেলায়,

হামামের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বাক্সটা খুলে দেখে, দিনার দিরহামে একেবারে ভর্তি। এইভাবে প্রতিদিন পয়সার পাহাড় জমতেই থাকে। আবু শাইর ভেবে পায় না, এত অর্থ নিয়ে সে কী করবে?

সুলতান, বেগম, উজির আমিররা নিয়ম করে প্রতিসপ্তাহে একদিন হামাম ঘরে আসে। প্রতিবারই মোটা মোটা দক্ষিণা পায় আবু শাইর।

এত অর্থ, এত বাদশাহী খাতির, কিন্তু আবু শাইর-এর কোনও অহংকার নাই। আগেও যেমন ছিল, এখনও সে তেমনি সদাশয়, পরোপকারী। চালে-চলনে, পোশাকে-আশাকে এমনকি খানা-পিনাতেও সে অনাড়ম্বর একেবারে সাদাসিধে মানুষ। কোথাও কোনও পরিবর্তন হয়নি। অভুক্ত মানুষ দেখলে এখনও তার মন কাঁদে। পরের উপকারে আসতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে সে। এখনও সে আগের মতোই গল্পবাজ, আড্ডা-প্রিয়, সদা উচ্ছল প্রাণবন্ত মানুষ। তার এই দিল দরিয়া ব্যবহারের জন্য একবার সে কী ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিল সে কাহিনী পরে শোনাচ্ছি। শুধু এইটুকু এখন শুনে রাখুন, একদিন এক জাহাজের কাপ্তান এসেছিল তার হামামে। ঘটনা চক্রে তার কাছে কোনও পয়সা কড়ি ছিল না। আবু শাইর তাকে, কোনও রকম পয়সার তোয়াক্কা না করে, খুব যত্ন করে ঘষে মেজে গোসল করিয়ে দিয়েছিল। কাপ্তান খুব খুশি হয়ে চলে গিয়েছিল সেদিন। বলে গিয়েছিল, আল্লাহ যদি কখনও সুযোগ করে দেয়, আমি তোমার এই সদ্ব্যবহারের প্রতিদান দেবো, শেখ। সারা জীবন আমি তোমাকে মনে রাখবো।

আপনারা এর পরের কাহিনী পরে শুনবেন। এখন পরম বন্ধু আবু কাইর-এর কথা শুনুন ঃ

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে হামামের প্রশংসা। আবু কাইর একদিন এল গোসল করতে। শহরের সব বিত্তবানরাই গোসল করে যায়। তারা কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে, হামামে সে গোসল করেছে কিনা। আবু কাইর 'সময় পাই নি, পরে যাবো' বলে বলে এড়িয়ে আসছিল। কিন্তু আর চুপ করে থাকা যায় না। যায় যাবে শ'খানেক দিনার, তবু তাকে হামামে যেতেই হবে। নইলে সমাজে ইজ্জৎ থাকে না। তাই আজ এসেছে সে গোসল করতে।

পরনে জমকালো বাদশাহী সাজ। বাহারী জীন লাগামে খচ্চরটাকে সাজিয়ে তার পিঠে চেপে এসেছে আবু কাইর। সামনে পিছনে বান্দাদের এক বাহিনী। সারা পথ তারা সেলাম ঠুকতে ঠুকতে, আবু কাইরকে তোয়াজ করতে করতে নিয়ে এসেছে।

হামামের দরজার সামনে পৌঁছতেই এক সুন্দর সুবাস ভেসে আসে তার নাকে। চন্দনের গন্ধ। আবু কাইর লক্ষ্য করে, দলে দলে লোক ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। কিন্তু কোনও হুড়োহুড়ি বিশৃংখলা নাই। একজনের পাশে এসে আর একজন বসে অপেক্ষা করছে। একের পর এক সবাই গোসল করার সুযোগ পাবে। গরীব বড়লোক কোনও ভেদাভেদ নাই। সকলের সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ।

বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করতেই আবু কাইর দেখতে পেল, একধারে একটা কুর্শিতে বসে আছে তার পুরনো দোস্ত আবু শাইর। মুখে তার সহজাত মিষ্টি হাসি। আবু কাইর বিশ্বাস করতে পারে না, এই সেই আবু শাইর। রোগা হাড় জির জিরে চেহারা ছিল তার, কিন্তু এখন সে দিব্যি নাদুস নুদুস হয়ে উঠেছে। আপেলের মতো সুন্দর গালে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু দেহের চেকনাই-এ খোলতাই হয়ে গেছে তার রূপ।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিল তারপর দারুণ উচ্ছ্বাসের ভান করে সে এগিয়ে এল আবু শাইর-এর দিকে।

—আরে—আরে—তুমি? আবু শাইর—? এখনও বেঁচে আছো? আচ্ছা লোক যাহোক, তোমার এই অপদার্থ বন্ধুটি বেঁচে রইলো কি মরে গেল একবার খোঁজও নিলে না। একেই বলে আজব দুনিয়া—না? তুমি হয়তো বলবে, এত বড় শহর, কোথায় আমার খোঁজ করবে? কিন্তু সে কথা কি ঠিক? সারা শহরের প্রতিটি মানুষ আজ আবু কাইর-এর নাম জানে। আমি এখন সুলতানের রজক। এ দেশে রঙের বন্যা এনে দিয়েছি। এখানকার মানুষে আগে সাদা আর নীল ছাড়া অন্য কোনও রঙের ব্যবহার জানতো না। কিন্তু আমি তাদের নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছি। তারাও আমাকে মাথায় করে রেখেছে। আজ শুধু আমার পয়সাই হয়নি, নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তিতে আজ আমার জুড়ি নাই। কোনও উৎসব অনুষ্ঠান আমাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। সুলতানের দরবারে একমাত্র আমারই অবাধ গতি। আমি যখন তখন তার সঙ্গে দেখা করতে পারি। কেউ কোনও টু শব্দটি করতে পারবে না। এমন কি স্বয়ং উজিরও আমার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে। আমার ইচ্ছায় সুলতানকে দিয়ে করতে না পারি এমন কোনও কাজ নাই।

আমার যখন সুদিন ফিরলো, বিশ্বাস কর দোস্ত, সব আগে তোমার কথাই আমার মনে হয়েছিল। চার দিকে চর পাঠালাম। সারা শহরের গলিঘুচি, সরাইখানা, মুসাফিরখানা—সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে তারা। কিন্তু কেউই তোমার কোনও সন্ধান দিতে পারে নি।

আবু শাইর হাসে, অবিশ্বাসের হাসি। বলে, কিন্তু বন্ধু আমি তো তোমার দোকানের দরজায় গিয়েছিলাম। সেদিন তুমি আমাকে যে ভাবে আদর অভ্যর্থনা করেছিলে, তা তো ভুলবার নয়।

—কী যা তা বলছো, দোস্ত। তুমি আমার দোকানে কবে গিয়েছিলে?

সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। এই হামাম ঘর তৈরি হওয়ার কিছুদিন আগে। দুটি মাস আমি বিমারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ঐ সরাইখানার মালিক না থাকলে মরেই যেতাম। যাই হোক, অসুখ থেকে উঠেই প্রথমে তোমার সন্ধানে বেরুলাম। তোমার ঠিকানা পেতেও বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু ঠিকানা না পেলেই বুঝি ভালো হতো—

আবু শাইর-এর চোখ জলে ভরে আসে।—সেদিন সবে আমি পথ্য করেছি।

গায়ে এক ফোঁটা বল নাই, কোনও রকমে পথে পা ফেলে চলতে পারি, সেই রোগ-জর্জর অবস্থায় সেদিন তুমি আমাকে চুরির অপবাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলে আবু কাইর। কী, ভুলে গেছ ?

আবু কাইর যেন আকাশ থেকে পড়ে।—কী যা তা বলছো ভাই ?

—যা তা নয় আবু কাইর, বুকে বড় ব্যথা নিয়ে বলছি এসব কথা। সেদিন তুমি আমার ওপর তোমার হাবসী বান্দা লেলিয়ে দিয়েছিলে বন্ধু !

—অসম্ভব। তুমি আমার দোকানে গেছ, আর আমি চিনতে পারবো না ?

—কেন চিনতে পারবে না, ভাই ? তুমি আমাকে, অসুখে যত ক্ষীণ কৃশকায়ই হয়ে থাকি, দেখামাত্র চিনেছিলে।

—বিশ্বাস কর, আবু কাইর মিথ্যা অনুতাপের ভান করে বলতে থাকে, আমি চিনতে পারিনি। কত চোর ছ্যাঁচোড় দোকানের সামনে থেকে কাপড়-চোপড় চুরি করে সরে পড়ে তুমি জান না। সেই কারণে আমার লোকজনকে বলা আছে, ভিখিরি টিখিরি জাতের কোনও লোককে দোকানের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। ওরাই বেশি চোর হয়। তা তোমার তো তখন খুব দৈন্যদশা। হয়তো ওরা ভুলটুল করে থাকবে। তুমি কিছু মনে করো না, ভাই।

আবু শাইর কঠিন কণ্ঠে বলে, না, ভুল কেউ করেনি। তোমার বান্দারাও করেনি তুমিও করোনি। তুমি জেনে শুনেই তোমার লোককে হুকুম দিয়েছিলে আমার ওপর চড়াও হতে। তোমার আশঙ্কা হয়েছিল, আমি তোমার লাভের ব্যবসায় ভাগ বসাতে চাইবো। তাই সেই মুহূর্তেই পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে বেতের চাবুক নিয়ে ছুটে এসেছিলে তুমি। এই দ্যাখো, এখনও কোন দাগই মিলায়নি, কী নির্মমভাবে তুমি আমাকে সেদিন প্রহার করেছিলে, ভাই। কী করে হাত উঠেছিল তোমার ?

আবু কাইর একমুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারে না। দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে, ইস্‌ এতবড় ভুল আমি করেছি, দোস্ত। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কী করে—

আবু শাইর-এর বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, লোকটা এখনও তাকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে।

—যাক ভাই, ওসব কথা। যা গেছে তা গেছে। ও নিয়ে আর আমার কোনও ক্ষোভ নাই। হ্যাঁ, চল, গোসল করবে তো ?

আবু কাইরকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায় আবু শাইর।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটানব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

আবু কাইর জিজ্ঞেস করে, তোমার এই ভাগ্য পরিবর্তন কবে হলো ? কী ভাবে হলো ?

আব্দু শাইর বলে, আল্লাহ্ যখন যাকে দেয়, ছপ্পর ফুঁড়েই দেয়। কোনও কারণ থাকে না তার।

এরপর সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী খুলে বললো তাকে। আবু কাইর মনের জ্বালা চেপে মুখে খুশির বন্যা ভাসিয়ে বলে, সুলতান যে তোমার উপর সদয় হয়েছেন এতে আমার চেয়ে আর কেউই এত খুশি হতে পারবে না দোস্ত। আমি সুলতানকে তোমার গুণের কথা শোনাবো। বলবো, তুমি আমার শুধু স্বদেশবাসীই নয়, একেবারে জীগরী দোস্ত। দেখো, তাতে তিনি তোমাকে আরও সুনজরে দেখবেন।

আবু শাইর বলে, আমি কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ওপরেই ভরসা রাখি, ভাই। আজ আমার যা কিছু ধন-দৌলত, সে সবই তাঁর কৃপায়। আমি বিশ্বাস করি, তিনি কেড়ে নিতে চাইলে, স্বয়ং বাদশাহও আমাকে সুখে রাখতে পারবেন না। আর তিনি যদি দরাজ হাতে আমাকে দিতে চান, সাধ্য নাই কারো, আমার সুখ সম্পদ কেড়ে নিতে পারে। সুতরাং ওসব কথা থাক। সবই নসীবের লেখা। কেউ তা এড়াতে পারবে না।

আবু কাইরকে নিরাবরণ করে তোয়ালে জড়িয়ে সে গোসলখানায় নিয়ে যায়। নিজে হাতে তাকে সাবান ছোবড়া দিয়ে ঘঁষেমেজে সাফ করে গোসল করায়। তারপর প্রসাধন কামরায় নিয়ে এসে সাজ-পোশাক পরিয়ে দামী সরবৎ খেতে দেয়।

সাধারণ মানুষ দেখলো সুলতানের পেয়ারের রজককে হামামের মালিক স্বয়ং তোয়াজ করে গোসল করাচ্ছে। একমাত্র সুলতান ছাড়া, দ্বিতীয় কোনও মানুষকে সে নিজে হাতে কখনও গোসল করায় না।

আবু কাইর যাবার সময় আবু শাইরকে একটা মোহরের তোড়া দিতে যায়। আবু শাইর গ্রহণ করে না, তোমার একটুও লজ্জা হলো না আবু কাইর। তোমার আমার সম্পর্ক কী পয়সার? সামান্য এই পয়সা দিয়ে আমাদের বন্ধুত্বে ইতি করতে চাও?

—না ভাই, তা কেন চাইবো! তোমার আমার বন্ধুত্ব চির-জীবনের। যাক ওসব কথা, তোমার হামামের সব ব্যবস্থাই চমৎকার। শুধু একটি খুঁৎ চোখে পড়লো।

—কী, বল?

—তোমার খদ্দেরদের চুল দাড়ি কামাবার সময় নরম কাই লাগিয়ে নাও না কেন? তাতে যেমন মোলায়েম করে কামানো যায়, তেমনি আরও আরাম পেতে পারে মানুষ। আমি তোমাকে এই কাই তৈরি করার কায়দা-কানুন সব বলে দিতে পারি।

—বাঃ চমৎকার বলেছো তো। আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু এদেশে শখের জিনিস বড় একটা পাওয়া যায় না। তা বানাবার মাল-মসলা আর কায়দা যদি বাৎলে দাও; আমি বানিয়ে নেবো!

আবু কাইর বলে, তুমি বাজার থেকে হলদে রঙের শেঁকো বিষ আর কড়া

চুন কিনে আনবে। একটু তেলের সঙ্গে এই দুটো খুব ভালো করে মেড়ে নেবে। তারপর দেবে খানিকটা আতর। তাহলে বদ গন্ধটা কেটে যাবে। তৈরি হয়ে গেলে মাটির ভাঁড়ে ভরে রাখবে। এসব বিশেষ ধরনের প্রসাধন সাধারণ মানুষের জন্য নয়, যখন সুলতান আসবেন গোসল করতে শুধু তারই মুখে মাথায় মাখিয়ে কামাবে। দেখবে, তিনি কত খুশি হন। তোমাকে একেবারে মাথায় করে রাখবেন।

আবু শাইর একখানা কাগজে সব লিখে রাখলো, আমি আজই তৈরি করে রাখছি। সুলতান প্রত্যেক জুম্মাবারে আমার হামামে আসেন চুল দাড়ি কামিয়ে গোসল করতে।

আবু কাইর আর দাঁড়ালো না। হামাম থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল সুলতানের দরবারে।

—কী সংবাদ রজক-প্রবর? এস, এস—

সুলতান স্বাগত জানায় আবু কাইরকে। আবু কাইর বলে জাঁহাপনা বড়ই দুঃসংবাদ।

—সে কী? কী ব্যাপার?

—আপনার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হচ্ছে?

সুলতান এবং দরবারের সকলে এক সঙ্গে আঁৎকে ওঠে, সে কী?

আবু কাইর মুখে কপট গাম্ভীর্য টেনে বলে, হ্যাঁ হুজুর, আমার খবর মিথ্যা নয়। আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, ভুলেও আর কখনও আপনি ঐ হামামে গোসল করতে যাবেন না।

—কেন? কেন?

—আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছে। আপনার দেহে শেঁকো বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে আপনাকে খতম করবে আবু শাইর। ঐ মারাত্মক বিষ কড়া চুন দিয়ে সে কাই তৈরি করে রেখেছে। আপনি গেলেই আপনার মাথায় মুখে মাখিয়ে চুল দাড়ি কামিয়ে দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আপনার মুখ মাথা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সে আপনাকে বলবে, ঐ মারাত্মক কাই আপনার তলপেটের নিচে লাগাতে। ওটা লাগালে ক্ষুর কাঁচির দরকার হয় না। এমনিতেই চুল খুলে সাফ হয়ে যাবে। আপনি হুজুর, ঐ শয়তানের কারসাজীতে ভুলবেন না। যেখানে লাগবে পুড়ে দগদগে ঘা হয়ে যাবে।

সুলতান তাজ্জব হয়ে যায় আবু কাইর-এর কথা শুনে।

—কিন্তু আমাকে সে মারবে কেন, কী ফায়দা?

—লোকটা আসলে খ্রীস্টান সম্রাটের গুপ্তচর। ছদ্মবেশ ধরে এসেছে এখানে. আপনাকে মারতে পারলে সে অনেক ইনাম পাবে তাদের কাছ থেকে।

সুলতান ঘাড় নাড়েন, হুঁ। বুঝলাম। দুনিয়াতে মানুষ চেনা ভার। কে যে কী উদ্দেশ্য নিয়ে চলা ফেরা করে—বোঝা দায়।

আবু কাইর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা দেখিয়ে বলে, এই খবর শোনা ইস্তক আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে, জাঁহাপনা। আমি সব কাজ ফেলে

ছুটে এসেছি আপনার কাছে। যদি আপনি আজই চলে যান হামামে—

সুলতান দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় এখনই বুঝি কে যেন তার সারা অঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়েছে।

—ঠিক আছে, এসব নিয়ে আর বেশি আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখন সবাই চুপচাপ থাক, আমি উজিরকে নিয়ে আজই হামামে যাবো। দেখবো, কী ব্যাপার?

উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান হামামে আসে। আবু শাইর পুলকিত হয়। দুজনকে নিয়ে পাশের ঘরে যায়। প্রথমে সুলতান এবং পরে উজিরের সারা দেহ দলাই মলাই করতে থাকে।

এক সময় আবু শাইর বলে, জাঁহাপনা, চুল সাফ করার আমি এক রকম কাই তৈরি করেছি। ওতে আর ক্ষুরের দরকার হয় না। শুধু লাগিয়ে দিলেই হলো। ব্যস্, সব চুল পলকে উঠে সাফ হয়ে যাবে।

সুলতান গম্ভীরভাবে বলে, আগে উজিরের তলপেটে লাগাও দেখি। ওর তো সারা শরীরে ভালুকের মতো লোম।

মাটির ভাঁড় থেকে খানিকটা কাই নিয়ে আবু শাইর উজিরের তলপেটে লাগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে উজির। সুলতান বুঝতে পারে, আবু কাইর মিথ্যে বলেনি, মারাত্মক বিষই বটে। গর্জে ওঠে সুলতান। সঙ্গে সঙ্গে হামামের হাবসী ক্রীতদাসেরা এসে হাজির হয়।

—এই খুনীটাকে বাঁধো।

আবু শাইরকে পিঠমোড়া করে বেঁধে প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়। সুলতান বন্দরের কাপ্তানকে ডেকে বলে, এই বিশ্বাসঘাতকটাকে একটা চুনের বস্তায় পুরে দরিয়ার জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমি আমার প্রাসাদের জানালা দিয়ে স্বচক্ষে দেখতে চাই, লোকটা, কেমন করে ডুবে মরে।

কাপ্তান কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জো হুকুম, জাঁহাপনা।

আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে একদিন আবু শাইর তার হামামে এক কাপ্তানকে বিনা মূল্যে খুব আদর যত্ন করে গোসল করিয়েছিল। এই কাপ্তানই সেই ব্যক্তি।

কাপ্তান প্রহরীদের বললো, বন্দীকে আমার বন্দরে নিয়ে এস।

বন্দর থেকে সুলতানের প্রাসাদ, বেশি দূরের পথ নয়। কাপ্তান একখানা ছোট্ট ডিঙিতে আবু শাইরকে তুলে দাঁড় বাইতে বাইতে অদূরে একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে ভেড়ে।

—আমাকে চিনতে পারো শেখ?

কাপ্তান প্রশ্ন করে! আবু শাইর এতক্ষণ তার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করেনি। নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভেবে ভেবেই সে সারা। কাপ্তানের কথায় চোখ মেলে তাকাল সে। তাই তো, সেই কাপ্তানই বটে, একে সে একদিন গোসল করিয়েছিল।

কাপ্তান বললো, তোমার সেদিনের ব্যবহার আমি কোনও দিন ভুলতে পারবো

না শেখ। তোমার মতো সদাশয় মানুষ, এই জঘন্য কাজ কী করে করতে পারলো ?

আবু শাইর-এর চোখে জল আসে।—বিশ্বাস করুন, কাপ্তান সাহেব, আমার মধ্যে কোনও ঘোর প্যাঁচ নাই। আমি সরল সাদা-সিধে মানুষ—সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করি, আপন করে নিতে চাই। আমার বন্ধু আবু কাইর চুল কামাবার কাঁই একটা বানাবার মতলব দিয়ে গিয়েছিল। তার কথামতো মালমসলা কিনে এনে বানালাম সেই কাঁই। তখন কি জানি, বন্ধু আমার প্রাণনাশের ফাঁদ ধরিয়ে দিয়ে গেল আমার হাতে।

কাপ্তান বললো, অধর্মের জয় কোনও দিনই হয় না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, তোমার কাজের সুফল তুমি পাবেই, শেখ। সুলতান এখন ক্রুদ্ধ। তাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। সময় আসতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। দিন কয়েক তুমি এই দ্বীপেই থাকো। তারপর আমি তোমার বিধি-ব্যবস্থা করে দেবো। এবার আমি যাচ্ছি, সুলতান তোমাকে দরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে মারার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবেন বলে তাঁর প্রাসাদের বাতায়ন-পাশে বসে আছেন।

আবু শাইর বলে, কিন্তু আমি তো রইলাম এখানে! কী ভাবে তাঁকে দেখাবেন।

কাপ্তান হাসে, এই যে বস্তাখানা দেখছো, তোমাকে এতে ভরে পানিতে ফেলে দেবার কথা ছিল। এই বস্তায় আমি বালি আর পাথরের চাঁই ভরে নিচ্ছি। ডিঙি বেয়ে প্রাসাদের সামনে গিয়ে সুলতানের চোখের সামনে ঝুপ করে ফেলে দেবো—বুঝতেও পারবেন না তিনি।

আবু শাইর-এর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।—আমার জন্যে আপনি এত ঝক্কি নেবেন—যদি কোনওক্রমে ধরা পড়ে যান!

কাপ্তান বলে, যদি ধরা পড়ে যাই ? যাই যাবো। তবু এই ভেবে মরতে পরবো এক সহৃদয় নিরপরাধ মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিচ্ছি।

দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আবু শাইর-এর দু-গাল বেয়ে।

একটুক্ষণ পরেই কাপ্তান ডিঙি বেয়ে প্রাসাদের পিছনে এসে হাজির হয়। বাতায়নে বসে আছে সুলতান—পাশে পারিষদরা। কাপ্তান বালি আর পাথর ভর্তি বস্তাটা গড়াতে গড়াতে ডিঙির ধারে নিয়ে আসে। সুলতান জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারা করতেই সে ঠেলে ফেলে দেয় সমুদ্রের জলে।

সুলতান হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে দেখে তার অনামিকা থেকে মহামূল্যবান আংটিটা খসে পড়ে গেছে দরিয়ার অগাধ জলে। এই আংটিটা ছিল দৈবশক্তি সম্পন্ন। সুলতান এবং তাবৎ প্রজাদেরও বিশ্বাস সুলতান ঐ আংটির বলেই বলীয়ান। যতক্ষণ তাঁর কাছে ঐ অলৌকিক আংটি থাকবে ততক্ষণ দেশের বা বিদেশের কোনও শত্রু তাঁর কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। প্রজারা একান্ত বশংবদ হয়ে থাকবে।

সুলতান দিশাহারা হয়ে পড়ে। এ কী হলো ? এখন সে কী করবে। একথা জানাজানি হয়ে গেলে তার প্রজারা আর পরোয়া করবে না তাকে। সারা

সলতানিয়াতে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। ক্ষমতালোভী উজির সেনাপতিরা তাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করে বসতে পারে। সুতরাং কাউকে কিছু না বলাই সঙ্গত মনে করলো সে। কিন্তু মনে মনে দুর্বল, অসহায় বোধ করতে থাকলো। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যেতে লাগলো। সমুদ্রের পানি শোষণ করা তো সম্ভব নয়, সুতরাং তার সমস্ত শক্তির উৎস সে-আংটিও আর উদ্ধার হবে না কোনও দিন। সুলতান বিষণ্ণ বদনে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করলো। সকলে ভাবলো, হাজার হলেও সুলতানের দয়ার শরীর, আবু শাইরকে প্রাণদণ্ড দিয়ে অন্তরে আঘাত পেয়েছেন খুব।

সেই জন-মানব শূন্য নির্জন দ্বীপে আবু শাইর একা একা দিন কাটাতে থাকে। কাপ্তান তাকে কিছু খাবার-দাবার আর একখানা মাছ ধরার জাল দিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন সে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ায়। কখনও ইচ্ছে হলে, জাল ফেলে। ছোট বড় কত না জানা মাছ ওঠে। আবু শাইর নিজের খাবার মতো রেখে বাকীগুলো জলে ছেড়ে দেয়। কী হবে শুধু শুধু মাছগুলোকে মেরে।

সেদিনও সে খেলাচ্ছলেই জাল ফেলেছিল। কিন্তু টেনে আর তুলতে পারে না। পেল্লায় ভারি। কোনও রকমে কিনারে ওঠাতে দেখলো, বিরাট একটা মাছ জালে জড়িয়ে পড়েছে। অনেক দিন এত বড় মাছ সে চোখে দেখেনি। আবু শাইর ভাবলো, আজ আর অন্য কিছু না, এই মাছেরই ফলার করবে সে। ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতেই পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে কী যেন ঝকমক করে উঠলো। আবু শাইর কৌতূহলী হয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে, পাথর বসানো একটা আংটি। নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও সে কিছু বুঝতে পারলো না, পাথরটা কী? যাই হোক ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলে পরে নিল সে। ভাবলো, কাপ্তান এলে তাকে দেখাবে, হয়তো সে চিনলেও চিনতে পারে!

কিছুক্ষণ বাদে বন্দর থেকে একখানা ডিঙি ভাসিয়ে কাপ্তানের দুই অনুচর এসে হাজির হলো আবু শাইর-এর কাছে।

আবু শাইর জিজ্ঞেস করে, কাকে চাই?

ছেলে দুটি বলে, আমাদের কাপ্তান সাহেব সেই সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন! এখন পর্যন্ত ফেরেননি। তিনি আমাদের মাছ ধরতে বলে গেছেন। রোজ সুলতানের প্রাসাদে মাছ পাঠাতে হয় কিনা। কিন্তু আজ কী বরাত, সারা সকাল ধরে জাল ফেলে ফেলে একটা মাছ তুলতে পারলাম না। এখন কী হবে। মাছ না পাঠাতে পারলে গর্দান যাবে যে—

আবু শাইর বললো, অনেক সকালে কাপ্তান সাহেব একবার এদিকে এসেছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেননি। তারপর এইদিকে চলে গেছেন।

আবু শাইর ডান হাতটা ছেলে দুটোর মাথার ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে নির্দেশ করে দেখায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে এক তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল। হাতটা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটোর ধড় থেকে মাথা দুটো উড়ে গেল, আর ধড়

দুখানা পাক খেয়ে গড়িয়ে পড়লো নিচে।

আবু শাইর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এ কি হলো? কী করে হলো—কিছুই অনুমান করতে পারে না সে। মনে হলো, তাকে ঘিরে ধরেছে বুঝি এক ঝাঁক জীন। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। নিজেকে আর সে ধরে রাখতে পারলো না। লুটিয়ে পড়ে গেল বালির ওপর। তারপর আর কিছু মনে নাই।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। কাপ্তান তার অনুচরদের খুঁজতে খুঁজতে সেই দ্বীপে এসে ডিঙ্গি ভেড়ায়। কিন্তু একি কাণ্ড, ছেলে দুটো ছিন্নমুণ্ডু অবস্থায় ছিটকে পড়ে আছে। আর আবু শাইর বালির ওপরে অসাড়ে নিদ্রামগ্ন। তার হাতের আংটিটার দ্যুতি এসে বিঁধলো কাপ্তানের চোখে। সর্বনাশ, এই আংটি তো সুলতানের। অলৌকিক ক্ষমতায় ছেলে দুটোর জীবনান্ত ঘটেছে। এমন সময় আবু শাইর আড়মোড়া ভেঙ্গে পাশ ফেরে। কাপ্তান চমকে ওঠে। আবু শাইর যদি ঘুম ভেঙ্গে উঠে তার দিকে কোন ভাবে হাত বাড়ায়, তা হলে তারও দশা ঐ ছোকরা দুটোর মতোই হবে। সে চিৎকার করে ওঠে, আবু-শাইর—তোমার ডান হাতটা গুটিয়ে রাখো, আমার দিকে বাড়িও না, ভাই। তা হলে নির্ঘাৎ আমার মৃত্যু হবে।

আবু শাইর ধড়মড় করে উঠে বসে। ডান হাতখানা পিছনের দিকে করে রাখে। প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন কী ব্যাপার, কাপ্তান সাহেব?

—তার আগে বল, তোমার হাতের ঐ আংটি তুমি পেলে কোথায়? ওটা সুলতানের হাতের অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন দৈব আংটি। ঐ আংটির দৌলতেই তিনি অসীম শক্তিধর। কিন্তু যেভাবেই হোক, ঐ আংটি তাঁর হাতছাড়া হয়েছে। সুতরাং এখন তিনি আমার মতোই সাধারণ একজন মানুষ মাত্র। তিনি যে বলে বলীয়ান ছিলেন সে শক্তি আজ তোমার করায়ত্ত। তুমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটি মানুষকে তোমার গোলাম বানিয়ে রাখতে পারো। এমন কি সুলতানকেও। যদি তিনি বেগড়বাই করার চেষ্টা করেন, তোমার এক ইশারাতে তাঁরও মুণ্ডু উড়ে যেতে পারবে। আবু শাইর তোমাকে বলেছিলাম না, সৎপথে থাকলে আল্লাহ তার সহায় হন। চল, এখানে আত্ম-গোপন করে থাকার আর কোনও প্রয়োজন নাই। চল, সুলতানের সামনেই যাবো। দেখবে, তিনি তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। না হলে, তার প্রাণ যাবে।

আবু শাইরকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তান সোজা সুলতানের দরবারে চলে আসে। সুলতান তখন উজির আমির পারিষদ পরিবৃত হয়ে দরবারের কাজে ব্যাপৃত ছিল। কাপ্তানের সঙ্গে আবু শাইরকে সশরীরে দেখে সুলতান আঁৎকে ওঠে।
—এ্যাঁ; ভূত নাকি?

দরবারের উজির আমির সকলেই অবাক হয়ে আবু শাইরকে দেখতে থাকে। তাইতো, লোকটাকে জলজ্যান্ত দরিয়ার মধ্যে বস্তা-বন্দী করে ফেলে দেওয়া হলো, সে আবার উঠে এল কী করে? যাদুমন্ত্র জানে নাকি?

সুলতান গর্জে ওঠে, কাপ্তান তুমি বিশ্বাসঘাতক। আমাকে ধোঁকা দিয়েছ,

এর কী সাজা তোমার জানা নাই।

—খুব জানা আছে, হুজুর। সুলতানের হুকুম তামিল না করলে গর্দান যায়, কিন্তু গর্দান নেবার তো ক্ষমতা এখন আপনার নাই।

—কী এ বড় স্পর্ধা।

—অপরাধ নেবেন না, হুজুর। আপনি যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যার বলে আপনার প্রজারা পদানত ছিল, সে দৈব অংগুরীয় আপনার হাতে আর নাই। ওটা দেখুন, আবু শাইর-এর হাতে।

সুলতান চমকে ওঠে। অজ্ঞাতসারে ডান হাতখানা আড়াল করতে চায়। তার চোখে মুখে সে-এক মৃত্যুর বিহ্বলতা। মুহূর্তের মধ্যে সারা মুখে বড় বড় স্বেদবিন্দু জমে ওঠে। উজির আমিররা এতক্ষণে নজর করলো, সত্যিই সুলতানের অনামিকা রিক্ত। আবু শাইর-এর ডান হাতের দিকে তারা তাকিয়ে দেখতে পেল, সুলতানের সেই দৈব আংটি জ্বলজ্বল করছে।

সুলতান সিঁটকে যায়। ভাবে তার মৌৎ সামনে হাজির। এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুণ্ডু উড়ে যাবে। হঠাৎ সে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আবু শাইরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমার সঙ্গে যে আচরণ আমি করেছি তার প্রতিশোধ তুমি নেবে বলেই এসেছ। কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাইছি, আবু শাইর। আমাকে প্রাণে মেরো না। তার বদলে আমি ছেড়ে দিচ্ছি এই মসনদ। তুমি আমার সারা সলতানিয়তের সুলতান হও। শুধু আমার আর্জি, প্রাণে মেরো না আমাকে।

আবু শাইর সেই নিস্তব্ধ দরবার কক্ষের অপর প্রান্তে কাপ্তানের পাশে এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে ধীর পদক্ষেপে সুলতানের পাশে এসে দাঁড়ালো। সকলকে চমকিত করে সুলতানের হাতে সে খুলে দিল সেই আংটি।

—তখত্-এর গৌরব আমার প্রয়োজন নাই। সলতানিয়তের লোভে আমি লুব্ধ নই। এই নিন আপনার অলৌকিক অংগুরীয়। আমি অতি সাদাসিধে সাধারণ মানুষ—এই অমিত বিক্রমের অধিকারী আমি হতে চাই না। এ আংটি আমি পেয়েছি একটি মাছের পেটে। কাপ্তান আমাকে বললেন, আংটিটা আপনার। তাই ফেরত দিতে এসেছি। কোনও শর্ত নয়, শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা আমার, এই কাপ্তান সাহেব আপনার হুকুম অমান্য করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাকে আপনি কোনও সাজা দেবেন না। আরও একটা কথা, আপনি আমার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন আমার অপরাধের সূত্র অনুধাবন না করেই। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আসল অপরাধীকে সনাক্ত করুন। আমার সব কথা শুনলে আপনার কাছে সব পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সুলতান দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আবু শাইরকে। দু-চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

—আমি সব বুঝেছি আবু শাইর। কোনও এক দুষ্ট-চক্রান্তের শিকার

হয়েছিলে তুমি। তোমার মতো সরলপ্রাণ সদাশয় মানুষকে প্রতারণা করতে তো বেশি কসরত করতে হয় না। তুমি সবাইকেই বুক ভরে ভালোবাসা দিতে পারো, বিশ্বাস করতে পারো। আমারই দোষ, আমিই তোমাকে চিনতে পারিনি এতদিন। আমি ন্যায় বিচার না করে তোমাকে অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছিলাম। কিছু মনে রেখ না, আবু শাইর। আমার হঠকারীতার জন্য আমি অনুতপ্ত। কিন্তু এখন আমার কাছে বল তো, কে তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিল সেই বিষাক্ত কাই তৈরি করার?

আবু শাইর বলে, সে আমারই স্বদেশবাসী—আবু কাইর। কাইটা যে ঐ রকম মানুষ খুন করা মারাত্মক বস্তু হতে পারে, আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমি জানতাম না।

—আমি সবই এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আবু শাইর। ঐশ্বর্য দেখে আপনজনই সব চাইতে বেশি ঈর্ষাকাতর হয়। আবু কাইর আমাকে এসে বলেছিল, তুমি খ্রীস্টানদের গুপ্তচর। আমাকে হত্যা করার জন্যেই তারা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে নিজেই যে এই শয়তানীর পাণ্ডা তা আমি খতিয়ে দেখিনি তখন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো একতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু করে:

আবু শাইর মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, উফ, লোকটা কী মিথ্যেবাদী শয়তান? আমার জীবনে আমি কখনও কোনও খ্রীস্টানদেশে যাইনি। আর বলে কি না, আমি তাদের গুপ্তচর! জানেন জাঁহাপনা, এই লোকটাকে আমি দিনের পর দিন মাসের পর মাস খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

—তাই বল! এতক্ষণে আমি আসল সূত্রটা ধরতে পারছিলাম না। তুমি তার উপকার না করলে সে তোমার এত বড় অনিষ্ট কী ক'রে করে?

এর পর আবু শাইর আবু কাইরকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে এখানে আসা, সরাইখানায় ওঠা এবং তাকে জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে তার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া এবং তার দোকানে তাকে অমানুষিক প্রহার করা ইত্যাদি সমস্ত কাহিনী খুলে বললো সুলতানকে।

—আপনি আরও প্রমাণ পাবেন হুজুর, সেই সরাইখানার মালিককে একবার ডেকে পাঠান।

সুলতানের হুকুমে তখনই সরাইখানার মালিককে হাজির করা হলো সেখানে। সে বললো, লোকটা কাফের জাঁহাপনা। আমি দেখেছি দিনের পর দিন সে কুঁড়ের বাদশার মতো ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতো, আর এই আবু শাইর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে খানাপিনা নিয়ে এসে তাকে খাওয়াতো। তার পুরস্কার সে কী ভাবে দিয়েছিল শুনুন: আবু শাইর যখন অসুখে পড়লো, বেদম জ্বরে

সে যখন অচেতন, তখন তার যা কিছু জমানো পয়সা কড়ি ছিল সব হাতিয়ে নিয়ে একদিন সে হাওয়া হয়ে গেল। এর মাস দুই পর আবু শাইর অসুখ থেকে উঠে খুঁজতে খুঁজতে আবু কাইর-এর দোকানে গিয়ে ঢোকে। তাকে দেখামাত্র লোকটা হাবসী বান্দাদের দিয়ে মারায়। তাতেও সে সন্তুষ্ট হয় না, বেতের চাবুক দিয়ে মেরে সারা অঙ্গ চৌচির করে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যায় বেচারাকে।

সুলতান থামিয়ে দিল, থাক, আমার সব জানা হয়ে গেছে। এবার দেখ, ওকে কী ভাবে শায়েস্তা করি আমি। এই—কে আছিস, শয়তান ধোপাটাকে পিছ-মোড়া করে বেঁধে নিয়ে আয় আমার সামনে।

সুলতানের আদেশে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল পেয়াদারা। আবু কাইর তখন তার পালঙ্ক-শয্যায় শুয়ে সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল। তার একমাত্র পথের কাঁটা আবু শাইরকে সে চির-জীবনের মতো সরিয়ে দিতে পেরেছে। এখন আর তাকে পায় কে!

পেয়াদাগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে তার ঘরে। আবু কাইর তম্বি করে তাড়া করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা সে-সুযোগ দিল না তাকে। রশি দিয়ে আস্টে-পিস্টে বেঁধে ফেললো। আবু কাইর হাতপা ছুঁড়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাবসী পেয়াদার বিরানব্বই সিক্কার গোটাকয়েক ঘুষিতেই বাছাধন কঁকিয়ে থেমে গেল। জামা পাতলুন ছিঁড়ে খুঁড়ে প্রায় আধা উলঙ্গ করে ফেললো তাকে। টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো সুলতানের সামনে।

আবু শাইর তখন বসেছিল সুলতানের ডান পাশে। সরাইখানার মালিক দাঁড়িয়েছিল একদিকে। নজর পড়তেই আবু কাইর-এর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল। আর রক্ষা নাই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। এবার নির্ঘাত মৃত্যু। প্রতারণা, বিশ্বাস-ঘাতকতার সাজা এবার তাকে পেতেই হবে।

সুলতান গর্জে ওঠে, তোমার দোস্তকে চিনতে পারছো, আবু কাইর? একে তুমি বেত্রাঘাত করেছিলে? এর সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করেছিলে? হাবসী-বান্দাদের দিয়ে পিটিয়েছিলে? এবং একে ফাঁসীর কয়েদী বানাবার চক্রান্ত করে-ছিলে? ঠিক কিনা? চুপ করে থেকো না, চটপট জবাব দাও। তুমি চক্রান্ত করলে কী হবে, আল্লাহ যার সহায় আছেন, তার অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। তোমার এই চরম প্রতারণার সাজা কী হতে পারে জান? মৃত্যু।

দরবারের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী বল?

সকলে হাত উঠিয়ে জানালো সুলতানের বিচার ন্যায়সঙ্গত।

এরপর সুলতান পেয়াদাদের হুকুম দিল, লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে সারা শহর ঘোরাবে। তারপর খারের বস্তায় ভরে ওকে দরিয়ার পানিতে ছুঁড়ে দেবে।

দরবারের সকলে সুলতানের বিচারের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। আবু

শাইর বলে, জাঁহাপনা, আমি ওকে ক্ষমা করে দিলাম, ওর সম্বন্ধে সব অভিযোগ আমি তুলে নিচ্ছি।

—কিন্তু আমি ভুলে যেতে পারছি না, আবু শাইর। সে শুধু তোমাকে নয় আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে সাজা তাকে পেতেই হবে।

পেয়াদাদের হুকুম দিল, যাও নিয়ে যাও।

সুলতানের যথা নির্দেশ মতো আবু কাইরের কোমরে দড়ি বেঁধে সারা শহরে বার-কয়েক ঘোরালো তারা। হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যক্ষ করলো, একদিন যার দাপটে সারা শহরবাসীরা থরথর করে কাঁপতো আজ তার কী হাল। একেই বলে নসীবের খেলা।

শহর ঘোরানো শেষ হলে পেয়দারা আবু কাইরকে একটা চুনের বস্তায় পুরে দরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে দিল।

সেইদিন পূর্ণ দরবার কক্ষে সুলতান আবু শাইর-এর দুহাত ধরে বললো, আবু শাইর, তোমার কাছে নিজেকে বড় ঋণী এবং অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। তোমার যা প্রাণ চায়, চাও আমার কাছে। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। যা চাইবে—তাই দিয়ে আমি ধন্য হবো। চাও, আবু শাইর, যা তোমার ইচ্ছা, চাও আমার কাছে। তোমাকে দুহাত ভরে দিয়ে আমি নিজের দীনতা কমাতে চাই।

আবু শাইর-এর মুখে অমায়িক হাসি, আমার কিছুই চাই না, জাঁহাপনা। আপনার দৌলতে এই শহরে এসে অনেক অর্থ আমি উপার্জন করেছি। আর বেশি কিছু চাই না। শুধু আমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিন আপনি। অনেকদিন আমার আপনজনদের দেখিনি। মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সুলতান বললো, তোমার বুদ্ধি বিচক্ষণতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে তুমি আমার প্রধান উজির হতে পারো। আমার ইচ্ছা, তুমি উজিরের মর্যাদা নিয়ে আমার কাছেই থাক।

আবু শাইর বললো, আপনার আদেশ মাথায় রাখলাম। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিন, জাঁহাপনা। মন আমার দেশে পড়ে রয়ে রয়েছে, এখন কোনও কাজেই মন বসবে না। আপনি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তা হলেই আমি খুব আনন্দ পাবো।

সুলতানের নির্দেশে একখানা জাহাজে দামী দামী সাজ-পোশাক, আসবাবপত্র, সামানপত্র এবং সোনা-দানায় ভর্তি করা হলো। বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর দাস-দাসী, বান্দা-বাঁদী তুলে দেওয়া হলো সেই জাহাজে। সুলতান বললো, এগুলো আমার উপহার।

আবু শাইরও এনে তুললো তার সঞ্চিত মোহরের বস্তাগুলো। যথাসময়ে জাহাজ ছেড়ে দিল আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে।

শাহরাজাদ থামলো।

এই হলো আবু কাইর ও আবু শাইর-এর কাহিনী। এরপর আপনাকে শোনাবো আর এক চমকপ্রদ কিস্সা। দুই আবদাল্লার এই উপকথা আপনার নেহাত মন্দ লাগবে না।

❖ ❖ ❖

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

কোনও এক সময়ে আবদাল্লা নামে এক জেলে বাস করতো। ন'টি সন্তানের জনক সে। কিন্তু অত্যন্ত গরীব। দিন আনে, দিন খায়—এই রকম দশা। রোজ সকালে সে জাল কাঁধে করে সমুদ্রের পাড়ে যায়। সারাদিন জাল ফেলে। যেদিন বরাতে থাকে মোটামুটি মাছ ওঠে। আর যেদিন নসীব সাধ দেয় না—সেদিন হরিমটর।

লোকটা খানিকটা বেপরোয়া। যেদিন চুনোপুঁটি ধরে, সেদিন সে কোন রকমে পেট ভরানোর মতো রুটি সবজী নিয়ে ঘরে ফেরে। কিন্তু যেদিন রাঘব বোয়াল রুই কাতলা তুলতে পারে সেদিন আর তাকে পায় কে? ভালো ভালো দামী দামী খানাপিনা সাজ-পোশাক কিনে নিয়ে যায়। সব পয়সা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নাই। বিবি হয়তো কখনও বলতে গেছে, ঘরে বাল-বাচ্চা আছে, একটু রেখে-ঢেকে খরচ কর। মানুষের সবদিন তো সমান যায় না।

আবদাল্লা সে-সব কথায় কর্ণপাতই করে না, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। তা বলে আজ কষ্ট করে থাকবো কেন? আর তাছাড়া, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

এইভাবে দিন কাটে।

একদিন সকালে আবদাল্লা-বিবি দশম পুত্রের জন্ম দান করলো। আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহর অশেষ করুণায় এর আগের ন'টিও পুত্রসন্তান।

ঘরে একটা দানাও ছিল না সেদিন। তবুও আবদাল্লা-গৃহিণী হাস্যমুখে বললো, হ্যাঁগো, নবজাতকের মুখে তো একটু দুধ-মধু দিতে হবে। যাও; জাল নিয়ে বেরোও! আজ দেখো, তোমাকে দুহাতে ভরে দেবেন তিনি।

আবদাল্লা বলে, আগের ন'টার বেলাতেও তো সেই আশাই ছিল, বিবিজান। কিন্তু সবাই হা-ঘ'রে বরাত নিয়ে জন্মেছে। যাক, যাই দেখি সমুদ্রের ধারে। যদি কিছু জোটে। জান বিবিজান, আমি সব সময়ই আশাবাদী। তবে আশা আমার পূরণ হয় না এই যা ফারাক—

আবদাল্লা আর দেরি করে না। জালখানা কাঁধে তুলে হন হন করে হেঁটে চলে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছয়তম রজনীতে

আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

নবজাতকের নাম করে জাল ফেলে আবদাল্লা।

—আল্লাহ তুমি ওকে পাঠিয়েছ। ওর জীবন যেন আমার মতো দুঃখের

না হয়। তাকে দুধে ভাতে রেখ, এই দোয়া মাগি।

তারপর ধীরে ধীরে জালখানা টেনে তোলে। কিন্তু হায় রে কপাল, একগাদা মাটি, শামুক আর ঝিনুকের খোলা ছাড়া কিছুই ওঠে না।

আবদাল্লা দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়ে।

—হায় খোদা, এই কী তোমার বিচার হলো। যাকে পাঠালে তার আহারের কোনও ব্যবস্থা করলে না? কিন্তু এতো হতে পারে না—কখনই হতে পারে না। তাকে কী অনাহারে রাখার জন্য পাঠিয়েছ তুমি?

জালখানা কাঁধে তুলে সে, সমুদ্র-সৈকতের অন্য প্রান্তে চলে যায়। আর একবার জাল ফেলে জলে। এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে জালখানা গুটিয়ে তুলতে থাকে। অবশেষে সে ওপরে তুলে দেখলো, একটা গাধা জল খেয়ে পেট ডাঁই করে মরে আছে। আবদাল্লার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। কোন রকমে ছাড়িয়ে গাধাটাকে ফেলে দিয়ে জালখানা গুটিয়ে সে অন্য দিকে ছোটে। সমুদ্রপাড়ের আর এক দিকে। মনে মনে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। একমাত্র আল্লার করুণা ছাড়া কিছুতেই কিছু হয় না। এত মন্দভাগ্য তার হলো কী করে? এ নির্ঘাৎ তার অপয়া বিবির দোষে। তা না হলে আজকের মতো এমন খারাপ দিন তার আর কখনও আসেনি। এইভাবে যদি প্রতিবারই মাছের বদলে আবর্জনা উঠতে থাকে তবে এ কারবার বন্ধ করে অন্য ধান্দা দেখতে হবে তাকে। অনেক দিন ধরে সে তার বিবিকে বলছিল, মাছ ধরার কাজে কোনও নাফা নাই, অন্য কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু বজ্জাত মাগীটার জন্যেই সে এই বে-ফয়দার কাজটা ছাড়তে পারছে না। তার সেই এক কথা, কাজ কোনওটাই খারাপ নয়। আল্লার ওপর ভরসা রেখে চল, দেখো একদিন না একদিন তিনি মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু এই কী মুখ তুলে চাওয়ার নমুনা?

হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে অনেকক্ষণ সমুদ্র পাড়ে বসে রইলো। আর জাল ফেলেই বা কী হবে। হয়তো আবার কোনও নিষিদ্ধ জন্তু জানোয়ারের গলিত দেহ উঠে আসবে।

বেলা পড়ে আসে। আবদাল্লা আর একবার জাল ফেলে জলে। মনে মনে ভাবে, এই শেষ। যদি কিছু না ওঠে আর সে এমুখো হবে না কোনও দিন।

—আল্লাহ তোমার প্রাণে যদি এক বিন্দুও মায়া-মমতা থাকে তবে আমার সদ্যজাত সন্তানের মুখে একটু দুধ মধুর ব্যবস্থা করে দাও। আমি না হয় পাতক, অনেক দোষ করেছি, কিন্তু সে তো নিষ্পাপ শিশু। তার কী অপরাধ? সে কেন অভুক্ত থাকবে? তাকে তুমি খেতে দাও—বাঁচাও। আমার বিশ্বাস, সে যখন বড় হবে তোমার নাম গান করবে। আহা শিশুটার কচি মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে এসেছি আমি। সে বড় ভালো ছেলে হবে। সাচ্চা মুসলমান হবে। শুধু তার মুখ চেয়ে অন্তত একটা মাছও আমার জালে দাও, খোদা। সে অন্তত বাঁচুক। আমার রুটিওলার কাছে অনেক ধার জমে গেছে। একটা ছোটখাটো মাছও যেন তাকে দিতে পারি আজ। তার কাছ থেকে রুটি নেব। কিছু নগদ পয়সাও ধার নেব। আহা, আহা, লোকটা বড় ভালো। সেধে

জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় আমার সংসারের হাল। মুখ ফুটে বলতে না পারলেও সে সব বুঝতে পারে। রুটি তো দেয়ই, উপরন্তু কিছু নগদ পয়সাও গুঁজে দেয় হাতে। এমন মানুষ আজকের দিনে ক'টা মেলে!

এই সব বলার পর আস্তে আস্তে জালখানা সে টেনে তুলতে থাকে। এবার যেন আরো বেশি ভারি মনে হয়। মনে শঙ্কা জাগে, আবার হয়তো কোনও বাজে মাল জালে জড়িয়েছে। অবশেষে অনেক কষ্টে টেনে তুলতে পারে সে।

আবদাল্লা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, জালের ভিতরে জড়িয়ে আছে একটা মানুষ। হ্যাঁ মানুষই তো। তার হাত পা, নাক মুখ চোখ সবই মনুষ্যাকৃতির। শুধু তার নিম্নাঙ্গটি মাছের মতো! মনে হয়, একটা লম্বা লেজ।

আবদাল্লার বুঝতে কষ্ট হয় না, সেই আজব বস্তুটি আসলে কোন জিন বা আফ্রিদি। হয়তো বহুকাল তামার জালায় বন্দী হয়ে ছিল। হয়তো সে মহামতি সুলেমান দাউদের কোনও বিদ্রোহী নফর। অপরাধের সাজা দিয়ে এই দরিয়ায় কয়েদ করে রেখে ছিলেন তিনি। তারপর কোনও ক্রমে সে সেই জালার মোহর ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!

আতঙ্কিত আবদাল্লা সমুদ্রকূল ধরে ছুটে পালাতে থাকে।

—ওরে বাবা রে গেলাম রে, ও বাবা, আফ্রিদি, ও বাবা সুলেমানের নফর, আমাকে মেরো না। দয়া কর।

—আরে এদিকে শোন, ফিরে তাকাও, ও ধীবর ভায়া শোন, এদিকে এস, তোমার কোনও ভয় নাই। আমি জিন আফ্রিদি বা বাঘ ভালুক—কিছুই না। তোমারই মতো এক মানুষ।

মৎস্যরূপী মানুষটা আবদাল্লাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আবদাল্লা তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। মৎস্য-মানুষ আবার বলতে থাকে, আমি যদি সত্যিই কোন জিন আফ্রিদি হতাম, তুমি কী আমাকে এই সামান্য জালে আটকে রাখতে পারতে। এতক্ষণে তোমার ঘাড় মটকে ধরতাম না? কোনও ভয় নাই। কাছে এস। এলে তোমার লাভই হবে—এস।

আবদাল্লা থমকে দাঁড়াল। ভাবে, তাতো ঠিকই। আসলে যদি সে কোনও দৈত্যদানবই হবে, ঐ তুচ্ছ জালের ঘেরোয় সে আবদ্ধ থাকে? এতক্ষণে এসে তার ঘাড় মটকে দিত না?

পায়ে পায়ে আবার সে ফিরে আসে জালের কাছে।

—সত্যিই তুমি কোনও জিন দৈত্য নও?

কোনও রকমে আবদাল্লা এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারে।

রাত্রির অন্ধকার কেটে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

*

পাঁচশো সাততম রজনী

আবার সে বলতে থাকে:

জালের মানুষ বলে, তোমাকে তো বললাম, না, আমি কোনও দৈত্য-দানব

নই। দেখছো না, আমি তোমারই মতো এক মানুষ। তোমারও যেমন হাত আছে মুখ আছে বুক আছে পেট আছে আমারও দ্যাখো সবই আছে। শুধু ফারাক—তোমার দুখানা পা আছে, আর আমার আছে এই ল্যাজ! তুমি ডাঙ্গায় চল দুটো পা দিয়ে, আর আমি জলে চলি এই ল্যাজ নাড়িয়ে। আমি কোনও অভিশপ্ত প্রাণী নই। আমাকে কেউ জলে ফেলেও দেয়নি। আমরা জলের মানুষ। জলেই আমাদের ঘর ও বাড়ি। শুধু আমি নই গো, আমার মতো হাজার হাজার জলপুত্র, জলকন্যা আছে এই দরিয়ার নিচে। তোমরা যেমন হাজার হাজার নরনারী বাস কর গ্রামে গঞ্জে শহরে, তেমনি আমরাও বসবাস করি জলের তলায়। আর তাছাড়া, আমার কথা-বার্তা শুনেও কী তুমি বুঝতে পারছো না, আমিও তোমার মতো রক্ত মাংসে গড়া এক মানুষ?

আবদাল্লা আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে তুমি কোনও জিন আফ্রিদি নও।

—তা হলে আর দেরি কেন, এবার জাল থেকে আমাকে বাইরে বের কর! তোমার সংগে আমার অনেক কথা আছে। আজ থেকে তুমি আমার দোস্ত হলে। সেই রকম আমিও হলাম তোমার দোস্ত।

আবদাল্লা জাল থেকে ওকে বাইরে বের করে দেয়। জলপুত্র বেরিয়ে এসে আবদাল্লাকে সালাম জানায়, খোদা মেহেরবান, তুমিও যেমন ইসলামে বিশ্বাসী আমিও তেমনি সাচ্চা মুসলমান। আজ থেকে আমরা দুজনে দোস্ত হয়ে গেলাম। আমার যতটা সাধ্য আমি তোমার উপকার করবো। আর তোমার যতটা ক্ষমতা তুমি আমার জন্য করবে—কী, রাজি?

আবদাল্লা বলে, বেশ তো। আমাকে কী কী করতে হবে, বল।

জলপুত্র বলে, তুমি রোজ আমার জন্যে নিয়ে আসবে তোমাদের মাটির ফলমূল—আঙ্গুর, ডুমুর, তরমুজ, ক্ষীরা, শশা, আনার, বেদানা, জলপাই, কলা, খেজুর ইত্যাদি। আর তার বিনিময়ে আমি দেব তোমাকে পানির তলার ফল-ফলারী। যেমন—হীরে মুক্তো, চুনীপান্না, চন্দ্রকান্ত মণি ইত্যাদি গ্রহ-রত্নাদি। তুমি যে-ঝুড়ি করে আমার জন্যে ফলমূল আনবে, সেই ঝুড়ি ভরেই আমি তোমাকে হীরে মুক্তো দেবো। কী? রাজী তো?

আবদাল্লা শুনে তো থ। বলে কী সে? আনন্দে নেচে ওঠে তার মন। বলে, রাজি মানে? একশোবার রাজি। আমি পা বাড়িয়েই রইলাম।

জলপুত্র বলে, তা হলে এস আমরা আল্লাহর নামে হলফ করি। কেউ আমরা কখনও আমাদের এই শর্তের খেলাপ করবো না।

দুজনে মিলে উচ্চ কণ্ঠে কোরানশরীফের প্রথম পরিচ্ছেদ আবৃত্তি করে মৌখিক চুক্তির শর্তাবলী স্বীকার করে নেয়। আবদাল্লা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

—আবদাল্লা, তোমার?

—আমারও নাম আবদাল্লা।

উল্লাসে ফেটে পড়ে দরিয়া আবদাল্লা, বাঃ, চমৎকার। তাহলে আজ থেকে

হবে মিট্টি আবদাল্লা, আর আমাকে ডাকবে দরিয়া আবদাল্লা বলে, কেমন ?

—তাই হবে।

দরিয়া আবদাল্লা বলে, আল্লাহর কুদরতে আমাদের শুধু নামেই মিল নাই, অন্তরের দিক থেকেও আমরা এক। তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই। তুমি আমার দোস্ত, আমি তোমার দোস্ত। এস, হাতে হাত মেলাও।

অতি অল্প সময়ে দুজনের মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। দরিয়া আবদাল্লা বলে, এখানে এক পলক দাঁড়াও, আমি যাবো আর আসবো। তোমার জন্যে এক ঝুড়ি হীরে চুনী পান্না নিয়ে আসি। কাল ঐ ঝুড়ি করেই আমার জন্যে ফলমূল নিয়ে আসবে।

এই বলে দরিয়া আবদাল্লা সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে গেল। মিট্টি আবদাল্লা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো পুতুলের মতো।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার সে উঠে এল জল থেকে। মাথায় একটা ঝুড়ি। মিট্টি আবদাল্লা বিস্ফারিত বিস্ময়ে দেখলো, সত্যিই—ঝুড়িটা হীরে চুনী পান্না মুক্তোয় ভরা। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে তার। দরিয়া আবদাল্লা বলে, নাও ধর, মাথায় তুলে ঘরে যাও। কাল যখন আসবে, মনে থাকে যেন, ঝুড়িভর্তি ফল আনবে।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, সে আর বলতে—

হন হন করে পা চালিয়ে সে বাড়ির পথ ধরে। পথে রুটিওলার দোকান। মিট্টি আবদাল্লা ভাবে, লোকটার দেনা কোনও দিনই শোধ করতে পারি না। আজ শোধ করে দেব।

রুটিওলার দোকানের সামনে এসে আবদাল্লা বলে, হ্যাঁ গো, দোকানী, আমার হিসেবটা একটু দেখ তো।

রুটিওলা বলে, অত হিসেব নিকেশের কী আছে। যা এনেছ, দিয়ে যাও। রুটি যা দরকার, নিয়ে যাও। তুমি কী হাতে কিছু পেলে শোধ করে দেবে না ?

—সত্যিই আজ হাতে হয়েছে, শেখ। তোমার কেন, সব দায়-দেনা আমি শোধ করে দিতে পারবো। অসময়ে তুমি আমার যা উপকার করেছ, দোস্ত, পয়সা কড়ি দিয়ে সে ঋণ পরিশোধও করা যায় না। সে চেষ্টাও আমি করবো না। তবে আজ যখন আল্লাহ দুহাত ভরে দিয়েছে—তোমাকে খানিকটা তার ভাগ না দিলে আমি নিজেই শান্তি পাবো না। এই নাও—

এই বলে আবদাল্লা এক মুঠি হীরে জহরৎ তুলে দেয় দোকানীর হাতে। মহামূল্য রত্নরাজি দেখে শেখ সাহেবের চোখ কপালে ওঠে।

—ইয়া আল্লাহ, একী ব্যাপার ? তুমি তো কামাল করেছ, দোস্ত ?

দোকানী এক ঝুড়ি পাউরুটি নিজের মাথায় তুলে বলে, চল চল, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার ছেলেটা দেখছি খুব পয়মন্ত। মনে হচ্ছে সুলতান বাদশাহর বরাত নিয়ে জন্মেছে।

আবদাল্লা বিবিকে সব ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বললো।

—এই নাও হীরে জহরতগুলো সাবধানে তুলে রাখ। আর একটা কথা,

কাউকে কিছু বলবে না। বুঝলে ?

আবদাল্লা-গৃহিণী খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে, পাগল নাকি। এসব কথা বলতে আছে কাউকে? আমি তো কাউকেই বলবো না। তুমি যেন আবার বলে বেড়িও না বাজারে।

আবদাল্লা বলে, না না বিবিজান, একমাত্র আমার ঐ রুটিওলা দোস্ত ছাড়া কাউকেই বলিনি। বলবোও না।

পরদিন সকালে আবদাল্লা সমুদ্র উপকূলে যায়। নানারকম সুন্দর সুন্দর মিষ্টি ফলের ঝুড়ি মাথায় করে হাজির হয় সেখানে। বালির ওপরে ঝুড়িটা নামিয়ে হাতে তুড়ি বাজিয়ে ডাকে, ও ভাই দরিয়া আবদাল্লা, কই, উঠে এস, দেখ, কী মজার সব ফল এনেছি তোমার জন্য।

প্রায় সংগে সংগেই জবাব আসে, এই তো আমি এলাম বলে।

একটু পরেই দরিয়া আবদাল্লা ওপরে উঠে আসে। উভয়ে সালাম-শুভেচ্ছা বিনিময় করার পর মিট্টি আবদাল্লা ফলের ঝুড়িটা দেখিয়ে বলে, তোমার জন্যে এনেছি। দেখ তো, পছন্দ হয় কিনা।

দরিয়া আবদাল্লা উল্লসিত হয়ে ওঠে, ইয়া আল্লাহ, কী তোফা—

এরপর সে তাকে সমুদ্র উপকূলে অপেক্ষা করতে বলে ঝুড়িটা নিয়ে জলের তলায় তলিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ওপরে উঠে আসে। এবার ঝুড়িটাতে ফল নাই, তবে মণি মুক্তোয় ঠাসা ছিল।

এর পর যথারীতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দুজনেই দুজনের ঘরের পথ ধরে।

আবদাল্লা আবার রুটিওলা বন্ধুর দোকানে এসে থামে। তার মাথায় সেই জহরতের ঝুড়ি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো নয়তম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে :

—ও দোকানী ভাই, একবার এদিকে এস, দেখ কে এসেছে ?

রুটিওলা ছুটে আসে। বলে, তোমাকে আর কষ্ট করে রুটি বইতে হবে না দোস্ত। আজ আমি বাদাম পেস্তা আকরোট কিসমিস চিনি মধু দিয়ে চল্লিশখানা পিঠে বানিয়ে তোমার বাড়িতে দিয়ে এসেছি। খেয়ে বলবে—কেমন হয়েছিল।

আবদাল্লা ঝুড়ি থেকে তিনখানা বড় বড় জহরত বের করে বলে, এটা রাখ।

রুটিওলার মুখে কথা সরে না। বোবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আবদাল্লার মুখের দিকে। আবদাল্লা বলে, অবাক হয়ে দেখছ কী ? খুশি হয়ে তোমাকে দিলাম, নাও। আমি আর দেরি করবো না বাজারে যেতে হবে জহুরীর কাছে।

বাজারের সবচেয়ে সেরা জহুরীর দোকানে এসে আবদাল্লা দোকানীকে কয়েকটা হীরে চুনী পান্না দেখায়।

—এগুলোর কী দাম হতে পারে দেখুন তো, জনাব?

বৃদ্ধ জহুরী সন্দিগ্ধ চোখে আবদাল্লার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে।

—কতগুলো আছে?

আবদাল্লা বলে, এগুলো তো নমুনা দেখাবার জন্যে এনেছি। বাড়িতে পুরো দুই ঝুড়ি আছে।

—কোথায় তোমার বাড়ি?

— খোদা মেহেরবান, বাড়িঘর বলতে যা বোঝায় তা আমার নাই, জনাব। ঐ মাছের বাজারের পাশে একটা বস্তির ঘরে বাস করি আমরা।

আবদাল্লার এই কথা শুনে জহুরী তার কর্মচারীদের বলে,—লোকটাকে পাকড়াও কর। চুরির মাল পাওয়া গেছে ওর কাছে। বেগম সাহেবার যে সব জড়োয়া গহনাপত্র চুরি গিয়েছিল সেইগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে এর কাছে। লোকটা চোর।

জহুরীর লোকজন আবদাল্লাকে পাকড়াও করে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে। একজন বলে, এই লোকটাই তো গত মাসে হাসান সাহেবের দোকানে ডাকাতি করে পালিয়েছিল।

আর একজন বলে, তাই বলি, ইদানিং এত বাড়িতে চুরি হচ্ছে কী করে?

সকলেই এক একটা রোমাঞ্চকর চুরি ডাকাতির গল্প ফেঁদে বসে। আবদাল্লা একটাও কথা বলে না। চুপচাপ সব শোনে।

দোকানের কর্মচারীরা মারতে মারতে আবদাল্লাকে নিয়ে যায় সুলতানের কাছে। জহুরী নানা রং চড়িয়ে নালিশ করে।

—লোকটা মহাচোর। বেগম সাহেবার গহনাপত্র সব এ-ই চুরি করেছে, জাঁহাপনা।

খবর পেয়ে বাজারের অন্যান্য জহুরীরাও ছুটে আছে সুলতানের দরবারে। তাদের মুখেও একই কথা।

এই লোকটাই যত চুরি ডাকাতির নাটের গুরু। বেগম সাহেবার যে হারটা হারিয়ে গিয়েছিল, এই হীরে জহরতগুলো তা থেকেই খুলে এনেছে ব্যাটা।

জহরতগুলো খোজার হাতে দিয়ে সুলতান বললেন, বেগম সাহেবার কাছে নিয়ে যা। তাকে দেখা তো—এগুলো তার কিনা।

বেগম সাহেবা হীরে জহরতগুলো হাতে নিয়ে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে: বাঃ চমৎকার তো? কোথায় পেলি?

খোজাটা বলে, জাঁহাপনা জানতে চাইছেন, আপনার যে গলার হারটা চুরি গেছে, দেখুন তো এই জহরতগুলো তার কিনা।

বেগম সাহেবা বলে, না না, সে তো আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার বাক্সের তলায় পড়ে গিয়েছিল। আর তা ছাড়া, এত দামী জিনিস কোথায় পাবো? এ বস্তু তো তামাম দুনিয়া খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তুই সুলতানকে গিয়ে

বল, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি যেন আমার মেয়ের জন্য এগুলো কিনে নেন। আমি তাকে একটা সাতনরী হার গড়িয়ে দেব।

খোজা গিয়ে সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, জহরতগুলো খুব পছন্দ হয়েছে বেগম সাহেবার। কিন্তু এগুলোর একটাও তাঁর নয়। তাঁর যে হারটা চুরি হয়ে গিয়েছিল মনে করেছিলেন, আসলে তা চুরি যায়নি। ঘরেই ছিল।

খোজার কথা শুনে সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়লেন, জহুরীদের তিরস্কার করে বললেন, তোমাদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নাই। একটা নিরীহ গোবেচারা মানুষ—তাকে চোর ডাকাত বলে ধরে এনেছ আমার কাছে? আল্লাহ তোমাদের এই গুস্তাকী মাফ করবেন কখনও?

জহুরীটা তখনও সুলতানকে বোঝাতে চায়, আপনি ভেবে দেখুন জাঁহাপনা, লোকটা সামান্য একটা জেলে। সে এই মহামূল্যবান জহরত পেল কোথায়? তাও আবার একটা দুটো নয়, বলে কিনা ওর বাড়িতে আরও দুই ঝুড়ি আছে! একটা হাঘরে লোকের পক্ষে এই সব মহামূল্য সম্পদ সৎভাবে রোজগার করা কী সম্ভব, হুজুর?

সুলতান আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, কেন সম্ভব নয়। আল্লাহ কখন কাকে কী ভাবে দেন কেউ বলতে পারে? সত্যিকার সৎ মানুষই তাঁর কৃপায় একদিন রাতারাতি অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারে। তোমরা লোভী, ঈর্ষাকাতর শকুনী। তাই অন্যের ঐশ্বর্যে কাতর হয়ে তার সর্বনাশ চিন্তা করছ। কিন্তু আমার সলতানিয়তে ধনী নির্ধন সব প্রজাই আমার চোখে সমান। তুমি শাহবানদার বলে ভেব না তোমাকে আমি বিশেষ কোনও সুনজরে দেখবো, আর এই গরীব বেচারা—যেহেতু সে তোমাদের মতো অসৎ গলাকাটা ব্যবসা করে পরস্ব অপহরণ করতে পারে না সেই কারণে তার ওপর নির্দয় হবো।

তোমরা আজ বিত্তবান—তাই সমাজের মাথায় পা রেখে যা খুশি তাই করে যাচ্ছো। এই অসহায় লোকটাকে আজ মারধোর করতে করতে এখানে নিয়ে এসেছ। কিন্তু কেন? কী তার অপরাধ? সে কিছু বিত্তের মালিক হয়েছে বলে? এতো তোমাদের ঈর্ষা! তোমরা কেউই চাও না, আর কেউ তোমাদের সমকক্ষ হোক। তাই বুঝি আজ একে চোর ডাকাতের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার দরবারে এনে হাজির করেছিলে। ভেবে ছিলে, তোমরা শহরের সম্ভ্রান্ত কেতাদুরস্ত সওদাগর। তোমাদের কথা আমি অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়ে এই নিরপরাধ লোকটিকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাবো! বাঃ, চমৎকার তোমাদের ফন্দী! কিন্তু একবারও কী ভেবেছিলে শাহবানদার, আমাকে ধোঁকা দিতে পারলেও আখেরে আল্লাহর কাছে ফাঁকিবাজী টিকবে না? শেষ বিচারের দিন সব কড়ায়গণ্ডায় তিনি বিচার করে দেবেন। তখন? তখন তোমরাই বা পালাবে কোথায়; আর আমিই বা আমার ভুলের, অজ্ঞতার কী জবাবদিহি করতে পারবো?

এই সময় প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো দশতম রজনীতে

আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

এইবার সুলতান আবদাল্লাকে উদ্দেশ করে বলে, তুমি গরীব বেচারা, আল্লাহ তোমার ওপর সদয় হয়ে কিছু দিয়েছেন, বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, তোমার কোনও ভয় নাই। এবার নির্ভয়ে বল তো এই মহামূল্য হীরে জহরত তুমি পেলে কেমন করে? এগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি, এ সব জিনিস কোন সুলতান বাদশাহদের কোষাগারেও দুর্লভ।

আবদাল্লা বলে, জাঁহাপনা, এই ধরনের হীরে জহরতের দুটো ভর্তি ঝুড়ি আছে আমার বাসায়। আমার এক দোস্ত, নাম দরিয়া আবদাল্লা—সে আমাকে দিয়েছে এগুলো।

এরপর আবদাল্লা সমুদ্র উপকূলের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালো সুলতানকে এবং বললো, আমি তার সংগে কোরাণশরীফ হলফ করে এক শর্ত করেছি—প্রতিদিন সকালে আমি তাকে এক ঝুড়ি ফল দেব, আর তার বিনিময়ে সে দেবে আমাকে এক ঝুড়ি এই সব হীরে জহরত।

সুলতান শুনে প্রীত হয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর নিষ্ঠাবান ভক্ত। তারই পুরস্কার তুমি পাচ্ছ। কিন্তু একটা কথা, ধন সংগ্রহ করা আর সেই ধন রক্ষা করতে পারা এক কথা নয়। তোমার ধনরত্ন রক্ষা করার সব ভার আমি নিলাম। যতদিন তুমি বাঁচবে আমি তার যথাযোগ্য পাহারার ব্যবস্থা করবো। এমনি কি তোমার মৃত্যুর পরও নিরাপদ থাকবে তোমার সম্পদ। তবে তোমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা কী করবে আমি বলতে পারি না এবং সে নিয়ে আমি কোনও বাধাও দিতে পারবো না তাদের। তবে তুমি যদি চাও আমার কন্যার সংগে তোমার শাদী দিতে পারি। সবে সে বিয়ের বয়সে পা দিয়েছে এবং আমার কন্যাকে যদি তুমি শাদী কর তবে আমার মৃত্যুর পর তুমিই আমার মসনদে বসবে। সুলতান হবে। এখন তোমাকে আমি আমার উজির করে রাখবো, কথা দিচ্ছি।

আবদাল্লা সম্মতি জানায়। সুলতান তার নফরদের ডেকে বলে, আবদাল্লাকে হামামে নিয়ে যাও।

চাকররা ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে ভালো করে সাবান ও খোসা দিয়ে ঘষে মেজে সাফ করে গোসল করায়। তারপর মহা মূল্যবান সাজ-পোশাকে সাজিয়ে সুলতানের সামনে হাজির করে।

সুলতান বলেন, এখন থেকে তুমি আমার উজির হলে। কী কী তোমার দপ্তর থাকবে, আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

আবদাল্লা বলে, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

সুলতান বললেন, আমি তোমার বাড়িতে দামী দামী নফর পেয়াদা পাহারা পাঠিয়েছি। তারা তোমার বিবি সন্তান এবং হীরে জহরতগুলো এখানে নিয়ে আসবে, আমার প্রাসাদেই থাকবে তারা।

সেইদিনই সুলতান তার কন্যার সংগে আবদাল্লার শাদী দিয়ে দেন। উৎসবের

সমারোহে প্রাসাদ ও প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। সারা শহরের পথঘাট বাজার আলোর মালায় ঝলমল করতে থাকে। আজ প্রাসাদের দ্বার সকলের জন্য অবারিত উম্মুক্ত। খানাপিনা নাচ-গান হাসি-হল্লায় মেতে ওঠে আমির, ইতর সকলে। সুলতানের সেনা-বাহিনীও নতুন সাজ-পোশাক পরে উৎসবে যোগ দিতে আসে।

আবদাল্লার জীবনে সেদিন এক পরম লগ্ন এল। শাহজাদী তার বেগম হয়ে অংকশায়িনী হলো। এমন সৌভাগ্য কজনে কল্পনা করতে পারে ?

প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সেদিনও অতি প্রত্যুষে সুলতান শয্যা ছেড়ে উঠেছেন। জানলার ধারে বসে আল্লাহর নাম গান করছেন। এমন সময় নজরে পড়লো, তার জামাতা উজির আবদাল্লা একটি ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সদর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। সুলতান ডাকলেন, কী ব্যাপার জামাই বাবা, এ সব কী, কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো এগারোতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

—আমার দোস্ত দরিয়া আবদুল্লার জন্যে ফল নিয়ে যাচ্ছি।

সুলতান বলেন, কিন্তু তা বলে এই এত ভোরে ? এ সময় তো প্রাসাদ থেকে কেউ বাইরে বেরোয় না! আর তাছাড়া, তুমি আমার জামাতা, সামান্য একটা কুলির মতো মাথায় মোট বয়ে নিয়ে যাবে, তাই বা কী করে হয় ?

আবদাল্লা বলে, আপনি যথার্থই বলেছেন, জাঁহাপনা। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভাবুন। আমার কথার খেলাপ হোক, আমার দোস্তের কাছে আমি মিথ্যেবাদী হই—এটাও তো আপনার কাম্য নয়, জাঁহাপনা। আজ এই যে আমার বিত্ত, এই যে আমার খ্যাতি সম্মান, এ সবেরই তো মূলে সে। তাকে কী করে ভুলবো বলুন ?

সুলতান বললেন, ঠিক, ঠিক বলেছ। যাও বাবা, তাড়াতাড়ি যাও তার কাছে। ওয়াদা আগে পূরণ করতে হবে। জীবনে জবানের দাম না দিতে পারলে আর কিছুই থাকে না।

আবদাল্লা ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে। কোনও কোনও পথচারী তাকে চিনতে পেরে অন্যজনকে বলে, ঐ দ্যাখ সুলতানের জামাই চলেছে সমুদ্রের উপকূলে।

অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করে না। ভাবে এমন গাঁজাখোরী কথা-বার্তা কেউ শুনেছে কখনও। বাদশাহর জামাই মোট বয়ে বেড়াবে কোন্ দুঃখে ?

কেউ বা ভাবে, লোকটা ফলওলা। তাকে ডাকে, ও ফলওলা, তোমার আনার কত করে দেবে ?

আবদাল্লা রাগ করে না। বরং আরও বিনীত হয়ে বলে, জী, এ ফল বিক্রীর

না। আমার দোস্তের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

এইভাবে সে একসময় সমুদ্র-সৈকতে এসে হাজির হয়। তার ডাকে সাড়া দিয়ে দরিয়া আবদাল্লা উঠে আসে। যথাবিহিত কুশল বিনিময়ের পর ফলের ঝুড়িটা নিয়ে জলের তলায় তলিয়ে যায় সে। ফিরে আসে আবার, নানা বর্ণের অমূল্য রত্নাভরণ ভরে নিয়ে। ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে আবদাল্লা আবার ফিরে আসতে থাকে। পথে সেই রুটিওলার দোকান। সেখানে সে দাঁড়ায়। দোকানটা সেদিন বন্ধ দেখে পাশের দোকানীকে জিজ্ঞেস করে, হাঁ গো, বলতে পারো, এই রুটিওলা দোকান খোলেনি কেন ?

কিন্তু কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারে না সে। তখন আবদাল্লা জানলা বেয়ে উঠে ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখে নেবার চেষ্টা করে। দোকানী গুটিসুটি মেরে বিছানায় পড়ে আছে। আবদাল্লা ডাকে, দোস্ত—দোস্ত, শুনছো ?

দোকানী ধড়মড় করে উঠে বসে। সারা চোখে মুখে তার আতঙ্ক।

—সে কী ? এখনও তুমি জিন্দা আছ ? আমি তো শুনেছিলাম তোমার ফাঁসী হয়ে গেছে ! হাটে বাজারের মানুষ সেইরকম আলোচনা করছিল।

আবদাল্লা বলে, সব বলছি। আগে দারজাটা খোল। কোনও ভয় নাই। আমি মরিনি এবং তোমারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না কেউ ?

রুটিওলা দরজা খুলে দেয়। আবদাল্লা সব বৃত্তান্ত খুলে বলে তাকে। বাজারের জহুরীগুলো তাকে শেষ করারই প্যাঁচ কষেছিল। কিন্তু সুলতান ধর্মাত্মা। তিনি সব বুঝে তাদেরই তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার ওপর সদয় হয়ে সুলতান তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে আমাকে জামাতা তথা উজির করেছেন। এখন আমি প্রাসাদের এক হারেমে আমার মা এবং বেগমকে নিয়ে বসবাস করার অধিকার পেয়েছি।

আবদাল্লা এক নিশ্বাসে বলে গেল কথাগুলো। একটু থামলো। তারপর আবার বলতে থাকলো, দোস্ত, আমার আশার অতিরিক্ত আমি পেয়ে গেছি। এত দৌলতে আমার কি বা প্রয়োজন। তাই আজ তোমাকে এই ঝুড়ির সব হীরে জহরতগুলো দিয়ে যেতে এসেছি। তুমি নিয়ে আমাকে ধন্য কর।

রুটিওলা বেচারার মুখে কথা যোগায় না। হতবাক হয়ে সে আবদাল্লার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবদাল্লা শূন্য ঝুড়ি নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসে। সুলতান হেসে বলেন, আজ দেখছি তোমার দরিয়া দোস্ত তোমার সঙ্গে ধোঁকাবাজী করল।

আবদাল্লা বলে, না জাঁহাপনা, সেও তার ওয়াদা পূরণ করেছে। বরঞ্চ গত-কালের চেয়ে আরও বাহারী মাল সে দিয়েছে।

—তবে তোমার ঝুড়ি খালি কেন ?

—আজকের সবটাই আমার এক রুটিওলা দোস্তকে দান করে এলাম। লোকটি বড় ভাল। আমার অসময়ের বন্ধু। যখন অভাবের তাড়নায় খেতে পেতাম না, লোকের কাছে ধার চেয়ে মুখ-ঝামটা খেতাম, সেই সময় আমার এই

বন্ধু দিনের পর দিন রুটি এবং নগদ পয়সা ধার দিয়ে আমার বাল-বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। সেই অসময়ের উপকার আমি ভুলবো কি করে? শুধু পয়সা-কড়ি বা ধন-দৌলত দিয়ে সে ঋণ শোধ করা যায় না। তাই আজ আমি যৎসামান্য তার হাতে দিয়ে এলাম। সে আমার অসময়ের বন্ধু। আজ আমার সুখের দিনে তাকে ভুলবো কি করে?

সুলতান বললেন, তোমার কথা শুনে খুবই প্রীত হলাম বাবা। তা ঐ রুটিওলার নাম কী?

তার নাম তন্দুরী আবদাল্লা।

সুলতান হাসলেন, বাঃ, চমৎকার যোগাযোগ তো! তোমার নাম মিট্টি আবদাল্লা, তোমার এক দোস্তের নাম দরিয়া আবদাল্লা, আর এক দোস্তের নাম তন্দুরী আবদাল্লা এবং আমার নাম তো জানো, সুলতান আবদাল্লা। সকলেই আমরা আল্লার পেয়ারের নোকর। সকলেই আমরা সমান তাঁর চোখে। ধর্মে বিশ্বাসে সততায় আমরা সকলেই এক। তোমার এই তন্দুরী আবদাল্লা বন্ধুর সংগে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। তোমার মতো তাকেও আমি এক উজির বানাতে চাই।

মিট্টি আবদাল্লা তার বন্ধু রুটিওলা আবদাল্লাকে ডেকে আনে সুলতানের কাছে। সুলতান তার সংগে কথা বলে খুব খুশি হন। বলেন, আজ থেকে তোমাকে আমার বাঁ-পাশের উজির করে নিলাম। আমার জামাতা থাকবে আমার ডান পাশে।

আবদাল্লা আজ সুলতান জামাতা—উজির। অতুল ঐশ্বর্যের মালিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিনের জন্য ভুল হয় না। দরিয়া দোস্ত-এর সংগে দেখা করতে যায় সে প্রতিদিন সকালে। নিজের মাথায় বয়ে নিয়ে যায় নানারকম মরশুমী ফলমূল এবং প্রতিদিনই সে ফিরে আসে ঝুড়ি ভর্তি হীরে জহরত নিয়ে। এইভাবে বারোমাস একটা দিনও সে বিরতি দেয় না। বছরের একটা সময়ে কোনও তাজা ফল পাওয়া যায় না। তখনও সে শুকনো ফল যা মিলতো তাই বয়ে নিয়ে যেত তার বন্ধুর জন্য। এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেল।

একদিন প্রত্যুষে যথারীতি সমুদ্র-সৈকতে বসে দুই বন্ধু আলাপ সালাপ করছিল।

এই সময় প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো বারোতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

মিট্টি আবদাল্লা জিজ্ঞেস করছিল, আচ্ছা দোস্ত, তোমাদের দেশটা কেমন? খুব সুন্দর?

দরিয়া আবদাল্লা বলে, তুমি যদি দেখতে চাও আমি তোমাকে নিয়ে যেতে

পারি, যাবে? যদি যাও দেখবে, আমাদের দেশের মানুষজন ভালো। সবাই তোমাকে কত আদর যত্ন করবে।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, কিন্তু দোস্ত, তোমরা পানিতে জন্মেছ, পানির নিচেই মানুষ হয়েছ। সেই কারণে জলের মধ্যে অবাধ গতিতে চলা-ফেরা করতে পারো। কিন্তু তা বলে আমরা তো মাটির মানুষ—আমরা পারবো কেন? যাই হোক, তুমি আমাকে পানির দেশে নিয়ে যেতে পারবে? আমার কোনও অসুবিধে হবে না?

দরিয়া আবদাল্লা বলে, তা হবে। ডাঙগায়ও আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। হাঁসফাঁস করি। গায়ের চামড়ায় হাওয়া লেগে শুকিয়ে যায়। টান ধরে। মনে হয় সারা শরীরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মনে হয় এই বুঝি হাওয়ার দাপটে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো।

মিট্টি আবদাল্লা হেসে বলে, আমাদেরও ঠিক ওই রকম হয়। পানির মধ্যে হাওয়া কম। অথচ আমরা দমভরে অনেক বেশি হাওয়া টানি আর ছাড়ি। ডাঙাতে আমাদের জন্ম। এবং এখানকার আবহাওয়া আমাদের ধাত সওয়া হয়ে গেছে। পানির নিচে একটুক্ষণ থাকলেই আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। দেহে অনাবশ্যক পানি ঢুকে কাহিল করে তোলে! এবং জোর করে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রাণসংশয় ঘটতে পারে।

দরিয়া আবদাল্লা বলে, তুমি যদি রাজি থাক আমি তোমার সারা গায়ে এমন একটা মালিশ মাখিয়ে দেব, যার ফলে, আর কোনও অসুবিধাই হবে না। চাই কি, বাকী জীবনটাও যদি পানির তলায় আমাদের সঙ্গে কাটাও, কোনও ক্ষতি হবে না তোমার। যেমন খুশি চলা-ফেরা করতে পারবে। খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো—যা প্রাণ চায় করতে পারবে।

—তা যদি হয়, তা হলে তোমার সঙ্গে পানির তলায় যেতে আমার বাধা কী? ঠিক আছে, নিয়ে এস সেই মালিশ। দেখি একবার চেষ্টা করে।

ফলের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে জলপুত্র সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যায়। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার ওপরে উঠে আসে। হাতে একটা পাত্র। তার মধ্যে গাওয়া ঘি-এর মতো খানিকটা তৈলাক্ত পদার্থ! হলদে রং। চমৎকার গন্ধ।

মিট্টি আবদাল্লা একটুখানি আঙুলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী দিয়ে তৈরি জিনিসটা?

দরিয়া আবদাল্লা বলে, এটা দানদান মাছের তেল। দানদান হলো সমুদ্রের সব মাছের সেরা! এক একটা মাছ বিরাট আকারের হয়। মাছের বাদশাহ বলতে পার। হাতির মতো আকৃতি প্রকৃতি।

—সর্বনাশ! এত বড় মাছটা কী খেয়ে বেঁচে থাকে?

—ছোটখাটো মাছই তার খাদ্য। তুমি তো জান, সবলের ভক্ষ্য দুর্বল।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, হাঁ, তা জানি। কিন্তু একটা কথা, তুমি যেখানে থাক সেখানে কী অনেক দানদান মাছ ঘোরাফেরা করে? তা হলে দোস্ত আমি

তোমার সঙ্গে যাবো না।

দরিয়া আবদাল্লা হেসে বলে, ভয় নাই বন্ধু, ভয় নাই। দানদানরা ভয়ংকর মারাত্মক ঠিক, কিন্তু ওরা মানুষের গন্ধ পেলে ত্রিসীমানায় থাকে না। তার কারণ মানুষের রক্তমাংসে যে জহর আছে তা তাদের পেটে গেলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, আমাকে মুখে পোরার পরে তো বুঝবে আমার রক্ত-মাংসে ওর মরণ বিষ আছে। আমাকে যদি সে গিলেই ফেলে তারপরে সে দানদান বেঁচে থাকলো কী মারা গেল, আমার কী যায় আসে। আমি তো তার আগেই খতম হয়ে যাবো।

দরিয়া আবদাল্লা অভয় দিয়ে বলে, না না, ওসব ভয় করার কোনও ব্যাপার নাই। দূর থেকে ওরা মানুষের গায়ের গন্ধ পায়। আর গন্ধ পাওয়া মাত্র সেখান থেকে হাওয়া হয়ে যায়। সুতরাং তুমি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে যেতে পার।

মিট্টি আবদাল্লা খানিকটা ভরসা পায়। বলে, একমাত্র খোদা আর তোমার ওপর নির্ভর করে আমি তোমাদের দেশে যাবো।

এই বলে সে তার সাজপোশাক খুলে একটা বালির গর্তের মধ্যে পুরে মাটি চাপা দিল। উদ্দেশ্য কোনও মানুষের নজরে পড়বে না।

জলের তলা থেকে উঠে এসে আবার এই সাজপোশাক পরে সে প্রাসাদে ফিরবে।

—তা হলে চল দোস্ত, আমি তৈরি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো তেরতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দানদান মাছের তেল ওর সারা গায়ে মাখিয়ে দেয় দরিয়া। তারপর মিট্টি আবদাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যায়। নামতে নামতে ওরা এক সময় একেবারে তলদেশে এসে হাজির হয়। এইবার দরিয়া মিট্টির চোখের পট্টি খুলে দেয়।

—চোখ মেলে দেখ, দোস্ত, আমাদের দেশে পৌঁছে গেছি আমরা।

মিট্টি আবদাল্লা দেখলো, তার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি অথবা কোনও জড়তাও অনুভব করছে না সে। ওপরে বিশাল জলরাশির চাপ। কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস নিতে বা ছাড়তে কোনও রকম অসুবিধে হচ্ছে না তার। বরং বলতে গেলে, নিজেকে অনেক হাল্কা বোধ হচ্ছে।

আমরা যেমন মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে উপরে তাকালে দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ দেখি তেমনি সমুদ্রের নিচে দাঁড়িয়ে ওপরের বিস্তৃত জলরাশিকে এক সমুদ্র দিক-চক্রবাল বলে মনে হতে থাকে। চারপাশে অসংখ্য লতাপাতা গাছপালার অপূর্ব সমারোহ। অদূরে একটি ছোট পর্বতমালা চোখে পড়ে। পাহাড়ের কোথাও কোথাও সুন্দর সবুজ উপত্যকার মনোরম শোভা দেখে দুচোখ জুড়িয়ে যায়। আবদাল্লা দেখলো, একপাশে একটা বিস্তীর্ণ রক্তমুখী প্রবাল

বন। তার মাঝে মাঝে সাদা এবং গোলাপী প্রবালও দেখা যাচ্ছিল। প্রবালের গাছগুলোর বহু বিস্তৃত ডালপালা নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকে একটা হীরের পাহাড়। পাহাড়ের তলায় একটা গুহা। গুহার মুখ পদ্মরাগমণির একখানা বড় চাঁই দিয়ে ঢাকা। সেই পাহাড়ের মাথায় হাজার হাজার নানা বর্ণের ঝিনুক। আলোর রশ্মি পড়ে সেই ঝিনুকগুলো ঝলমল করছিল।

মাথার ওপর দিয়ে আবদাল্লা ওপরে তাকিয়ে দেখে, নানা রঙের মাছ চলা-ফেরা করে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ ফুলের মতো, কেউ ফলের মতো, আবার কেউ বা পাখীর আকারের। আবার অনেকগুলো মাছ দেখতে নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ারের মতো। যেমন গরু, মোষ, হরিণ, খরগোস, কুকুর। আবার কেউ বা দেখতে অবিকল মনুষ্যাকৃতির।

আবদাল্লা চলতে চলতে হীরে জহরতের পাহাড়ে উঠে আসে। মণি-মুক্তার দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায় আর কি! কোথাও বা চুনী কোথাও হীরে, কোথাও পান্না, আবার কোথাও বা মুক্তোর পাহাড়।

মিট্টি আবদাল্লা তখনও তার দোস্ত দরিয়ার হাত ধরে চলছিল। চলতে চলতে সে অবাক হয়ে দেখলো, একটা পান্নার পাহাড়কে কেটে ছোট ছোট গুহার মতো ডেরা বানানো হয়েছে। আর সেই প্রতিটি গুহার মুখে এক একটি পরমা-সুন্দরী ষোড়শী কন্যা দাঁড়িয়ে আছে।

দরিয়াকে সে জিজ্ঞেস করে, এই মেয়েগুলো কারা? দেখে মনে হচ্ছে, এরা একা। শাদী নিকা এখনও হয় নি।

—তুমি ঠিকই ধরেছ। ওরা সবাই কুমারী—সমুদ্র কন্যা। আর ঐ যে পান্না পাহাড়ের গুহাগুলো দেখছো—ওই ওদের থাকবার ঘর। যতদিন না কোনও পুরুষ এসে পছন্দ করে তাদের নিয়ে যায় ততদিন ওখানেই ওরা বাস করবে। সেই রকম একজন পুরুষের প্রতীক্ষাতেই ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকে—যতদিন না তেমন কেউ আসে।

এই শহরের অন্যদিকে আছে জন-বসতি। সেখানে মানুষ স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর সংসার করে। কিন্তু মেয়েরা যখনই শাদী-যোগ্যা হয় তখনই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই পর্বতগুহায়। এই সময়টা এদের পতি সাধনার কাল। আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এসে কায়-মনো-বাক্যে শুধু মনের মানুষের চিন্তা করে এখানে।

দুই বন্ধু হাত ধরা-ধরি করে সামনে এগিয়ে চলে। মিট্টি আবদাল্লা দেখতে পায় অনেক লোকজন নারী-পুরুষ বালবাচ্চা এবং তাদের ঘরবাড়ি। কিন্তু দোকান পাট বা হাট-বাজার কিছুই নজরে পড়ে না। মিট্টি আবদাল্লা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দোস্ত, তোমরা সওদাপাতি কর কোথায়? কই, কোনও দোকান পাট তো দেখছি না।

দরিয়া বলে, না নেই। ও সবের দরকার হয় না আমাদের। প্রয়োজনের তুলনায় জিনিসপত্র এখানে অনেক বেশি। তাই বেচা-কেনার কোনও দরকার

হয় না। যা যা দরকার হাত বাড়ালেই পায়—মাগুনায়। সুতরাং হাট-বাজারে কী হবে? ঐ যে দেখছো, ছোট ছোট অসংখ্য মাছ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এগুলোই আমাদের আহার্য। খিদে পেলেই ধরে ধরে খাই। আর মনের আনন্দে গান গাই। অভাব অভিযোগ বলতে কিছু নাই এখানে।

আবদাল্লা বললো, তোমরা কেউই সাজ-পোশাক পর না? সবাই এরকম উদোম উলঙ্গ হয়ে থাক কেন? শরম লাগে না?

—শরম? সে আবার কী বস্তু? আর সাজ-পোশাক আমাদের কাছে বাহুল্য মনে হয়। আল্লা আমাদের যাকে যে ভাবে গড়েছেন তা কাপড়-চোপড় জড়িয়ে ঢেকে রাখতে যাব কেন? ওসব আমরা পছন্দ করি না। তাই এখানে সাজ-পোশাক বলতে কী বোঝায় তা জানে না কেউ।

আবদাল্লা জানতে চায়, আচ্ছা তোমাদের শাদীর ব্যাপারটা কী ভাবে হয়?

—এখানে নানা জাতের মানুষের বাস। খ্রীস্টান, ইহুদী, পারসী, মুসলমান সব জাতের লোকই থাকে এই শহরে। বিধর্মীরা শাদী নিকার ধার ধারে না। কোনও একটা মেয়েকে কোনও একটা ছেলের মনে ধরলেই তারা একসঙ্গে সহবাস করতে থাকে। এইভাবে কিছুকাল কাটার পর ছেলে বা মেয়ে কারো যদি অনিচ্ছা জন্মে, তবে আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তখন ছেলেটি খুঁজে বেড়ায় অন্য একটি মেয়ে। সেই রকম মেয়েটিও অন্য এক পুরুষের সন্ধান করতে থাকে। তবে এ সবই বিধর্মীদের ব্যভিচার। সাচ্চা মুসলমানরা কিন্তু পবিত্র কোরাণের নির্দেশ মতোই শাদী নিকা করে।

দরিয়া আবদাল্লা বলে, আর একটু জোরে চল দোস্ত, আমাদের নিজেদের মুলুকের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। দেখবে সে কী বাহারী জমকালো শহর। চোখ জুড়িয়ে যাবে। মন ভরে যাবে। আর দেখবেই বা কত। দুচার দিন বা দুচার বছর ঘুরে দেখে তো তার কিছুই দেখা সম্ভব না। এক হাজার বছর ধরে যদি দেখ তবে দেশটার দেখার মতো সুন্দর সুন্দর জিনিসের শতাংশের এক অংশ দেখা সম্ভব হতে পারে। এবং তা থেকে এর সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা করাও সম্ভব না।

মিট্টি আবদাল্লা বললে, বড্ড খিদে পেয়েছে দোস্ত। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো ঐ কাঁচা মাছ খেতে পারবো না।

দরিয়া আবদাল্লা অবাক হয়, সে কি? তবে তোমরা খাও কী করে?

—অলিভ তেলে ভেজে নিই। অথবা লঙ্কা পেয়াজ রসুন ইত্যাদি মসলা দিয়ে ঝোল-ঝাল বানাই। অবশ্য অলিভ তেল ছাড়া বিনের তেলেও রান্না করি আমরা।

দরিয়া আবদাল্লা হো হো করে হেসে ওঠে, তবেই বোঝ, এই সমুদ্রের তলায় আমরা অলিভ বা বিনের তেল পাবো কোথায়? আর এই জলের ভিতর আগুনই বা জ্বালাবো কী করে?

—তা বটে। যাইহোক, চলো, তোমাদের শহরের ভিতরে নিয়ে চল।

ভোর হয়ে আসছিল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চৌদ্দতম রজনী :

আবার গল্প শুরু হয় :

দরিয়া আবদাল্লা এবার মিট্টিকে সঙ্গে নিয়ে এক নতুন দেশে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে একটা পাহাড়ের তলায় ছোট বড় অনেক গুহা। এই সব গুহাতে বাস করে এরা। যার যে রকম সংসার সেই ভাবে বেছে নিয়েছে গুহার আকার। কারো সংসার ছোট। সে থাকে ছোট্ট গুহায়। কারো আবার আল্লার দোয়ায় অনেক বালবাচ্চা। সে বেছে নিয়েছে বড় সড় গোছের একটা। দরিয়া এই রকম একটা গুহার সামনে এসে থামে।

—এই হোল আমার আস্তানা। এখানেই আমি থাকি। এস, ভেতরে এস।

দুই বন্ধু গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দরিয়া ডাকে, কই গো, মা জননী, একবার এদিকে দেখবে এস, কে এসেছে।

দরিয়ার বড় কন্যা এগিয়ে আসে। গুলাবী প্রবালের মতো গায়ের রং। এলায়িত সোনালী চুল। সুডোল স্তনভার। সুন্দর পেটখানা। পাতলা ছিপছিপে শরীরের গড়ন। আর বিশাল কাজল কালো ওর চোখ দুটি। কিন্তু হায়, এমন সুঠাম সুন্দর সুতনুকার ভারী নিতম্ব নাই। নাই দুখানা পা। তার বদলে এক দীর্ঘায়ত লেজ শোভা পাচ্ছে তার নিম্নাঙ্গে।

পরদেশী মেহেমানকে দেখে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে মিট্টি আবদাল্লার আপাদমস্তক গভীর কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে থাকে। তারপর এক সময় হি-হি করে হেসে ওঠে, আব্বাজান এর লেজ নাই কেন? এ কেমন জীব?

দরিয়া বলে, ইনি আমার দোস্ত, মা। জলের ওপরে মাটির দেশে থাকেন। আমি যে রোজ তোমার জন্য ঝুড়িভর্তি ফল নিয়ে আসি, সে-সব ফলমূল ইনিই আমাকে দেন। খুব সাচ্চা আদমী। অমন ভয় করছ কেন? কাছে এস, এঁর সঙ্গে কথা বলো। ইনি যে আমাদের মাননীয় মেহেমান, মা।

মেয়েটি কাছে আসে। মিষ্টি গলায় বলে, বসুন। আমাদের দেশে এসে আপনার কেমন লাগছে?

আবদাল্লা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় সেখানে এল দরিয়ার বিবি। কোলে কাঁধে দুটি বাচ্চা। ওদের হাতে দুটো মাছ। কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল। আবদাল্লার মনে হলো, আমাদের দেশের বাচ্চারা ঠিক এই ভাবে শশা পেয়ারা খায়।

মিট্টি আবদাল্লাকে দেখে হাঁ হয়ে যান দরিয়ার বিবি। বাচ্চা দুটোকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

– খোদা হাফেজ, তাজ্জব কাণ্ড! এ যে দেখি ল্যাজ নাই গো। ল্যাজ ছাড়া কী করে চলা ফেরা করেন ইনি? কী কাণ্ড—

বৌটা আবদাল্লার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। সব চেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হয় ওর কাছে আবদাল্লার নিম্নাঙ্গ। এমন সুন্দর জিনিস সত্যিই হয় না। আল্লাহর কী অপরূপ সৃষ্টি। প্রথমে কেমন

ভয় ভয় লাগে, কিন্তু একটু পরে জড়তা কেটে যায়। বোঁটা হাতের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে অনুভব করে আবদাল্লার সারা শরীর, মাঝে মাঝে সে ফিক ফিক করে হেসে ওঠে, সবই সুন্দর, চমৎকার। কিন্তু ল্যাজ নাই—এ কেমন ব্যাপার ?

এই পা উরু পাছা জঙ্ঘা ও কটিওলা লেজবিহীন জীবটিকে দেখে দেখে বিস্ময় আর কাটে না তার। মিট্টি আবদাল্লার কিন্তু এই সব আদৌ ভালো লাগে না। একটু রাগত স্বরেই সে অনুযোগ করে. দোস্ত, তোমার বিবি-বাচ্চাদের উপহাস কুড়াতেই কি এসেছি এখানে ? আমাকে দেখে ওরা অত হাসাহাসি করছে কেন ?

—ক্ষমা কর ভাই, সত্যিই আমি লজ্জিত। ওদের ঐ সব পাগলামীতে কান দিও না তুমি। আসলে মেয়ে-মানুষ আর বাচ্চাদের জ্ঞান-বুদ্ধি একটু তরল হয়।

এই বলে ছোট দুটোকে ধমক দেয় দরিয়া, এ্যাই, কী হচ্ছে, চুপ কর।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। ভীত চকিত চোখে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। দরিয়া আবার বলে, ওদের আচরণে আহত হয়ো না ভাই। জন্মাবধি ওরা লেজ ছাড়া কোনও মানুষ চোখে দেখেনি। সুতরাং তোমার এই পা কোমর পাছা ওদের কাছে আজব বস্তু বলেই তো মনে হবে। তোমরা চিড়িয়াখানায় গেলে যে কৌতূহল নিয়ে নানা জাতের বহুবিচিত্র জন্তুজানোয়ার দেখো, তোমাকে দেখেও ওদের চোখে সেই বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ওরা অবোধ অবলা, শিশু। এতে যে তোমার মনে কোনও আঘাত অভিমান হতে পারে সে দিকটা চিন্তা করার মতো বুদ্ধি ওদের নাই। সেই ভেবেই ওদের ক্ষমা এবং অবজ্ঞা কর।

ওরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছিল সেই সময় ইয়া লম্বা তাগড়াই দশটি সমুদ্রমানব এসে দাঁড়ালো সেখানে।

—শোন আবদাল্লা, সুলতান শুনেছেন, তুমি এক ল্যাজহীন মাটির মানুষকে এনে ঢুকিয়েছ তোমার ঘরে! কথাটা কী সত্যি ?

—মিথ্যে হবে কেন ? বিলকুল সত্যি। এবং এই দেখ সে লোক। আমার দোস্ত—আমার মেহমান। আমাদের দেশ দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। এখুনি আবার সমুদ্রকূলে তুলে দিতে যাচ্ছি।

—না; তা তুমি পারো না। সুলতানের হুকুম, এই পরদেশীকে তার সামনে হাজির করতে হবে। সুলতান পরীক্ষা করে দেখবেন, আসলে এর শরীরের গঠন-প্রকৃতি কেমন। এবং কী বস্তুতে গড়া। সুলতান খবর পেয়েছেন, এর সামনেটা এক রকম এবং পিছনটাও নাকি আর এক রকম ? শরীরে নাকি এমন সব কল-কব্জা বসানো আছে; যা কোনও মানুষের হয় না। তিনি একে দেখার জন্যে দারুণ কৌতূহল নিয়ে বসে আছেন। এক্ষুণি যেতে হবে।

দরিয়া দোস্তের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে দুহাত জোড় করে বলে, আমাকে ক্ষমা কর ভাই। আমাদের মহামান্য সুলতানের আদেশ অগ্রাহ্য করার

ক্ষমতা আমার নাই। তিনি যখন তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, নিয়ে যেতেই হবে তাঁর সামনে।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, আমার কেমন ভয় ভয় করছে, দোস্ত। হাজার হলেও সুলতান তো। খেয়ালী মানুষ, যদি মেজাজ মর্জি ভালো থাকে, কথা নাই। কিন্তু যদি প্রথম দর্শনেই তাঁর খারাপ লাগে তবে আমার গর্দান থাকবে তো?

দরিয়া বলে, তোমার কোন ভয় নাই, ভাই। আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবো। যদি কোনও বিপদ ঘটে, আমি বাঁচাবো তোমাকে।

আবদাল্লা বলে, সবই খোদা ভরসা। তিনি যদি রাখেন তবেই বাঁচবো। ঠিক আছে, চল তাঁর দরবারে।

আবদাল্লাকে দেখা মাত্র উৎসুক আর আনন্দে হেসে গড়িয়ে পড়ে সুলতান। হাসির হুল্লোড়ে সিংহাসনটা জলের তলায় তলিয়ে যায় বার বার।

—ইয়া আল্লাহ, এ যে দেখছি, ল্যাজহীন মানুষ! কী হে, কী ব্যাপার? তোমার ল্যাজ নাই কেন? চলাফেরা কর কী করে?

আবদাল্লা বলে, আমি জানি না। পা দিয়েই আমরা চলি। আমাদের দেশের কোন মানুষেরই লেজ নাই। সকলেরই আমার মতো পা আছে।

সুলতান জিজ্ঞেস করে, তোমাদের পিছনের ওই ভারী বস্তুটি কী?

আবদাল্লা বলে, কেউ বলে পাছা, কেউ বলে নিতম্ব।

—কী কাজে দরকার হয়?

—বাঃ, পাছা না থাকলে বসবো কী করে? অবশ্য এই পাছা মেয়েদের অঙ্গ শোভাও বটে। ভারী নিতম্বওলা মেয়েদের কদর বেশি।

—আর তোমাদের ঐ সামনের বস্তুটি কী? কী কাজেই বা লাগে?

আবদাল্লা সলজ্জ কণ্ঠে বলে, এটা পুরুষাঙ্গ—লিঙ্গ। মানুষের জীবনে এ বস্তু একাধিক কাজে দরকার হয়। কিন্তু মহামান্য সুলতানের সামনে সে-সব কথা আমি বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। তবে এইটুকু জেনে রাখুন জাঁহাপনা, মানব-সভ্যতার মূলসূত্র এই লিঙ্গ। এর দ্বারা আমরা বংশ বৃদ্ধি করে টিকে আছি।

আবদাল্লার কথা শুনে সুলতান এবং দরবার-শুদ্ধ সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

আবদাল্লা হতচকিত মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পনেরোতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সুলতান প্রীত হয়ে মিট্টি আবদাল্লাকে বলে, শোন ল্যাজহীন, তোমার 'পাছা'টা দেখে আমি বড় খুশি হয়েছি। তোমাকে আমি পুরস্কার দিতে চাই। বল, কী তোমার বাসনা—কী নিতে চাও?

আবদাল্লা বলে, জাঁহাপনা, দুটি বস্তু আমার কাম্য। প্রথমত, আমি ফিরে যেতে চাই আমার দেশে এবং যাওয়ার সময় নিতে যেতে চাই কিছু জহরত।

দরিয়া আবদাল্লা বলে, জাঁহাপনা, আমার বন্ধুটি এখানে আসার পর থেকে কিছুই আহার করে নি! আমাদের প্রিয় খাদ্য কাঁচা মাছ ওরা খেতে পারে না। সেই কারণে ওকে এখুনি সমুদ্রের ওপরে ফিরিয়ে দিয়ে আসা দরকার।

সুলতান বললো, ঠিক আছে। যতটা চায় হীরে জহরত দিয়ে ওকে ওপরে রেখে এস।

সুলতানের লোকজন নানা বর্ণের বহুবিচিত্র অমূল্য মণিমাণিক্য এনে হাজির করলো তখুনি।

সুলতান বলে, যত পার, নিয়ে যাও। কিন্তু নেবে কিসে?

দরিয়া আবদাল্লা সেই ফলের ঝুড়িটা নিয়ে এসে এক ঝুড়ি বোঝাই করে নিল সেই হীরে চুনী পান্না মুক্তো, মণি ইত্যাদি। তারপর মিট্টিকে সংগে করে সোঁ সোঁ করে অনন্ত জলরাশি ভেদ করে ওপরে উঠে এল।

সমুদ্রসৈকতে তুলে দিয়ে দরিয়া আবদাল্লা বললো, তা হলে এবার আমি চলি ভাই।

বালির ওপরে বসে রইলো আবদাল্লা। একটানা অনেক পথ সাঁতার কেটে ওঠার পর হাঁফ ধরে গেছে তার। বেশ কিছুক্ষণ পৃথিবীর মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে চাংগা হয়ে উঠলো। তারপর জহরতের ঝুড়িটা মাথায় তুলে শহরের পথে হেঁটে চললো।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, এবং দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো দেখে সুলতান চিন্তিত হলেন। হয়তো জামাতার কোনও বিপদ আপদ ঘটে থাকতে পারে। তন্দুরী উজিরকে বললেন তিনি, এত দেরি তো তার কোনও দিন হয় না, উজির। আমার লোকজন সংগে নিয়ে তুমি একবার সমুদ্রের ধারটা দেখে এস তো।

—জো হুকুম, জাঁহাপনা।

জনা কয়েক নফর চাকর সংগে নিয়ে তন্দুরী আবদাল্লা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেখা হয়ে গেল মিট্টি আবদাল্লার সংগে।

—কী ব্যাপার দোস্ত! আজ এত দেরি? আমরা তো ভাবনায় মরি।

জহরতের ঝুড়ি একটা নফরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মিট্টি বলে, আর বল কেন, আমার দোস্ত আজ নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরবাড়ি শহর মুলুক দেখাতে।

—সে কী পানির তলায়? গেলে কেমন করে? দম বন্ধ হয়ে গেল না?

আবদাল্লা বলে, না। সব বলবো, চলো আগে প্রাসাদে যাই।

প্রাসাদে পেঁৗছে সুলতান এবং অন্যান্যদের সামনে তার সমুদ্র তলদেশের সেই বিচিত্র অভিযানের কাহিনী সবিস্তারে শোনালো সে। এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

যদিও মুগ্ধ বিস্ময়ে সব শুনলেন সুলতান, কিন্তু বার বার মাথা নেড়ে বললেন, কাজটা তুমি আদো ভালো কর নি, বেটা। পানির তলায় মানুষ যায়

কখনও ? ভবিষ্যতে আর কক্‌খনো যাবে না।—এই আমার ইচ্ছা। এরপর থেকে, তুমি আমার জামাতা এবং মান্যবর উজির হয়ে ঝুড়ি মাথায় করে নগণ্য এক কুলিমজুরের মতো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে, তাও আমি চাই না। ধন-দৌলতের প্রয়োজন আছে মানি, কিন্তু সব আগে মান ইজ্জত। এখন আর তোমার ঐ কাজ সাজে না। পাঁচজন পাঁচ রকম কথা বলছে তোমাকে নিয়ে। সবই আমার কানে আসে। যাইহোক, ধন-দৌলত অনেক হয়ে গেছে, আর তোমার সমুদ্র-সৈকতে যাওয়ার কোনও দরকার নাই।

সুলতানের আদেশ অমান্য করতে পারলো না আবদাল্লা। সেই তার শেষ। আর কোনও দিন সে সমুদ্র উপকূলে যায় নি তার দোস্ত দরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে।

জানি না, দরিয়া এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল কি না, ভেবেছিল কি না—মাটির মানুষরা কী সবাই এইভাবে কসম খাওয়া কথার খেলাপ করে ?

শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে সুলতান শাহরিয়ার-এর দিকে তাকায়।

—বাঃ বেড়ে মজার কিস্‌সা শোনালে শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলে, এবার শুনুন, পীতাম্বর যুবকের কাহিনী।

সে বলতে থাকে ঃ

একদিন রাত্রে খলিফা হারুন অল রসিদ তার উজির জাফর, উজির অল ফজল, আবু ইশাক, কবি আবু নবাস এবং দেহরক্ষী মাসরুর হাবিলদার আহমদকে সঙ্গে নিয়ে সওদাগরের ছদ্মবেশে প্রাসাদ ছেড়ে পথে বের হলেন। খলিফা অনিদ্রা রোগে ভুগছেন। সারাদিন কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েও রাতে তাঁর ঘুম আসে না। উজির জাফরের পরামর্শেই তিনি টাইগ্রিসের দিকে চললেন। জাফর বলেছিল, মনের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নৌকাবিহার বড় চমৎকার।

টাইগ্রীসের উপকূলে এসে ওঁরা একখানা নৌকা ভাড়া করে চেপে বসেন। রাত্রিকালে টাইগ্রিসের শোভা বড়ই মনোহর। মাথার ওপরে চাঁদ ঝুলছিল, মৃদুমন্দ সমীরণ বইছিল। দূরে মাঝিরা দেহাতী গান ধরেছিল। নৌকা চলতে থাকে।

এক সময় নদী-তীরবর্তী এক প্রাসাদোপম ইমারতের কাছে এসে পড়েন ওঁরা। খলিফা কান পেতে শোনেন, ঐ বাড়িটার ভেতর থেকে এক সুমধুর সঙ্গীত ভেসে আসছে। জাফরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শুনতে পাচ্ছ ?

জাফর বলে, বড় মিঠে গলা, জাঁহাপনা। এমন গান কখনও শুনিনি।

খলিফা বলে নৌকা ভেড়াও। দেখতে হবে কে গাইছে। এমন ভাল গান দূর থেকে শুনে কী আশ মেটে। যে ভাবেই হোক অন্দরে ঢুকতে হবে।

রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ষোলতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয়:

—জাফর, খলিফা বলেন, আমরা পরদেশী মুসাফির—এই বলে গৃহস্বামীর আতিথ্য নিতে হবে। বাড়ির ভিতরে না ঢুকতে পারলে এমন মধুর সঙ্গীত ভালো করে উপভোগ করা যাবে না।

নৌকা থামলে ওরা সকলে নেমে বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। কড়া নাড়তেই এক খোজা প্রহরী এসে দরজা খুলে দিল।

—কাকে চান, জনাব?

জাফর বলে, আমরা পরদেশী মুসাফির। আজকের রাতের মতো মাথা গোজার একটু আস্তানা চাই।

—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিচ্ছি।

খোজাটা অদৃশ্য হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামী এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে।

—আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক, জনাব। আমার কী পরম সৌভাগ্য, আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন আপনারা। এ ঘর-দোর আপনাদের নিজেদের মনে করে ভিতরে আসুন জনাব।

এক প্রশস্ত কক্ষ। সেখানে নিয়ে গিয়ে গৃহস্বামী যত্নকরে বললো, মেহেরবানী করে আসন নিন।

ঘরখানা অতি মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো। দেওয়াল ও ছাদে শিল্পীর তুলিতে আঁকা নানা ছাঁদের সুন্দর সুন্দর কারুকার্য। ঘরের ঠিক মাঝখানে স্ফটিকের চৌবাচ্চার মধ্যে বসানো একটা জলের ফোয়ারা। বিরাম-বিহীন ধারা বর্ষণ করে চলেছে। এবং তারই ফলে সারা ঘরটায় সুখদায়ক শীতলতা ছড়িয়ে পড়েছে।

গৃহস্বামী সবিনয়ে বললো, আপনাদের কে কী মর্যাদার মানুষ আমি জানি না। তাই, সকলকেই আমি সমান সম্মান দেখাচ্ছি। ঘরে অনেক প্রকারের আসন কুর্শি কেদারা আছে। আপনারা যে যেখানে বসতে ইচ্ছা করেন বসুন।

এরপর সে ঘরের অপর প্রান্তে চোখ রাখলো। সেখানে একশোটি সোনার কুর্শিতে একশোটি সুন্দরী তরুণী আসীন ছিল। হাতের ইশারা করতেই ওরা এক এক করে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এবং দ্বিতীয় সংকেত করতে নফররা কারুকার্য করা একখানা কাপড় বিছিয়ে দিল পাশের মেজ-এ। তারপর এক এক করে নানা সুগন্ধী খানাপিনা এনে সাজিয়ে দিল।

গৃহস্বামীর অনুরোধে ওরা সকলে বসে আহার করলো। মুখ-হাত ধোয়া শেষ হলে এবার গৃহস্বামী বললো, আপনারা আজ রাতে আমার ঘরে মহামান্য

অতিথি। অনুগ্রহ করে বলুন, কী ভাবে আপনাদের তুষ্ট করতে পারি। আপনাদের যা অভিরুচি ফরমাইশ করুন ; আমি পূরণ করার কোশিস করবো।

জাফর বলে, আমরা যখন নদীর ঘাটে নৌকা ভেড়ালাম তখন এক সুন্দর সঙ্গীতের রেশ আমাদের কানে ভেসে আসছিল। এবং আপনার এই ইমারত থেকেই আসছিল বুঝতে পারলাম। যদি কোনও অসুবিধা না থাকে তবে ঐ গান আমাদের একবার শোনান, জনাব।

গৃহস্বামী বললেন, অনেক ধন্যবাদ। এখুনি শোনাচ্ছি আপনাদের।

পাশের একটি নফরকে বললো তোমার মালকিনকে গিয়ে বল, মেহেমানরা তাঁর গান শুনতে চাইছেন।

ঘরের শেষ প্রান্তে দামী পর্দা টাঙানো ছিল। তার ওপার থেকে গৃহস্বামীর বিবি উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানালো। একটু পরে সে গাইতে শুরু করলো। কী সে অপূর্ব গান। যেমন কথা তেমনি তার সুরেলা কণ্ঠ। সারা ঘরময় কান্নার বেদনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

খলিফা মুগ্ধ হয়ে আবু ইশাককে বলেন, ইয়া আল্লাহ, এমন গান আমি কখনও শুনিনি, ইশাক।

তারপর গৃহস্বামীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয় গায়িকা তার প্রিয়তমের বিরহে একেবারে মুহ্যমান হয়ে গেছেন। গানের ভাষা ও সুরে তারই করুণ বেদনা ঝরে পড়ছে।

গৃহস্বামী বললেন, জী না সাহেব, আপনার এ অনুমান ঠিক না, তবে আপনজন—তার মা এবং বাবার বিয়োগের ব্যথা তাকে মথিত করে ফেলেছে। যখনই তাদের কথা মনে পড়ে সে এই ধরনের করুণ সুরের গান গায়।

খলিফা এই প্রথম গৃহস্বামীর দিকে ভালো করে তাকালেন। বয়সে সে যুবক। সুন্দর চেহারা। কিন্তু সারা মুখে এক বিষাদের ছাপ। যেন মনে হয়, দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ। পীতাভ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সারা মুখ। যুবককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বিদেশী, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারের কোনও কথা জানতে চাওয়া বোধহয় সঙ্গত হবে না, তবু বলছি, যদি আপত্তি না থাকে তবে বলুন, মুখের যে এই পীতাভ ফ্যাকাশে রং একি আপনার জন্মগত, না অন্য কোনও কারণে হয়েছে।

যুবক বললো, না, বলতে কোনও বাধা নেই। সে এক বড় বিচিত্র কাহিনী। আপনাদের যদি শোনার ধৈর্য থাকে, আমি শোনাতে পারি।

—আমরা সবাই উম্মুখ হয়ে আছি। আপনি বলুন।

এই সময় রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সতেরোতম রজনী :

আবার গল্প শুরু করে সে :

—তাহলে শুনুন মালিক, আমার মাতৃভূমি উমান মুলুককে এক সময়ে আমার

বাবা উমান শহরের নামজাদা সওদাগর ছিলেন। জাহাজের ব্যবসা ছিল তাঁর। নানা দেশের বন্দরে বন্দরে ভাড়া খেটে ঘুরে বেড়াতো সেগুলো। ত্রিশখানা জাহাজ। এর বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ত্রিরিশ হাজার দিনার।

বাবা খুব শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। সে-কারণে আমাকেও তিনি যথেষ্টই পড়াশুনা শিখিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ সময়ে বাবা আমাকে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিয়ে যান। আমি শ্রদ্ধাভরে সেগুলো শুনেছিলাম সেদিন। এরপর আল্লাহ তাঁকে কোলে টেনে নিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর আমি ইয়ার দোস্ত পরিবৃত হয়ে (তখন আমার অনেক টাকা কড়ি সুতরাং তাঁবেদারদের অভাব ছিল না) একদিন বসে আছি এমন সময় অসময়ের ফলভর্তি একটা ঝুড়ি নিয়ে এসে হাজির হলো জাহাজের এক কাপ্তান। ফলগুলো সত্যিই খুব সুন্দর এবং দুষ্প্রাপ্যও বটে। আমি ওকে একশো দিনার বকশিশ দিলাম। ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে ফলগুলো বিলিয়ে দিতে দিতে কাপ্তানকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে এনেছ এই অকালের ফলগুলো। এখন তো আমাদের দেশে এসব পাওয়া যায় না।

কাপ্তান বলে, আমি সদ্য বসরাহ এবং বাগদাদ থেকে ফিরছি। ওখানকার বাজার থেকে সংগ্রহ করেছি। সাধারণ মানুষ এ ফল খেতে পারে না। সুলতান বাদশাহদের জন্য বিক্রি হয়।

আমার বন্ধু-বান্ধবরা বসরাহ আর বাগদাদের গুণগানে মুখর হয়ে উঠলো। সেখানকার মানুষ, তাদের আচার ব্যবহার, সভ্যতা ভদ্রতা নাকি অপরূপ। এক একজন এক-একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এমন সব সুন্দর সুন্দর কাহিনী শোনাতে থাকলো যে আমি বড়ই চমৎকৃত হলাম। আমার মনে দেশ ভ্রমণের বাসনা জেগে উঠলো। বিশেষ করে বসরাহ এবং বাগদাদ আমাকে দেখতেই হবে।

আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি প্রায় জলের দরেই বেচে দিলাম। যত দাসী বাঁদী ছিল তাও বেচলাম। একখানা মাত্র জাহাজ রেখে বাকীগুলো বেচে হাজার হাজার দিনার হাতে পেলাম। বেচলাম না শুধু আমার হীরে জহরত এবং সোনাদানাগুলো। তারপর দিনক্ষণ দেখে আমার সেই একমাত্র জাহাজ-খানায় চেপে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে পড়লাম।

আল্লাহ সহায় ছিলেন। পথে কোনও বিপদ হলো না। কয়েকদিন পরে নিরাপদে এসে পৌঁছলাম বসরাহর বন্দরে। সেখান থেকে একখানা ছোট নৌকা করে চলে এলাম বাগদাদে।

আমার বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম বাগদাদের কারখ্ অঞ্চলে বিত্তশালীরা বাস করে। সেখানে একখানা বিরাট বাড়ি ভাড়া করে নিলাম। আমার বাড়িটা ছিল ঠিক জাফরান পথের ওপর।

সেদিন জুম্মাবার ছিল। আমি সদ্য শহরে এসেছি। শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় আমি টাইগ্রিসের উপকূলে এসে পড়লাম। সেখানে দেখি, একখানা বিরাট বাড়ির বাইরের বারান্দায় অনেকগুলো ছোট ছোট

ছেলে এক পলিত-কেশ বৃদ্ধকে ঘিরে বসে আছে। আরও কাছে যেতে বুঝলাম তিনি কিস্‌সা শোনাচ্ছেন ছেলেদের। পরে জেনেছিলাম এই বৃদ্ধের নাম তাহির ইবন অল আলা। ছোটদের বন্ধু নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ছোট ছোট ছেলেদের তিনি খুব পেয়ার করেন। মজার মজার কাহিনী শোনান। নানারকম ফলমূল, মেঠাই-মণ্ডা খেতে দেন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আঠারোতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বৃদ্ধের কথাবার্তা শুনতে থাকলাম! বড় মজার মানুষ। তার গল্প বলার কায়দা ভারি অদ্ভুত। শুনতে শুনতে সব কিছু ভুলে যেতে হয়। সেই মুহূর্তে মনে হলো, আমার বাগদাদে আসা সার্থক হয়েছে।

বারান্দার ওপরে উঠে গিয়ে বৃদ্ধকে সালাম জানাতে তিনি আমাকে বসতে বললেন। সবিনয়ে বললাম, জনাব আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। আজ রাতটা যদি আপনার এখানেই কাটাই—

তিনি খুশি হয়ে বললেন, এতো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। বেশ তো থাকুন। খানাপিনা করুন। আমার এখানে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বাঁদী আছে। দশ বিশ পঞ্চাশ এমন কি একশো দিনারের মেয়েও আছে। আপনার যাকে পছন্দ সঙ্গী করে নিতে পারেন।

আমি বললাম, আমাকে একটা দশ দিনারের বাঁদী দিন। এই নিন একমাসের টাকা আগাম তিনশো দিনার।

বৃদ্ধের হাতে দিনারগুলো তুলে দিতে তিনি নিক্তি দিয়ে ওজন করে একটি ছেলেকে বললেন, সাহেবকে হামামে নিয়ে যাও। খুব ভালো করে গোসল করাও।

ঘষে মেজে গোসল করে আসার পর বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে করে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটি মেয়ে বসেছিল। বৃদ্ধ তাদের সামনে আমাকে দেখিয়ে বললো, এই তোমার নতুন মেহবান রেখে গেলাম।

তিনি চলে গেলেন। ভালো করে দেখলাম, মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। ওর লাবণ্য-লাস্য আমাকে মুগ্ধ করলো।

সে আমাকে বসতে বললো। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। একটা মেজেয় সাজানো ছিল নানারকম সুন্দর সুন্দর খানাপিনা।

দুজনে মিলে আহারপর্ব সমাধা করলাম। তারপর সে আমাকে শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে দিল। সেই রাতে সুরা এবং নারী-সুধা পান করলাম আকণ্ঠ। মেয়েটি কায়দা-কানুন জানে, আমাকে অমৃতের সায়রে ভাসিয়ে রাখলো সারাটা রাত।

শুধু সেই একটা রাত্রিই নয় পরপর তিরিশটা রাত্রির সহচরী, শয্যা-সঙ্গিনী হয়ে আমাকে অনেক আনন্দ উজাড় করে দিল সে। সুখের সময়গুলো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। একটা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। মনে হলো শুধুমাত্র একটা রাতই অতিবাহিত করেছি আমি।

ঠিক তিরিশটা রাত্রি কাটার পর একটি চাকর এসে আমাকে হামামে নিয়ে গেল। গোসলাদি করার পর সে নিয়ে এল আমাকে সেই বৃদ্ধের কাছে।

আমি বললাম, মালিক বড় আনন্দ পেয়েছি একটা মাস। এবার আপনি আমাকে কুড়ি দিনারের একটা মেয়ে দিন।

বৃদ্ধ হাত বাড়ালেন। আমি এক মাসের ভাড়া ছ'শ দিনার তার হাতে তুলে দিলাম। যথারীতি নিক্তিতে ওজন করলেন তিনি।

তিনি অন্য একটা ছেলেকে বললেন, যাও, সাহেবকে নিয়ে যাও।

অন্য একটা ঘরে এসে দাঁড়ালাম। ঘরের মাঝখানে দুগ্ধ-ফেননিভ পালঙ্ক-শয্যা। তার চারপাশে চারটি দাসী দণ্ডায়মান। আমাকে বসতে বলে তারা পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরে দেখলাম, এক খ্রীস্টান সুন্দরী এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। আগের মেয়েটির চেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে। সাজ-পোশাকের বাহারও অনেক বেশি তার। সে আমার একখানা হাত ধরে পালঙ্কে বসালো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো উনিশতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

সে আমাকে সোহাগ জানিয়ে বললো, সাহেবের এমন সুন্দর রূপ, তা এই ভাড়া করা মেয়ের দরকার হলো কেন? তোমাকে দেখে যে-কোনও মেয়েরই তো জিভে জল আসার কথা! যাই হোক, খানাপিনা তৈরি, চলো খেয়ে নিই আগে।

দুজনে তৃপ্তি করে খেলাম। খাবারের শেষে সুরা-সাধনা চলতে থাকলো। রাত বাড়ে। নেশাও বাড়তে থাকে। রক্ত নেচে ওঠে। আমরা শুয়ে শুয়ে অমৃতলোকে পাড়ি জমাই।

ভালো লাগে। বড় ভালো লাগে। অবশ্য এজন্য মেয়েটিই দায়ী। কী করে ভালো লাগাতে হয় সে বিদ্যা তার বেশ ভালো রকমই জানা আছে।

সারাটা মাস কেটে গেল। আমি অনেক পেলাম। কিন্তু মনে হতে লাগলো, আরও চাই, আরও। আমার ক্ষুধার বুঝি শেষ নাই।

যথারীতি আবার চাকরটা এসে আমাকে হামামে নিয়ে গেল। হামাম থেকে আবার সেই বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আমি বললাম, অনেক আনন্দ পেয়েছি। আমার ইচ্ছা, বাকী জীবনটা আমি আপনার আনন্দ-গৃহেই কাটিয়ে দিই।

বৃদ্ধ বললেন, উত্তম কথা। আজ রাতে আমাদের এই বাড়িতে এক সুন্দর উৎসব অনুষ্ঠান হবে। আপনি আমাদের মহামান্য অতিথি। আপনাকে এই

উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ করছি। সন্ধ্যাবেলায় আপনি এসে সোজা-ছাদের ওপরে চলে যাবেন। সেখানেই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

সেদিন ছাদের ওপরটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ছাদের মাঝখানটায় একখানা মখমলের পর্দা খাটিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত করা হয়েছে। পর্দার ওপারে, দেখলাম এক তরুণ আর এক তরুণী গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে শায়িত।

পাতলা পর্দার বাধা থাকলেও মেয়েটির অসাধারণ রূপ-লাবণ্য আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না। এমন অলোক-সামান্যা রূপবতী নারী আমি জীবনে দেখিনি কখনও। বুকের মধ্যে কামনার আগুন দাউ দাউ করে উঠলো। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। গত একটা মাস যে মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছিলাম তার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ছাদের ওপরে যাকে দেখে এলাম, সে কে?

মেয়েটি মুচকী হেসে বলে, কেন, খুব বুঝি মনে ধরেছে? তা তো ধরবেই। তার মতো খুবসুরত মেয়ে তো তামাম আরবে নাই। সে-ই আমাদের মধ্যমণি। তার রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কত সুলতান ও বাদশাহর ছেলে। তুমিও কী হাত বাড়াবে নাকি?

আমি বলি, ক্ষতি কী?

—না বিশেষ আর কী ক্ষতি। মাত্র পাঁচশো দিনার—এক রাতের ভাড়া।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসে, ভালো করেই টোপ গিলেছ দেখছি। যাক কাল সন্ধ্যায় মালকড়ি নিয়ে এস। সে তোমার বাঁদী হবে বৈকি।

পরদিন শাহজাদাদের জমকালো সাজ-পোশাকে সেজেগুজে এসে দাঁড়ালাম বৃদ্ধের সামনে। দিনারের একটা থলে বাড়িয়ে দিলাম তার হাতে।

—পনের হাজার আছে। এক মাসের ভাড়া।

বৃদ্ধ ওজন করে দেখে নিল। তারপর একটি ছোকরাকে বললো, সাহেবকে নিয়ে যা।

ছেলেটি আমাকে একখানা প্রশস্ত কামরায় নিয়ে এসে বললো, আপনি এখানে বসুন।

ছেলেটি বেরিয়ে যেতে পাশের ঘর থেকে দুজন বাঁদী এসে আমাকে বললো, মেহেরবানী করে আমাদের সঙ্গে আসুন।

পাশের ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। এমন মূল্যবান গালিচা পর্দা, আসবাবপত্র আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আর কী সুন্দর করে সব সাজানো গোছানো! দেওয়ালে দেওয়ালে নামী শিল্পীর আঁকা নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। জীবন সার্থক হয়ে গেল আমার।

ঘরের এক পাশে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিল সে। তার মাথা এবং পায়ের কাছে বাঁদীরা চামর দোলাচ্ছিল। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি তাকে, তার রূপ-যৌবন, লাস্যকে।

—আসুন আসুন, মালিক। আপনার পথ চেয়েই বসে আছি আমি।

যেন কেউ সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে উঠলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলাম, মেয়েটি দুহাত বাড়িয়ে আমাকে আহ্বান করছে।

—আসুন, বাঁদী আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত মালিক।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো কুড়িতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

তার রূপের বর্ণনা দেব, সে ভাষা আমার নাই। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী পরী সে। রূপবতী সুন্দরী নারী আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এ মেয়ের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। কবিরা হয়তো তাকে নিয়ে অনেক কাব্যগাথা রচনা করতে পারতেন, কিন্তু আমি এক সাধারণ মানুষ, সে ভাষা কোথায় পাবো। তবু বলবো, দুনিয়ার সেরা শিল্পীরও সাধ্য নাই তার মতো সুন্দরীর ছবি আঁকতে পারে।

সেই রাতে আমাকে সে অনেক সুমধুর গান শোনালো। সে গানের মিঠে সুর আজও আমার কানে বাজে। হৃদয়ের রক্তে, রন্ধ্রে অনুরণন তোলে!

শরাবের নেশায় পাগল হলাম, কিম্বা তার রূপের নেশায়, ঠিক বলতে পারবো না। তবে সে নেশার ঘোর আমার সারাটা মাস আর কাটলো না।

মাসান্তে আমার ডাক পড়লো। বৃদ্ধের সামনে নিয়ে গেল নফর। আমি বললাম, আমার সব কিছু পাওয়া হয় নি, শেখসাহেব। আমি আরও কিছুকাল কাটাতে চাই তাকে নিয়ে।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, এ তো বড় শুভ সংবাদ। তা টাকাটা আগাম যে চাই মালিক।

আমি লজ্জিত হয়ে বলি, একশো বার। এক্ষুণি আমি বাসায় গিয়ে নিয়ে এসে দিচ্ছি আপনাকে।

আরও পনের হাজার দিনার এনে দিলাম বৃদ্ধের হাতে। একটা মাস পরে আবার নফর এসে দাঁড়ায়। আমি তখন আরও বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

আবার বৃদ্ধকে এনে দিলাম পনের হাজার দিনার। আর এক মাসের ভাড়া।

এইভাবে মাসের পর মাস চলে গেল। সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেল আমার সমস্ত সঞ্চিত ধন। উমান থেকে যা কিছু এনেছিলাম সব শেষ হয়ে গেল একদিন।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একুশতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয়:

আমি কপর্দকশূন্য হয়ে চোখের পানি ফেলতে থাকি। আমাকে কাঁদতে দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, মালিক, তোমার চোখে পানি কেন? কী হয়েছে?

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। দু হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার

করে কেঁদে উঠি, আমার আর কিছু নাই, সোনা। সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি পথের ভিখারি। পয়সা নাই সে জন্য আমার এক বিন্দু দুঃখ নাই মণি। শুধু এই ভেবে সারা হচ্ছি, তোমার সঙ্গ ছেড়ে আমাকে সরে যেতে হবে। তোমাকে না দেখে আমি বাঁচবো কী করে ?

মেয়েটি বলে, এর আগে একটা খদ্দেরেরও পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমাকে নিয়ে সে অনেকদিন কাটাবার পর তারও বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার বাবা বড় ভালো মানুষ। তিনি বিনি পয়সায় আরও তিনটে দিন কাটাতে দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। তোমাকেও তিনি নিশ্চয়ই সেই কথাই বলবেন। কিন্তু প্রিয়তম, তুমি যেমন আমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না, আমিও তেমনি তোমার অদর্শন সইতে পারবো না। যে-ভাবেই হোক আমি একটা ফিকির বের করবো। যাতে তুমি আমি একসঙ্গেই সারাজীবন কাটাতে পারি তার একটা ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। যাক, ও নিয়ে তুমি কোনও দুর্ভাবনা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দরকার হলে আমার নিজের ভবিষ্যৎ আমিই নির্ধারণ করবো। বাবার কিছু বলার নাই, আমি বড় হয়েছি এখন। আমার স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরার অধিকার আছে। তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমি তোমাকে পাঁচশো দিনার দিচ্ছি। এটা নিয়ে গিয়ে তুমি বাবাকে দিয়ে বল, এখন থেকে রোজকার পয়সা রোজ দেবে। তাতেও তিনি 'না' করবেন না। আজ তুমি যে টাকাটা বাবার হাতে দিয়ে আসবে সেই টাকাটা তিনি আমাকে দেবেন। আগামীকাল আবার সেই টাকাটা নিয়ে গিয়ে বাবাকে দিও। এইভাবে চলতে থাকলে বাবা বুঝতে পারবেন না। তোমারও আর থাকার কোনও অসুবিধা ঘটবে না।

মেয়েটির এই আশ্চর্য ফন্দীতে একটা বছর ওকে নিয়ে দিব্যি আনন্দে কাটালাম। কিন্তু নসীবে সুখ চিরকাল থাকে না কারো। মেয়েটি একদিন রাগের মাথায় তার দাসীকে একটা থাপ্পড় মেরে বসলো। আর সেই হলো আমার কাল। জব্দ করার জন্য সে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে আসল কথা সব ফাঁস করে দিল।

মেয়ের বাবা তো ক্ষেপে আগুন। তিনি শুধু মারতেই বাকী রাখলেন। ঠগ জোচ্চোর প্রতারক নানারকম বিশেষণে ভূষিত করলেন আমাকে।

—অপনার মতো এই রকম জালিয়াত ঠগ আমি কম দেখেছি। আমার নিয়ম আছে পয়সা ফুরিয়ে গেলে তিনটি দিন আমি তাকে বিনি পয়সায় থাকতে দিই। কিন্তু আপনি আমাকে ধোঁকা দিয়ে মেয়ের সঙ্গে সাট করে গোটা একটা বছর কাটিয়েছেন। আর নয়, এবার মানে মানে কেটে পড়ুন। আমার এখানে কোনও জায়গা হবে না। শুধু এখানে কেন, এই বাগদাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে আপনাকে, এবং আজই। নইলে আপনার লাস টাইগ্রিসে ভাসবে কাল।

বৃদ্ধ আমার দিকে দশটা চাঁদীর দিরহাম ছুঁড়ে দিল। এই নিন রাহাখরচ। আধঘণ্টার মধ্যে বাগদাদের সীমানা ছেড়ে চলে যান।

উমানের সওদাগর-সম্রাটের পুত্র আমি একদিন কয়েক লক্ষ দিনারের মালিক ছিলাম। আর আজ পথের ভিখারি। কী খাব কোথায় যাব কিছুই জানি না।

হাঁটতে হাঁটতে একদিন বসরাহ এসে পৌঁছলাম। খিদেয় পেট জ্বলছিল। অথচ ট্যাঁকে কানা-কড়ি নাই। চেয়ে-চিন্তে কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা, সেই আশায় বাজারের দিকে চলেছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম। পিছন থেকে কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ফিরে দেখি আমার দেশ উমানের এক সওদাগর। বাবার দোকানের কর্মচারী ছিল এক সময়। এখন নিজেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ পয়সা করেছে।

—আরে, মালিক আপনি এখানে?

—আর মালিক। কে যে কখন বাদশাহ আর কে যে কখন ফকির হয় কে বলতে পারে।

আমার এই ধরনের দার্শনিক কথার মর্ম উদ্ধার করতে পারলো না সে। বললো, কেন, কী হয়েছে?

আমি তখন আমার সব আনন্দ-দুঃখের কাহিনী খুলে বললাম তাকে।

—আমার যা ছিল সবই তুলে দিয়েছি ওই বুড়োর হাতে। সে যে কী পরিমাণ অর্থ নিশ্চয়ই তুমি আন্দাজ করতে পার। ত্রিশখানা জাহাজ বিক্রির টাকা। তাছাড়াও আমার বাড়ি-ঘর জমি-জমা দোকান-পাট বেচেও পেয়েছিলাম অনেক। এর সঙ্গে ছিল বাবার শখের সম্পত্তি—হীরে জহরত সোনা-দানা। সেও প্রচুর। সব মিলে কয়েক লক্ষ্য দিনার। এর একটা পয়সাও আমি অন্য দিকে খরচ করিনি। সবই দিয়েছি ঐ বুড়োকে। তার বিনিময়ে সে আমাকে তার মেয়ের সঙ্গে কাটাতে দিয়েছে কিছুকাল। আজ যখন আমি নিঃশেষ, রিক্ত তখন সে আমাকে বের করে দিয়েছে। একটা পয়সা নাই যে রুটি সবজী সংগ্রহ করি।

বলতে বলতে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে বললো, দুঃখ করে কেনও ফল হবে না মালিক। নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। না ঠেকলে মানুষ শেখে না। তবে অনেক সময় এই শিক্ষালাভের জন্য এত মূল্য দিতে হয় যে আর টিকে থাকাই দায় হয়। যাক, যা গেছে তা তো গেছে। ও নিয়ে অনুশোচনা করে কোনও লাভ হবে না। এখন সামনে চলতে হবে। নতুন করে বাঁচার ধান্দা করতে হবে। যতদিন না সময় সুযোগ হয় আপনি আমার গদিতেই থাকুন। বসরাহর বন্দরে আমি ভূষি-মালের কারবার করি। সারাদিনের কেনা বেচার হিসেবপত্র রাখবেন। তার বদলে খানাপিনা এবং নগদেও কিছু ধরে দেব। আপনি আমার মালিকের সন্তান। অবস্থার ফেরে পড়েছেন। তাই বলে মনে করবেন না আপনাকে কর্মচারী করে রাখতে চাই। আপনি আমার দোকানটা দেখা-শুনা করবেন। তার সম্মান দক্ষিণা হিসাবে সামান্য কিছু দেবো আমি।

মনে সাহস এবং আশা ফিরে পেলাম। যাক, দুনিয়াতে সব মানুষই তবে অকৃতজ্ঞ নয়। এখনও কিছু হৃদয়বান পরোপকারী লোক আছে।

বসরাহর বন্দর বাজারে বছরখানেক কাটে। ইতিমধ্যে শ'খানেক দিনার জমিয়ে ফেলেছি। ভাবলাম, আর এইভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করবো না। এই

একশো দিনার সম্বল করেই ব্যবসা শুরু করবো।

একদিন বাগদাদের জাহাজে চেপে বসলাম।

জাহাজের পাটাতনে বসে দূরে দিগন্ত বিস্তৃত অশান্ত জলরাশির দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকি। জাহাজ চলেছে, যাত্রীর কোলাহল, খালাসীদের ব্যস্ততা সারেঙের হাঁক—কিছুই কানে প্রবেশ করে না। আমি শুধু একা একা বসে অতীতের পাতা ওলটাই। স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাই।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি পাটাতনের এক পাশে কয়েকজন সওদাগর ঘিরে ধরেছে আর এক সওদাগরকে। সে একটা পোঁটলা খুলে মেলে ধরেছে তাদের সামনে। মুহূর্তে আমার চোখ ঝলসে গেল। একসঙ্গে এত চুনী-পান্না মুক্তো প্রবাল, নাগরাজ মণি প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন কখনও দেখিনি।

ওদের কথাবার্তা এবং কলকোলাহল থেকে বুঝলাম, সওদাগর সাহেব নানা দেশে ঘুরে স্বদেশে ফিরছেন। অনেক হীরে জহরত বিক্রী করেছেন। শেষে এইটুকু আর বেচা হয় নি। তাই সবাইকে বলছেন, যার দরকার এগুলো নিয়ে নিন, খুব সস্তা দরে দিয়ে দেবো।

কিন্তু মওকা বুঝে সওদাগররা তেমনে বড় একটা আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। তারা দাঁও খুঁজছিল। নিশ্চয়ই সে নামবার আগে প্রায় মাটির দরে দিয়ে যাবে।

হয়তো দিতও তাই। কারণ অনেকদিন ঘর ছাড়া। আজ প্রথম পরবাস থেকে নিজের শহরে পা রাখবে সে। ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেও অনেক। লাভের অংকটাও নেহাত মন্দ আসে নি। এখন এই সামান্য কটা মাল নিয়ে আর ঝুলে থাকার ইচ্ছে নয় তার। জাহাজ থেকে নামার আগে হাত সাফ করতে চায় সে।

হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়লো সওদাগর সাহেবের। বেশ কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে পরিচয় হাতড়াতে লাগলাম।

—আপনি এখানে?

আমি তখনও তাঁকে ঠিক চিনতে পারছি না বুঝে তিনি বললেন, আপনার বাবা উমানের সওদাগরদের বাদশাহ ছিলেন, মালিক। আমি আপনার বাবার কাছে অনেক হীরে জহরত বিক্রী করে এসেছি। বহুত খানদানী বড়া আদমী ছিলেন আপনার বাবা। শুনলাম, তিনি গত হয়েছেন। তা আপনি এখন কোথায় ব্যবসা করেন, মালিক?

আমি বললাম, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করি না।

—করবারই বা কী দরকার। বাবা যা রেখে গেছেন তা সাতপুরুষ বসে খেলেও ফুরাবে না। এগুলো দেখলেন, হুজুর? পছন্দ হয়?

আমি বলি, পছন্দ হলেই বা কী করবো, বলুন। এই দুনিয়াতে আমি এখন মাত্র একশো দিনারের মালিক। তার বেশি এক আধলাও আমার নেই।

সওদাগর অবাক হন। বলেন, সে কি কর্তা? অতবড় বিশাল সম্পত্তি, নষ্ট হলো কিসে?

আমি বললাম, সে অনেক দুঃখ লজ্জার কাহিনী। এত লোকের সামনে বলি কী করে। আর বলেই বা কী হবে। যা গেছে তা গেছে। ফিরে আসবে না

কোনও দিন এবং ও নিয়ে দুঃখও করি না। এখন আমি মাত্র একশোটা দিনার সম্বল করে অনির্দিষ্ট পথে চলেছি। যদি বরাতে কিছু থাকে হবে। না হলে —না হলে আর ভাবি না, যা হয় হবে।

সওদাগর আমার কথায় অভিভূত হয়ে বললেন, এক কালে আপনার বাবার পয়সা বহু লোকে খেয়েছে। আমিও যে তার ভাগ পাইনি তা নয়। যখনই গেছি তার কাছে—শূন্য হাতে ফিরিনি। শৌখিন মানুষ ছিলেন তিনি। ভালো হীরে জহরত মূল্যবান রত্ন কিছু নিয়ে গেলে লুফে নিতেন। দরদাম একদম পছন্দ করতেন না। মুখ ফুটে চাইতে পারলেই হতো। সেই দামই মঞ্জুর করতেন তিনি। তাই বলছিলাম, এক সময়ে আপনাদের অনেক খেয়েছি আজ না হয় আপনার এই অসময়ে তার কিছু ফেরতই দিলাম। আপনি এগুলো নিন মালিক! যদি বরাতে থাকে, যদি তেমন তেমন মক্কেলের দেখা পান এতেই আপনার অনেক হবে।

আমি বললাম, কিন্তু আমি দাম না দিয়ে নেব না। এবং ও-সব জিনিসের দাম আমার কাছে নাই।

সওদাগর নাছোড়বান্দা। বললেন, ঠিক আছে আপনি ঐ একশো দিনারই দিন আমাকে। ঐ দামেই আপনাকে বেচবো আমি।

তবু আমার মনে হতে লাগলো তিনি আমাকে যেন কৃপা করতে চাইছেন। আমি রাজি হবো কি হবো না ভাবছি। তিনি পুঁটলিটা বেঁধে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, নিন ধরুন। ভাববেন না, আপনাকে আমি দান করে দিলুম। বাজারে দরদাম করে বেচলে হাজারখানেক লাভ করতে পারবেন। সে আর এমন কী। একশো দিনারে মাল কিনে হাজার দিনার কী নাফা হতে পারে না!

আমার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। তাই তো, ব্যবসাতে এরকম মওকা কখনও আসে বইকি। এবং সে সময়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকে নাকি কেউ?

সওদাগরের হাতে আমার পুঁজিটা তুলে দিয়ে রত্নের পুঁটলিটা নিয়ে নিলাম।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেইশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

সেই থেকে আমার ভাগ্যের বিবর্তন শুরু হলো। বাগদাদে এসে আমির অমাত্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনেকগুলো মাল বিক্রি করতে পারলাম। হাতে কিছু পয়সা হলো। তখন একটা দোকান ভাড়া করে কেনা-বেচার ব্যবসা শুরু করে দিলাম। দিনের শেষে লাভও হতে থাকলো কিছু কিছু।

আমার রত্নগুলোর মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা বস্তু ছিল। সমুদ্রের কোনও ঝিনুক-টিনুক জাতীয় কিছু একটা হবে। দেখতে লাল টুকটুকে। ভালো

করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় দুটো চোখ এবং ফড়িং-এর মতো দুখানা ঠ্যাং আছে তার। যাইহোক, বাজারের অনেককেই দেখালাম। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলো না। এবং দামও দিতে চাইলো না কিছু। ভেবেছিলাম এক দুই দিনারও যদি পাওয়া যায় বেচে দেব। কিন্তু পনের দিরহামের বেশি দাম দিতে চাইলো না কেউ। আমি আর ও নিয়ে সময় নষ্ট করলাম না। দোকানের একটা তাকে ফেলে রাখলাম। থাক, যদি কখনও কারো দরকারে লাগে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে।

একদিন দোকান খুলে আছি, এক পরদেশী এসে ঢুকলো। আমি তাকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, বসুন, মালিক। কী চান বলুন? কী দেব?

আগন্তুক তাক-এ রাখা সেই অদ্ভুত বস্তুটার দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, ইয়া আল্লাহ, এতদিনে পেলাম—

অনেক দিনের অনাদরে অযত্নে পড়ে থাকার জন্য ওটার ওপর ধুলো বালি জমে গিয়েছিল। লোকটি হাতে তুলে নিয়ে ধুলো ঝেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। আমি ঈষৎ বিরক্ত বোধ করছিলাম। এই সাত সকালে কোথায় ভাবলাম একটা মক্কেল এল, তা না, যত সব ঝুট ঝামেলা—

লোকটা বললো, কত নেবেন এটা।

আমি বললাম, কত দিতে পারেন?

—কুড়ি দিনার।

একেবারে কু-ড়ি দিনার। আমি ভাবলাম লোকটা রসিকতা করতে ঢুকেছে। রাগ হলো, কিন্তু আমি দোকান খুলে বসেছি। খদ্দেরের সঙ্গে রাগারাগি করা কেতা বিরুদ্ধ। মনের রাগ মনে চেপে নির্লিপ্ত ঠাণ্ডাগলায় বললাম, আপনি আসতে পারেন।

সে কিন্তু অন্যরকম ভাবলো, দামের অংকটা শুনে হয়তো গোসা হয়েছে আমার। তাই আমাকে তোয়াজ করে বললো, আহা রাগ করছেন কেন? আমি খদ্দের, আমার যা ইচ্ছে দাম বলতে পারি। আপনার পোষায় দেবেন, না হলে দেবেন না। এর মধ্যে রাগারাগির কী থাকতে পারে। ঠিক আছে, পঞ্চাশ নিন।

এবার নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম। লোকটার তামাশা করার ঢং দেখে রী রী করে জ্বলে উঠলো আমার শরীর। কিন্তু কথা উঠলে রাগের মাথায় কি বলতে কি বলে ফেলবো, তার চাইতে গুম মেরে বসে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। এক-খানা হিসেবের খাতা টেনে নিয়ে সেইদিকে মনোনিবেশ করতে চাইলাম। ভাবলাম এইভাবে ওকে দোকান থেকে বিদায় করবো। কিন্তু তা হলো না। দুম করে সে বললো, একহাজার দিনার, দেবেন?

এবার আমি ওর দিকে কটমট করে তাকালাম। ইচ্ছে হলো একটা ঘুঁষি মেরে ওর মুখের আদলটা বিগড়ে দিই। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার খাতার দিকে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। লোকটা একটা বেহুদা।

—আহা, আমার কথাটা একটু শুনুন। কী চান বলুন, দুহাজার, তিন হাজার, চার হাজার ?

আর একটাও কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না আমার। সে এক তরফা বকেই চললো, দশ পনেরো—বিশ হাজার ?

একটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কী ব্যাপার ? আপনার মতলব কী ? বিক্রি করতে চান, না, চান না। সাফ সাফ বলে দিন।

তার চেঁচামেচিতে ততক্ষণে রাস্তার অনেক পথচারী দোকানে উঠে এসে ভিড় জমিয়েছে।

—কী ব্যাপার ? কী হয়েছে ?

লোকটা বলে দেখুন, আমি এই জিনিসটা কিনতে চাই। তা নিজে থেকেও উনি দাম বলবেন না। আমি দর দিচ্ছি তাও হ্যাঁ না কোনও জবাব দেবেন না।

একজন বললো, সে কি গো দোকানী, খদ্দেরের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে নাকি !

আমি দারুণ অস্বস্তিতে পড়লাম। একটা তুচ্ছ কারণে এত লোক জমায়েত হয়ে গেছে। লোকটা তো মহাশয়তান। আমি বেশ রাগত স্বরেই বললাম। কী ব্যাপার, আপনি সত্যিই কিনতে চান, না মস্করা করছেন ?

লোকটাও ঠিক তেমনি ভাবে জবাব দেয়, আপনি সত্যিই বিক্রী করতে চান, না, মস্করা করছেন ?

—নিশ্চয়ই বিক্রী করতে চাই।

—তাহলে আমার শেষ কথা শুনুন, আমি এর জন্য ত্রিশ হাজার দিনার দিতে পারি। যদি মনে করেন লেনদেন শেষ করে দিতে পারেন।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে উপস্থিত লোকদের সাক্ষী মানলাম, আপনারা শুনছেন, শুনছেন তো সব ? আমি কিন্তু এক্ষুণি মেনে নেব ওঁর কথা! তখন পিছটান দিলে শুনবো না।

—আমিও শুনবো না। একবার যদি মেনে নেন আমার দাম। দিতে হবে ঐ দামে।

—আলবাৎ দেব। ফেলুন কড়ি।

—ত্রিশ হাজার ?

—হ্যাঁ, ত্রিশ হাজারই দেব।

তখন লোকটি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে বললো, আপনারা সাক্ষী। উনি আমাকে এই জিনিসটা ত্রিশ হাজার দিনারে বিক্রী করছেন। আমি এক্ষুণি দাম মিটিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে সে একটা বস্তা এনে আমার সামনে রাখলো।

লেনদেন চুকে গেল। সেই অদ্ভুত বস্তুটা জেবে ভরলো সে। আমি ত্রিশ হাজার দিনার বাক্সে তুললাম। লোকজন বিদায় নিল। দোকানের ভিড় পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু লোকটি গেল না। আমার পাশে এসে বসলো। তারপর করুণা প্রদর্শন করে বললো, আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে। রাগের মাথায় এমন

কটা অমূল্য জিনিস এই নামমাত্র দামে বেচে দিলেন ? বুঝতে পারছি, আপনি একেবারে অজ্ঞ। জহুরীর ব্যবসাই ফে'দেছেন। কিন্তু আসল জহরত চিনতে পারেন না।

— মানে ?

—মানে আর কিছুই নাই। হাতের মুঠোয় সাতরাজার ধন এসেছিল। কিন্তু চিনতে পারলেন না ? ছাইএর দামে বেচে দিলেন ?

—ছাই-এর দামে ?

—হ্যাঁ, ছাই-এর দামে। এর দাম মাত্র ত্রিশ হাজার নয়। ত্রিশ লক্ষেও এ বস্তু সংগ্রহ করা যায় না।

সেই মুহূর্তে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। কী ভাবে আমি প্রতারিত হয়েছি ভাবতে গিয়ে অজ্ঞান অচৈন্য হয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলাম আমার সারা মুখের রক্ত দেহে নেমে গিয়ে পাণ্ডুর বর্ণ হয়ে গেছে। সেই থেকে আমার এই অবস্থা। অনেক চিকিৎসাপত্র করেও মুখের স্বভাবিক অবস্থা আর ফিরিয়ে আনতে পারিনি।

যাইহোক, অনেক্ষণ পর ধাতস্থ হয়ে লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বলুন তো, বস্তুটা কী। কী কাজেই বা লাগে ? কেনই বা এর এত দাম ?

সে বললো, ভারত-সম্রাটের এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। সারা দুনিয়ায় তার রূপের খ্যাতি। লোকে বলে, তার সমতুল্য রূপবতী নাকি আর দুটি নাই। কিন্তু সেই কন্যা এক দুরারোগ্য মাথার যন্ত্রণায় ভুগছে। নানা দেশের অনেক হেকিম বদ্যি তার চিকিৎসা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু সুফল হয়নি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চব্বিশতম রজনী :

আবার কাহিনী শুরু হয় :

ভারত-সম্রাটের আমি এক পারিষদ। একদিন তাঁকে বললাম, আপনার কন্যার এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারেন এমন ধন্বন্তরী মহাপুরুষের আমি সন্ধান পেরেছি, সম্রাট।

—কে সে ?

ব্যাবিলনে বাস করেন এক সিদ্ধপুরুষ। তার নাম সাদ আলী। তিনি নাকি কঠিন অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন। তবে সে অনেক খরচের ব্যাপার।

আমার কথা শুনে সম্রাট হাসলেন। কন্যা আমার প্রাণ-প্রতিমা। তার নিরাময়ের বিনিময়ে সাম্রাজ্যও দিয়ে দিতে পারি। যাও তুমি তাঁর কাছে। যত অর্থ প্রয়োজন নিয়ে যাও। কন্যা সুস্থ হয়ে উঠবে, তার চেয়ে বড় কিছু নাই আমার কাছে।

আমি ব্যাবিলনে গিয়ে পীর সাদ আলীর সঙ্গে দেখা করলাম। সম্রাট-

নন্দিনীর অসুখের বীস্তারিত বিবরণ শোনালাম তাকে। তিনি বললেন, সাত মাস ধরে আমি বিচার বিবেচনা করবো। তারপর দেব বিধান।

সাতমাস ধরে তিনি গুনে পড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, সমুদ্রের এক দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ এই রোগের একমাত্র রক্ষাকবচ। একটা ছোট লাল টুকটুকে বস্তু আমাকে দেখালেন। তার দুটি চোখ। ফড়িংএর মতো দুখানা ঠ্যাং। অনেকটা সমুদ্রের ফেনার মতো অদ্ভুত বস্তু। তিনি বললেন, সারা দুনিয়ায় কয়েকটিমাত্র আছে। পয়সা কড়ি দিয়ে এর দাম মেটানো যায় না। যাইহোক, তুমি আমাকে এক কোটি দিনার দিও।

দাম শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। যাইহোক, সম্রাটের হুকুম যত টাকা লাগে দেব, যদি মেয়ের রোগ সারে।

সাদ আলী সেই শাঁখটাকে আমার হাতে দিয়ে বললেন, মেয়ের গলায় হারের মতো ঝুলিয়ে রাখবে। দেখবে আর কোনও রোগ নাই। কিন্তু সাবধান গলা থেকে খুলবে না। তা হলে আবার আক্রমণ করবে।

কী আশ্চর্য, একটা কবচ করে হারের মতো পরার দিন থেকে সম্রাট-কন্যার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। যে মেয়েকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হতো, সেই মেয়ে আবার হাসি গানে মুখর হয়ে উঠলো। সম্রাট নিশ্চিন্ত হলেন। প্রজারাও খুশি হলো।

কিন্তু সে-সুখ আর বেশিদিন সইলো না সম্রাটের। রাজকন্যা একদিন সখী-সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে কলহাস্যে মুখর হয়ে নৌকা-বিহারে বেরুলেন। সে-ই তার কাল হলো। আনন্দের হুটোপুটিতে কখন যে গলা থেকে রক্ষাকবচের হারটা নদীর জলে পড়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। কিন্তু একটু পরেই মাথাটা যখন টনটন করে উঠলো তখন গলার দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলেন তিনি। সেই থেকে রাজকন্যা আবার নিদারুণ মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। সম্রাট আমাকে ব্যাবিলনে পাঠালেন, আর একটা রক্ষাকবচ কেনার জন্য। কিন্তু ব্যাবিলনে এসে শুনলাম, সাদ আলী দেহ রেখেছেন। চোখে অন্ধকার দেখলাম। সম্রাট বললেন, দিকে দিকে লোক পাঠাও। পৃথিবীর যে প্রান্তে পাওয়া যায় সংগ্রহ করে নিয়ে এস সেই রক্তবর্ণ রক্ষাকবচ। যত অর্থ প্রয়োজন হয়, দেব আমি।

আমরা দশজন অমাত্য পৃথিবীর দশ দিকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিলাম। আজ আপনার দোকানে এসে, একমাত্র তাঁর ইচ্ছায়ই, সেই হারা-নিধি অমূল্য-বস্তুর সন্ধান পেলাম। তার পরের ঘটনা তো আপনার জানা।

আমাকে আফশোশের হুতাশনে দগ্ধ করে রেখে সে বিদায় নিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে আর মন বসলো না। দোকানপাট বেচে দিয়ে আমি আবার গেলাম আমার প্রিয়ার সন্ধানে।

টাইগ্রিসের উপকূলের সেই প্রাসাদোপম ইমারত। কিন্তু একি তার জরাজীর্ণ দশা। চুনবালি খসে খসে পড়ছে। জানলার শার্সির কাঁচ ভাঙ্গা। কার্নিশে আগাছার আড্ডা জমিয়েছে। কতকাল ঝাড়ু পড়েনি। ধুলোবালিতে

আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সারা বাড়িটা।

দরজায় একটি চাকরকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম। কী ব্যাপার এমন দশা হল কী করে ?

ছেলেটি বললো, সেই রমরমা আর নাই। সব শেষ হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, সেই বৃদ্ধ ? তার মেয়েরা ?

—উমানের এক সওদাগর-পুত্র—আবু অল হাসান তার নাম। তার সঙ্গে আমাদের মালিকের মেয়ের পেয়ার হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির মালিক মেয়ের বাবা জানতে পেরে তাকে তাড়িয়ে দেন। এত অধর্ম সইবে কেন, হাসান সাহেব তার সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা এনেছিলেন। আমাদের মালিক সেগুলো হাতিয়ে নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। সেই থেকে বৃদ্ধের বরাত খারাপ হয়ে গেল। সে সময় সারা বাড়িটায় কত মেয়ে ছিল। কত খদ্দের আসতো। সারা বাড়িটা গমগম করতো দিনরাত। কিন্তু হাসান সাহেব যাওয়ার পর মালিক-কন্যা শয্যা নিলেন। কাজ কাম একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সারা দিন-রাত ঘরের দরজা বন্ধ করে শুধু কাঁদেন—আর কাঁদেন। না আছে খাওয়া, না আছে নাওয়া। দিনকে দিন অমন ননীর শরীর শুকিয়ে যেতে লাগলো। বৃদ্ধ বাবা মেয়েকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, 'মা, মনে কোনও দুঃখ রেখ না। এখানে কোনও মানুষই চিরদিন থাকবে বলে আসে না। ওরা আসে মরশুমী ফুলের মধু আহরণ করতে। ভালবাসতে আসে না কেউ।' কিন্তু বৃদ্ধের এই সান্ত্বনায় কোনও কাজ হলো না। দরজা তিনি খুললেন না।

তিনিই ছিলেন সারা বাড়ির শতেক মেয়ের সেরা—মধ্যমণি। তার মতো সুন্দরী তামাম বাগদাদে ছিল না কেউ। আজও নাই। কত বড় বড় আমির সওদাগর আসতো। কিন্তু তারা যখন শুনলো মালিকের মেয়ে আর কোনও খদ্দের ঘরে ঢোকাবে না তখন ভিড় কমতে থাকলো। সারা বাগদাদে এই বাড়িটা সেরা ফুর্তির জায়গা বলে দেশ-বিদেশের লোকে জানতো। দুনিয়ার নানা দেশ থেকে কত ধনী সওদাগর আসতো এখানে। কিন্তু নাম একবার খারাপ হয়ে গেলে ব্যবসা রাখা দায় হয়।

মেয়ের অবস্থা দেখে মালিক তাহির সাহেব চিন্তিত হলেন। দেশ বিদেশে লোক পাঠালেন হাসান সাহেবের সন্ধানে। কিন্তু কি করে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে ? দীন দরিদ্র অবস্থায় তিনি হয়তো অখ্যাত অজ্ঞাত কোন জায়গায় পড়ে আছেন।

শেষে, বৃদ্ধ তাহির সাহেব ব্যবসা-পাতি গুটিয়ে নিলেন। বাড়ি ভতি মেয়ে ছিল। সবাইকে তিনি ছেড়ে দিলেন। সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করতে লাগলো। একদিন মাইফেল মজলিশে সরগরম থাকতো যে বাড়ি, আজ সেটা পড়ো ভুতুড়ে হয়ে পড়ে আছে। একটা মানুষ আসে না আজ।

আমি জিজ্ঞেস করি, মালিক তাহির সাহেব গেলেন কোথায় ?

—তিনি আর এ বাড়িতে থাকেন না। দেহ জরাজীর্ণ হয়েছে। মেয়ের দুঃখে তিনি নেতিয়ে পড়েছেন। এখন শহরের ভিতরে তাঁর এক আত্মীয়ের

কাছে আছেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁচিশতম রজনী :

আবার সে গল্প শুরু করে :

আমি বললাম, যাও তোমার মালিককে খবর দাও। বল, হাসান সাহেব ফিরে এসেছেন! তিনি তাঁর বাড়িতে অপেক্ষা করছেন।

আমার কথা শুনে ছেলেটি একবার আমার আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, আপনি সাহেব? দাঁড়ান, আমি আসছি।

প্রায় ছুটতে ছুটতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল শেখ তাহিরকে সঙ্গে নিয়ে।

বৃদ্ধের দেহের সেই জৌলুস আর নাই। চোখের কোলে কালি পড়েছে। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। মনে হলো, এই দু বছরে বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে তাঁর।

আমাকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকলেন তিনি।

—কোথায় ছিলে বাবা? তোমার জন্যে মেয়েটা আমার কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেছে। তোমার টাকা পয়সা—যা আমার কাছে গচ্ছিত আছে সব ফেরত নিয়ে আমাকে ঋণ মুক্ত কর।

এই বলে একটা মোহর ভর্তি বস্তা এনে আমার সামনে রাখলেন তিনি।

—এতে এক লক্ষ দিনার আছে। এ সবই তোমার টাকা। নিয়ে আমাকে ভার মুক্ত কর। আজ দুটো বছর মেয়েটা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তুমি ওকে বাঁচাও বাবা, এই আমার একমাত্র ভিক্ষে তোমার কাছে।

আপনারা বিশ্বাস করুন জনাব, আমাকে দেখা মাত্র আমার প্রেয়সী আনন্দে মূর্ছা গেল। দু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। সে অশ্রু আনন্দের।

সেই রাতেই তাহির সাহেব কাজী এবং সাক্ষী সাবুদ ডেকে এনে আমাদের শাদী দিয়ে দিলেন। সেই থেকে তাহির সাহেবের প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা আমার আদরের বিবি হলো। আমার এত দিনের বাসনা পূর্ণ হলো। আজ একটু আগে যার গান শুনে তারিফ করলেন সেই আমার বিবি। তাকে নিয়ে পরমানন্দে ঘর করছি আমি। আজ আমার মনে আর কোনও খেদ নাই। ওর ভালোবাসায় ভরে আছি কানায় কানায়। দশটা বছর কেটে গেছে। আমরা ভালোবাসার ফলে পেয়েছি একটি পুত্র সন্তান। চাঁদের মতো ফুটফুটে, ওর মায়ের মতোই খুবসুরত। একটু অপেক্ষা করুন, তাকে আপনাদের সামনে হাজির করছি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছাব্বিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

এই বলে সেই পাণ্ডুবর্ণ যুবক অন্দরে চলে গেল। একটু পরে বছর দশেকের একটি সুন্দর ছেলেকে সঙ্গে করে এনে বললো, এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র সন্তান। মেহমানদের আদাব জানাও বেটা।

খলিফা দেখলেন ছেলেটি সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। যেমন চেহারা তেমনি আদব-কায়দা। মন ভরে গেল।

এরপর ওঁরা বিদায় নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরদিন সকালে খলিফা বললেন, জাফর, একবার আবু অল হাসানকে হাজির কর। এবং সারা বছর ধরে বাগদাদ বসরাহ এবং খুরাসন থেকে যত ভেট নজরানা পেয়েছি সেগুলো সব নিয়ে এসে এই দরবার-কক্ষে আমার সামনে নিয়ে এসে রাখ।

জাফরের ইশারায় মাসরুর সেইসব উপহার উপঢৌকন সামগ্রী এনে দরবার-কক্ষের মাঝখানে স্তূপাকার করে রাখলো। হীরে চুনী পান্না প্রবাল ও মুক্তোর সে কি এলাহী ব্যাপার! চোখ ঝলসে যায় আর কী! একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হলো জহরতগুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাসরুর সঙ্গে করে নিয়ে এল সেই পাণ্ডুবর্ণ যুবক আবু অল হাসানকে। যথাবিহিত কুর্নিশ কেতা জানিয়ে অল হাসান অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা স্মিত হেসে প্রশ্ন করলেন। গতকাল রাতে তোমার হাবেলীতে যে ক'জন মুসাফির সওদাগর মেহমান হয়েছিল, জান তারা কে?

—না জাঁহাপনা। তাঁরা আমার মহামান্য অতিথি। তাঁদের সৎকার করাই আমার ধর্ম। কুলশীল জানার তো কোনও অধিকার নাই আমার।

—চমৎকার!

ইশারা করতে মাসরুর চাদরের ঢাকাটা খুলে দিল। খলিফা বললেন, চেয়ে দেখ তো যুবক, এখানে যে সব ধনরত্ন পালা দেওয়া আছে তার মোটমূল্য তোমার সেই দৈবরত্নের সমান হবে কিনা? কোন রত্নের কথা বলছি বুঝতে পারছো? যেটা তুমি না বুঝে মাত্র ত্রিশ হাজার দিনারে বেচে দিয়েছিলে?

আবু অল হাসান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে খলিফার দিকে তাকিয়ে—

—আ-প-নি??

—হ্যাঁ, আমিই। কাল রাতে আমি—আব্বাস বংশের পঞ্চম ধারক খলিফা হারুন অল-রসিদ, আমার উজির জাফর এবং অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তোমার আতিথ্য নিয়েছিলাম। তোমার সেবায় বড় প্রীত হয়েছি। তোমার মহব্বতের বিরহ বেদনা মধুর কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এবং দুঃখ অনুভব করেছি ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য। যে অমূল্য রত্ন তোমার হাতে এসেছিল, তোমার অজ্ঞতার দোষে, তার উচিত মূল্য তুমি লাভ করতে পারনি। এতে আমিও বিশেষ দুঃখ বোধ করেছি। এই যে ধন রত্ন দেখছো এখানে, এ সবই তোমার জন্য। একটা ভুলের জন্য, অজ্ঞতার জন্য যে ক্ষতি তোমার হয়েছে,

আমি তা পূরণ করতে চাই। দেখ তো এগুলোর দাম তোমার সেই দৈবরত্নের দামের সমান হবে কিনা!

অল হাসান বলে, অনেক বেশিই হবে, জাঁহাপনা।

—তা হোক। এসব তোমার। আমি দিলাম, নিয়ে যাও।

আবু অল হাসান ভাবতে পারে না, কী কথা সে শুনলো। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেউ কাউকে দান করতে পারে। হোন না তিনি সুলতান বাদশাহ! দৌলতের মায়া কার নাই। সারা শরীরের মধ্যে কী এক অভূতপূর্ব শিহরণ খেলে যেতে থাকে। অল হাসান মাথা চেপে সেই দরবার-কক্ষেই বসে পড়ে। তারপর আর কোনও চৈতন্য থাকে না।

অনেকক্ষণ পর যখন সম্বিত ফিরে এল তখন খলিফা জাফর এবং আমির অমাত্যরা অবাক হয়ে দেখলেন; যুবকের মুখের পাণ্ডুবর্ণ আর নাই। গালের রক্তের গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। কল্পনাতীত প্রাপ্তির আনন্দে তার দেহের তন্ত্রীতে আবার বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে। এবং তারই ফলে মুখের ধমনীতে আবার রক্ত-প্রবাহ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মাসরুর একখানা আর্শী এনে ধরলো হাসানের সামনে। অনেক দিন পরে নিজের চেহারার পূর্ব রূপ ফিরে পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে তার মন। এ-সবই আল্লাহর বরপুত্র খলিফার অপার মহিমা।

খলিফা চিৎকার করে ওঠেন, সবই সেই দয়াময়ের দোয়ায় হলো হাসান। আমার কোনও কেরামতি নাই। যাক, এবার এগুলো সঙ্গে নিয়ে ঘরে যাও। সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাও গে।

—জাঁহাপনা, এই হচ্ছে সেই পীত যুবক হাসানের কাহিনী। এর পরে শোনাবো আপনাকে আনারকলি এবং বদর বাসিমের কিস্সা।

এবং শাহরাজাদ বলতে শুরু করে:

অনেক অনেক দিন আগে আজম মুলুকের খুরাসন শহরে শাহরিমান নামে এক বাদশাহ বাস করতেন। তাঁর হারেমে শতাধিক সুন্দরী বাঁদী রক্ষিতা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের কারুরই গর্ভে কোনও সন্তানাদি হয়নি।

বিশাল সলতানিয়ত, কে তার উত্তরাধিকারী হবে, তাঁর অবর্তমানে কে বসবে মসনদে, এই নিয়ে তিনি সদাই চিন্তিত এবং বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকতেন। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নানা শাস্ত্রের গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্ব আলোচনায় দিন কাটাতেন।

এমনি এক দিনে, যখন তিনি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ধর্ম আলোচনায়

ব্যাপৃত, সেই সময় দ্বার রক্ষী এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা, বিদেশী এক সওদাগর এসেছেন সঙ্গে এক পরমাসুন্দরী বাঁদী নিয়ে। আপনার দর্শন-প্রার্থী তিনি।

সুলতান বললেন, নিয়ে এস তাকে।

সওদাগরের সঙ্গে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো। তার রূপের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো দরবার মহল। পাতলা ফিনফিনে বোরখার আড়ালে তার দেহের প্রতিটি ভাঁজ প্রতিটি খাঁজ স্বচ্ছ পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। অমন অনিন্দ্য রূপ-যৌবন কোনও নারীর হতে পারে ভাবা যায় না। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিটোল নিখুঁত সুন্দর। সুলতান বললেন, কত নেবে বণিক ?

সওদাগর বিনয়ের অবতার বললো, জাঁহাপনা আমি একে প্রথম পালকের কাছ থেকেই কিনেছি। এখনও অপাপবিদ্ধ—কুমারী। তিনি দাম নিয়ে-ছিলেন তিন হাজার দিনার। এরপর নানা দেশের নানা হাটে বাজারে ঘুরেছি। তাতেও আমার হাজার তিনেক খরচ হয়েছে। এখন শাহেনশাহর সামনে হাজির করেছি। যদি জাঁহাপনার মনে ধরে তবেই আমি ধন্য হবো। ইনাম কিছু আশা করি না।

সওদাগরের ব্যবহারে প্রীত হলেন সুলতান। উজিরকে বললেন, ওকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং এক প্রস্থ মূল্যবান সাজপোশাক বকশিশ দিয়ে দাও।

সওদাগর দশ হাজার দিনার ও শৌখিন সাজ বগলদাবা করে সুলতানের শতায়ু কামনা করতে করতে বিদায় হলো।

সুলতান খোজা সর্দারকে বললেন, যা একে হারেমে নিয়ে যা। দাসী বাঁদীদের বল, হামামে নিয়ে গিয়ে খুব ভালো করে ঘষে মেজে যেন গোসল করায়। অনেক দূর দেশ থেকে এসেছে। পথের ক্লান্তি জমে উঠেছে অঙ্গে। সব যেন সাফা করে দেয় তারা।

খোজা সর্দার মেয়েটিকে অন্দরমহলে নিয়ে চলে যায়। সারাদিন ধরে দরবারের কাজকর্ম সমাধা করে সুলতান নিজের কক্ষে আসেন। মেয়েটিকে গোসলাদি করিয়ে মূল্যবান নতুন সাজ-পোশাকে সাজিয়ে দাসী বাঁদীরা সুলতানের ঘরে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল।

ঘরে ঢুকে তিনি মেয়েটিকে কাছে ডাকেন, কই, এ দিকে এসোতো সুন্দরী। নাকাব খোল তো একবার, দেখে জীবন সার্থক করি।

কিন্তু কী আশ্চর্য, বাঁর এক ইশারাতে সারা সলতানিয়ত থরথর কম্পমান, সেই অমিত বিক্রম এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতিকে সামনে দেখে সে একবার উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম কুর্নিশ জানালো না।

সুলতান শাহরিমান-এর মুখ কালো হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, বেয়াদপ! যারা মানুষ করেছে, দেখছি আদবকেতা কিছুই শেখায়নি!

—তোমার নাম কী ?

কিন্তু কোনও উত্তর দিল না মেয়েটি। তবে কী বোবা বধির ? সুলতান এবার ওর সামনে সরে আসেন। নিজের হাতে নাকাব সরিয়ে দেন। সে

চোখের দৃষ্টিতে কোন চাঞ্চল্য নাই। স্থির, ঠাণ্ডা। ভাবলেশ হীন। নিথর ও নিস্পন্দ।

—কে তুমি ?

কোনও জবাব নাই! শান্ত নির্বিকার নির্বাক হয়ে বসে থাকে সে। সুলতান দুহাতে টেনে নেয় ওকে। বুকের মধ্যে পেষণ করে জাগ্রত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সাপের মতো ঠাণ্ডা শরীর। কোনও উত্তাপ-উত্তেজনা নাই।

এবার তিনি ক্ষুব্ধ বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু মেয়েটির অপার রূপ-লাবণ্য তাঁকে আবার প্রসন্ন করে তোলে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতাশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সে দিনের মতো তিনি আর মেয়েটিকে কোনও প্রশ্ন করেন না।

পরদিন উৎসবের আয়োজন করা হয়। খানাপিনা গান-বাজনায় মেতে ওঠে প্রাসাদের মানুষজন। কিন্তু মেয়েটির কোনও বিকার নাই।

উৎসবের শেষে সবাই বিদায় নিলে সুলতান নিজের কক্ষে ফিরে আসেন। মেয়েটিকেও নিয়ে আসা হয় তার ঘরে।

সুলতান ওকে দুহাতে তুলে শুইয়ে দেন পালঙ্ক শয্যায়। এক এক করে দেহের আবরণ খুলে ফেলতে থাকেন তিনি। পরপর সাতটা পোশাক খোলার পর একটি মাত্র পাতলা রেশমী শেমিজ অবশিষ্ট থাকে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ান তিনি। তারপর সেটিও খুলে নেন। এমন নিভাঁজ নিখুঁত দেহবল্লরী তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে কামনার আগুন।

কিন্তু মেয়েটি অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। ওর দেহে কোনও চাঞ্চল্য জাগে না। সে রাতে সুলতান আকণ্ঠ পান করেন ওর দেহ সুধা। মনের সব ক্ষোভ রাগ উবে যায়। আনন্দে নেচে ওঠে হৃদয় মন।

এইভাবে রাতের পর রাত ওকে শয্যাসঙ্গিনী করে মেতে থাকেন তিনি। হারেমের অন্য সব মেয়েদের কথা একেবারে ভুলে থাকেন।

একটা বছর কেটে যায়। মেয়েটিকে দিয়ে সুলতানের কাম-বাসনা চরিতার্থ হয় কিন্তু একটা কথাও তিনি আদায় করতে পারেন না তার কাছ থেকে। সুলতান বুঝতে পারেন না, কেন সে কথা বলে না। রাতের পর রাত কত আদর সোহাগ করে কতভাবে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

—তুমি আমার দেহের ক্ষুধা তৃপ্ত করেছে, তোমাকে পেয়ে আমার সব দৈন্য ভুলে গেছি, শোনও চোখের মণি, একবার কথা বল। আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি কী বুঝতে পার না? বিশ্বাস কর না আমাকে? তোমার জন্য আমার সব বেগম বাঁদীদের বরবাদ করে দিয়েছি? তোমাকে পেয়ে আমি দরবারের কাজেও তেমন মন দিই না—প্রজাদের ওপর

অবিচার করি। সে কী তুমি জান না? তোমার জন্য আমি আমার সব কিছু ঐশ্বর্য বিসর্জন দিতে পারি—একথা কি বিশ্বাস কর? কথা বল সোনা, একটিবার কথা বল। আর যদি তুমি নাই বলতে পার কথা—যদি বোবাই হও তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হবো না। তুমি ইশারাতেও বোঝাও তোমার মনের ভাষা। তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালো লাগা না লাগা বুঝতে দাও আমাকে। আল্লা তোমাকে অলোক-সামান্য রূপযৌবন দিয়েছেন। আর মুখে ভাষা দেননি সে কি বিশ্বাস করা যায়? তিনি কী এতই নির্মম হতে পারেন?

সুলতানের এত অনুরোধ উপরোধেও সে নির্বাক হয়ে বসে থাকে। সুলতান বলেন, ঠিক আছে, কথা না হয় নাই বললে, তুমি আমাকে এক পুত্র উপহার দাও। আমার বয়স বাড়িয়ে বিকেল হতে চললো। এত বড় সলতানিয়ত। এই বিপুল বৈভব—মসনদ, কে সব ভোগ করবে। তুমি আমাকে দয়া কর, একটি পুত্র সন্তান দাও। আর ক'দিন বাঁচবো জানি না। কিন্তু যদি এই সান্ত্বনা নিয়েও মরতে পারি, তোমার গর্ভে আমার সন্তান আছে, সে সুলতান হয়ে আমার মসনদে বসবে। আমার বংশ রক্ষা করবে, আমার বেহেস্ত লাভ হবে।

হঠাৎ মেয়েটি মাথা তুলে তাকাল। এতদিন পরে ওর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটেছে। বললোঃ

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ঊনত্রিশতম রজনীতে

আবার সে শুরু করেঃ

—মহানুভব সুলতান, আপনার আর্জি আল্লা পূরণ করেছেন। আমার গর্ভে আপনার সন্তান এসেছে। জানি না সে ছেলে কি মেয়ে—তিনিই একমাত্র বলতে পারেন। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, যতদিন না আমি আপনার সন্তান ধারণ করি আপনার সংগে বাক্যালাপ করবো না।

এতদিন পরে ওর মুখে কথা ফুটেছে দেখে সুলতানের আনন্দ আর ধরে না। সে যে কী আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হৃদয়াবেগে তিনি কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না। ওর কুসুমদল কোমল দেহলতাখানি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিতে থাকেন।

—এতদিনে আল্লাহ মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার মুখের ভাষা শুনতে পেয়েছি। আজ আমার কী আনন্দের দিন, তোমার গর্ভে আমার সন্তান। আমার ভবিষ্যৎ বংশধর, মসনদের উত্তরাধিকারী!

দরবারে গিয়ে সবাইকে জানালেন তিনি। এতদিন পরে ঘর আলো করতে আসছে তার সন্তান। উজির আনন্দ কর, আনন্দ কর। যে যা চায় দাও। আমার আর কোনও দুঃখ নাই, আর কোন বাসনা নাই।

সুলতানের নির্দেশে অকাতরে দানধ্যান করা হতে লাগলো। দীন-দরিদ্ররা আহার্য বস্ত্র বকশিশ নিয়ে দোয়া মাঙতে মাঙতে চলে গেল। সারা প্রাসাদ শহর সলতানিয়ত সুলতানের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলো। প্রজারা আশ্বস্ত হলো—

তাদের ভাবি সুলতান তবে আসছে।

দরবারের কাজ সেরে সুলতান আবার ফিরে আসে নিজের কক্ষে। প্রাণাধিকাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে।

—আচ্ছা নয়নতারা, বল দেখি, কেন এতদিন আমাকে এত কষ্ট দিয়েছ? কেন কথা বলনি?

সে বলে, জাঁহাপনা, আমি যখন এখানে আসি তখন আমার কী পরিচয়? আর অধিকারই বা কতটুকু। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে প্রাসাদে ঠাঁই দিলেন, তাতেই বা কী গেল এল? আমি তো জানতাম আপনার কাছে আমার কানাকড়িও, দাম থাকবে না, যদি না আমি আপনাকে সন্তান উপহার দিতে পারি! শঙ্কা ছিল, আপনার শতাধিক বেগম-বাঁদী যা পারেনি—আমিই বা তা পারবো, কী ভরসা! তাই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম! আমি জানতাম, যদি ব্যর্থকাম হই, যদি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করতে না পারি, তবে হারেমের অন্য বাঁদী বেগমদের যা বরাতে জুটেছে আমার ভাগ্যেও তাই মিলবে। এঁটো কলাপাতার মতো পরিত্যাগ করে প্রাসাদের এক কোণে ফেলে রেখে দেবেন। হয়তো বৎসরান্তেও একবার খোঁজ নেবার ফুরসত হবে না আপনার। সেই দুঃখ সইবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম আমি। দুদিনের আদর ভালোবাসা সোহাগ খেয়ে লালসা বেড়ে গেলে পরে আরও বেশি কষ্ট পাবো এই আশঙ্কাতেই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম।

সুলতান অবাক হয়ে বললেন, শুধু এইমাত্র কারণ? কিন্তু না, আমার মনে হয় তোমার মনে অন্য কোনও ব্যথা-বেদনা আছে। আসল কারণ সেইটেই।

সে বলে, আমি আজ চার বৎসর মা ভাই আত্মীয় পরিজনদের ছেড়ে চলে এসেছি। তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে না। আমার জন্মভূমি থেকে সাত সমুদ্র পার হয়ে আজ আমি কত দূরে চলে এসেছি। জানি না, আমার মা ভাইরা কে কেমন আছে।

সুলতান বলেন, এইজন্যে তোমার মন খারাপ করে? এইজন্যে এতদিন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলনি? তা সে তোমার মা ভাই যত দূরেই থাক, আমি কি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাতে পারি না কয়েকদিনের জন্য?

সে বলে, আমার নাম গুলনার। আমাদের মাতৃভাষায় একথার অর্থ—বেদানার ফুল—আনারকলি। আমার জন্ম সাগরে। আমার বাবা ছিলেন সমুদ্রের শাহ। মা-এর নাম লোকাস্ত। এবং এক ভাই আছে, তার নাম সালির। ছোট বেলা থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, সমুদ্রে আমি থাকবো না। জলের ওপরে মাটির দেশে যাবো—এই আমার একমাত্র স্বপ্ন। সেখানকার প্রথম চেনা পুরুষ হবে আমার ভালোবাসার সঙ্গী। সে আমাকে রক্ষা করবে, ভরণ-পোষণ করবে। তার বদলে আমি তাকে উজাড় করে দেব আমার দেহ-মন-প্রাণ ভালোবাসা—যাকে তোমাদের ভাষায় বলে মহব্বত।

একদিন রাতে মা ভাই যখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময় আমি চুপিসারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। উত্তাল জলরাশি ঠেলে শোঁ শোঁ করে উঠে আসলাম

ওপরে। সাঁতার কেটে এসে পৌঁছলাম সমুদ্র উপকূলে। তখন গভীর রাত। মাথার ওপরে পূর্ণিমার চাঁদ। আলোর অমৃত ঝরে পড়ছিল। দক্ষিণা বাতাসে ঘুম এসে গেল চোখে।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক হৃত-কুৎসিত লোক। প্রায় দৈত্যের মতো। লোমশ হাতের থাবা বাড়িয়ে আমাকে তুলে নিল সে কাঁধের ওপর। আমি অনেক হাত পা ছুঁড়লাম। দাপাদাপি করলাম। কিন্তু ওর কবল ছাড়া পেলাম না।

এক জঙ্গলের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে নামালো সে। জোর করে শুইয়ে দিল চিৎ করে। তারপর পাশবিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য জোর জবরদস্তি করতে থাকলো। কিন্তু আমি প্রাণপণে ওর মুখে এমন একটা ঘুষি মারলাম, লোকটা আর্তনাদ করে ছিটকে পড়লো দূরে। সেই ফাঁকে আমি উঠে দে দৌড়। সে আমার পিছু ধাওয়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি।

দৌড়ে আর কোথায় পালাবো, এক সওদাগরের খপ্পরে গিয়ে পড়লাম। সে আমাকে বাঁদী হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে দিল এই সওদাগরের কাছে। এবং তার কাছ থেকেই আপনি আমাকে কিনেছেন। লোকটা খুব সৎ এবং নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিল। তা না হলে, আমার মতো একটি কচি ডাগর মেয়েকে নিয়ে সে পুরো তিনটি বছর এদেশে সেদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে—একদিনের তরে গায়ে হাত ঠেকায়নি!

এই আমার জীবনের কাহিনী।

এখানে আসার পর প্রথম প্রথম আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। সদাই মনে হতো, এই জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি সমুদ্রের জলে। ডুব দিয়ে চলে যাই আমার দেশে মা ভাই-এর কাছে, কিন্তু পারিনি। পরে যখন বুঝতে পারলাম আপনি মানুষটা নেহাত খারাপ নন তখন আর সে ঝোঁক ছিল না। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, গোড়াতেই বেশি ঢলাঢলি করবো না। কারণ সুলতান বাদশাহদের খামখেয়ালীর অনেক কাহিনী আমার শোনা ছিল। আজ তারা যাকে মাথার মণি করে রাখে কাল তাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়! সেই কারণে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইনি। জানতাম, আমার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন না হলে আপনার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরাতে দেরি হবে না। এতদিনে যখন বুঝতে পারলাম, আমি সন্তান-সম্ভবা তখন মনে ভরসা পেলাম—তা হলে আপনি আর আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। এখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, আপনার হারেমের ঐ শতাধিক বেগম বাঁদীদের কাউকে আপনি আর ভালোবাসবেন না। কিন্তু আমি বুঝি আর আমার মা ভাইকে দেখতে পাবো না। আমার শোকে কেঁদে কেঁদে তারা সারা হয়ে যাচ্ছে। এমন দেশ, সেখানে লোকজন পাঠিয়েও কোনও খবর দেবার উপায় নাই। আর তা ছাড়া আমি যদি নিজেও যাই, তারা আমার কথা আদৌ বিশ্বাস করবে না। আমি যে এখন আর সামান্যা কেউ নই—পারস্য এবং খুরাসনের শাহেন শাহর একমাত্র পেয়ারের বাঁদী, সে কথা তারা আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দেবে।

এই সময়ে রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ত্রিশতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

আনারকলির কাহিনী শুনে সুলতান শাহরিমান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

—কী অদ্ভুত সুন্দর কাহিনী শোনালে, আমায়! কিন্তু যে কারণেই হোক তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও কখনও, আমি আর এক মুহূর্তও বাঁচবো না —নির্ঘাৎ মরে যাবো। তুমি বললে, তোমার জন্ম সমুদ্রের নিচে। তোমার বাবা ছিল সমুদ্রের সুলতান। তোমার মা লোকস্ত আর তোমার ভাই সালিহ। ওরা এখনও সমুদ্রের তলাতেই বসবাস করে। সবই বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে আমার কাছে। সত্যিই কোন মানুষ সমুদ্রের নিচে থাকতে পারে কিনা, আছে কিনা আমার কোনও ধারণা নাই। শুধু বুড়ো-বুড়িদের কাছে ছোটবেলায় কিছু গল্প কাহিনী শুনেছিলাম। কিন্তু সে তো সবই বানানো কিস্‌সা। সত্যিই যে কিছু তেমন সব নরনারী পানির নিচে থাকতে পারে বিশ্বাস করিনি। আজ তোমার মুখে শুনে আর অবিশ্বাস করতে পারছি না, আমি। উপরন্তু তোমাদের জাত ধর্ম আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার কৌতূহল হচ্ছে। আচ্ছা, একজন মানুষ ঐ পানির নিচে চলা-ফেরা করতে পারে কী করে? দম আটকে মরে যায় না? বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো!

আনারকলি বলে, আমি যা জানি, সব আপনাকে বলবো, জাঁহাপনা। সুলেমান ইবন দাউদের অশেষ করুণায় আমরা সমুদ্রের নিচে সুখে সচ্ছন্দে বসবাস করি। আপনারা যেমন এই মাটির পৃথিবীতে বাস করেন তেমনিভাবে। জলই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বস্তু। আপনারা যেমন নাক দিয়ে হাওয়া টানেন ছাড়েন, আমরা তেমনি জল টানি আর ছাড়ি। জলই আমাদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। জলে আমাদের দেহ নরম এবং সতেজ থাকে। আমাদের দেহের আচ্ছাদন জলে কখনও ভেজে না। এই যে আমার চোখের মণি দেখছেন, জলের তলায় সে জ্বলে। অনেক দূর দিগন্তে চলে যেতে পারে এই চোখের দৃষ্টি। সমুদ্রের গভীর তলদেশে থেকেও আমরা স্বচ্ছ পরিষ্কার দেখতে পাই চাঁদনি তারার রোশনাই। পৃথিবীর সব মুলুক এক সঙ্গে জুড়লে আমাদের জল মুলুকের চার ভাগের এক ভাগ হবে। কী বিরাট বিশাল, তা কল্পনা করা যায় না। আমাদের সমুদ্র সাতটি মুলুকে বিভক্ত। তার এক একটা প্রায় আধখানা পৃথিবী। লক্ষলক্ষ কোটি কোটি মানুষ, জন্তু জানোয়ার এবং মাছের বাস এই সব সমুদ্রে। এর নিচে বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান ধনরত্ন সঞ্চিত আছে। আমরা যে শহরে বাস করি সেখানকার ঘর বাড়ি দেখলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন। স্ফটিকের তৈরি নানারকম কারুকার্য করা সব বাড়িঘর। ডাণ্ডুর মতো বড় বড় মুক্তো, প্রবাল, চুনী, পান্না পদ্মরাগমণি, সোনা-চাঁদীর পাহাড়

চারপাশে। কেউ হাত দিয়ে ছোঁয় না। ওসবে কার কী প্রয়োজন ? কিন্তু, কিন্তু এখানে—তোমাদের এই মাটির দেশে সেই সব এক একটা জিনিসের কী দাম ?

আমরা ইচ্ছামত সাঁতার কেটে যেখানে খুশি, যত দূরে খুশি চলে যেতে পারি। তাই গাধা ঘোড়া বা পাল্কী রথের কোনও প্রয়োজন হয় না। তোমাদের এখানে অবশ্য ঐগুলোই পথ চলার সেরা অবলম্বন। তবে ওসব আমাদের দেশেও আছে। আস্তাবলে রেখে দেয় লোকে। উৎসব অনুষ্ঠানের সময় কেউ হয়তো শখ শৌখিনতা করে এক-আধটুক চাপে। যাই হোক, একদিনে আপনাকে কত আর বলবো। আমি তো আপনার সারা জীবনের সঙ্গিনী, পরে আবার অনেক মজার মজার কথা শোনাবো।

—তবে একটা কথা, আনার আবার বলে, আমাদের দেশের এবং আপনাদের দেশের প্রসূতি পরিচর্যার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক আছে। আমাদের শরীরটা যেভাবে তৈরি আপনাদের এখানকার মেয়েদের শরীর ঠিক সেইভাবে তৈরি নয়। সেই কারণে এখানকার ধাইরা হদিশই করতে পারবে না আমাদের পেটে বাচ্চা কীভাবে থাকে, কখন সে প্রসব করবে, এবং নবজাতককে কী-ভাবে রাখলে, পরিচর্যা করলে সে সুস্থ থাকবে। এই সব ভেবে আমার বড় ভয় করছে জাঁহাপনা, আমার পেটে আপনার যে বাচ্চা আছে তার জন্মকালে ধাইদের দোষে তার না কোনও অনিষ্ট হয়। কারণ এখানকার ধাইরা তো এখানকার মতো করে আমাকে প্রসব করাবার চেষ্টা করবে। তাতে ফল খারাপ হাওয়ার আশঙ্কাই বেশি!

সুলতান আঁৎকে উঠলেন, বল কী ? সর্বনাশ হবে যে!

—তাই তো বলছি, জাঁহাপনা, আপনি আমার মা ভাইদের খবর পাঠান। তারা আমার কাছে থাকলে আর কোনও ভয় থাকবে না। আমার মা সব জানে। সে সব নিখুঁত বন্দোবস্ত করতে পারবে। আমাদের বাচ্চার নিরাপদের কথা ভেবেই তাদের খবর দেওয়া দরকার।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একত্রিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সব শুনে সুলতান বললেন, কিন্তু তোমার মা ভাই-এর এখানে কী করে নিয়ে আসা যায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আনার। আমার লোকজন তো পানির তলায় যেতে পারবে না।

আনারকলি বলে, তার দরকার নাই, জাঁহাপনা। আপনি যদি বলেন আমি তাদের এখানে এনে হাজির করে দিতে পারি।

—তুমি পার ? কী করে ?

—আপনি পাশের ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকুন, তা হলেই দেখতে পাবেন কী করে আমি তাদের নিয়ে আসি এখানে!

আনারকলি ওর বুকের মধ্যে থেকে দুটুকরো ছোট ছোট চন্দন কাঠের টুকরো বের করে একটা সোনার পাত্রে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গল গল করে ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। আনার বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়ায়! আর তখুনি, দেখা গেল, সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। তারপর মুহূর্ত মধ্যে প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা তুফান শুরু হয়ে যায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গ পড়ে। সেই তরঙ্গতুঙ্গে ভেসে ওঠে এক সুন্দর সুপুরুষ যুবক। তার এক হাতে একটি ফুল। এবং তার ওপরেই ভাসে এক পলিত-কেশ বৃদ্ধা নারী। সুলতানের বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেই বৃদ্ধা আনারের মা লোকস্ত। আর ঐ যুবক তার ভাই সালিহ। এরপর আরও পাঁচটি সুদর্শনা মেয়ে ভেসে ওঠে জলের ওপর। এরা সকলে ভাসতে ভাসতে প্রাসাদ-সমীপের উপকূল দিয়ে এগিয়ে আসে। তারপর কূলে উঠে ওরা প্রাসাদের জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। এবং এক এক করে লাফিয়ে লাফিয়ে আনারের ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আনার-এর মা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে, আমাদের ছেড়ে তুই এতদিন কী করে ছিলি মা। আমরা ভাবলাম তুই আর বেঁচে নাই। কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছি এতকাল।

—আমার দোষ স্বীকার করছি মা। না বলে কয়ে ঐ ভাবে ঘর ছেড়ে চলে আসা আমার উচিত হয়নি! কিন্তু নিয়তির লিখন কে খণ্ডাতে পারে, বল। যাইহোক, দেরিতে হলেও আবার তো আমরা এক জায়গায় হতে পেরেছি। এ আনন্দই বা রাখবো কোথায়?

তারপর আনার তার বিচিত্র অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করলো তাদের কাছে।

—এখন আমি বাদশাহ শাহরিমানের পেয়ারের বেগম। আমার গর্ভে তার একমাত্র সন্তান। এই বিশাল সলতানিয়তের একমাত্র মালিক। এই সন্তানের প্রসব যাতে নিরাপদে হয় সেই জন্যেই আমি তোমাকে স্মরণ করেছি, মা। তুমি ছাড়া আমাদের রীতি-নীতি এরা তো কেউ জানে না।

আনার-এর মা বলে, বাছা তোমাকে এই মাটির দেশে দেখে আমি তো আঁতকে উঠেছিলাম। না জানি কত দুঃখে কষ্টে তোমার দিন কাটছে! ভেবেছিলাম স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্যেই বুঝি আমাদের ডাকছো। কিন্তু এখন এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখে বুঝতে পারছি, তুমি খুব সুখে আনন্দে আছ।

আনার বললো, আজ আমার মতো ভাগ্যবতী সুখী মেয়ে আর কে আছে, মা!

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বত্রিশতম রজনীতে
আবার সে গল্প শুরু করে:

পাশের ঘর থেকে সবই শুনছিলেন সুলতান। তার প্রিয়তমা আনার আজ মা ভাইকে ফিরে পেয়ে খুশির বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, তার মুখে হাসি ফুটেছে।

সুলতান পুলকিত হয়।

আনারকলি দাসী বাঁদীদের ডেকে খানাপিনা সাজাতে বলে। নানারকম বাদশাহী খাবার-দাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে দেয় তারা। মা বলে, সে কি, আমরা এলাম যাঁর ঘরে তিনি কোথায়? তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো না, খাবো কি? যা মা, তাঁকে ডাক, আমরা তাঁকে দেখি, আলাপ করি, তারপর খাবো।

আনারকলি একটু গলা চড়িয়ে সুলতানকে ডাকে, জাঁহাপনা, শুনতে পাচ্ছেন? আমার মা ভাই এসেছে। তারা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে।

সুলতান পাশের ঘর থেকে এসে আনারের মা ভাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানালেন, আমি বড় খুশি হয়েছি আপনারা এসেছেন।

সালিহ বললো, আমার আদরের ভগ্নী আনার, মনে ভয় ছিল সে বুঝি সুখে নাই, সুলতান বাদশাদের হিংস্র কামনার স্বীকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু আনারের মুখে সব শুনলাম, আপনি তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। অবশ্য সবই নিয়তির খেলা। যার ভাগ্যে যা লিখেছেন তিনি, তাই তো হবে। তা না হলে, আমার বোন আনার সমুদ্রের কন্যা, অতল সমুদ্রের প্রত্যন্ত প্রদেশে আমাদের বাস। সেখান থেকে উঠে সে কী করে আপনার সন্তানের জননী হচ্ছে?

সুলতান বললেন, এ তুমি যথার্থই বলেছ, শালা সাহেব। নিয়তির লেখা কেউ এড়াতে পারে না। যাক, এবার খানাপিনা কর।

সেদিন থেকে ওরা সকলে প্রাসাদেই অবস্থান করতে থাকলো। যথাসময়ে আনারকলি তার মা লোকস্তের হাতে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলো। চাঁদের মতো সুন্দর ছেলে। যেমন রং, তেমনি চেহারা। সুলতানের যে কী আনন্দ, কী করে তা বলবো। সে ভাষা আমার নাই। সাত দিন পরে শুদ্ধাচার করে ছেলেকে সুলতানের কোলে তুলে দিল আনারকলি। নবজাতকের নাম রাখলেন তিনি বদর বাসিম। অর্থাৎ চাঁদের হাসি।

এই সময়ে রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেত্রিশতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

সুলতানের হাত থেকে সালিহ,—আনারকলির ভাই, ছেলেকে হাতে নিয়ে আদর সোহাগ করতে থাকে। নানা ভাবে নাচাতে নাচাতে সে ঘরময় নেচে বেড়ায়। হঠাৎ সুলতানকে হতবাক করে দিয়ে সালিহ ছেলেকে হাতে ধরে জানালা দিয়ে লাফিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতলে তলিয়ে যায়। সুলতান অসহায়ভাবে আর্তনাদ করে ওঠেন। তাঁর সারা চোখে মুখে সে কি আতঙ্ক, ভয়! একটু পরে নিদারুণ হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি।

আনারকলি হাসে। আপনি শান্ত হোন, জাঁহাপনা, ভয়ের কোনও কারণ নাই। ছেলের কোনও অনিষ্ট হবে না। বহাল তবিয়তে আবার তারা ফিরে আসবে।

কিন্তু সে কথায় সুলতান আস্বস্ত হতে পারেন না। তাঁর সারা চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে, এখন আমি কী করি, কী হবে, ওরে বাবা, এ কী হলো ?

আনার সুলতানকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে, আপনি উতলা হবেন না জাঁহাপনা, এটা তো মানেন, আমি তার মা, দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছি। আপনার চাইতে দরদ আমার অনেক বেশি। সেই মা হয়ে আমি বলছি, হতাশার কোনও কারণ নাই। আপনার সন্তান যেমনটি ছিল তেমনি সুস্থ অবস্থায় আবার এখানে ফিরে আসবে। আপনি শান্ত হোন।

সুলতান বুঝলেন সবই। আনারকলি তার গর্ভধারিণী মা। সে যখন এত নিশ্চিন্ত, নিশ্চয়ই আশঙ্কার কোনও কারণ থাকতে পারে না। তবু অশান্ত পিতার মন কিছুতে প্রবোধ মানতে চায় না। অপলক চোখে তিনি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ভেসে ওঠে সালিহ। তার হাতে বদর বাসিম। সুলতান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

কি আশ্চর্য, সুলতান ছেলেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন, একেবারে মায়ের বুকের শিশুর মতো ঝকমক করছে এক ফোঁটা পানিও গায়ে লাগেনি!

সালিহ বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনি ভীষণ ভয় পেয়ে যাবেন। কিন্তু ভয়ের কিছু নাই। ওর শরীরের অর্ধেক রক্ত আমার ভগ্নী আনারের। সেই সূত্রে সে জলচরের সব যোগ্যতার হকদার। পরমপিতা সুলেমানের আশীর্বাদ নিয়ে সে জন্মেছে। জল তার সহায় হবে জীবনভোর, কোনও অনিষ্ট করবে না। আমি ওকে কাজল পরাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। জন্মের সাতদিন পরে আমাদের প্রত্যেক শিশুকে আমরা পরিয়ে দিই। এর ফলে সারাজীবন ধরে সে জলের মধ্যে সব কিছু স্বচ্ছ পরিষ্কার দেখতে পায়। জলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে এর কখনও কিছু অসুবিধে হবে না। এমন কি জলে চলবে, জলে শোবে অথচ একবিন্দু জল লাগবে না গায়ে। এ হচ্ছে আমাদের জন্মগত ব্যাপার। সুলেমানের আশীর্বাদ।

সালিহ বদর বাসিমকে আনারকলির কোলে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ট্যাঁকে ঝোলানো থলেটা খুলে সুলতানের হাতে দেয়।

—ভাগ্নের মুখ দেখার নজরানা!

কার্পেটের ওপর থলেটা উপুড় করে ঢেলে দেন সুলতান। বিস্ময়ে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। পায়রার ডিমের মতো বড় বড় হীরে, এক বিঘৎ মাপের পান্না, মটরদানার মতো মুক্তো, অদ্ভুত লাল রঙের প্রবাল, এবং অজস্র মূল্যবান গ্রহরত্ন। সারা ঘরখানা আলোয় আলোয় ঝকমক করে উঠলো।

সুলতান ভেবে পান না, সালিহকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবেন। আনারকলিকে

উদ্দেশ করে বলেন, তোমার ভাই-এর এই অভাবনীয় উপহার দেখে আমার তো আক্কেল-গড়ুম হয়ে গেছে, আনার। এর এক একটা রত্ন আমার সারা মুলুকের সম্বৎসরের আয়ের সমান।

আনারকলি বলে, সে যাই হোক, আপনার যোগ্য উপহার আমরা দিতে পারি না, জাঁহাপনা। যা-ই দিই না কেন, আপনার ঋণ শোধ হবে না কোনও দিন। আমরা সবাই মিলে হাজার বছর ধরে আপনার বাঁদী গোলাম হয়ে থাকলেও আপনার দেনা শোধ দিতে পারবো না।

সালিহকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সুলতান বললেন, এইখানে আমার প্রাসাদে তোমরা আরও চল্লিশ দিন থাকো—এই আমার ইচ্ছা, ভাই।

সুলতানের অনুরোধে আরও চল্লিশটা দিন কাটিয়ে দেশে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলো ওরা। সুলতান বললেন, ক'টা দিন বড়ই আনন্দে কাটলো। সালিহ, তোমাকে কিছু দিতে চাই আমি, কী নেবে, বল?

সালিহ বললো, যে আদর ও আতিথেয়তা পেলাম, তার তুলনা নাই। এর বেশি কী আর কামনা করতে পারে মানুষ। ধন দৌলতের তো কোনও মূল্য নাই আমাদের কাছে। আমরা চাই ভালোবাসা—প্রেম ও শুভেচ্ছা। এবং তা আপনার কাছ থেকে পর্যাপ্তই পেয়েছি আমরা। মন ভরে গেছে। এখন অনুমতি করুন, স্বদেশে ফিরে যাই। জল ছেড়ে আমরা অনেকদিন হাওয়ার মধ্যে আছি। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা শুভ নয়। বেশীদিন ডাঙায় থাকলে অসুখ বিসুখ করতে পারে। এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি। পরে আবার আসবো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো চৌত্রিশতম রজনী:

আবার কাহিনী শুরু হলো:

সালিহ বলতে থাকে, ভাগ্নেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, মন বড়ই বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। কিন্তু উপায়ই বা কী? যাই হোক, মাঝে মাঝে এসে মামুকে দেখে যাবো।

সুলতান বলেন, না, আর তোমাদের আটকে রাখবো না। এখন ফিরে যাও। কিন্তু যখনই সময়-সুযোগ হবে, চলে এস। তোমাদের মজার দেশটা দেখার বড় ইচ্ছে। কিন্তু পানি আমি ভীষণ ভয় করি।

আনারকলি বাচ্চা বদর বাসিম এবং সুলতানকে নিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া দেখতে থাকলো।

এবার আমরা বদর বাসিমের কথায় আসি।

আনারকলি আয়া-ধাইদের বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কোলে ছেলেকে ছেড়ে না দিয়ে নিজের বুকের দুধই খাইয়ে লালন করতে থাকলো। এইভাবে চার বছর কাটে। দামাল শিশু দিনে দিনে সিংহ-শাবকের মতো বেড়ে ওঠে।

বাসিমের বয়স যখন পনের হলো, তার রূপের বাহার আরও ফেটে পড়তে

লাগলো। পড়াশুনা, খেলাধুলো, নাওয়া-খাওয়া, ঘুমানো—সব তার ঘড়ির কাঁটায় চলে। কোনও অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলা নাই। দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে ওর যৌবনের গোলাপ-কুঁড়ি।

সুলতান বৃদ্ধ হয়েছেন। দেহ অর্থব হয়ে পড়ছে। বুঝতে পারছেন, সময় সমাগত। আর বেশি দেরি নাই—এবার যেতে হবে। সুলতান ভেবে আনন্দ পান তাঁর একমাত্র সন্তান বাসিম রূপে, গুণে, শৌর্যে ও বীর্যে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

একদিন উজির আমির অমাত্য আমলা ইয়ার-বক্সী, পাত্র-মিত্র পারিষদ এবং সেনাপতিদের সমক্ষে বাসিমের মাথায় বাদশাহী শিরোপা মুকুট পরিয়ে দিলেন সুলতান। নিজে হাতে ধরে তাঁর মসনদে বসিয়ে দিলেন পুত্রকে।

—আজ থেকে তুমি এই সলতানিয়তের সুলতান। আমি চাই যে, এই পবিত্র মসনদের মর্যাদা তুমি জীবন দিয়েও রক্ষা করবে। এই ধর, ন্যায় দণ্ড, শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন, এসবই বাদশাহর ধর্ম।

সুলতান বাসিমের কপালে চুম্বন এঁকে দিলেন। এইভাবে অভিষেক হলো তার।

বদরু বাসিম তখ্‌তে বসে প্রথমে উজির আমিরদের নিয়ে সভা করলো।

—সবলের আক্রোশ থেকে দুর্বলকে এবং ধনীর শোষণ থেকে গরীব-দুঃখীকে রক্ষা করাই আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে।

নতুন সুলতানের মুখে এই সাম্যের বাণী শুনে বৃদ্ধ শাহরিমান ও উজির-আমির সকলেই মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

এরপর শাহরিমান সুখে অবসর যাপন করতে থাকলেন। আর বাসিম বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রজাপালন করতে লাগলো।

এক বৎসর পরে আল্লার নামগান করতে করতে একদিন শাহরিমান দেহ রাখলেন।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আনারকলি এবং বাসিম এক মাস ধরে শোক পালন করলো। শাহরিমানের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সালিহ এল সমুদ্রতল থেকে। এই সতেরো বছরে আরও অনেক বার এসে সে দেখে গেছে তার বোন আর ভাগ্নেকে। বাসিমের কাছে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলো সে।

—তাঁর মরার সময় আমি কাছে থাকতে পারলাম না, বাবা। এ দুঃখ আমার যাবে না। যাক, বাবা-মা কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। শোক করো না মামু। ভালোভাবে শাসন কাজ চালাও। তোমার প্রজারা তোমার পুত্রসম। তাদের সুখ-সুবিধে দেখাই তোমার একমাত্র কাজ।

ভাই-বোনে বাসিমের শাদী নিয়ে আলোচনা হয়। সালিহ বলে, বাসিম বড়

হয়েছে—সতেরোয় পা দিল, এবার তো ওর একটা শাদীর ব্যবস্থা করতে হয়, বোন।

আনারকলি বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম, দাদা। ভালো মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়, দেখ। একমাত্র সলতে, সময় মতো শাদী দিয়ে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

সালিহ বলে, আমার মতে, সমুদ্রের শাহজাদীদের কারো সঙ্গে ওর শাদী দেওয়া উচিত।

আনারকলি বলে আমারও তাই ইচ্ছে। ভেবে দেখতো কোন সুলতান বাদশাহর সুদর্শনা সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যা আছে!

সালিহ এক এক করে নাম করতে থাকে। কিন্তু আনারকলির কাউকেই মনে ধরে না।

—না, এরা কেউই বাসিমের যোগ্য হবে না। ওর যা বাড়ন্ত গড়ন—যা রূপ, শিক্ষাদীক্ষা, তার উপযুক্ত এরা কেউ না।

সালিহ বলে, মনে পড়েছে, আনার। সুলতান সামানদালের এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—তার নাম জানারা।

আনার বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে। আমি যখন চলে আসি তখনও ওর বয়স ছিল বছরখানেক। ফুটফুটে সুন্দর চাঁদের মতো মেয়ে—একেবারে ডানাকাটা পরীর মতো। এই মেয়েই আমার ছেলের যোগ্য হবে। তুমি ওর বাবার সঙ্গে কথা বল, দাদা।

দুই ভাইবোনে যখন এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল বাসিম শুয়ে শুয়ে ঘুমের ভান করে সব শুনছিল। জানারার রূপের বর্ণনা শুনে সে মনে মনে শিহরিত হয়ে ওঠে।

সালিহ বলে, কিন্তু বোন, কাজ অত সহজ হবে বলে তো মনে হয় না। জানারার বাবা বড় একরোখা গোঁয়ার। এর আগে অনেক সুলতান বাদশাহর প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন কি কয়েকজন শাহজাদাকে ঠেঙিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছে। আবার শুনেছি, কাউকে মারতে মারতে শহরের বাইরে বের করে দিয়েছে। জানি না, আমাদের প্রস্তাব সে কী ভাবে নেবে। এই কারণে আমার সন্দেহ হয়, ব্যাপারটা হয়তো শুভকর হবে না।

আনারকলি বলে, হুঁ, কাজটা খুব হিসেব করে ও সাবধানে এগোতে হবে। ঝোপ বুঝে কোপ মারা ছাড়া আর পথ নাই। তাছাড়া করতে গেলে দয়ে মজতে হতে পারে! যাক, এ নিয়ে ভেবে চিন্তে পরে আবার আলোচনা করা যাবে।

এই সময় আড়মোড়া ভেঙে বাসিম জেগে ওঠে। ভাবখানা এতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল। এই মাত্র জাগলো। বিছানা ছেড়ে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। কিন্তু অন্তরে দগ্ধ হতে থাকলো। জানারা তার বুকে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়েছে। এখন কিসে তার নির্বাপিত হবে?

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাঁইত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বাসিম ভাবে, তার হৃদয়ের এই আকুলতা মা ও মামার কাছে গোপন রাখবে। সারা রাত ধরে নানা রঙের স্বপ্নের জাল বুনে চলে। চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসে না।

ভোর না হতেই সে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে। মামার ঘরে গিয়ে সালিহকে ডেকে তোলে, মামা, ওঠ, চল তোমার সঙ্গে আজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবো। সারারাত ঘুম হয়নি। মাথাটা ধরে আছে। খোলা হাওয়ায় বেড়ালে হয়তো একটু ভালো লাগবে।

সালিহ বলে, বেশ তো চল, মামু। সকাল বেলায় সমুদ্রের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো।

সমুদ্রের উপকূলে এসে ওরা একটা উঁচু টিলার ওপরে বসে। সামনে শান্ত গভীর সমুদ্রের ঘন নীল জল। মাথার ওপরে নির্মেঘ আকাশ। এক সময় বাসিম বলে, মামা আপনাদের কথাবার্তার সবই আমি শুনেছি। সুলতান সামানদালের কন্যা জানারাকে দেখার জন্য মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সালিহ বুঝলো, ভাগ্নের হৃদয়ে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। বললো, কিন্তু তাকে পাওয়া তো খুব সহজ কাজ হবে না, মামু।

—কিন্তু মামা, যে ভাবেই হোক জানারাকে পেতেই হবে। তার কথা শোনার পর থেকে আমার বুকের মধ্যে তার আসন পাতা হয়ে গেছে। আমি তাকে না পেলে মরে যাবো। আপনাকে ব্যবস্থা একটা করে দিতেই হবে। তাকে ছাড়া অন্য কোনও নারীকে আমি হৃদয়ে স্থান দিতে পারবো না।

সালিহ বলে, তা হলে মামু, চল তোমার মা-এর কাছে যাই। তাকে বলি, সুলতান সামানদালের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আমরা সমুদ্রের নিচে যেতে চাই। সে যদি যাবার অনুমতি দেয় তবে তোমাকে নিয়ে আমি সামানদালের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

বাসিম বাধা দিয়ে বলে, মাকে এসব বলে তার অনুমতি আদায় করতে যাওয়া বৃথা। আমি তার একমাত্র সন্তান। এক পলক চোখের আড়াল করতে চাইবে না, কিছুতেই আমাকে যেতে দিতে রাজি হবে না। তার চেয়ে আমি বলি কি. তাকে না বলেই, চল আমরা চলে যাই। হয়তো মা খানিকটা কষ্ট পাবে, কিন্তু আমি ফিরে এলেই আবার মুখে হাসি ফুটবে তার। আর তা ছাড়া মা-এর আশঙ্কা, সুলতান সামানদাল ভীষণ নিষ্ঠুর, সে আমাদের সঙ্গে হয়তো খারাপ ব্যবহার করবে! মা বলবে, নিজের সলতানিয়ত ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। কারণ মসনদ অরক্ষিত থাকলে শত্রুর মনে লোভ জাগবে। আমি আমার মাকে ভালো করে জানি, সে এই সব অজুহাত দেখিয়ে আমার যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবে। তার চেয়ে, মাকে কিছু বলার দরকার নাই, চল আমরা একবার সামানদালের সঙ্গে মোলাকাত করে আসি। দেখি তার কী মতামত।

সালিহ বললো, তোমার যখন এতই ইচ্ছা, চল যাই একবার ঘুরে আসি।

এই বলে সে তার হাতের একটা আংটি খুলে বাসিমের হাতে দিয়ে বললো, এটা পরে নাও। রক্ষাকবচ, হাতে থাকলে জলের নিচে তোমার কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

এরপর টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সালিহ আল্লা হো আকবর বলে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল। মামার দেখাদেখি ভাগ্নেও ঠিক একইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। নিমেষে তলিয়ে গেল দুজনে। একেবারে সমুদ্রের গভীর তলদেশে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে শুরু করে ঃ

সালিহর ইচ্ছা প্রথমে সে তার ভাগ্নেকে তাদের নিজের প্রাসাদে নিয়ে যায়। তার মা লোকস্ত নাতিকে দেখে পুলকিত হবেন।

সুতরাং সে বাসিমকে সঙ্গে নিয়ে মা-এর কাছে উপস্থিত হলো। লোকস্ত বাসিমকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বুকে জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ করতে থাকে।

—তোমার মা কেমন আছে, ভাই ?

—ভালো আছে, দাদীমা।

লোকস্ত বলে, আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। কতকাল পরে আবার তোমাকে দেখতে পেলাম। আনারকে আনতে পারলে না ভাই, তাকে একবার দেখতাম।

বাসিম বললো, মা আপনাকে শুভেচ্ছা আর সালাম জানিয়েছে দাদীমা।

আপনারা বুঝতে পারছেন, এখানে বাসিম মিথ্যে কথা বললো। আসার সময় সে তো তার মা-এর সঙ্গে দেখা করেই আসেনি।

সালিহ বললো, তোমার নাতি সামানদালের কন্যা জানারাকে শাদী করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে এসেছি সামানদালের সঙ্গে এই শাদীর ব্যাপার নিয়ে এক প্রস্তাব দেব বলে।

ছেলের কথা শুনে লোকস্ত ভীষণ রেগে উঠলেন, তোর তো সবই জানা আছে বাবা। সামানদাল ভীষণ জেদী একরোখা এবং ভয়ঙ্কর লোক। কত সুলতান বাদশাহকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, কত শাহজাদাদের মেরে হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে, সেকি তুই জানিস না ? এসব জেনে শুনে ওর কাছে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসলে মাটির মানুষের কাছে আমাদের মান ইজ্জত কী বাড়বে সালিহ।

—কিন্তু মা আমাদের ছেলেই বা কম কিসে ? হতে পারে তার মেয়ে জানারা সুন্দরী, কিন্তু আমাদের বাসিম তারও অধিক সুন্দর সুপুরুষ। হতে পারে তারা বিত্তশালী কিন্তু আমাদের ছেলে তার চেয়েও ধনী সুলতান।

লোকস্ত দেখলো, ছেলেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। তার মা বললো, যেতে

হয় তুই একা যা। আমি বাসিমকে সঙ্গে দেব না। কোনও কারণে সে যদি অপমান অবজ্ঞা করে সে আমি সইতে পারবো না।

সালিহ দুই বস্তা উপহার সামগ্রী চাকরদের মাথায় চাপিয়ে সামানদালের প্রাসাদের দিকে চললো।

এই সময়ে ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো উনচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

সামানদালের প্রাসাদে এসে সে সুলতানের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। এবং প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। সালিহ দরবারে প্রবেশ করে।

একখানা পান্নার সিংহাসনে বসেছিল সামানদাল। সালিহ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উপহারের বস্তা দুখানা তার সামনে রাখে। সুলতানও তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাশে বসতে বলে।

—সু-স্বাগতম শাহজাদা সালিহ। কী খবর, এস, এস, এখানে বসো আমার পাশে। অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হলো। আচ্ছা, বল কেন এসেছ আজ, দেখি কিছু করতে পারি কিনা তোমার জন্য ?

নিশ্চয়ই আপনি করতে পারবেন, জাঁহাপনা। আজ আমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। দুনিয়াতে একমাত্র আপনিই তা পূরণ করতে পারেন।

সামানদাল অধৈর্য হয়ে ওঠে, আহা, ভূমিকা রেখে চটপট বলেই ফেল, না!

সালিহ বলে, আপনার প্রাণাধিক কন্যার সঙ্গে আমার ভাগ্নে সুলতান বদর বাসিমের শাদীর প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি। পারস্য এবং খুরাসনের পরলোকগত সুলতান শাহরিমানের একমাত্র সন্তান সে—বর্তমানে সুলতান।

সালিহর প্রস্তাব শুনে সামানদাল হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

আমি ভেবেছিলাম, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। কিন্তু এখন দেখছি, নাঃ, আমি ভুল করেছি। তা না হলে এই ধরনের অদ্ভুত আজগুবি একটা প্রস্তাব তুমি রাখতে পার আমার কাছে!

—কেন, প্রস্তাবটা আজব হলো কী করে। আমার ভাগ্নে বাসিম আপনার কন্যার অযোগ্য কোন দিক দিয়ে। রূপে ? গুণে ? ঐশ্বর্যে ? আমি বলবো, আপনার কন্যা রূপসী অবশ্যই। কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর আমার ভাগ্নে। আপনার কন্যার যা গুণ আছে বাসিমের গুণ তার চেয়ে অনেক বেশি। আর ঐশ্বর্য তার এত আছে—আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

সালিহর এই সব কথা শুনে সামানদাল ক্রোধে ফেটে পড়ে।

—কী, এত বড় স্পর্ধা! আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান ? এই—কে আছিস, কুত্তার বাচ্চাকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দে তো।

একদল ষণ্ডাগণ্ডা মার্কা পেয়াদা তাকে পাকড়াও করার জন্য ছুটে আসে। কিন্তু সালিহ আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তাদের সকলকে পাশ কাটিয়ে প্রাসাদের বাইরে

ছিটকে আসতে পারে।

বাইরে এসেই সে চমকে যায়। তার মা লোকস্ত সন্তানের বিপদ আশঙ্কায় এক হাজার অশ্বারোহী সেনা পাঠিয়েছে তাকে রক্ষা করার জন্য। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত তারা।

সেনাপতি জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, শাহজাদা। আপনি এমন ভীত চকিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন কেন?

সালিহ বলে, সামানদাল আমাকে কুৎসিততম গালমন্দ দিয়েছে। তার লোকজনদের লেলিয়ে দিয়েছে আমার ওপর। আমাকে তারা মারবে।

সেনাপতি তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিল, দরবারে ঢুকে সুলতানকে আক্রমণ কর।

তৎক্ষণাৎ সৈন্যরা লাফ দিয়ে নেমে অসি উন্মুক্ত করে, রে রে করে ঢুকে পড়লো দরবার মহলে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চল্লিশতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয়ঃ

সামানদাল দেখলো, এক উন্মত্ত সৈন্যদল তার প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। এক মুহূর্ত সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তারপর চিৎকার করে উঠলো, আমার বীর যোদ্ধা সৈন্যরা, শত্রু হানা দিয়েছে, বীর বিক্রমে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। কচুকাটা করে শুইয়ে দাও এদের। এই মুহূর্তে আমি দেখতে চাই, শয়তানদের মুন্ডু গড়াগড়ি যাবে আমার পায়ের তলায়।

সামানদালের সৈন্যরাও তেড়ে এল। দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগলো। কিন্তু সালিহর সৈন্যবাহিনী অমিত বিক্রমশালী। এক পা পিছনে হটাতে পারলো না। তাদের অসির আঘাতে সামানদলের সৈনারা লুটিয়ে পড়তে থাকলো। এইভাবে অনেকক্ষণ লড়াই চলার পর দেখা গেল, সামানদালের সব সৈন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। অগণিত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়েছে সারা দরবার মহলে। রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে।

সামানদাল শঙ্কিত হলো। এবার বুঝি তার প্রাণ যায়। সিংহাসন ছেড়ে সে পালিয়ে অন্দরমহলে যেতে চায়। কিন্তু সালিহ লাফিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়। তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে বলে, খবরদার, এক পা নড়বে না। যদি পালাবার চেষ্টা কর শয়তান, এই যে দেখছো, শাণিত তলোয়ার, তোমার মুন্ডু লুটিয়ে পড়বে এখুনি।

সামানদাল হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সালিহর সৈন্যরা পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেলে তাকে।

সামানদাল সালিহর হাতে বন্দী থাকে। আমরা এখন তার কন্যা জানারার কথা বলি।

প্রাসাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুর হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত, ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এবং বাবা সামানদাল বন্দী, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র জানারা তার এক নিত্য সহচরী বাঁদী সিরৎলিকে সঙ্গে করে খিড়কীর দরজা দিয়ে পালিয়ে, অজানার পথে বেরিয়ে পড়লো।

পথঘাট কিছুই জানা নাই। প্রাণ-ভয়ে দিশাহারা হয়ে কোথায় যে সে ছুটে চললো কিছুই বুঝতে পারে না। প্রাসাদের বাইরে সে কখনও আসেনি।

চলতে চলতে এক জনবসতি-শূন্য গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করে সে একটা ঝাঁকড়া গাছের ওপরে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

কিন্তু নিয়তির এমনি খেলা যে লোকস্তের প্রাসাদ এই বনভূমির অতি সন্নিকটে।

দুইজন অশ্বারোহী সৈন্য ছুটতে ছুটতে এসে লোকস্তকে সংবাদ দিল। শাহজাদা সালিহকে সুলতান সামানদাল অপমান করেছিল। তাকে প্রহার দেবারও হুকুম দিয়েছিল সে। কিন্তু তা তারা পারেনি। ইতিমধ্যে আমরা, এক সহস্র সেনা সেখানে পৌঁছে যাই। এখন দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না বেগমসাহেবা, এ যুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বদর বাসিম আতঙ্কিত হলো। সর্বনাশ! এখন উপায়? শুধু একমাত্র তারই কারণে এই যুদ্ধ। মামা যদি মারা যায়? তা হলে? তা হলে সে দাদীমা লোকস্তের চোখের বিষ হবে। সব দোষ তার ঘাড়েই চাপবে। বলবে, তোমার খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়েই আমার ছেলেটা প্রাণ হারালো! না না, না, আর ভাবতে পারে না বাসিম।

সকলের অলক্ষ্যে সে প্রাসাদ ছেড়ে বনের দিকে ছুটে চলে। কোথাও পালাতে হবে। আত্মগোপন করতে হবে। না হলে পুত্রহারা মায়ের রোষানলে পড়ে সে ছারখার হয়ে যেতে পারে।

নিয়তিই তাকে সেই ঝাঁকড়া গাছের নিচে এনে দাঁড় করালো। আপনারা জানেন, এই গাছের ডালে বসে আছে সামানদাল কন্যা জানারা। সেও প্রাণভয়ে এখানে এসে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ছিল।

গাছের ডালে উঠে বসতে যাবে, হঠাৎ বাসিমের নজরে পড়ে এক পরমা-সুন্দরী কন্যা একটা ডালের ওপরে বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। এমন রূপবতী নারী কখনও দেখেনি সে।

—কে তুমি? কেনই-বা এখানে এই গাছে বসে আছ, সুন্দরী?

—আমি জানারা, আমার বাবা সুলতান সামানদাল। সালিহ তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাদের প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। আমাদের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত খতম হয়ে গেছে। আমার বাবা এখন শাহজাদা সালিহর হাতে বন্দী। আমার তল্লাশে তার সৈন্যরা এতক্ষণে সারা প্রাসাদ তোলপাড় করছে। আমি অনেক আগেই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কে?

—আমার নাম বদর বাসিম, সালিহর ভাগ্নে। পারস্য এবং খুরাসনের

সুলতান। আমার বাবা ছিলেন সেখানকার সুলতান। আমার মা আনারকলি, —বেগমসাহেবা লোকস্তের কন্যা। মামার মুখে তোমার রূপের অনেক কথা শুনেছি। আমারই ইচ্ছায় তিনি গিয়েছিলেন তোমার বাবার কাছে। শাদীর প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু তোমার বাবা শুনেছি আমার মামাকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। আত্মরক্ষার জন্যই তিনি সৈন্য ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তোমার বাবা উদ্ধত, অবিনয়ী। তার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এই মর্মান্তিক কাণ্ড সংঘটিত হলো। মামার প্রস্তাবে সে যদি রাজি নাও হতো এমন কোনও অপরাধ ছিল না। কিন্তু পেয়াদা সিপাই দিয়ে মারধোর করানো কি সহ্য করা সম্ভব!

জানারা বলে, আমার বাবা ভীষণ বদরাগী, একরোখা মানুষ। তা না হলে, তোমার মতো এমন সুন্দর সুপুরুষ পাত্রকে তাঁর পছন্দ হয় না? তোমাকে জামাই করতে পারলে, যে-কোনও সুলতান বাদশাহ নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু আমার বাবা নিজের ভালো, আমার ভালো কিছুই বুঝতে চাননি। তাঁর দম্ভেই তিনি মারা গেলেন। আপনার মামার হাতে আজ তিনি বন্দী। কে জানে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন কিনা। না করাই স্বাভাবিক। নিজেকে রক্ষা না করতে পারলে তো এতক্ষণে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়তো আমার বাবার পায়ের নিচে। এখন তাঁর অনুকম্পার ওপরই সব নির্ভর করছে।

জানারা নিচে নেমে এল। বাসিম তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে, তুমি আমার কল্পলোকের মানসী প্রিয়া। শয়নে স্বপ্নে, নিদ্রা জাগরণে শুধু তোমারই ধ্যান করেছি আমি। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচতে পারবো না—এই কারণেই সুদূর মাটির দেশ থেকে নেমে এসেছি এই গহিন সমুদ্রে। বল, তুমি আমার হবে?

(চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় জানারার অধর কপোল, বুক। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে পিষ্ট করে ফেলতে চায় ওর ফুলের মতো কোমল তনুলতা। বাসিম অনুভব করতে পারে, জানারার সুডৌল স্তন-যুগল মর্দনের আনন্দে যেন আর্তনাদ করে উঠছে।

বাসিম উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ক্ষিপ্রহাতে সে জানারার কটিবন্ধ খোলার জন্য হাত বাড়ায়।) কিন্তু পারে না। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মেরে বাসিমকে ঠেলে ফেলে দেয় জানারা। মুখে থুথু ছিটিয়ে ফুঁসে ওঠে, অসভ্য জানোয়ার, কামনার কীট, এই তোর ব্যবহার? এই তোর ভালোবাসা? নারী-মাংসের পাশবিক ক্ষুধা তোর শিরায় শিরায়। তুই আমাকে ভালোবাসিস? মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা? তোর অপকর্মের সাজা কেমন করে দিতে হয়, একবার দ্যাখ। শোনও মাটির দেশের জন্তু, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার তুমি করলে তার দণ্ড হিসাবে তোমাকে আমি এই মুহূর্তে না-পাখি না-পশু এক অদ্ভুত ধরনের জীবে পরিণত করলাম।

কি আশ্চর্য, জানারার মুখের অভিশাপ শেষ হতে না হতে বদর বাসিম একটা বিরাটাকৃতির শাদা উটপাখির আকার ধারণ করলো।

জানারা তার সহচরী বাঁদীকে বললে, এই কামুক জানোয়ারটাকে আমি এমন

একটা জীব বানালাম সে কোনও দলেই ঠাঁই পাবে না। পাখীরা বলবে, 'তুমি উড়তে পার না, ডানা থাকলে কী হবে, আমরা তোমাকে দলে নেব না। আর জানোয়াররা বলবে, তোমার তো দু'খানা পা। তুমি আবার জানোয়ার হতে চাও কোন মুখে, দূর হও।' সিরৎলি, এটাকে নিয়ে চলে যা ঐ মরুভূমির মধ্যে। বেঁধে রেখে আয়, না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরুক লোচ্চাটা। নারী-মাংস খুবলাতে আসার মজাটা একবার বুঝুক।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বিয়াল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

জানারা বললো, তুমি ভুল জায়গায় খাপ খুলতে গিয়েছিলে মিট্রির সুলতান। জানারা ভালোবাসার দাসী হতে পারে কিন্তু কারো পাশবিক কামনার শিকার হবে না! সিরৎলি যাও, নিয়ে যাও তাকে ঐ উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে, ওকে বেঁধে রেখে এস। গলা শুকিয়ে না খেয়ে মরুক, ওটা!

সিরৎলি বাসিমকে তাড়াতে তাড়াতে মরুভূমির দিকে নিয়ে চলে। বাসিম-এর চোখে জল আসে। চলতে চলতে কখনও সে দাঁড়িয়ে পড়লে সিরৎলির ডাণ্ডা এসে পড়ে ওর পিঠে। বেদনায় কঁকিয়ে ওঠে সে। আবার চলতে থাকে। কিন্তু হাজার হলেও সুলতানের দুলাল। দৌড় ঝাঁপের অভ্যাস নাই কোনকালে, অমন তাড়া সহ্য করবে কী করে। আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ে। সিরৎলির দিকে করুণভাবে তাকায়।

সিরৎলির মায়া হয়। আহা কী সুন্দর শাহজাদা। না হয় একটু বাড়া-বাড়িই করেছিল, তাই বলে এই হাল করতে আছে। সে ভাবে, ঐ খাঁ খাঁ মরু-ভূমির মধ্যে বেঁধে রেখে এলে নির্ঘাৎ মারা যাবে। না, তা সে করতে পারবে না। একটা সোনার চাঁদ ছেলেকে এইভাবে হত্যা করার পাপের ভাগী সে হতে পারবে না। অন্য কোথাও, অন্য কোনও স্থানে রেখে দিয়ে যাবে। যেখানে অন্ততঃ প্রাণে মারা যাবে না। তারপর ওর যা বরাতে লেখা আছে তাই হবে। চাই কি শাহজাদী জানারার রাগ পড়ে গেলে তারও মনে অনুতাপ অনুশোচনা হতে পারে। তখন হয়তো সে-ই তাকে উল্টে চাপ দিয়ে দুষবে, 'আমি না হয় রাগের মাথায় তাকে মেরে ফেলতেই বলেছিলাম, তাই বলে তুমি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হয়ে অমন সুন্দর এক শাহজাদাকে হত্যার মুখে রেখে এলে?'

নবাব বাদশাহর বাড়িতে নোকরী করে করে তার তিন কাল গেছে। এদের খামখেয়ালীপনা দেখে দেখে নাড়ি-নক্ষত্র সব তার চেনা হয়ে গেছে। একই কথা মেজাজ মর্জি বুঝে চলতে পারলে ইনাম মেলে। আবার সেই কথারই দোষ ধরে, অন্য সময় হয়তো বা কারো গর্দান যায়।

সিরৎলি উটপাখী রূপী বাসিমকে তাড়িয়ে নিয়ে এক শ্যামল বন-প্রান্তরের দিকে চলে যায়। অদূরে এক স্বচ্ছ-সলিলা নদী প্রবাহিতা। গাছে গাছে পাকা

পাকা ফল। সে ভাবলো, এইখানে শাহজাদাকে রেখে গেলে গাছের ফল আর নদীর জল খেয়ে সে অন্ততঃ জীবন ধারণ করতে পারবে।

সালিহ সামানদালকে বন্দী করে তারই প্রাসাদের এক কক্ষে কয়েদ করে রাখে। এবং মসনদে আরোহণ করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করে দেয়। সারাটা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে শাহজাদী জানারার সন্ধান পায় না।

সালিহ বুঝতে পারে বিপদের আশঙ্কা বুঝে পূর্বাহ্নেই সে কেটে পড়েছে। মা-এর কাছে ফিরে আসে সে। লোকস্ত ছেলেকে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। কেঁদে আকুল হয়।

—এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা।

—কেন কী, আবার কী হয়েছে মা?

সালিহ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

লোকস্ত বলে, বাসিমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই অচেনা-অজানা বিদেশ-বিভুঁই-এ কোথায় গেল সে, আর কেনই বা না বলে ক'য়ে চলে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি নফর চাকরদের খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা ফিরে এসে বললো, ধারে কাছে কোথাও সে নাই। বহু দূরে অন্য কোথাও গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে হয়তো বা।

সালিহ চারদিকে লোকজন পাঠালো। সারা শহর গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরে এলো তারা। না, কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না বাসিমের। অবশেষে সে শ্বেত শহরে দূত পাঠালো আনারকলির কাছে। গভীর দুঃখ-বেদনা জানিয়ে এক পত্র লিখলো সে, 'বাসিম কোথায় উধাও হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও তার সন্ধান করতে পারিনি।'

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে আনারকলি এসে উপস্থিত হলো। মা লোকস্ত ভাই সালিহ গভীর শোকে মুহ্যমান। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে তাদের।

সালিহ চেখের জল ফেলতে ফেলতে সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিল।

—আমি এখন সামানদালের মসনদ অধিকার করে সুলতান হয়ে বসেছি। সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শাহাজাদী জানারাকেও পাওয়া যায় নি। প্রাসাদ কেন, সমগ্র দেশেও তাকে দেখে নি কেউ। বদর বাসিমের সন্ধানে এখনও আমার বিশাল বাহিনী দেশের সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আনারকলির চোখের সামনে আঁধার নেমে এল। পুত্রহারা মা-এর গগনভেদী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো। প্রাসাদ ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়লো বুক ভাঙ্গা কান্নার ঢেউ।

মা লোকস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দেয়, খোদা এত নিষ্ঠুর হবেন না, মা। বাসিম আমার ফুলের মতো নিষ্পাপ নির্মল। তার কোনও ক্ষতি হতে পারে না। তুই দেখিস, বাসিম আবার ফিরে আসবে।

আনারকলি বলে, মা আমি তো আর এখানে পড়ে থাকতে পারবো না। চার দিকে শত্রুর অভাব নাই। মসনদ অরক্ষিত আছে, আমি যাচ্ছি। বাসিমের খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠাবে আমার কাছে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেতাল্লিশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

এবার চলুন আমরা সেই সবুজ বনানীর নদী উপকূলে যাই। সেখানে সিরৎলি বদর বাসিমকে কীভাবে রেখে গেছে—একবার দেখে আসি।

উটপাখী-রূপী বাসিম যখন দেখলো, দাসীটা তাকে নদীর ধারে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, কান্নায় ভেসে যেতে লাগলো তার দুচোখ। পাখা আছে তবু উড়ে পালাবার ক্ষমতা নাই। বিশাল দেহটা নিয়ে দুপায়ে গুটি গুটি হেঁটে আর কতদূর যাওয়া যায় ? এবং যাবেই বা কোথায়। সবই অচেনা-অজানা। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করে দেখে নিল সে। খিদে তেষ্টাও পেয়েছিল বেশ। চারপাশে অনেক ছোট ছোট ঝাঁকড়া গাছ। এবং সেই সব গাছের নাম না জানা হাজার হাজার পাকা ফল। বাসিম যতটা পারলো খেল। তারপর নদীর ঘাটে গিয়ে প্রাণভরে জল পান করলো। তারপর খুঁজে পেতে একটা বিশাল প্রাচীন বটের কোটরে আশ্রয় নিল। জায়গাটা সে মন্দ বের করেনি। বিশ্রাম করার পক্ষে উপযুক্ত।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। বাসিম বৃক্ষ-কোটরে ঘুমিয়ে পড়লো। সকাল বেলায় ঘুম ভেংগে সে চমকে ওঠে। এক শিকারী জালে আবদ্ধ করেছে তাকে।

শিকারীর মুখে বিজয়ের হাসি।

—যাক, আজ একটা ভালো দাঁও পাওয়া গেছে। বাজারে নিয়ে গেলে চড়া দামে বিকাবে। শিকারী তার কাঁধে তুলে নিল উটপাখী-রূপী বাসিমকে। স্বগতভাবে বলতে বলতে পথ চলে, এতকাল এত পাখি ধরেছি, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত নতুন পাখি তো কখনও পাইনি। দামটা যাচাই করে দেখতে হবে। নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ পাখি নয়। হয়তো অনেক দাম হবে। হাটে বাজারে কোনও সাধারণ লোকের কাছে বেচে দিলে দামও বেশি পাওয়া যাবে না, এবং এর মর্ম বোঝার চেষ্টা না করে কেটে ফেলবে হয়তো। তার চাইতে সুলতান বাদশাহর কাছে হাজির করলে মোটা বকশিশ মিলতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে সে এক সুলতানের প্রাসাদে পৌঁছলো। পাখিটার অদ্ভুত আকার এবং তার ঠোঁট চোখ পালক দেখে সুলতান মোটা ইনামের বিনিময়ে পাখিটা কিনে নিয়ে একটা সোনার খাঁচায় ভরে রাখলো। একটা পাত্রে করে খেতে দিল কিছু ভুট্টা আর ডালের দানা। কিন্তু কিছুই স্পর্শ করলো না সে। সুলতান ভাবলো, এ পাখি এসব বুঝি খায় না। তারপর কিছু মাংস এবং ফল এনে দিল। এবার কিন্তু পাখিটা সাগ্রহে খেতে থাকলো।

সুলতান আনন্দে নেচে ওঠে। খোজাকে ডেকে বলে, ওরে, যা যা, শিগির বেগমসাহেবাকে খবর দে, কী অদ্ভুত একটা পাখি কিনেছি আজ। পাখিটা ডালের দানা ছোঁয় না। অথচ মাংস ফল পেলে গবগব করে খায়।

খোজাটা ছুটে যায় হারেমে। একটু পরে বেগমসাহেবা আসে। কিন্তু পাখিটা দেখামাত্র সে নাকাব দিয়ে মুখ ঢেকে থামের আড়ালে দাঁড়ালো। সুলতান বুঝতে পারে না, কী ব্যাপার? বেগমের পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হলো? এত শরম কীসের? এখানে তো বাইরের কোনও পুরুষ নাই।

বেগম বলে, এই পাখিটা আসলে পাখি নয়। এক শাহজাদা। খুব সুন্দর দেখতে। ওর নাম বদর বাসিম। সুলতান শাহরিমানের পুত্র। ওর মা আনারকলি। শাহজাদী জানারার অভিশাপে ওর এই উটপাখির দশা হয়েছে।

সুলতান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, জানারা অভিশাপ দিল কেন?

—তার কারণ, এই বদর বাসিমের মামা সালিহ জানারার বাবা সামানদালকে বন্দী করে মসনদ দখল করে নিয়েছে।

সুলতান চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ ঐ শাহজাদী জানারাকে সমুচিত সাজা দেবেন। কী কী ঘটেছে, সব আমাকে খুলে বল, বেগম।

সুলতান-বেগম অসাধারণ যাদুবিদ্যাধরী। আগাগোড়া সব কাহিনী খুলে বললো সে। সুলতান সব শুনে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে উটপাখির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী, সব সত্যি?

পাখিটা ঠোঁট নেড়ে, পাখা ঝটপট করে জানালো সবই ঠিক।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুয়াল্লিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সুলতান বলে, বেগমসাহেবা, তুমি ওকে শাপমুক্ত করে দাও। আবার সে মানুষ হয়ে উঠুক।

বেগমের নির্দেশে খোজা এক পেয়ালা জল এনে দেয়। বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়ে কয়েকবারে জলটুকু পাখিটার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে আবার কী সব বলতে থাকে।

নিমেষের মধ্যে উটপাখিটা মানুষের আকার ধারণ করতে থাকে। একটু পরে সে এক সুন্দর সুপুরুষ শাহজাদার চেহারা ফিরে পায়। খাঁচার দরজা খুলে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

—আল্লাহ মেহেরবান।

সুলতান বদর বাসিমকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার সব কাহিনী শুনতে চাই, বেটা।

বদর বাসিম তার জীবনের সব কাহিনী সবিস্তারে খুলে বললো তাকে। শোনার পর সুলতান বললো, এখন বল, বাবা, তোমার জন্যে কী আমি করতে পারি।

বদর বলে, সব আগে আমি আমার সলতানিয়তে ফিরে যেতে চাই। অনেক দিন দেশ ছাড়া। মসনদ খালি পড়ে আছে। চারদিকে শত্রুর অভাব নাই। না জানি এতদিনে কী ঘটেছে। দারুণ উৎকণ্ঠায় মা দিন কাটাচ্ছেন। আমাকে

না দেখা পর্যন্ত তাঁর মুখে হাসি ফুটবে না ।

সুলতান বললো, আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করছি ।

খুব সুন্দর দেখে একখানা ময়ূরপঙ্খী নৌকা বানিয়ে অনেক খাবার দাবার এবং সোনাদানা হীরে জহরতে বোঝাই করে বাসিমকে চাপিয়ে বিদায় দিল সে ।

বাসিমের বড় আশা ছিল সে দেশে ফিরতে পারবে । কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর । ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে না গিয়ে উপায় কী ?

পাঁচ দিন চলার পর হঠাৎ সমুদ্রে তুফান উঠলো । ঝড়ের তোড়ে নৌকাখানা ভেঙে খান খান হয়ে গেল । মাঝি মাল্লারা কে কোথায় তলিয়ে গেল কেউ জানে না । বাসিমের যখন সম্বিত ফিরে এল, দেখলো, সে শুয়ে আছে এক পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্র উপকূলে ! আশে-পাশে তাকিয়ে দেখলো, কোনও জনমানব নাই । একটু পরে দেখা গেল গরু, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর মোষের একটা দল এগিয়ে আসছে । বাসিমের ভয় হলো । ওরা যদি আক্রমণ করে, প্রাণে আর বাঁচবে না সে । ভয়ে আতঙ্কে সে ছুটতে থাকে । জানোয়ারগুলোও তাড়া করে নিয়ে চলে । এইভাবে দৌড়তে দৌড়তে এক সময় এক শহরের ভিতরে প্রবেশ করে । সামনেই একটা দাওয়াখানা । উপায়ান্তর না দেখে সে ঐ ওষুধের দোকানেই ঢুকে পড়ে ।

দোকানের মালিক এক পলিত-কেশ বৃদ্ধ । বাসিম তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল । আর্তকণ্ঠে মিনতি জানাল সে, মেহেরবানী করে বাঁচান আমাকে । এক দল জন্তুজানোয়ার তাড়া করেছে আমাকে । উফ্ কী সাংঘাতিক ব্যাপার । এত জন্তুজানোয়ার এল কোথা থেকে এ শহরে ?

বৃদ্ধ বললো, তোমার কোনও ভয় নাই, বেটা । তুমি স্থির হয়ে বসো এখানে । তারপর চল আমার বাসায় । খানাপিনা কর । তখন তোমাকে বলবো সব কাহিনী ।

দোকানের পিছন দিকে বৃদ্ধের বাড়ি । বাসিমকে নিয়ে এসে সে শোবার ঘরে বসালো । নফর খানা সাজিয়ে দিয়ে গেল । খেতে বসে বৃদ্ধ বাসিমকে বলতে থাকে, এই শহরের নাম যাদুপুরী । এখানকার শাসক এক যাদুকরী —বেগম সালমানখ । তার যাদুবিদ্যার কৌশল জগৎবিখ্যাত । আসলে সে এক দানবী ! নারীমূর্তি ধরে আছে এখানে । দারুণ কামুক । দুনিয়ার এমন কোনও বীর্যবান পুরুষ নাই, যে ওর কামক্ষুধা মেটাতে পারে । এই দ্বীপে যারা আসে তাদের মধ্য থেকে সুন্দর সুন্দর সেরা জোয়ানদের সে পাকড়াও করে আনে । যতক্ষণ তাদের ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ ধরে তাকে নিয়ে কামসম্ভোগ করে । তারপর নির্বীর্য হয়ে পড়লে মন্ত্র পড়ে জানোয়ার বানিয়ে ফেলে । এবং নিজেও সেই জাতের মাদী জানোয়ারের রূপ ধরে পাল খেতে থাকে । এইভাবে জানোয়ারও যখন তাগদহীন হয়ে পড়ে তখন আবার সে নারীমূর্তি ধারণ করে । কিন্তু জানোয়ারকে তার মানুষের চেহারা ফিরিয়ে দেয় না । তুমি যাদের তাড়া খেয়ে আমার দোকানে ঢুকেছিলে সেই জানোয়ারগুলো আসলে কেউ জানোয়ার নয় । সকলেই পরদেশী মুসাফির ! ঐ শয়তানীর খপ্পরে পড়ে আজ তাদের

এই দশা। ওরা চেয়েছিল, তুমি যাতে এই শহরে না ঢোকো। সেইজন্যে তাড়া করে সমুদ্রেই পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তুমি বুঝতে পারনি। ভয় পেয়ে সাপের গর্তের মধ্যেই ঢুকে পড়েছ। তোমার রূপ অসাধারণ। যৌবন অটুট তাগড়াই আছে। এই শয়তানী যাদুকরীটা তোমাকে দেখলে তার জিভে পানি ঝরবে। কিন্তু সাবধান কোনভাবেই তার কব্জায় পড়ো না। একেবারে ছোবড়া করে ফেলে দেবে।

অবশ্য আমিও একজন যাদুকর। এমন বিদ্যা জানি, ওই আলমানখকে সাতঘাটের পানি খাইয়ে দিতে পারি। কিন্তু নিজের যাদুক্ষমতা আমি কাজে লাগাই না। আমি সাচ্চা মুসলমান, নিত্য কোরান পাঠ করি। আল্লাহর নির্দেশ আছে অসৎ কাজে যাতে এই সব যাদুবিদ্যার ব্যবহার না হয়। সুতরাং সে রকম অনাচার আমি কিছু করতে পারি না। তা না হলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম ঐ যাদুকরীকে।

বৃদ্ধের কথা শেষ হতে না হতে সুবেশা সুন্দরী প্রায় এক হাজার মেয়ের একটা বাহিনী এসে বাড়ির দরজার সামনে দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এবং তার মাঝখান দিয়ে একটা আরবী তেজি ঘোড়ায় চেপে এসে দাঁড়ালো সেই বেগম আলমানাখ। তার পরণে চোখ ধাঁধানো জমকালো বাদশাহী সাজ-পোশাক।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে সে বৃদ্ধকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানালো।

সদর পেরিয়ে ছোট একখানা বসার ঘর। তার পাশেই বৃদ্ধের শোবার ঘর। একখানা কুর্শিতে বসে পড়ে আলমানাখ আড়চোখে বাসিমকে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছয়চল্লিশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

একটু পরে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে, আবদ অল রহমান সাহেব, এই খুবসুরত ছেলেটি কে?

বৃদ্ধ জবাব দেয়, আমার ভাইপো। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

—ভারি চমৎকার দেখতে আপনার ভাতিজা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে যায়। যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা রাতের জন্যে ওকে আমি আমার প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাই। আপনি বিশ্বাস করুন, কোনও রকম-খারাপ কাজ করবো না। শুধু নয়ন ভরে দেখবো ওর মনোহর রূপ। এক সঙ্গে বসে গল্পসল্প করবো, খানাপিনা, গান বাজনা করবো। ব্যস, এর বেশি আর কিছু করবো না। আপনি নিশ্চিন্তে একটা রাতের জন্যে আমার হাতে ছেড়ে দিন। সত্যি বলছি, আর কোনও কিছু করবো না। ছেলেটিকে দেখেই বড় ভালো লেগেছে। ওকে একটু প্রাণভরে দেখবো, এই আর কি!

আবদ অল রহমান বলে, দেখুন, আপনার হাতে ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি

নাই, কিন্তু আমার ভাইপোর ওপর কোনও যাদুবিদ্যা খাটাবার চেষ্টা করবেন না। তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। কারণ আপনাকে তো চিনতে আমার বাকী নাই!

—আরে না, না, আমি আপনাকে যখন কথা দিয়ে যাচ্ছি, ওসব খারাপ কিছু করবো না। এই নিন, আপনার সেলামী রইলো। ওকে দিন, আমি যাই।

এক হাজার মোহরের একটা থলে বৃদ্ধের সামনে রেখে বাসিমকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সে প্রাসাদে ফিরে এল।

প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করে বাসিম স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এমন অসাধারণ কারুকর্ম কোথাও সে দেখেনি। দরজা জানলাগুলো সব সোনার তৈরি। ঘরে ঢুকেই সে বাসিমকে নিয়ে পালঙ্ক-শয্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু না, আসুরিক কোনও কায়দা নয়, বেশ সোহাগ করেই ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলতে থাকে বাসিমকে। বাসিমের সমস্ত সত্তা ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে থাকে আল মানাখের সোহাগ শৃঙ্গারের যাদুতে। মেয়েটি কামকলায় ওস্তাদ। কী ভাবে মরুভূমিতেও ফুল ফোটাতে হয় সে কায়দা তার জানা।

বাসিম বৃদ্ধের কাছ থেকে পূর্বাহ্নেই সব জেনে নিয়ে ছিল। সেই কারণে নিজেকে সে কঠিন করে বেঁধে রাখার প্রাণপণ কসরৎ যে করে নি তা নয়, কিন্তু মেয়েটির আশ্চর্য রতিরঙ্গ ভঙ্গী এবং রীরংসা জাগাবার ছলা-কলার কাছে কোথায় সে-সব খড়কুটোর মতো ভেসে গেল।

আনন্দ যেমন সে লুটতে জানে, আনন্দ তেমনি সে দিতেও জানে। সে দেওয়ার কোনও কার্পণ্য নাই। দুহাত ভরে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া। দেহ প্রাণ মন ভরে গিয়ে উপচে উপচে পড়তে থাকে।

বাসিম ভেবে পায় না, এত আসন, এত ব্যসন, বিহার সে শিখলো কোথায়? যে কোন হীন বীর্য পুরুষও এই রতিসঙ্গ লাভ করলে সিংহের মতো তড়পে উঠবে।

পরদিন বাসিম নিজেই নড়লো না। তারপর দিনও সে আল মানাখের দেহ-পাশেই আবদ্ধ রয়ে গেল। মেয়েটি অবশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। মুখ টিপে হেসে ঠোনা মেরে বলেছিল, কী গো নাগর, এখনও তোমার আশ মিটলো না! আর কত মধু খাবে। এবার যাও তোমার বুড়ো চাচার দোকানে। তোমাকে না পেয়ে সে যে মূর্ছা যাবে।

—তা যাক, আমি তোমার কাছেই থাকবো—চিরকাল।

—চিরকাল? হা হা হা—চিরকাল? আহা, পুরুষদের কী আমার চিনতে বাকী আছে? একটা মেয়েতে কী তাদের চিরকাল চলে! দিনকয়েক পরেই আমাকে এঁটো-কলাপাতার মতো ছুঁড়ে দিয়ে অন্য মেয়ের ওড়না পাজামা খুলতে ছুটবে। আমি তোমাদের চিনি না?

—বিশ্বাস কর, যে রসের স্বাদ তুমি আমাকে দিয়েছ, জীবনে এর আগে কেউ দেয় নি। আমার বিশ্বাস এ বিদ্যার এত কলা অন্য কোনও মেয়ের জানাও নাই। তাই আমি তোমার কাছেই থাকবো চিরকাল। কোথাও যাবো না।

—দেখা যাক।

মেয়েটি মুচকি হেসে আবার সুরত রঙে মেতে উঠলো।

এইভাবে চল্লিশটা দিন, চল্লিশটা রাত মধুর আনন্দে কেটে যায়। বাসিম ভাবে এবার সে একটু অভিনয় দেখাবে আল মানাখকে। সন্ধ্যাকালে যথারীতি মেয়েটি কাছে এসে আদর সোহাগ আরম্ভ করে। কিন্তু বাসিম অনীহা দেখিয়ে বলে, আজ শরীরটা ভালো নাই গো, আজকের রাতটা রেহাই দাও।

আল মানাখ ঠোঁটের কোণে হাসে, শরীরের আর কী দোষ, বল। একনাগাড়ে কতদিন আর পারবে? ঠিক আছে, বিশ্বাস কর আর বিরক্ত করবো না তোমাকে।

বাসিম ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে।

রাত গভীর হলে মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের এক পাশ থেকে একটা পাত্রে খানিকটা বার্লি নিয়ে আসে। জল দিয়ে গুলে কাই করে তার মধ্যে আর একটা গুঁড়ো পদার্থ খানিকটা মিশিয়ে ঢেকে রাখে। তারপর আবার বাসিমের পাশে এসে শুয়ে পড়ে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বাসিম সোজা সেই বৃদ্ধের দোকানে আসে। সব ব্যাপার খুলে বলে তাকে। বৃদ্ধ বলে, শয়তানী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? ওর মরার পাখা গজিয়েছে। তোমাকে আমি একখানা পিঠে দিচ্ছি। এ-খানা নিয়ে যাও। ওখানে গিয়ে দেখবে, শয়তানীটা নাস্তা সাজিয়ে বসে আছে। এবং সেই নাস্তা-খাবারের মধ্যে এই রকম একখানা পিঠে দেখতে পাবে। ওই পিঠেখানা কিছুতেই খাবে না। ওর মধ্যে ওষুধ মিশিয়ে রেখেছে সে। খেলেই কিন্তু তুমি একটা গাধা হয়ে যাবে। এই পিঠেখানা কৌশল করে ওকে খাওয়াতে পারবে তো? তা হলেই বাজিমাৎ হয়ে যাবে। তোমাকে গাধা বানাতে গিয়ে সে নিজেই গাধা হয়ে যাবে। তখন তুমি ওর পিঠে চেপে সোজা চলে আসবে আমার দোকানে। তারপর যা করার আমি করবো।

বাসিম প্রাসাদে ফিরে এসে দেখে সামনের ফুলবাগিচার মধ্যে একটা টেবিলে খানাপিনা সাজিয়ে বসে আছে আল মানাখ। বাসিমকে দেখে সে বলে, কী ব্যাপার, কোথায় গিয়েছিলে এত সকালে?

বাসিম বলে, অনেক দিন চাচার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম, একবার দেখা করে আসি। তা চাচা পেট পুরে নাস্তা খাইয়ে দিয়েছেন। কী চমৎকার পিঠে বানাতে পারেন তিনি। আমি তো অনেকগুলো খেলাম। চাচা তোমার জন্যও একখানা দিলেন, খেয়ে দেখ।

বাসিম পিঠেখানা আল মানাখের হাতে তুলে দেয়। আল মানাখ বলে আমিও বানিয়েছি; আমারটা একবার খেয়ে দেখ দেখি, তোমার চাচার চেয়ে খারাপ হয়েছে কিনা।

নাস্তার রেকাবী থেকে একখানা পিঠে তুলে দেয় সে বাসিমের হাতে। বাসিমের বুঝতে অসুবিধে হয় না ওর কারসাজী। পিঠেখানার একটুকরো ভেঙে নিয়ে মুখে পোরার ছল করে কামিজের মধ্যে ফেলে দেয়। মিছি মিছি

করে এগাল ওগাল করে চিবুতে থাকে। আল মানাখও একটুকরো ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দেয়। এগাল ওগাল করে খেয়ে সে জলের গেলাস তুলে নিয়ে এক আঁজলা জল বাসিমের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বলতে থাকে, ওরে হাঁদা, কি খেয়েছিস, জানিস না, এইবার তুই গাধা হয়ে যা।

কিন্তু বাসিমের আকৃতির কোনও পরিবর্তন হলো না। আল মানাখ শিউরে ওঠে। তবে—তবে কী আমার যাদুবিদ্যা মিথ্যো হয়ে গেল ?

—হ্যাঁরে, বিশ্বাসঘাতক শয়তানী, মিথ্যেই হয়ে গেছে তোর ভেল্কিবাজী। এইবার দেখ আমার যাদুবিদ্যার ক্ষমতা।

এই বলে সে এক আঁজলা জল ছিটিয়ে দিল ওর গায়ে।

—আমাকে গাধা বানাতে গিয়েছিলি ? এবার তুই নিজে গাধা হয়ে যা।

সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরী গাধা হয়ে গেল। এবং বাসিমও ওর পিঠে চেপে সোজা চলে এল বৃদ্ধের ওষুধের দোকানে।

শেখ আবদ অল রহমান গাধারূপী আল মানাখকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়ে, এইবার বিশ্বাসঘাতিনী, তোকে আমি কি শিক্ষা দিই একবার দেখ।

এই বলে সে আল মানাখের মুখের ওপর একটা লাথি মারে। বাসিমকে বলে, বাবা, তোমাকে আর আটকাবো না। তুমি দেশে ফিরে যাও। তোমার মা দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। আমি আগে তোমার পেঁছবার ব্যবস্থা করছি। তারপর ঐ সব হতভাগ্য পরদেশী মুসাফিরগুলোকে আবার মানুষের রূপে ফিরিয়ে আনবো।

বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তেই সামনে এসে দাঁড়ালো এক আফ্রিদি জিন। অল রহমান বললে, এই শাহজাদাকে নিয়ে শ্বেতসহরে তার প্রাসাদে পেঁছে দাও।

জিন তার পিঠে তুলে নিল বাসিমকে। তারপর ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেল। তীরবেগে ছুটে চললো সে শ্বেতসহরের দিকে। একদিন এক রাত্রি ছুটে চলার পরে এসে পেঁছয় শ্বেতসহরের প্রাসাদ-চূড়ায়। সেখানে সে বাসিমকে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটচল্লিশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

বাসিম সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসে। দুঃখী মায়ের মুখে হাসি ফোটে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর সোহাগ করতে থাকে। দুচোখে ভরে ওঠে অশ্রু।

বাসিম দেখলো লোকস্ত এবং সালিহও এসেছে তার মা-এর কাছে। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালো সকলকে। তারপর মা-এর দিকে তাকিয়ে বললো, মা, জানারাকে শাদী করার ইচ্ছা আমি ত্যাগ করতে পারি নি। তোমরা যে ভাবে পার তার ব্যবস্থা কর।

সালিহ বললো, সে আর এমন কী কঠিন কাজ, মামু। জানারার বাবা সামানদাল আমার হাতে বন্দী হয়েছে। ওকে আমি তারই প্রাসাদের এক অন্ধকার কয়েদখানায় আটক করে রেখেছি। এখুনি নিয়ে আসছি এখানে।

তুড়ি বাজাতেই এক প্রহরী এসে দাঁড়ালো। সালিহ বললো, যাও পাতালপুরী থেকে সামানদালকে নিয়ে এস এখানে।

প্রহরী বিদায় নিল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শৃংখলিত সামানদালকে এনে দাঁড় করালো সে সালিহর সামনে।

সালিহ বললো, কী কেমন আছেন শাহেনশাহ!

—কেন আমাকে বিদ্রূপ করছো, সালিহ। তুমি আমার মসনদ অধিকার করে নিয়েছ, আমি তো এখন আর সুলতান নই, তোমার বন্দী মাত্র।

সালিহ বলে, আপনার সলতানিয়ত দখল করে ভোগ করার কোনও বাসনা নাই আমার। আপনার মসনদ আপনাকেই ফিরিয়ে দেবো। কিন্তু একটা শর্তে।

সামানদাল জানতে চায়, কী শর্ত?

—আপনার কন্যা জানারাকে শাদী করতে চায় আমার এই ভাগ্নে বাসিম। আপনি একে এর আগে স্বচক্ষে দেখেন নি। ভালো করে দেখুন তো, আপনার মেয়ের চাইতে কোন অংশে এ খাটো কিনা?

সামানদাল বলে, চমৎকার ছেলে। এমন জামাই পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আমি এখুনি রাজি। কিন্তু জানারাকে আনতে তো লোক পাঠাতে হবে। আমার প্রাসাদে সে নাই। তবে এটা ঠিক, ধারে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

সালিহ প্রহরীকে ডেকে বললো, জলদি যাও। যে ভাবে পার, সুলতান সামানদালের কন্যা জানারাকে খুঁজে পেতে এনে হাজির কর এখানে।

প্রহরী চলে গেল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে এল জানারাকে সংগে নিয়ে। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলো সামানদাল। আদর সোহাগ করে বললো, মা-জননী, এঁদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন বেগম লোকস্ত, এ হচ্ছে তাঁর ছেলে সালিহ, আমাকে বন্দী করেছে; আর এ তার ভগ্নী আনারকলি—এখানকার সুলতান বদর বাসিমের মা। এবং এই হচ্ছে সেই—

বাধা দিয়ে জানারা বললো, জানি বাবা, ইনি হচ্ছেন মহামান্য সুলতান বদর বাসিম। এঁর সংগে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে।

সামানদাল বললো, মা, আমি এদের জবান দিয়েছি—বাসিমের সংগে তোমার শাদী দেবো। আমি জানি, তুমি আমার ভীষণ অনুগত। আমার কথার খেলাপ হবে তেমন কাজ করবে না কখনও। বাসিম তোমার যোগ্যপাত্র হতে পারবে। রূপে গুণে শৌর্যে, বীর্যে ওর তুলনা নাই, আমার তো মনে হয় তোমরা দুজনে দুজনের যোগ্য।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ঊনপঞ্চাশতম রজনীতে

আবার সে কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

জানারা সলজ্জভাবে মাথা নিচু করে। বিনম্র কণ্ঠে বলে, আব্বাজান, আপনার কথা আমার কাছে হাদিশের বাণী। আপনি যখন ভালো বুঝেছেন, নিশ্চয়ই এ শাদী আমার পক্ষে শুভকর হবে। আমার কোনও দ্বিধা নাই। আপনি ব্যবস্থা করুন, আব্বাজান। আমি রাজি।

জানারার সম্মতি শোনার সংগে সংগে প্রাসাদের সকলে আনন্দ ধ্বনি করে ওঠে। তড়িৎ প্রবাহের মতো পলকে ছড়িয়ে পড়ে এই শুভ সংবাদ।

সন্ধ্যাকালে কাজী এবং সাক্ষী-সাবুদ এল। শাদীনামা তৈরি করল তারা। দারুণ জাঁকজমকের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেল জানারা-বাসিমের শাদী পর্ব।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে তাকায়। শাহরিয়ার বলে, ভারি সুন্দর তোমার কিস্সা, শাহরাজাদ। মন ভরে যায়। তোমার এই গল্প থেকে অনেক অজানা জিনিস জানলাম। অবশ্য দরিয়া আবদাল্লার কাহিনীও বহুৎ মজাদার ছিল। পানির নিচে যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেশ আছে তা তো আগে জানতাম না। আচ্ছা, শাহরাজাদ, শয়তান বদমাইশের গল্প শোনাবে দু একটা?

শাহরাজাদা বলে, নিশ্চয়ই শোনাবো।

এবং শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

কাইরোর সুবাদার আমির মহম্মদ এই কাহিনীটি বলেছিলেন ঃ

মিশরের উত্তরাঞ্চলে সফর করার কালে এক রাতে আমি এক জিলার সেরা চাষী—ফাল্লার অতিথি হয়েছিলাম। বয়সে তিনি প্রাচীন। এবং গাঢ় তামার মতো তাঁর গায়ের বর্ণ। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, তার ছেলেমেয়েরা সকলে ধবধবে ফর্সা। চিবুকে গোলাপী আভা। চোখ নীল এবং চুল হালকা নরম।

ফাল্লা সাহেব আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনার গায়ের রং তামাটে, কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েরা তো সব চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর?

তিনি সহাস্যে বললেন, ওদের মা ফ্রাংক দেশের মেয়ে। আমি তাকে এক যুদ্ধ বন্দিনী হিসেবে কিনেছিলাম। হিতিনের যুদ্ধে সালা অল দিন খ্রীস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করে পরাজিত করেছিলেন। সেই থেকে জেরুজালেম খ্রীস্টান-আক্রমণ মুক্ত হতে পেরেছে।

এসব অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন আমি সবে যৌবনে পা

দিয়েছি।

আমি বললাম, যদি মেহেরবানী করে শোনান সে কাহিনী—

—নিশ্চয়ই শোনাবো। সেই খ্রীস্টানদের সঙ্গে আমার দুঃসাহসিক অভিযান বড়ই আশ্চর্যজনক।

আপনি হয়তো জানেন, আমি একজন শন-চাষী। এটা আমাদের বংশগত ব্যবসা। আমার বাবা, আমার বাবার বাবা, সকলেই এই কাজ করে গেছেন। আমিও উত্তরাধিকার সূত্রে এই কাজ করি। ফাল্লা আমাদের পৈতৃক উপাধি।

এক বছর কপাল জোরে অনেক ভালো আবাদ হয়েছিল। শনের গাছগুলোর এমনই বাড়-বাড়ন্ত চেহারা হয়েছিল যে প্রায় পাঁচশো দিনারের ফসল ঘরে তুলতে পারলাম। কিন্তু বাজারে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। আড়ৎদাররা এমন দাম বলে যাতে বিক্রি করলে নাফা দূরে থাক, লোকসান হয়ে যায়। তারা বললো, তোমার শন নিয়ে সিরিয়ার একরে যাও। সেখানে গেলে ভালো দাম পেতে পার। ওদের কথায় আমি একর শহরে গেলাম।

এক সময় এই একর শহর ফ্রাঙ্কদের দখলে ছিল। যাই হোক, সেখানে যাওয়াতে মোটামুটি ভালোই বাণিজ্য হলো। মালের অর্ধেকটা দালালদের ছয় মাসের বাকীতে দিলাম। আর বাকী অর্ধেকটা খুচরো খদ্দেরের কাছে বেচে বেশ মোটা লাভ বানালাম।

একদিন আমার দোকানে এক খ্রীস্টান ফ্রাঙ্ক তরুণী এল। আমাদের মেয়েদের মতো ওরা বোরখা-টোরখা পরে না। লাজ-শরমের বালাই নাই, শরীরের আধ-খানাই খোলামেলা।

মেয়েটি সুদর্শনা, সুন্দরী এবং ধবধবে ফর্সা। প্রথম দর্শনেই আমার খুব ভালো লেগে গেল। যতক্ষণ সে আমার দোকানে বসেছিল, আমি শন ওজন করা এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম ওর দেহ-সৌষ্ঠব, মুখশ্রী, আয়ত চোখ। আজ বলতে লজ্জা নাই, ন্যায্য যা দাম হয় তার চেয়ে অনেক কম দামই নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। দোকান থেকে বেরিয়ে সে চলে যায়। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি—যতদূর চোখ যায়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বাহান্নতম রজনীতে

আবার কাহিনী শুরু করে সে :

এর কয়েকদিন পরে আবার সে এল। এবার আমি তাকে আরও সস্তা দরে মাল বেচলাম। মেয়েটি কিন্তু আদৌ দর-দাম করে না। আমি হিসেব করে যা বলি তাই সে দিয়ে চলে যায়।

এরপর আরও একবার এল সে। বুঝতে পারলাম, আমি যে ওকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখি সে ব্যাপারটা ওর চোখ এড়ায়নি। এবার সে একা আসেনি।

এক বৃদ্ধ রমণীকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

এই বুড়িটা আমার দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে কী যেন তল্লাস করে দেখতে থাকলো।

এরপর আরও কয়েকবার মেয়েটি এসেছে, আমার দোকানে। বলা বাহুল্য উদ্দেশ্য—শন কেনা। কিন্তু প্রতিবারই ঐ বুড়ি মেয়েছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

দিনে দিনে মেয়েটির প্রতি আমি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ি। বুকের মধ্যে হুহু করে পুড়ে যেতে থাকে।

একদিন বুড়িটাকে একান্তে ডেকে বললাম, মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতে পার? আমি তোমাকে খুশি করে দেবো।

বুড়িটা বলে, দেবো। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমি তুমি আর সে ছাড়া কাক-পক্ষীটি জানবে না এই গুপ্তমিলনের কথা।

আমি বললাম, আমার তরফ থেকে কোনও বেইমানী হবে না, কথা দিচ্ছি।

বুড়ি বললো, ঠিক আছে দিনক্ষণ ঠাঁই সব জানাবো তোমাকে। যথাসময়ে যথাস্থানে সঙ্গে কিছু পয়সা-কড়ি নিয়ে হাজির থেক, কেমন?

আমি বলি, আমি তৈরি আছি, তুমি ব্যবস্থাপত্র কর। পয়সা কড়ি আমার কাছে তুচ্ছ। আমি চাই ওর ভালোবাসা। তারজন্য যত টাকা লাগে আমি দু-হাতে খরচ করবো। আচ্ছা বুড়ি মা, তোমাকে কী দিতে হবে, বল। তোমারটা আগাম দিয়ে দিই।

সে বলে, ও নিয়ে বিশেষ ভাবনার কারণ নাই, বাছা। সে হবে'খন।

—না না, সে হয় না। এই নাও ধর, পঞ্চাশটা দিনার রাখ এখন।

আমি প্রায় জোর করেই ওর হাতে গুঁজে দিই টাকাটা। বুড়ি আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, তুমি একটু দাঁড়াও বাবা, আমি ওকে জিজ্ঞেস করে এসে বলছি।

বুড়িটা সুন্দরীর কাছে গিয়ে কী সব আলোচনা করলো, বলতে পারবো না। একটু পরে সে ফিরে এসে বললো, ওর কোন জানা জায়গা কোথাও নাই। একেবারে আনকোরা কুমারী মেয়ে। এ সবের মর্ম সে এখনও বোঝে না। তা বাবা তোমার বাড়িতেই ব্যবস্থা কর না কেন? সন্ধ্যাবেলায় দিয়ে যাবো ওকে, আর সকালবেলায় নিয়ে যাবো। আমার মনে হয়, সে-ই ভালো হবে।

আমি বললাম, তা হতে পারে। আমি তো একলাই থাকি, কোনও অসুবিধে হবে না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে আসবে—সেই রকমই ঠিক হলো। আমি সকাল সকাল দোকান-পাট বন্ধ করে মাংসের অনেক রকম দামি-দামি খানা, তন্দুরী, ফল, মিষ্টি এবং শরাব, গোলাপ জল নিয়ে বাসায় পৌঁছলাম। সব সাজিয়ে গুছিয়ে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

যথাসময়েই সে এল।

তখন গ্রীষ্মকাল। আমি ছাদের ওপরে ফরাস পেতেছিলাম। ওকে সঙ্গে

করে ওপরে নিয়ে গেলাম। পাশাপাশি বসলাম। দুজনে মিলে খানাপিনা করলাম। তারপর সুরার পেয়ালা পূর্ণ করে নিলাম আমরা।

আমার বাসাটা একেবারে সমুদ্র উপকূলে। সেদিন ছিল শুক্লপক্ষের শেষের দিকের এক তিথি। চাঁদের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ছাদে। সমুদ্রের জলে এক অপূর্ব স্বাদু লেগেছিল সেদিন। সেই মনোহর দৃশ্য আজও আমার চোখে ছবির মতো ভেসে ওঠে।

আমার মনের মধ্যে কী যেন তোলপাড় শুরু হয়। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, এই সুন্দর ধরণীতে আমি যেন এক অসুন্দর, অসুর। তা না হলে, আমি আল্লাহর দোয়াতে এই দুনিয়ায় এসেছি, তাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, অথচ তার বাণী আমি বিস্মৃত হয়ে এক বিধর্মী খৃস্টান কন্যাকে অঙ্কশায়িনী করার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছি। ছিঃ ছিঃ, ধিক আমাকে।

যদিও আমরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছিলাম তবু নিজেকে সংযত করে একটু সরে গিয়ে বললাম, এই চাঁদিনী রাত, মৃদুমন্দ হাওয়া, সমুদ্রের শোভা, শরাবের গুলাবী নেশা এবং তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য—এর বেশি আর কী কাম্য হতে পারে প্রিয়া। নাই বা হলো আমাদের দেহ-মিলন, আজকের মধু-যামিনী এমনি মধুর হয়েই কাটুক না।

মেয়েটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও হয়তো বুঝতে পারে না। আমার মতো একটি জোয়ান পুরুষের নিরালা সঙ্গ পাওয়ার পর তার মনের সুপ্ত নারী-সত্তা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল। সে আমি বুঝতে পারছিলাম। ক্রমশঃ সে উচ্ছল এবং প্রগলভ হয়ে উঠছিল। আমার গায়ে হাত রাখছিল। আমার মাথার চুলের মধ্যে বিলি কেটে আদর করতে করতে ওর মুখখানা অস্বাভাবিকভাবে নামিয়ে নিয়ে আসছিল আমার মুখের ওপর।

আমি ওকে আলতোভাবে সরিয়ে দিয়ে বললাম, আজ থাক সোনা। অন্য দিন হবে। আজ শুধু তোমাকে, চাঁদকে আর এই সমুদ্রকে নয়ন ভরে দেখি, কেমন?

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে সরে যায়।

সে রাতে আমি আর সে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েছিলাম বটে কিন্তু কেউ কারো কাছে ঘেঁষে আসিনি বা অঙ্গ স্পর্শ করিনি।

খুব সকালে ফ্রাঙ্ক-সুন্দরী ঘুম থেকে উঠে নিশঃব্দে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমি আমার দোকানে এসে বসলাম।

ঠিক দুপুরবেলায় মেয়েটি আমার দোকানের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। দেখলাম, ওর চোখের দৃষ্টিতে সাপিনীর ক্রোধ। এবার আমি আর নিজেকে সহজ সংযত করে রাখতে পারলাম না। মেয়েটির সারা চোখে মুখে অতৃপ্ত কামনার ক্ষুধা। আমাকে দেখে ফুঁসতে থাকে। তখন ওকে আরও অনেক অনেক বেশী সুন্দরী মনে হতে লাগলো। আমার সমস্ত দেহমন ওর সঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কাল রাতে হঠাৎ তুমি এত উদাস বিবাগী পীর মুসাফিরের মতো হয়ে গেলে কেন? তুমি না

কাইরোর ফাল্লা। ভোগ-বিলাস কামনা-বাসনা নিয়েই তোমাদের জীবন কেটেছে এতকাল। আজ হঠাৎ সাধু সন্ত বনে গেলে কী করে? তুমি প্রাসাদের খোজা নও। যৌবন-মদে মত্ত এক নওজোয়ান তুমি।

তবে শুধু শুধু নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে কেন?

মেয়েটিকে আর একবার কাছে পেতে হবে। তাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। নিজেরও কাম-ক্ষুধা মেটাতে হবে। এই রকমের একটা চিন্তা-ভাবনা ঘুরতে থাকলো মাথার মধ্যে। আমি ছুটে বাইরে গেলাম। বুড়িটাকে সঙ্গে করে মেয়েটি ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

বুড়িকে একপাশে ডেকে বললাম, হ্যাঁগো, বুড়িমা, আর একটা রাত ওর সঙ্গে কাটাবার ব্যবস্থা করে দাও।

বুড়ি বললো, তা দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু সে কী রাজি হবে?

আমি বুড়ির হাতে একশোটা দিনার গুঁজে দিয়ে বললাম। রাজী তাকে করাতেই হবে। অন্ততঃ আর একটা রাতের জন্য।

বুড়ির চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বললো, ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যাতেই নিয়ে যাবো।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় এল মেয়েটি। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে রাতেও চাঁদিনী রাতের ঐ কাব্যগন্ধময় মনোহর শোভা দেখে চিত্ত বিগলিত হয়ে গেল। দেহ মন থেকে উদগ্র কামনা উধাও হয়ে গেল। আমি পারলাম না। সেদিনও পারলাম না তাকে কাছে টেনে নিতে। পারলাম না ভোগ করতে তার দেহ-সুধা।

সে রাত্রিও কেটে গেল নিরামিষ ভাবে।

মেয়েটি, বুঝতে পারলাম, আমার এই রকম অদ্ভুত আচরণে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলো না। নীরবে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরদিন আবার সে যখন আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আবার তাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আশ্চর্য!

সে কিন্তু আমার দিকে বিষ-দৃষ্টিতে তাকালো। মনে হতে লাগলো, এখনি বুঝি পঞ্চশরে দগ্ধ করে দেবে আমাকে।

মেয়েটি আমার সামনে এগিয়ে ভুরু কুঁচকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বললো, প্রভু খ্রীস্টের নামে বলছি, ওগো মুসলমানের সন্তান, এই কী তোমাদের ধর্মের শিক্ষা? একটি নবযৌবন-উদ্ভিন্না কুমারী মেয়েকে পাশে শুইয়ে তসবী জপ কর তোমরা? আর কখনও ভেবো না, আমার দেখা পাবে।

নিরুপায় হয়ে আমি বুড়ির শরণাপন্ন হলাম। সেও দাঁও বুঝে কোপ বসালো। বললো, এবার পাঁচশোর কমে হবে না বাছা।

বুড়ি আর দাঁড়ালো না। মেয়েটিকে নিয়ে হন হন করে চলে গেল।

আমার বুকে তখন কামনার আগুন ধকধক করে জ্বলছে। যে ভাবে হোক ওকে ভোগ করতে হবে, এই আমার তখন একমাত্র চিন্তা। পাঁচশো দিনার

আমার কাছে অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও টাকা পয়সার কথা চিন্তা না করে একটা থলের পাঁচশোটা দিনার ভরে ছুটে যাবো বাড়ির কাছে, হঠাৎ এমন সময়…

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো শাহরাজাদ।

পাঁচশো তিপ্পান্নতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

আমি শুনতে পেলাম, সুলতানের আমির সনদ ঘোষণা করে চলেছে, শোনও মুসলমান ভাই সব, যারা আমাদের শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন—অবিলম্বে তাদের দোকান-পাট গুটিয়ে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ ব্যাপারে মাত্র এক সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করা হচ্ছে।

আমার সব কামনা বাসনা মাথায় উঠলো। তড়িঘড়ি মাল যা ঘরে ছিল সব বেচে সাবাড় করতে লাগলাম। দালালদের বললাম, আমার পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দাও তোমরা, আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।

টাকা পয়সা যা আদায়, বিক্রি হলো তা দিয়ে নানারকম জিনিসপত্র সওদা করলাম। আমাদের দেশে সেগুলো বেচে লাভ হবে।

সাতদিনের মাথায় একর শহর ত্যাগ করে দেশের পথে রওনা হলাম। মন ভারাক্রান্ত ছিল, কারণ আমার একমাত্র কামনা—সেই খ্রীস্টান মেয়েটির সঙ্গে সহবাস আর হল না।

প্রথমে আমি দামাসকাসে এলাম। সেখানকার বাজারে বেশ ভালো মুনাফায় অনেক জিনিসপত্র বেচলাম। এত মোটা লাভ আমি আশা করিনি। কিন্তু যুদ্ধের দামামা বাজছে। অন্য দেশ থেকে মালপত্রের আমদানি ছিল কম। সেই কারণে আমার মাল আশাতীত চড়া দামে বিকিয়ে গেল। অবশ্য সবই খোদার দোয়া। তা না হলে যে কাজেই হাত দিই, সোনা ফলে কেন?

সে সময় একটা জব্বর ব্যবসায়ে নেমে পড়লাম। মোটা লাভ। যুদ্ধে যে সব খ্রীস্টানরা বন্দী হতো, তাদের নিলামে তুলে বিক্রী করে দিত সরকার। আমি এই নিলাম ডাকতে শুরু করলাম। নতুন জাতের ব্যবসা। অনেকেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকলো। কিন্তু আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছি তখন। লাভ হোক, লোকসান হোক, ছাড়বো না!

লোকসান দূরে থাক, লাভের অঙ্কের কোনও সীমা সংখ্যা রইলো না। এক একটা চালান পানির দরে কিনি। আর তার এক একজন বন্দীকে বিক্রি করে কেনা দামের দশগুণ উঠে আসে। যুদ্ধের ভয়ে অনেক বড় মহাজন শহর ছেড়ে পালিয়ে গণ্ডগ্রামে চলে গিয়েছিল। আমার পক্ষে সুবিধে হলে সেই। কারবারে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে তবে যা খুশি দাম হেঁকে মাল বেচা সম্ভব। আমারও হলো তাই। আমি সর্বেসর্বা। আমার ওপরে টেক্কা দিয়ে নিলাম ডাকার মতো মক্কেল মহাজন তখন সারা দামাসকাসে কেউ ছিল না।

এইভাবে পুরো তিনটি বছর দুহাতে কামিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমার মনে সেই খ্রীস্টান মেয়েটির স্মৃতি অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিল।

আমাদের সুলতানের বিক্রমের কাছে খ্রীস্টান ফ্রাংকরা দাঁড়াতে পারলো না। ফ্রাঙ্ক-কবলিত জেরুজালেম এবং সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল অধিকার করে নিলেন। ফ্রাংকরা প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে সুলতান বাহিনীর হাতে বন্দী হতে লাগলো। আর যত বন্দী আসে, ততই আমার পোয়া বারো। জলের দামে কিনে সোনার দামে বেচা।

একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটলো। একটি সুন্দরী বাঁদী সংগ্রহ করে সুলতানকে ভেট দিতে তার তাঁবুতে গিয়েছি। বাঁদীটিকে সুলতানের বেশ পছন্দ হয়ে গেল। খুশি হয়ে তিনি আমাকে একশো দিনার বকশিশ দিতে বললেন তার উজীরকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই লড়াই ক্ষেত্রের খাজাঞ্চীখানায় সেদিন একশোটি দিনারও পুরো ছিল না। প্রতিদিন যুদ্ধের খরচ এলাহী। প্রাসাদ থেকে রোজই টাকা আসে। রোজই সব খরচ হয়ে যায়। যাই হোক, উজির বললেন, তহবিলে মাত্র নব্বইটা দিনার আছে।

সুলতান বিচলিত বোধ করলেন, ঠিক আছে, ঐ নব্বইটা দিনারই দিয়ে দাও একে। আর আমার যুদ্ধবন্দীদের খোয়াড়ে নিয়ে যাও।

সুলতান আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ঐ বাকী দশ দিনারের জন্য যে কোনও একটি বাঁদী পছন্দ করে, নিয়ে যাও তুমি।

এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সুলতানের জবান থেকে বেরিয়েছে, আমাকে একশো দিনার দিতে হবে। সে কথার খেলাপ হবে কী করে?

প্রহরী আমাকে বন্দী খোঁয়াড়ে নিয়ে গেল। খোঁয়াড়টা দুইভাবে বিভক্ত। একদিকে মেয়ে আর একদিকে পুরুষদের আটক করে রাখা হয়েছে। আমাকে সে নিয়ে গেল মেয়েদের খোঁয়াড়ে। হাজারখানেক বন্দিনী—আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি, হঠাৎ নজর পড়লো, সেই ফ্রাঙ্ক-সুন্দরীর ওপর। ওর সংগে আমি দুটি অ-সহবাস রাত্রি কাটিয়েছিলাম একদা। খুব চেনা মুখ, প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম। বুকের মধ্যে পুরোনো ক্ষতটা টনটন করে উঠলো।

একর শহর ছেড়ে চলে আসার পর সে এক খ্রীস্টান সেনাপতির অঙ্কশায়িনী হয়েছিল। ওকে দেখার সংগে সংগে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে প্রহরীকে বললাম, এই মেয়েটিকে আমি নেব।

মেয়েটির নাম ড্যামজেল। ওকে সংগে নিয়ে আমার তাঁবুতে ফিরে এলাম।

—আমাকে চিনতে পার?

ড্যামজেল ঘাড় নাড়ে, না। আমি চিনতে পারছি না।

—কেন মনে পড়ছে না, তুমি আমার দোকানে যেতে সওদা করতে। তোমার সংগে এক বুড়ি থাকতো। এক শহরের সমুদ্র উপকূলের এক ভাড়াবাড়িতে আমি থাকতাম। পরপর দুটি রাত্রি তুমি আমাকে সংগ-সুখ দিয়েছিলে, মনে নাই? অত কাছে নিভৃতে পেয়েও আমি কিন্তু তোমার কুমারীত্ব নষ্ট করিনি সেদিন। এবং সেই কারণেই বোধ হয় তুমি আমার ওপর ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলে। তবে বিশ্বাস কর, তৃতীয় রাতেও তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে

আসতাম আমি। আমার ইচ্ছে ছিল, সেই রাতে আমি তোমার দেহ-সম্ভোগ করবো। তোমার বুড়ি আমার কাছে পাঁচশো দিনার সেলামী চেয়েছিল। দেবার জন্যে তৈরিও হয়েছিলাম। কিন্তু নসীব খারাপ, সেইদিনই সরকারের হুকুম জারী হলো, বিদেশী মুসলমান সওদাগরদের ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং মনের খেদ মনেই রয়ে গেল। আর তোমার সঙ্গে মিলতে পারলাম না। সেদিন একটা রাতের জন্য পাঁচশো দিনারও দিতে তৈরি ছিলাম, কিন্তু কপাল দোষে পাইনি। আজ কিন্তু সামান্য দশটা দিনারের বিনিময়ে তোমাকে চিরকালের মতো লাভ করেছি, ড্যামজেল! এখন থেকে তুমি আমার।

ড্যামজেল মাথা নিচু করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, সেদিন আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছ তোমার বাসায় আর কেনই বা নিজে অভুক্ত থেকে আমাকে উপবাসী রেখে বিদায় করে দিচ্ছ—ঠিক বুঝতে পারিনি তখন। আমি রুষ্ট হয়েছিলাম তোমার ওপর, কিন্তু পরে বুঝেছি। ইসলামের নির্দেশ তোমাকে ঐ ব্যভিচার করতে দেয়নি। সেই থেকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছে। এখন আমি মনে-প্রাণে পয়গম্বর মহম্মদের বাণীই গ্রহণ করে নিয়েছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কোনও মহান্ শক্তির অস্তিত্ব নাই।

খোদা কসম, সেই রাতেও আমি তাকে শয্যা সঙ্গিনী করতে পারলাম না। কারণ সে তখনও আমার কেনা বাঁদী। বিধিমতে আগে তাকে মুক্ত করতে হবে। তারপর ইসলাম-ধর্মমতে আমি শাদী করতে পারবো তাকে।

এরপর কাজী ও সাক্ষী-সাবুদ ডেকে ড্যামজেলকে আমি শাদী করেছিলাম। আমার ঔরসে সে গর্ভবতী হলো। আমরা দামাসকাসে পাকাপাকি বসবাস করতে থাকলাম।

আমাদের শাদীর বেশ কিছুকাল পরে একদিন ফ্রাঙ্কের সম্রাটের দূত এল আমাদের সুলতান সালা-অল-দিনের দরবারে। যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। কতকগুলো শর্তে সন্ধি হয়েছিল দুই পক্ষের। সেই সূত্রেই দূত এসেছিল। উদ্দেশ্য যুদ্ধবন্দী বিনিময় চুক্তি হবে।

আলোচনায় সাব্যস্ত হলো, ফ্রাঙ্কের সমস্ত নারী-পুরুষ বন্দীদের ফেরত দেওয়া হবে। অবশ্য ফ্রাঙ্ক-সম্রাটও সমস্ত মুসলমান বন্দীদের ওয়াপস করে দেবে।

সুলতানের সেনাপতি একখানা ফর্দ দিল। যাবতীয় বন্দীদের নাম-ধাম পরিচয় ছিল সেই ফর্দে। দূত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকলো সব। কিছুক্ষণ পরে সে বললো, কিন্তু এই ফর্দে তো একটি রমণীর নাম নাই। সে রমণী আমাদের এক সেনাপতির সহধর্মিণী। তাকে তো চাই।

সুলতান প্রহরীদের বললেন, দেখ, সে কোথায় গেল। খুঁজে-পেতে নিয়ে এস তাকে।

প্রহরীরা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আমার গৃহে এসে তার সন্ধান পেল।

সুলতানকে সব ব্যাপারটা জানিয়ে আবার যখন তারা আমার কাছে ফিরে এল, আমি ততক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়েছি। আমার বিবি অবাক হয়ে আমার পিঠে হাত রাখে, কী, হয়েছে কী? তোমার চোখে পানি কেন?

আমি সব বললাম তাকে।

—সুলতানের পেয়াদা এসেছে। তোমাকে নিয়ে যাবে তারা।

ড্যামজেল বললো, পেয়াদাদের যেতে বল, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল দরবারে। তারপর সুলতানকে যা বলতে হয়, আমি বলবো।

বোরখা পরিয়ে ওকে নিয়ে গেলাম সুলতানের দরবারে। সুলতানের এক পাশে বসেছিল ফ্রাঙ্ক-সম্রাটের দূত।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুয়ান্নতম রজনী:
আবার সে গল্প শুরু করে:

আমি কুর্নিশ করে দাঁড়ালাম।

—এই সেই নারী, জাঁহাপনা!

সুলতান আমার বিবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী বলার আছে? এই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তুমি কী তোমার স্বদেশে ফিরে যেতে চাও? না, যেমন আছ তেমনি তোমার স্বামীর সঙ্গে এখানে ঘর করতে চাও?

—আমি আমার স্বামীর সঙ্গেই থাকতে চাই, জাঁহাপনা। তাঁর সন্তান আমার গর্ভে আছে। এবং আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাকে বিধি-সম্মত ভাবে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। এখন আমি আর খ্রীষ্টান নই আর সেখানে আমার ফিরে যাওয়ারও কোন অভিপ্রায় নাই।

সুলতান সালা-অল-দিন ফ্রাঙ্ক-রাষ্ট্রদূতকে উদ্দেশ করে বললেন, তা হলে সবই শুনলেন। এখন আপনি যদি মনে করেন, ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করে দেখতে পারেন।

সুলতান যেভাবে প্রশ্ন করলেন, ঠিক সেইভাবে ফ্রাঙ্ক-রাষ্ট্রদূত, আমার বিবিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি তোমার বর্তমান মুসলমান স্বামীর কাছেই থাকতে চাও? না, তোমার খ্রীস্টান স্বামীর কাছে আবার ফিরে যাবে?

—আমি এই মিশরীয়কে ছেড়ে কোথাও যাবো না। এখন আমি আর খ্রীস্টান নই। ইসলাম ধর্মমতে দীক্ষা নিয়েছি।

রাষ্ট্রদূত গর্জে উঠলেন, ঠিক আছে। আমার যা জানার, জানা হয়ে গেছে। এবার তুমি যেতে পার।

বিবিকে নিয়ে আমি দরবার থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে যাচ্ছি, এমন সময় রাষ্ট্রদূত আমাকে ডাকলো, একর শহরে যে বুড়িটার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল, সে তোমার বিবির মা। এই মোড়কটা তোমাকে দেবার জন্য পাঠিয়েছে আমার হাতে।

আমি হাত পেতে সেই মোড়কটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। খুলে দেখি,

ড্যামজেলের পুরনো ব্যবহৃত কিছু সাজ-পোশাক। আর একখানি রুমালের এক কোনায় পঞ্চাশ এবং অপর কোনায় একশোটা দিনার বাঁধা।

আমার কাছে সব ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেল। তার কন্যার প্রতি আমি যে মর্যাদা দেখিয়েছিলাম এবং এখনও যে মর্যাদা তাকে দিয়েছি তারই কৃতজ্ঞতা এবং আশীর্বাদই জানিয়েছে সে।

এরপর দামাসকাস ছেড়ে আমরা মিশরে চলে এলাম। তারপর কতকাল কেটে গেছে। ড্যামজেল এক এক করে আমার ঔরসের অনেকগুলো সন্তানের জননী হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তারা সকলেই আমার বিবির রং পেয়েছে।

এই আমার জীবনের কাহিনী, খোদা হাফেজ।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে। সুলতান শাহরিয়ার মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে, কাল্লার মতো ভাগ্যবান সুখী মানুষ কম আছে, শাহরাজাদ।

কিন্তু তার চেয়েও সুখী এবং ভাগ্যবান লোকের কাহিনী আপনাকে শোনাবো।

—কী কাহিনী?

এক জেলে খলিফা, এক সামুদ্রিক বাঁদর আর এক খলিফার কাহিনী শুনুন তাহলে ঃ

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

কোনও এক সময়ে বাগদাদে খলিফা নামে এক জেলে বাস করতো। এমনই তার দীন-হীন অবস্থা যে, সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও শুধুমাত্র নিজের উদরান্নের সংস্থান করতে পারতো না। এই কারণে সে ভয়ে শাদী নিকা কিছুই করার দুঃসাহস করেনি। একজনেরই রুটি জোগাড় হয় না, সেখানে বিবি বাল-বাচ্চাদের মুখে সে খাবার দেবে কোথা থেকে! তার মতো দুঃস্থ অসহায় অবস্থা তার পড়শীদের কারুরই ছিল না।

রোজ সাত-সকালে সকলের আগে জাল কাঁধে করে সে নদীতে যায়। সকলের চেয়ে বেশিবার জাল ফেলে। কিন্তু এমনই বরাত, সকলের চেয়ে কম মাছ সে তুলতে পারে।

এই রকম একদিন, নদীতে দশ দশবার জাল ফেলেও একটা চুনো-পুঁটি তুলতে পারলো না। রাগে দুঃখে হতাশায় নদীর উপকূলে বসে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকলো সে।

—হায় আল্লাহ, একবার অভাগার দিকে মুখ তুলে তাকাও। তুমি ছাড়া যে এ-জগতে আর কোনও ভরসাই নাই আমার। তুমি তো তোমার সৃষ্টি সব

প্রাণীকে আহার যোগাও। তবে আমার ওপর এত নির্দয় হবে কেন ?

এইভাবে অনেকক্ষণ হা হুতাশ করার পর আবার সে বুকে ভরসা নিয়ে জাল ফেললো। একটুক্ষণ পরে জাল গোটাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। দারুণ ভার বোধ হচ্ছিল। ভাবলো, এতদিনে আল্লাহ বোধহয় মুখ তুলে তাকিয়েছেন! বেশ তাগদ খাটিয়েই জালখানা ওপরে তুলতে পারলো সে।

খলিফা অবাক হয়ে দেখলো, না কোনও মাছ নয়, একটা কানা খোঁড়া বাঁদর উঠে এসেছে মাত্র।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো পঞ্চান্নতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

খলিফা কপাল চাপড়াতে থাকে, এই কী তোমার বিচার হলো মালিক! মাছের বদলে একটা কানা-খোঁড়া বাঁদর বরাদ্দ করে পাঠালে আমার জন্য ?

একখানা রশি দিয়ে বাঁদরটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে বেধড়ক প্রহার করতে লাগলো সে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে সে বলে ওঠে, আমাকে মেরো না জেলের পো, আমাকে এমন করে মেরো না। তুমি আমার কথা শোন, আর একবার জাল ফেল। দেখবে, আল্লাহ তোমার আজকের রুটির ব্যবস্থা করে দেবেন।

এক-চক্ষু খঞ্জ সেই বাঁদরের কথায় জেলে আবার জাল ফেলে জলে।

এবারে জালটা আরও বেশি ভারি বোধ হয়। অনেক কষ্টে সেবারও জালখানা ওপরে তোলে সে। আর কী আশ্চর্য, এবারও আর একটা বাঁদর। কিন্তু এ বাঁদরটা খোঁড়াও না, কানাও না। দেখতে খুবই সুন্দর। কাজল কালো টানা-টানা চোখ, সুন্দর থ্যাবড়া নাক, দাঁতগুলো ঝকঝকে, সাদা মুক্তোর মতো। ওর গায়ে ছিল লাল সাদা ডুরি কাটা একটা কুর্তা। হাতে ছিল সোনার বালা। কানে ছিল দুল। এবং পায়ে ছিল সোনার ঘুঙুর। বেশ সুন্দর করে হাসছিল সে। এবং আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল জেলেকে।

খলিফা দাঁতে দাঁত চেপে স্বাগতভাবে বলে, আজ দেখছি বাঁদরেরই দিন। আল্লাহ কী পানির সব মাছকেই এই রকম সব বাঁদর বানিয়ে রেখেছেন ?

এ বাঁদরটাকেও সে আগের মতো রশি দিয়ে গাছের গুঁড়িতে বেঁধে প্রথম বাঁদরটাকে তেড়ে বলল, ওরে শয়তান, তোর কথাতেই আমি আবার জাল ফেললাম। তা মাছের বদলে আর একটা বাঁদর ? এবার তোকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবো।

প্রথম বাঁদরটা বলে, আচ্ছা আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। তুমি ঐ বাঁদরটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখ না, ও কী বলে ? আমার মনে হয়, আমাকে পেটালে তোমার পেট ভরবে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বললে আখেরে তোমার ভালোই হবে।

প্রথমটাকে ছেড়ে দিয়ে সে দ্বিতীয়টার কাছে এসে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বাঁদরটা সহাস্যে স্বাগত জানায় জেলেকে।

খলিফা ওকে ধমক দেয়, এত হি হি করে হাসার কী আছে? থামো। বল, কী বলতে চাও?

দ্বিতীয় বাঁদর বলে, আমাকে তুমি চেন, খলিফা?

—না, জানি না। কিন্তু আমার কথার যদি জবাব না দাও, এই চাবুক তোমাকে সব জানিয়ে দেবে।

বাঁদর বলে, আহা অত গোসা করছো কেন? অমন কড়া কড়া কথা বলে কী ফয়দা? তার চেয়ে এস আমার কাছে। আমার কথা মন দিয়ে শোন, অনেক লাভবান হতে পারবে।

খলিফা চাবুকটা ফেলে দিয়ে বলে, বেশ বল। আমি তোমার সব কথাই শুনতে চাই।

বাঁদরটা বলে, এর আগে আমি এক ইহুদীর কাছে ছিলাম। এখনও সে-ই আমার মনিব। লোকটা সুদে টাকা খাটায়। তার কাছে থাকার সময়ে তার ব্যবসার খুব বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল। প্রতিদিন সে আমার মুখ দেখে দোকান খুলতো। এবং আমার মুখ দেখেই আবার দোকান বন্ধ করতো। লোকে বলে, বাঁদরের মুখ দেখলে নাকি অযাত্রা—অশুভ হয়। কিন্তু আমার মনিবের তো ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভালোভাবেই চলছে। যাই হোক, তোমার নসীবটা একবার পরীক্ষা করে দেখ, আমাকে দিয়ে তোমার বরাত কিছু খোলে কিনা।

—এক কাজ কর, বাঁদরটা বলতে থাকে। আমাকে জালে জড়িয়ে তুমি আর একবার জাল ফেল জলে। দেখ কী ওঠে।

জেলে বললো, বেশ তাই করছি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

পাঁচশো ছাপান্নতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

বাঁদরটা যেভাবে বললো, খলিফা সেইভাবে জাল ফেলে।

এবার তার ভাগ্যে একটা বিরাট মাছ ওঠে। তার গায়ের রং রুপোলী। চোখ দুটো ঠিক যেন দুটো সোনার মোহর।

বাঁদরটা বলে, দেখলে তো আমি কেমন পয়া? যাই হোক, একটা বড়সড় ঝুড়ি নিয়ে এস। নিচে কিছু পাতা বিছিয়ে মাছটা ভরে নিয়ে বাগদাদ শহরে যাও। আমার কথা যদি বিশ্বাস না কর তবে যাওয়ার আগে আমাদের দুজনকে বেঁধে রেখে যাও এই গাছের গুঁড়িতে। পথে যেতে যেতে যদি কোনও লোক জিজ্ঞেস করে কী মাছ পেয়েছ আজ, কোনও জবাব দেবে না।

সোজা চলে যাবে স্যাকরা বাজারে। সেখানে জহুরী সাদার দোকান আছে। লোকটা ইহুদী—সুদখোর। স্যাকরা বণিক-সভার শাহবানদার সে। তাকে বলবে, আপনার নাম করে জাল ফেলেছিলাম। আল্লাহ আমাকে এই মাছটা

দিয়েছেন। তুমি যখন ঝুড়ি থেকে বের করে মাছটা তাকে দেখাবে, সে জিজ্ঞেস করবে, 'আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখিয়েছ এ মাছ?' তুমি বলবে, খোদা কসম, কাউকেই দেখাইনি। তখন সে দাম হিসাবে তোমাকে একটা দিনার দিতে যাবে। তাও নেবে না। এইভাবে সে দাম বাড়াতে বাড়াতে যদি বলে, 'মাছটাকে সোনা দিয়ে ওজন করে দিচ্ছি,' তাও নেবে না তুমি। তখন সে জিজ্ঞেস করবে 'তাহলে কী নেবে?' তখন তুমি বলবে, 'পয়সা-কড়ি কিছুই চাই না, মালিক। কয়েকটা কথার বিনিময়ে আপনাকে দিতে পারি এই মাছটা।' সে বলবে, 'কী কথা?' তখন তুমি বলবে 'আপনি উঠে দাঁড়িয়ে বলুন, আপনারা সবাই সাক্ষী, আমি আমার বাঁদরটা এই জেলে খলিফার বাঁদরের সঙ্গে বদল করে নিলাম।'

ব্যস, এই তোমার মাছের উপযুক্ত দাম হবে। এরপর আমি তোমার সম্পত্তি হয়ে যাবো। এবং আমার কপালেই তোমার কপাল ফিরে যাবে। প্রতিদিন তুমি জাল ফেলে যা মাছ পাবে, বিক্রি করে একশো দিনার সংগ্রহ করতে পারবে। এবং দেখবে, দিনে দিনে তুমি ধনী হবে এবং ঐ ইহুদী গরীব হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে এমন একদিন আসবে, তখন তুমি হবে বাজারের সেরা বণিক, আর সে কপর্দকহীন হয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে।

বাঁদরটা বললো, যা বললাম, ভালো করে খেয়াল রেখ, তাহলে তোমার সৌভাগ্য কেউ নিতে পারবে না।

জেলে বললো, ঠিক আছে, তোমার কথামতোই কাজ করবো। কিন্তু এখন এই কানা-খোঁড়া বাঁদরটাকে কী করবো? ছেড়ে দেব?

দ্বিতীয় বাঁদর বলে ঠিক আছে, আমাদের দুজনকেই তুমি ছেড়ে দিয়ে যাও। আমরা এই জলেই থাকবো।

খলিফা ওদের দুজনকে খুলে দিতেই ওরা জলে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাছটাকে ভালো করে ধুয়ে ঝুড়িতে ভরে মাথায় তুলে বাজারের পথে গান গাইতে গাইতে চলে সে।

পথে অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। সবাই চেনা জানা। তারা সকলেই জানে, লোকটা একেবারে অপয়া। সারাদিনে একটা ভালো মাছ ধরতে পারে না। কেউ কেউ রসিকতা করে জিজ্ঞেস করে, কী গো, জেলের পো, আজ দেখি প্রাণে বসন্ত জেগেছে! তা রুই-টুই কিছু তুলেছ বলে মনে হচ্ছে?

কিন্তু খলিফা কোনও জবাব দেয় না। গান গাইতে গাইতে সে সোজা চলে আসে ইহুদী জহুরীর দোকানে।

জহুরী বসেছিল নফর চাকর পরিবৃত হয়ে বাদশাহী কেতায়। পরনে তার মহামূল্যবান সাজ-পোশাক। যে আসনটায় বসেছিল তা দেখতে প্রায় তখত-এর মতো—অত্যন্ত দামী, বাহারী। দেখে মনে হয়, যেন কোথাকার নবাব বাদশাহ।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতান্নতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

খলিফাকে দেখে স্বাগত জানালো ইহুদী, আরে এস এস, কী ব্যাপার! কী মাছ পেয়েছ, আজ? রাতে স্বপ্ন দেখেছি, বিরাট একটা মাছ ধরে আনা হয়েছে বাড়িতে।

খলিফা বলে, আজ সকালে আপনার নাম করে জাল ফেলেছিলাম। তা জালে আল্লাহর দোয়ায় উঠেছে একটা পেল্লাই মাছ। এই দেখুন।

ইহুদী দেখে খুশি হয়ে বলে, বাঃ, তোফা। এই নাও, দামটা রাখ।

একটা দিনার দিতে যায় সে। কিন্তু খলিফা বলে, না মালিক ওতে হবে না।

—আচ্ছা এই নাও দু দিনার।

—না ওতে হবে না?

—তিন দিনার?

—না।

—দশ?

—না, ওতেও দিতে পারবো না।

—আচ্ছা, বাবা তুমি কী চাও? সোনা দিয়ে মেপে দেব?

জেলে বলে, মাফ করবেন জনাব, টাকা-পয়সার বিনিময়ে এ মাছ আমি বিক্রি করতে পারবো না।

ইহুদী জহুরী অবাক হয়ে বলে, তবে? কী চাও তুমি?

—জী, আমাকে একটা কথা দিতে হতে?

—কী কথা বল?

জেলে বলে, আপনার যে বাঁদরটা আছে, ঐ বাঁদরটা আমি নেব। তার বদলে অবশ্য আমার একটা বাঁদর আপনাকে দেব। আপনি রাজি থাকেন তো বলুন?

—বড় অদ্ভুত প্রস্তাব! ঠিক আছে তাই হবে।

খলিফা বলে, না, ওভাবে বললে হবে না। আপনার দোকানের এইসব খদ্দের কর্মচারী এদের সামনে হলফ করে বলুন যে, আমার বাঁদরটার সঙ্গে আপনার বাঁদরটা বদলা-বদলী করে নেবেন।

ইহুদী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এই যে, শোন ভাইসব, আমি এই জেলে খলিফাকে কথা দিচ্ছি, আজ থেকে ওর বাঁদরের সঙ্গে আমার বাঁদরটা বদল করে নেব।

জেলে সঙ্গে সঙ্গে মাছটা ইহুদীর দোকানে নামিয়ে দিয়ে খালি ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে আবার নদীর ধারে ফিরে আসে। মনে মনে ভাবে বাঁদরটাকে সব কথা বলা দরকার। জাল ফেলে সে। ভাবে নিশ্চয়ই সে উঠে আসবে। জালটা ভারিও বোধ হতে থাকে। টেনে তুলতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, জালে বাঁদরটা উঠে আসেনি, তার বদলে উঠেছে অজস্র ভালো ভালো মাছ। সারা জালটা রুপোর মতো ঝকমক করতে থাকে।

নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল একটা মেয়ে। জেলের কাছে এগিয়ে এসে একটা মাছ দরদাম করে এক দিনার দিয়ে কিনে নেয়। একটু পরে আরও কয়েকজন পথচারী দাঁড়িয়ে পড়ে। তারাও কিনে নেয় খানিকটা। এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে বেজায় ভিড় জমে যায় সেখানে। সবাই তাজা মাছের সন্ধানে এসেছিল। ভালো দামেই সব মাছগুলো অল্পক্ষণের মধ্যে বিকিয়ে যায়। খলিফা গুণে দেখলো, ঠিক একশো দিনার হয়েছে।

মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে আসে খলিফা। বহুকাল পরে আজ তার খুশির সীমা নাই। একটা নয় দুটো নয় একশোটা সোনার দিনারের মালিক সে। এইভাবে প্রতিদিন জাল ফেলে সে একশো দিনার পাবে। ওরে বাপস্! সে কত টাকা হয়ে যাবে তার? অত টাকা সে রাখবে কোথায়?

খলিফা আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে থাকেঃ এইভাবে আমি অনেক বড় লোক হয়ে যাবো একদিন। বিরাট ইমারত, দাস-দাসী খ্যাতি মান সব হবে আমার। কত লোক আমার কাছে আসবে সাহায্যের জন্য! আমি অবশ্য কাউকেই ফেরাবো না। আহা, লোকে অভাবে পড়েই না হাত পাতে। যার যা দরকার সবাইকে খুশি করে দেব।

সবচেয়ে মজার হবে, স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ আসবেন আমার কাছে টাকা ধার করতে। তিনি এসে বলবেন, খলিফা সাহেব, খলিফা সাহেব, বাড়ি আছ?

—আমি উত্তর দেব, কে?

তিনি আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলবেন, আমি খলিফা হারুন অল রসিদ। বড় টানাটানির মধ্যে চলছে, তা আমাকে একশোটা দিনার ধার দিতে পার, খলিফা সাহেব?

আমি তখন গম্ভীর চালে বলবো, একশো দিনার? অত টাকা কোথায় পাবো জাঁহাপনা? আমি গরীব-সরীব মানুষ, দিন আনি, দিন খাই। একসঙ্গে একশো দিনার চোখেই দেখিনি। আপনাকে কে বলেছে, আমার কাছে টাকা আছে?

খলিফা বিশ্বাস করবেন না আমার কথা। তিনি সব খোঁজখবর নিয়েই আমার কাছে আসবেন। কত টাকা আমার জমেছে এবং কোন্ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, সবই তাঁর জানা, সুতরাং হাবিলদার আহমদকে বলবেন, গ্রেপ্তার কর একে। আহমদ আমাকে ন্যাংটো করে পেটাতে শুরু করবে। যতক্ষণ না একশো দিনার বের করে দিই ততক্ষণ সে আমাকে মারতেই থাকবে। অবশেষে টাকাটা বের করে দিতেই হবে।

এই রকম ঝুট ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় বের করতে হবে। জেলে শুয়ে শুয়ে ভাবে। শেষে সে ঠিক করে, না, পাড়াপড়শী কাউকে সে জানাবে না কী তার রোজগার হচ্ছে। জামাকাপড় সাজ-পোশাক এবং খানাপিনা কিছুই পালটাবে না সে। যেমন আগে ছিল ঠিক তেমনি থাকবে। না, অন্যের দুঃখে বিগলিত হয়ে দয়া সে দেখাবে না কাউকে। দেবে না একটা পয়সাও।

তাতে লোকে সন্দেহ করবে। ভাববে, অনেক পয়সা না থাকলে কেউ দানখয়রাত করতে পারে? পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের বাঁশ হয়ে যাবে। কী দরকার অমন উট্‌কো দরদ দেখিয়ে? লোকে হাতে পেয়ে উপকারটুকুও নেবে, আবার চোখও টাটাবে। এইভাবে পাঁচ কান হতে হতে একদিন সুলতানের কানে যেতে আর কতক্ষণ। আর খলিফার রোষে পড়লে কারো রক্ষে আছে? সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হবে। সুতরাং একটিও কথা না। নিজেকে ঠিক তেমনি দীন-ভিখারী সাজিয়েই রাখবে সে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো উনষাটতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

অনেক বুদ্ধি খরচ করে সে একটা অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলো। গাঁজাখোরদের মতো আজগুবি এক ফিকির বলা যায়।

রাত যখন গভীর হয়ে এল, খলিফা নিজেকে বিবস্ত্র করে দেওয়ালে টাঙানো চাবুকখানা পেড়ে নিল। সপাং সপাং করে নিজের শরীরে বসাতে থাকলো চাবুকের ঘা। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে সে, ওরে বাবা রে, গেলাম রে, ম'লাম রে। দোহাই হুজুর আর মারবেন না, মরে যাবো।

এরপর সে নিজেই নিজেকে তড়পে ওঠে। বল শীগ্‌গির, বল, কোথায় টাকা রেখেছিস্‌?

আবার সপাং সপাং করে আঘাত করে নিজেকে। আবার সে আর্তনাদ করে, দোহাই জাঁহাপনা আমাকে ছেড়ে দিন, বলছি, বলছি আমি।

—বল, কোথায় রেখেছিস্‌ টাকা?

আবার নিজেই বলে, দিচ্ছি, হুজুর দিচ্ছি বের করে।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে খলিফার আর্ত চিৎকারে পড়শীদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। হুড়পাড় করে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসে।

—কী ব্যাপার! খলিফার ঘরে ডাকাত পড়লো নাকি?

আর একজন বলে, ঘরে ওর ফুটো পয়সা নাই, চোর ডাকাতে নেবে কী?

অন্য একজন বলে, কিন্তু সে হুঁশ কী ওদের আছে? লোকটা দু বেলা দুখানা রুটি জোগাড় করতে পারে না। তাকে মারধোর করলেই কী টাকা বের করে দিতে পারবে।

ওদিকে আরও জোরে আর্তনাদ ওঠে। ও বাবা গো, ম'লাম। আমায় ছেড়ে দিন, হুজুর আমি সব বলছি।

পড়শীরা আলোচনা করলো। আর তো চুপ করে থাকা উচিত হবে না। চল সকলে মিলে দেখি।

কেউ লাঠি, কেউ বর্শা, কেউ সড়কী নিয়ে এসে দাঁড়ালো খলিফার দরজায়। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তখন ওরা দেওয়াল বেয়ে ছাদের

ওপরে ওঠে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে।

তাজ্জব কাণ্ড! সবাই দেখে অবাক হয়। ঘরে দ্বিতীয় কোনও মানুষ নাই। খলিফা একা—এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ। একখানা চাবুক দিয়ে নিজেই পেটাচ্ছে নিজের শরীর।

—কী ব্যাপার? তোমার কান্নাকাটি চিৎকারে পাড়ার লোক সব জেগে ওঠে। আমরা তো মনে করেছিলাম, তোমার ঘরে ডাকাত পড়েছে! সেই থেকে ভয়ে আমরা কাঁপছি। কিন্তু এসব কী কাণ্ড?

ওদের কথার জবাব না দিয়ে খলিফা উল্টো তম্বি করে, তোমরা কী চাও? এই রাত দুপুরে কেন এসেছ আমাকে বিরক্ত করতে? না হয় আমি নিম্ব, তা বলে নিজের দেহটারও কী আমি মালিক নই? দু চারটে গোত্তা মেরে এই বেয়াড়া শরীরটা শায়েস্তা করারও কী কোনও অধিকার নাই আমার? আমাকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দাও। তোমরা এখন ভালো ছেলের মতো বিদেয় হও তো! তোমাদেরও উচিত মাঝে মাঝে আমার মতো এই রকম দেহচর্চা করা, বুঝলে?

এরপর আর পড়শীদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আবার সে যথারীতি চাবুক চালিয়ে যেতে লাগলো নিজের শরীরে।

খলিফার এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে পড়শীরা তো সবাই হেসে খুন। আর কিছু না বলে তারা বিদায় নিল।

খলিফা চিন্তা করতে থাকে, ব্যাটারা এর মধ্যে সন্ধান পেয়ে গেছে, আমার কাছে একশো দিনার আছে। সেইটেই হাতাতে ওরা এসেছিল। হুঁ হুঁ বাবা, আমিও কম সেয়ানা নই। সেটি হচ্ছে না। এই বসে রইলাম গ্যাট হয়ে। সারারাত ঘুমাবো না। দেখি কে চুরি করে নিয়ে যায়।

সারাটা রাত বিনিদ্রভাবে কাটালো খলিফা। সকালে নদীতে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো দিনারগুলো কোথায় রেখে যাবে। ভাবলো, যদি ঘরে রেখে যাই ব্যাটারা নির্ঘাৎ লোপাট করে দেবে। সুতরাং ঘরে রেখে যাবে না সে। কিন্তু কোমরে পেটিতে বেঁধে চলাও নিরাপদ নয়। সবাই জানে পেটিতে টাকাপয়সা ছাড়া কিছু থাকে না। আর এই বাগদাদ শহরে ছিনতাই দলের অভাব নাই। পথে পা বাড়ালেই গাঁটকাটারা পিছনে লাগবে। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে সে একটা অভিনব উপায় আবিষ্কার করলো। পুরানো কুর্তা ছিঁড়ে একটা থলে বানালো। দিনারগুলো থলেয় ভরে গলায় ঝুলিয়ে জাল কাঁধে করে সে নদীর দিকে রওনা হলো।

আগের দিনের সেই জায়গায় এসে জালটাকে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছত্রাকার করে জলের মধ্যে ফেললো সে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। জাল ফেলার সময় সারা দেহে প্রচণ্ড ঝাঁকানি লাগে। এবং সেই ঝাঁকানির দোলায় ছিটকে বেরিয়ে যায় থলেটা। একবারে মাঝ নদীতে পড়ে তলিয়ে যায়।

খলিফাও ক্ষিপ্রহাতে জামাকাপড় খুলে ফেলে বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে

পড়ে জলে। অনেকক্ষণ ধরে আঁতিপাতি করে খোঁজে। কিন্তু জলের কোন্ অতলতলে স্রোতের টানে ভেসে চলে যায় তা কিছুই হদিশ করতে পারে না। অবশেষে হতাশ অবসন্ন দেহে ওপরে উঠে আসে। কিন্তু অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, জামাকাপড়গুলো কে চুরি করে পালিয়েছে।

—ইয়া আল্লাহ! এই কী তোমার বিচার? শয়তান চোর আমার এই ছেঁড়া সাজপোশাকের লোভও সামলাতে পারলো না?

খলিফা একটি প্রচলিত প্রবাদ আওড়ায়ঃ মক্কায় পেঁছিলে কি হবে, উটের সহিসরা কখনও হাজী হতে পারে না।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বেচারা খলিফা আর কী করে; জালখানা জড়িয়ে নিল সারা শরীরে। ঝুড়িটা তুলে নিল মাথায়, ছড়িটা নিল হাতে—তারপর ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে নদীর ধার দিয়ে চলতে থাকলো।

খলিফা জেলের কথা এখন থাক। এবার খলিফা হারুন অল রসিদের কথা শুনুন। বর্তমান কাহিনীর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

এই সময়ে বাগদাদ শহরে ইবন অল কিরনাস নামে এক জহুরী ছিল। সুলতানের দরবারে তার গতিবিধি ছিল অবাধ। এক কথায় শহরের সম্ভ্রান্তদের সে অন্যতম,—সুলতানের নেক-নজর ছিল তার ওপর। শহরের যে-কোনও বড় কেনা বেচা—তা সে সাজপোশাক, অলঙ্কার বা বাঁদী গোলামের কেনা-বেচাই হোক না কেন, ইবন অল-কিরনাসকে বাদ দিয়ে কিছুই হতে পারতো না।

একদা ইবন অল কিরনাস সাহেব তার দোকানে বসেছিল। এমন সময় একটা দালাল নিয়ে এল একটি বাঁদীকে। মেয়েটি এ শহরে নবাগতা। পরমাসুন্দরী বললেও তার রূপের মাধুর্যকে খাটো করা হয়। মোটকথা, তার মতো নিখুঁত নিভাঁজ কুমারী কন্যা এতাবৎ কালে তামাম আরবে কোথাও কেউ দেখেনি।

দালাল বললো, শুধু রূপই নয় মালিক, গুণগুলোও পরখ করে নিন। গান, বাজনা, নাচ-এ সে পটীয়সী। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানেও সে সুপণ্ডিত।

অল কিরনাস আর কোন দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার দিনার দামে মেয়েটিকে সওদা করে নিল। ওর জমকালো বাহারী সাজপোশাক বাবদ খরচ করলো আরও এক হাজার দিনার।

সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে গেল সে খলিফার দরবারে। সে রাতটা খলিফার সঙ্গেই কাটালো মেয়েটি। এর ফলে অল রসিদ মেয়েটির অনন্য-সাধারণ গুণাবলীর পরিচয় জানতে পারলেন। মুগ্ধ হলেন তিনি। মেয়েটির নাম মেরিজান। খাস আরবের কন্যা। কোনও দোআঁশলা নয়। সকালবেলায় খুশি হয়ে তিনি অল-কিরনাসকে দশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন।

এই নতুন বাঁদীটির রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে খলিফা অন্য সব বাঁদীদের ভুলে গিয়ে ওকে নিয়েই মেতে রইলেন বেশ কিছুদিন। আপনারা শুনে অবাক হবেন, মেয়েটার মোহে অন্ধ হয়ে খলিফা তার প্রিয়তমা বেগম জুবেদাকে স্মরণ করেন না অনেকদিন। জুবেদা তো শুধু তাঁর বেগম নয়, চাচার মেয়ে – নিজের বোন। তাকেও ভুলে রইলেন তিনি। দরবারে কাজ ডকে উঠলো। সারাটা মাসে একমাত্র জুম্মাবারে নামাজের সময়টুকু ছাড়া আর তাঁকে কেউ অন্য কোথাও দেখতে পেত না। সারা দিনরাত মেরিজানকে নিয়ে পড়ে থাকেন।

সারা সলতানিয়তের আমির ওমরাহরা চিন্তিত হলো। সুলতান যদি দরবারের কাজ দূরে ঠেলে এইভাবে দিনের পর দিন সামান্য একটি নারীকে নিয়ে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতে থাকেন তবে তো দেশ জাহান্নামে যাবে। সকলে মিলে উজির জাফর অল বারমাকীর কাছে দরবার করলো তারা, আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, এর একটা ব্যবস্থা করুন। আমাদের তো মনে হয় সুলতানকে ঐ মেয়েটা গুণ করেছে। এখন তিনি ব্যাধিগ্রস্ত। আপনাকেই এর প্রতিকার করতে হবে।

জাফর বলে, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, উপযুক্ত দাওয়াই দিয়ে তাঁর এ রোগ আমি সারাবো।

এই জন্যে জাফর শুক্রবার-এর প্রতীক্ষায় বসে রইলো। যথাসময়ে জুম্মাবারে সে আগে থেকেই হাজির থাকলো বড় মসজিদে। সেখানে সুলতান নামাজ পড়তে আসবেন। সেই সময় সে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারবে।

যথাসময়ে সুলতান এলেন। নামাজাদির পর উজির জাফর কথা পাড়লো। নানা বিষয়ের কথা। প্রথমে দেশের হালচাল। তার পরে ভালোবাসার মোহ এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিয়ে গভীর তত্ত্বকথার অবতারণা করলো উজির জাফর।

সুলতান বললেন, জাফর আমি নেহাত ছেলেমানুষ বা নিরেট নই। সব আমি বুঝি। এর পরিণাম যে সুখাবহ হতে পারে না, তা আমি জানি, কিন্তু কি করবো জাফর, হাত-পা আমার বাঁধা, কিছুতেই নিজেকে ছাড়তে পারছি না। সব দোষ আমার। আমি সবই বুঝতে পারি। কিন্তু ভালোবাসার মোহের জালে জড়িয়ে পড়েছি।

জাফর বলে, ধর্মাবতার, মেরিজান এখন আপনার দখলে। আপনার হুকুমের বাঁদী সে। অন্যান্য আর পাঁচটা বাঁদীর মতো সেও আপনার একটি কেনা বাঁদী মাত্র। আমি আপনাকে এই মোহমুদ্গরের একটা উপায় বাতলে দিতে পারি। ওকে ছেড়ে আপনি মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে পড়ুন। শিকার করুন, মাছ ধরুন। ফাঁদ ছাড়াও আরও অনেক রকম ফাঁদ আছে। সেই ফাঁদে আপনি পা বাড়ান। এতে আপনার ভালো হবে। আপনার সলতানিয়ত রক্ষা পাবে। আপনার প্রজারা আপনার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে।

—তুমি ঠিক বলেছ, জাফর। বাইরেই কোথাও যাওয়া যাক। তুমি ব্যবস্থা কর। আমি আজই যাবো। এবং এক্ষুনি।

জাফর এবং খলিফা খচ্চরে চেপে সোজা শহর-সীমায় এসে পেঁছল। সারা দিন ধরে ও'রা দুজনে প্রচন্ড খরতাপের মধ্যে এদিক ওদিক বিচরণ করতে থাকেন। এইভাবে পেয়াদা প্রহরীদের পিছনে ফেলে এক সময় তাঁরা দৃষ্টি-পথের অগোচরে উধাও হয়ে যান।

চলতে চলতে খলিফা পিপাসার্ত বোধ করেন।

—জাফর, তেষ্টা পেয়েছে যে—

ধারে কাছে কোনও জনবসতি নাই। জাফর লক্ষ্য করলো অনেক দূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ের টিলায় কী যেন একটি বস্তু নড়াচড়া করছে।

সুলতান জিজ্ঞেস করেন, ওখানে কী আছে জাফর?

—আসলে, আমার মনে হচ্ছে, ওগুলো মানুষজন কিছু না। ওখানে শশার ক্ষেত কিংবা ফলের বাগান আছে। অর্থাৎ ধারে কাছে পানিও আছে। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসছি।

সুলতান বললেন, তোমার খচ্চরের চেয়ে আমারটা অনেক তাগড়াই আর দ্রুতগামী। তুমি বরঞ্চ এখানে দাঁড়াও, আমি ঘুরে আসছি।

সুলতান আর কোনও জবাবের প্রত্যাশা না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন। এবং নিমেষের মধ্যে পেঁছে গেলেন সেই পাহাড়ের পাদদেশে। সেই উলঙ্গ জেলে সারা অঙ্গ জালে আবৃত করে ধুলোকাদা মেখে কিম্ভূত কিমাকার সেজে পাগলের মত ধেই ধেই করে নাচছিল সেখানে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মনে হয় কোনও এক দৈত্যদানব সে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একষট্টিতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

অল রসিদ জেলের সামনে দাঁড়িয়ে স্মিত হেসে স্বাগত জানাল।

—আচ্ছা ভাইসাব, আমাকে একটু খাবার পানি দিতে পারো?

খলিফা জেলে বাজখাই গলায় খেঁকিয়ে ওঠে, তুমি কী উন্মাদ না অন্ধ? পাহাড়ের নিচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, দেখতে পাচ্ছো না?

হারুন অল নদীর ঘাটে নেমে আঁজলা ভরে টাইগ্রিসের জল পান করে। খচ্চরটাকেও খাওয়ায়। তারপর খলিফা জেলের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, এখানে কী করছো? এবং কী কর তুমি? পেশা কী?

খলিফা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তোমার আগেরটার চেয়ে এটা আরও আহাম্মকের মতো প্রশ্ন। তাই নয় কী? আমার কাঁধের মালপত্র দেখে কী বুঝতে পারছো না, আমার কী পেশা?

—হুঁম, দেখে তো সবাই বলবে তুমি জেলে। মাছ ধরাই তোমার কাজ। কিন্তু তোমার কুর্তা কামিজ পাতলুন গেল কোথায়?

এই কথা শুনে জেলের প্রত্যয় হয়, আর কেউ নয়, এই ব্যাটাই সেই চোর।

তার জামাকাপড় চুরি করে এখন মজা দেখতে এসেছে। ভাবামাত্র সে ছুটে এসে সুলতানের খচ্চরের লাগাম চেপে ধরে, আমার জামাকাপড় কোথায়, শীগ্গির বের কর। আমাকে ন্যাংটো করে তামাশা দেখতে এসেছ? শিগ্গির ফেরত দাও আমার সাজপোশাক। তা না হলে তোমার খুপরী খুলে নেব, শয়তান কাঁহিকা।

—খোদা কসম, হারুন বলেন, আমি তোমার জামাকাপড়ের বিন্দুবিসর্গ জানি না। বুঝতেই পারছি না, কী তুমি বলতে চাইছো, কী করেই বা পরনের বাস চুরি যেতে পারে। আমার মগজে ঢুকছে না, জেলের পো!

সুলতান হারুন অল রসিদের গাল দুটো বেলুনের মতো ফোলানো। মুখের হাঁ-খানা খুব ছোট্ট—ঠিক সানাইবাদকদের মতো। জেলে খলিফা সুলতানের মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে ভাবলো, নির্ঘাৎ লোকটা সানাইবাজিয়ে।

— ওহে সানাইবাদক, সুবোধ ছেলের মতো আমার জামাকাপড়গুলো বের করে দাও দেখি। তা না হলে এই যে দেখছো ডাণ্ডা, এটা তোমার পিঠে ভাঙবো।

হারুন আঁৎকে ওঠার ভান করেন, হায় বাপস্, ওর একটা বাড়ি খেলে আমার দফা-রফা হয়ে যাবে। দোহাই বাবা রক্ষা কর, আমি তোমাকে আমার সাজ-পোশাক দু-একটা খুলে দিচ্ছি, পর। কিন্তু তোমার ঐ ডাণ্ডাটা নিচে নামাও। ওটা দেখলেই আমার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সুলতান তাঁর বাহারী সাটিনের পোশাকটা খুলে খলিফা জেলের হাতে দিলেন।

—এইটে নিয়ে আমাকে রেহাই দাও, বাবা। সত্যি বলছি, আমি তোমার জিনিস চুরি করিনি।

জেলে বিজ্ঞের হাসি হাসে, আমাকে তুমি অতই বোকা হাঁদা পেয়েছ নাকি। আমার পোশাকের দাম তোমার এটার দশগুণ হবে। ভুজুংভাজুং দিয়ে যা তা একটা গছিয়ে দিলেই অমনি আমি গলে যাবো, ভেবেছ? তোমার এই বিদ-ঘুটে আঁকি-বুকি-কাটা কুর্তার ক'-পয়সা দাম হবে, শুনি? আমারটার কী দাম ছিল জান?

—তোমার কথা একশোবার সত্যি, ভাইসাব। কিন্তু আপাততঃ এটা পরে তোমার অঙ্গ-শোভা একটু ঢাক। তোমার মহামূল্যবান পোশাকটার সন্ধান করে দেখছি।

খলিফা জেলে সেই সুলতানের আজানুলম্বিত শেরোয়ানীটা গায়ে চাপায়। কিন্তু বেঁটে খাটো মানুষটার পক্ষে পোশাকটা বেশিমাত্রায় বড় হয়ে যায়। মাটিতে ঘষা লেগে ছিঁড়ে যাবে আশঙ্কায় মাছের ঝুড়ি থেকে ছুরিখানা বের করে নিচের অংশটুকু কেটে ফেলে। সেই কাটা অংশটুকু পাকিয়ে সে পাগড়ী বানিয়ে মাথায় পরে। এবার শেরোয়ানীটা ওর হাটু অবধি নেমে থাকে। তা থাক, ওর বেশি নিচে নামাতে সে চায় না।

জেলে বলে, আচ্ছা সানাইবাদক, সানাই বাজিয়ে মাসে কত টাকা রোজগার কর?

খলিফা হারুন বিন্দুমাত্র হাসি মজাক না করে বেশ গম্ভীর ভারিক্কি চালে

বলেন, তা ধর, দশ দিনার।

জেলে সমবেদনা জানায়, আহা গরীব বেচারা, তা কী করবে বল। তিনি যার ভাগ্যে যা লিখেছেন তার বেশি তো কেউ পাবে না। আমার কথাই বলি, দশটা দিনার আমি তুড়ি মেরে এক পলকে রোজগার করতে পারি। একবার মাত্র জাল ফেলবো, বাস্, আর দেখতে হবে না, মাছে মাছে ছয়লাপ হয়ে যাবে আমার জাল।

হারুন বলেন, জাল ফেললেই মাছ উঠবে জানলে কী করে? কোনও কোনও বার নাও তো উঠতে পারে?

—না তা হতে পারে না। এই জলের তলায় আমার একটা বাঁদর আছে। সেই আমার হয়ে দেখা শুনা করে। জাল ফেলামাত্র ভালো ভালো মাছদের তাড়িয়ে এনে সে জালের মধ্যে ঢোকায়।

জেলে খলিফা একবার সুলতানের চোখের দিকে তাকায়, কী খুব লোভ হচ্ছে তো? তা করবে এই ব্যবসা? ভাবনার কিচ্ছু নাই। সব আমি হাতে কলমে শিখিয়ে দেব তোমায়। সারাদিন তুমি আমার সাগরেদ হয়ে কাজ করে যাবে। আমি তোমাকে পাঁচ দিনার দিনরোজ দেবো, কী, রাজি? না না, ঘাবড়াবার কিচ্ছু নাই। ভেবো না, ঐ পাঁচ দিনারের চাকাতেই বাঁধা হয়ে গেল জীবন। যখন ধীরে ধীরে ভালো কাজ শিখতে পারবে মাইনে আরও বাড়িয়ে দেবো। তুমি হয়তো ভয় পাচ্ছো তোমার সানাই-দলের সর্দার যদি বাধ সাধে। তাহলে আমার এই ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দেব। তা ছাড়া আমার বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা ঘুষি যখন খাবে, বুঝবে বাছাধন কেমন মজা।

সুলতান বলেন, ঠিক, আমি তোমার শর্তে রাজি।

—তা হলে খচ্চর থেকে নামো। এখুনি তালিম নিতে শুরু কর। করবেই যখন ঠিক করেছ, দেরি করে লাভ কী?

সুলতান আমতা আমতা করে নেমে পড়ে, না, হ্যাঁ, মানে, তাতো বটেই।

জেলে বলে, এই যে জালখানা দেখছো, ঠিক এর গোড়াটা শক্ত মুঠিতে পাকড়াও করে ধর। তারপর জালটাকে মাথার ওপর দিয়ে এইভাবে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দেবে পানিতে। গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

সুলতান যথাসাধ্য চেষ্টা করে জালখানা জলে ফেলতে পারেন। একটু পরে ধীরে ধীরে টেনে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু দারুন ভারি। টেনে আর পারেন না। তখন দুজনে মিলে ওপরে তুলে আনলো জালখানা। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেলে খলিফা চিৎকার করে গালিগালাজ দিতে থাকে, ওহে ক্যাওড়ার সানাই-এর পো, ইটপাটকেল ঢুকে যদি জাল আমার ছেঁড়ে তাহলে তোমাকে আর আস্ত রাখবো না। খেসারত হিসাবে তোমার খচ্চরটাকে বাজেয়াপ্ত করে নেব।

ভাগ্য ভাল হারুনের জালে ইটপাটকেলের বদলে সুন্দর সুন্দর মাছ উঠলো অনেকগুলো। কিন্তু তাতে জেলের মুখে হাসি দেখা গেল না। আবার খিস্তি-খেউড় করে সুলতানকে তালিম দিতে লাগলো। নাও অত আহলাদে আটখানা

হতে হবে না। এখন মন দিয়ে কাজ কাম কর—তা না হলে মেরে তোমার ঐ বাঁদরের মতো হত কুৎসিত মুখখানার আদলই পাল্টে দেব।

ভোর হয়ে আসছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বাষট্টিতম রজনী :

আবার গল্প শুরু হয় :

—শোন, জেলে খলিফা হুকুম করে, তোমার খচ্চরটায় চেপে সোজা বাজারে চলে যাও। সেখান থেকে বেশ ভালো দেখে দুখানা বড়সড় ঝুড়ি কিনে আনবে। তা না হলে এত মাছ একটা ঝুড়িতে ধরবে না। তুমি যাও, আমি মাছগুলো পাহারা দিই। অন্য কোন দিকে তাকাবে না, ঝুড়ি কিনেই চলে আসবে। দাঁড়ি-পাল্লা বাটখারা সব আমার কাছে আছে। বাজারে যাবো, মাছ দাঁড়িতে তুলবো আর পয়সা গুনে থলেয় ভরবো। ব্যস, অন্য কাজ নাই। খুব সাবধান, দেরি করো না, তাহলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

—ঠিক আছে মালিক, যা বললে তাই হবে।

এই বলে খচ্চরের পিঠে চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে যেতে হো হো করে হাসতে থাকেন সুলতান।

সুলতানকে খোশ মেজাজে আসতে দেখে উজির জাফর বলে, মনে হচ্ছে ওখানে খুব চমৎকার একখানা বাগান পেয়ে অনেকটা সময় জিরিয়ে এলেন, জাঁহাপনা ?

খলিফা হারুন অল রসিদ তখনও প্রাণখোলা হাসি হেসেই চলেছেন। জাফর বলে, মনে হচ্ছে, আপনি নতুন ভাবে খুশি হবার পথ খুঁজে পেয়েছেন। কী ব্যাপার, পানি খেতে আপনার এত দেরি হলো কেন ?

খলিফা হেসে বলেন, সে বড় মজার ব্যাপার। এমন নির্মল আনন্দ বহুদিন আমি পাইনি, জাফর। বড় ভালো কেটেছে সময়টুকু।

তিনি জেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া ইত্যাদির কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলেন।

সব শুনে জাফর বললো, যাক শুনে আসবস্ত হলাম। আপনার গায়ের লাল শেরোয়ানী না দেখে আমার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল আর কী ? এতক্ষণে বুঝলাম, না, মারাত্মক কিছু না। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে জেলের কাছ থেকে আপনার মহামূল্যবান কুর্তাটা আমি কিনে নিয়ে আসতে পারি।

সুলতান আরও উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে ওঠেন।

তুমি কী ভাবছো এখনও সেটা আগের মতো মূল্যবানই আছে ? ওটার তিন ভাগের একভাগ কেটে সে তার পাগড়ী বানিয়ে দফা শেষ করে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, মাছ ধরার শখ আমি ষোলআনা মিটিয়ে নিয়েছি। ঐ রকম আসুরিক ব্যায়ম-চর্চার আর দরকার নাই আমার। এবং প্রথম বারে যা তুলতে পেরেছি, কে জানে সারাজীবন ধরে জাল ফেললেও হয়তো আর তেমনটি হবে না। এক-

খেপেই বাজিমাত করে দিয়েছি। এত মাছ উঠেছে, রাখবার মতো পাত্র নাই। তাই আমার সদাশয় মনিব বাজার থেকে দুটো বড় গোছের ঝুড়ি কেনার জন্য পাঠিয়েছে।

জাফর বলে, জাঁহাপনা কী মনে করেন, তাঁর মহামান্য মালিককে একটু মার দিয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার?

—না না, মোটেই না। বরং আমাকে পাহারা দেবার জন্য তোমার সাঙগ-পাঙগরা যারা আশে-পাশেই ঘুর ঘুর করছে তাদের সববাইকে বলে দাও। এক একটা মাছ, এক এক দিনার দামে জেলের কাছ থেকে কিনে আনুক তারা।

জাফার তখন সমস্ত সিপাই পেয়াদাদের ডেকে বললো, তোমরা সবাই এক এক করে নদীর ধারে যাও। এবং সুলতানের জন্য মাছ নিয়ে এস।

তক্ষুনি সকলে জাফরের নির্দেশ মতো পাহাড়ের পাদদেশে টাইগ্রিস নদীর উপকূলের দিকে ধাবিত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা চড়ুই-এর ঝাঁকের মতো ঘিরে ধরলো সেই জেলেকে।

—এ্যাই ব্যাটা জেলে, কী মাছ ধরেছিস দেখি, দে?

জেলে বলে, ফেল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পর? মাছ নেবে—পয়সা এনেছ?

—চোপ বাঁদর, সুলতান মাছ খাবে, এই তোর বাপের ভাগ্যি, আবার পয়সা কী র‍্যা?

এই বলে সবাই মিলে কেড়ে কুড়ে নিল ওর মাছগুলো। জেলে প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। একটু পরেই দুচার ঘা খাওয়ার পর মালুম হতে লাগলো, নাঃ, লোকগুলো নেহাত ফালতু আদমি নয়। লড়াই-এর কায়দা কসরত ওরা খুব ভালো করেই জানে। তা না হলে, তার মতো পালোয়ানের হাত থেকে মাছ কেড়ে কেউ পার পেয়ে যেত?

কোন রকম দুহাতে দুটো মাছ শক্ত করে ধরে সে নদীর জলে ঝাঁপ দিল। এক ডুবে অনেকটা ভেতরে চলে গিয়ে ভেসে উঠে মাছ দুটো ওপরের দিক করে দেখাতে দেখাতে সাফাই গাইতে থাকে, এই দেখো, সব নিতে পারনি তোমরা। আমি দুটো নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও, সবুর কর, আমার সানাই-এর পোঁ ফিরে আসুক, তারপর সে তোমাদের মজাটা টের পাইয়ে দেবে 'খন।

সবাই জেলের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছিল। সেই ফাঁকে সব মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে নদীর জলে পড়ে পালিয়ে গেল। প্রহরীরা দেখলো, একটা মাছও নাই। তখন এক নিগ্রো নফর চিৎকার করে জেলেকে ওপরে উঠে আসতে বলে। তার আশা ঐ মাছ দুটোও অন্তত সে নিয়ে যাবে সুলতানের কাছে।

—ও জেলের পো, ওপরে উঠে এস ভাই।

জেলে ক্ষেপে ওঠে, বিদেয় হ, বানচোৎরা।

এই গালাগালে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিগ্রোটা। হাতের বর্শা উঁচিয়ে ধরে, এখনও বলছি, উঠে আসবে তো এস, নইলে এই বর্শার ফলা তোমার দাবনায় গেঁথে যাবে।

জেলে খলিফা আঁৎকে ওঠে, ওরে হতভাগা পাজি ছুঁচো, এটা ছুঁড়িস নে বাবা, তাহলে আর বাঁচবো না। এই নে, দিচ্ছি তোকে এই মাছ দুটো। মাছের চেয়ে আমার জানের দাম অনেক বেশি।

সাঁতার কেটে সে উপকূলের দিকে এগিয়ে এসে মাছ দুটো নিগ্রোটার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়।

নিগ্রোটা মাছ দুটোকে একখানা বাহারী রুমালে বেঁধে কুর্তার জেবে হাত ঢোকায়।

—নাঃ, তোমার নসীবই খারাপ জেলের পো, একটা দিরহামও নাই। যাই হোক কাল সকালে যদি প্রাসাদে গিয়ে আমাকে, মানে নিগ্রো খোজা সাঁদালকে খোঁজ কর, ভাল ইনাম পাবে।

জেলে খলিফা আর একটি বাক্যও উচ্চারণ করে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে নিগ্রোটাকে। আর মনে মনে মুণ্ডুপাত করে তার।

নিগ্রোটা চলে গেলে জল থেকে উঠে বাজারের পথ ধরে চলতে থাকে সে।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেষট্টিতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

খলিফা জেলেকে দেখে রাস্তার লোক ঘিরে ধরে। তার অন্ততঃ হাজার দিনারের মহামূল্যবান এক জলসিক্ত শেরোয়ানী। সবাই অবাক হয়ে দেখে আর ভাবে, এই গরীব জেলেটা এই পোশাক পেল কোথায়?

সুলতানের দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দর্জি হতবুদ্ধি হয়ে তাকায় খলিফার দিকে। হারুন অল রসিদের এ পোশাক তার নিজের হাতের তৈরি। কিন্তু এই জেলেটা তা পেল কী করে?

—হ্যাঁ গো, এই পোশাকটা তুমি পেলে কোথায়?

খলিফা খিস্তি করে ওঠে, তাতে তোমার কী হে শালা? তুমি কে নটবর, জবাবদিহি করতে হবে? তা যদি জানার ইচ্ছে হয় তো শুনে রাখ, এটা নজরানা দিয়েছে আমার সাগরেদ। তাকে আমি মাছ ধরার ব্যবসায় তালিম দিয়েছি। আমার জামা-কাপড় সে ব্যাটা চুরি করেছিল। যদি না দিত এটা, আমি তার হাত কেটে-ফেটে দিতাম।

দর্জি বুঝলো কোনও ভাবে সুলতানের সঙ্গে এই জেলের যোগাযোগ হয়েছিল। এবং তিনি তার সহজাত মজা তামাশার ঝোঁকেই এই কাণ্ড করেছেন। তাই সে বলে, ও, বুঝেছি। ঠিক আছে, তোমার কাজে যাও।

এরপর নিজের ঘরে ফিরে আসে জেলে।

আমরা জানি, সুলতান কিছু মুক্ত বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে জাফরকে সঙ্গে নিয়ে শহর ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। এবং জেলে খলিফার সাহচর্যে এসে প্রচুর নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছিলেন।

এতদিনের মনের জড়তা কাটিয়ে আবার সজীব কর্মমুখর হওয়ার উৎসাহ প্রেরণা সঞ্চয় করে এসেছিলেন। এর ফলে মেরিজানের মোহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এই বাঁদীটা একটা দুষ্ট গ্রহের মতো তার জীবনটাকে গ্রাস করে বসেছিল এই একটা মাস। দরবারের কাজকর্ম যেমন সিকেয় উঠেছিল, তেমনি চাচার মেয়ে বেগম জুবেদাও বিষাদে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। নাওয়া-খাওয়া সে প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল বলা যায়। এর অবশ্য একটাই কারণ, মেয়েদের স্বভাব-সুলভ হিংসা। তার স্বামীকে নিয়ে অন্য মেয়ে ফস্টিনস্টি করবে, গুণ-তুক করে বশে রাখবে, তা কোনও বেগম-বিবিই সহ্য করতে পারে না।

বেগমসাহেবা মওকা খুঁজছিল এতদিন। এই শয়তানী বাঁদীটাকে একবার কব্জায় পেলে ওর জন্মের সাধ শেষ করে দেবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সেই সুযোগ গতকাল সে পেয়েছিল। এবং তার সদ্ব্যবহার করতেও কসুর করেনি জুবেদা বেগম।

যখন সে শুনলো, সুলতান জাফরকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ বিহারে বেরিয়েছেন তখন বাঁদীটাকে নিমন্ত্রণের নাম করে তার কামরায় ডেকে পাঠালো। খোজাকে বললো, যা তাকে গিয়ে বল, অনেকদিন সে প্রাসাদে এসেছে,অথচ আমি সুলতানের খাস বেগম, আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি। তাই আজ দুপুরে তার সম্মানে আমি একটা ভোজসভার আয়োজন করেছি। সে যেন অতি অবশ্য এক্ষুনি চলে আসে আমার কামরায়। শুনেছি সে নাচে-গানে বাজনায় চৌকস। সুলতান তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে যদি এসে আমাকে দু-একটা গান-বাজনা শোনায়, খুব খুশি হবো।

খোজা বেগমের দূত হয়ে গেল মেরিজানের কামরায়। আদাব-কুর্নিশ জানিয়ে বললো, মালকিন, গুস্তাকী মাফ করবেন। আমি এসেছি খলিফা হারুন অল রসিদের চাচা কাসিমের কন্যা এবং সুলতানের একমাত্র খাস বেগম জুবেদা সাহেবার কাছ থেকে। আপনি হারেমে এসেছেন এক মাস হলো। এ যাবত তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়নি। সুলতানের মুখে আপনার নানা গুণ-কীর্তন শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। আজ দুপুরে শুধুমাত্র আপনারই সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেছেন তিনি। তাঁর একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি আমার সঙ্গে তাঁর কামরায় গিয়ে খানাপিনায় সঙ্গ দেন এবং আপনার দু-একটা মধুর সঙ্গীত শোনান তবে কৃতার্থ হবেন তিনি।

মেরিজান বলে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন, যাবো না ? চল, আমি তৈরি।

বীণা হাতে করে সে উঠে দাঁড়ায়। খোজাটা এগিয়ে এসে হাত পেতে বলে, মেহেরবানী করে যন্ত্রটা আমার হাতে দিন, মালকিন।

জুবেদার, তার নিজস্ব দরবার-মহলে এই ভোজসভার ব্যবস্থা করেছিল। মেরিজান প্রবেশ করে প্রথমে সোনার তখতে আসীন বেগম জুবেদাকে আভূমি আনত হয়ে দীর্ঘ কুর্নিশ জানালো। তারপর উপস্থিত অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে

আলাপ-পরিচয় করতে থাকলো।

অনেকটা দূরে স্বর্ণসিংহাসনে বসে ফিন-ফিনে পাতলা রেশমী বোরখার জাফরীকাটা নাকাবের মধ্য দিয়ে এক দৃষ্টে মোরিজানকে নিরীক্ষণ করতে থাকলো বেগম জুবেদা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চৌষট্টিতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সত্যিই মেয়েটি অসাধারণ রূপসী বটে। যেমন টানাটানা চোখ, তেমনি ভ্রু, তেমনি ছোট ললাট। গায়ের রং দুধে-আলতায়। কী সুন্দর অধর—একেবারে পাকা আঙ্গুরের মতো টসটসে। গালে গুলাবী আভা। ছোট অথচ উন্নত নাকের একপাশে কালো একটা তিল সারা মুখটাকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলেছে। জুবেদা মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। মেয়েটির মরালের মত গ্রীবা। কচি ডালিমের মতো সুডৌল সুগঠিত দুটি স্তন, ক্ষীণ কটি, ভারি নিতম্ব—যতই দেখে, জুবেদার বুকে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু মুখে মধু ঢেলে বলে, আহা, অত শরম কীসের, ভাই। এখানে আমরা সবাই সুলতানের পেয়ারের বাঁদী বেগম। সহজ হয়ে দিলখোলা মেজাজে হাসি মজাক কর সকলের সঙ্গে, তবে তো আসর জমবে!

মোরিজান মাথা নুইয়ে বলে, তাই হবে, বেগমসাহেবা।

—অত কায়দা কেতা দেখাচ্ছো কেন, ভাই। বললাম না সবাই আমরা এক। তুমি বাঁদী আমি না হয় বেগম। নাম আলাদা হলেও সুলতানের চোখে সকলেই আমরা সমান। সবাই আমরা একই বৃন্তের ফুল। আজ অনেক দিন বাদে সকলে যখন এক জায়গায় মিলিত হয়েছি, তখন আজ আর কারো মনে কোন জড়তা সংকোচ রেখ না, ভাই। খাও, পিও, নাচো, হাসো, গাও।

একটু থামলো জুবেদা বেগম, তারপর জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মোরিজান, সুলতানের মুখে শুনেছি—তোমার নাকি ভারি সুন্দর মিষ্টি গলা। কী ভাই, শোনাবে দু একটা গান?

মোরিজান জুবেদার এই রকম সুন্দর সহজ-সাধারণ আচরণ প্রত্যাশা করে নি। সে ভেবেছিল, সুলতানের পেয়ারের খাস বেগম—দেমাকেই মাটিতে পা পড়বে না। কিন্তু সে-সব ধারণা সব ভুল হয়ে গেল তার। কত সুন্দর সহজ ভাবে নিমেষে মানুষকে আপন করে নিতে পারে সে। উৎফুল্ল হয়ে জবাব দেয়, নিশ্চয়ই শোনাবো। আপনি শুনতে চাইছেন, শোনাবো না? ভালো মন্দ জানি না—শুনে ভালো লাগে বাহবা দেবেন। আর যদি ভালো না লাগাতে পারি—সে তো আমার দোষ।

মোরিজান গান ধরে। সুললিত মধুর কণ্ঠ। সুরের মূর্ছনায় মোহিত হয়ে যায় সকলে। এক এক করে চোদ্দখানা গান গায় সে। জুবেদা ভাবে, নাঃ, যা শুনেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি গুণবতী সে। তার গলায় কী এক যাদু

আছে, গান শুনতে শুনতে অন্য জগতে উধাও হয়ে যেতে হয়।

গান শেষ হলে, অপূর্ব ছন্দ-তালে নাচতে থাকে মেরিজান। এমন মনোহর নাচ অনেক দিন দেখেনি জুবেদা। ঈর্ষায় অন্তর জ্বলে ওঠে।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁয়ষট্টিতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

নাচ শেষ হতে হাততালি দিয়ে প্রশংসা জানায় জুবেদা।

—চমৎকার! বড় সুন্দর তোমার নাচগান, মেরিজান। খুব আনন্দ পেলাম, ভাই। আচ্ছা এবার এস, আমরা খানাপিনায় বসি।

বিরাট টেবিলে নানা রকমের সুগন্ধী মুখরোচক শাহী খানাপিনার এলাহি ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

জুবেদা নিজের হাতে মেরিজানের সামনে খাবারের রেকাবীগুলো সাজিয়ে দেয়। বলে, নাও ভাই, শরম করো না। পেটভরে খেয়ে নাও।

মেরিজান বলে, আপনারা?

—আমরাও তোমার সঙ্গেই বসছি। আমাদের দিচ্ছে দাসী বাঁদীরা। তুমি আমার ঘরে আজ প্রথম এলে, তাই নিজের হাতেই তোমাকে দিলাম—তা না হলে নিন্দে হবে যে, ভাই।

সবেমাত্র একগ্রাস মুখে পুরেছে, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে মেরিজানের। জলের গেলাসের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু গেলাস আর হাতে ওঠাতে পারে না। মাথাটা ঢলে পড়ে ঘাড়ের ওপর।

বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না আপনাদের যে, ঈর্ষান্বিতা জুবেদা মেরিজানের খাবারে মারাত্মক আফিং-এর ডেলা মিশিয়ে রেখেছিল। এবং এ তারই অবশ্যম্ভাবী এই ফল।

পলকের মধ্যে মেরিজানের দেহ লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপর। কপট উৎকণ্ঠা দেখিয়ে ছুটে আসে, জুবেদা।

—এ কি! কী হলো? মেরিজান? মেরিজান? কী হলো ভাই? কথা বল?

কিন্তু কে কথা বলবে? তখন সে আফিঙের আরকে জারিত হয়ে গেছে। জুবেদা খোজাকে বললো, আর দেরি করিস নে। শীগ্‌গির নিয়ে যা আমার ঘরে। আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।

জুবেদা তার মহলের একটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখলো—মেরিজানকে। কিছুক্ষণ পরে ঘোষণা করে দিল, খাবার টেবিলে গলায় মাংসের টুকরো আটকে দম বন্ধ হয়ে মেরিজান মারা গেছে।

অল্প সময়ের মধ্যে জুবেদার অনুচররা প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগিচায় একটা শ্বেতপাথরের তাজিয়া বানিয়ে ফেললো।

খলিফা বাইরের ভ্রমণ-সফর শেষ করে প্রাসাদে ফিরে এসে প্রথমে খোজার

কাছে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়া বাঁদীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, জুবেদা পূর্বাহ্নেই খোজাকে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল, খবরদার, সুলতান যদি এর বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেন, তোর ধড়ে মুণ্ডু আর রাখবো না। খোজা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, ধর্মাবতার, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আপনি চলে যাওয়ার পর তিনি খেতে বসেছিলেন। কিন্তু কপালের লেখা, মুখের মাংস গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে সংগে সংগেই মারা গেলেন। হাকিম বদ্যি ডাকবার পর্যন্ত ফুরসত দিলেন না তিনি। শোকের সমুদ্রে আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। পরম ভাগ্যবতী নারী। না হলে এমন মৃত্যু কারো হয় না, জাঁহাপনা।

জাঁহাপনার তখন ঐ সব তত্ত্বকথা শোনার মতো অবস্থা নয়। সে পাগলের মতো ছুটে গেল প্রাসাদে। মেরিজানের কামরায়। সেখানে তার সাজপোশাক, সেতার বেহালা সরোদ, ঘুঙুর, নুপুর মল সবই যেমন ছিল ঠিক আছে। শুধু সে নাই। প্রায় উন্মাদের মতো সারা প্রাসাদ দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন তিনি। এক সময় বাগিচার অভ্যন্তরে নকল তাজিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখের জল আর কিছুতেই বাঁধ মানে না। এক অসহায় শিশুর মতো কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটানোর পর নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলেন সুলতান। বাঁদী বেগম ইয়ার দোস্ত উজির আমির সকলের সংগে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন।

জুবেদা দেখলো, তার সব ফিকিরই খেটে গেছে। তখন সে একটা বড় গোছের সাজপোশাকের বাক্সে মেরিজানের হতচৈতন্য দেহটা ভরে ডালা বন্ধ করে দুজন একান্ত অনুরক্ত খোজার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বললো, যা বাজারে নিয়ে যা। যাকে প্রথম খদ্দের পাবি, যে দামে হোক, বেচে দিবি। বলবি, মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই অবস্থাতেই নিতে হবে।

এবার আমরা অন্য প্রসংগে যাই।

পরদিন সকালে জেলে খলিফার ঘুম ভাংগে। প্রথমেই মনে পড়ে, সেই আবলুস কালো নিগ্রোটার কথা। সে বলেছিল, মাছ দুটোর দাম দেবে। সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে তার নাম সাঁদাল বলে খোঁজ করলেই হবে। কিন্তু সে যদি তার কথা না রাখে, খলিফা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তা হলে ঐ গন্দামুখোর থ্যাবড়া নাক আমি ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দিয়ে আসবো।

প্রাসাদের সদর ফটকের সামনে এসে এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মেরে সাঁদালকে খুঁজতে চেষ্টা করে জেলে খলিফা। ফটকের পাহারায় ছিল যে প্রহরী তড়পে তেড়ে আসে সে, এ্যাই—কুত্তাকা বাচ্চা, ইধার কেয়া কাম, ভাগো হিয়াসে।

ফটকের ওপাশে সংগী সাথী পরিবৃত হয়ে কাছেই বসেছিল সাঁদাল। প্রহরীর তর্জনে সে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে, কী ব্যাপার। হঠাৎ খলিফাকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বলে, আরে এস, এস ভাইসাব, তোমার জন্যেই বসে আছি।

জেলে গম্ভীরভাবে বলে, তা তো থাকতেই হবে। আমার মাছের দামটা—

সাঁদাল ব্যস্ত হয়ে ওঠে, আরে কী আশ্চর্য, দাম তো নিশ্চয়ই পাবে। সঙ্গে আরও কিছু বকশিশও পাবে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি তোমার দামটা।

এই বলে খোজাটা কুর্তার জেবে হাত ঢোকায়। ঠিক তক্ষুনি উজির জাফর, সাঁদাল—সাঁদাল বলে চিৎকার করে ডেকে ওঠে।

সাঁদাল জেলের দিকে তাকায়, এক পলক, ঐ—উজির ডাকছেন। শুনে আসি আগে। যাবো আর আসবো। এসেই তোমার দাম মিটিয়ে দিচ্ছি আমি। ততক্ষণে—এই টুলটায় বসো তুমি।

সাঁদাল ছুটতে ছুটতে দরবারে ঢুকে যায়। জেলে খলিফা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছয়ষট্টিতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

খোজা নফর চাকর প্রহরীরা ঘিরে থাকে জেলে খলিফাকে। তারা জানে সুলতানের পছন্দ মতো এই জেলের মাছই এসেছে তাঁর প্রাসাদে। সুতরাং সে তো আর যে-সে মেকদারের মানুষ হতে পারে না। তাই খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে তার সান্নিধ্যে থাকতে পেরে প্রাসাদপুত্ররা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। সাঁদাল সেই চলে গেছে—আর ফেরার নাম নাই। খলিফা জেলে প্রথমে অধৈর্য, পরে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। লোকটা ধাপ্পাবাজ নয় তো? হয়তো এই হুট করে কেটে পড়া- এও তার একটা বাহানা। কিন্তু সে-ও জেলের পো, খলিফা। তার সঙ্গে ঐ সব গাড়চালাকী চলবে না। মেরে [illegible]স নামিয়ে রেখে যাবে। খলিফা হাঁক ছাড়লো—হেই, সাঁদাল—

কিন্তু কোনও জবাব পেল না। সাঁদাল তখন জাফরের সঙ্গে জরুরী কথা বলতে ব্যস্ত ব্যাপৃত ছিল। জেলে খলিফা আবার একটু চড়া গলায় ডাকে, এই যে—কদম্বপিয়ারী, কই, কোথায় গেলে, একবার এদিকে এস তো নটবর। আমার যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, বাপজান! আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে যাও, আমি বিদেয় হই।

জাফরের সামনে দাঁড়িয়ে সাঁদাল জেলের ঐ সুমধুর সম্ভাষণ শুনে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সাড়া না দিয়ে বরং আরও তৎপর হয়ে ওঠে কথা-বার্তায়। ভাবখানা এই—কিছুই তার কানে যায়নি।

কিন্তু জেলের পো খলিফা তো ছাড়বার পাত্র নয়। এবার সে দরবার-মহলের আরও কাছে সরে আসে। খ্যনখানে গলায় সাদর সম্ভাষণ জানাতে থাকে, ওহে মিথ্যুকে জাসু, একবার দয়া করে গতরটা বাইরে বের করে আন। বলি, লোক ঠকানোর এই ধান্দা কতকাল ধরে চালাচ্ছো। ট্যাঁকে নাই ফুটো পয়সা, বাদশাহী চাল আছে ষোল আনা। বলে কিনা—'যাওয়া মাত্র পেয়ে যাবে দাম।' ওরে

আমার দেনেওলা আমির রে ! এখনও বলছি, এই গরীবের পয়সা কটা মেরে তুমি সুলতান বনবে না। মেহেরবানী করে আমার ন্যায্য পাওনাটা দিয়ে দাও।

এইবার উজির জাফর কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পায়। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। খোজাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, লোকটা কে? কী সব বলছে সে? কে তাকে ঠকিয়েছে?

নিগ্রো খোজাটা বলে, ঐ লোকটাকে আপনি চেনেন না, হুজুর?

জাফর বলে, যাকে জীবনে কখনও দেখিনি, তাকে চিনবো কী করে?

খোজা বলে, কিন্তু মালিক, এই জেলের কাছ থেকেই তো আপনি আমাদের মাছ আনতে বলেছিলেন! শেষ পর্যন্ত দুটো মাছ নিয়েও এসেছিলাম। তবে তার দাম দেওয়া যায়নি। কারণ আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছুই ছিল না তখন। আমি ওকে এখানে এসে দাম নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তাই সে এসেছে। দামও মিটিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি তলব করলেন, তাই আর দেওয়া হয়নি। বলে এলাম, ফিরে এসে দিচ্ছি। তা, লোকটা এত ইতর, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে যা তা বলে গালমন্দ দিয়ে যাচ্ছে।

জাফর মুচকি হেসে বলে, আহা-হা, ধীরে। খলিফা হারুন অল রসিদের মহামান্য গুরু—ওস্তাদ সে। তার নামে ঐ ধরনের অশালীন মন্তব্য করছো? তোমার তো বড় কম দুঃসাহস নয় খোজা সর্দার! স্বয়ং সুলতান যাকে সেলাম করে কথা বলেন, তার সঙ্গে এই ব্যবহার? না-না না, এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। মুখ সামলে, খুব সমীহ করে কথা বলবে তার সঙ্গে।

—ওকে কিছুতেই যেতে দিও না, জাফর নির্দেশ দেয়, আমাদের কী পরম সৌভাগ্য এই দুঃসময়ে সে নিজেই এসে হাজির হয়েছে। তুমি তো জান, গতকাল প্রিয়তমা বাঁদী মেরিজান মারা যাওয়ার খবর শোনার পর থেকে সুলতান ঘরে দোর দিয়েছেন। ইয়ার বন্ধু, বিবি বাঁদী, আমির আমলা কারো সঙ্গেই দেখা করছেন না। শোকে তিনি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন, এই অবস্থায় আমাদের কোনও কথাই তিনি কানে তুলবেন না। একমাত্র এই জেলের পো-ই অসাধ্য সাধন করতে পারবে। ওর সঙ্গে সুলতানের অন্য একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওকে দেখামাত্র তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারেন। তুমি যাও, ওকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা কর। আমি খলিফার ঘরের সামনে যাই। দেখি, হাওয়া কী রকম!

সাঁদাল বললো, একাজ আপনার পক্ষেই সম্ভব, হুজুর।

উজির গেল প্রাসাদের অন্দরে খলিফা হারুনের ঘরের সামনে আর সাঁদাল এল প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে খলিফা জেলের কাছে।

—হুম্, এতক্ষণে তা হলে ফিরে এলে চাঁদু।

সাঁদাল দ্বাররক্ষীকে ইশারা করে বলে, লোকটাকে আটক কর।

খলিফা খেঁকিয়ে ওঠে, উঁ, আটক কর! যেন ওর লাখ পঞ্চাশ চুরি করেছি আমি! আটক কর! আগে আমার কড়ি ফেল, তারপর ওসব আটক কর—ফাটক কর, শোনাবে। কারো গাঁটকাটা পয়সা নয়—এ হকের পাওনা। সিধে

ফেলে তারপর কথা বল। ওসব বুজরুকি আমি শুনতে চাই না।

খলিফা জেলেকে দ্বাররক্ষী যে কী সমাদরে রাখলো, সে কথা পরে বলবো। এখন চলুন যাই, প্রাসাদের অন্দরমহলে।

জাফর পা টিপে টিপে সুলতানের ঘরের সামনে এসে জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে, শোকে মুহ্যমান খলিফা পালঙ্ক-শয্যায় এলিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন!

জাফর খুব মৃদু গলায় বলে, খোদা হাফেজ! সবই তাঁর অপার লীলা ধর্মাবতার। তাঁর ওপরে আর কারো কিছু জারিজুরি খাটে না। নসীবে যা লিখে রেখেছেন তিনি, মেনে তা নিতেই হবে। খোদা—আপনার মঙ্গল করুন, জাঁহাপনা।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতষট্টিতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে ঃ

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল সুলতান। চোখে তার, বিষদৃষ্টি।

—খোদা তোমার মঙ্গল করুন, জাফর। কিন্তু বেয়াদপ, কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে। কেন আমার হুকুম অমান্য করে বিরক্ত করতে এসেছ? সুলতানের ফরমান কী তোমার জানা নাই? কেন এসেছ এখানে?

জাফর বলে, ধর্মাবতার,আপনার হুকুম না মেনে এখানে আসা আমার অন্যায় হয়েছে, আমি জানি। এবং সে জন্য যে আপনি আমাকে সমুচিত সাজা দিতেও কসুর করবেন না—তাও জানি। এ সত্ত্বেও কিন্তু আমি এলাম। কারণ, না এসে পারলাম না। আপনার গতকালের শিক্ষাগুরু—সেই জেলে খলিফা আজ সকালে প্রাসাদে এসেছে। আপনার সম্বন্ধে তার অনেক নালিশ আছে। আমি তার খানিকটা নিজের কানে শুনে এসেছি। সে বলছিল,—'খোদা মেহেরবান, আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মানুষ এত অধম এবং অকৃতজ্ঞ হয় কী করে। সে আমার কাছে নাড়া বাঁধলো। ওস্তাদ বলে স্বীকার করে নিল। আমি তাকে আমার মাছ ধরা বিদ্যা শেখালাম। প্রথম খেপেই সে কামাল করে দিল। আহা-হা, কী সুন্দর পয়া হাত। জাল ধরেই মালে মালা-কার করে দিল। কিন্তু হলে হবে কী, সব রসাতলে গেল। গোচোনা হয়ে গেল। শিক্ষাগুরুর ইজ্জৎ করতে শেখে না যে, সে যত গুণবানই হোক ওস্তাদের অভিশম্পাতে আখেরে কোনও আয় উন্নতি করতে পারে না। আগে গুরু খুশি রাখতে হবে। গুরু রুষ্ট হলে সব ভ্রষ্ট হয়। আমি ওকে বললাম যাও দুখানা ঝুড়ি কিনে নিয়ে এস। তা সেই যে হাওয়া হলো, আর ফিরলো না? এইভাবেই কী গুরুদক্ষিণা দিতে হয়?'

জেলের এই সব কথা শুনে আমারও বেশ খারাপ লেগেছে। সত্যিই, ওস্তাদ বলে কথা—ও নিয়ে এমন ঠাট্টা রসিকতা আদৌ করা উচিত নয় আপনার।

সত্যিই যদি আপনি তার কাছে শিক্ষানবীশি করতে চান, করুন। আমাদের কিছু বলার নাই। আর যদি মনে করেন, না, আর ওসব শিখে-টিখে কোনও লাভ নাই, তাও তাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিন ঃ না ওস্তাদ কাল পর্যন্ত যা হয়ে গেছে তা হয়েছে। তারপর আর আমাদের কোন শর্ত চুক্তি রইলো না। এখন তুমি অন্য সাগরেদ তলাশ করতে পার।

কালকের পরে এই প্রথম খলিফার চোখে জল থাকা সত্ত্বেও মুখে হাসি ফুটলো। একটু পরে তিনি অনেক পিছনের কথা স্মরণ করে হো হো করে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন। হঠাৎ তার বুক থেকে ভারি পাথরের বোঝা সরে গেল। নিজেকে মনে হতে লাগলো, উচ্ছ্বল প্রাণবন্ত ডানামেলা এক পায়রা। বললেন, একটা সত্যি কথা বলতো জাফর, সত্যিই কী সে এখন প্রাসাদে?

—খোদার কসম, জাফর দিব্যি করে বলে, সে এখন সশরীরে এই প্রাসাদেই হাজির আছে।

—খোদা হাফেজ, আজ আমি তাকে সব পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেব। আল্লাহ যদি তাকে এইভাবে পাঠিয়ে থাকেন যে, তার আচার-আচরণের দণ্ড-সাজা আমাকে দিয়ে দেওয়াবেন তিনি, তবে তাই হোক। আর যদি তিনি ভেবে থাকেন সে আমার ইনাম এবং মর্যাদা পাবার অধিকারী, সে-ভী আচ্ছা। জাফর একখানা কাগজ দাও আমাকে।

তৎক্ষণাৎ কাগজ এল। কাগজখানা চল্লিশটা টুকরো করলেন তিনি। প্রথম কুড়িখানা জাফরের হাতে দিয়ে বললেন, এক থেকে একহাজার দিনারের যে কোনও অঙ্ক এই কুড়িখানা কাগজের যে কোনওটায় লেখ। এবং সেই সঙ্গে আমার দরবার বা দপ্তরের যে কোনও পদ, তা সে খলিফা আমির উজিরই হোক বা নফর চাকরই হোক—উল্লেখ কর।

উজির আজ্ঞা মতো কুড়িখানা কাগজে কুড়িটা পদের নাম এবং নিজের ইচ্ছে মত এক থেকে এক হাজারের নানারকম সংখ্যা লিখে রাখে। এরপর বাকী কুড়িখানা কাগজ দিয়ে সুলতান বলেন, এই কুড়িখানা কাগজে সাধারণ প্রহার থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত কুড়িটা সাজার উল্লেখ কর।

জাফর তাও লেখে। এবং সুলতানের নির্দেশমতো কাগজের টুকরোগুলো একই রকমের ভাঁজ করে একখানা গামলার মধ্যে রেখে গামলাটা খলিফার দিকে এগিয়ে দেয়।

খলিফা ইস্টনাম জপ করতে থাকেন।

—আমি আমার চৌদ্দ পুরুষের নামে হলফ করেছি, এই গামলা থেকে ঐ জেলে খলিফা যে কাগজখানা প্রথমে টানবে, তার বিধান আমি অক্ষরে অক্ষরে মানবো। তা সে যদি 'খলিফার' কাগজটাই তুলতে পারে, আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবো তাকে তখত্। আর যদি সে শূল, ফাঁসী বা ঐ রকম কোনও নিষ্করুণ সাজার কাগজ একখানা তুলে ধরে, তবে সে রেহাই পাবে না। সে সাজা তাকে নিতেই হবে—মৃত্যুদণ্ড হলেও। মকুবের কোনও প্রশ্ন নাই। কারণ আমি পিতৃপুরুষের নামে হলফ করেছি। এ সাজা বা পুরস্কার রদ করার ক্ষমতা

আমার হাতে রইলো না।

জাফরকে বললেন তিনি, নিয়ে এস তাকে এখানে।

উজির শঙ্কিত হলো, সাধারণতঃ দেখা গেছে, গরীব দুঃখীদের নসীবে ভাল কিছু ওঠে না। হয়ত নিরীহ বেচারা মৃত্যুদণ্ডের কাগজই একখানা টেনে বসবে। তখন তার এই অকারণ মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দোষী মনে করতে পারবে না। খলিফা হলফ করেছেন। সুতরাং তখন তাঁর কাছে আর্জি জানিয়ে কোনও সুরাহা হবে না। ইয়া আল্লাহ, একি সংকটে ফেললে আমাকে। এখন কী করে সেই ভাগ্যহত মানুষটাকে এখানে হাজির করবো আমি!

জাফর প্রাসাদের বাইরে এসে জেলেকে দেখতে পেয়ে প্রাসাদের অন্দরে নিয়ে আসতে চায় তাকে। কিন্তু জেলে কিছুতেই রাজি নয়। সে চেঁচামেচি চিৎকার জুড়ে দেয়, হায় খোদা, এই ভোঁদড় নিগ্রোটার কথায় ভুলে কেন আমি এসেছিলাম এখানে। একি দশা হলো আমার।

মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে তার-স্বরে চিৎকার এবং খিস্তি খেউর করতে থাকে। কিন্তু সুলতানের হুকুম, নিয়ে যেতেই হবে, জাফর খোজা সাঁদালকে হুকুম করে, টেনে হিঁচড়ে যে ভাবে হোক, নিয়ে যেতে হবে খলিফার সামনে।

সাঁদাল হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে হাজির করে প্রাসাদের বাইরের ঘরে। সাঁদাল বলে, খুব হুঁশিয়ার খলিফা, এখনও বলছি, ভালো মানুষের মতো গিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়াও। তা না হলে হয়তো এক্ষুনি তোমার গর্দান নেবার হুকুম আসবে।

ভয় পেয়ে খলিফা উঠে দাঁড়ায়। সামনের দরজার ভারি পর্দা সরিয়ে সাঁদাল তাকে খলিফার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। হারুন অল তখন তখত্-এ বসে ছিলেন। তার দুইপাশে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাহ।

খলিফা ঘরে ঢুকেই থমকে যায়। এ সে কী দেখছে? খুব ভালো করে সুলতানের চেহারাখানা নিরীক্ষণ করে হিহি করে হেসে উঠলো সে।

—অ, সানাই-এর পো তুমি এখানে বাদশাহ সেজেছ! বহুত আচ্ছা। তুমি কী ভেবেছিলে গতকাল নদীর ধারে ঐ ভাবে আমাকে একা ফেলে রেখে, ধোঁকা দিয়ে কেটে পড়ে খুব বাহাদুরের কাজ করেছিলে? আমি তোমাকে আমার বিদ্যা শিখিয়ে দিলাম। তার পুরস্কার কী এই বেইমানী? তোমাকে দুটো ঝুড়ি আনতে পাঠালাম, তুমি আর ফিরলে না? আমাকে না তুমি ওস্তাদ বলে মেনে নিয়েছিলে? এই কী তোমার গুরুদক্ষিণা? একপাল খোজা শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে নাজেহাল করে ছাড়লো। তোমার ধরা সব মাছ-গুলো খোয়ালাম। অন্ততঃ একশোটা দিনার পাওয়া যেত বিক্রি করে। এখন তো দেখছি, এ সবই তোমার কারসাজী! কাল যাদের ওখানে দেখেছিলাম, যারা আমার মাছগুলো সব কেড়ে-কুড়ে নিয়েছিল, মনে হচ্ছে, তারা সবাই এখানে তোমার আশেপাশে আছে। সে যাক, এখন বল দেখি সানাই-এর পো,

তোমার এই বন্দীদশাটা কী করে হলো? এইভাবে তোমাকে কয়েদ করে রেখেছে কে?

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটষট্টিতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সুলতান হাসলেন। সোনার গামলাটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা ধর খলিফা। এর থেকে একটিমাত্র কাগজের মোড়ক তুলে নাও।

কিন্তু খলিফা সুলতানের কথায় আমল না দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, হায় বাপ্, এ কি কাণ্ড! সানাই ছেড়ে কী জ্যোতিষ ধরলে নাকি? গতকাল তো জেলে হতে চেয়েছিলে, আজ হয়েছ জ্যোতিষী! বাঃ বেড়ে! তবে একটা কথা জেনে রাখ সানাই-এর পো, যত বেশি রকমের ব্যবসা ধরবে, লাভের অঙ্ক কিন্তু ততই কমতে থাকবে। ধর যদি—

বাধা দিয়ে জাফর বলে, থাক আর জ্ঞান দিতে হবে না। এবার একখানা মোড়ক তোল দেখি।

জাফর ওকে তখত্এর দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল। গামলার কাছে দাঁড় করিয়ে একটা হাত টেনে নিয়ে জোর করে ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে।

জেলে খলিফা মুঠি করে একগাদা কাগজের মোড়ক তুলে ধরলো।

জাফর প্রায় ধমকের সুরে বললো, তোমাকে না বলা হলো, মাত্র একখানা মোড়ক তুলবে। রাখ, রেখে দাও আবার। মাত্র একখানা তোল।

এবার সে একখানা মোড়কই উঠিয়ে আনলো। মোড়কটা খুলে সে সুলতানের হাতে দেয়, এই নাও সানাই-এর পো, দ্যাখ, কী উঠেছে আমার নসীবে। ঠিক ঠিক বাতাবে, কিছু লুকাবে না কিন্তু।

সুলতান কাগজখানা দেখে গম্ভীর মুখে জাফরের হাতে দেয়। জাফরের মুখখানা আরও কালো হয়ে যায়। লেখা ছিল: একশোটা চাবুকের ঘা।

তৎক্ষণাৎ মাসরুরকে ডাকা হলো। এবং সপাং সপাং করে একশো চাবুকের আঘাত পড়লো খলিফার পিঠে। কিন্তু ওর তাতে ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। যেন তেমন কিছুই হয় নি।

জাফর এবার আর্জি জানায়, আমার মনে হয়, এই গরীব বেচারাকে আর একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। ধর্মাবতার যদি আজ্ঞা করেন, তবে খলিফা আর একবার মোড়ক তুলে ভাগ্য যাচাই করতে পারে। আহা, অনেক মার খেয়েছে সে।

—তুমি তো বড় বেহুদা হে জাফর, সুলতান কী তার কথার খেলাপ করবে? হয়তো এবার সে ফাঁসীর কাগজখানাই তুলে বসতে পারে, ওর মৃত্যু দেখবারই কী বাসনা হয়েছে তোমার?

জাফর বলে, শোভান আল্লাহ, এর চাইতে ফাঁসীর কাগজ তোলাই বুঝি ভাল ছিল ধর্মাবতার।

—তাই নাকি? ঠিক আছে, তোমার কথাই থাক। তোল দেখি হে আর একবার।

কিন্তু খলিফা বেঁকে বসলো, খোদা তোমাদের দুধে-ভাতে রাখুন। অত ভালয় আমার কাজ নাই। চাই না আমি আমির বাদশাহ হতে, মাথায় থাক তোমার এই জ্যোতিষ খেলা। শোনও সানাই-এর পো আর ও কাজটি হচ্ছে না আমাকে দিয়ে।

জাফর বলে, আমি বলছি, তোমার বরাত খুলবে। ভালো করে নেড়ে-চেড়ে আর একখানা তোল।

খলিফা নিমরাজি হয়ে গামলার মধ্যে হাত ঢোকায়। একখানা মোড়ক তুলে জাফরের হাতে এগিয়ে দেয়। জাফর খুলে দেখে চুপ করে যায়।

—কী, কী হলো? চুপ করে গেলে কেন, উজির? বল, কী লেখা আছে?

কাগজখানা সুলতানের হাতে তুলে দিতে দিতে সে বলে, কিছুই লেখা নাই, জাঁহাপনা, একেবারে সাদা।

তোমাকে বলে দিলাম না, ওর কপালে ভালো কিছু নাই। যাক, এবার বিদায় করে দাও।

জাফর বললো, এটা তো ঠিক যাচাই হলো না, ধর্মাবতার।

—ঠিক আছে, আর একবার তুলতে বল, কিন্তু মনে থাকে যেন, এই-ই শেষ বার।

সে-বারে সে যে কাগজখানা তুললো তাতে লেখাছিল—এক দিনার।

খলিফা জেলে শাপ-শাপান্ত করে, নিপাত যাও, সানাই-এর পো। একশো ঘা চাবুকের বদলে দিচ্ছ মাত্র একটা দিনার! এর প্রতিফল তুমি পাবে আল্লাহর দরবারে—শেষ বিচারের দিন।

সুলতান অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। জাফর আর এই বেদনা-দায়ক পরিহাস সহ্য করতে পারছিল না। খলিফাকে সে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে চলে গেল।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো উনসত্তরতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

সেই হতভাগ্য জেলে যখন মনের দুঃখে প্রাসাদের সদর ফটক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন দূর থেকে ছুটে এসে নিগ্রো খোজা সাঁদাল ওর পথরোধ করে দাঁড়ালো, ভাগ না দিয়ে পালাচ্ছো যে বড়!

কিসের ভাগ?

—বাঃ, সুলতানের ঘরে দিয়ে এলাম। ইনাম বকশিশ যা পেয়েছ হিস্সা মতো তার আদ্দেক ভাগ দেবে না আমাকে? এটা তো আমার হক মতো ন্যায্য পাওনা।

খলিফা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, হকের পাওনা? তা নেবে, নাও। আমি

যে একশো ঘা চাবুক খেয়েছি—তার আদ্দেক নেবে ? নিতে পারবে ? আর এই নাও একটা দিনার নগদ পেয়েছি। এটার আর আদ্দেক না, পুরোটাই তুমি নাও।

এই বলে দিনারটা খোজা সাঁদালের মুখে ছুঁড়ে মারলো সে। তারপর হন হন করে ছুটতে থাকলো। মুদ্রাটা কুড়িয়ে নিয়ে খোজা সাঁদাল দৌড়ে এসে খলিফার হাতে একটা থলে গুঁজে দেয়।

আরে, পালাচ্ছো কোথায় ? তোমার মাছের দাম নেবে না ? এই নাও, একশো দিনার আছে। আর এই নাও তোমার সেই এক দিনার।

এতক্ষণে খলিফার মুখে হাসি ফোটে। লোকটাকে যত খারাপ সে ভেবেছিল আসলে ততটা খারাপ নয়। তা না হলে মাত্র দুটো মাছের দাম একশো দিনার কেউ দেয় ?

বুকের মধ্যে দিনারের থলেটা লুকিয়ে সে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে চলতে থাকে।

বাঁদী-বাজারের পাশ কাটিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হয়। খলিফা দেখলো, দুটি লোক একটা লম্বা বাক্স সামনে করে বিচিত্র ভঙ্গীতে হাঁক ডাক করছে, এই যে বণিক সওদাগর সাহেবরা—দেখে যান, কম দামে ভালো সওদা ঘরে নিয়ে যান।

খলিফা থমকে দাঁড়ায়। কম দামে ভালো সওদা ! সে আবার কী ? এত কাল তো শুনে এসেছে, ন্যায্য দামে ভালো সওদা। পায়ে পায়ে সে ওদের কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে, কী গো, কী আছে তোমাদের বাক্সে ?

একজন বলে, বেগম জুবেদা নিলামে পাঠিয়েছেন। যা আছে তা বাক্সেই আছে। আগে থেকে কিছু দেখা যাবে না, বলা যাবে না। যদি ইচ্ছা করেন নিলাম ডাকতে পারেন। হারেমের মাল—বহুত সস্তায় বিকিয়ে যাবে। কে নেবেন আসুন।

অনেকেই ভিড় করে আসে। একজন দর দেয়—কুড়ি দিনার। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে—পঞ্চাশ। অন্য এক ব্যক্তি হাঁকে—একশো দিনার।

লোক দুটো তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে—এই যে মাত্র একশো দিনারে হারেমের মাল নিলাম হয়ে যাচ্ছে—মাত্র একশো দিনার। আর কেউ আছেন ? একশো একশো—

—একশো এক দিনার।

খলিফা দর দেয়। এরপর আর কেউ মুখ খোলে না। সুতরাং একশো এক দিনারেই ডাক শেষ হয়। খলিফা একশো এক দিনার গুণে দিয়ে বাক্সটা কাঁধে তুলে বাড়ির পথে রওনা হয়।

মনে মনে ভাবে স্বয়ং জুবেদার হারেমের সম্পত্তি। নিশ্চয়ই ভালো ভালো সাজ-পোশাক আছে। সুলতানের হারেমের সামান, পুরোনো হলেও অনেক দাম হবে। মনে মনে আকাশ-কুসুম রচনা করতে করতে এক সময় বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছয়।

মাছের বাজারের পিছনে তার বাস। এক বিরাট পড়ো বাড়ি। অসংখ্য

ঘর। এক একটা ঘর অধিকার করে আছে এক একটি জেলে পরিবার। সরকারী সম্পত্তি। কেউই ভাড়া দিয়ে থাকে না সেখানে। অবশ্য দেবার সংগতিও কারো নাই। সবাই দিন আনে দিন খায়। তবে খলিফার মতো দৈন্যদশা কারো নয়। লোকটা নেশা ভাঙ্গ কিছু করে না, শাদী নিকাও করেনি। সুতরাং বিবি বাল-বাচ্চা বা অন্য কোনও ঘাড়ে বসে খানেওলা লোকও কেউ নাই। তার পরিবার বলতে সে মাত্র একা। তবু তার রোজ দিন খাবার জোটে না। ঘরে একটা দানা বা ফুটো পয়সা সে জমিয়ে রাখতে পারে না কখনও। যেদিন বরাতে জোটে সেদিন সে খায়, অন্যদিন নিরম্বু উপবাস।

দরজার সামনে বিরাট দশাসই একটা বাক্স নামাতেই পড়শীদের অনেকেই এসে ভিড় জমায়।

—কি গো খলিফা, এ জিনিস কোত্থেকে নিয়ে এলে?

খলিফা বলে, কিনে এনেছি।

এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। চোখে মুখে দুর্বোধ্য আতঙ্ক বিস্ময় ফুটে ওঠে। এত বড় একটা বাহারী বাক্স—ভিতরে কী আছে কে জানে? এই বাক্সটারই তো অনেক দাম হবে? একটা দিরহাম যার ঘরে থাকে না, দিন ভিখিরির হাল যার, সে কি করে এ মাল কিনে আনবে? ধীরে ধীরে সকলের চোখে মুখে অবিশ্বাসের প্রশ্ন জেগে ওঠে, তা হ্যাঁ গো খলিফা, কত দামে কিনলে? পয়সা পেলে কোথায়?

—দাম? তা দাম নেহাত মন্দ না—একশো এক দিনার।

—একশো—এ—ক— দি—না—র? বল কি? এত টাকা কোথায় পেলে তুমি?

তখন খলিফা গতকালের এবং সে দিনের সমস্ত ঘটনা টিকা-টিপ্পনি সহকারে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করলো তাদের কাছে।

—জানো তোমরা, সেই সানাই-এর পোটা এমন অকৃতজ্ঞ, নরাধম আমাকে বাগে পেয়ে একশোটা চাবুক মারিয়ে একটা মাত্র দিনার ছাড়লো? আবার ওর সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলে কিনা, লোকটা স্বয়ং নাকি খলিফা হারুন অল রসিদ, যতো সব গাঁজা। তবে হ্যাঁ, জাতে হাবশী হলে কী হবে, নিগ্রোটা লোক ভাল। মাত্র দুটো মাছ সে নিয়েছিল। তার দাম হিসাবে পুরো একশোটা দিনার আমার হাতে দিল। আরে, সেই টাকার গরমেই তো মাথাটা বিগড়ে গেল। তা না হলে বাক্সের ভিতরে কী মাল আছে জানি না শুনি না—অমনি দুম করে পুরো পয়সাটাই বাজী ধরে বসলাম?

পড়শীরা তার এই অসম্ভব গাঁজাখুরী বানানো গপ্পো কেউই বিশ্বাস করে না। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়—এ নির্ঘাৎ চুরির মাল। প্রাসাদের হারেম থেকে চুরি করে আনা হয়েছে। দারুণ আতঙ্কে ভয়ে তারা কেঁপে ওঠে। এখুনি সারা মহল্লাটা খানাতল্লাসী করতে আসবে সুলতানের সিপাই সান্তরা। পাড়া সুদ্ধু সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবে দরবারে। তারপর একের অপরাধে অন্যের ফাঁসী—এ আর নতুন কথা কী?

—ওরে বাবা রে, কী হবে রে, বলে সকলে যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

খলিফা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওদের ভীত-চকিত ত্রস্ত পায়ে ছুটে চলার দিকে।

—যাব্‌ বাবা! এ কী হলো? সব যে কেটে পড়লো? এখন এই পেল্লাই বাক্সটা আমি ঘরে ঢোকাই কী করে?

যাই হোক, অনেক কায়দা কসরত করে অপরিসর দরজার চৌকাঠ গলিয়ে কোনও ক্রমে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসতে পারলো সে।

এতক্ষণে খলিফা বুঝতে পারে, বাক্সটা বিরাট বড়। কারণ তার ছোট্ট ঘরটার আধখানাই সে জুড়ে নিয়েছে। খলিফার মুখে হাসি ফোটে, তা মন্দ হলো না। খাট পালঙেকর কাজ দেবে। সটান টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে সে বাক্সটার ওপর। দেখে নেয়, আরাম সে শোয়া যাবে কিনা। নাঃ, একেবারে মানুষের মাপের প্রমাণ আকারের বাক্স। আনন্দে নেচে ওঠে সে। সত্যি সত্যিই সে শুয়ে পড়ে বাক্সটার ওপর।

শুয়ে শুয়ে ভাবে, না জানি ভিতরে কী আছে। নবাব বাদশাহদের খেয়াল খুশির কারবার। হয়তো এমন কোনও চিজ রয়ে গেছে, যা দিয়ে তার মতো একজন গরীব জেলের সারা জিন্দগীই মহা সুখে কেটে যেতে পারে।

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙলো, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। সারা ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ তার কানে আসে একটা ক'কানীর আওয়াজ। চমকে ওঠে খলিফা। কী রে বাবা, ভূত প্রেত নাকি! ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। হাতড়াতে হাতড়াতে চিরাগটা খুঁজে পায়। জ্বালায়।

নাঃ, ঘরে তো কেউ নাই। কিন্তু আবার সেই অদ্ভুত আওয়াজ। এবার সে বুঝতে পারে শব্দটা ঐ বাক্সের ভিতর থেকেই আসছে। ডালাটা খুলতে যায়। কিন্তু তালা দিয়ে বন্ধ করা।

একটুক্ষণ কী যেন ভাবে সে। তারপর একখানা ডাণ্ডা এনে ডালাটার ভিতরে ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই মট করে খুলে যায়।

ডালাখানা তুলতেই চমকে ওঠে সে। এ কী? কী যেন নড়াচড়া করছে? মূল্যবান সাজ-পোশাক পরা পরমাসুন্দরী একটি নারী-মূর্তি। খলিফা ভয়ে শিউরে উঠে। এ নির্ঘাৎ কোন হুর-পরী বা জিন।

ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে, কই গো, কে আছ, তোমরা বেরিয়ে এস, আমার ঘরে জিন ঢুকেছে।

তার চেঁচামেচিতে পড়শীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। বিরক্ত হয়ে কেউ কেউ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, কী, এত রাতে আরম্ভ করছে কী? একটু ঘুমাতে দেবে না?

আল্লাহকসম, তোমরা একবারটি আমার ঘরে এসে দ্যাখো, জিন এসেছে।

এবার তারা ক্রোধে ফেটে পড়ে, গাঁজা-ভাঙ্গ চড়িয়েছ বুঝি? যাও, ঘরে যাও।

যতো সব ঝুট ঝামেলা—

খলিফা হতাশ হয়ে ফিরে আসে। ততক্ষণে বাক্সের মধ্যে উঠে বসেছে মেরিজান। খলিফাকে দেখে সে আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ আমি কোথায় ?

খলিফা অবাক চোখে দেখতে থাকে, একেবারে ডানা-কাটা পরী। এমন রূপ সে জীবনে কখনও দেখেনি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, কে তুমি, মালকিন ?

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বাহাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

তখনও মেরিজানের নেশার ঘোর সবটা কাটেনি। জোর করে চোখের পাতা খোলার চেষ্টা করে বলে, আমার যুঁই চামেলীরা কোথায় ?

এরা দুজন মেরিজানের নিত্য সহচরী দাসী।

খলিফা বিস্মিত হয়ে তাকায়, এখানে যুঁই চামেলী কোথায় পাবো ? অনেক দিন আগে কয়েকটা হেনা এনেছিলাম। তা এতদিনে শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে বোধ হয়।

খলিফার এবম্বিধ বাক্য কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সব ঘোর কেটে যায় মেরিজানের। বড় বড় চোখ মেলে সে তাকায়। খলিফার আবির্ভাব সে আন্দাজ করতে পারে না। ঘরের দৈন্যদশা অবলোকন করে বেশ বুঝতে পারে, এ তার সেই প্রাসাদ-হারেম কক্ষ নয়। যে ভাবেই হোক, অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে এসে পড়েছে সে।

—আমি কোথায় ? তুমি কে ?

খলিফার কানে যেন মধু ঢেলে দিল কেউ। কী মিষ্টি গলার আওয়াজ! একেবারে গানের মতো। সুলতানের উদ্যানে একটা ঝরনা আছে। খলিফা একদিন ঐ ঝরনার পানি খেতে গিয়েছিল। এখনও সে ঐ কলকল শব্দ শুনতে পায় মাঝে মাঝে। ভারি মিঠে লেগেছিল সেই ঝরনার আওয়াজ। আজ, অনেকদিন পরে, আবার সেই ঝরনার গান শুনতে পেল সে এই রূপসীর কণ্ঠে। সামান্য দুটি কথা—'আমি কোথায়, কে তুমি।' কিন্তু এই সামান্য প্রশ্নই অসামান্য সঙ্গীত হয়ে ভেসে আসে তার কানে। বড় মধুর মনে হয়। ভালো লাগে।

—আমি এক অতি সাধারণ জেলে—নাম খলিফা। এই আমার দৌলতখানা। এখানেই আমি অবস্থান করি। আর ঐশ্বর্য বলতে আমার যা যা আছে তা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ সব। এ ছাড়া অন্য কোনও কিছু বৈভব আমার নাই। সংসারে আমি একা। আমার খানাপিনায় ভাগ বসাবার দ্বিতীয় ছিল না কেউ—আজ তুমি এলে।

—তা হলে আমি আর প্রাসাদে নাই ?

—বিলকুল না। তুমি এখন আমার 'প্রাসাদে' এসে গেছ। এবং একান্ত

ভাবেই আমার, তবে—

—অর্থাৎ—

—অর্থাৎ, তোমাকে আমি বাঁদী-বাজার থেকে নিলামে কিনে এনেছি, আমার শেষ সম্বল নগদ একশো এক দিনারে। এখন তুমিই আমার একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তবে সত্যি কথা বলছি শোন। কেনার সময়, বাক্সের ডালা খোলার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না, ভিতরে তুমি আছ! নিলামের শর্ত ছিল—'যো হ্যায়—সো হ্যায়'। তাই—সওদা দেখার প্রশ্ন ওঠে না।

মেরিজান হাসে, সে হাসিতে মুক্তো ঝরে। কাজল-কালো টানা টানা আয়ত চোখ মেলে তাকায়, তুমি আমাকে না দেখেই কিনে নিয়ে এলে?

—তুমি যে আছো, তা তো জানতাম না। আসলে আদৌ কিছু আছে কি না—তাও ভাবিনি তখন। শুধু মনে করেছিলাম, বেগম জুবেদার হারেমের মাল যখন, তখন খুঁজে পেতে দেখলে, এবং বরাতে থাকলে হয়তো মণি-মুক্তো কিছু মিললেও মিলতে পারে।

এবার মেরিজান সব কিছু ইয়াদ করতে পারে। সব স্বচ্ছ মনে পড়ে ওর। জুবেদার মহলে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল। সেই গান, সেই নাচ, সেই খানা খেতে বসা—

ব্যস্! তারপর তো আর কিছু মনে করতে পারে না সে। কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না, বয়সের ভারে প্রায় বিগত-যৌবনা, এক কালের পরমাসুন্দরী, বেগম জুবেদা তার রূপগুণের ঈর্ষায় কাতর হয়ে খাবারে ঘুমের দাওয়াই মিশিয়ে দিয়ে এইভাবে পার করে দিয়েছে তাকে।

খলিফার কথায় সব পর্দা সরে গেল মন থেকে। মুচকি হেসে সে জানতে চাইলো, তা পেলে কিছু তেমন মণিরত্ন?

খলিফা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কাব্য করে বলে ফেলে, হয়তো তারও বেশি পেয়েছি—

এই ভাবে টুকিটাকি কথাবার্তা, হাল্কা কিছু রসিকতার মধ্য দিয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দেয় ওরা। ভোরে মেরিজান বলে, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, খলিফা। তোমার ঘরে তো কিছু নাই। কি করা যায়, বল তো?

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না, একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

বাইরে এসে হাঁক পাড়তে থাকে, এই যে শুনছো, জিনের খিদে পেয়েছে, একটু খাবার কিছু দেবে, ভাই?

একটা জানলা খুলে যায়। আধখানা আধপোড়া রুটি, আর একটা শশা ছুঁড়ে দিয়ে আবার জানলাটা দড়াম আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে যায়।

রুটির টুকরো আর শশাটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে সে। বলে, এই নাও, খাও।

মেরিজান বলে, কিন্তু শুকনো রুটি গলায় আটকে যাবে যে। একটু পানি নিয়ে এস।

খালি কুঁজোটা তুলে নিয়ে আবার সে বাইরে চলে যায়। এবং একই ভাবে

ডেকে হেঁকে লোক জাগিয়ে একজনের কাছ থেকে নিয়ে আসে খানিকটা পানীয় জল।

মেরিজান খুব পরিতৃপ্তি সহকারে সেই পোড়া রুটি আর শশাটা উদরস্থ করলো।

—আর কিছু চাই, মালকিন?

খলিফা ওকে তুষ্ট করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কিন্তু মেরিজান বলে, বহুৎ সুক্রিয়া। আমার জন্য অনেক তকলিফ্ তোমাকে পোয়াতে হলো। এখন আর কিছু চাই না।

খলিফা বললো, তা হলে, মালকিন এবার আপনার কাহিনীটা একটু শোনান। কেন এবং কী ভাবে আপনি এই বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে বাঁদী-বাজারে বিক্রী হতে এলেন?

মেরিজান মধুর করে হাসতে জানে। সে হাসির বানে অনেক পাখি বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে পারে। খলিফাও কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—জুবেদা, মেরিজান বলতে থাকে, সুলতানের চাচার মেয়ে, পেয়ারের বেগম, বিকেল-বয়েসী জুবেদাই আমার এই দশা বানিয়েছে। হিংসায় সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। নেহাত বরাত জোর আমার, বুকে ছুরিফুরি বসিয়ে একেবারে খতম করে দেয়নি!

আমার মনে হয়, সে-ই আমাকে বাক্সে ভরে বাজারে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিল। এবার এর আসল কারণ শোন। সুলতান যে-কোন কারণেই হোক, আমাকে ভীষণ পেয়ার করেন। একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চান না—এই ছিল তার আক্রোশ। তবে খোদা মেহেরবান, তাঁর ইচ্ছাতেই আজ তোমার কাছে এসেছি আমি। তুমি আমার সঙ্গে আচার ব্যবহারও খুব ভালো করছো। এসব কথা ধর্মাবতার অবশ্যই জানবেন। এবং তার যোগ্য পুরস্কার তুমি পাবে।

খলিফা বললো, কিন্তু এই কী সেই হারুন অল রসিদ যাকে আমি মাছ-ধরা শিখিয়েছিলাম? প্রাসাদের ভিতরে সে একটা ইয়া বিরাট বড় পিঁজরা পোলের মতো কুর্শিতে বসে থাকে?

মেরিজান বলে, ঠিক। ঠিক বলেছ।

খলিফা বলে, তা—যাই বল না কেন, লোকটা মোটেই সুবিধের না। সানাই-এর পোঁ ধরে ধরে গাল দুখানা টোপাকুলের মতো ফুলিয়ে ফেলেছে। একেবারে ডাঁহা মিথ্যুক, ঠগবাজ পাজি শয়তান। এত বড় বদমাইশ, আমার পরণের কাপড় চুরি করলো, তারপর একশোটা চাবুক মেরে একটা দিনার ধরিয়ে দিল হাতে। এরপর একদিন যদি পথে-ঘাটে পাই বাছাধনকে—

মেরিজান ঠোঁটে তর্জনী রেখে চোখের ইশারায় চুপ করতে বলে, ওসব কথা থাক, জানতো দেওয়ালেরও কান আছে। অন্যে কী খারাপ আচরণ করলো, না করলো, সে সব নিয়ে দুঃখ করতে নাই। নিজে ভালো হও। লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর, দিলটাকে সাফা রাখো। তোমার আচার ব্যবহারেই তোমার পরিচয়। শিক্ষা দীক্ষা সবই পণ্ড হয়ে যায়, যদি না তুমি নম্র বিনয়ী এবং

মধুরভাষী হতে পার। সমাজের ওপর তলায় আসন পেতে গেলে আগে তোমাকে কথা বলতে শিখতে হবে। তা না হলে তোমার কোন জ্ঞান বা বিদ্যাবুদ্ধি কোনও কাজে আসবে না।

ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তিয়াত্তরতম রজনীতে

আবার সে বলতে আরম্ভ করে :

মেরিজানের কথাগুলো খলিফার মরমে গিয়ে বিঁধে। এতকাল পরে তার চোখের সামনে থেকে অজ্ঞতার এক কালো পর্দা সরে যায়। অভ্যাস-লব্ধ কটু-ভাষা, এবং সহজলভ্য নিষ্ঠুর আচার আচরণ পরিহার করে সদা মধুরভাষী হওয়ার এবং সহজাত সুকুমার বৃত্তিগুলো জাগ্রত করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

খলিফাকে আদর্শ মানুষ হতে গেলে কী কী আচার আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং কী কী বিধি নিয়ম মেনে চলতে হবে তার বিস্তারিত উপদেশবাণী শোনায় মেরিজান।

খলিফা বলে, এতদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম। আজ তুমি আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিলে। কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, জানি না। তোমার প্রতিটি উপদেশ আমি যথাসাধ্য মেনে চলবো। এখন বল, কী আমাকে করতে হবে।

মেরিজান বলে, কিছু করতে হবে না, শুধু একটুকরো কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে এস।

খলিফা প্রতিবেশিদের একজনের কাছ থেকে কাগজ ও কলম এনে দেয় মেরিজানকে।

মেরিজান ছোট্ট একখানা চিঠি লিখলো জহুরী ইবন কিরনাসের নামে। অতি সংক্ষেপে জানালো তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী। পরিশেষে লিখলো, এখন সে এই জেলে খলিফার ঘরে আছে। বাঁদী-বাজার থেকে একশো এক দিনার দিয়ে তাকে কিনে এনেছে সে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে খলিফার হাতে দিয়ে সে বললো, সোজা চলে যাও স্যাকরা পট্টিতে—জহুরী ইবন কিরনাসের দোকানে। চিঠিখানা তার হাতে দেবে। সে যা বলে শুনবে। কিন্তু একটা কথা, আচার ব্যবহার কথায় বার্তায় কোনও রকম অসভ্যতা যেন প্রকাশ না পায়।

খলিফা বললো, আপনার উপদেশ আমার মনে আছে, মালকিন।

দ্রুত পায়ে চলে যায় সে স্যাকরা পট্টিতে কিরনাসের দোকানে। মাথা নুইয়ে তাকে আদাব জানিয়ে চিঠিটা তার হাতে তুলে দেয়। কিরনাস মাথা নত করে না। ঠোঁট নেড়ে আদাব জানায়। ভাঁজ করা চিঠিখানা না খুলে আলতোভাবে দু' আঙুলে ধরে একপাশে রেখে দেয়। ভাবে, কারো কাছ থেকে কোনও প্রশংসাপত্র লিখিয়ে এনেছে। এও এক জাতের ভিখিরিদের ভিক্ষে আদায় করার ফিকির। কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে বলে, একটা আধলা দিরহাম দিয়ে

দে একে।

খলিফা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে আরও বিনয় বিগলিত হয়ে বলে, কিছু গুস্তাকী নেবেন না জনাব, আপনার কাছে কোনও দান ভিক্ষের জন্যে আসিনি আমি। মেহেরবানী করে ঐ চিঠিখানা যদি একবার পড়েন, আমি ধন্য হবো। তারপর আপনি যা বলবেন এ বান্দা তাই করতে প্রস্তুত আছে, মালিক।

কিরনাস একটু অবাক হয়। চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করে। এবং একটু পরেই আনন্দে নেচে ওঠে ওর চোখ। চিঠিখানা বার বার ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমু খেতে থাকে সে। খলিফাকে আদর করে পাশে বসায়, কোথায় থাকো তুমি ভাই, বাসা কোথায় ?

খলিফা মৃদুকণ্ঠে তার বাসগৃহের ঠিকানা জানায়। কিরনাসের আনন্দ আর ধরে না। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকে। দোকানের দুজন কর্মচারীকে বলে, একে এক্ষুনি মোসেসের কাছে নিয়ে যাও। বল, আমি বলছি, তহবিল থেকে যেন এক হাজার দিনার এর হাতে দেয় সে। তারপর আবার আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এস এই মেহমানকে।

একটুক্ষণ পরে নগদ এক হাজার দিনার সঙ্গে করে আবার সে ফিরে এল কিরনাসের দোকানে। কিন্তু এ কী এলাহি কাণ্ড! দুটি সুসজ্জিত খচ্চর— সোনার জিন লাগাম লাগানো। তার একটায় চেপে বসেছে জহুরী কিরনাস। আর একটা সওয়ারের অপেক্ষা করছে। এ পাশে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ ভাবে শ' খানেক নফর চাকর দাসদাসী। খলিফা ফিরে আসতেই খুব ঘরোয়া সুরে আদর করে কিরনাস বলে, চটপট, জলদি চেপে বসতো, দোস্ত।

খলিফা বলে, কিন্তু আমি তো কখনও খচ্চরে চাপিনি, জনাব। ও আমি পারবো না। আমি বরং হেঁটেই যাচ্ছি।

—আরে না না, সে হয় নাকি ? এতকাল চাপোনি তো কী হয়েছে ? আজ চাপবে। আচ্ছা দাঁড়াও। কী করে চাপতে হবে, আমি তোমাকে তালিম দিয়ে দিচ্ছি।

কিরনাস নেমে এসে খলিফাকে দু হাতে তুলে খচ্চরটার পিঠে বসিয়ে দেয়।

কিন্তু অনভ্যাসের কপাল চচ্চড় করে, খচ্চরটা বেগড় বাই করতেই লাগম ছেড়ে দিয়ে সে লেজে মোচড় দেয়। আর যাবে কোথায়, এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে, টাল সামলাতে পারে না খলিফা। এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হতে পারে, তাই ঘটলো। খলিফা ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। খচ্চরটা ছুটেই চললো।

কিন্তু এই সঙ্গেই সব দুর্ভাগ্যের ইতি হয়ে গেল খলিফার জীবনে। এর পরের অধ্যায়গুলো খুবই সুন্দর, সুখকর এবং আনন্দদায়ক।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুয়াত্তরতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

কিরনাস তার নফরদের বলে, সাহেবকে উঠিয়ে হামামে নিয়ে যাও। খুব

ভাল করে ঘষেমেজে গোসল করাবে। তারপর আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। আমি সেখানে অপেক্ষা করছি।

চাকররা খলিফাকে নিয়ে শহরের এক সম্ভ্রান্ত হামামে গেল। আর কিরনাস চললো খলিফার বাসায়—মেরিজানকে নিয়ে আসতে।

চাকর দুটো হামামের ইজারাদারকে বুঝিয়ে বললো, একেবারে শাহজাদার মতো বানিয়ে দিতে হবে। আপনি সাহেবকে গোসল করান, আমরা ওঁর জন্য সাজপোশাক সওদা করে নিয়ে আসি ততক্ষণ।

গোসলাদি শেষ করে হামাম থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তায় নামলো খলিফা, তখন কে বলবে সে শাহজাদা নয়। ওকে দেখার জন্য পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলো। এমন বাহারী বাদশাহী সাজ-পোশাকে সেজেছে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে কিরনাসের ইমারতে এসে পেঁছিয় ওরা। মেরিজানকে নিয়ে কিরনাস অবশ্য তার আগেই এসে গিয়েছিল সেখানে।

বিরাট একটা প্রশস্ত কামরা। তার মাঝখানে একটা 'দিবানে' বসেছিল মেরিজান। ওর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল শতাধিক দাসী বাঁদীরা।

খলিফা প্রবেশ করতেই সকলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো। অতি সহজেই খলিফাও প্রত্যভিবাদন জানায়। একেবারে বাদশাহী কেতায়!

খলিফার অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। সোজা সে মেরিজানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে আভূমি আনত হয়ে অভিবাদন জানায় তাকে। মেরিজান উঠে দাঁড়িয়ে হাতে ধরে তাকে নিজের পাশে বসায়। শরবতের দুটি পেয়ালা তুলে নিয়ে খলিফার হাতে দেয় একটা, এবং নিজে একটা নেয়। দুজনেই খুব ধীরে ধীরে পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকে।

খলিফা বিনম্র কণ্ঠে বলে, এই গৃহের আতিথেয়তা আমার বহুকাল স্মরণে থাকবে।

মেরিজান বলে, তোমার এই সংযত আচরণও এবাড়ির কেউ ভুলতে পারবে না, খলিফা। এবার তোমাকে সুলতানের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার আগে আমি তোমাকে দু-একটা উপদেশ দিতে চাই। যখন তুমি সুলতানের দর্শন প্রার্থনা করবে এবং তা মঞ্জুর হবে, তখন দরবারে প্রবেশ করে যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে তাকে সবিনয়ে বলবে, 'ধর্মাবতার, আপনার কী স্মরণে আছে, এই বান্দা একদিন আপনাকে জাল ফেলার কৌশল শিখিয়েছিল?' তিনি তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করবেন। তখন তুমি বলবে, আপনি কী আজ রাতে এই অধমের পর্ণকুটীরে একবার মহামান্য মেহমান রূপে পায়ের ধুলো দিতে পারেন না?' ব্যস্, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। দেখবে, তিনি অবশ্য আসবেন তোমার ঘরে।

খলিফা প্রায় শতাধিক নফর-চাকর পরিবেষ্টিত হয়ে তখুনি সুলতানের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়। খোজা সর্দার সাঁদাল তাকে চিনতে পেরে এগিয়ে আসে, কী ব্যাপার?

—সাঁদালজী, সুলতানের সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই। এই তার ভেট সহস্র মুদ্রা। তাকে দিয়ে মেহেরবানী করে বল, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

সাঁদাল কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে সে খলিফার জমকালো বাদশাহী সাজপোশাকের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে কিছুক্ষণ। তারপর দরবারে ঢুকে সুলতানকে বলতে থাকে, ধর্মাবতার, ব্যাপার কী হয়েছে, আমি বলতে পারবো না। তবে দেখে মনে হলো, সেই জেলে খলিফা হয়তো বা হালে সুলতান হয়েছে। তার সাজপোশাক এবং সঙ্গের নফর-চাকর পেয়াদা পাহারা দেখে অন্ততঃ তাই মনে হয়। আর এই নিন আপনাকে তিনি সহস্র দিনার ভেট পাঠিয়েছেন।

সুলতান গম্ভীর ভাবে বললেন, নিয়ে এস তাকে।

খলিফা দরবারে ঢুকেই আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো।

—খোদা আপনার মঙ্গল করুন, জাঁহাপনা। আপনি ত্রিভুবনের পিতা, ইসলামীদের রক্ষক। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন। আপনার সলতানিয়ৎ-এর প্রজারা সসম্মানে বসবাস করতে থাকুন। দুনিয়ার মহামতিদের নামের ওপরে আপনার নাম উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাক চিরকাল।

সুলতান সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন খলিফার এই আশ্চর্য পরিবর্তন।

—একটা কথার জবাব দেবে খলিফা, এই চমৎকার পোশাকটা তুমি পেলে কোথায় ?

—আমার প্রাসাদেই ছিল, জাঁহাপনা।

—আচ্ছা—তা হলে এখন তুমি প্রাসাদের মালিক ?

—হ্যাঁ, হুজুর। এখনও পর্ণকুটীরই বলতে পারেন। তবে আজ রাতে যদি মেহেরবানী করে আপনি পায়ের ধুলো দেন, তবে তা প্রাসাদই হয়ে যেতে পারে। আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ জানাতেই এসেছি, জাঁহাপনা। আজ আপনি আমার মহামান্য মেহমান হবেন, এই আশা করবো।

—মেহমান ? তোমার ?

হারুন অল রসিদ মৃদু হাসলেন, তুমি কি শুধু একা আমাকেই চাইছো ? না—আমার সঙ্গে যারা যেতে চায় তারাও যাবে ?

খলিফা বলে, সকলকেই আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, জাঁহাপনা। আপনার প্রাসাদ এবং দরবারের সকলেই যদি যান, আমি আরও খুশি হবো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁচাত্তরতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

হারুন জাফরকে ইশারা করতে সে খলিফার সামনে এগিয়ে এসে বললো, আজ রাতে আমরা তোমার অতিথি হলাম—ধর্মাবতারের এই অভিপ্রায়।

এরপর আবার যথাবিহিত কুর্নিশাদি সেরে খলিফা জাফরকে শুভেচ্ছা

জানিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল। সুলতান অনেকক্ষণ ধরেই ব্যাপারটা অনুধাবন করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না। পরিশেষে জাফরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা জাফর, বলতে পার, এই খলিফা জেলেটা গতকাল কী রকম সব হাঁদা বোকার মতো কাণ্ডকারখানা দেখিয়ে আমাদের হাসিয়ে মাতিয়ে গেল, সেই লোকটাই একটা রাতে এত আমূল বদলে গেল কী করে? তুমি দেখলে তো ওর আদব-কায়দা কেতা। কেমন মোলায়েম মার্জিত ভাষা! হঠাৎ রাতারাতি এ-সব সে রপ্ত করলো কী করে! মানব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে তো এত তাড়াতাড়ি এসব গুণের অধিকারী হওয়া যায় না। এরজন্য আজন্মের না হলেও বহুকালের শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস দরকার হয়। তাছাড়া এত অর্থই বা সে পেল কোথায়? বড় তাজ্জব কাণ্ড!

জাফর বলে, সবই তাঁর ইচ্ছা। কখন যে তিনি কাকে কী ভাবে চালান—তাঁর মহিমা বোঝা বড় ভার!

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে জাফর, মাসরুর এবং প্রাসাদের আরও দুজন প্রিয়-পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে খচ্চরে চেপে বসলেন সুলতান। জেলে-খলিফার বাড়ির ঠিকানা ধরে যেতে যেতে বিশাল এক প্রাসাদোপম ইমারতের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। ফটক থেকে প্রাসাদের দরজা অবধি বেশ কিছুটা পথ গালিচা ঢাকা। ঘরের সারা মেঝেটা নানা কারুকাজ করা অতি মূল্যবান পারস্য-গালিচায় মোড়া। দরজা জানলায় বাহারী অথচ নয়নাভিরাম পর্দা খাটানো।

সুলতান দেখলেন, দরজার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে খলিফা জেলে।

—আসতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা।

ঘরের ভিতরটায় প্রবেশ করে চোখ জুড়িয়ে যায়। লোক দেখানো জাঁক-জমকের চেয়ে সারা ঘরময় ছড়িয়েছিল এক রুচিরা হাতের যাদুস্পর্শ, খুব যে একটা অসম্ভব দামী দুষ্প্রাপ্য আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো গোছানো তা নয়। পরন্তু বলা যায়, অতি নগণ্য একটা সাধারণ খেলনাও জায়গা মতো রাখার গুণে ঘরের আদলই গেছে বদলে।

মোট কথা মনোহর নয়—মনোরম পরিবেশ। মার্জিত রুচি সর্বত্র। সব মিলে এক ছন্দবন্ধ কাব্যের রূপ ধারণ করে আছে ঘরখানা।

ঠিক মাঝখানে সোনা দিয়ে মোড়া হাতীর দাঁতের চৌকো একখানা তখত্। সুলতানকে সসম্মানে সেই মসনদে বসালো খলিফা জেলে। জাফর বসলো ওর এক পাশে। মাসরুর এবং অন্য দুজন দাঁড়িয়ে রইলো অদূরে।

নফর চাকররা খানাপিনা এনে থরে থরে সাজিয়ে দিল। মুরগী, হাঁস, ভেড়া এবং নানারকম পাখীর মাংসের হরেক রকম পদ। সুগন্ধে আমোদিত হয়ে উঠলো সারা ঘর। সুসজ্জিতা বাঁদীরা শরাবের পাত্র পূর্ণ করে দিতে থাকলো।

সুলতান বিস্ময়ে হতবাক। তিনি তখনও ভাবতে পারছিলেন না, এ কী সত্য? জাফরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাফর, আমার আল্লার কসম খেয়ে বলছি,

এত সুন্দর ব্যবস্থা আগে কখনও দেখিনি। এতটুকু উৎকট বাড়াবাড়ি নাই, সব যেন নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন—মন-প্রাণ ভরে গেছে আমার। আমি যা কল্পনা করেছিলাম, এ দেখছি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর।

জাফর বলে, ধর্মাবতার, কে বলতে পারে এখন পর্যন্ত যা দেখলাম, তা আসলে কিছুই দেখা নয়। এরপরে যা দেখাবে, তা হয়তো আরও সুন্দর, আরও চমৎকার—

এই সময় জেলে খলিফা এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বললে, মহামান্য ধর্মাবতার যদি আজ্ঞা করেন, তবে তার এক বাঁদীকে এখানে গান গাইবার জন্য হাজির করতে পারি। তামাম বাগদাদের সেরা গাইয়ে সে।

—আর্জি মঞ্জুর।

সুলতান সম্মতি জানালেন। মেরিজান বোরখায় সারা অঙ্গ জড়িয়ে সামনের মঞ্চে এসে বসলো। খলিফা হারুন অল রসিদ তেমন নজর করলেন না—করলেও অবশ্য ধরতে পারতেন না। কিন্তু গানের সুললিত কণ্ঠ যখন সারা ঘরে অনুরণন তুলতে থকলো তখন সুলতান ছটফট করে উঠলেন।

—এ কি? এ কার কণ্ঠ? না না না, সে কী করে হয়? তবে কী হুবহু একই কণ্ঠ দুজনের হতে পারে?

সুলতানের সারা মুখ বিবর্ণ পাংশু বর্ণ হয়ে যায়। কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। তারপর—তারপর আর কিছুই তিনি মনে করতে পারেন না। ঢলে পড়ে যান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছিয়াত্তরতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

হঠাৎ সুলতান মূর্ছিত হয়ে পড়ায় ঘর সুদ্ধু সকলে তাকে ঘিরে ধরে। সকলের মুখে চোখে দারুণ আতঙ্ক ভয়। কিন্তু মেরিজান নির্বিকার। সে জানে, এর আসল কারণ কী? খলিফাকে বলে, সবাইকে বাইরে যেতে বল তো। কোন ভয় নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে এখুনি।

সকলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। শুধু রইলো মেরিজান, জেলে খলিফা আর অচৈতন্য সুলতান। ক্ষিপ্র হাতে বোরখা এবং ইজার টেনে খুলে দেয় মেরিজান। শুধু পরনে থাকে এক নয়ন-সুখকর সাজ-পোশাক। এই পোশাকটা সুলতানের বড় প্রিয় ছিল। প্রাসাদে সে বেশির ভাগ সময়ই পরে থাকতো।

অল রসিদের গা-ঘেঁষে বসে পড়ে সে। চোখে মুখে গোলাপ জলের ঝাপটা দেয়। এবং হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে।

একটু পরে চোখ মেলে তাকালেন খলিফা। সামনে মেরিজানকে দেখামাত্র আবার মূর্ছা গেলেন। মেরিজান এবার অল রসিদকে জড়িয়ে ধরে আদর

সোহাগ চুম্বন করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সুলতানের আচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটে না। তিনি কঁকিয়ে ওঠেন, তবে কী এই সেই শেষ বিচারের দিন? মৃতেরা কী সবাই উঠে এসেছে আজ? না আমি খোয়াব দেখছি?

মেরিজান আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে, না না না, ও কথা আপনি কী বলছেন, জাঁহাপনা! এই তো আমি বেঁচে আছি, রক্ত-মাংসের দেহ নিয়েই বেঁচে আছি, ধর্মাবতার। শেষ বিচারের দিনও না, খোয়াবও না। আমি আপনার পেয়ারের মেরিজান—তাকিয়ে দেখুন, হুজুর, আমি সশরীরে বেঁচে আছি। আমাকে কেউ কবর দেয়নি, মরিনি আমি। আমি মারা গেছি—আমাকে কবর দেওয়া হয়েছে সবই মিথ্যা। আপনাকে ওরা ধোঁকা দিয়েছিল, ধর্মাবতার। আজ আমি জানে বেঁচে আবার আপনাকে ফিরে পেয়েছি, তার জন্য একমাত্র দায়ী এই খলিফা, আর কেউ নয়।

অল রসিদ হাসলেন, কাঁদলেন, চোখের জল মুছলেন এবং সব শেষে আবার হাসতে থাকলেন। তারপর সব কথা ফুরিয়ে গেলে গভীর আশ্লেষে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মেরিজানকে। চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে দিলেন অধর কপোল বক্ষ।

এইভাবে অনেক অনেকক্ষণ একে অন্যের মধ্যে হারিয়ে রইলো। এক সময় জেলে খলিফা উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারী দিয়ে বলে ধর্মাবতার, রাত অনেক গভীর হয়ে আসছে। এবার বোধহয় আর এভাবে এখানে পড়ে থাকা সংগত হবে না।

সুলতান সহাস্যে মুখ তুলে বললেন, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়লে নাকি। ঠিক আছে, ওদের ডাকো। শোনও খলিফা, আমার জন্য যা তুমি করেছ, সে ঋণ শোধ করা যায় না। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, তুমি আমার একটা অঞ্চলের সুবাদার হয়ে চিরকাল আমার পাশে পাশে বন্ধুর মতো শুভানুধ্যায়ী হয়ে থাক—এই আমার ইচ্ছা।

—বান্দা কী কখনও মনিবের আজ্ঞা অমান্য করতে পারে, ধর্মাবতার! আমি রাজি।

—শুধু তুমি আমার সুবাদারই হবে না খলিফা, তুমি হবে আমার প্রাণাধিকা মেরিজানের মালঞ্চের নতুন মালাকর। আমি তোমার হাতেই সঁপে দিতে চাই একে। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা দুজনেই সুখী হবে। চিন্তার কোন কারণ নাই, মেরিজানের ভরণ-পোষণের জন্য মাসে দশহাজার দিনার বরাদ্দ করে দেব আমি। এ ছাড়া তার সাজ-পোশাক, অলংকার বাসস্থান দাস দাসী এবং নানা বিলাসের সামগ্রী যৌতুক দেব তাকে। প্রতিদিনই তোমাদের সংগে আমার দেখাসাক্ষাৎ হবে। এবং প্রাসাদের উৎসব অনুষ্ঠানে সাদরে ডেকে নিয়ে যাবো। এক সংগে খানাপিনা গান-বাজনা আমোদ আহ্লাদ করবো।

খলিফা আভূমি আনত হয়ে সুলতানকে কুর্নিশ জানায়।

এরপর বহুকাল সে মেরিজানকে জীবন-সঙ্গিনী করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর

সংসার করেছিল।

শাহরাজাদ ক্ষণকালের জন্য থামে। এ গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু, জাঁহাপনা, তাই বলে ভাববেন না, এর চেয়ে ভালো গল্প আপনাকে শোনাতে পারবো না।

শাহরিয়ার বলে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র আমার সংশয় নাই, শাহরাজাদ। এর পর তুমি কী কিস্‌সা বলতে চাও? নাম বল। নিশ্চয়ই সেটা এই জেলে খলিফার কাহিনীর চেয়েও মজাদার হবে।

শাহরাজাদ বলে, আমার পরের গল্পের নাম······

শাহরাজাদ বলেঃ আমার গল্পের নাম বসরাহর হাসানের দুঃসাহসিক অভিযান।

অনেককাল আগে পারস্য ও খুরাসনের বাদশাহ ছিলেন কিনদামির। সমগ্র ভারত চীন ও সিন্ধের সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছিলেন তিনি। তাঁর মতো দুঃসাহসিক, যোদ্ধা, দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার, এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসি-যোদ্ধা আর কেউ ছিল না। ভ্রমণ, শিকার এবং লড়াই-এ তার আসক্তি ছিল অপরিসীম। এছাড়া আলোচনা, বিতর্ক এবং রঙ্গ রসিকতাতেও সবিশেষ পটু ছিলেন তিনি।

উৎসব অনুষ্ঠানে কবি দার্শনিক এবং কথকদের আমন্ত্রণ জানাতেন। তাদের কাব্য কাহিনী এবং সারগর্ভ আলোচনা শুনতেন। যদি কখনও কোনও বিদেশী মুসাফির তার আশ্রয়ে আসতো, প্রভূত সমাদরে তাকে আপ্যায়ন করতেন। তাঁর জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতেন। এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর সভার বেতনভুক কবি এবং কথকদের তিনি উজিরের সমান মর্যাদায় আসন দিতেন। এই কারণে তাঁর প্রাসাদে দেশের সেরা বিদ্বজ্জনদের সমাবেশে এক মহাতীর্থ হয়ে উঠেছিল। বহু লুপ্ত প্রায় গল্পগাথা কাব্য-দর্শন তার প্রচেষ্টায় আবার নতুন করে বেঁচে উঠতে পেরেছিল।

আপনি শুনে হয়তো অবাক হবেন জাঁহাপনা, তাঁর স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, একবার তিনি যে গল্প-গাথা শুনতেন তা আর কোনও দিনই বিস্মৃত হতেন না। এই রকম শোনা বহু ভারতীয়, আরবী এবং পারসী উপকথার প্রতিটি ছত্র তিনি নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে পারতেন। বহু কবির কাব্য অনর্গল মুখস্থ আবৃত্তি করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না তাঁর।

এইভাবে দিনে দিনে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নতুন কিছুই আর বাকী ছিল না শোনার। যিনি তাঁকে যা শোনাতে আসতেন তা

পূর্বাহ্নেই জানা বলে আর শোনার কোনও দরকার হতো না তাঁর। এই কারণে দুঃখ পরিতাপের অন্ত ছিল না বাদশাহ কিনদামিরের। কি করে কার গল্প কিস্‌সা শুনে তিনি অবসর বিনোদন করবেন সেই চিন্তাই তাঁকে দহন করতো সর্বদা।

একদিন এই রকম এক যন্ত্রণা-কাতর মুহূর্তে বাদশাহ কিনদামির তাঁর ব্যক্তিগত খোজাকে বললেন, যা তো, আবু আলীকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

আবু আলী বাদশাহর খুবই প্রিয়পাত্র। তার সমকক্ষ কথক সে-সময়ে আর দ্বিতীয় ছিল না কেউ। এমন গল্প সে ফাঁদতে পারতো যা শুনতে শুনতে শ্রোতারা আহার নিদ্রা ভুলে যেত। একটা কিস্‌সাই একনাগাড়ে এক সাল ধরে বলে যেত সে। কোথাও কোনও ছেদ-যতি পড়তো না। শুনতে শুনতে কেউ হাই তুলতো না, কেউ বলতে পারতো না—গল্পটা কোনও জায়গায় ঝিমিয়ে আসছে বা শুনতে আর তেমন জমজমাট মনে হচ্ছে না।

সেই আবু আলীও আজ বাদশাহর কাছে দেউলে হয়ে গেছে। তার সমুদ্র-গর্ভ গল্পের অগাধ সম্ভার সব আত্মসাৎ করে নিয়েছেন তিনি। নতুন গল্প তেমন আর বানাতে পারে না আজকাল। তবু বাদশাহ আবু আলীকে অশ্রদ্ধা করেন না। ভাঁড়ারের সবখানি উজাড় করে দিয়েছে সে। এবং তার পরিমাণও পর্বত প্রমাণ। এতবড় গুণী লোককে সমাদর না করে কী পারা যায়?

বৃদ্ধ আবু আলী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

—এই যে এসো এসো। এককালে কত গল্প কিস্‌সা শুনিয়েছ, আজ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে। তা সত্ত্বেও তোমাকেই আজ ডেকে পাঠিয়েছি। নতুন একটা কিস্‌সা শোনাতেই হবে। কী, পারবে না? আমি যে অনেকদিন উপবাসী, আলী। আজকাল কেউ আর নতুন কোনও কাহিনী শোনাতে পারে না। যারা আসে, তারা সবাই পুরোনো কাহিনীই সম্বল করে আসে। সবই যে আমার শোনা। দেশে গল্পের এত দুর্ভিক্ষ হয়ে গেল কেন, আলী? আমার যে একা একা সময় আর কাটে না। তাই বলছি, নতুন কোনও গল্প যদি শোনাতে পার, আমি তোমাকে একটা জায়গীর দেব, অনেক বাগ-বাগিচা গোলা-বাড়ি চাষাবাদের নিষ্কর, জমিজমা দেব। কিন্তু একটা শর্ত—এমন গল্প বলবে যা আমার অজানা এবং অসাধারণ। যদি তোমার কাহিনী শুনে আমি মুগ্ধ হই, কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমার প্রধান উজিরে বহাল করবো। এবং তুমি আমার ডান পাশে বসবে। এবং তোমার খেয়াল খুশি মতো হুকুমত চালাবে। পুরো ক্ষমতা দেওয়া হবে তোমাকে। আর যদি বল, না, পারবে না শোনাতে তেমন কাহিনী, তবে আর এখানে পড়ে থেকে কী করবে? তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিবি বালবাচ্চাদের কাছে দেশে ফিরে যাও। বাকী জীবনটা শাক-রুটি খেয়ে কাটিয়ে দাও গে।

বাদশাহর প্রস্তাব শুনে আবু আলী দিশাহারা হয়ে পড়ে।

—শাহেন শাহর আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু জাঁহাপনা এই অজ্ঞ-অধম আপনার একটু দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করছে। আমি কিস্‌সা আপনাকে শোনাবো

ঠিকই, তবে তার জন্য একটা বছর সময় ভিক্ষা করছি। এক বৎসর পরেও যদি আমি কাহিনী শুরু করতে না পারি, তবে বাদশাহ যে ফরমান দিয়েছেন, আমি তা মেনে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবো।

বাদশাহ বলেন, পুরো একটা বছর—বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে না? কে বলতে পারে কোন্ মানুষ আরও একটা সাল বেঁচে বর্তে থাকবেই? যাই হোক, তোমার গল্প আমার বড় প্রিয়। সেই কারণে একটা বছরই সময় তোমাকে দিলাম। তবে একটা শর্ত – এই সময়কালের মধ্যে তুমি তোমার গৃহ-ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পারবে না।

আবু আলী বাদশাহকে কুর্নিশ জানিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

একা একা বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো সে। তারপর তার প্রিয়পাত্র পাঁচটি তরুণ ম্যামলুককে ডেকে বললো, বড় বিপদে পড়েছি, বাবা সকল। বাদশাহ হুকুম করেছেন, নতুন গল্প শোনাতে হবে। এবং অপূর্ব অসাধারণ হওয়া চাই। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে নতুন গল্প কোথায় পাবো আমি! তাই তোমাদের কাছে ...নুরোধ, এই বুড়ো মনিবকে যদি বাঁচাতে চাও তবে তোমাদের একটু ... হবে।

...াদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার দিনার সংগে দিচ্ছি। পাঁচদিকে ...য়ে পড়। পৃথিবীর নানা দেশ তোমরা পরিভ্রমণ করবে। নানা ... মানুষের সঙ্গে মিশবে। তাদের কাছ থেকে গল্প কিস্‌সা ...মধ্যে বসরাহর হাসান-এর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী যদি ... পারে, তাকে খুশি করে, পয়সা কড়ি যা চায় দিয়ে, তার কাছ ...াহিনী শুনে একটা খাতায় লিখে আনবে। আমি নিজে জানি না ...। এবং আমার বিশ্বাস খুরাসন পারস্যের কোনও কথকই তা ... দুনিয়ার সব কিস্‌সাই তাকে আমি শুনিয়েছি শুধু মাত্র এই একটা ...াহ কিনদামিরের না জানা। এ কাহিনী যদি তাঁকে শোনাতে পারি, ...-ইজ্জত সব বাঁচবে। আমি বাদশাহর জায়গীর জমা পাবো, উজির ...কুমত চালাবো। আর তা যদি তোমরা কেউ সংগ্রহ করে না আনতে ...ামার নকরী যাবে। শূন্য হাতে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। এখন ...াদের হাতে। তোমরা যদি চেষ্টা কর, যদি ঐ হাসানের লুপ্ত কাহিনী ...রে আনতে পারো তবেই তোমাদের মনিবের মুখ রক্ষা হয়।

...ু আলী তার পাঁচজন কর্মচারী, কে কোন্ দেশে যাবে তাও বলে ... প্রথম জনকে বললো, 'সে যাবে ভারত এবং সিন্ধে'। দ্বিতীয় জন ...রস্য, চীন এবং তার আশে পাশের দেশ। তৃতীয় যাবে, খুরাসন এবং ...লগ্ন রাষ্ট্রগুলি। চতুর্থ যাবে মাঘরীবের পূর্ব পশ্চিম এবং পঞ্চম জন ...মগ্র মিশর এবং সিরিয়া।

...র হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতাত্তরতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

দিনক্ষণ দেখে একদা পাঁচজনকে পাঁচদিকে রওনা করে দিল আবু আলী।

এর এগার মাস পরে চারজন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এসে জানালো, তারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করেও এমন কোনও মানুষের সন্ধান করতে পারেনি যে তাদের সেই হাসানের কাহিনী শোনাতে পারে।

আবু আলী বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চিন্তায় ভাবনায় বার্ধক্য নেমে আসে দেহে মনে। প্রায় হতাশ হয়ে শুধু আল্লাহর নাম জপ করতে থাকে। এখন একমাত্র ভরসা তিনি। তাঁর দয়া না হলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

সবাই শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। শুধু মুবারকই ফেরেনি।

তামাম মিশর এবং সিরিয়ার প্রায় বেশির ভাগ অঞ্চলই সে ঘুরেছে। কিন্তু হাসানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী জানে—তেমন কোনও ব্যক্তিরই সন্ধান পায়নি। তবু সে আশা ছাড়েনি। অক্লান্তভাবে ঘুরে চলেছে।

কাইরোর জগৎ বিখ্যাত কথকদের সঙ্গেও সে দেখা করেছিল। তারা তাকে আরও অনেক মজার মজার কাহিনী শোনাতে চেয়েছিল। কিন্তু আবু হাসানের দুঃসাহসিক অভিযান তাদের সকলেরই অজানা। তাই প্রায় ব্যর্থ মনোরথ হয়েই সে স্বদেশে ফেরার উদ্যোগ করছিল। কারণ সময় আসন্ন। এক বছর পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নাই। তার মধ্যে মালিককে কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হবে।

কাইরো ছেড়ে মুবারক দামাসকাসে আসে। মনে তখনও আশা—যদি কেউ শোনাতে পারে।

দামাসকাস বড় সুন্দর শহর। তার পথ ঘাট, হাট বাজার, প্রাসাদ ইমারত চোখ মেলে দেখার মতো। তাছাড়া চমৎকার জলহাওয়া। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এক পড়ন্ত বিকেলে শহরের অভ্যন্তরে এসে পৌঁছয় সে। একটা সরাইখানার সন্ধানে এপথে ওপথে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। বড় বড় দোকান-পাট, ফিরিওলা, গাধা, খচ্চর, ভিস্তিওলা, ছেলে-ছোকরাদের হুটোপুটি এইসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলছিল, এমন সময় কে যেন পিছন থেকে কাঁধে হাত রাখলো। মুবারক চমকে ওঠে। এই অজানা অচেনা বিদেশ বিভুঁই—এখানে কে তার কাঁধে হাত রাখবে। মুখ ফেরাতে এক হাসিখুশি যুবককে দেখতে পেল।

—তুমি তো মুসাফির? তা এই ভর সন্ধ্যাবেলা কোথায় চলেছ?

মুবারক বলে, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ, আমি পরদেশী। এখানে একটা আস্তানা খুঁজতে বেরিয়েছি। আপাতত রাতটা কাটাতে হবে।

—তারপর? তারপর কোথায় যাবে?

মুবারক বলে, কোথায় আর যাবো। পথে পথেই ঘুরবো। জনে জনে জিজ্ঞেস করবো, কেউ যদি শোনাতে পারে হাসানের কাহিনী?

—হাসানের কাহিনী? সে কে? কোথায় থাকে?

মুবারক হাসে, এ হাসান বসরাহর হাসান। অনেক অনেক কাল আগে তার ইন্তেকাল হয়েছে। তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক মানুষ। তাঁর জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। সে-সব কাহিনী এখন প্রায় হারিয়েই গেছে। আমি বহু দেশ ঘুরে এলাম, কিন্তু কেউই বলতে পারলো না। তাই হতাশ হয়ে দেশে ফিরে চলেছি। যাবার পথে দামাসকাস পড়লো—জগৎ বিখ্যাত প্রাচীনতম শহর, ভাবলাম একবার দেখে নয়ন সার্থক করে যাই।

যুবক বললো, তুমি কী জান এখানে দুনিয়ার সেরা কথক শেখ ইশাক থাকেন।

—শুনেছিলাম।

—চল, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। ঐ যে দলে দলে মানুষ প্রায় ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে—দেখছো, ওরা সবাই চলেছে শেখ ইসাকের কিস্‌সা শুনতে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি কাহিনী বলতে শুরু করেন। যারা আগে ভাগে গিয়ে জায়গা দখল করে বসতে পারে তারা ভাগ্যবান—পুরো কাহিনীটা শুনতে পায়। আর যারা দেরি করে তাদের মাঝখান থেকেই শুনতে হয়। চল, একটু পা চালিয়ে চল, এখনও হয়তো বসার জায়গা পাবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বলতে শুরু করবেন।

একটা প্রকাণ্ড বড় মহলের মত ঘর। তার ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চে বসে কিস্‌সা বলে চলেছেন শেখ ইসাক—পৃথিবীর নামজাদা কথক। প্রতিদিন নানা দেশ থেকে শত সহস্র মানুষ আসে তার কিস্‌সা শুনতে।

ইতিমধ্যেই প্রচুর জনসমাগম হয়ে গিয়েছিল। মুবারক এবং ঐ যুবক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এক পাশে জায়গা করে বসে পড়লো।

পলিতকেশ সদাপ্রফুল্ল সেই কথক বৃদ্ধকে ঘিরে প্রথম সারিতে বসেছে শহরের সম্ভ্রান্ত আমির ও সওদাগররা। তাদের পিছনে পিছনে বসেছে সুধী গুণী এবং ইতর সাধারণ মানুষ।

যুবক বললো, এ কাহিনীটা শেখ সাহেব কয়েকদিন আগে শুরু করেছেন। এখন তিনি এ গল্প প্রায় শেষ করে এনেছেন। এরপরে নতুন কিস্‌সা শুরু হবে আজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দারুণ উত্তেজনা এবং হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে কাহিনীটা শেষ করে শেখ ইশাক।

এক এক করে শ্রোতারা বিদায় নিয়ে চলে যায়। কিন্তু মুবারক দাঁড়িয়ে থাকে। ইশাক ইশারা করতে তার সামনে এসে সালাম জানায়।

—মালিক, আমি পরদেশী। আপনাকে দু'একটা কথা বলতে চাই।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটাত্তরতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে ঃ

বৃদ্ধ ইশাক বলে, ওকথা বলতে নাই, বেটা, আমরা সকলেই পরদেশী।

তাঁর ঠিকানা ছেড়ে দুদিনের তরে এসেছি। আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাবো।

মুবারক বলে, আমার স্বদেশ খুরাসান। আমার ওস্তাদ আবু আলী, হয় তো তার নাম শুনে থাকবেন, খুব নামজাদা কথক। তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এই তাঁর নজরানা—একজাহার দিনার। মেহেরবানী করে আপনি গ্রহণ করুন, তিনি ধন্য হবেন।

আমার ওস্তাদের বিশ্বাস বর্তমানে জীবিত তাবৎ সেরা কথকদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। আপনার তুল্য কাহিনীকার সারা দুনিয়ায় আর দুটি নাই।

ইশাক বললো, হ্যাঁ, আমি তাঁর অনেক খ্যাতি ও প্রশংসা শুনেছি। তিনি আজ আরব দুনিয়ায় সুপরিচিত। ঠিক আছে, তার উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করলাম। এখন বল, কী তোমার অভিপ্রায়? আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো।

মুবারকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

—আল্লাহ আপনার নাম যশ খ্যাতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখুন মালিক। আবু আলী, আমার ওস্তাদ নতুন এক কাহিনী চেয়ে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আমাদের সুলতান শুনতে চেয়েছেন। দুনিয়ার সব কিস্সাই তাঁর শোনা হয়ে গেছে। একমাত্র বসরাহর হাসানের বিচিত্র অভিযানের কাহিনী ছাড়া। আমি তারই প্রত্যাশায় আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি জেনে থাকেন সে কাহিনী আমাকে মেহেরবানী করে শোনান—এই আমার একমাত্র বাসনা।

বৃদ্ধ ইশাক হাসে, তুমি যথাস্থানেই এসে পড়েছ বাছা। আমি ছাড়া আর কেউই জানে না সে কাহিনী। ঠিক আছে, আমি তোমাকে খুশি করে দেব। তোমার মালিক, আবু আলী যথার্থই ভেবেছেন, হাসানের কাহিনীর মতো অমন চমৎকার কিস্সা আজ পর্যন্ত কেউ কখনও শুনেছে বলে আমার জানা নাই। অতি শৈশবে আমি এক লোলচর্ম পীর ফকিরের মুখ থেকে শুনেছিলাম এই কাহিনী, সেই পীর সাহেবও নাকি শুনেছিলেন অন্য এক সদাশয় বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছে। তাঁরা আজ আর কেউ ইহজগতে নাই।

তোমার মালিকের অনুরোধে, শুধু শোনার মতো করেই বলবো না, তুমি যাতে নিখুঁতভাবে তার প্রতিটি ছত্র লিপিবদ্ধ করে করে নিতে পারো সেদিকেও আমি লক্ষ্য রাখবো। কিন্তু একটা শর্ত আছে, বেটা।

মুবারক বলে, আপনি আদেশ করুন মালিক, আপনার শর্তের প্রতিটি অক্ষর আমি যথাযথ পালন করবো।

—বহুত আচ্ছা, বেটা। কারণ এ কাহিনী সকলের জন্য নয়। তোমাকে কথা দিতে হবে পাঁচ রকম লোকের কাছে এ কাহিনী তোমরা শোনাতে পারবে না। অজ্ঞ এবং উগ্ররা এর মর্ম বুঝবে না। এ কাহিনী ভণ্ডরা শুনলে রাগান্বিত হবে। মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা ক্ষীণবুদ্ধি বা নির্বোধ হয়—তারাও এ বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। বোকা হাঁদাদেরও ঠিক একই কারণে শোনাবে না। এবং পরিশেষে বিধর্মীদের কখনই শোনাবে না। এ কাহিনীর সার, যা অমূল্য সম্পদ, তারা মেনে নিতে পারবে না।

মুবারক বলে, উপরে আল্লাহ সাক্ষী আর নিচে আপনি, মালিক, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

বৃদ্ধ ইশাক খাতা এবং দোয়াত কলম দিল মুবারককে।

—নাও শুরু কর। প্রথমে 'হাসানের বিচিত্র অভিযানের দুঃসাহসিক কাহিনী' এক শিরোনাম লেখ।

একটানা সাত দিন সাত রাত্রি ধরে লিখে চললো মুবারক। লেখা শেষ হলে আগাগোড়া সবটা আবার সে পড়ে শোনালো বৃদ্ধ ইশাককে। মাঝে মাঝে ইশাক সাহেব একটু আধটু পরিবর্তন পরিমার্জন করে দিল।

এত দিনে মুবারকের মুখে এক দুর্গজয়ের আনন্দ ফুটে ওঠে। ইশাক-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশের পথে রওনা হয়।

বৎসর পূর্তির আর মাত্র দশ দিন বাকী। প্রাসাদের সদর ফটকে আবু আলীর নামের ফলক আঁটা হবে। দেশের আপামর সবাই জানবে আবু আলী বাদশাহকে নতুন এক কাহিনী শোনাবে। কী বেইজ্জতের কথা হবে। আবু আলী কী কাহিনী শোনাবে বাদশাহকে? কী নতুন কাহিনী তার জানা আছে? সবই তো তার শোনা। একমাত্র শেষ ভরসা ছিল মুবারক। কিন্তু সে-ও ফিরলো না। আর শূন্য হাতে ফিরেই বা কী হবে? তাতে তো মান বাঁচবে না।

বৃদ্ধ যখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে, ঠিক সেই সময় মাত্র দশ দিন আগে এসে পৌঁছল মুবারক। আনন্দ উল্লাসে মাতিয়ে তুললো আবু আলীর বাস-গৃহ।

—আপনার আশীর্বাদে আমি পেয়েছি মালিক, এই নিন।

খাতাখানা আলীর হাতে তুলে দেয় মুবারক। বৃদ্ধের চোখ থেকে দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে।

খাতাখানার প্রথম পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়লো আবু আলীর, বেশ বড় বড় হরফে লেখা আছে: বসরাহর হাসানের বহু বিচিত্র অভিযানের দুঃসাহসিক কাহিনী।

আবু আলী বুকে জড়িয়ে ধরে ম্যামলুক মুবারককে। তারপর ডান পাশে বসায়। মাথায় হাত রেখে বলে, অতি শৈশবে বাজার থেকে তোমাকে কিনে এনে আমি নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করেছি বাবা। বান্দা বলে মূর্খ করে রাখিনি। আমার সাধ্যমতো লেখা-পড়া তোমাকে শিখিয়েছি। আজ আমি বড় খুশি হয়েছি তোমার কাজ দেখে। আর কেনা গোলাম করে তোমাকে আটকে রাখবো না, বাবা। যাও আজ থেকে তুমি মুক্ত। তোমার গোলামী জীবন শেষ হয়ে গেল। এবার নিজের ইচ্ছামতো যেখানে খুশি চলে যাও। যা প্রাণ চায় কর, কেউ তোমাকে আর বাধা দেবে না। আজ থেকে আমি আর তোমার মালিক নই, বেটা। এখন তোমার নিজের মালিক তুমি নিজে। আর ওপরে যিনি আছেন তিনি তো মালিকের মালিক।

—আমি তোমাকে দশটা আরবী টাট্টু ঘোড়া, পাঁচটা মাদী ঘোড়া, দশটা উট, দশটা খচ্চর, তিনটি নিগ্রো এবং দুটি খুদে বান্দা উপহার দিচ্ছি—এ তোমার

কাজের যোগ্য পুরস্কার, তুমি নাও।

নয় দিন নয় রাত্রি ধরে বৃদ্ধ আলী, মুবারকের হাতের লেখা সেই খাতাখানা আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেললো।

দশ দিনের দিন সকালে হামামে গিয়ে গোসল করলেন তিনি। নতুন সাজ-পোশাক পরলেন। তারপর পাণ্ডুলিপিখানা একটি ছোট সোনার বাক্সে বন্দী করে হাজির হলেন বাদশাহ কিনদামিরের দরবারে।

বাদশাহ কিনদামির আবু আলীর প্রতীক্ষাতেই অধীর আগ্রহে বসেছিলেন মসনদে। উজির আমির ওমরাহ আমলায় পরিপূর্ণ দরবার-কক্ষ।

আবু আলী কুর্নিশ জানায়। বাদশাহ উৎফুল্ল হয়ে স্বাগত জানায়, এস এস আবু আলী, তোমার পথ চেয়েই বসে আছি আমরা।

সোনার বাক্সটা মসনদের সামনে রেখে আবু আলী বললো, এই আমার সেই কাহিনী। আজ ওয়াদার শেষ দিন। আপনি যদি হুকুম করেন আমি পড়ে শোনাতে পারি।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো উনআশিতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

বাদশাহ বললেন, তুমি তোমার কথা রেখেছ, আমি খুব প্রীত হয়েছি। যাই হোক, এখন কিসসাটা শোনাও। দেখি কেমন লিখেছ।

একটানা সাত দিন ধরে পড়ে শোনালো আবু আলী। বাদশাহ এবং দরবারের সকলে আহার নিদ্রা ভুলে রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন সেই হাসানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দুঃসাহসিক কাহিনী। বাদশাহ মুগ্ধ, বিস্মিত এবং চমৎকৃত হলেন। আবু আলী প্রধান উজিরের পদে বহাল হয়ে বাদশাহর ডানপাশে অলংকৃত হয়ে বসলো। জায়গীর, জমি-জমা, বাগ-বাগান, দাস-দাসী, ঘোড়া, খচ্চর—নানা উপহার উপঢৌকনে ভূষিত করলেন তাকে।

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, এই হাসানের কাহিনীর পাণ্ডুলিপির একখানা নকল আমার সংগ্রহে আছে। অনেকবার এই চমৎকার কাহিনী আমি পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। এখন সেই কাহিনীই আপনাকে শোনাবো ঃ

অনেক অনেক দিন আগে বসরাহ শহরে এক প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ এবং সাহসী যুবক বাস করতো। তার নাম—হাসান। বৃদ্ধ বাবা

মা-এর বড় আদরের দুলাল ছিল সে। কারণ হাসান তাদের শেষ বয়সের সন্তান।

বাবা মারা যাওয়ার পর প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছিল, এবং নানা রকম ভোগ-বিলাসে ডুবে অল্পকালের মধ্যে সব নিঃশেষও করে দিয়েছিল সে।

ছেলের দীনদশা দেখে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে। সে নিজের পাওয়া অংশের সম্পত্তি বিক্রি করে ছেলেকে একখানা স্যাকরার দোকান করে দিল।

হাসান বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি। তার মতো সুঠাম সুন্দর সুপুরুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। দোকান খুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে পথচারীরা ভিড় করে দাঁড়ায়। এমন খুব-সুরত চাঁদের মতো ছেলে তারা কেউ দেখেনি কখনও।

দু দিনেই দোকান জম-জমাট হয়ে উঠলো। ছেলে মেয়ে বুড়ো, বণিক সওদাগর আমির—সবাই এসে ভিড় জমাতে থাকলো। সওদা করাটা গৌণ, আসল উদ্দেশ্য হাসানকে প্রাণ ভরে দেখা।

একদিন হাসান তার দোকানে বসেছিল, এমন সময় সাদা দাড়িওলা এক পারসী এসে দাঁড়ালো। তার মাথায় বিরাট এক পাগড়ী। আর হাতে একখানা কোরান।

—খোদা হাফেজ, এ তো দেখছি সুন্দর এক স্বর্ণকার।

দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে হাসানকে শুভেচ্ছা জানায় সে। হাসানও প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে ওকে বসতে অনুরোধ জানায়।

পারসী আসন গ্রহণ করে স্মিত হেসে বলে, বেটা, তোমার সুরত এবং আদব কায়দা বড়ই সুন্দর। আমার নিজের কোনও সন্তানাদি নাই। তোমাকে আমি যদি দত্তক নিতে ইচ্ছা করি তো তুমি কি রাজি হবে? সারা জীবন ধরে যে বিদ্যা আমি শিখেছি, তা আমার মরার সঙ্গে সঙ্গেই মুছে যাবে—এ ব্যথা আমি সইতে পারছি না। সেই কারণেই আমি তোমাকে দত্তক নিতে চাই। শিখেয়ে যেতে চাই আমার গুপ্ত মন্ত্র। দিয়ে যেতে চাই আমার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ—ধনদৌলত—সব।

হাসান এক কথায় রাজি হয়ে যায়।

—আপনি কখন আমাকে গ্রহণ করতে চান, চাচা? আমি রাজি।

—আগামীকাল। আজ আমি উঠি তাহলে?

পারসী সাহেব উঠে দাঁড়ায়। হাসানের মাথায় হাত রেখে সে আশীর্বাদ জানায়। তারপর আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে চলে যায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আশিতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

হাসান ভীষণ চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরে এসে মাকে সব কথা বলে।

মা আঁৎকে ওঠে, এ তুই কী বলছিস হাসান? পারসীরা কী কখনও সৎ

হয় ? ওদের কী জন্মের ঠিক আছে ?

—কিন্তু মা, ঐ সদাশয় পারসী সাহেবটি বেজন্মা নয়। ওর সংগে কথা বললে, ওর চেহারা চরিত্র দেখলে তুমি বুঝতে পারতে। ওর মাথার পাগড়ী সাদা মুসলিনের। সাচ্চা মুসলমান পীর ছাড়া এ পাগড়ী কেউ পরে ?

মা বাধা দিয়ে বলে, ভুল করো না বাবা, আমি জানি এই পারসীরা ভীষণ ঠগ জোচ্চোর হয়। ওদের শিক্ষা-দীক্ষা সবই বদ কাজের উদ্দেশ্যে, জীবনে ভালো চিন্তা তারা কখনও করে না। নিজের ভাইকে কী করে পথে বসাতে হবে সেই চিন্তাই তাদের আসল।

হাসান হো হো করে হেসে ওঠে, মা, আমরা গরীব। গরীব বললে ঠিক বলা হলো না, আমরা দীন দরিদ্র। তাই কারো ভালো আমরা সহ্য করতে পারি না। আমি তো বাজি রেখে বলতে পারি, সারা বসরাহয় একটা লোকও নাই, যে ঐ পারসী সাহেবের মতো উদার মহৎ। একটা লোকের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় না ? লোকটা সৎ কী শঠ ? ঐ পারসী সাহেবকে দেখলেই তোমার মনে হবে—কোন পীর-টির কেউ হবে হয়তো। লোকের নামে নিন্দা করার আগে তাকে একবার ভালো করে যাচাই করা উচিত মা। মিছিমিছি কারো নামে দোষ দিতে নাই।

মা দেখলো ছেলেকে বোঝানো যাবে না। সে আর কথা বাড়ালো না।

পরদিন সকালে যথারীতি দোকান খুলে বসে আছে হাসান। একটু পরে সেই পারসী এল। হাসান সাদর অভ্যর্থনা করে তাকে বসতে দিল। পারসী প্রশ্ন করলো, আচ্ছা তুমি কী শাদী করেছ ?

হাসান বলে, জী না। তবে আমার মা ভীষণ পীড়াপীড়ি করেন রোজই।

পারসী বলে, অতি উত্তম। তুমি যদি শাদী নিকা কিছু করতে তবে আমার বিদ্যা তোমাকে শেখাতাম না। কারণ তুমি গোপন রাখতে পারতে না তোমার বিবির কাছে। আচ্ছা, তোমার দোকানে কোনও তামার জিনিস আছে ?

—জী হ্যাঁ। তামার রেকাবী আছে, চলবে ?

একখানা তামার রেকাবী এনে দিল হাসান। সে বললো, চমৎকার, এতেই হবে,। তোমার হাপরটা জ্বালাও। এই রেকাবীখানা পোড়াও। তারপর কাটারী দিয়ে কুটি কুটি করে কেটে ফেল।

পারসীর কথামতো হাসান রেকাবীখানাকে পুড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো।

—আচ্ছা, এবার তোমার ধাতু গলানো পাত্রে টুকরোগুলো রেখে গলিয়ে ফেল।

হাসানের কাছে এসব কাজ শক্ত নয়। যথা নির্দেশ মতো তামার টুকুরো-গুলোকে সে গলিয়ে ফেললো।

পারসী হাপরের কাছে এগিয়ে এসে তার হাতের বইখানা খুলে বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়লো। তারপর হঠাৎ গলা চড়িয়ে সে হক্ বক্ মক্ বলে চিৎকার করে ওপরের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। তারপর আবার খাটো গলায়

বলতে থাকলো, আ যা—! আ যা—সুরজ কা রোশনি—আ—যা!

এরপর আবার সে হুঙ্কার ছাড়লো। ওরে শয়তানের বেহদ্দ, ধাতুর বাচ্চা—আসবি কিনা বল, না হলে পিটিয়ে খাল খিঁচে নেব। অক্ বক্ মক্। ওরে শয়তানের জাসু তামা, সোনা-হ। না হবি তো আমার হাতে মরবি।

এরপর পাগড়ীর ভাঁজ থেকে একটা ছোট কাগজের পুরিয়া বের করে খুললো সে। হলুদ আর জাফরান মেশানো রঙের একটু গুঁড়ো। গলিত তামার মধ্যে ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তরল ধাতুটি জমে একটা শক্ত বাঁট হয়ে গেল। হাসান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলো—একখানা সোনার বাঁট।

তবু মনে সন্দেহ থেকেই যায়। তাই হাসান পরীক্ষা করার জন্য কষ্টি-পাথরখানা নিয়ে আসে।

না, কোনও সন্দেহ নাই, একেবারে খাঁটি সোনা। কোনও খাদ নাই।

পারসী বললো, জলদি বাজারে গিয়ে বেচে টাকা নিয়ে এস। টাকাটা দোকানে রাখবে না। বাড়িতে নিয়ে যেও, বুঝলে?

হাসান তাড়াতাড়ি বাজারে চলে যায়। দু হাজার দিনারে বিক্রি করে টাকা নিয়ে ফিরে আসে।

তখুনি বাড়ি ফিরে হাসান মার হাতে টাকাটা তুলে দেয়। ছেলে রোজগার করে এনেছে। মা খুশি হয়ে সিন্দুকে তুলে রাখে। হাসান হাসতে হাসতে বলে, কিন্তু কী করে টাকাটা পেলাম তা তো জিজ্ঞেস করলে না, মা?

—কেন ব্যবসা করছিস, লাভ হবে না।

—তা বলে একদিনে এত নাফা?

মা বুঝতে পারে না, তবে কোথায় পেলি?

তখন সে সব ঘটনা খুলে বলে। মা শুনে আঁৎকে ওঠে, সর্বনাশ এ তুই কী করেছিস। কোন্ জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিস, বাবা। এবার যে ফাটকে যেতে হবে।

—কেন, ফাটকে যেতে হবে কেন? আমি তো কাউকে ঠকাইনি—খাঁটি সোনা দিয়ে ন্যায্য দাম নিয়েছি। সোনা যে নিখাদ খাঁটি তা আমিও যাচাই করে দেখেছি, যে কিনেছে সেও যাচাই করে দেখেছে। এতে ভয় পাওয়ার কী আছে। তোমার যত্তোসব আজগুবি চিন্তা।

মা বলে, তুই চিনিস না ঐ জালিয়াত পারসীগুলোকে। ওরা পারে না এমন কাজ নাই। গুন তুক করে ভেল্কি দেখিয়ে 'না' কে 'হাঁ' করে দিতে পারে। তুই যাকে সোনা বলে বেচে এসেছিস, বাবা, আসলে তা সোনা নয়। হতে পারে না। কালই দেখবি তা পিতল বা তামা হয়ে গেছে। ওরা তুক তাক জানে, কিছুক্ষণের জন্য যে-কোনও ধাতুকে সোনার মতো করে দিতে পারে। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আবার সে নিজের ধাতুর গুণে ফিরে আসে।

হাসান বলে, আমি তো এই বিদ্যাই শিখবো, তাঁর কাছে। আজ প্রথমে তিনি আমাকে মৌলিক ধাতু থেকে সোনা বানাবার কায়দা শিখিয়েছেন।

মা কী বলবে বা বলতে চায়, সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে রসুইখানায়

ঢুকে পিতলের হামান-দিস্তাখানা তুলে নিয়ে সোজা দোকানে ফিরে আসে হাসান। এই হামান-দিস্তায় তার মা পেঁয়াজ রসুন থেঁতো করে। লংকা মরিচের গুঁড়ো-মসলা বানায়।

হামান-দিস্তাখানা দোকানের মেঝেয় রেখে হাপরটা জ্বালাতে যায়। পারসী দোকানেই বসেছিল। হাসানের কাণ্ড দেখে সে হাসে।

—এটা কী হবে?

হাসান উৎসাহিত হয়ে বলে, খাঁটি পিতলের। অনেকটা ভারি আছে। সোনা বানাবো। কত ওজন হবে?

পারসী বলে, কিন্তু এ বিদ্যা তো দিনে মাত্র একবারই খাটানো চলে। বেশি লোভ করলে কোনও লাভ হবে না। আজকের যা পাওনা পেয়ে গেছ, আবার কাল বানাতে পারবে।

হাসান চুপসে যায়, কিন্তু আমি আপনার বিদ্যার গুপ্ত রহস্যটা জানতে চাই, মালিক।

—তুমি একটা বদ্ধ পাগল। যথাসময়ে সব শিখতে পারবে। এতে ধৈর্যই বড় কথা। অসংযম বিদ্যার সুফল নষ্ট করে।

হাসান মাথা নাড়ে, তা ঠিক, সব কিছুরই নির্দিষ্ট সময় আছে। তাড়াহুড়া করলে সমূলে বিনাশ হতে পারে।

পারসী বলে যদি তুমি সত্যিই শিখতে অভিলাষ কর, তোমার সব যন্ত্রপাতি বেঁধে-ছেঁদে চল আমার বাসায়। সেখানে গোপনে শেখাবো তোমাকে। এখানে এই বাজারের মধ্যে কী এসব কাজ হয়?

হাসান বলে, তা হলে তাই চলুন। সত্যিই তো এ সাধনার বস্তু। এত হট্টগোলের মধ্যে সম্ভব হবে কী করে?

যন্ত্রপাতি সব বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে দোকান বন্ধ করে পারসীর সংগে পথে বেরিয়ে পড়ে হাসান। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মা-এর কথাগুলো বার বার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে।

পারসী কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, কী মনে দ্বিধা আছে? না, মন যতক্ষণ না সাফা হচ্ছে ততক্ষণ কোনও কাজে পা বাড়াবে না। ঠিক আছে, যেতে হবে না আমার বাসায়। চল, আজ তোমার বাসাতেই যাবো। সেখানেই শুরু হবে তোমার শিক্ষানবিশী।

—সেই ভাল। মা নিজের চোখে দেখলে মনে ভরসা পাবেন।

হাসান পারসীকে নিয়ে তার নিজের বাসার দিকে চললো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একাশিতম রজনীতে
আবার সে গল্প শুরু করে:

বাসায় পৌঁছে হাসান পারসীকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভিতরে চলে যায়।

—মা, মাগো, উনি এসেছেন। আজ রাতে আমাদের বাসায় মেহমান হবেন। আমরা একসঙ্গে খানাপিনা করবো।

মা বলে, বাড়িতে যা শাক-রুটি আছে, তাই খাবে, চিন্তার কী? আমাদের শাস্ত্রে নুন আর রুটির মতো পবিত্র জিনিস আর কিছু নাই। কিন্তু ঐ নাস্তিক সূর্যের উপাসক পারসীরা এর মর্ম বোঝে না। যাই হোক, একবার যখন আমার ঘরে সে এসেছে, তাকে যেতে বলবো না—যেতে দেবোও না। কিন্তু ঐ জালিয়াত ঠগ জোচ্চোরটা যতক্ষণ থাকবে আমি এ বাড়িতে থাকবো না। তোমাদের খানা-পিনা যা দরকার সব আমি বানিয়ে দিয়ে পড়শীদের কারো বাড়িতে রাত কাটাতে যাবো। তারপর কাল চলে গেলে, সারা বাড়িটা আগে ভালো করে ধোয়া পোঁছা করে তবে এখানে নুন রুটি খাবো আমি।

পাঁচরকম তরকারী রুটি নুন জল সব সাজিয়ে রেখে হাসানের মা পাশের বাড়িতে শুতে চলে যায়।

হাসান এবং পারসী দুজনে বসে খানাপিনা শেষ করে। পারসী বলে, হাসান, আজ তোমার নুন খেলাম, এ ঋণ পরিশোধ করা যায় না। তোমাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছি। শুধু সেই কারণেই আমার অর্জিত বিদ্যার গুপ্তরহস্য তোমাকে শেখাতে চাই।

এই বলে সে একটি কাগজের পুরিয়া বের করে পাগড়ীর ভাঁজ থেকে। ভাঁজ খুলে সেই জাফরান হলুদ বর্ণের গুঁড়োটা দেখিয়ে বলে এর মাত্র এক টিপ পরিমাণ গুঁড়োতে পাঁচ সের পিতলকে সোনা করে ফেলতে পার। এই অমোঘ বস্তুটি এক হাজার সহজলভ্য এবং এক হাজার দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ার মূল থেকে তৈরী করা হয়। বহু পরিশ্রম-সাধ্য! কী কী প্রক্রিয়ায় করা যায় তার বিস্তারিত বিবরণ তোমাকে পরে বলবো একদিন। এখন এটা তোমার কাছে রেখে দাও। কিন্তু সাবধান, খুলে রেখ না, এর মধ্যে একটা গন্ধ আছে সেটা উবে যেতে পারে।

স্বাভাবিক কৌতূহলের খেয়ালেই পুরিয়াটা নাকের কাছে ধরে গন্ধের প্রকৃতি আঘ্রাণ করে দেখতে যায় হাসান! ঠিক এইটেই চেয়েছিল পারসী। হাসানের অচৈতন্য দেহটা লুটিয়ে পড়ে। পারসী আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।—বাজীমাৎ। হাসান, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি ক'টা বছর ফন্দী ফিকির করছিলাম। শেষে আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। এবার আর আমার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছ না তুমি।

ঘরের এক পাশ থেকে একটা বাক্স টেনে নিয়ে ডালা তুলে ভিতরের জামা-কাপড়গুলো বের করে ছুঁড়ে দেয়। হাসানের অচৈতন্য দেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাক্সের মধ্যে ভরে। একটা কুলিকে ডেকে এনে বাক্সটা তার মাথায় চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সোজা সমুদ্রের তীর। সেখানে তার একখানা জাহাজ ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। পারসী বাক্সটা নিয়ে উঠতেই জাহাজটা ছেড়ে দিল।

জাহাজ চলতে থাকুক, এবার আমরা হাসানের মা-এর কথায় আসি।

সকালবেলায় হাসানের মা বাড়িতে ঢুকেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। সে যা আশঙ্কা করেছিল, তাই ঘটেছে। দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের মধ্যে যে বাক্সটা ছিল তা নাই। বাক্সের সাজপোশাকগুলো মেঝের ওপর ছত্রাকারে ছড়ানো। হাসান নাই, পারসীটাও নাই।

ছেলের শোকে মা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। কপাল চাপড়ায়। বুক চাপড়ায়। চুল ছেঁড়ে।

—হায় রে আমার চোখের মণি, হায় রে আমার সোনা, কোথায় গেলি, বাবা। কী করে তোকে ফিরে পাবো।

পাড়া-পড়শীরা ছুটে আসে। সমবেদনা জানায়। অনেকেই এদিক ওদিক খোঁজ করতে ছুটে। কিন্তু হাসানকে কোথায় পাবে তারা। সে ততক্ষণে এক সমুদ্রগামী জাহাজের খোলে অচৈতন্য অবস্থায় বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে।

শোকাতুরা মা হাসানের আশায় কোনও রকমে জীবন ধারণ করে থাকে।

ভোর হয়ে আসে! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বিরাশিতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

পারসীটা মহা ধুরন্ধর ধড়িবাজ এক যাদুকর। লোকটার নাম বাহ্‌রাম। অগ্নির উপাসক। প্রতি বছর সে মুসলমানদের ঘর থেকে একটি করে সুঠাম সুদর্শন যুবককে চুরি করে নিয়ে আসে। তার বিকৃত কামনার ভোগ্য হিসাবে ব্যবহার করে। একটা বিখ্যাত প্রবাদ আছে : সে নিজে কুকুর তার মা বাবাও কুকুর। তার বাবার বাবাও তো কুকুর। এবং যে পথ ধরে সে চলে সে পথে তো একমাত্র কুকুররা চলে! সুতরাং সে যে পুরোপুরি একটা কুকুর সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

জাহাজ ছাড়ার পর প্রতিদিন একবার ক'রে সে নিচের খোলে যায়। বাক্সের ডালা তুলে দেখে, হাসানের চৈতন্য ফিরেছে কিনা। কয়েকদিন পরে আস্তে আস্তে সে জ্ঞান ফিরে পেতে থাকে। পারসী খানাপিনা নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেয়। তারপর ডালা বন্ধ করে ওপরে চলে আসে। এইভাবে যাত্রাপথ একদিন শেষ হয়ে আসে। জাহাজ এসে ভিড়ে এক উপকূলে। বাক্সটা নিয়ে বাহ্‌রাম তীরে নামে। জাহাজটা আবার দরিয়ার মাঝখানে ভেসে গিয়ে চলতে থাকে।

বাহ্‌রাম বাক্সের ডালাটা তোলে। হাসানের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে দেয় মন্ত্রবলে। এবার সে চোখ মেলে তাকায়। উঠে বসে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সামনে সমুদ্র। পায়ের নিচে পাথরের নুড়ির সমুদ্র-সৈকত। নুড়িগুলো কত বিচিত্র বর্ণের। কোনটা লাল, কোনটা সবুজ, কোনটা সাদা, আবার কেউ বা নীল।

হাসানের বুঝতে কষ্ট হয় না, সে আর নিজ দেশের সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়িয়ে নাই। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে দেখে, তার পিছনের দিকে একটা পাহাড়ের

টিলার ওপর বসে আছে ঐ পারসী। একটা চোখ বন্ধ করে তাকে ট্যারার মতো দেখছে। এবার সে পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই শয়তানটিরই এই কাণ্ড। মায়ের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ হয়। আগেই সে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হাসান নিজেই তা উপেক্ষা করেছে।

পারসীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

—এ সবের মানে কী? আপনি না আমার নুন খেয়েছেন?

বাহ্‌রাম হো হো করে হেসে ওঠে।

—আমরা তো অগ্নির উপাসক। তোমাদের নুন-ফুনের ধার ধারি না। এযাবৎ আমি ন'শো নিরানব্বইটি মুসলমান ছেলের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছি। আগুন সাক্ষী রেখে বলতে পারি, তোমার মতো এমন সুন্দর তাদের কেউই ছিল না। তুমিই আমার এক হাজার সংখ্যা পূরণ করবে। ভাবিনি, এত সহজে তুমি আমার খপ্পরে ধরা দেবে। কিন্তু সূর্যের অপার মহিমা, এখন তুমি আমার কব্জায়। এবং দেখ, কী ভাবে কতখানি আমি তোমার সঙ্গে ভালোবাসা করি। প্রথমে তুমি তোমার ধর্মমত ত্যাগ করে আমার ধর্মমত মাথা পেতে নাও।

এই কথা শোনামাত্র হাসান তড়িৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ায়, কী? কী বললেন? আবার বলুন তো শুনি? শয়তান!

পারসী বলে, আরে না না, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। যাক, পরীক্ষায় তুমি পাশ করে গেছ। এবং প্রমাণ করতে পেরেছ ধর্মে তোমার অটুট মতি আছে। তুমি পরমপিতা আল্লাহর একনিষ্ঠ সেবক।

—আমি তোমাকে এই পাহাড়-সন্নিহিত নির্জন সমুদ্র উপকূলে কেন নিয়ে এসেছি, জান? প্রকৃত শিক্ষা এই রকম নির্জন স্থানেই সম্ভব হতে পারে। ঐ যে পাহাড়ের চূড়া দেখছো, ওখানে আমাদের উঠতে হবে। ঐখানেই আছে প্রকৃত সঞ্জীবনী সুধা—যা এই বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। ঐ পর্বতের শিখরে শয়ন করে এই বিদ্যার সাধনা করতে হবে তোমাকে। তবেই সিদ্ধিলাভ হবে। নচেৎ নয়। যদি তুমি স্বেচ্ছায় ওখানে যাও খুব সুখের কথা। অফুরন্ত আনন্দ আহরণ করতে পারবে। আর যদি যেতে না চাও, তবে আমাকে বলপ্রয়োগ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তুমি যেখানে একদিন নিদ্রিত ছিলে সেখানেই রেখে দেবো আবার। এবার বল, কী করতে চাও? আমরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে অনেক গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতে পারবো। সে-গুলো আমাদের এই বিদ্যায় একান্তভাবে প্রয়োজন। ওগুলো আনতে পারলে তোমাকে শেখানোর কাজ আরও দ্রুততর হতে পারবে।

হাসান সরাসরি 'না' করতে পারলো না। লোকটা মহা শয়তান, বদমাইস ধড়িবাজ। মা-এর উপদেশগুলো আবার মনে ভেসে ওঠে। জলে দু-চোখ ভরে ওঠে।

—কেঁদো না, হাসান। খুব শীগ্‌গিরই প্রমাণ পাবে আমার উপদেশ কত মূল্যবান।

হাসান ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু কী করে আমি ওখানে উঠবো ? অত উঁচু পাহাড়।

—তোমাকে কোনও কষ্ট করতে হবে না, হাসান। আমি যাদুমন্ত্র দিয়ে তোমাকে ওপরে উঠিয়ে দেব। পাখীর মতো ডানা মেলে উঠে যাবো আমরা।

আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট তামার পাত্র বের করল পারসীটা। পাত্রটার গায়ে উৎকীর্ণ করে লেখা কতকগুলো শব্দ—ঠিক যেন দৈববাণীর মতো।

পাত্রটার মুখ মোরগের একটুকরো চামড়া দিয়ে ঢাকা। ঠিক যেন ছোট্ট একটা দামামা। আঙুলের টোকা দিয়ে টঙ্কার তোলে সে। এবং তৎক্ষণাৎ ধূলির ঝড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় চারদিক। এবং মিশ-মিশে কালো একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সামনে। ঘোড়াটার দুখানা পাখা নড়তে থাকে।

পারসী ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে এবং হাসানকে উঠিয়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়। পারসীর হাতে ভর করে হাসান ওপরে উঠে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীরাজ উড়ে চলে আকাশে। পলকের মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে ওদের নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শয়তানের দুষ্ট চাহনি পারসীর চোখে। গগন-বিদারী শব্দ করে সে অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়ে, এবার—হাসান, তুমি আমার পুরো কব্জায়। তোমাকে রক্ষা করে এমন প্রাণী কেউ জন্মায়নি দুনিয়ায়। এবার আমার কামনা-বাসনা চরিতার্থ কর। এখন তো মানবে, একমাত্র অগ্নি ছাড়া কোনও শক্তি নাই।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তিরাশিতম রজনী ঃ

আবার সে শুরু করে ঃ

হাসান চিৎকার করে ওঠে, আল্লা হো আকবর! আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নাই। মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। ওরে শয়তান বেল্লিক, তুই আমার শক্তি জানিস না, আমি এক সাচ্চা মুসলামান, তাঁর কৃপাতেই তোকে আমি খতম করে ফেলবো।

এই বলে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাদুকরের হাত থেকে সেই দামামাটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে পর্বত-শিখরের এক ধারে ঠেলে নিয়ে যায়। এবং প্রাণপণ শক্তিতে এক লাথি বসিয়ে দেয় ওর নাভিস্থলে। টাল সামলাতে না পেরে পারসীর দেহটা ছিটকে চলে যায় শূন্যে। এরপর ঘুরপাক খেতে খেতে শয়তানের দেহটা গিয়ে আছড়ে পড়ে নিচে সমুদ্র-সৈকতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়।

এইভাবে ঐ বিকৃত-কাম জালিয়াত যাদুকরের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

হাসান উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

অনেকক্ষণ সেই পাহাড় চূড়ায় বসে থাকার পর নিজেকে সহজ স্বাভাবিক

করে তুলতে পারে। হাসানের হাতে ছিল সেই ছোট্ট দামামাটা। মোরগের চামড়া দিয়ে ছাওয়া। সে জানে, বস্তুটা যাদু-মন্ত্রপূত। কিন্তু কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিছুই বুঝতে পারে না। হাসান সে চেষ্টাও করে না। কী করতে কী হয়ে যাবে কে জানে। এই ভেবে দামামাটাকে সে কোমরে ঝুলিয়ে নেয়।

এবার নিচে নামবার উপায় দেখতে হয়। হাসান নিচে তাকায়, মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে ওর। পাহাড়টা এত উঁচু যে নিচের বড় বড় গাছ-পালাগুলো খুবই ছোট চারার মতো দেখাচ্ছে। মাথার ওপরে হাত বাড়ালেই পেঁজাতুলোর মেঘ।

এই রকম অত্যুচ্চ পাহাড়ের শিখর থেকে অবরোহণ অসম্ভব কাজ। হাসান দেখতে পায় পাহাড়ের একপ্রান্তে অনেক দূরে একটি আগুনের শিখা। জন-মানবের চিহ্ন নাই, এখানে আগুন কে জ্বালায়? হাসান ভাবে, তবে কী কেউ আছে ওখানে? কোনও মানুষ?

অতি সন্তর্পণে দেখে-শুনে পা ফেলে হাসান। বিপদ-সঙ্কুল গিরি পর্বত। পথ নাই। তবু নিদারুণ কৌতূহলে ধীরে ধীরে ঐ অগ্নি-শিখাকে লক্ষ্য করে সামনে এগিয়ে চলতে থাকে।

বেশ কিছুটা এগোবার পর হাসান বেশ বুঝতে পারে, আসলে ওটা কোনও আগুনের শিখা নয়, বিশাল স্বর্ণ-প্রাসাদের শিখরে একটি বিরাট গোলাকৃতি গম্বুজ। সূর্যের কিরণে ঐ রকম লেলিহান অগ্নিশিখা বলে ভ্রম হচ্ছে। চার পাশের চারটি সোনার থাম ওকে রক্ষা করে আছে।

ঐ গম্বুজটা লক্ষ্য করে সে চলতে থাকে। কাছে মনে হলেও আসলে অনেক অনেক দূরে। হাসান ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলে, হয়তো ঐ প্রাসাদে জিন দৈত্যরা বসবাস করে। যাই হোক, সুলতান বাদশাহ অথবা আফ্রিদি জিন যে-ই থাক সেখানে, আমি যাবোই। হাসান মনে মনে সংকল্প করে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, খানাপিনার তো একটা সন্ধান দেখতে হবে। আমি প্রাসাদের দ্বাররক্ষীকে বলবো, আমাকে একটুকরো রুটি আর একটু পানি দাও, আমি খাবো। বড় খিদে তেষ্টা পেয়েছে। দেখি, সে কী বলে? যদি ওর প্রাণে দয়ামায়া কিছু থাকে। যদি সে রক্তমাংসের মানুষ হয়, হয়তো দয়া-ধম্মো করে প্রাসাদের এক কোণে একটু মাথা গোঁজার মতো ঠাঁইও দিয়ে দিতে পারে।

হাসান বুকে সাহস সঞ্চয় করে প্রাসাদের সামনে এগোতে থাকে। তবে যা হয় হবে, নসীবে যা লেখা আছে তার বাইরে কিছুই হবে না। সুতরাং ও নিয়ে বৃথা মাথা ঘামিয়ে, ভীত শঙ্কিত হয়ে কী ফায়দা? বরং বেপরোয়া হওয়াই ভালো। তাতে মনের সাহস বাড়ে, দেহে অনেক বেশি শক্তি সঞ্চার হয়।

হাসান প্রাসাদের সিংহদরজায় এসে দাঁড়ায়। একখানা প্রকাণ্ড পান্না পাথরের চাঁই কেটে বানানো হয়েছে এই সুন্দর সিংহদরজাটি।

ফটকে কোনও প্রহরী নাই। হাসান প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় নজরে পড়লো, ফোটা ফুলের মতো

সুন্দর দুটি কুমারী কন্যা একটি শ্বেত পাথরের মঞ্চে বসে খুব মনোযোগ সহকারে দাবা খেলছে। এমনই নিবিষ্ট মনে খেলায় মগ্ন ছিল যে, হাসানের প্রবেশ এবং উপস্থিতি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না ওরা। কিন্তু একটু পরে ছোটটি মুখ তুলে তাকায়। হঠাৎ বাইরের আগন্তুক দেখে অবাক হয়।

বড় মেয়েটিকে সজাগ করে দিয়ে বলে, ঐ দ্যাখ, কী সুন্দর একটি ছেলে! মনে হচ্ছে, সেই বদমাইস বাহ্‌রামের শিকার। কিন্তু কী করে সে ওই শয়তানের হাত থেকে পালাতে পেরেছে, বুঝতে পারছি না।

অন্য মেয়েটি ফিরে তাকায়। হাসানের নিটোল স্বাস্থ্য, নিখুঁত রূপলাবণ্য অপলক মুগ্ধ-নয়নে দেখতে থাকে সে। প্রতি বছরই তো বাহ্‌রাম একটি করে মুসলমানের ছেলেকে চুরি করে নিয়ে আসে এই পাহাড়ে। তার বিকৃত কামনা চরিতার্থ করে। কিন্তু তারা কেউই এর মতো এত সুন্দর সুপুরুষ ছিল না।

হাসান ছোট মেয়েটির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। আকুল হয়ে বলে তুমি যা ভেবেছ, আমি তাই, সুন্দরী। শয়তান বাহ্‌রাম আমাকে এনেছিল এই পাহাড়ে তার বিকৃত কাম-ক্ষুধা মেটাতে। কিন্তু আমার সাহস এবং বিক্রমের কাছে সে হেরে গেছে। তাকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি নিচে একেবারে সমুদ্রের উপকূলে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে অক্কা পেয়েছে।

ছোট মেয়েটি বিস্ময়ে চমকে ওঠে, বল কী? কী সাংঘাতিক কাজ করতে পেরেছ? কত শত ফুলের মতো ছেলেকে ধরে নিয়ে এসে লোকটা শেষ করে দিয়েছে। তুমি তো বাহাদুর পুরুষ, ওই রকম একটা ধূর্ত ধড়িবাজ শয়তানকে খতম করেছ?

মেয়েটি ওর দিদির দিকে তাকিয়ে বলে, দিদি, আজ থেকে একে আমি ভাই বলে মেনে নিলাম।

হাত ধরে হাসানকে সে তুলে ধরে, চল, আমাদের সঙ্গে থাকবে তুমি। আমরা যা খাব, তাই তুমি খাবে।

হাসানকে সে হামামে নিয়ে যায়। ভালো করে স্নান করায়। বাহারী সাজ-পোশাক পরতে দেয়। তারপর খাবার ঘরে নিয়ে এসে বসায়। তিনজনে মিলে খানাপিনা করে। ছোট বোন জিজ্ঞেস করে, তোমার কী নাম, ভাই?

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুরাশিতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

—আমার নাম হাসান। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ তোমাদের এখানে এসে পৌঁছেছি।

এরপর হাসান তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে। কী করে বাহ্‌রাম তাকে ধোঁকা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল, সেই সব বৃত্তান্ত আগাগোড়া খুলে বললো ওদের।

মেয়ে দুটি ক্রোধে আরক্তবর্ণ হয়ে বলে, ঐ কুত্তার বাচ্চাটাকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুমি খুব ভাল কাজ করেছ, ভাই। তা না হলে দোজকের পোকাটা আরও কত শত নিরীহ ছেলের সর্বনাশ করতো কে জানে!

বড় বোন ছোটকে উদ্দেশ্য করে বলে, গুলাবী, তোর ভাইটিকে আমাদের জীবনের কাহিনীটা বল, তাহলে সে বুঝতে পারবে আমরা কে, কেন এখানে আছি।

তখন গুলাবী বলতে শুরু করে ঃ

শোন ভাইসাব, আমরা সম্রাট-নন্দিনী। আমার নাম গুলাবী, আর দিদির নাম জামিলা। আরও পাঁচটি বোন আছে আমাদের। তারা অবশ্য আমাদের চেয়েও সুন্দরী। এখন ওরা শিকারে গেছে, তবে তাড়াতাড়িই ফিরবে। আমাদের যে সকলের বড় তার নাম শুকতারা, তার ছোটর নাম সন্ধ্যামণি, তার ছোট—চুনী, পরেরটার নাম পান্না আর সব ছোট—পাপিয়া।

আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান। কিন্তু আমাদের মা ভিন্ন ভিন্ন। আমি আর জামিলা সহোদরা। আমাদের বাবা জিনদের সম্রাট। তিনি ভীষণ উদ্ধত, অহঙ্কারী, অত্যাচারী। সেই কারণে কেউই আমাদের বিয়ে করতে সাহস করেনি, বা রাজী হয়নি। বাবার ধারণা, তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যাদের পাণি-গ্রহণ করার যোগ্যতা সারা দুনিয়ায় কারো নাই। তাঁর এক পণ, কারও তিনি বিয়ে দেবেন না। এই কারণে তাঁর মন্ত্রীকে বলেছিলেন, 'দুনিয়ার মধ্যে এমন এক গুপ্তস্থানের সন্ধান কর, যেখানে আমার মেয়েদের নিরাপদে রাখা যাবে। এবং কোনও জিন আফ্রিদি কখনও সন্ধান করতে পারবে না।' 'আমাদের একমাত্র বিশ্বাস, ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করার জন্য। পয়গম্বরের পবিত্র বাণী—কোনও নারীই কুমারীত্ব নিয়ে বাঁচে না। সুতরাং সম্রাট যদি তাঁর কন্যাদের চিরকুমারী করেই রাখেন, তা কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হবে। এবং কন্যাদের জীবন গভীর দুঃখের মধ্যে কাটবে।' কিন্তু আমাদের বাবার সেই এক গোঁ। তিনি বললেন, বিবাহিত দেখার আগে ওদের আমি মরা-মুখ দেখবো। এই মুহূর্তে, এখনি যদি তুমি ওদের লুকিয়ে রাখার মতো কোনও গুপ্ত-গৃহের ব্যবস্থা না করতে পারো, তোমার গর্দান নেব আমি। উজির তখন নিরুপায় হয়ে বললো, সম্রাট যদি এমনই ধনুর্ভাঙ্গা পণ করেন তবে আমি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করছি। মেঘমালা পর্বতে এক স্বর্ণ-প্রাসাদ আছে। জনমানবের অগম্য সেই স্থান। দুর্গের মতো সুরক্ষিত। বহু প্রাচীন কালে সম্রাট সুলেমানের বিদ্রোহী সেনাপতিরা এই দুর্গম পর্বত-শিখরে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের পুনর্বাসনের জন্য এক মনোহর সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। সেই থেকে সে প্রাসাদ জন-মানবশূন্য পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। বড় মনোরম পরিবেশে তৈরি করা হয়েছিল প্রাসাদটি। চমৎকার জল-হাওয়া, একেবারে চির-বসন্ত। যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, লতাগুল্মে গাছপালার নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। হাজারো রকম ফুল ফলের সে কি সীমাহীন সমারোহ। কোথাও নিরন্তর নির্ঝর ঝরনা নিরবধিকাল ধরে ঝরে চলেছে। কোথাও পাহাড়ের ছোট

নদী এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে দূর-দূরান্তরের কোনও এক দুর্গম গুহার অন্ধকারে। সে-নদী, জল, সে-ঝরনার জল বরফের মত শীতল, মধুর মতো মধুর।'

বাবা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না। তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুচর জিন ও মরিদসকে দিয়ে এই প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের। আমাদের পৌঁছে দিয়েই ওরা আবার ফিরে গেল বাবার সাম্রাজ্যে।

সেই থেকে আমরা এখানে আছি। উজিরের প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের এই প্রাসাদ-পরিবেশ বড়ই সুন্দর। চারদিকে ফুলে ফলে ভরা। ঝরনা আর ছোট নদীর ছড়াছড়ি। এখানকার আকাশে-বাতাসে ফুলের সুবাস। পাখিদের গান শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আবার ওদের কল-কাকলীতে জেগে উঠি। এখানে মানুষের কোলাহল, বিদ্বেষ বিভেদের হলাহল নাই। আছে ফুলে ফুলে মধু, পাখির কুজন, আর ঝরনার কলতান। এখানে শীতের কাঁপুনি নাই। এখানে গ্রীষ্মের দাবদাহ সহ্য করতে হয় না! এখানে চিরকাল বসন্ত জাগ্রত, সামনেই সরোবর। সারাদিন হাঁসেরা খেলা করে। এই পাহাড়ের নাম মেঘমালা। আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। বিশ্ব সংসার আঁধার হয়ে যায়। তখন, ময়ূরেরা পেখম মেলে, সে দৃশ্য তুমি দুনিয়ায় আর কোথায় দেখতে পাবে? আর ঐ যে দেখছো, কত নাম না জানা হরেক রঙের পাখি—আমরা ভাবি, লাল নীল গোলাপী, প্রবাল, মুক্তো, চুনী পান্নার মতো এত হাজারো রকম সুন্দর সুন্দর রঙ ওরা পেল কোথায়। দিনের পর দিন বছরের পর বছর দেখেও পুরনো হয় না ওরা—মনে হয় একেবারে আনকোরা নতুন।

আমরা বেশ আছি। সুখে আছি এখানে। ঈশ্বরের কাছে একটাই আমাদের প্রার্থনা ছিল, তাও আজ পূরণ করে দিলেন তিনি। আমরা চেয়েছিলাম অন্ততঃ একজন পুরুষ সঙ্গী। তা তিনি আমাদের আশার অতিরিক্ত দিয়েছেন। তোমার মতো অলোক-সামান্য সুপুরুষ—সঙ্গী হিসাবে এতটা আশা করি না আমরা।

কিছুক্ষণ পর অন্য পাঁচ বোনেরা এসে গেল। গুলাবী এক এক করে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিল, আজ থেকে হাসান আমাদের ভাইজান, বুঝলে?

সকলে হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে, আমরা সাত বোন আর তুমি আমাদের মাথার মণি একটিমাত্র ভাই।

হাসানের আর কোনও দুঃখ থাকে না। এক অবর্ণনীয় আনন্দে ভরে ওঠে মন। আর কী আশ্চর্য, এতগুলো ভরা-যৌবনের কন্যা তাকে ঘিরে আছে, অথচ মনের নিভৃত কোণেও এতটুকু যৌবন-চঞ্চলতা অনুভব করে না সে।

ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁচাশিতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়িয়ে শিকার করে বড় সুন্দরভাবে দিনগুলো কেটে

যেতে থাকে। হাসান এক নতুন জীবনের, নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। জীবনের সুধাপাত্র কানায়-কানায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। কোনও অভাব-অভিযোগ দুঃখ সন্তাপের লেশ মাত্র নাই আর। এখানে এসে যে আনন্দ, যে সুখ, যে শান্তি সে পেয়েছে—কামনা-বাসনা-কলুষিত মাটির পৃথিবীতে তা কল্পনাও করা যায় না।

হাসান তার দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা বলে। মেয়েরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে। সেই রকম মেয়েরাও তাদের নিজের দেশের, নিজের জাতের জিন আফ্রিদিদের বিচিত্র কাহিনী শোনায়। হাসান শুনতে শুনতে অবাক হয়, মজা পায়। আবার ভয়ে শিউরেও ওঠে কখনও।

সব মেয়েরাই তাকে খুব ভালবাসে। আদর যত্ন করে। বিশেষতঃ ছোটটি গুলাবী হাসানকে আরও বেশি আপন করে নিতে চায়।

একদিন ওরা দল বেঁধে বড়াতে বেরিয়েছিল। এ-বনে ও-বনে অনেক ঘুরলো, শিকার করলো। তারপর এক সরোবরের ধারে পা ছড়িয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশা-পাশি বসে নানা গল্পে মশগুল হয়ে উঠলো।

হঠাৎ একসময় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গজর্নের মতো তাণ্ডব নিনাদ শুনতে পেয়ে সকলে সামনের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকায়। ধূলি-ধূম্রজালে ঢেকে আসতে থাকে সারা আকাশ। নিমেষের মধ্যে কালো অন্ধকার নেমে আসে। গুলাবী ভয়ে আর্তনাদ করে হাসান-এর হাত ধরে টেনে তোলে. শিগ্গির ওঠ, আর এক পলক এখানে নয়।

প্রায় একরকম জোর করেই হাসানকে টেনে হিঁচড়ে সে নিয়ে আসে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের ফুল-বাগিচায়। একটা ঝাউ-এর ঝোপের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বলে, চুপ! কোনও সাড়া শব্দ করবে না। নড়বে না চড়বে না একটুও। এখুনি সম্রাট জিনিস্থানের বিশাল জিন সৈন্যবাহিনী এখানে এসে নামবে। এই ধূলি-ধূম্রজাল তারই ইঙ্গিত। প্রতি বছর আমাদের দেশে বাবার প্রাসাদে এক বিরাট উৎসব হয়। সে উৎসবে দেশ-বিদেশের অনেক জিন আফ্রিদি রাজারা আমন্ত্রিত হয়ে আসে। বাবা বছরে ঐ একটিবার আমাদের নিয়ে যান সেখানে। কিন্তু পাছে আমরা কোনও পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হই, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে যান। উৎসব শেষ হলে আবার আমরা ফিরে আসবো। কিন্তু ভাইজান, এই ক'টা দিন তোমাকে একা একা কাটাতে হবে। এইভাবে এখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোমাকে ফেলে যেতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে আমাদের। কিন্তু কী করবো বল। সম্রাটের অদেশ—না গিয়ে উপায় নাই।

বিদায়বেলায় মেয়েরা চোখের জল ফেলতে থাকে। ছোট বোন একটা চাবির গোছা হাসানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, সব ঘরের তালার চাবি আছে এতে। ইচ্ছে হলে যে-কোনও ঘর খুলতে পার। কিন্তু সাবধান, ঐ যে দেখছো পাশের ঐ ঘরটা—ভুলেও কখনও ওদিকে যেও না। ও-ঘর খোলার চেষ্টা করো না, ভাই-জান। তোমাকে ভাল করে বোঝাবার জন্য ও-ঘরের এই চাবিটায় দেখ, একটা

মার্কা করে রেখেছি। এই চাবিতে খোলা যাবে ও-ঘরের তালা। কিন্তু ভাইটি আমার, ওদিকে পা মাড়িও না।

—অন্য আর সব ঘরে যেও। খানাপিনা অঢেল আছে। ইচ্ছে মতো খেও। ক'টা দিন একটু কষ্ট করে কাটাও। আমরা শিগ্গিরই ফিরে আসবো, কেমন?

হাসান হাত পেতে চাবির গোছাটা নেয়। ঘাড় নেড়ে বলে, আমি তোমাদের ফেরার পথ চেয়েই বসে রইলাম, বোন। আমার কোনও কষ্ট হবে না। আর হলেও, আবার তোমাদের ফিরে পাবো সেই আশাতেই সব সইতে পারবো।

নীরব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিঃসঙ্গ জীবন কাটতে থাকে হাসানের। দুঃখ বেদনায় টনটন করে ওঠে হৃদয়। কবে ওরা ফিরবে, আবার কবে হাসি কল-গানে মুখর হয়ে উঠবে তার জীবন, সেই ভেবে ভেবে সময় আর তার কাটতে চায় না।

সারাটা দিন সে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় পাখির গান শোনে, ফুলের শোভা দেখে, ঝরনার সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু রাত আর ফুরায় না। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়। কত রকম বাহারী-বাহারী খানাপিনা। হাসানের মুখে রোচে না।

চোখে ঘুম আসে না। একা একা পালঙ্ক-শয্যায় শুয়ে ছটফট করে হাসান। নাঃ, আর ভাল লাগে না। মনের মধ্যে একটা নিষিদ্ধ বাসনা কুরে কুরে খায়। হাসান ভাবে, ঐ ঘরে ঢুকতে বারণ করে গেছে কেন গুলাবী? কী আছে ও-ঘরে? বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পায়ে পায়ে সেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। চাবিটা নিচে নাড়া-চাড়া করে। খুব ইচ্ছে হয়, খুলতে। কিন্তু গুলাবীর সেই কাতর অনুনয় মনে পড়ে। ওর কাজল-কালো চোখের মিনতি সে ভুলবে কী করে? নাঃ, না না, সে খুলবে না। কাজ নাই খুলে। বারণ যখন করে গেছে, কী হবে তার কথা অমান্য করে, দ্রুত পায়ে আবার ফিরে আসে শোবার ঘরে। সটান শুয়ে পড়ে শয্যায়। মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে ওই অহেতুক কৌতূহল।

কিন্তু যা করতে বারণ করা হয়, যা না দেখতে বলা হয় এবং যা শুনতে দেওয়া হয় না—তার প্রতি মানুষের সহজাত অদম্য কৌতূহল অনেক বেশি। হাসান আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। কী আছে ঐ ঘরে—তাকে দেখতেই হবে। কেন বারণ করে গেছে গুলাবী? হাসানের কোনও বিপদ হবে বলে? তা হোক, মরার বাড়া তো বিপদ নাই। যদি জানও কবুল করতে হয় তাও সে করবে। কিন্তু দেখবে, ঐ ঘরে কী আছে? কেন ঢুকতে নিষেধ করে গেছে সে?

এবার সে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ঐ দরজার দিকে এগোয়। চাবি দিয়ে খুলে ফেলে কুলুপ।

ভিতরে ঢুকে কিছুই দেখতে পায় না প্রথমে। সব যেন কেমন কালো অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে সব। ঘরে আসবাব বলতে কিছু নাই। না আছে একখানা কুর্শি কেদারা, না আছে খাট পালঙ্ক। গালিচা

পর্দা কিছুই চোখে পড়ে না। অবশেষে এক প্রান্তে দেওয়ালে দাঁড় করানো একখানা কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িটা যেখানে ছাদে গিয়ে ঠেকেছে সেই জায়গাটায় মানুষ গলার মতো একটা ফোকর। হাসান বাতিটা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু না, নিচে থেকে কিছু দেখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে ওঠে। ফোকরটা দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দেয়।

মাথার ওপরে উন্মুক্ত আকাশ। নিচে সমতল ভূমি, ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ভরে গেছে দশ-দিগন্ত। সামনে বিশাল ফুলের বাগিচা। কত নাম না জানা বাহারী ফুল—চাঁদের আলোয় হাসছে। যতদূর চোখ যায়—শুধু প্রকৃতির অপার সুন্দর সবুজ বনরাজি নীলা।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছিয়াশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

অদূরে একটা সরোবর। কানায় কানায় ভর্তি স্বচ্ছ নীল নিস্পন্দ জলরাশি। যেন মনে হয়, ঘুমে গলে গেছে। পুকুরের পাশে নানা জাতের বিরাট বিরাট গাছপালা। মৃদু-মন্দ সমীরণে পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। বাদাম গাছের মাথায় চাঁদের আলো বরফের আস্তরণ ফেলেছে। অদূরে কোনও তরুশাখায় রাতজাগা পাখি একই আওয়াজের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। পুকুরের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একখানা প্রাসাদ। প্রাসাদের ভেতর থেকে পুকুরের ঘাট পর্যন্ত নেমে এসেছে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। ঘাটের দুপাশে সারি সারি স্ফটিকের থাম। সিঁড়ির ধাপগুলো প্রবাল আর পান্না দিয়ে তৈরি। এবং ধারগুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো। ওপরে পাতা একখানা চন্দন কাঠের সিংহাসন। সিংহাসনের মাথায় সোনার রাজছত্র। ঘাটের প্রবেশ দ্বারের ওপরে এক আঙ্গুর কুঞ্জ। তার লতাপাতা সবই সোনার। আঙ্গুরগুলো মুক্তোর। সারা চত্বরটা চাঁদী আর সোনার জরিতে বোনা এক পর্দা দিয়ে ঘেরা। এমন সুন্দর বস্তু ধরায় কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

হাসান হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। এক অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করে ওঠে।

এক ঝাঁক পাখি উড়তে উড়তে পুকুরের পাড়ে এসে বসে। বিরাট বিরাট সব দেখতে। সংখ্যায় মোট দশটি। সাদা ডানাগুলো ঘাসের ওপর ঘষতে ঘষতে ঘাটের কাছে আসে। ওদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ সে ঐ সিংহাসনে উঠে বসে।

পাখিগুলো প্রবল বেগে পাখা ঝাপটাতে থাকে। এবং একটু পরে পাখার খোলসের ভেতর থেকে দশটি পরমাসুন্দরী বিবসনা তরুণী হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসে। মেয়েগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গী করে সাঁতার কাটতে থাকে।

এক সময় সাঁতার ও স্নান শেষ করে ঘাটে উঠে আসে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি সিংহাসনে গিয়ে বসে। দীর্ঘায়িত কেশদাম ছাড়া তার দেহে

আবরণ বলতে অন্য কোনও বসন ছিল না।

হাসান বিচলিত বোধ করে। দেহের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখন সে বুঝতে পারছে, গুলাবী কেন তাকে এই দরজা খুলতে নিষেধ করেছিল।

মেয়েটি আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। ওর দেহের কোথাও কোন খুঁত নাই। নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া এক নিভাঁজ নিখাদ শিল্পকর্ম।

সে সম্পূর্ণ নিরাবরণ। তার গভীর কাজল-কালো চোখেও কীসের যাদু! হাসান আর স্থির থাকতে পারে না। ওর অধর কপোল, পীনোন্নত স্তন, ক্ষীণ কটি ভারি নিতম্ব, পাথর কুঁদা জঙ্ঘা, উরু—সব মিলে সে-কি এক অপরূপ ছন্দ।

সাম্রাজ্ঞীর মতো ভঙ্গী করে সে পা ছড়িয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে অর্ধশায়িত হয়ে থাকে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সাম্রাজ্ঞীর সঙ্গী-সাথীরা এক গোছা সোনার জরি ঝালর এনে ওর কাঁধের ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেহের নিম্নাঙ্গ কিছুটা আচ্ছাদিত করে দেয়। মাথায় পরিয়ে দেয় নানা রত্ন-খচিত একটি স্বর্ণমুকুট। কোমরে জড়িয়ে দেয় একখানা সূক্ষ্ম কাজ করা সুবর্ণ পেটিকা। এইবার সে আরও মোহিনী রূপ ধারণ করে।

হাসান এতক্ষণ একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না সে। এগিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে।

এমন সময় শুনতে পায় হাসান, মেয়েদের মধ্যে একজন বলে, রাজকুমারী, ভোর হয়ে আসছে। এবার আমাদের যেতে হবে। দূর দেশের পথ, এই সময় না বেরুলে সকাল হয়ে যাবে!

আবার ওরা পালকের পাখাগুলো পরে নিয়ে দূর নীল আকাশে উঠে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওরা দৃষ্টির ওপারে চলে যাওয়ার পরও হাসান ঊর্ধ্বাকাশের দিকে এক ভাবে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। যদি কোনও ভাবে আবার নজরে আসে। কিন্তু নীল আকাশ আর পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। হাসানের হৃদয় বিদারিত হতে থাকে। বহু সুন্দরী মেয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সে পেয়েছে। কিন্তু কেউ তাকে এইভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। বুকের মধ্যে কী এক দুঃসহ অনুভূতি। কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। সাতটি পরমাসুন্দরী কন্যা তার হৃদয়ের যে বস্তুতে সাড়া দিতে পারে নি, এই মেয়েটি অনায়াসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা চুরি করে পালালো কী উপায়ে?

নিজের ঘরে ফিরে আসে হাসান। সারাদিন ধরে নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে ঐ রাজকন্যার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে সে।

আবার রাত্রি নামে। সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আবার সে ওপরে উঠে আসে। এক ঠায় দাঁড়িয়ে পুকুরের ঘাটের দিকে তাকিয়ে রাতের প্রহর গুণতে থাকে।

কিন্তু সে রাতে তারা আর আসে না। আসে না তার পরের রাতেও। তারপর এক এক করে অনেক রাত আসে যায়। কিন্তু তারা আর আসে না। হাসান আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। সারা দিনে রাতে তার একই ধ্যান জ্ঞান। দারুণ অসহ প্রেমানলে জ্বলতে থাকে সে। এর চেয়ে মৃত্যুও যে অনেক ভাল ছিল।

এইভাবে হাসানের যখন মৃতকল্প দশা, তখন একদিন সেই সপ্ত কন্যারা ফিরে এল। বাইরের সাজপোশাক না খুলেই ছোট মেয়ে গুলাবী ছুটে এল হাসানের ঘরে। দেখতে পেল সে, হাসান বিবর্ণ হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে প্রায়। চোখ দুটো আধ বোজা। অঝোর ভাবে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

গুলাবী হাসানকে দুহাতে টেনে তোলার চেষ্টা করে, ভাইজান, কী হয়েছে? তোমার জন্যে ভাবনার আমার অন্ত ছিল না। না জানি কেমন আছ তুমি? শেষে, যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হলো? যাই হোক, কী হয়েছে খুলে বল দেখি। আমি সব ঠিক করে দেব, বল ভাইটি।

হাসান শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কোনও কথা বলতে পারে না। গুলাবীও কাঁদতে থাকে। বার বার বলে, আমাকে তোমার দুঃখের কারণটা বল, ভাই। দেখ, আমি তার কিনারা কিছু করে দিতে পারি কি না।

অনেকক্ষণ পরে হাসান বলতে পারে, আমি সাধ করে মরেছি। দোষ আমার। তুমি কী করে বাঁচাবে, বোন? যাক, যে ভুল আমি করেছি, তার চারা নাই। এবার আমাকে নীরবে মরতে দাও।

গুলাবী এবার আর্তনাদ করে ওঠে, এসব কী অলুক্ষণে কথা মুখে আনছ ভাই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব। তা যদি না পারি, তোমার আগে তোমার এই বোনটিই দেহ রাখবে—এই বলে দিলাম।

হাসান বলে, শোন বোন, আজ দশটা দিন আমি মুখে একটা দানা তুলতে পারিনি। রাতে ঘুমোইনি।

এরপর সমস্ত ঘটনা গুলাবীকে বলে।

ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো অষ্টাশিতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

রাগ করবে কী—হাসানের বিরহ-বেদনার কাহিনী শুনে অনুকম্পা জাগে গুলাবীর। হাসানকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, নিজেকে শান্ত করো ভাইজান। চোখের পানি মুছে ফেল। আমি ভরসা দিচ্ছি, তোমার কল্পলোকের মানসীকে আমি এনে দেব তোমার হাতে। জানি না সে মেয়ে কে? কী তার রুচি প্রকৃতি পরিচয়! তবু তুমি যখন চাইছ, আমি আমার জীবন তুচ্ছ করেও এ-কাজ করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু একটা কথা—এ ব্যাপারটা আমার অন্য সব

বোনদের কাছে গোপন রাখতে হবে। ওরা যদি শোনে, বারণ করা সত্ত্বেও তুমি ঐ দরজা খুলে বাইরে গিয়েছিলে, তা হলে বিশ্রী ব্যাপার হবে। তার চেয়ে কোনও কথা বলার দরকার নাই। ওরা জানতে পারলে আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে। তোমার মানস-প্রিয়াকে পাওয়ার আশাও চিরতরে ভন্ডুল হয়ে যাবে। ওরা যদি তোমাকে ঐ নিষিদ্ধ দরজার কথা জিজ্ঞেস করে বলবে, ওর ধারে কাছে যাওনি।' যদি জানতে চায়, 'তবে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কেন?' বলবে, 'তোমরা চলে যাওয়ার পর থেকেই এই দশা হয়েছে।'

হাসান বলে, বাঃ চমৎকার। ঠিক আছে, আমি ঐ রকমই বলবো ওদের।

হাসান অনেকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এর প্রধান কারণ, গুলাবী ভরসা দিয়েছে, তার মানসীকে পাইয়ে দেবে। এবং অন্য কারণ, নিষেধ সত্ত্বেও ওই দরজা খোলায় সে রাগ করেনি। হাসান বলে, আমাকে কিছু খেতে দাও, বোন।

গুলাবী ওর দিদির কাছে যায়। বলে, হাসান আজ দশ দিন অসুস্থ ছিল। খানাপিনা কিছুই করেনি। এখন সে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। খিদেও পেয়েছে। চল, ওকে কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করি, বেচারা আমাদের অদর্শনে কাতর হয়ে পড়েছিল। স্বদেশ স্বজন ছেড়ে এখানে একা একা পড়ে থেকে সে কাহিল হয়ে পড়েছে। চল, যাই আমরা ওকে একটু সঙ্গ দিয়ে আবার হাসি আনন্দে মাতিয়ে রাখি।

মেয়েরা নানারকম খানাপিনা এনে টেবিলে সাজায়। হাসানকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হল্লা করে খায়। কেউ গায়, কেউ নাচে—আবার জমজমাট হয়ে ওঠে স্বর্ণপ্রাসাদ। অল্প সময়ের মধ্যে হাসান আবার হাসিখুশি প্রাণবন্ত হয়।

দু একদিন পরে মেয়েরা শিকারে যায়। যায় না শুধু গুলাবী! সে বলে, হাসানের কাছে একজন থাকা দরকার। তোমরা যাও, আমি ওকে দেখবো।

গুলাবী হাসানকে সঙ্গে করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে। পুকুর পাড়ের ঘাটের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হাসানকে প্রশ্ন করে, এখন বল তো ভাইজান, তোমার মানসী ঘাটের কোন্ জায়গায় বসেছিল সে রাতে?

হাসান বলে, ঐ যে ঐ চন্দনকাঠের সিংহাসন দেখছো—ঐ সিংহাসনে সে বসেছিল—সাম্রাজ্ঞীর মতো ভঙ্গী করে।

গুলাবী শিউরে ওঠে, বল কী! ও যে এক জিন-সম্রাটের কন্যা! সারা পৃথিবীর চার ভাগের একভাগ তার দখলে। আমার বাবাও অনেক বড় সম্রাট। কিন্তু সে তো আরও অনেক বড়। এক সময় আমার বাবা তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তুমি যে চাঁদে হাত বাড়িয়েছ, ভাই?

গুলাবী বলতে থাকে: ওর বাবার এক দল নারী সাগরেদ আছে। ওরা প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা—সেনাপতি। ওদের এক-একজনের অধীনে পাঁচ হাজার করে নারী-সেনার এক একটা বিশাল বাহিনী আছে।

জিন সম্রাটের সাতটি কন্যা। এইটিই সবচেয়ে ছোট। এবং পরমাসুন্দরী। ওর নাম রোশনি। প্রতি পক্ষের প্রথমায় ওর বাবার দরবারের উজির আমিরদের কন্যাদের সহচরী করে সে এ সরোবরে সাঁতার কাটতে আসে। ঐ যে পালকের

ডানাগুলো ওরা খুলে যখন জলে ঝাঁপ দেবে সেই সময় টুক করে রোশনির ডানা দুখানার খোলসটা সরিয়ে ফেলতে হবে তোমাকে। এই ডানার খোলস যাদুমন্ত্রপূতঃ। পরে নিলে তবেই আকাশে ওড়া যায়, নচেৎ নয়।

চুরি করে এই গাছের আড়ালে তুমি ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর জলকেলী শেষ করে সে যখন ওপরে উঠে দেখবে ডানা নাই—তখনই মজাটা জমবে ভালো। তোমাকে আর কিছু কসরত করতে হবে না। আপসে আপসে তোমার কব্জায় এসে যাবে। কিন্তু খুব সাবধান, অনেক ছলাকলা করে সে তোমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু মেয়েমানুষের ছলচাতুরীতে ভুলে একবার যদি তাকে ফেরত দিয়ে দাও তার ডানার খোলস, তবে সব রসাতলে যাবে। তুমি তো মরবেই, সেই সঙ্গে আমরাও বাঁচবো না। ওর বাবার আক্রোশে আমার বাবার সাম্রাজ্যও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ওর কোনও মিঠে কথা কানে তুলবে না। বরং সব সময় কড়া তাঁবে রাখবে। যাতে সে তোমাকে ভয় পায়, এবং বাধ্য থাকে। তারপর যা ঘটে ঘটবে।

ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো উননব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে ঃ

হাসান খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। গুলাবীর হাতে সে ঠোঁট স্পর্শ করে চুম্বন করে। বলে, তোমার মাথা আছে বলতে হয়। এক চালেই বাজিমাৎ হয়ে যাবে, বোন।

গুলাবী বলে, আহা আগে থেকেই অত আশা করতে নাই। শেষে ভরাডুবি হলে দুঃখটা বেশি করে বাজে, বুঝলে!

এরপর ওরা আবার নিচে নেমে আসে।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রতিপদের চাঁদ ওঠার দিন। হাসান সন্ধ্যা হতে না হতেই পুকুরের পাশে ঘাটে এসে উঁচু মঞ্চের পিছনে এসে লুকিয়ে থাকে। রাত বাড়ে। এক সময় ঐ দশটি পাখি এসে নামে পুকুরের পাড়ে। ওরা ডানার খোলসগুলো ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই মওকায় হাসানও রোশনির খোলস সরিয়ে নিয়ে যায় এক গুপ্ত স্থানে। নিজেও লুকিয়ে থাকে একটা গাছের আড়ালে।

জলকেলী শেষ করে সকলে ঘাটে উঠে আসে। কিন্তু রোশনি আর তার নিজের ডানা-খোলস খুঁজে পায় না। আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে সে। কপাল চাপড়াতে থাকে, চুল ছিঁড়তে থাকে। দারুণ হতাশায় সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

অন্য মেয়েরা এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। যে যার নিজের নিজের ডানাগুলো চটপট পরে নিয়ে আকাশ পথে উঠে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের রাজকুমারী অসহায় অবস্থায় পড়ে রইলো সেখানে—সেদিকে কেউই কোনও ভ্রূক্ষেপ করে না। ওরা বুঝেছে, বাইরের কোনও অজানা শত্রু ওদের পিছনে লেগেছে। প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারলে বাঁচা দায় হবে।

রোশনি সহচরীদের এই অশোভন স্বার্থপর আচরণে ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে

ফুঁসতে থাকে, ঠিক আছে, এর প্রতিফল তোদের পেতে হবে একদিন।

হাসান আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিবসনা সুন্দরীর দিকে সে ধাবিত হয়। মেয়েটি ছুটে পালিয়ে, যায় পুকুরের অপর পাড়ে। ওর চোখে মুখে সে কী নিদারুণ ভয় আর লজ্জা। হাসান চিৎকার করে বলে, শোন পিয়ারী আমাকে ভয় করার কিছু নাই। কাছে এস, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো না।

কিন্তু সে কথা সে কানে তোলে না। কোনও রকমে দুহাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে ছুটে চলে। হাওয়ার দাপটে ওর লম্বা চুলের রাশি পতাকার মতো পতপত করে উড়তে থাকে। হাসান পিছনে পিছনে দৌড়তে দৌড়তে এক সময় রোশনির চুলের গোছা মুঠি করে ধরে ফেলে, আহা পালাচ্ছ কেন? আমি কী বাঘ, না ভালুক-যে খেয়ে ফেলবো?

মেয়েটি হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করে নিজেকে ছাড়াবার কায়দা কসরৎ চালায়। কিন্তু হাসানের বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে আর বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। টানতে টানতে এনে তার নিজের ঘরে তালা বন্ধ করে ফেলে। তারপর ছুটে যায় গুলাবীর কাছে। এমন শুভ সংবাদ আগে তো তাকেই জানাতে হবে।

গুলাবী হাসানের কামরায় এসে দেখে, মেয়েটি নিদারুণ দুঃখে হতাশায় কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কান্নাকাটি করছে। সে ওর পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলে, আপনি মহারানী! আমাদের ঘরে যখন একবার ধুলো দিয়েছেন, এখানেই থাকুন ঘর আলো করে—এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

রোশনির ভুরু নেচে ওঠে, ওঃ, তুমি গুলাবী! তা হলে এইসব ফন্দী তোমারই! তাই বলি, মাটির মানুষ এখানে আসবে কী করে? এতক্ষণে বুঝলাম তোমারই সব ষড়যন্ত্র। তোমার বাবা যাঁর গোলামী করেছে সেই জিন-সম্রাটের কন্যা আমি। আর আমাকে কিনা তুমি একটা মানুষের বাচ্চার যৌন-কামনার শিকার বানাবার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে? ঠিক আছে—দেখা যাবে। তুমি তো জান গুলাবী, আমার বাবার কী বিক্রম। তামাম দুনিয়ার তাবৎ জিন-সম্রাট তার অনুদাস মাত্র। সেই বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বাঁধবার সাধ হয়েছে তোমার? তুমি কী জান না, আমার বাবার এক ইশারায় লাখো লাখো সৈন্য গগনমণ্ডল ছেয়ে ফেলতে পারে। তুমি এক জিন-সম্রাটের কন্যা হয়ে একটা মানুষের সন্তানকে আশ্রয় দিয়েছ? একথা শুনলে আমাদের সমাজে তোমার বা তোমার বাবার কী দশা হবে একবার ভেবেছ? তার উপর আমার সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা—কি ভেবেছ, অত সহজেই আমি ভুলে যাব? তোমার সহায়তা ছাড়া, কোনও মানুষের পক্ষে কী সম্ভব ছিল আমার জলকেলীর সরোবরের পথ সন্ধান করা?

গুলাবী গলায় মধু ঢেলে রোশনির মন ভোলাবার চেষ্টা করে, রাজকুমারী, আপনার পিতা আমার পিতার মালিক। সুতরাং তিনি আমার মালিকের মালিক। আপনি তার কন্যা। আপনার মতো রূপসী নারী তামাম জিন

দুনিয়ায় দুটি নাই। জলকেলীর সময় এই অবোধ যুবক আপনার অঙ্গ-সোষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিধাতা পুরুষ কার ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন আগে থেকে কেউ আমরা তা বলতে পারি না। তা না হলে দুনিয়াতে এত নারী থাকতে সে মাটির দেশের মানুষ হয়ে আপনার মতো এক জিন-পরীর প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়বে কেন? নিশ্চয়ই, বুঝতে হবে, এর পিছনে অদৃশ্য ঈশ্বরের কোনও হাত আছে। আপনি একটু গভীরভাবে ভাবার চেষ্টা করুন রাজকুমারী। ঈশ্বরের অভিপ্রায় না থাকলে এই ধরনের অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছুতেই ঘটতে পারতো না।

—ভালোবাসার অপরাধ সর্বদা মার্জনীয়। সে দিক থেকে এই যুবকের গুস্তাকী আপনি মাফ করতে পারেন। আমি হলফ করে বলতে পারি, শুধু চোখের নেশা নয়, এর মহব্বৎ সাচ্চা সোনা। আপনাকে সে দিল-ক্যা-প্যার করেই রাখতে চায়। আপনি প্রসন্ন হোন। এর ভালোবাসা গ্রহণ করে দেখুন, সেখানে কোনও খাদ নাই। আপনারও ভালো লাগবে একে। আপনিও প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে পারবেন। আপনি শুনে অবাক হবেন রাজকুমারী এক পক্ষ আগে আপনাকে প্রথম দেখার পর থেকে এই পনের দিন সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আপনার বিরহে কাতর হয়ে শয্যা নিয়েছিল। আপনাকে না পেলে এর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এবং বিরহ জ্বালাতেই মৃত্যু হবে।

গুলাবী আরও সবিস্তারে হাসানের হৃদয় যন্ত্রণার বিষাদ করুণ চিত্র তুলে ধরে রোশনির সামনে। এবং বলে, আপনারা দশ জন ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই পরমাসুন্দরী। কিন্তু ভেবে দেখুন, রাজকুমারী, এ কিন্তু অন্য কোনও নারীর দিকে কোনও নজর করেনি। এর একমাত্র কাম্য আপনি আর আপনার মহব্বত।

রোশনি বুঝতে পারে, যুবকের উদ্দেশ্য অসৎ নয়। এতক্ষণে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো নব্বইতম রজনীতে

আবার সে গল্প শুরু করে:

জমকালো সাজ-পোশাকে সাজিয়ে রোশনিকে খানাপিনা এনে দেয় গুলাবী। অনেক আদর-আপ্যায়ন তোয়াজ করতে থাকে সারাক্ষণ। রোশনি-সুন্দরী খুশি হয়ে ওঠে, আমিও ভাবছি গুলাবী, এই বোধহয় করুণাময়ের ইচ্ছা ছিল। তা না হলে আমার স্বদেশে, বাবা আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এই দূর প্রবাসে এসেই বা এমন কঠিন পরীক্ষার সামনা-সামনি হব কেন? এখন নসীবের কাছে নতি স্বীকার ছাড়া গতি কী?

গুলাবী হাসানের কাছে গিয়ে বলে, এবার যাও, এই উপযুক্ত সময়। ওর মনটা বেশ নরম হয়ে আছে। প্রথমে ঘরে ঢুকেই ওর পা দুখানা জড়িয়ে ধরবে। তারপর ওর হাত এবং কপালে চুমু খাবে। এর আগে পর্যন্ত একটি বাক্য

উচ্চারণ করবে না, মনে থাকে যেন।

হাসান ঘরে এসে কাঁপতে থাকে। রোশনি এগিয়ে আসে কাছে। অপলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সে হাসানকে। হাসান বড় রূপবান যুবক। খুশিতে ভরে ওঠে ওর মন। নিচে বসে পড়ে রোশনির পা দুখানা চেপে ধরে হাসান। চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে হাতে এবং পরে ওর চোখে কপোলে এবং পরিশেষে অধরে অধর রাখে।

তুমি সুন্দর—সবচেয়ে সুন্দর, রূপের রানী—আমার দিল-ক্যা-প্যার। আমার আনন্দ, আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান—চোখের মণি রোশনি— ! আমার ওপর একটুখানি সদয় হও, সোনা। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। আমার এই জীবন-যৌবন—সব বিলিয়ে দিতে চাই তোমার পায়ে। শুধু একটু-খানি ভালবাস। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো—আমি তোমার বান্দা হয়ে থাকতে চাই, রোশনি তুমি একটুখানি সদয় হও। আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না, ভালোবাসতে চাই, প্যার করতে চাই। শাদী করতে চাই তোমাকে।

আমি তোমাকে আমার স্বদেশ বাগদাদে নিয়ে যাবো। সেখানে তুমি আমার বেগম হয়ে থাকবে। দাস দাসী খোজা নফর চাকর তোমার সেবা-যত্ন করবে। তোমার জেল্লায় ঘর ভরে উঠবে আমার। বাগদাদ বলতে শান্তির শহর বোঝায়। সেখানকার বাসিন্দা কলহ-বিবাদ জানে না। দেখবে, সেখানকার মানুষজন কত ভালো, কত ধার্মিক। আমার মা আছে, তার মতো ভালো মানুষ আজকালকার দিনে দেখা যায় না। দেখো, সে তোমায় পেটের সন্তানের মতোই আদর সোহাগ করবে। ভালোবাসায় ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে তোমার হৃদয়। কত সুন্দর সুন্দর খানা বানিয়ে খাওয়াবে, তোমাকে পেয়ে সে যে কী খুশি হবে!—কারণ আমি তার একমাত্র সন্তান, আর তুমি আমার পেয়ারের বিবি। আমার মায়ের হাতের রান্না একবার যে খেয়েছে, সে আর ভুলতে পারেনি কোনও দিন। তামাম বাগদাদের মধ্যে তার তুল্য ভালো খানা আর কেউই বানাতে পারে না।

একটানা এত সব কথা বলে হাসান থামে। ভাবে, রোশনি কিছু বলবে। কিন্তু একটাও কথা বলে না সে!

এই সময় হঠাৎ সদর দরজায় করাঘাত হয়। হাসান দরজা খোলার জন্য বাইরে আসে। মেয়েরা শিকার থেকে ফিরেছে। হাসানকে দেখে ওরা কল-মুখর হয়ে ওঠে। অনেকগুলো হরিণ খরগোস, বুনো মোষ, শেয়াল এবং আরো অনেক রকমের পশু শিকার করে এনেছে তারা। এবং সেই আনন্দেই সকলে মশগুল। হাসান ভয় করেছিল, রোশনিকে ওরা দেখে ফেলবে। কিন্তু তখন কে কী ভাবে কোন্ জানোয়ারটাকে ঘায়েল করেছিল, তারই ফিরিস্ত শোনাতে ব্যস্ত। অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না। মেয়েরা বলে, হাসান ভাই, একটু হাত লাগিয়ে ধরতো, বাব্বা জানোয়ারগুলো কি পেল্লাই ভারি।

অন্য দিন হাসান ওদের হৈ-হুল্লোড়ে নিজেকে সামিল করে দেয়। শিকার সামগ্রী দেখে আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু আজ যেন হাসান তেমন প্রাণ খুলে হাসতে পারছে না। বারবার ওর নিজের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখছে। কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব। ব্যাপারটা বড় বোনের নজর এড়ায় না। হাসানকে একটু টিপ্পনি কেটেই বলে, কী হলো ভাইজান, মনে হচ্ছে, আজকের শিকার তোমার পছন্দ হয়নি? তা, আর কোনও বড় শিকার ধরেছ নাকি।

হাসান ভীষণ বিচলিত বোধ করে। তবে কী বড়দিদি সব জেনে ফেলেছে? মাথা তুলে আর তাকাতে পারে না সে। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়! বড় বোন আবার বলে, না কি দেশের জন্য মন খারাপ করছে। মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। শরম করো না ভাইটি, খুলে বল তোমার মনের কথা। তা না হলে আমরা জানবো কেমন করে?

হাসান তবু কোনও কথা বলতে পারে না। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময় গুলাবী ছুটে আসে সেখানে। হাসতে হাসতে বলে, ভাইজান আজ একটা সুন্দর চিড়িয়া ধরেছে, দিদি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে পাখিটা কিছুতেই পোষ মানছে না। তোমরা যদি চেষ্টা-চরিত্র করে তাকে একটু বশে আনতে পার দিদি, ভাই-এর আমার মুখে হাসি ফুটবে।

মেয়েরা হো হো করে হেসে ওঠে। বড় বোন বলে, এটা কী একটা সমস্যা হলো? না না, একটা সামান্য চিড়িয়ার জন্য ও বেচারী অমন মনমরা হবে কেন? নিশ্চয়ই অন্য কিছু হয়েছে।

—কারণ, হাসান ঐ পাখিটাকে পেয়ার করে ফেলেছে। আর সে কী পেয়ার দিদি! যদি একবার দেখতে—

হাসান তখনও আরক্ত হয়ে নত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

বড় বোন এবার বোধহয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারে।

—তা হলে খুব বড় রামপাখি বল?

—তা আমাদের মতই আকরে হবে আর কি।

গুলাবী মুখ টিপে হাসে। হাসতে হাসতেই বলে, হলেও মনুষ্য সন্তান তো! বুদ্ধিতে একটু খাটো! তাই আমরা যখন দেশে গিয়েছিলাম, তখন হাসানকে বারবার করে বারণ করে গিয়েছিলাম, ঐ নিষিদ্ধ দরজাটা খুলো না। কিন্তু খাটো বুদ্ধির মানুষগুলোর অহেতুক কৌতূহল একটু বেশি হয়। আমার বারণ অমান্য করে আমাদের আদরের ভাইজান এক রাতে ঐ দরজা খুলে ওপরে চলে গিয়েছিল। এবং ভাগ্যক্রমে সে রাত ছিল প্রতিপদের। তোমরা তো জান দিদি, প্রত্যেক প্রতিপদ তিথিতে সম্রাট জিনিস্থানের মেয়েরা সরোবরে জলকেলী করতে আসে! হাসান ঐ সম্রাট-নন্দিনীকে দেখে মূর্ছা যায়। তারপর থেকে সে আর শয্যাত্যাগ করে দাঁড়াতে পারেনি—এমনই শরীরের হাল হয়েছিল।

—যাই হোক, অনেক প্যাঁচ-পয়জার করে সেই রাজকুমারী রোশনিকে সে ঘরে এনে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু কিছুতেই তাকে পোষ মানাতে পারছে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একানব্বইতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

গুলাবীর কথা শুনে মেয়েরা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, তাই নাকি, ভাইজান? তা একবার দেখাও তোমার সে আজব চিড়িয়া? দেখি সে কতবড় রূপসী।

হাসান ওদের সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। সাত বোন এক সঙ্গে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ করে রাজকুমারী রোশনিকে। বড় বোন এগিয়ে এসে বলে, আপনার আগমনে এই স্বর্ণ-প্রাসাদ আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে, রাজনন্দিনী। আমাদের ভাই হাসান, রূপে-গুনে সেরা ছেলে। এত ভালো ছেলে আজকের দিনে হয় না। আমি হলফ করে বলতে পারি, হাসানকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আপনার জীবন মধুর হয়ে উঠবে। আপনি রাজি হয়ে যান। হাসান ভাইজানের সঙ্গে আপনার শাদী দিয়ে দিই আমরা। এই প্রাসাদে চির কাল ঘর আলো করে থাকুন।

মেয়েরা রোশনির জবাবের প্রত্যাশায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রোশনি না বলে 'হ্যাঁ', না বলে 'না'। গুলাবী রোশনির একখানা হাত টেনে নিয়ে হাসানের হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বলে, ব্যস, হয়ে গেল। দুহাত এক করে দিয়েছি আমরা—এবার তোমরা বোঝাপড়া করে নাও, কেমন?

হাসানের আনন্দ আর ধরে না। গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে সে ঃ

যখন তুমি খেলা কর জলে,
খেলার ছলে হারিয়ে যাও তলে,
তখন আমি চমকে উঠে বলি,
কোথায় আমার স্বর্ণচাঁপার কলি?
হঠাৎ আবার ভেসে ওঠো জলে,
রুষ্ট হই, কপট কোপানলে।
তখন তুমি মধুর করে হাসো,
শুধাও যেন—এতই ভালোবাসো?

মেয়েরা আনন্দে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে, হৈ—হৈ—

হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ওরা। হাসির হুল্লোড়ে এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে অনেকক্ষণ।

—এবার বলুন রাজকুমারী, আমাদের ভাইটি কেমন? কী সুন্দর করে মহব্বতের ছড়া বেঁধে দিল এক লহমায়, আপনি পারবেন?

—তা হলে তোমাদের ভাইটি কবিয়াল, দেখছি।

এই প্রথম রোশনির মুখে বোল ফোটে। গুলাবী বলে, হ্যাঁ, আলবাৎ কবি। মুখে মুখে সেই এই রকম মহব্বতের হাজারো কবিতা বানিয়ে শুনিয়ে দিতে পারে আপনাকে।

এবার রোশনি কোমল দৃষ্টি মেলে হাসানের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে

হাসে। চোখের ইশারায় হাসানকে কাছে ডাকে।

এরপর হাসানের দুই বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় রোশনি। মেয়েরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পর পর চল্লিশটা দিবস রজনী হাসান আর রোশনি পালংক-শয্যায় পড়ে থাকে। এমন মধুময় মুহূর্ত হাসান জীবনে কখনও উপভোগ করেনি। প্রাণ মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রোশনি তাকে কোনও ভাবেই বঞ্চিত করেনি। দু হাতে সব উজাড় করে দিয়েছে।

কিন্তু একচল্লিশ দিনের শেষ রাতে হাসান স্বপ্নে তার মাকে দেখে। পুত্র-শোকে কেঁদে কেঁদে তার মা প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। হাসানের তাজিয়া বানিয়ে সারা দিনরাত সে তার সামনে বসে চোখের জল ফেলে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতেই হাসান আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে, মা, মা গো, মা—

হঠাৎ এই অস্বাভাবিক আওয়াজে চমকে ওঠে মেয়েরা। দ্রুত পায়ে ছুটে আসে হাসানের ঘরের দিকে। গুলাবী রোশনিকে জিজ্ঞেস করে, কী কী হয়েছে হাসানের?

রোশনি বলে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে স্বপ্নে কিছু দেখে থাকবে।

গুলাবী হাসানকে জাগিয়ে তোলে, ভাইজান? ভাইজান, কী হয়েছে তোমার? অমন চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

হাসান বিছানায় উঠে বসে। তখনও ওর চোখে জল টলমল করছে। স্বপ্নের কাহিনীটা বললো সে।

গুলাবী এবং অন্য মেয়েরাও কাঁদতে থাকে, তোমাকে আর এখানে আটকে রাখা ঠিক হবে না, ভাইজান। তুমি এবার দেশে যাও। কিন্তু কথা দাও, ফি বছর একবার করে এসে তোমার এই বোনদের সঙ্গে দেখা করে যাবে?

হাসান বলে, একশোবার। যেখানেই যাই, যত দূরেই থাকি বোন, তোমাদের এই আদর আর এত ভালবাসা ভুলবো কেমন করে? মন আমার পড়ে থাকবে এখানেই।

কিন্তু হাসান যাবে কী ভাবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, বাহ্‌রামের সেই ছোট্ট যাদু দামামাটা আছে তার কাছে। তবে সে বস্তুটি কী করে ব্যবহার করতে হয় তা তো সে জানে না! গুলাবী শুনে বললো, আমি জানি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সেই ছোট্ট দামামাটা মোরগের চামড়ার ছাউনিতে ঢাকা। গুলাবী অদ্ভুত কায়দা করে দুটি আঙ্গুল রেখে টোকা মারে। আর তখুনি সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পিলপিল করে গাধা, ভেড়া, খচ্চর, ঘোড়া, মোষ, উট প্রভৃতি নানা জাতের জন্তু-জানোয়ার এসে স্বর্ণ-প্রাসাদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। গুলাবী তার থেকে কয়েকটা উট এবং খচ্চর বেছে নিয়ে বাকীগুলোকে বিদায় করে দেয়।

নানারকম সাজ-পোশাক, রত্ন আভরণ এবং মনোহারী উপহার সামগ্রী বেঁধে-ছেঁদে জানোয়ারগুলোর পিঠে চাপিয়ে দেয় মেয়েরা।

বিদায় বেলায় সাত বোন চোখের জলে ভাসে। বিশেষ করে গুলাবীর বেশি করে বাজে। কারণ, এতদিন সেই সবচেয়ে বেশি করে হাসানকে কাছে কাছে রেখেছিল। তার খানাপিনা সুখ-সুবিধা দেখা-শোনার ভার ছিল তারই ওপর।

দীর্ঘ পথ, কিন্তু বিশেষ কোন দুর্ভোগ পোয়াতে হলো না। কয়েকদিন চলার পর হাসান রোশনিকে সঙ্গে করে বসরায় এসে পৌঁছয়।

মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। ছেলের আগমন প্রথমে সে বুঝতে পারে না। হাসান আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরে, মা, মাগো চেয়ে দেখ, আমি — হাসান, তোমার ছেলে আবার ফিরে এসেছে তোমার কোলে।

হাসানকে যে আবার ফিরে পাবে সে আশা করেনি তার মা। তার ধারণা জন্মেছিল, হাসান আর বেঁচে নাই। তাই বাড়ির আঙিনায় হাসানের নামে একটা তাজিয়া বানিয়ে সে তার সামনে বসে দিনরাত কান্নাকাটি করতো।

হাসান বলে, মা আমি বেঁচে আছি। এই দেখ, শাদীও করেছি। এই তোমার পুত্র-বধূ।

মা রোশনিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তুমি যে-ই হও মা, তুমি আমার বড় আদরের। যখন এসেছ, ঘর আলো করে থাক, মা।

হাসানের বাড়িটা ছোট-খাটো। কোনও প্রাসাদ ইমারত নয়। ঘরদোর অতি সাধারণ। রোশনি সম্রাট-নন্দিনী—সে অবাক হয়। এই ছোট বাড়িতে মানুষেরা বাস করে কী করে?

বসরাহর বড় বাজার থেকে সবচেয়ে দামি দামি সাজ-পোশাক কিনে আনে হাসান। রোশনিকে ডেকে বলে, দেখ তো, কেমন মানাবে তোমায়?

সে-সব অতি সাধারণ, একেবারেই জোলো বলে মনে হয় রোশনির কাছে। এমন সাজ-পোশাক সে কেন, তাদের দাসী বাঁদীরাও কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু হাসান বা তার মা মনে দুঃখ পেতে পারে, তাই মুখে বলে, মন্দ কী! এতেই চলবে।

হাসানের মা সব বুঝতে পারে।, বলে, এখানকার হাট-বাজারে বাহারী সওদা পাওয়া শক্ত, মা। ওসব পেতে গেলে বাগদাদে যেতে, হবে।

রোশনি বলে, কী দরকার মা। এই বেশ হয়েছে। এতেই চলে যাবে।

মা বলে, হাসান, এক কাজ কর বাবা, মাকে নিয়ে তুই বাগদাদে চলে যা। খলিফা হারুন অল রসিদের শহর। উজির আমির সওদাগরদের বাস। বড় লোকের জায়গা, শখের সামানের অভাব নাই সেখানে। ওখানে গিয়ে খুব বড় দেখে একখানা বাড়ি কিনে বৌমাকে নিয়ে ওখানেই তুই বাস কর গে। নতুন অচেনা জায়গা। গোড়া থেকেই যদি আমিরি চালে চলতে শুরু করিস, কারো মনে কোনও সন্দেহ হবে না। কারণ, কত দেশ থেকে কত বড়লোক সেখানে যায়। লাখ লাখ টাকা খরচ করে। কেউ সে দিকে তাকিয়েও দেখে না। কিন্তু এখানে এই ছোট্ট বসরাহতে আমাকে তোকে তো সবাই চেনে জানে। এত

কাল আমাদের কী অবস্থা ছিল কারো অজানা নাই। আজ যদি তুই এখানে হঠাৎ তিনমহলা বাড়ি হাঁকিয়ে বসিস, গণ্ডা কয়েক দাসী-বাঁদী কিনিস, লোকের চোখ টাটাবে না? ভাববে, এত পয়সা কোথায় পেল ওরা? এমনিতেই ঐ শয়তান পারসীটার সংগে তোর অত মাখামাখি মেলামেশার জন্য অনেক কথা উঠেছিল। লোকটা যে জালিয়াত—মন্তর তন্তর দিয়ে তামা-পিতলকে সোনা বানিয়ে বাজারের লোককে ঠকায়, সে খবর তারা পেয়েছিল। এখন তুই ফিরে এসেছিস। বিদেশ থেকে অঢেল সোনাদানা হীরে জহরৎ নিয়ে এসেছিস। সে খবরও লোককে জানানো যাবে না। যা ঘরদোরের হাল চুরি ডাকাতি হয়ে যাবে। এবং যদি আমিরি চালে চলতে থাকিস, তখন এখানকার লোক রটাবে সোনা জাল করে পয়সা বানাচ্ছিস। তার অনেক বিপদ আছে, বাবা। একবার যদি খলিফা হারুন অল রসিদের কানে যায়—একেবারে গর্দান নিয়ে নেবে আমাদের সকলের। তার চেয়ে ওসব ঝুঁকির মধ্যে গিয়ে কাজ নাই। তুই বাগদাদে চলে যা। গোড়া থেকেই বড়লোকি চালে চলতে থাকলে কারো আর নজরে পড়বে না।

হাসান বললো, তুমি ঠিকই বলেছ, মা। এখানে থাকলে ভয়ে ভয়ে গরীবের মতোই দিন কাটাতে হবে। কিন্তু তার তো কোনও দরকার নাই। আমি যে ধনদৌলত সংগে এনেছি; সাতপুরুষ বসে খেলেও তা ফুরাবে না। ঠিক আছে, এখানকার পাট আমি একেবারেই তুলে দিচ্ছি মা। তুমিই বা এখানে পড়ে থাকবে কী কারণে? আমি বাড়িঘর সব বেচে দিয়ে তোমাকে সংগে নিয়েই বাগদাদে যাবো।

কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ি এবং বাড়ির যাবতীয় সামানপত্র সব বেচে দিল হাসান। প্রতিবেশিরা অনেকে দুঃখ করলো, আহা, সাত পুরুষের ভিটে, বেচে দিলে?

হাসান বলে, ভিটে তো খাওয়াবে না, চাচা। বাঁচতে গেলে পয়সা চাই। সে-পয়সা রোজগার করতে হলে ভালো বাণিজ্য করা দরকার। আমি বাগদাদে গিয়ে সওদাগরি ব্যবসা করবো।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ্ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তিরানব্বইতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয়:

সামানপত্র বাঁধা ছাঁদা করে নিয়ে হাসান সেই ছোট্ট দামামাটায় টোকা দেয়। সংগে সংগে একপাল জন্তু জানোয়ার এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মধ্য থেকে কয়েকটা উট বাছাই করে নিয়ে বাকীগুলোকে বিদায় করে দেয় সে। এবং বাক্সপ্যাটরা চাপিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে যায়।

বাগদাদ শহরের পাশে টাইগ্রিসের উপকূলে এসে এক লক্ষ দিনার দিয়ে একখানা সুরম্য অট্টালিকা কেনে। এই প্রাসাদখানা এক উজিরের ছিল।

বাজার থেকে অনেকগুলো দাসী বাঁদী নফর চাকর খোজা কিনে নিয়ে আসে

হাসান। আর নিয়ে আসে দুষ্প্রাপ্য দামী কাঠের খাট পালঙ্ক কুর্শি কেদারা মেজ। সূক্ষ্ম কাজকরা পর্দা এনে টাঙিয়ে দেয় জানালা-দরজায়। পারস্যের শৌখিন গালিচা এনে পাতে মেঝেয়। এবং আরও নানা রকম সুন্দর সুন্দর শখের জিনিস এনে ঘরদোর সাজায়। এইভাবে দিন কয়েকের মধ্যে প্রাসাদখানা ঝকমক করে ওঠে।

রোশনি আর মাকে নিয়ে হাসান পরম সুখ বিলাসের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। প্রতিদিন নতুন নতুন স্বাদের সুন্দর সুন্দর খানা তৈরি করে তার মা। রোশনি নিজহাতে হাসানকে খাবার সাজিয়ে দেয়। নাচ গান বাজনায় মাতিয়ে রাখে স্বামীকে।

রোশনি গর্ভবতী হয়, এবং ন'মাস বাদে ফুটফুটে সুন্দর দুটি জমজ পুত্রের জন্ম দেয়। হাসান ওদের একটির নাম রাখে নাসির এবং আর একটির মনসুর।

একটা বছর কেটে গেল। হাসানের মনে পড়ে সেই সপ্তকন্যার কথা। ওরা বলেছিল, বছর শেষে একবার করে এসে বেড়িয়ে যাবে।

একমাত্র ইরাকেই মেলে সেই রকম কিছু বিশেষ উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে আনে হাসান। মেয়েদের জন্যে নিয়ে যাবে সে। কিন্তু হাসানের আশঙ্কা হয়, মা হয়তো যেতে দিতে চাইবে না। কিন্তু মা বাধা দেয় না, বলে যারা তোমার জন্য এত করেছে, যাবে বই কি সেখানে। তবে বেশি দেরি ক'রো না, বাবা। জানতো মায়ের প্রাণ, কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না।

হাসান বলে তুমি কিছু ভেব না মা, আমি বেশি দেরি করবো না। তুমি রইলে, রোশনি, নাসির, মনসুর এরা রইলো—আমি কি বেশিদিন না দেখে থাকতে পারি।

হাসান গলাটা খাটো করে বলে, একটা কথা মা—তোমার ঘরের খাটের তলায় একটা পাখীর ডানার খোলস আছে; খুব হুঁশিয়ার থেকো, ঐ খোলসটা যেন কিছুতেই রোশনির হাতে না পড়ে। ওর উড়ে বেড়ানোর নেশাটা এখন কেটে গেছে। কিন্তু ঐ খোলসটা দেখলেই আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আর একবার যদি সে আকাশে উড়তে পায় তখন কী হবে কে বলতে পারে। হয়তো সে চিরকালের মতো আমাদের ছেড়ে ওর বাবার কাছে পালিয়ে যাবে। ওই খোলসটা তোমার বুকের কলিজা—এই জ্ঞান করে ওটাকে আগলে রাখবে, মা। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

হাসান আরও সতর্কবাণী শোনায় মাকে, তুমি নিজে হাতে রোশনির খানা-পিনা এনে দিও মা। নফর চাকরদের ওপর ছেড়ে দিও না। কারণ ওরা কেউই ওর মেজাজ-মর্জি জানে না। কোন্ জিনিসটা ওর পছন্দ কোন্‌টা অপছন্দ, আমি আর তুমি ছাড়া তো কেউ জানে না, মা। রোশনিকে তুমি বাড়ির বাইরে এক পা যেতে দেবে না কোথাও। ও যেন জানালা দিয়ে পথের দিকে মুখ না বাড়ায়, ছাদে না যায়। সব সময় চোখে চোখে রাখবে ওকে। একবার যদি সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় মা, আমি আর বাঁচবো না। রোশনি আমার জান, আমার কলিজা! এই কথাটা তুমি মনে রেখো, মা।

মা হেসে বলে, তুই কী আমাকে এতই বোকা হাঁদা মনে করিস নাকি, বাবা। আমি সব বুঝি, সব আঁচ করতে পারি। তোর বৌ আমাদের ঘরে বেগমের তোয়াজে থাকলে কী হবে, ওর মন পড়ে থাকে আশমানে। ওর বাবা মার দেশে। তুই দেখিস্ না, নিজের গর্ভের সন্তান নাসির মনসুর—হীরের টুকরো, চাঁদের মতো ছেলে, সেই ছেলের ওপরই বা ওর মায়ের দরদ কতটুকু। তবে আমিও সেয়ানা মেয়ে। আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালানো সম্ভব নয়। তুই কিচ্ছু ভাবিস নি বাবা, যা ঘুরে আয় মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে। এসে দেখবি তোর রোশনি যেমনটি ছিল তেমনি আছে আমার কাছে। ওর আদর যত্নের কোনও ত্রুটি রাখিনি এতদিন, এখনও কোন অনাদর করবো না। তুই যা ওদের দেখে আয়। তবে বেশি দেরি করিস নে, বাবা।

মা-পোয়ের এই নিভৃত আলাপ কিন্তু আড়ালে থেকে রোশনি সবই শুনে ফেলে।

দিনক্ষণ দেখে হাসান মায়ের কাছে বিদায় নেয়। রোশনি নাসির এবং মনসুরকে আদর সোহাগ করে। রোশনিকে বলে, খুব সাবধানে থেক। মায়ের কথার অবাধ্য হয়ো না। আমি খুব শিগ্গিরই ফিরে আসবো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

পাঁচশো চুরানব্বইতম রজনী

আবার গল্প শুরু হয়ঃ

দামামায় টোকা দিতেই অনেক জন্তু-জানোয়ার এসে হাজির হয়। হাসান এক পক্ষীরাজ ঘোড়াকে রেখে বাকী সবগুলোকে চলে যেতে বলে।

শেষ বারের মতো সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পক্ষীরাজের পিঠে চেপে বসে হাসান। এবং পলকের মধ্যে সে উড়ে চলে আসে স্বর্ণপ্রাসাদে।

সাত বোন আনন্দে নেচে ওঠে। সারা প্রাসাদ আলোর মালায় সাজায়। রাশি রাশি ফুল এনে ভরে ফেলে ঘরদোর। সুন্দর সুন্দর খাবার তৈরি করে। সারা প্রাসাদময় সে কি উৎসব আনন্দের ঘটা।

সাত বোন, বিশেষ করে গুলাবী যে কী খুশি হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নাচগান হৈ হল্লা, শিকার ভ্রমণ সাঁতারে মেতে উঠলো সকলে। প্রাণের ভাই হাসান সব কিছুতে তাদের সঙ্গী সহচর হয়ে রসের ভিয়েন জোগাতে থাকলো।

আচ্ছা, ওরা ওদিকে হেসে খেলে আনন্দে দিন কাটাক, আমরা চলুন আবার ফিরে যাই বাগদাদে—হাসানের প্রাসাদে।

হাসান চলে যাওয়ার পর দুদিন শাশুড়িকে ছেড়ে এক পাও নড়লো না রোশনি। কিন্তু তৃতীয় দিন ভোরে উঠে সে হাসানের মাকে বললো, মা আজ কতকাল গোসল করিনি। বাচ্চা দুটো তো দুধ মাখিয়ে বুকখানা চটচটে করে ফেলেছে। গা ঘিন ঘিন করছে, আমি হামাম থেকে গোসল সেরে আসি।

মা বললো, হায় আমার কপাল, এ শহর তো আমার কাছে একেবারেই অচেনা, মা। এর পথ ঘাট বাজার হাট কিছুই জানি না। এখান থেকে কত দূরে হামাম, কোন্ পথেই বা যাওয়া যায়, কিছুই জানি না। এ অবস্থায় কী করে হামামে যাবে তুমি। তার চেয়ে আর কটাদিন কষ্ট করে কাটাও। হাসান শিগ্গিরই এসে পড়বে। ছেলে এসে তোমাকে গোসল করিয়ে নিয়ে আসবে। আর তোমার যদি নিতান্তই খারাপ লাগতে থাকে তাহলে ঘরেই আমি খানিকটা পানি গরম করে দিচ্ছি। তাই দিয়ে গা হাত পা ভালো করে মুছে ফেল, দেখবে—আরাম পাবে। গোসলের সব সাজ-সরঞ্জামই আমার ঘরে আছে। দিন কয়েক আগে হাসান একটা আলেপ্পোর সুগন্ধী আতরের শিশি এনে রেখেছে। পানির মধ্যে খানিকটা মিশিয়ে দিলে ফুরফুর করে খুশবু ছাড়বে। মনটা খুশ্ হয়ে উঠবে।

রোশনি কিন্তু তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে না! ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে থাকে, মা একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না। শহরের পথ-ঘাট অচেনা-অজানা এ অজুহাত আপনার অচল। আমি নাজুক নাবালিকা নই যে, পথে বেরুলে হারিয়ে যাবো। আপনার একটা কেনা বাঁদিকেও যদি এই ধরনের বাধা দিতেন তবে আমি বলতে পারি, সেও তা মানতো না। বাঁদী-বাজারে তাকে বিক্রি করে দিয়ে আসার জন্য জুলুম করতো। আপনি আমাকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করেন। তা না হলে বাড়ির বাইরে যেতে দিতে আপনার আপত্তি হতো না। কিন্তু একথাও জেনে রাখুন মা, কোনও নারী যদি মনে করে সে পালাবে বা নষ্ট হবে তাকে আপনি শিকলে বেঁধে রেখেও আটকাতে পারবেন না। আপনি আমার সতীত্বে কটাক্ষ করেছেন। এ অবস্থায় এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, মা। এখন আমার মৃত্যু ছাড়া পথ নাই।

এই বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে রোশনি। মা দেখলো রোশনি তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এই রাগের মাথায় মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নাই। কী জানি, হয়তো সে জহর খেয়েই জীবন শেষ করে দেবে! ভয়ে শিউরে ওঠে সে।

—তুমি যখন এতই গোসা করছ মা, তবে চল যাই তোমাকে হামামে গোসল করিয়ে নিয়ে আসি। হাসান বলেছিল, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে যেন বাড়ির বাইরে যেতে না দিই। কিন্তু আমি আর তার কথা রাখতে পারলাম না। চল তেল সাবান আতর সঙ্গে নাও, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো হামামে।

রোশনিকে বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত হামামে নিয়ে যায় হাসানের মা। কিন্তু না নিয়ে গেলেই ভালো হতো, আরও একটু পাষাণ প্রাণ হয়ে রোশনির সব কথা হজম করে চুপচাপ কটাদিন কাটালে কী ক্ষতি ছিল? কিন্তু নিয়তিকে কে এড়াতে পারে? যা হবার তা তো হবেই।

হামামে পৌঁছতেই রোশনির অসাধারণ রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করে গোসলের জন্য অপেক্ষমান মেয়েরা চমকে ওঠে। এত রূপ কোনও মানুষের হতে পারে

না। এ নিশ্চয়ই কোনও হুরী-পরি।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পচানব্বইতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না। তারপর সাজপোশাক ছেড়ে যখন রোশনি বিবস্ত্রা হয় তখন তারা ওর নগ্ন দেহবল্লরীর অপার লাবণ্য এবং নিভাঁজ নিখুঁত অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখে আরও বেশি অবাক হয়ে যায়। একেবারে নিপুণ কারিগরের হাতে গড়া অপূর্ব এক শিল্পমূর্তি।

অন্য মেয়েরা, যারা গোসল করার জন্যে গিয়েছিল, সকলেই গোসল-টোসল ভুলে গিয়ে রোশনিকে দেখতে থাকে। এত রূপ সে কোথায় পেল? দুনিয়ার বহু রূপসী নারীর দেহ-বর্ণনা ওরা শুনেছে কিন্তু এ মেয়ে তো তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কোনও শিল্পীর সাধ্য নাই এ রূপ তুলিতে আঁকে। কোনও কবির কল্পনা এর ধারে কাছেও পেঁছিন সম্ভব নয়।

মুহূর্তের মধ্যে রোশনির রূপের খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে! দলে দলে মেয়েরা হামামে এসে ভিড় জমাতে থাকে। কেউ গোসল করতে আসে না —আসে রোশনিকে দেখে নয়ন সার্থক করতে। এই সব মেয়েদের মধ্যে বেগম জুবেদার এক চরও ছিল। মেয়েটির নাম তুহ্ফা। ভীষণ চালাক এবং অপরূপ সুন্দরী।

গোসল শেষ করে সাজপোশাক পরে রোশনি বাড়ি ফেরার জন্য শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামে। যতক্ষণ সে ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নগ্ন দেহ মর্দন করতে করতে স্নান করছিল ততক্ষণ একভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল তুহ্ফা।

রোশনির সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলার ছল করে সে। কিন্তু রোশনি কোনও আমল দেয় না। নিজের মনে পথে নামে। তুহ্ফা কিন্তু চিনে-জোঁক। সে ওদের পিছু ছাড়ে না। হাঁটতে হাঁটতে হাসানের বাড়ির দরজায় এসে পড়ে। রোশনি আর তার শাশুড়ি ভিতরে ঢুকে যায়। খোজা দরজা বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় তুহ্ফা খোজাকে বলে, আমিও যাবো ভেতরে। তোমার মালকিনের সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আরে ভাগ্।

খোজাটা খিঁচিয়ে ওঠে, যা পালা এখান থেকে, মালকিনের সঙ্গে কথা আছে! কথা আছে তো সারাটা পথ মুখে কুলুপ এঁটে ছিলে কেন। বলতে পারলে না?

তুহ্ফা বলে, আহা ছাড়োই না গো, আমি শুধু এই গুলাবটা তার হাতে দেব, তার পরেই বেরিয়ে আসবো।

খোজাটা এবার খেউড় করে, গুলাব তোর ইয়েয় ঢুকিয়ে দেব। যা ভাগ্, পালা। তা না হলে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় নামিয়ে দেব।

তুহ্ফা সাপিনীর মতো ফুঁসে ওঠে, কী, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

দাঁড়া তেরে দেমাক আমি দুমড়ে দিচ্ছি।

এই বলে দুমদাম পা ফেলে তুহ্ফা রাস্তায় নামে।

—আরে যা যা, তোর মতো কত ছেনাল দেখলাম আমি। তুই এসেছিস এখানে খাপ খুলতে।

ক্রুদ্ধ তুহ্ফা প্রাসাদে ফিরে আসে। মুখ ভার করে বসে থাকে জুবেদার সামনে। বেগম জুবেদা বুঝতে পারে আজ কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। তা না হলে সদা-চঞ্চল তুখোড় তুহ্ফা ঐভাবে মন-মরা হয়ে বসে থাকার পাত্রী নয়।

—হ্যাঁরে তুহ্ফা, অমন মুখ ভার করে বসে আসিছ কেন, কী হয়েছে? এ দিকে আয় তো শুনি।

তুহ্ফা কোনও কথা বলে না। ধীরে ধীরে জুবেদার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—কী হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলি এতক্ষণ?

—হামামে।

—তা সেখানে তোকে কেউ কিছু বলেছে?

—না।

—তবে?

—মালকিন, আজ হামামে গোসল করতে এসেছিল একটি মেয়ে। তেমন রূপবতী নারী আমি জীবনে দেখি নি। আমি কেন, আপনারা কেউই দেখেন নি। ধরার মানুষ এত সুন্দর হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই ডানাকাটা হুরী-পরি!

—বলিস কী?

জুবেদা জানে, তুহ্ফা নিজে দেখতে সুন্দরী বলে ও সহসা কোনও মেয়েকেই সুন্দরী বলে স্বীকার করতে চায় না। অথচ ওর মুখে অন্য মেয়ের রূপের প্রশংসা!

—মেয়েটার কী নাম?

—তাতো বলতে পারবো না, তবে শুনলাম বসরাহর এক সওদাগর হাসানের বিবি সে। ওদের বাড়িটা আমি দেখে এসেছি।

—কোথায়?

টাইগ্রিসের ধারে একটা বিরাট প্রাসাদ আছে। তার একটা ফটক এধারে আর একটা ফটক নদীর সামনে।

জুবেদা দেহরক্ষী মাসরুরকে ডেকে পাঠায়। সে এলে জুবেদা তাকে বলে, টাইগ্রিসের ধারে একটা প্রাসাদ আছে জানিস?

—জী হ্যাঁ।

সেই প্রাসাদের এধারে একটা ফটক আর নদীর দিকে আরেকটা। ওই প্রাসাদের মালিক বসরাহর এক সওদাগর হাসান। তার বিবিকে আমার কাছে নিয়ে এস একবার।

মাসরুর হাসানের প্রাসাদে যেতেই দ্বাররক্ষী খোজা সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়ায়,
—বান্দাকে হুকুম করুন মালিক।

মাসরুর বলে, হাসানের মা কোথায়?

খোজা ওকে ভেতরে নিয়ে যায়। হাসানের মা ভয়ে কেঁপে ওঠে। খলিফার দেহরক্ষী মাসরুরকে সে চেনে। মাসরুর বলে, আমি পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের ষষ্ঠ পুরুষ খলিফা হারুন অল রসিদের চাচা কাসিমের কন্যা এবং খলিফার খাস পেয়ারের বেগম জুবেদার আজ্ঞাবহ নফর মাসরুর। তিনি আপনার পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন। তাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এখুনি।

হাসানের মা এবার আর্তনাদ করে ওঠে, আমরা এখানে বিদেশী বণিক। আমার একমাত্র ছেলে, সে-ই বাড়ির কর্তা, এখন বাড়ি নাই। দূরদেশে বাণিজ্যে গেছে। বিদেশ যাওয়ার আগে সে আমাকে বার বার বারণ করে গেছে, ঘরের বিবিকে যেন বাইরে না বের করি। এমন কি আমিও যেন তাকে নিয়ে বাইরে না যাই। তা সে যে কারণেই হোক। আমার ডর লাগছে, সে যদি বাড়ির বাইরে যায় তাহলে তার ঐ রূপ-যৌবন অনর্থ ঘটাবে। আর কোনও কারণে যদি অঘটন কিছু ঘটে যায়, ছেলে আমার আত্মঘাতী হবে। এই কারণেই, আপনার কাছে আমার আর্জি মাসরুরজী, আমার এই অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে আপনি আমার ওপর একটু করুণা করুন। হাসান না আসা পর্যন্ত এই কটা দিন সবুর করে থাকুন। ও আসুক, তারপর যতবার খুশি নিয়ে যাবেন ওর বিবিকে। আমি একটুও আপত্তি করবো না।

মাসরুর বলে, আপনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না মালকিন, আপনার পুত্র-বধূর কোনও তখলিফ হবে না। আমাদের বেগমসাহেবা শুধুমাত্র একবার দেখতে চেয়েছেন তাকে। কারণ, তিনি শুনেছেন, তার মতো পরমাসুন্দরী কন্যা তামাম দুনিয়ায় আর দুটি নাই। সেইটাই পরখ করে দেখবেন তিনি নিজের চোখে। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। এমনও তো হয়, তাক লাগাবার জন্য অহেতুক বাড়িয়ে বলে অনেকে। বেগমসাহেবা এর আগেও আমাকে অনেক মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম করেছেন। এবং আমি তা তামিলও করেছি। তিনি কারো না কারো মুখ থেকে সেই সব মেয়েদের রূপগুণের অনেক অনেক রংদার বর্ণনা শুনেছিলেন এবং আমাকে হুকুম করেছিলেন তাদের হাজির করতে। আপনার পুত্র-বধূকেও তিনি ঐ সব মেয়েদের মতোই স্বচক্ষে যাচাই করে দেখে নিতে চান মাত্র। আপনি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন ওকে। আমি কথা দিচ্ছি, যথাসময়ে আবার আমিই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো তাকে। তার কোনও অনিষ্ট হবে না, হতে পারে না। আমি খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবো, দিয়ে যাবো।

হাসানের মা দেখলো মাসরুরকে আর বেশি কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। সে বাদশাহী হুকুমের তাঁবেদার। বেগম জুবেদা যখন নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে, কিছুতেই ছাড়বে না সে।

অন্দরে গিয়ে রোশনিকে বলে, মা, বেগম জুবেদা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। এখুনি যেতে হবে। ভাল করে সেজে-গুজে নাও। আমি নাসির ও মনসুরকে সাজিয়ে দিচ্ছি। ওদের দুটোকে নিয়ে মাসরুরের সঙ্গে তুমি প্রাসাদে চলে

যাও। আচ্ছা চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

আগে আগে পথচারীদের 'হট যাও হট যাও' করতে করতে মাসরুর চলে। দুই নাতিকে কোলে করে নিয়ে তার পিছনে পিছনে চলে হাসানের মা। এবং মোটা কাপড়ের বোরখায় আপাদ-মস্তক আবৃত করে রোশনি চলে সব পিছনে।

খলিফার প্রাসাদে পেঁছে মাসরুর ওদের নিয়ে আসে বেগম জুবেদার খাস-মহলে। বেগমসাহেবা তখন তার তখতে আরাম করছিল। রোশনির কোলে শিশু-সন্তান দুটিকে তুলে দিয়ে হাসানের মা আভূমি আনত হয়ে বেগম-সাহেবাকে কুর্নিশ জানায়। জুবেদা হাত বাড়িয়ে তাকে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে। রোশনিকে কাছে ডাকে, এদিকে কাছে এস বাছা। শরম করার কি আছে, এখানে তো কোনও পরপুরুষ নাই। বোরখা নাকাব খুলে ফেল।

তুহফাকে সে ইশারা করতে সে এসে রোশনির বোরখা খুলে সরিয়ে নেয়। রোশনির রূপের আলোয় জুবেদার মহল ঝলমল করে ওঠে। জুবেদা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রোশনির মুখের দিকে। তুহফা বাড়িয়ে বলেনি কিছু। সত্যি, এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সে আগে দেখেনি কখনও। বিধাতা পুরুষ কী ভাবে এমন নিখুঁত সুন্দর নারী সৃষ্টি করেছিলেন সেই কথাই ভাবতে থাকে জুবেদা।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

অনেকক্ষণ পরে জুবেদা নিজেকে ধাতস্থ করতে পারে। তখত ছেড়ে উঠে এসে সে রোশনির গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুমু খায়, সোহাগ জানায়। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তখতে নিজের পাশে বসায়। গলায় পরিয়ে দেয় নিজের গলার সাতনরী মুক্তোর মালাখানা। এই হারটা এক সময় অল রসিদ পরিয়ে দিয়েছিলেন জুবেদাকে।

—তুমি আমার সারা মুলুকের গৌরব। আমার ছোট্ট বাঁদীটা তোমার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে একটা জায়গায় মস্ত ভুল করেছে, রোশনি। তোমার এ রূপ তো কোনও ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বাছা। আচ্ছা এবার বল, নাচ গান কিছু জান তুমি? নিশ্চয়ই জান। তোমার মতো রূপবতী কন্যার সব গুণেই থাকা সম্ভব।

রোশনি বলে, বিশ্বাস করুন, বেগমসাহেবা, আমি ও-সব কিছুই জানি না। না গান, না নাচ। সাধারণতঃ মেয়েরা যে সবগুলোর অধিকারী হয় তার কিছুই আমার জানা নাই। শুধু একটা জিনিস খুব ভাল জানি, আসমানে পাখীর মতো উড়ে বেড়াতে পারি।

—বাঃ এ তো ভারি অদ্ভুত!

জুবেদা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকায় রোশনির দিকে। বলে, শুনেছি জিন-পরীরা ডানামেলে শূন্যে উড়ে বেড়ায়। তা তুমি ডানা ছাড়া উড়বে কী

করে? ডানা ছাড়া নয় বেগমসাহেবা, ডানা আমার আছে। কিন্তু এখন আমার কাছে নাই। আমার শাশুড়ির হেপাজতে আছে। আপনি যদি দেখতে ইচ্ছা করেন, তবে এঁকে বলুন, তিনি যদি আমার ডানার খোলসটা এনে দেন আমি আপনাকে আমার আকাশে ভেসে বেড়ানোর খেলা দেখাতে পারি।

জুবেদা বৃদ্ধার দিকে তাকায়, বুড়িমা, ঐ পালকের খোলসটা একবার এনে দাও তো ওকে। আমি ওর আকাশে ওড়া দেখবো।

বৃদ্ধা শিউরে ওঠে, এইবার সব গেল। মনে মনে ভাবে সে। একবার মুক্ত আকাশে উড়লে ও কী আর এই ইট-পাথরের শহরে ফিরে আসবে? ইয়া আল্লা, একি মুসকিলে ফেললে আমাকে? এখন আমি কী করি। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলে, বাছা আমার আপনাকে দেখে ঘাবড়ে গেছে। কী যে আবোল তাবোল সব বকতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি না। ভাবছি, ওর মাথাটাই বুঝি খারাপ হয়ে গেল। কোনও মানুষ কী কখনও ডানা পাখা পরে উড়তে পারে, না ডানা পাখা কারো থাকে?

কিন্তু রোশনি বাধা দিয়ে বলে, আমি আপনার নামে কসম খেয়ে বলছি বেগমসাহেবা, আমার পাখার খোলসটা আমাদের প্রাসাদেরই কোনও স্থানে লুকানো আছে।

জুবেদা এক জোড়া মণি-রত্ন খচিত মহামূল্যবান বালা তুলে দেয় হাসানের মার হাতে। প্রায় ঘুষ বলা যায়।

—আর দেরি করো না, বুড়ি মা, শিগ্গির যাও। খুঁজেপেতে নিয়ে এস ঐ খোলসটা। আমরা তোমার ছেলের বিবির মজার খেলা দেখবো। তারপর আবার তোমাকে ফেরত দিয়ে দেবো এখুনি। যাও, আর দেরি করো না।

কিন্তু হাসানের মা কিছুতেই কবুল করে না। বলে, আপনি বিশ্বাস করুন বেগমসাহেবা, সে জিনিস আদৌ আছে কিনা, বা থাকলে কোথায় আছে—আমার জানা নাই।

জুবেদা মাসরুরকে ডাকে।

— মাসরুর হাসানের বাড়ি চলে যাও। সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করে দেখ, একটা পাখীর ডানার খোলস কোথায়ও আছে কিনা। খুঁজে পেলে আমার কাছে নিয়ে এস।

মাসরুর ছুটলো হাসানের প্রাসাদে। অবশ্য যাবার আগে হাসানের মা-এর কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে যেতে ভুললো না সে।

সারা প্রাসাদ চুঁড়ে সে বের করলো সেই খোলসখানা। হাসানের মায়ের পালঙ্কের তলায় একটা বাক্সের মধ্যে লুকানো ছিল।

জুবেদা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে সেই শশাঙ্কশুভ্র পাখীর পালকের খোলস-খানা নেড়ে চেড়ে দেখলো। ভিতরে কোনও অলৌকিক যন্ত্রপাতি কিছু নাই। নেহাতই বাহারী একখানা মুখোশ জাতীয় খেলনা মাত্র।

দেখা শেষ হলে সে রোশনির হাতে দিয়ে বললো, নাও এবার দেখাও দেখি তোমার ভেল্কিবাজী। আমার তো বাপু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না—

রোশনি খোলসখানা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে। নাঃ, অবিকল সেই রকম আছে। যেমনটি সে খুলে রেখেছিল পুকুরপাড়ে, ঠিক সেই রকম।

চোখের পলকে পরে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পাখা দুখানা আলতোভাবে নাড়তে নাড়তে মেঝে থেকে অল্প উঁচুতে উঠে হাওয়ায় ভর করে চারপাশে ঘেরা হারেমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি কয়েকবার ঘুরে বেড়ায়। তারপর ছোঁ-মেরে ছেলে দুটিকে তুলে নেয় দুই হাতে। আবার সে ঘুরতে থাকে—এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি।

জুবেদা হতবাক হয়ে এই অভাবনীয় আশ্চর্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে থাকে। নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। ভাবে, স্বপ্ন দেখছে না তো। কিন্তু স্বপ্ন তো অনেকে মিলে দেখা যায় না।

রোশনি বলে, এই দেখুন বেগমসাহেবা, ছেলে কোলে নিয়ে কেমনভাবে আমি উড়ে বেড়াচ্ছি। উড়তে উড়তেই ওদের আদর সোহাগ করছি, মাই দিচ্ছি কেমন দেখুন।

একটুক্ষণ পরে আরও খানিকটা ওপরে ছাদ বরাবর উঠে যায় রোশনি। সবাই মাথার ওপরের দিক করে একভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে রোশনির খেলা। হঠাৎ সে অনেক ওপরের খোলা জানালা দিয়ে গলে প্রাসাদের বাইরে চলে যেতে যেতে বলে, বিদায় বেগমসাহেবা, আমি চললাম—চির বিদায়।

হাসানের মাকে বলে, মা আপনার ছেলেকে বলবেন যদি ইচ্ছা হয় ওয়াক ওয়াক দ্বীপে আমার সংগে সে দেখা করতে পারবে।

—রোশনি—রোশনি, শোন ফিরে এস!

একটানা চিৎকার করতে থাকে জুবেদা। একি হলো, মেয়েটা ধোঁকা দিয়ে কেটে পড়লো! তবে তো হাসানের মার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। হায় হায়, একি হলো—একি করলাম আমি? এখন এই বুড়ি আর ছেলের কী দশা হবে। না না, আর ভাবতে পারে না সে।

—হাসানের মা, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নাই আমার। আমি তোমার কাছে চির-কালের মতো অপরাধী হয়ে গেলাম। ছি ছি ছি, একী করলাম? আজ থেকে তোমার জীবনে যে নিদারুণ বিয়োগ ব্যথা নেমে এল, তা আর কী করে সারাবো আমি। আমার খেয়াল-খুশি মেটাতে গিয়ে তোমাদের সর্বনাশ করলাম। এ পাপ আমি রাখবো কোথায় বুড়ি মা?

হাসানের মার কানে এ সব কথা কিছুই ঢুকলো না। রোশনি জানলার মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই সে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছিল। অনেকক্ষণ পর যখন সে সম্বিত ফিরে পেল, দেখলো রোশনি নাই, তার দুই নাতিও নাই।

রোশনি যে সুযোগ পেলেই পালাবে তা সে কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিল। কিন্তু কোনও ভাবেই সে সুযোগ করতে পারছিল না। আজ জুবেদা বেগমের হঠকারিতায় সব পণ্ড হয়ে গেল। এমন বেইমান মেয়েটি, যাবার সময় দুধের বাছা—তার আদরের ধন নসিব আর মনসুরকেও তুলে নিয়ে চলে

গেল? হাসান—তার একমাত্র সন্তান, এই শোকতাপ কী করে সহ্য করবে সে। রোশনির শোকে তো সে সারা হয়ে যাবেই, সেই সঙ্গে পুত্রশোকও কী কম দহন করবে তাকে?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো আটানব্বইতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে:

জুবেদা বলে, হাসানের মা, তুমি আমাকে আগে বললে না কেন, তোমার ছেলে একটা জিন-পরীকে শাদী করে নিয়ে এসেছে? তাহলে আমি তাকে এভাবে পালাবার সুযোগ দিতাম না। আমি বুঝতে পারিনি আগে ওর এই মতলব ছিল, তাহলে এই ঘটনা কিছুতেই ঘটতো না।

হাসানের মা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, দোষ কারো নয় বেগমসাহেবা, দোষ আমার নসীবের। ভাগ্যে যা লেখা আছে তা এড়াবো কী করে? যাক, এখন আমি শুধু ভাবছি, হাসান ফিরে এলে এই দুঃসংবাদ তাকে জানাবো কী করে?

মনের দুঃখে ঘরে ফিরে যায় হাসানের মা। বাড়ির অঙ্গিনায় তিনটি তাজিয়া বানিয়ে তার সামনে বসে সারা দিনরাত চোখের জল ফেলতে থাকে।

হাসান সপ্তকন্যাদের সঙ্গে তিনটি সুখের মাস অতিবাহিত করে একদিন বাগদাদে ফিরে আসে। আসার সময় মেয়েরা দশটি উটের পিঠে সোনাদানা হীরে জহরত বোঝাই করে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়।

বাড়িতে এসেই সে প্রথমে রোশনি এবং পরে পুত্র দুটির সন্ধান করে। কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে রোরুদ্যমানা মাকে জিজ্ঞেস করে, মা, আমার রোশনি কোথায়?

মা এ কথার কী জাবাব দেবে। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে, বাবা আমাদের কপাল ভেঙেছে, রোশনি ছেলে দুটোকে নিয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে।

হাসান উন্মাদের মতো মায়ের ঘরে ছুটে যায়। খাটের তলায় বাক্সটা খোলা পড়ে আছে। খোলসটা নাই, এবার সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে। ঘরের এক কোণে একখানা তলোয়ার রাখা ছিল, সে-খানা তুলে নিয়ে ছুটে আসে আঙ্গিনায়।

—মা, এ জীবন আমি আর রাখবো না!

মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, অমন কাজটি করিসনে বাছা। তুই আমার বুকের কলিজা, একমাত্র দুলাল। এইভাবে আত্মঘাতী হলে আমি তো আর একদণ্ড বাঁচবো না। বাবা, সোনা আমার, মাথাটা ঠাণ্ডা কর। চল, ঘরে চল। সব আশাই গেছে, তবু তার মধ্যে একটুখানি ভরসা সে দিয়ে গেছে, বাবা! উড়ে চলে যাবার সময় সে একটি মাত্র কথা বলে গেছে, হাসান যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে দেখা হবে।

রজনী প্রভাত হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো নিরানব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

এই নিদারুণ দুঃখের মুহূর্তে হাসান যেন একটু আশার আলো দেখতে পায়।

—মা, আমি যাবো সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে। কোথায় সে দ্বীপ আমি জানি না, তবু আমি যাবো। নাম শুনে মনে হচ্ছে, দ্বীপ-এ শুধু পাখীরাই থাকে। হয়তো বহু দূরদেশে সিন্ধু কিংবা চীন, পারস্য বা ভারতের কোনও দুরধিগম্য সমুদ্রের ওপারে। তা হোক, যেখানেই হোক, যত দূরেই হোক, আমি যাবো। পথের নিশানা আমি জানি না। কিন্তু নিশানা আমি পাবো। আমার সাতবোনরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে এই দ্বীপের ঠিকানা। আমি আর দেরি করবো না, মা। এখনি মেঘমালা পাহাড়ে আবার চলে যাবো। মেয়েদের কাছ থেকে ওয়াক ওয়াক দ্বীপের ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে যেতে হবে রোশনির সন্ধানে। রোশনি ছাড়া আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। রোশনি বিহীন এ জীবন আমার কাছে একেবারে অর্থহীন।

হাসান সেইদিনই মেঘমালা পাহাড়ে আবার ফিরে আসে। মেয়েরা তো হাসানকে দেখে অবাক। আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে সকলে। কিন্তু হাসানের মুখে সেই দুঃসংবাদ শুনে সবাই চুপসে যায়। সবারই মুখ কালো হয়ে ওঠে। চোখে জল আসে। গুলাবী এগিয়ে এসে হাসানের কাঁধে হাত রাখে, নিজেকে শক্ত কর, ভাইজান। জীবনে সুখ যেমন আছে দুঃখেরও সীমা নাই। সবই সইবার শক্তিও তিনি দিয়েছেন। নিজেকে হারিয়ে দিও না। সময়ে সবই সয়ে যায়, ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় একটা মারাত্মক ভুল করে বসলে, তা আর শুধরানো যায় না। সে ক্ষতি অপূরণীয়ই থেকে যায়।

হাসান অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বলে, কিন্তু বোন, এ ব্যথা আমি সইবো কী করে? না না, সে আমি পারবো না। হয় রোশনিকে তোমরা ফিরিয়ে পাওয়ার উপায় বলে দাও, নয়তো এ জীবন আমি রাখবো না। রোশনি যাওয়ার সময় বলে গেছে, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে। আমি জানি না, সে দ্বীপ কোথায়? কোন্ পথে যেতে হয়? কতই বা দূর। যাই হোক পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক, আমি সেখানে যেতে চাই। তোমরা কী জান বোন, সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপের ঠিকানা?

গুলাবী বলে, জানবো না কেন? সবই জানি। কিন্তু ঐ দ্বীপে তুমি যাবে কী করে, ভাইজান? ওর চেয়ে তুমি যদি বল, বেহেস্তে যাবে, আমরা তোমাকে এক্ষুনি যেতে বলবো। কিন্তু ওয়াক ওয়াক দ্বীপ—সে তো মানুষের অসাধ্য।

গুলাবীর কথা শুনে হাসানের মনে যে ক্ষীণ আলোটুকু টিমটিম করে জ্বলছিল, তাও মিলিয়ে যায়।

গুলাবী হাসানকে আদর সোহাগ করে ভোলাবার চেষ্টা করে। মন খারাপ

করো না, ভাইজান। তুমি না পুরুষমানুষ, একটু শক্ত হও। ধৈর্য ধর। প্রবাদ আছে জান তো—'ধৈর্যই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা—ধৈর্য ধরে শান্ত ধীর ভাবে এগোতে পারলে একদিন লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব।' সুতরাং এই দারুণ দুঃখের দিনে ধৈর্য ধরে মাথা ঠিক রাখ। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার বিবি বাচ্চাদের ফেরত পাওয়ার জন্য আমি আমার প্রাণ পণ করবো। এবং আশা করি, তোমার মুখে আবার হাসি ফোটাতে পারবো। কী দুর্ভাগ্য! তোমাকে আমি বার বার বলেছিলাম, অশুভের শেষ রাখতে নাই। তখনই যদি আমার কথামতো ঐ খোলসটাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারতে তাহলে আজ এত দুঃখ পেতে হত না। যাক, নসীবে যা আছে, কে আর এড়াবে বল। এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে এই দুঃখ বেদনার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

এই কথা বলার পর গুলাবী তার দিদিদের মিনতি করে, তোমরা সকলে মিলে যদি হাসানকে না বাঁচাও, সেই দুর্গম ওয়াক ওয়াক দ্বীপে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না কর তবে ভাইজান আমার প্রাণে বাঁচবে না, দিদি।

মেয়েরা ভরসা দেয়, ঠিক আছে বোন, আমরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করবো, কথা দিচ্ছি।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শোতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয়ঃ

মেয়েদের এক চাচা আছে, তিনি প্রতি বছর একবার করে এই মেঘমালা প্রাসাদে এসে ভাইঝিদের দেখে যান। সবাইকেই খুব পেয়ার করেন। কিন্তু তার মধ্যে বড় বোনকে একটু বিশেষ নেক-নজরে দেখেন তিনি।

এই চাচার নাম আবদ্ অল কাদ্দুস। গতবারে তিনি যখন এসেছিলেন তখন বড় ভাইঝিকে একটি আতরের বাক্স উপহার দিয়ে যান তিনি। বলেছিলেন, এই আতর-এর অল্প একটুখানি তুলোয় মাখিয়ে যদি আগুন ধরিয়ে দাও তবে তোমার ঈপ্সিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারবে।

গুলাবী বললো, বড়দি তোমার সেই আতর একটুখানি দেবে?

বড়বোন বলে, ওমা সে কি কথা, দেব না কেন? যা, আমার ঘরে আছে, নিয়ে আয়।

গুলাবী আতরের বাক্সটা নিয়ে এসে একটুকরো তুলোয় কয়েক ফোঁটা মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক সুগন্ধে ভরে ওঠে। এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই একটা তুষার-শুভ্র হাতীর পিঠে চেপে আকাশ পথ থেকে নেমে আসেন চাচা আবদ্ অল কাদ্দুস।

—এই যে মা সকল, আমি হাজির, বল কী চাই?

বড়বোন চাচার পায়ে হাত রেখে বলে, কেন, শুধু দেখার জন্য আমরা স্মরণ করতে পারি না আপনাকে? সেই এক সাল আগে এসেছিলেন আপনি। এতকাল দেখিনি, মন খারাপ করছিল, তাই আতরে আগুন দিয়েছি, চাচা।

চাচা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। মৃদু হাসলেন।

—সে কথা ঠিক, বেটা। বছর ঘুরে এল, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। আমিও ভাবছিলাম, দু একদিনেই আসবো। তা সে যাই হোক, 'এখন আসল ব্যাপারটা কী বল তো, মা জননী? কেন ডেকে পাঠিয়েছ, এই বুড়ো ছেলেকে?

বড়বোন বলে, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন চাচা, আপনি যখন জানতে চাইছেন, বলছি।

এরপর হাসানের সংগে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতা, রোশনির সংগে তার শাদী এবং সন্তান দুটি সহ রোশনির পলায়নের বিস্তারিত কাহিনী চাচাকে সে খুলে বলে।

—এখন চাচাজী, আমাদের এই ভাইটি রোশনির তালাশে ওয়াক ওয়াক দ্বীপে যেতে চায়। আমরা জানি, আপনি বলে দিতে পারেন তার নিশানা।

শেখ আবদ্ অল কাদ্দুস গম্ভীর হয়ে মাথা নিচু করে মুখে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে কী সব আঁকিবুকি কাটলেন। এবং বার বার ঘাড় আন্দোলিত করে অস্ফুট স্বরে স্বাগত ভাবে 'না না' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন।

—না, বেটা কোনও উপায় নাই। ওয়াক ওয়াক দ্বীপে পাঁচ হাজার কুমারী জিন-কন্যাদের বাস। এবং তারা সকলে সম্রাট জিনিস্থানের নারী-সেনা। তোমাদের ভাইটিকে বল, বৃথা শোক করে নিজেকে ধ্বংস না করে সে যেন এই দুরাশা মন থেকে মুছে ফেলে! কোনও জনপ্রাণী এই দুর্গম দ্বীপে কখনও পৌঁছতে পারবে না। এই অবাস্তব অসম্ভব চেষ্টা করে কোন ফয়দা নাই।

গুলাবী অসহায় ভাবে শেষ চেষ্টা করে, কিন্তু চাচাজী, আমাদের ভাইটিকে একথা বলে শান্ত করা যাবে না। আপনি ওকে আরও বিশদভাবে একটু বুঝিয়ে বলুন।

চাচা এবার হাসানের দিকে তাকায়। হাসান ও'র পায়ে হাত রাখে। হাসানকে আদর জানিয়ে চাচা বলেন, বেটা, বৃথা শোক করে নিজেকে শেষ করো না। শান্ত মাথায় ভাবো। শোক নিয়ে চিরকাল কেউ বসে থাকে না। সময়ে একদিন সে সয়ে যায়ই। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত অনেকে টিকে থাকতে পারে না। আমি বয়সে প্রবীণ, অনেক দুঃখ তাপ সকলের জীবনে যেমন আসে আমার জীবনেও এসেছিল। কিন্তু তাদের জন্য দগ্ধ হয়ে যদি নিজেকে নষ্ট করে ফেলতাম তবে আর আজ তোমার সামনে বসে এই উপদেশ দিতে পারতাম না। শুধু একটা কথা মনে রেখ বাবা, নিজের ব্যথাটাই সবচেয়ে বড় করে দেখ না। তোমার চেয়ে আরও বেশি ব্যথিত মানুষ এই দুনিয়ায় আছে। তাদের কথা ভেবে নিজের দুঃখটা ঈষৎ হাল্কা করার চেষ্টা কর।

চাচা বলতে থাকেন, যত চেষ্টা কর কোনও ভাবেই তুমি সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে পৌঁছতে পারবে না। এবং সে চেষ্টাও করো না। তার ফল শুভ হবে না। এমন কি যদি ডানাওলা জিন আফ্রিদিদের এক বিশাল বাহিনীরও সাহায্য পাও; তবুও আমি বলছি, ওখানে যেতে পারবে না তুমি। এই ওয়াক ওয়াক দ্বীপ তোমার শ্বশুর জিনিস্থান-সম্রাটের অত্যন্ত সুরক্ষিত অঞ্চল। এখান থেকে

ওয়াক ওয়াকের দূরত্বটা একবার শোন : সাতটা দুস্তর সমুদ্র পার হতে হবে। তারপর সাতটা মহাদেশ, এবং সাতটা অত্যুচ্চ গিরি পর্বতমালা অতিক্রম করে যেতে হবে সেই দ্বীপে। পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে—তার ওপারে মহাশূন্য ছাড়া আর কিছু নাই। আমি মনে করি না, তুমি এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র প্রান্তর গিরি পর্বত পার হয়ে সেখানে পৌঁছতে পারবে কখনও। যদি পারও, তবু ওয়াক ওয়াক দ্বীপের সুরক্ষা ভেদ করতে পারবে না কিছুতেই। তাই বলছি, বাবা, ঐ দুরাশা ত্যাগ করে তোমার বোনদের সঙ্গে হেসে খেলে এখানেই দিন কাটাও।

হাসানের মুখ ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়ে যায়। এবং মুহূর্তে মধ্যেই এক বিকট আর্তনাদ তুলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। মেয়েরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সাজপোশাক ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।

হাসানের যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন দেখে, গুলাবীর কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে। আর অন্য মেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে কেউ হাওয়া করছে, কেউ বা চোখে মুখে গোলাপ জলের ঝাপটা দিচ্ছে।

চাচা আবদ্ অল কাদ্দুসের করুণা হয়। মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা শান্ত হও মা, এই সময়ে শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যদি নিজেরাই ভেঙ্গে পড় তা হলে ওর কী দশা হবে?

এই বলে তিনি হাসানের কাছে এগিয়ে আসেন। মাথায় হাত রেখে বলেন, চুপ কর বেটা, চুপ কর। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার চোখে পানি শোভা পায় না। ওঠ, আমার সঙ্গে এস। দেখি কী করা যায়।

প্রায় জোর করেই তিনি হাসানকে উঠিয়ে নিয়ে হাতীর পিঠে চেপে বসেন।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

মেয়েরা হাসিমুখে বিদায় জানালো। ওদের মনে আশা জেগেছে, চাচা যখন একবার ভরসা দিয়েছেন নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা তিনি করবেন।

হাতীটার কানে কী যেন ফিসফিস করে বললেন চাচা। আর সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ করে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যেতে লাগলো সে। তারপর মহাশূন্যে উঠে গিয়ে এক পলকের জন্য নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে এবং পর মুহূর্তেই উল্কার গতিতে ছুটে চলতে থাকলো।

একটানা তিন দিন তিন রাত্রি চলার পর অনেক সমুদ্র গিরি নদী প্রান্তর পার হয়ে চলে এল তারা পৃথিবীর অপর প্রান্তে অদ্ভুত অজানা এক বিচিত্র দেশে। চাচা বললেন, এই তিন দিনে আমরা যে পথ পার হয়ে এলাম তা সাধারণ মানুষের কত দিনের পথ, জান?

হাসান বলে, অনুমান করতে পারবো না, চাচা।

সাত বছর ধরে যদি চলতে থাকো, তবেই এখানে এসে পৌঁছতে পারো।

সেই পথ আমরা এলাম মাত্র তিন দিনে।

একটা গাঢ় নীলবর্ণের পাহাড়ের চূড়ায় এসে থামলো হাতীটা। এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি বিশাল গুহা দেখতে পেল হাসান। গুঁহার মুখে একখানা লোহার দরজা। দরজার রঙও গাঢ় নীল। ভেতর থেকে বন্ধ। বৃদ্ধ গিয়ে টোকা দিতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা নিগ্রো। তার হাতে ধরা ছিল একখানা নীলবর্ণের ঢাল এবং তলোয়ার। কোনও কিছু ভাববার বা বলার সুযোগ না দিয়ে দারুণ ক্ষিপ্রহাতে নিগ্রোটার হাত থেকে তিনি ছিনিয়ে নিলেন তলোয়ারখানা। নিগ্রোটা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। হাসানকে নিয়ে চাচা ভিতরে ঢুকে গেলেন। নিগ্রোটা দরজা বন্ধ করে দিল।

ওরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতে থাকে। আশে পাশে স্বচ্ছ নীল পাহাড়ের দেওয়াল। তার ভিতর দিয়ে নীল আলো এসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সিঁড়ির পথ।

এইভাবে নিচে নামতে নামতে এক সময়ে ওরা দুটি বিরাট ফটকের সামনে এসে হাজির হয়। ফটকের দরজা ভারি সোনার পাতে গড়া। এর একখানা দরজা খুলে ফেললেন আবদ্ অল কাদ্দুস। এবং ভিতরে ঢুকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যেতে যেতে হাসানকে উদ্দেশ করে বলে গেলেন, যেমন দাঁড়িয়ে আছ, তেমনি দাঁড়িয়ে থাক, একদম নড়াচড়া করবে না। আমি ফিরে আসছি।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটি নীল রঙের ঘোড়ায় লাগাম ধরে ফিরে এলেন তিনি। বললেন, উঠে বসো।

এরপর অন্য ফটকের দরজা খুলে ফেললেন। হাসান তাকিয়ে দেখে, দূর নীল দিগন্ত বিস্তৃত এক শস্য শ্যামল প্রান্তর। কোথায় যে তার শেষ, কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, বেটা, প্রস্তুত থেকো, যেকোনও মুহূর্তে প্রাণ সংশয় বিপদ ঘটে যেতে পারে। আর যদি মনে কর, এখনও সময় আছে, তোমার সাত বোনের কাছে ফিরে যেতে পারো।

হাসান বলে, যাই ঘটুক, মৌৎ যদি আসে আসুক—আমি ফিরবো না, চাচা।

বৃদ্ধ বললেম, বাবা বাড়িতে তোমার বুড়ো মা আছেন, এই বয়সে পুত্রশোকে কেঁদে ভাসাবেন তিনি—সেটা কী সন্তান হয়ে তোমার ভাবা উচিত নয়? আমি বলি কি, এই মৃত্যুর গুহায় না ঢুকে তার চেয়ে মা-এর ছেলে মা-এর কোলে ফিরে যাও। তোমাকে পেয়ে আবার তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠবে। কী বল?

হাসানের সেই এক কথা, আমার বিবি বাচ্চাদের না নিয়ে আর তার কাছে ফিরে যাবো না, চাচা।

আবদ্ অল কাদ্দুস আর বেশি বোঝাবার চেষ্টা করলেন না। একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই খৎখানা সঙ্গে রাখ।

ঘন নীল কালীতে চিঠিখানার ওপরে নাম লেখা ছিলঃ 'সেখ-এর গুরু সেখ আলী আমাদের পরম শিক্ষাগুরু সদাশয় মহামতি পালক-পিতা'—

চাচা বললেন, তা হলে ঠিক আছে, হাসান, এবার আমার ফেরার পালা।

তোমাকে একাই যেতে হবে। আল্লাহর নাম করতে করতে এগিয়ে যাও। তারপর নসীবে যা আছে, হবে। তোমাকে কিছু নিশানা বাতলাতে হবে না, এই ঘোড়া যেদিকে যেখানে নিয়ে যায় সেইদিকেই যাবে তুমি। চলতে চলতে এক সময় এক কালো পাহাড়ের সামনে গিয়ে হাজির হবে। সেই পাহাড়ের চূড়াটাও দেখতে ভীষণ কালো। পাদদেশে দেখবে একটা গুহা। ঘোড়া থেকে নেমে পড়বে। এবং জিন লাগামশুদ্ধ একে ঢুকিয়ে দেবে ঐ গুহার অভ্যন্তরে। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে বাইরে—গুহার মুখে। একটুক্ষণ পরে একজন মিশমিশে কালো মানুষ এসে দাঁড়াবেন তোমার সামনে। তিনি দেখতে যেমন আবলুস-কালো; তাঁর সাজপোশাকও তেমনি কাঠ কয়লার মতো ম্যাটমেটে কালো। অঙ্গের অন্যান্য আবরণ-আভরণ সবই কালো। শুধু তাঁর আজানুলম্বিত দাড়িগুলো দেখবে শাঁখের মতো সাদা। তাঁর হাতে চুম্বন করবে তুমি। এবং ওর পোশাকের একপ্রান্তে মাথা ঠেকাবে একবার। এরপর এই চিঠিখানা তুলে দেবে তাঁর হাতে। তোমার সম্বন্ধে এতে সুপারিশ করা আছে। এই কৃষ্ণকায় বৃদ্ধই সেই সদাশয় মহামতি পালকপিতা। আমার ওস্তাদ—শিরোমণি। মনে রেখ, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তোমার সকল ইচ্ছা পূরণ করে দিতে পারেন। সেই কারণে তাঁকে খুশি করে তাঁর প্রিয়ভাজন হাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। তিনি যা যা বলেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে এবং সেইভাবে চলবে। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন।

আবদ্ অল কাদ্দুস বিদায় নিয়ে চলে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসান বুঝতে পারলো, ঘোড়াটা একবার গা-ঝাড়া দিয়ে শোঁ-শোঁ করে ওপরে উঠে তারপর তীরগতিতে ছুটে চলতে থাকলো।

দশদিন ধরে ঘোড়ার লাগাম ধরে রইলো হাসান। উল্কার মতো একটানা ছুটে চলেছে সে। কোথায় কতদূরে এবং কোন্ পথে সে চলেছে, জানে না, জানতে চায়ও না। কারণ, চাচা বলে গেছেন, ঘোড়াকে চালাতে হবে না। শুধু লাগাম ধরে বসে থাকবে। যেখানে যাবার সেখানেই ও যাবে।

অবশেষে সেই কৃষ্ণ পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামে ঘোড়াটা। হাসান দেখলো পাহাড়ের শিখরে ঘোরতর কৃষ্ণকালো অন্ধকার। একদিকে একটা গুহা। তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। জিন লাগামসহ ঘোড়াটকে গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলো। চাচার বর্ণিত সেই কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। তাঁর তুলোর মতো সাদা দাড়িগুলো জানু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো দুইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই বৃদ্ধই সদাশয় মহামতি পালক-পিতা শেখ আলী—পয়গম্বর সুলেমানের বিবি বিলকিসের পুত্র। হাসান নতজানু হয়ে বৃদ্ধের পায়ে চুম্বন করে। তারপর

ও'র পোশাকের এক প্রান্ত মাথায় ঠেকায়, এবং চিঠিখানা হাতে তুলে দেয়। বৃদ্ধ নীরবে চিঠিখানা গ্রহণ করে গুহার অভ্যন্তরে চলে যান।

হাসান আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। শেষে প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ আর ফেরেন না। আরও অনেক সময় কেটে যায়। আবার তিনি ফিরে এলেন। এবার তাঁর সারা অঙ্গের আবরণ আভরণ সব সাদা।

তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরে আসতে ইশারা করলেন হাসানকে।

গুহার অভ্যন্তরে চার দেওয়ালে ঘেরা বিরাট একখানা কামরায় এসে দাঁড়ালো হাসান। সেই ঘরের চার কোণে বসেছিল চারজন বৃদ্ধ। ওদের সকলেই একই রকম কালো পোশাক পরিহিত। প্রত্যেকের সামনেই স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপি এবং একটি করে ধূমায়িত সুবর্ণ ধূপদানী। ধূপের সুগন্ধে সারা ঘর ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ওদের সামনে আরও সাতজন শিষ্য বসে বসে তুলট কাগজে কী যেন লিখে চলেছিল এক মনে।

পালক-পিতা যখন ঘরে ঢুকলেন, ওরা সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানালো তাঁকে। চার কোণের সেই চার বৃদ্ধ ব্যক্তিও উঠে এসে ঘরের মাঝখানে রক্ষিত আসনে পালক-পিতার পাশে বসলো। সকলে যে যার আসন গ্রহণ করার পর শেখ আলী, হাসানকে বললো, এবার তোমার যা বলার, বল।

হাসান কী বলবে, যতবারই শুরু করতে যায়, চোখে জল ভরে আসে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একটুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিতে পারে সে। জীবনের আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই সবিস্তারে মেলে ধরে ও'দের সামনে। কী ভাবে পারসী জালিয়াতটা তাকে বিভ্রান্ত এবং মেঘমালা পর্বত শিখরে নিয়ে যায়, কী ভাবে তার ওপর সে পাশবিক অত্যাচার করে বিকৃত কামনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়, আত্মরক্ষার জন্য কী ভাবে তাকে পাহাড় চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে হাসান হত্যা করে, তারপর সপ্তকন্যাদের সঙ্গে পরিচয়, রোশনির সঙ্গে তার শাদী, সন্তান লাভ এবং তার পলায়ন, পরিশেষে তাকে উদ্ধারের নিমিত্ত শেখ আবদ্ অল কাদ্দুসের সঙ্গে এই অভিযানে আসা—সব আগাগোড়া খুলে বলে সে।

সকলে অবাক হয়ে শুনলো। এবং হাসান থামতে ওরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, বেগম বিলকিসের যোগ্য সন্তান, আমাদের বিচারে এই যুবক দয়ার যোগ্য। কারণ, সে একদিকে স্বামী, এবং অপর দিকে পিতা হিসাবে নিদারুণ দুঃখ শোক ভোগ করছে। আমাদের উচিত ওর বিবি এবং বাচ্চাদের সন্ধান করে ওর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া।

প্রাজ্ঞ শেখ আলী বললেন, তোমরা বিশেষ বিজ্ঞ, কিন্তু একটা কথা কি জান, এই কাজটা যত সহজে বললে তত সহজে সমাধা করা কিন্তু সম্ভব হবে না। দুস্তর বাধা, বিস্তর বিপদ কাটাতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, ওই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে যাওয়া এবং সেখান থেকে কার্য সমাধা করে ফিরে আসা কত কঠিন কাজ। সবচেয়ে শক্ত সম্রাটের ঐ দুর্ধর্ষ পাঁচ হাজারী উড়ন্ত সৈন্য-বাহিনী। ওরা দিনরাত অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছে সম্রাট এবং তাঁর কন্যাদের। এ হেন অবস্থায়

তোমরা কী করে আশা করতে পার, রোশনির সংগে হাসানের দেখা হওয়া সম্ভব হতে পারে!

শিষ্যরা বললো, আপনি যথার্থই বলেছেন, পিতা। কিন্তু আপনি তো জানেন, এই যুবককে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমাদেরই এক ধর্মভাই—আবদ্ অল কাদ্দুস। শুধু এই কারণেই আমরা এই দায়িত্ব এড়াতে পারি না কোনও মতে।

হাসান পালক-পিতার পা জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

—আপনিই একমাত্র পারেন, আমার বিবি বাচ্চাদের ফিরিয়ে দিতে।

পালক-পিতা বিচলিত হয়ে ওঠেন। হাসানকে দুহাতে তুলে ধরে বললেন, জীবনে আমি অনেক দেখেছি জেনেছি। কিন্তু এর মতো একজনকেও দেখিনি। বিবি বাচ্চাদের জন্য এই মহব্বত, তাদের উদ্ধারের জন্য মরণাপন্ন বিপদ নিশ্চিত জেনেও এইভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করতে পারে, এ আমি ভাবতে পারি না। যাই হোক, পথ অতি বন্ধুর, তবু আমি কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

এর পর শেখ আলী প্রায় এক ঘণ্টা মৌন হয়ে রইলো। শিষ্যরাও তাঁর অনুগামী হলো। সারা ঘরময় বিরাজ করতে থাকলো এক নিঃসীম নীরবতা।

এক সময় মৌন ভংগ করে পালক-পিতা বললেন, প্রথমে আমি সম্ভাব্য বিপদ কাটাবার জন্য একটা জিনিস দিচ্ছি। তাঁর দীর্ঘ দাড়ির গোছা থেকে সবচেয়ে লম্বা একগাছি চুল ছিঁড়ে হাসানের হাতে দিয়ে বললেন, যখন বুঝবে মরণাপন্ন বিপদ, বাঁচার আর কোনও আশাই নাই, তখন এই চুল থেকে একটুখানি বের করে আগুন ধরিয়ে দেবে। তাহলেই তৎক্ষণাৎ আমি তোমার সামনে উপস্থিত হবো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

ছয়শো তিনতম রজনীতে

আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

বৃদ্ধ ওপরের গম্বুজ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। হাতে তুড়ি বাজিয়ে কাকে যেন এত্তেলা দিলেন। এক আফ্রিদি এসে হাজির হলো সংগে সংগে। শেখ আলী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী আফ্রিদি?

—আমি দানাস ইবন ফাকতাস—আপনার দাসানুদাস, পরম-পিতা।

দানবের কানে কানে ফিস ফিস করে কী যেন বললেন তিনি। তারপর হাসানের দিকে মুখ ফিরিয়ে সকলকে শোনাবার মতো স্বরে বললেন, এই আফ্রিদির পিঠে চেপে বসো বেটা। এ তোমাকে আসমানের অনেক ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। খুব শক্ত করে ধরে থাকবে এর গলা। এ তোমাকে নামিয়ে দেবে শ্বেত কর্পূর দ্বীপে। সেখানে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে এ আবার ফিরে আসবে। কারণ তার ওপরে আর যাওয়ার এক্তিয়ার নাই এর। এরপর তোমাকে একা একা পার হতে হবে সেই কর্পূর দ্বীপের প্রান্তরভূমি। ওই

দ্বীপ অতিক্রম করে সামনে আর একটা দ্বীপ দেখতে পাবে। তারই নাম ওয়াক ওয়াক দ্বীপ। তারপর আল্লাহ তোমাকে দেখবেন।

হাসান বৃদ্ধ শেখ আলী এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়ে আফ্রিদি দানাস-এর কাঁধে চেপে বসলো।

মুহূর্ত মধ্যে মহাশূন্যে উঠে গেল আফ্রিদি। তারপর বায়ুবেগে ধাবিত হতে থাকলো সেই শ্বেত কর্পূর দ্বীপের দিকে।

যথাসময়ে দানাস নামিয়ে দিল হাসানকে। তারপর বললো, এই সেই কর্পূর দ্বীপ, এর ওধারে আমার যাওয়ার উপায় নাই। আপনি একাই যান। আমি চললাম।

সামনে চকচকে রূপোলী প্রান্তর। হাসান এগিয়ে চলে। চলতে চলতে এক সময় অনেক দূরে একটা তাঁবু দেখতে পায়। হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে চলে আসে। না তাঁবু নয়, ঘাসের শয্যায় শুয়ে পড়ে আছে এক বিশাল বিকট দৈত্য। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে হাসান। দৈত্যটার নিদ্রাভঙ্গ হয়। ক্রোধে আরক্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়! তারপর মেঘ-নিনাদের মতো গর্জন করে ওঠে। সেই ভয়ংকর আওয়াজে হাসান চৈতন্য-লুপ্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায়। দৈত্যটা আলতোভাবে এক হাত দিয়ে ওর দেহটাকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নেয়, আবার সে ছুঁড়ে দেয়, আবার লুফে নেয়। এইভাবে বার কয়েক লোফালুফির পর সে দু আঙুলে ওর ঘাড়টা চেপে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে।

হাসানের পায়ের তলায় মাটি নাই। শূন্যে ঝুলেই হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে থাকে, ওরে বাবা রে, গেলাম রে, ওগো কে আছ, বাঁচাও। ও বাবা, দৈত্য মহারাজ দোহাই তোমার—তোমাকে গড় করি বাবা, আমাকে মেহেরবানী করে ছেড়ে দাও।

হাসানের এই কাকুতি মিনতি শুনে দৈত্যটার মুখে হাসি ফোটে, আরে, এ তো বহুৎ আচ্ছা গানেবালা চিড়িয়া। ভারি সুন্দর মিঠে তো এর বোল। সম্রাটের কাছে নিয়ে গেলে অনেক ইনাম মিলবে। ঠিক আছে তাই নিয়ে যাবো!

হাসানকে আলগোছে হাতের তালুর ওপর বসিয়ে দৈত্যটা আধ ক্রোশ লম্বা লম্বা পা ফেলে বন-বাদাড় ভেঙে এগিয়ে চলে। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় চলে আসে। এই ওর সম্রাটের ডেরা-দরবার। এক শিলাখণ্ডকে মসনদ বানিয়ে তার উপর বসেছিল দৈত্য-সম্রাট। চারপাশে ঘিরে বসেছিল ওর সাঙ্গ-পাঙ্গরা। প্রায় পঞ্চাশজন হবে। প্রত্যেকেই এক একজন ভয়ংকর-দর্শন দানব। দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা সবদিকেই সমান—প্রায় পঞ্চাশ হাত হবে।

এই দেখুন মহারাজ, আমি আপনার জন্য এক আজব চিড়িয়া ধরে এনেছি। ভারি সুন্দর গান গাইতে পারে। গলার আওয়াজ বড় মিঠে।

দৈত্যটা হাসানের নাকে টোকা দিতে দিতে বলে, গাও মেরে বুলবুল। গাও।

দৈত্যের ভাষা হাসান কী করে বুঝবে। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। ভাবে এবার তার ইন্তেকাল এসে গেছে। ওরা ওকে মেরে

খেয়ে ফেলবে। আকুল হয়ে সে কেঁদে ওঠে, কে আছ গো, রক্ষা কর, রক্ষা কর। ও বাবা গো ম'লাম গো—বাঁচাও গো—

ইনিয়ে বিনিয়ে সে কাঁদতে থাকে। এবং তাতেই কাজ হয়। সম্রাট হাসানের করুণ কান্নার অর্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু ওর কণ্ঠের আওয়াজ বড় মধুর মনে হয় তার।

খোদা হাফেজ, খুব মজাদার—চমৎকার চিড়িয়া তো! কোথায় পেলে? যাও এক্ষুণি আমার মেয়েকে দিয়ে এস। মেয়ের খুব ভাল লাগবে। একটা খাঁচায় ভরে ওর ঘরের সামনে ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে এস। এর গান আর গলার কিচির-মিচির আওয়াজ শুনে মেয়েটা ভারি আনন্দ পাবে।

এই সময় ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো চারতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

দৈত্যটা একটা খাঁচায় পুরলো হাসানকে। খাঁচার মধ্যে বসিয়ে দিল দুটো চাড়ি। একটায় জল, অন্যটায় দানা! আর দুখানা দোলনা। ভাবলো, চিড়িয়াটা নেচে নেচে গাইবে আর এ দোলনা থেকে লাফিয়ে ও দোলনায় গিয়ে বসবে। তারপর খাঁচাটাকে রাজকুমারীর পালঙ্কের শীর্ষে একটা আংটায় ঝুলিয়ে রেখে চলে গেল।

হাসানকে দেখে রাজকুমারীর আর আনন্দ ধরে না। নানাভাবে ওর সঙ্গে সে নিজের ভাষায় কথা বলে মনের অভিব্যক্তি বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসান তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না। তবে এটা বুঝতে অসুবিধা হলো না, মেয়েটা তাকে কোন কষ্ট দিতে চায় না। বরং হাবভাবে মনে হয়, আদর সোহাগই করতে চায় সে।

হাসান হাত পা নেড়ে মুখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে মনের ভাব বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাজকুমারী ভাবলো সে গান গাইছে। ওর গলার মিষ্টি স্বরে মুগ্ধ হয় সে।

হাসানকে তার এতই ভাল লাগে যে, কোনও সময়ই তার কাছ ছাড়া হতে চায় না। সারাদিন সারারাত ধরে ওর সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় বক বক করে চলে, আদর সোহাগ ও তর্জন করে। হাসানেরও মন্দ লাগে না। সে-ও চোখের ভাষায় হাতের ঈশারায় তাকে মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। বিচিত্র সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক আবোল তাবোল বকে। রাজকুমারীর কানে সে-সব আওয়াজ গান হয়ে বাজে।

হাসান কখনও কখনও উত্তেজিত বোধ করে। আকারে ইঙ্গিতে তার সঙ্গম সহবাস অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এসব কথা বোঝার জন্য কোনও ভাষার প্রয়োজন হয় না। রাজকুমারীও সঙ্গসুখ পেতে উন্মুখ। কিন্তু বুঝতে পারে না, ঐ চড়ুই-এর মতো ছোট্ট একটা চিড়িয়াকে দিয়ে কী ভাবে রতিসুখ পাবে।

একদিন রাজকুমারী খাঁচা থেকে হাসানকে বাইরে বের করে। সাজপোশাক খুলে ফেলে স্নান করাতে যায়। হঠাৎ সে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে হাসানের নিরাবরণ নগ্ন দেহের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। একি! এ তো পুরুষদের মতোই পুরুষাঙ্গ। শুধু আকারে অত্যন্ত ছোট—একটা ধানি লঙ্কার মতো। ইয়া আল্লাহ, কোনও পাখীর এরকম হয়, তাতো কখনও দেখিনি। এবার সে হাসানের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে দেখতে থাকে। বাঃ একি, সবই তো পুরুষের মতো। এ তো বহুৎ আজব চিড়িয়া। হাসানের নগ্ন দেহখানা সে বাঁ হাতের তালুর ওপর বসিয়ে নেয়। হাসান একটি ছোট্ট চড়ুই-এর মতো ওর হাতের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। রাজকুমারী লক্ষ্য করে, ধানি লঙ্কাটা ধীরে ধীরে ফুলে ঢপের আকার ধারণ করে।

এ কেমন পাখী? পাখীর মতো গান গায় বটে কিন্তু আর সবই তো এর আমাদের দানবদের মতো? রাজকুমারী ভাবে।

হাসানের অনাবৃত দেহে হাত বুলাতে থাকে সে। স্বভাবতই হাসান উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাজকুমারীর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। সে-ও রিরংসায় কাতর হয়।

রাজকুমারীর খুব একটা মন্দ লাগে না। যদিও চড়ুই-এর মতো একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। আরও খানিক সময় থাকতে পারলে হয়তো আরও ভালো লাগতে পারতো।

সেই থেকে হাসান রাজকুমারীর পোষা মোরগ হয়ে গেল। যখন তখন সে হাসানকে বের করে আদর করে, সোহাগ করে, চুমু খায়, এবং সারা গায়ে হাত বুলায়। হাসান উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। কিন্তু রাক্ষস-কন্যা এক পলকেই ওকে অসাড় অবশ করে ফেলে!

এই রকম মজার খেলা চলতে থাকে বেশ কিছুদিন। হাসানের মন্দ লাগে না। কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্যর কথা এক নিমেষের জন্য বিস্মৃত হতে পারে না। তার বিবি রোশনি, তার পুত্র নাসির আর মনসুরকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু এখানে এই রাক্ষসপুরীতে খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে রাজকুমারীর চোখে চোখে থাকলে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে কী উপায়ে? তাকে যেতে হবে ওয়াক ওয়াক দ্বীপে জিনিস্থান সম্রাটের সুরক্ষা থেকে লোপাট করে আনতে হবে ওদের।

হাসানের সঙ্গে সেই আশ্চর্য দামামা আর শেখ আলীর একগাছি চুল আছে। বিপদের দিনে কাজে লাগানো যেতে পারতো। হাসানের পোশাক পাল্টাবার সময় রাক্ষস-রাজকন্যার সে দুটো বস্তু ঐ কুর্তার জেব থেকে বের করে রাখা সম্ভব হয়নি। তা হলে সে সন্দেহ করতে পারতো। ঐ পোশাকের মধ্যেই সেগুলি রয়ে গেছে। পোশাক এখন রাজকুমারীর হেপাজতে। অনেক বার সে ঐ দামামা আর চুলের গাছিটা রাজকুমারীর কাছে ইশারা ইঙ্গিত করে ফেরত চেয়েছে। রাজকুমারী প্রতিবারই ভুল ভেবেছে—চিড়িয়া গরম হয়েছে। প্রতিবারই

সে হাসানকে ঐ ভাবে ঠাণ্ডা করেছে। এখন সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, কী ভাবে কথাটা ওকে বোঝানো যায়, কী ভাবে আবার ফেরত পাওয়া যায় ও দুটো অমূল্য সম্পদ।

একদিন রাতে রাজকুমারী হাসানকে খাঁচা থেকে বের করে তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আদর সোহাগ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। এই মওকায় হাসান আস্তে আস্তে উঠে তার পরিত্যক্ত পোশাকের ভেতর থেকে সেই দামামাটা আর শেখ আলীর দেওয়া চুলের গাছিটা বের করে এক গাছি চুলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো পাঁচতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয়ঃ

সঙ্গে সঙ্গে গুহাগহ্বর কেঁপে ওঠে, এবং পালক-পিতা আবির্ভূত হন। তার সর্বাঙ্গে কালো সাজপোশাক।

—কী চাও বেটা ?

হাসান নতজানু হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে বলে, দোহাই আপনার, জোরে কথা বলবেন না। ও জেগে যাবে এবং আমাকে ঐ খাঁচায় ভরে ফেলবে।

শেখ ওকে হাতে তুলে নিয়ে অলৌকিক ক্ষমতা-বলে গুহার বাইরে পাহাড়ের ওপরে চলে যায়। তারপর জানতে চান, কী ঘটেছে। তখন হাসান তার শ্বেত কর্পূর দ্বীপের এই বন্দীদশার কাহিনী ব্যক্ত করে তাঁকে।

শেখ আলী হাসানের ব্যভিচার-প্রক্রিয়া শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। বলেন, তোমার যদি এই রকম অনাচার করার ইচ্ছা থাকে তবে বাকী চুলগুলো তুমি আমাকে ফেরত দিয়ে দাও। তারপর তোমার যা প্রাণ চায় করতে পারো, আমার কিছু বলার নাই। তবে জেনে রাখ, আমার দ্বারা আর কোনও সাহায্য পাবে না তুমি। তোমার নিজের হিম্মতে যদি কুলায় তুমি ওয়াক ওয়াক দ্বীপ থেকে বিবি বাচ্চাদের উদ্ধার করে দেশে নিয়ে যেও। আমার সাহায্য চেও না—পাবে না। আর যদি আমার ওপর তোমার ভরসা থাকে তবে এই সব ব্যভিচার তোমাকে ছাড়তে হবে। আমি তোমার বিবি বাচ্চাদের উদ্ধার করে দেব।

হাসান কেঁদে ফেলে, আপনি আমাকে মাফ করুন, প্রভু আমার বিবি বাচ্চাদের ফেরত নিয়ে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। আমার কাছে, এই দেখুন। একটা আশ্চর্য যাদু দামামা আছে, এর সাহায্যে আমি পরীর দেশে উড়ে যেতে পারি।

শেখ আলী বললেন, আমি চিনতে পেরেছি। এটা বাহরামের কাছে ছিল। সেও আমার এক শিষ্য—অগ্নি উপাসক ছিল। সে-ই একমাত্র যে আল্লাহতে বিশ্বাস রাখতে পারেনি। কিন্তু এ দামামা ওয়াক ওয়াক দ্বীপে কোনও কাজে আসবে না। কারণ জিনিস্থান-সম্রাট তার এলাকার সব যাদু

অকেজো করে রেখেছে। একমাত্র তার নিজের যাদুই সেখানে কাজ করতে পারে।

হাসান বলে, পয়গম্বরের বাণী ঃ যার দশ সাল বেঁচে থাকার ওয়াদা ন'বছরের মাথায় তার ইন্তেকাল হয় না। যদি আমার নসীবে লেখা থাকে ঐ অজ্ঞাত দেশে প্রাণ যাবে—যাবে। সেইজন্যে আপনার কাছে আমার আর্জি, আপনি আমাকে সঠিক পথ বলে দিন প্রভু। আমি তার থেকে বিচ্যুত হব না।

তখন পালক-পিতা হাসানকে বললো, চোখ বন্ধ কর।

হাসান চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—চোখ খোল।

হাসান চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সামনে দাঁড়িয়েছিল পালক-পিতা। নিমেষে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। আরও আশ্চর্য হলো হাসান এখন সে আর শ্বেত কর্পূর দ্বীপের রাক্ষসদের প্রাসাদ পাহাড়ের চূড়ায় নাই। সে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা অজানা এক দ্বীপের সমুদ্রের বেলাভূমিতে। যে দিকে নজর যায়, সারা সমুদ্র সৈকত ব্যাপী লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার বহু বিচিত্র রঙের হীরে জহরত ছড়ানো।

কিন্তু সে দিকে বা নিজের দিকে নজর দেওয়ার পলকমাত্র সময় পেল না হাসান। হাজার হাজার সাদা পাখীর ঝাঁক নেমে এল তার মাথার ওপর। কী বিরাট বিরাট সে-সব পাখী। এক একটা প্রায় মানুষের মতো দেখতে। সারা আকাশে ছেয়ে গেল তারা, সূর্য ঢাকা পড়ে গেল তাদের পাখার আড়ালে। চার দিকে নেমে এল ঘন কালো অন্ধকার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা হাসানের চারপাশে নেমে এসে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ওয়াক ওয়াক অওয়াজ তুলে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকলো।

হাসান বুঝলো, এই সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপ—সেই নিষিদ্ধ দেশ। পাখী গুলো তাড়া করে হাসানকে সমুদ্রে নামাতে চায়। কিন্তু হাসান দৌড়ে কাছেই একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে আশ্রয় নিল। ঘরটার মধ্যে একটা যুৎসই জায়গা খুঁজে বসতে যাবে, এমন সময় পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো। চারদিক থেকে গুম গুম আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো।

এমন সময় ধুলোর ঝড় উঠলো। অন্ধকার হয়ে গেল দশদিক। সেই অন্ধকারের মধ্যে হাজার হাজার সৈন্যের ঢাল-তলোয়ার ঝিলিক মেরে উঠলো।

এরাই আমাজন সেনা! সম্রাটের নারী-সৈন্য-বাহিনী। সকলেই সোনার ঘোড়ায় চেপে এসেছে। হাসানকে কুঁড়েঘরের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা লাগাম টেনে ঘোড়াগুলোকে পিছনের দিকে হঠাতে থাকে। তখন ওরা পিছ'নর পা ছুঁড়ে বালীর পাহাড় তুলে মেয়েগুলোকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু হাওয়ার দাপটে মুহূর্তে ধুলো বালি সব সরে যায়। হাসান দেখলো, মেয়েগুলোর মুখ একেবারে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর।

ভোর হয়ে এল! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো ছয়তম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা চওড়া একটি মেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে হাসানের দিকে এগিয়ে এল। তার ইশারায় সব মেয়েই নিচে নেমে সার হয়ে দাঁড়ালো। ওরা সবাই ফুলের মতো সুন্দর।

লম্বা জাঁদরেল মেয়েটির মুখ সেনাপতির শিরস্ত্রাণ বর্মে ঢাকা ছিল। হাসানের বুঝতে অসুবিধে হয় না, সে-ই এই নারী সেনা-বাহিনীর প্রধান। কাছে আসতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে ওর পা দুখানা চেপে ধরলো, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি পরদেশী মুসাফির। ভাগ্যের তাড়নায় এখানে এসে পড়েছি। আপনি আমাকে বাঁচান। যদি আমার দুঃখের কাহিনী শোনেন আপনার করুণা হবে। এমনি হতভাগ্য আমি, বিবি বাচ্চাদের খুইয়ে আজ দেশে দেশে ঘুরছি।

মেয়েটির কী মনে হলো। সে তার মুখের বর্ম সরিয়ে নিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসান ওর কুৎসিত কদাকার চেহারা দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। এমন ভয়ঙ্কর বীভৎস কারো চেহারা হতে পারে, সে ভাবতে পারে না। নাকটা ব্যাঙের মতো, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো কয়লার গুলের মতো গোল গোল। আকর্ণ বিস্তৃত মুখের হা, নিচের ঠোঁটটা অস্বাভাবিক রকমের ঝুলে পড়েছে। হাসান আর সহ্য করতে পারে না। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে।

বৃদ্ধা সেনাপতি ভাবলো, মনুষ্য-সন্তানরা হয়তো মুখ ঢেকে সম্মানীয়দের সম্মান দেখায়। হাসানের ব্যবহারে সে প্রীত হলো।

শোন ছেলে, ভয় নাই, আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, কোনও সাজা দেব না। বরং তোমার যাতে কোনও বিপদ না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এখন নির্ভয়ে বল তো, কে তুমি, কেনই বা এসেছ এই নিষিদ্ধ দেশে। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ এখানে আসার দুঃসাহস করেনি। তুমি জান না, এই ওয়াক ওয়াক সপ্তদ্বীপমালা, জীন-সম্রাট জিনিস্তানের সপ্তকন্যাদের সুরক্ষিত সাতটি রাজ্য। সম্রাটের কড়া নির্দেশ আছে, কোন বিদেশী—সে মানুষই হোক আর জীন আফ্রিদিই হোক, এই সাতটি দ্বীপের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারবে না। যদি কেউ তার আদেশ লঙ্ঘন করে ঢোকার চেষ্টা করে, তবে কঠোর সাজা পেতে হবে তাকে। তা তুমি কী এসব কিছু জানতে না? আর তা ছাড়া ঐ সব দুর্গম গিরি পর্বত কান্তার মরুপ্রান্তর এবং সাগর দরিয়া পার হয়ে এমন দূর দেশে পৌঁছতেই বা পারলে কী করে? এবং কী উদ্দেশ্যেই বা এসেছ এখানে?

হাসান বলে, অপনি যদি ধৈর্য ধরে আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনেন আমি নিশ্চয়ই শোনাবো, মা। তবে সে কাহিনী একটু দীর্ঘ, কিছু সময় লাগবে।

নারী-সেনাপতি ইশারা করতে তার গোটা বাহিনীটা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বৃদ্ধা সস্নেহে বললো, চলো ঐ পাহাড়ের টিলাটায় গিয়ে বসি। তার পর শুনবো তোমার কাহিনী।

হাসান তার কাহিনী বলে।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করে তোমার বিবি বাচ্চাদের কী নাম।

—আমার দুই ছেলের নাম নাসির আর মনসুর। আর বিবির আসল নাম কী—বলতে পারবো না। তবে আমাকে সে তার নাম বলেছিল রোশনি।

এই বলে হাসান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বৃদ্ধা সান্ত্বনা দিতে দিতে বলে, কেঁদো না বাছা, তোমার এই দুঃখের কাহিনী শুনে বড় ব্যথিত হলাম। কোনও মা-ই কী সন্তানের চোখে পানি দেখতে চায়? কেঁদো না, চুপ কর। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার বিবি বাচ্চাদের সন্ধান করার জন্য জান প্রাণ চেষ্টা করবো। এখন সন্দেহ হচ্ছে, আমার নারী-সেনাদের কেউ হয়তো তোমার বিবি হতে পারে। কারণ এই দ্বীপে ওরা ছাড়া তো কোনও মেয়ে নাই। যাই হোক, কাল তোমাকে ওদের সবাইকে বিবস্ত্র করে দেখাবো। তুমি ভালো করে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে তোমার বিবিকে!

হাসান কৃতার্থ হয়ে বলে, আলবাৎ চিনতে পারবো মা। তার চেহারা কী ভোলবার?

পরদিন বৃদ্ধা সেনাপতির বিশাল সৈন্য-বাহিনীর মেয়েরা এসে হাজির হয়। সবাই সাজ-পোশাক খুলে বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়ায়। হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা প্রতিটি মেয়ের সামনে দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলে।

হাসান বলে, এরা সকলেই পরমাসুন্দরী, সন্দেহ নাই। কিন্তু মা, এর মধ্যে আমার বিবি নাই।

বৃদ্ধা চিন্তিত হয়, তবে? তবে তো মনে হয়, সে এ দ্বীপের মেয়ে নয়।

হাসান বলে, কিন্তু উড়ে চলে যাবার আগে সে আমার মাকে বলেছিল, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে আবার তার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

বৃদ্ধা বললো, এ ছাড়া আর মাত্র সাতটি কন্যা আছে এই সপ্তদ্বীপে। কিন্তু তারা তো সম্রাট-নন্দিনী। কেমন দেখতে ছিল তোমার বিবি, তার রূপের কিছু বর্ণনা শোনাতে পার?

হাসান বলে, সে-রূপ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মা, অমন অলোকসামান্যা সুন্দরী আমাদের মানুষ-জগতে দুটি নাই। তার চোখ নাক মুখ স্তন কটি জঙ্ঘা একেবারে নিখাদ নিখুঁত। নিপুণ ভাস্করের হাতে গড়া এক অপরূপ সৃষ্টি!

বৃদ্ধা কিছু অনুমান করতে পারে না। এখানকার সেনাবাহিনীর মেয়েরাও তো সকলে অসামান্যা সুন্দরী, অবশ্য রাজকুমারীরা আরও অনেক বেশী সুন্দরী, সে কথা ঠিক। কিন্তু রাজকুমারীদের যদি কেউ হয়, বৃদ্ধা শিউরে ওঠে, তা হলে তো সর্বনাশ। এবং তা ছাড়া কীই বা হতে পারে। আমার এই সমগ্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যখন সে নাই তখন তো বাকী থাকে মাত্র ঐ সাতজন রাজকুমারী। এ ছাড়া তো অন্য কোনও নারী এখানে নাই।

বৃদ্ধা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, হাসান তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার বিবি সম্রাটের সাত মেয়ের কোনও এক মেয়ে। তা যদি হয়, সে দুরাশা তুমি

ত্যাগ কর, বাবা। চাঁদে হাত বাড়াতে যেও না। এ খবর সম্রাটের কানে গেলে এইখানেই তোমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবেন তিনি। সম্রাটের এই দুর্ভেদ্য সুরক্ষা থেকে তাঁর কন্যাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে—সে আশা করো না। তার চেয়ে তুমি আমার কথা শোন, আমার সেনাদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ বল, আমি সানন্দে তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। এর জন্যে সম্রাট বা তাঁর কন্যাদের কারো অনুমতির প্রয়োজন হবে না। কারণ সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর আমিই সর্বপ্রধান কর্ত্রী। আমার হুকুমে ওরা প্রাণ দেবে, প্রাণ নেবে।

হাসান বলে, আপনার এই বদান্যতার কথা আমি ভুলবো না। কিন্তু আমি যৌবন কামে উন্মত্ত হয়ে কোনও নারী মাংসের সন্ধানে এখানে আসিনি মা। আমি আমার পেয়ারের বিবি বাচ্চাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি। এবং আমার বিশ্বাস, আল্লাহ যখন এত দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়ে এখানে আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন তখন শেষরক্ষাও তিনি করবেন। তা না হলে এই নিষিদ্ধ দ্বীপে এসে আপনার মতো এমন দয়াবতী মাকেই বা পাবো কেন? সবই তাঁর ইচ্ছা। আমার মন বলছে, আপনি—আপনিই আমাকে সন্ধান করে দিতে পারবেন আমার বিবি বাচ্চার।

বৃদ্ধা প্রশংসায় বিগলিত হয়ে গেল।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো আটতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

—বাবা, আমি তোমার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি। বিবি বাচ্চারা তোমার কাছে বড় আদরের। তাদের অদর্শন তুমি সইতে পারছো না। যাই হোক, খুব বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে আমি এই দ্বীপের রানী আমাদের সম্রাটের বড় কন্যার দরবারে নিয়ে যাচ্ছি। জানি না সে আমাকে কী বলবে।

হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা সেনাপতি দরবারে আসে। হাসানকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে সে রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। দরবারে প্রবেশ করে রাজকুমারীকে যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ায়।

রাজকুমারীর নাম নুর অল হুদা। এই বৃদ্ধাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে সে। তার কারণ জন্মের পর থেকে সে তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। বুকের দুধ খাইয়েছে। সে তার ধাত্রী।

নুর অল হুদা বৃদ্ধাকে দেখে খুব খুশি হয়। বলে, এই যে ধাই মা, মনে হচ্ছে, সুখবর আছে?

—সুখবর কিনা জানি না, বেটা, তবে তোমার কাছে এক আর্জি নিয়ে এসেছি। আজ একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। একটি চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর নওজোয়ান ছেলে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? এবং কেনই বা এসেছ? তার জবাবে ছেলেটি বড় করুণ কাহিনী শোনালো আমাকে। তার বিবি এক জিন-কন্যা।

তার সঙ্গে ছেলেটির শাদী হয়েছিল। এবং দুটি সন্তানের জন্মও দিয়েছিল সে। একদিন সে ছেলে দুটিকে তুলে নিয়ে আবার আকাশে উড়ে উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু যাবার সময় সে এই দ্বীপের নাম বলেছে।—যদি দেখা করতে চাও, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে আমার সন্ধান পাবে। আমি আমার সৈন্য-বাহিনীর সব মেয়েদের দেখিয়েছি তাকে। কিন্তু তাদের কেউ ওর বিবি নয়। যা বর্ণনা দেয় তাতে মনে হয়, তোমাদের সাত বোনের একজন হয়তো হতে পারে। আমি ওকে সঙ্গে করে এনেছি। যদি তুমি দেখতে চাও, দরবারের ভিতরে নিয়ে আসতে পারি ওকে।

বৃদ্ধার কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়ে নুর অল হুদা।

—তুমি একটা হতচ্ছাড়া মেয়েছেলে। এতবড় সাহস তোমার, একটা মানুষের বাচ্চাকে ঢুকতে দিয়েছ আমাদের এই পবিত্র দ্বীপে? কী লজ্জার কথা? ছি ছি! তুমি কী চাও, তোমার মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে খাই?

বৃদ্ধা ভয়ে কাঁপতে থাকলো। হাত জোড় করে সে রাজকুমারীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। নুর অল হুদা তখনও বলে চলেছে, তুমি কী আমার রাগ জান না? আমি তো বুঝতে পারছি না, এসব শোনার পর এখনও কেন তোমাকে জিন্দা রেখেছি। তুমি আমাদের প্রধান সেনাপতি, এই দ্বীপ পাহারা দেবার ভার দেওয়া আছে তোমার ওপর। তার কী এই নমুনা? আমি তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো। আমাকে চেন না! থাক, সে সব পরে হবে, এখন ওকে হাজির কর আমার সামনে। দেখি, কতবড় তার দুঃসাহস, আমাদের এই পবিত্র দ্বীপে পা রেখেছে সে!

বৃদ্ধা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে হাসানকে নিয়ে আবার দরবারে প্রবেশ করে।

নুর অল হুদা বোরখায় সারা দেহ আবৃত করে সিংহাসনে বসেছিল। আভূমি আনত হয়ে হাসান কুর্নিশ জানাল তাকে। নুর অল হুদা বৃদ্ধাকে ইশারা করতে সে হাসানকে বললো, আমাদের মহামান্যা রাজকুমারী তোমাকে প্রশ্ন করছেন, তোমার নাম কী, স্বদেশ কোথায় এবং তোমার বিবি বাচ্চাদেরই বা কী নাম?

হাসান বলে, আমার নাম হাসান, আমার জন্মভূমি বসরাহ। আমার বিবির নাম জানি না; দুইপুত্রের নাম নাসির আর মনসুর।

—তোমার বিবি তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে কেন?

হাসান বলে, খোদা কসম, আমি তা জানি না।

—কোথা থেকে চলে গেছে?

—বাগদাদের খলিফা অল রসিদের প্রাসাদ থেকে সে উড়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় সে আমার মাকে বলে গেছে, 'আপনাদের ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশ আমাকে ডাক দিয়েছে—যেতেই হবে। বিদায় বেলায় দুঃখ রয়ে গেল। আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। যদি সে দেখা করতে চায়, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে যেতে বলবেন ওকে।' এই বলে সে

আমার বাচ্চা দুটোকে তুলে নিয়ে আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি সে-সময় দেশে ছিলাম না। ফিরে এসে সব শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল আমার সামনে।

এবার নুর ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজেই কথা বললো, হুম্, তোমার বিবি যদি তোমাকে দেখা না দিতে মনস্থ করতো, তা হলে তোমার মাকে তার ঠিকানা জানিয়ে আসতো না কিছুতেই। আবার অন্য কথাও ভাববার আছে, সে যদি সত্যিই ভালবাসতো তাহলে তোমাকে ছেড়ে পালাবেই বা কেন?

হাসান সঙ্গে সঙ্গে হলফ করে বললো, আপনি বিশ্বাস করুন রাজকুমারী, খোদা কসম, আমার বিবি আমাকে গভীরভাবে ভালবাসতো—আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এখনও সে ভালোবাসা অটুট আছে তার। শুধু উন্মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াবার নেশা ওকে ঘর ছাড়া করেছে। আমারই ভুল হয়েছিল, আমি ওকে অবিশ্বাস করে ওর ডানার খোলসটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। তাই শাদীর পর আর কোনও দিন সে আকাশে ভেসে বেড়াতে পারেনি। আমার মনে হয়, গোড়া থেকে ওকে পুরো স্বাধীনতা দিলে, ওর আকাশে ওড়ার সখ মেটালে, ঐ ভাবে সে চলে যেত না।

একটু থেমে হাসান বললো, আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী সব শুনলেন, এখন যদি মেহেরবানী করে আমার বিবি বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, চিরকাল আপনার বান্দা হয়ে থাকবো, রাজকুমারী। আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।

নুর অল হুদা 'হাঁ না' কোনও কথা বললো না। পুরো একটা ঘণ্টা মুখ গুঁজে আপন মনে ভাবতে থাকলো, তারপর এক সময় মাথা উঁচু করে বললো, এতক্ষণ কী ভাবে তোমাকে সমুচিত সাজা দেওয়া যায়, তা-ই চিন্তা করছিলাম। কিন্তু এখনও ভেবে উঠতে পারলাম না ঠিক মতো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো দশতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয়ঃ

বৃদ্ধা আতঙ্কিত হয়ে নুর-এর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। রাজকুমারী, মা, তোমাকে আমি নিজের কন্যার মতো করে লালন পালন করেছি। আমার স্তন খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছ। সেই জোরে তোমার কাছে আজ এই যুবকের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি, বেটা। তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও। কত দূর দেশ থেকে সে এসেছে। কত দুস্তর বাধা বিপত্তি মাথায় নিয়ে সাত সমুদ্র, সাতটা পাহাড় পর্বত ও সাতটা মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে তবে পৌঁছতে পেরেছে এখানে। এবং তা কীসের জন্য? বিবি আর বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে। দুনিয়ার ইতিহাসে এই মহব্বতের নজির নাই, রাজকুমারী। একে তুমি কঠোর দণ্ড দিও না, এই আমার প্রার্থনা। বরং ক্ষমা করে এই মূর্ত ভালোবাসার প্রতীককে সৌজন্য দেখাও। তবে তোমার মহত্ত্ব বাড়বে। ছেলেটির সঙ্গে সহজ হয়ে,

একটু দরদ ঢেলে, প্রাণ খুলে আলাপ-সালাপ করে দেখ, তোমার প্রাণে দয়া হবে।

নুর অল হুদা নিজের বোরখা খুলে হাসানের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাসান নুরকে দেখে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বৃদ্ধা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধাতস্থ করার চেষ্টা করে। একটু পরে সে চোখ মেলে তাকায়। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ কী হলো, বাছা।

হাসান বলে, ইয়া আল্লাহ্, এ আমি কী দেখলাম? এ যে বিলকুল আমার বিবির মতো দেখতে! একটা মুগের দুখানা ডালের একখানা! অবিকল তার মতো!

রাজকুমারী হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে।

—এ তো দেখছি আস্ত একটা উন্মাদ। আজন্ম আমি কুমারী, আমাকে সে তার বিবি বলে ঠাওরালো? আমি কিনা তার দুই ছেলের মা? আচ্ছা বল শুনি, কেন আমাকে দেখে তোমার বিবি বলে মনে হলো?

হাসান বলে, আমার বিবির মতো পরমাসুন্দরী নারী ত্রিভুবনে কোথাও নাই, এই আমার এতদিনের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আপনাকে দেখে সব আমার গোলমাল হয়ে গেল। সেই মুখ, সেই নাক, কপোল অধর সব-সব হুবহু তারই মতো। এতটুকু তফাত নাই। শুধু, ভালো করে লক্ষ্য করলে ধরা যায়, তার চোখের সঙ্গে আপনার চোখের সামান্য ফারাক আছে। আর ধরা যায় আপনার কণ্ঠস্বর শুনে। আপনার কথাও গান হয়ে বেরিয়ে আসে, কিন্তু দুজনের স্বরে কিছু পার্থক্য আছে।

রাজকুমারী বুঝলো এ যুবক অন্য কোনও নারীতে আসক্ত হবার পাত্র নয়। কিন্তু হাসানকে দেখা অবধি কী এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করছে সে। এরই নাম কী ভালোবাসা?

যাই হোক, কে সেই নারী—যার সন্ধানে সে নিজের জীবন তুচ্ছ করে এই নিদারুণ ঝুঁকির মধ্যে পা বাড়িয়েছে? তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। এবং এই দ্বীপেই যখন সে আছে, নিশ্চয়ই তার অন্য ছয় বোনদেরই একজন কেউ হবে! কিন্তু কে? আমি এদের দু'জনকেই শায়েস্তা করবো।

বৃদ্ধাকে সে বলে, ধাইমা, এক্ষুণি তুমি আমার ছয় বোনকে নিমন্ত্রণ করে এস। গত দুই বছর তাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ওদের বলবে, কাল আমার প্রাসাদে আনন্দ উৎসব হবে। ওরা যেন সবাই চলে আসে। কিন্তু খবরদার, এই ছেলেটির কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবে না কিছু।

রাজকুমারীর মনের কথা আর জানবে কী করে, হুকুম তামিল করতে তক্ষুণি সে বেরিয়ে পড়লো অন্য ছয় দ্বীপে। প্রত্যেক দ্বীপের রানী হচ্ছে এক এক বোন।

পর পর পাঁচটি দ্বীপে গিয়ে পাঁচ বোনকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে সব শেষে ছোট বোনের দ্বীপে গেল সে। জিন-সম্রাট এই ছোট কন্যার প্রাসাদেই শেষ জীবন অতিবাহিত করছে। বৃদ্ধার মুখে বড়দিদির আমন্ত্রণ পেয়ে ছোট কন্যা নাচতে

নাচতে ছুটে যায় বাবার কাছে।

—বাবা, বড়দি ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল তাঁর প্রাসাদে খানাপিনা, নাচ-গান হবে। সব বোনরা—আমরা এক জায়গায় মিলবো আজ দু বছর বাদে। আমাকে যেতে দেবে তো, বাবা?

সম্রাট ছোট কন্যার কথা শুনে হঠাৎ কেমন বিচলিত বোধ করে, না মা, না, মানে—না, হ্যাঁ—মা না না।

ছোট মেয়ে সম্রাটের এই ধরনের ভাবভঙ্গী দেখে ঘাবড়ে যায়, সে কী বাবা, অমন করছো কেন তুমি। অনেক দিন বাদে নিজের বড় দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাবো—তাতে তোমার এত আপত্তি হচ্ছে কেন?

এতক্ষণে সম্রাট গুছিয়ে বলতে পারেন কাথাটা।

—কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, মা। এবং সেই থেকে আমি ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছি। কেন জানি না, মনে হচ্ছে, তোমাকে বুঝি আমি আবার হারাবো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো এগারোতম রজনী ঃ

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

সম্রাট বলতে থাকে, স্বপ্নে দেখেছি, আমার গুপ্তধনাগারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। লক্ষ লক্ষ হীরে জহরত, মণিমুক্তা নেড়ে চেড়ে দেখছি। হঠাৎ আমার নজর পড়লো সাতখানা অত্যাশ্চর্য মণিরত্নের দিকে। তার মধ্যে সব চেয়ে যেখানা ছোট, সেখানা আমার কাছে আরও বেশি সুন্দর মনে হল। আমি ঐ রত্নখানা হাতে করে প্রাসাদে উঠে এলাম। এর পর দেখলাম, হঠাৎ একটা বাজপাখী উড়ে এসে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেল ঐ রত্নখানা। আমি চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ছুটে গেল। বাকী রাতটা শুধু পায়চারী করে কাটালাম। সকালবেলায় গণৎকারদের ডেকে পাঠিয়ে আমার স্বপ্নের কথা বললাম ওদের। ওরা আমাকে ব্যাখ্যা করে বললো, মহানুভব সম্রাট, ঐ সাতখানা রত্ন আপনার সাতটি কন্যা। আর ছোট রত্নখানা—সে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা।

আমাদের আশঙ্কা, কোনও এক দৈব-দুর্বিপাকে আপনি আপনার এই ছোট কন্যাকে হারাতে পারেন।

সেই থেকে আমি দারুণ উদ্বেগের মধ্যে আছি। তোমার দিদি অনেক দিন পরে তোমাকে ডেকেছে, যাওয়া খুবই সঙ্গত, কিন্তু এ অবস্থায় তোমাকে কাছ-ছাড়া করতে কিছুতেই প্রাণ চাইছে না, মা।

সব শুনে ছোট মেয়ে হো হো করে হাসে, তুমি আমাকে সকলের থেকে বেশি ভালবাস, সেইজন্যেই তোমার মনে এত ভয়, বাবা। তা না হলে খোয়াব কী কখনও সত্যি হয়? আর ঐ গণৎকারদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা তো গালভরা

বাণী দিতে পারলেই মোটা ইনাম পায়। তোমার আশঙ্কা করার কোনও কারণ নাই, বাবা। আমি নিজে যেতে রাজি না হলে কেউ আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো জান বাবা, এর আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে বিপদে পড়ে কিছুকালের জন্য আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ওরা চিরকালের মতো বেঁধে রাখতে পেরেছিল? সুযোগ বুঝে একদিন তো আবার তোমার কাছে ফিরে এলাম, বাবা। সুতরাং ওসব দুর্ভাবনা মন থেকে মুছে ফেল। আমি কোথাও চলে যাবো না। কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবা, মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে। হাজার হলেও সহোদরা দিদি, সে ডেকেছে, না গেলে চলে?

সম্রাট তবু যেন প্রাণ খুলে বলতে পারে না, আচ্ছা যা।

ছোট কন্যা—আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এই আমাদের কাহিনীর নায়িকা রোশনি—বাবাকে আদর করতে করতে বলে, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো, বাবা। তোমার এই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে এত সহস্র সৈন্য দিনরাত শ্যেন দৃষ্টি মেলে পাহারা দিচ্ছে। বাইরের একটা মশাও এ দ্বীপে ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া সাত সমুদ্র, সাত পাহাড়, সাত মরুপ্রান্তর, শ্বেত সূর্যের দ্বীপ ডিঙিয়ে তবে ওয়াক ওয়াক দ্বীপ। এত বাধা বিপদ কাটিয়ে এখানে এসে পৌঁছবে, এমন হিম্মত কার আছে? বাবা, আর মুখ ভার করে থেকো না, সব দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে একবার প্রাণ খুলে হেসে আমাকে বিদায় দাও তো!

শেষের কথাগুলো সম্রাটের খুব মনে ধরলো। তাই তো! তার দেশের যা সুরক্ষা, তা ভেদ করে বাইরের কোন প্রাণীর এখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল। বললো, যা মা, দেখে শুনে যা। তোর সঙ্গে আমি কড়া পাহারা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। জানিস তো তোকে ছাড়া আমি দিন কাটাতে পারি না।

এর পর এক হাজার নারী-সেনার এক বাহিনীর প্রহরায় রোশনি বড় দিদির প্রাসাদে এসে পৌঁছয়।

পৌঁছয় আরও পাঁচ বোন। কিন্তু আনন্দ উৎসবের কোনও আভাস দেখতে পেল না কেউ।

নুর অল হুদা খবর পাঠালো, তোমরা বিশ্রাম কর, সবাই। যথাসময়ে আমি ডেকে পাঠাবো।

দরবারে নুর অল হুদা সিংহাসনে উপবিষ্ট। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসান। কোরবানীর খাসীর মতো তার অবস্থা। চারপাশ ঘিরে এক পাল অসিধারিণী উন্মুক্ত খড়্গ উঁচিয়ে আছে। রাজকুমারী প্রথমে তার চেয়ে ছোট যে বোন—তাকে ডেকে পাঠালো।

—দেখ, ভালো করে তাকিয়ে দেখ, যুবক। এ-ই কী তোমার বিবি?

হাসানকে প্রশ্ন করে নুর। কিন্তু হাসান বলে, এঁরও রূপের কোনও তুলনা নাই, রাজকুমারী। দেখতেও অনেকটা আমার বিবিরই মতো, কিন্তু না,

ইনি নন।

নূর অল হুদা ইশারা করতে তার ভগ্নী দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

আর একজন আসে। হাসান বলে, সত্যিই অপরূপ সুন্দরী। একেবারে নিখুঁত। কিন্তু নসীব খারাপ, ইনিও আমার বিবি নন।

এর পর তৃতীয় জন এল। সেও নয়। চতুর্থ এল। সেও নয়। এল পঞ্চম সহোদরা। নূর জিজ্ঞেস করে, দেখ, ভালো করে, দেখ, এ নিশ্চয়ই তোমার বিবি?

হাসান অবাক হয়। এত মিল কী করে সম্ভব। হুবহু একই রকম দেখতে। একেবারে রোশনি। কিন্তু না, এ রোশনি নয়। হাসান ঘাড় নাড়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে, না না এ-ও নয়। এরা সবাই সুন্দর, সবাই দেখতে আমার বিবির মতো। আশ্চর্য ভেল্কী বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। কিন্তু এদের কেউই আমার বিবি নয়।

নূর অল হুদার বুঝতে আর বাকী থাকে না, তা হলে রোশনি—তার সর্ব কনিষ্ঠ ভগ্নী ছাড়া আর কেউ নয়। ইশারা করতে প্রহরী রোশনিকে দরবারে নিয়ে আসে। হাসান মুখ তুলে তাকায়। আর তখুনি অস্ফুট আর্তনাদ তুলে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। নূর-এর ঠোঁটের কোণে হিংসার হাসি ঝিলিক মেরে ওঠে। হুম্, তা হলে ছোটর এই কাণ্ড। ঠিক আছে, দাঁড়াও মজা আমি দেখাচ্ছি। এই কে আছিস, এই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যা এখান থেকে। সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিয়ে আসবি, যা নিয়ে যা।

দুটি নারী-জল্লাদ হাসানের অচৈতন্য দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যায়। সমুদ্র-সৈকতে এসে হাসানের হত-চৈতন্য অসাড় দেহটাকে শুইয়ে দেয় বালির ওপর—একেবারে জলের ধারে। ভাবে এক সময় সাগরের ঢেউ এসে ওকে টেনে নিয়ে যাবে অকুল দরিয়ায়। তারপর এই চাঁদের মতো সুন্দর নওজোয়ানের নসীবে যা লেখা আছে, তাই হবে।

এদিকে নূর ক্রোধান্বিত হয়ে রোশনিকে বলে, তুই আমাদের পবিত্র জিন-বংশের কলঙ্ক। জিনিস্থান-সম্রাট যার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতে পারে না, তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা। একটা সামান্য নর সন্তানের সঙ্গে ঢলাঢলি করে তুই তাকে দেহ বিলিয়ে দিয়েছিস। ছি ছি, লজ্জায় মাথা কাটা যায়। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোকে আমি এই মুহূর্তেই খতম করে ফেলি। কিন্তু না, বাবা এখন জীবিত। তার হুকুম ছাড়া কোনও কাজ আমি করি না। এখুনি তাঁর কাছে আমি তোমার গুণের কথা জানিয়ে খবর পাঠাচ্ছি। তিনি যা জবাব পাঠান—সেইভাবে তোমার ব্যবস্থা করা হবে। এ্যাই, একে পাতালের অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যা। খুব শক্ত করে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখবি।

এর পর নূর বৃদ্ধা সেনাপতির দিকে তাকায়।

—আর তুমি? তোমার কী শাস্তি বিধান দেব, বল তো; ধাই মা? তুমি আমাকে লালন পালন করেছ, বুকের স্তন খাইয়ে মানুষ করেছ। তোমার ওপর কিছু কৃতজ্ঞতা আমার থাকা উচিত। কিন্তু ধাইমা, ব্যক্তি-স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্র

অনেক বড়। তার স্বার্থ সকলের ওপরে। সেখানে আমি কোনও দাক্ষিণ্য দেখাতে পারি নি। তুমি আমার সেনাবাহিনীর প্রধান। তোমার হাতে রাষ্ট্রের সুরক্ষার ভার দেওয়া ছিল। সেই, মহান কর্তব্য থেকে তুমি বিচ্যুত হয়েছ। এর সাজা তোমাকে পেতেই হবে। তুমি আমার মাতৃতুল্য, কিন্তু তুমি এখন দেশ-দ্রোহী। এখন আমি চিন্তিত বিচলিত! কী করবো কিছুই ঠিক করতে পারছি না। দেশ-দ্রোহের সাজা প্রাণদণ্ড, কিন্তু তোমাকে আমি নিজে হাতে সে দণ্ড দেব কী করে, মা?

নুর অল হুদা এক মুহূর্ত স্থির অপলক হয়ে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, নাঃ, আমি নিজে হাতে রাখবো না তোমার বিচার। বাবাকেই সব জানাচ্ছি। তিনি যা হুকুম করেন, তাই হবে। এখনি আমি দূত পাঠাচ্ছি বাবার কাছে। তাঁর জবাব না আসা পর্যন্ত এই দরবারে এইভাবে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, এই আমার আদেশ।

এই বলে নুর দরবার কক্ষ ত্যাগ করে অন্য বোনদের সঙ্গে মিলিত হতে যায়।

এদিকে সমুদ্রবেলায় বালির শয্যায় শুয়েছিল হাসান। এক সময় তার জ্ঞান ফিরে আসে। দুদিন আগে হঠাৎ এই সমুদ্র-সৈকতেই সে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হঠাৎ সেই শেখ আলীর মন্ত্রবলে। আজ সে সেখানেই শুয়ে আছে, আশ্চর্য!

সামনে দিগন্ত-প্রসারী দুস্তর জলরাশি, আর এপাশে সেই গিরি পাহাড় শ্রেণী। ওপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ। বড় মনোহর দৃশ্য। কিন্তু হাসানের কিছুই ভালো লাগে না। কোথায় তার নয়নের মণি রোশনি। এক পলকের জন্য তাকে সে দেখেছে। তারপর আর কিছু মনে নাই।

হাসান বুঝতে পারে রাজকুমারী নুর অল হুদার হুকুমে তার প্রহরীরা এখানে এই বালুকাবেলায় ফেলে গেছে তাকে। তা যাক. কিন্তু রোশনি—তার বিবিকে কী অবস্থায় রেখেছে সে। অথবা এতক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে সে তার প্রাণ সংহার করেছে! না না, ও-কথা হাসান ভাবতে পারে না—ভাবতে চায় না।

একটা চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসে হাসানের। তাকিয়ে দেখে দুটি ছোট্ট মেয়ে—নারী-সেনা হবে—প্রচণ্ডভাবে মারামারি করতে করতে তার দিকে ধেয়ে আসছে। হাসান উঠে দাঁড়ায়। ছুটে গিয়ে মেয়ে দুটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করে, কী ব্যাপার, তোমরা এমন মারামারি করছো কেন?

একটি ছোট্ট মাথার টুপি নিয়ে ওদের মধ্যে বচসা এবং সেই নিয়ে মারামারি শুরু হয়েছে। একটি মেয়ে বলে, টুপীটা আমার, অন্য জন বলে, না আমার, আমি দেব না।

হাসান হাসে। তুচ্ছ একটা মাথার টুপি, এই নিয়ে এমন তুলকালাম কাণ্ড। আচ্ছা শোন, আমি তোমাদের বিবাদ মিটিয়ে দিচ্ছি।

মেয়ে দুটি সাগ্রহে বলে, বেশ তাই দিন। আমরা আপনার রায়ই মেনে নেব।

হাসান বলে আমি একটা ঢিল ছুঁড়ে দিচ্ছি আসমানের দিকে। তোমরা ছুটে যাবে। যে আগে নিয়ে আসতে পারবে ঐ ঢিলটা, এ টুপি তারই প্রাপ্য, কেমন, রাজি।

—রাজি-রাজি।

দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে। হাসান বলে, তা হলে টুপিটা আমার কাছে জিম্মা রাখ।

একটি মেয়ের হাতে ছিল টুপিটা। সে নির্দ্বিধায় তুলে দেয় হাসানের হাতে। হাসান একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে পাঠিয়ে দেয় অনেক ওপরে। আর তখনি চিলের মতো ডানা মেলে ওরা উড়ে যায় আকাশে। ঐ ঢিলটার পিছনে। হাসান হাসতে হাসতে টুপিটা মাথায় পরে নেয়, স্বগতভাবে বলে, যতো সব পাগল।

একটুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে ওরা। হাসান দেখে ওদের একজনের হাতে সেই পাথর টুকরোখানা। সে চিৎকার করে ডাকে, কই গো, কোথায় গেলে, এই যে আমি ঢিলটা ধরেছি।

হাসান হাসতে হাসতে বলে, এই তো আমি।

হাসান অবাক হয়, সে কি! ওদের একেবারে নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে আছে সে—ওরা দেখতে পাচ্ছে না। আবার সে সাড়া দেয়, এই তো আমি।

মেয়ে দুটো দিশাহারা হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। এবার হাসানের মনে খটকা লাগে। তবে তো এ কোনও সাধারণ টুপি নয়। নিশ্চয়ই যাদু-মন্ত্রঃপূত। মাথায় পরলে আর তাকে কেউ দেখতে পায় না।

মেয়েরা তারস্বরে ডাকতে থাকে ওকে। হাসান কিন্তু আর কোনও সাড়া দেয় না। হন হন করে হেঁটে চলে আসে নূর অল হুদার দরবারে। সেখানে তখন নূর ছিল না। দরবারকক্ষ প্রায় শূন্য। শুধু একপাশে মুহ্যমান সেই বৃদ্ধা মাথায় হাত রেখে চোখের জল ফেলছিল।

হাসান ওর কাছে গিয়ে ডাকে, আপনি কাঁদছেন কেন মা।

বৃদ্ধা মুখ তুলে তাকায়। কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না। ভাবে, হয়তো তার মতিভ্রম ঘটেছে।

হাসান আবার বলে, রোশনি কোথায় মা, তাকে তো দেখছি না?

এবার আর ভুল হয় না তার। এতো সেই হাসানের কণ্ঠ স্বর। কিন্তু কোথায় সে? দরবারে তো অন্য কোনও প্রাণী নাই। অবাক হয়ে সে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। হাসান বুঝতে পারে বৃদ্ধা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। টুপিটা সে মাথা থেকে খুলে নেয়।

হঠাৎ হাসানকে দেখে চমকে ওঠে সে, তুমি? তুমি কী করে এখানে এলে বাবা? তোমাকে তো ওরা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এসেছে।

হাসান বলে, সে কথা পরে বলবো। এখন বলুন রোশনি কোথায়—জিন্দা আছে তো সে?

—এখনও আছে। তবে আর বেশিক্ষণ বোধ হয় থাকবে না।

—কেন ?

নূর ওর বাবাকে খৎ লিখে দূত পাঠিয়েছে। জবাব এলেই রোশনি আর আমাকে খতম করে ফেলবে সে।

—আপনাকেও ? কিন্তু কেন, মা ?

—দেশদ্রোহিতার অপরাধ। আমি তার সেনাবাহিনীর প্রধান, আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম স্বার্থ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছি—এই অপরাধ। ও-কথা থাক, আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। মরতে আমার বাধা নাই। কিন্তু দুধের বাছা রোশনি, ওকে বাঁচাতে হবে বাবা। কিন্তু কী করে বাঁচাতে পারবে ওকে। সে তো এখন পাতালের কয়েদখানায় বন্দিনী হয়ে আছে !

হাসান আকুল হয়ে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাও অদৃশ্য হয়ে যায়। দরবারের প্রহরীরা আতঙ্কিত হয়ে একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, আরে সেনাপতি গেল কোথায় ?

হাসান বুঝতে পারে, এ টুপি যার মাথায় থাকবে সে-ই শুধু অদৃশ্য হয়ে যাবে তা নয়, সে যাকে ধরবে, ছোঁবে—তাকেও কেউ দেখতে পাবে না।

হাসান বলে, মা, আপনি আমাকে ধরে থাকুন, তা হলে আপনাকেও কেউ দেখতে পাবে না। তারপর চলুন ঐ কয়েদখানায়, রোশনিকে উদ্ধার করতে হবে।

বৃদ্ধা পাতালের কয়েদখানায় নিয়ে আসে। সেখানে রোশনিকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চৌদ্দতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

হাসান ভাবে, এই অবস্থায় রোশনিকে যদি দেখা দেয় তবে হয়তো এখুনি মূর্ছা যাবে সে। ক্ষিপ্র হাতে হাসান ওর বাঁধন খুলে দেয়। প্রথমে রোশনি কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকে। পরে হাসান ওর মাথার টুপি খুলে ফেলতে পরিষ্কার বুঝতে পারে এই অন্ধকার কয়েদখানা থেকে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে তার স্বামী। হাসানের বুকে মাথা রেখে সে কাঁদতে থাকে।

হাসান বলে, এখন কান্নার সময় নয় রোশনি। চল, এখান থেকে পালাতে হবে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়। রোশনিকে কাঁধে তুলে এবং বৃদ্ধাকে হাতে ধরে কয়েদখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

হাসান বলে, আমি তোমাকে বাগদাদে নিয়ে যেতে এসেছি রোশনি, যাবে তো ?

রোশনি বলে, দেরি হলেও বুঝাতে পেরেছি, হাসান। শাদীর পর মেয়েদের একমাত্র ভরসাস্থল তার স্বামীর আশ্রয়। এখানে যদি ফেলে রেখে যাও, আমার

নিজের লোকেরাই আমাকে কোতল করে ফেলবে। ওদের ধারণা, তোমাকে শাদী করে তোমার ঔরসে বাচ্চা পয়দা করে আমি পতিতা হয়েছি। জিন-সম্রাটের বংশে চুনকালী দিয়েছি, সুতরাং এই ওয়াক ওয়াক দ্বীপ-এ আমার থাকা আর নিরাপদ নয়। চল, এই মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে জাহান্নামেও যেতে রাজি আছি।

হাসান বলে, জাহান্নাম কেন বলছো, তুমি আর আমি বাগদাদে ফিরে গিয়ে নতুন বেহেস্ত রচনা করবো। তার আগে একবার তোমার নিজের প্রাসাদে যেতে হবে। সেখান থেকে আমাদের চোখের মণি নাসির ও মনসুরকে তুলে নিতে হবে।

রোশনি স্বামী আর বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে আসে। তিনখানা ডানার খোলস সংগ্রহ করে আনে সে। আর নিয়ে আসে নাসির ও মনসুরকে।

—নাও এই ডানাগুলো পরে নাও।

রোশনি নিজেও একখানা পরে। ছেলে দুটোকে কোলে নেয় বৃদ্ধা। এবং মুহূর্ত মধ্যে মহাশূন্যে মেঘের ওপারে নিঃসীম নীল আকাশে উঠে যায় ওরা। তারপর উল্কার গতিতে ছুটে চলে বাগদাদের দিকে।

মাত্র একটি রাত। হাজার হাজার যোজন পথ একটি মাত্র রাতের মধ্যে পার হয়ে ঠিক ভোরবেলায় টাইগ্রিস উপকূলে এসে হাসানের বাড়ির ছাদের ওপর এসে নামে সকলে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো পনেরতম রজনী ঃ
আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে হাসান দরজায় কড়া নাড়ে। তখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। হাসানের মা অসাড় হয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল। ছেলের [illegible]ক্ কেঁদে কেঁদে সে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। সারা দিন রাতে চোখের দু পাতা [illegible] পারে না। প্রতিটি রাতের প্রতিটি প্রহর ঘণ্টা সে কান পেতে শোনে।

আত্মীয় পরিজন কেউই বড় একটা খোঁজ খবর রাখে না। হঠাৎ এই ভোরে কে আবার কড়া নাড়ে। হাসানের মা মেঝের ওপর শুয়ে থেকেই সাড়া দেয়, কে? কে কড়া নাড়ে?

—আমি মা, হাসান, তোমার ছেলে। দরজা খুলে দেখ, কাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

হাসানের মা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। তার হারানিধি হাসান আবার ফিরে এসেছে? কোনরকমে সে উঠে দাঁড়ায়। দরজার হুড়কোখানা খোলে। তারপর সত্যি সত্যিই হাসানকে দেখতে পেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে টলে পড়তে যায়। কিন্তু হাসান দুহাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে

মাকে। মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, মা—মাগো তাকিয়ে দেখ, আমি ফিরে এসেছি। আর, এই তোমার রোশনি। এই দেখ তোমার দাদুভাইরা, এদের বুকে নাও।

অনেকক্ষণ পর মা সম্বিত ফিরে পায়। রোশনি তার পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বলে সবই আমার দোষে হয়েছে মা। আমি ঘাট স্বীকার করছি। আর কক্‌খনো এমনটি হবে না। আপনি দেখবেন, কত ভালো মেয়ে হয়ে আমি ঘরে থাকবো। আকাশ আমাকে ডাক দিয়েছিল, তাই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আপনাদের এত আদর ভালবাসা তুচ্ছ করে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু মা, সে মোহ আমার কেটে গেছে। আমি আর কোথাও যাব না। এই আমার ঘর, এই আমার সংসার, এই-ই আমার ইহকাল পরকাল—সব।

এরপর হাসান তার মাকে সামনে বসিয়ে সেই দুঃসাহসিক অভিযানের আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনালো। তার পুনরাবৃত্তির কোনও প্রয়োজন নাই এখানে।

তখন থেকে হাসান তার মা বিবি-বাচ্চাদের এবং মাতৃপ্রতিম সেই বৃদ্ধাকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে থাকলো। বৎসরান্তে একবার করে সে তার সাত বোনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যেত। যাবার সময় রোশনিকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে আদর সোহাগ করতে করতে কানে কানে বলে যেত। আবার পালিয়ে যাবে না তো ?

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ সুলতান শাহরিয়ারের মুখের দিকে তাকায়। সুলতান এতক্ষণ গল্পের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে বসেছিল। গল্প শেষ হতে সে আত্মস্থ হয়।

—শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে যেতে হয় শাহরাজাদ। সত্যিই এমন দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী অনেক কাল শুনিনি। এমন তোমার শ্বাসরোধ করা গল্প যে, শুনতে আমার দরবারের কাজ কাম সব লাটে ওঠার দাখিল হয়েছে।

দুনিয়াজাদ বলে, কী চমৎকার কিস্‌সা দিদি। তবে এ তোমার ভারি অন্যায়, গুলাবীর সঙ্গে হাসানের আর একটা শাদী দিয়ে দিলে কী এমন ক্ষতি হতো।

শাহরাজাদ হাসে, প্যাগলী কোথাকার।

তারপর সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলে রাত আর বেশি বাকী নাই, এখন নতুন কিস্‌সা শুরু করলে আপনার ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়ে যাবে, জাঁহাপনা। এমনিতেই তো আমাকে দোষারোপ করছেন, আমার জন্যেই নাকি আপনার দরবারের জরুরী কাজ কাম নষ্ট হচ্ছে।

সুলতান শাহরিয়ার বলে, তা হোক, তবু তোমার কিস্‌সা শুনে মেজাজ তো খুশ থাকে। ঠিক আছে, আজ আর, নতুন কাহিনী নয়, এখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। এস আমরা একটু 'ভালোবাসা' করে ঘুমিয়ে পড়ি।

তারপর দুনিয়াজাদের দিকে চোখ পাকিয়ে সুলতান শাহরিয়ার কপট তম্বি করেন, দুনিয়া, তুম ইধার মৎ দেখো, আঁখ বন্ধ করকে শো যাও।

এর পর ওরা এক সময় সব কাজ সাঙ্গ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ছয়শো ষোলতম রজনী ঃ

শাহরাজাদ এবার নতুন গল্প শুরু করবে ঃ

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা এবার একটা মজাদার কাহিনী শুনুন !

কোনও এক শহরে এক যুবক সওদাগর বাস করতো। ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে প্রায়ই তাকে বিদেশে যেতে হতো। সওদাগরের এক বিবি ছিল। মেয়েটি নষ্ট চরিত্রের। ভীষণ কামুক।

সওদাগর যখন বিদেশে যেত ওর বিবি কাম-কাতর হয়ে সুন্দর সুপুরুষ ছোকরা খুঁজে বেড়াতো।

একবার সওদাগর বিদেশে গেলে বিবিটা ঐ রকম একটি তরুণকে সন্ধান করে বাড়িতে নিয়ে আসে। সারা দিন রাত তার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ রতি রঙ্গ করে কাটাতে থাকে।

একদিন ঐ ছেলেটি এক বিকৃত-কাম বৃদ্ধ শেখের পাল্লায় পড়ে। বৃদ্ধের প্রস্তাবে ছেলেটি ক্ষেপে যায়। এবং কিল চড় লাথি ঘুষি মেরে তাকে ঘায়েল করে ফেলে। বুড়োটা কোতোয়ালের কাছে নালিশ করে। কোতোয়াল ছেলেটিকে ধরে এনে ফাটকে ভরে রাখে।

সওদাগর-বিবি খবর পায়, তার নাগর কয়েদ হয়েছে। রাগে সে ফুঁসে ওঠে। সটান চলে আসে কোতোয়ালীতে।

কোতোয়াল তখন তার দপ্তরে কাজে ব্যস্ত ছিল। সওদাগর-বিবিকে দেখে সে লোলুপ হয়ে ওঠে। মেয়েটির দেহে ঢলঢলে ভরা যৌবন। রিরংসার আগুন জ্বলে ওঠে শরীরে। জিজ্ঞেস করে, কী চাই তোমার ?

সওদাগর-বিবি সালাম জানিয়ে বলে, কোতোয়াল সাহেব, আপনার ফাটকে আমার ভাই আটক হয়ে আছে। একটা বুড়ো শেখ ওর নামে মিথ্যা নালিশ করেছে আপনার কাছে। ও কিছু দোষ করেনি। মেহেরবানী করে আপনি ওকে ছেড়ে দিন। আমার বাড়ির সে-ই একমাত্র কর্তাব্যক্তি। ওকে যদি আপনি কয়েদ করে রাখেন আমার সংসার অচল হয়ে যাবে।

কতোয়াল বললো, ঠিক আছে তোমার ভাই যাতে ছাড়া পায়, আমি দেখব। আমি এখন অন্য কাজে খুব ব্যস্ত। তুমি আমার হারেমে অপেক্ষা কর। এদিকের কাজ কাম শেষ করে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করছি।

সওদাগর-বিবি ভাবলো, বুড়োটার প্রাণে বসন্ত জেগেছে। কিন্তু সে-ও জাঁহাবাজ মেয়ে। তাকে কাবু করা অত সহজ নয়। মুখে বললো, কোতোয়াল সাহেব, আপনার হারেমে এসব হবে না। আপনি যদি দয়া করে আমার বাড়িতে আসেন, আমি নির্ভয়ে সব খুলে বলতে পারি আপনাকে।

—বেশ তো, কোথায় তোমার বাড়ি ?

মেয়েটি বলে, চাঁদনী বাজারের পিছনে একটাই লাল রঙের বাড়ি আছে।

ওইটেই এই বাঁদীর বাড়ি। ঠিক সূর্য ডোবার সময় যদি আসেন খুব ভালো হয়।

কোতোয়াল গম্ভীর হয়ে বলে, ঠিক আছে, তুমি থেকো। আমি ঐ সময়ই যাবো তোমার বাড়ি।

সওদাগর-বিবি কোতোয়ালী থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসে কাজীর বাড়ি। মেয়েটিকে দেখামাত্র কাজীর কামনা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এমন আপেলের মতো গাল, রতিদগ্ধ অধর, উদ্ধত বক্ষ, ভারি নিতম্ব কাজীর বুকে তুফান তোলে। বৃদ্ধ প্রশ্ন করে, কী চাই তোমার? কেউ তোমার ওপর জোর-জুলুম করেছে কিছু?

সওদাগর-বিবি বলে, জী না, আমার ওপরে আবার কে জুলুম করবে। আমি এসেছি আমার নিরপরাধ ভাই-এর খালাসের জন্য।

—খালাস? কেন কী হয়েছে, সে কী, কয়েদ হয়েছে নাকি?

—জী হাঁ, কোতোয়াল তাকে অন্যায় করে ফাটকে ভরে রেখেছে। একটা বুড়ো শেখ আমার ভাই-এর নামে মিথ্যে করে নালিশ করেছিল। কয়েকটা মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করে এনেছিল। কোতোয়াল দু-তরফের সব কথা না শুনেই তাকে বেড়ি পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

কাজী বলে, তোমার সব কথা শোনা দরকার। তুমি এখন আমার হারেমে যাও। তারপর দেখি, এদিকের কাজ কাম সেরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবো। তবে নিশ্চিন্ত থেক, তোমার ভাইকে আমি খালাস করে দেব।

সওদাগর-বিবি বুড়ো কাজীর মতলব বুঝতে পারে। বলে, দেখুন কাজী সাহেব, আপনার হারেমের মেয়েরা আমার অচেনা। সেখানে আমি ঠিক সহজ হতে পারব না। তার চেয়ে আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার বাড়িতে আসেন খুব ভালো হয়।

—কোথায় তোমার বাড়ি?

সওদাগর-বিবি বলে, এই কাছেই চাঁদনীচকে।

বাড়ির ঠিকানা নির্দেশ করে সে বলে, সূর্য ডোবার একটু পরে আপনি আসুন, আমি আপনার জন্যে তৈরি থাকবো।

এই বলে সে আর সেখানে দাঁড়ায় না। চলে আসে উজিরের প্রাসাদে। উজির সাহেব তখন তার সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে মশগুল ছিল। সওদাগর-বিবির কাম-জর্জর মূর্তি দেখে সে মোহিত হয়ে পড়ে।

—তোমার কী চাই?

সওদাগর-বিবি বলে, হুজুর কোতোয়াল আমার ভাইকে অন্যায় করে আটকে রেখেছে। সে আমার সংসারের একমাত্র সহায়। তাকে আপনি মুক্ত করে দিন, এই আমার আর্জি।

উজির ভারিক্কি চালে বলে, এইসব কোতোয়ালগুলোকে আমি শূলে দেব। তা তুমি কিচ্ছু ভেব না, তোমার ভাইকে আমি খালাস করে দেব। এখন এক কাজ কর, আমার অন্দরমহলে গিয়ে অপেক্ষা কর। এদিকের কাজকাম সেরে

তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি।

সওদাগর-বিবি বলে, আমি অতি সাধারণ মানুষ। আপনাদের হারেমে আমার যেতে শরম করছে। তার চেয়ে আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় একবার পায়ের ধুলো দেন, ধন্য হবো।

এর পর সে তার বাড়ির ঠিকানাপত্র জানিয়ে বলে সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক পরে আপনার জন্য আমি পথ চেয়ে বসে থাকবো, হুজুর।

উজির বলে, আচ্ছা দেখি, যাবো।

এর পর সে চলে আসে সুলতানের কাছে। সুলতান তার রূপের আগুনে জ্বলে ওঠেন। সাধারণ ঘরে এমন সুন্দরী যুবতী মেয়ে!

—কী বাছা, কেন এসেছ? কেউ তোমার ওপর অত্যাচার করেছে?

—না জাঁহাপনা, সে-সব কিছু নয়। আমার সংসারের একমাত্র সহায় আমার ভাই। সে এখন ফাটকে।

—ফাটকে? কেন?

—আপনার কোতোয়াল তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে আটক করে রেখেছে। আপনি আমার মা-বাপ—তাকে যদি ছেড়ে দেবার হুকুম না দেন তো অনাহারে মরে যাবো আমি।

এই বলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সুলতান বলেন, আহা-হা, কেঁদো না, আমি সব সুরাহা করে দিচ্ছি। আগে মামলাটা আমাকে শুনতে হবে। তার জন্য কিছু সময় দরকার। তবে আমার কাছে ন্যায্য বিচার পাবে। অন্যায় আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি এখন আমার হারেমে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি সব খোঁজখবর নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি একটু পরে।

সওদাগর বিবি বলে, জাঁহাপনা আমি অতি সাধারণ মেয়ে, সুলতানের হারেমে প্রবেশ করার স্পর্ধা আমার নাই। আপনি যদি মেহেরবানী করে এই গরীবের কুঁড়েঘরে একবার আসেন চিরজীবন আমার কাছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুলতান মনে মনে ভাবেন, সেই ভালো। বলেন, ঠিক আছে, তোমার ঠিকানাপত্র রেখে যাও, আমি যাবো। হ্যাঁ, কখন গেলে তোমার সুবিধে হবে?

সওদাগর-বিবি বলে, আমার ঘরের কর্তা সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক বাদে বাইরে যায়। আপনি তার পরে যে-কোনও সময় আসুন, জাঁহাপনা। বাঁদী প্রস্তুত থাকবে।

সুলতানের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সে এক ছুতোরের দোকানে আসে। ছুতোরটা ইয়া মোটকা। (গোল গোল চোখ দুটো ওর উদ্ধত বুকের ওপর গেঁথে রেখে জ্বল জ্বল করে তাকায়, আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে।)

—হ্যা গো দোকানী, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমার রসুই ঘরের হাঁড়ি পাতিল থালাবাসন রাখার একটা বেশ বড়সড় আলমারী দরকার। বানিয়ে দিতে পারবে?

লোকটা বলে, অত তাড়াতাড়ি অত বড় একটা আলমারী কী বানানো যায়, মালকিন। তা আমার দোকানে একটা তৈরি আছে, দেখুন যদি পছন্দ হয়।

সওদাগর-বিবি বলে না ও-সব জিনিস চলবে না। আমার আলমারী প্রমাণ

সাইজের হওয়া চাই। ভিতরে পাঁচখানা তাক থাকবে। এবং প্রত্যেকটা তাকের জন্য আলাদা কুলুপ থাকা চাই। দাম যা লাগে আমি দেব। চাই কি আগামও নিয়ে নিতে পার। কিন্তু সূর্য ডোবার আগে আমার চাই।

আগাম দাম পাওয়া যাবে শুনে ছুতোর উৎসাহিত হয়ে বলে, ঠিক আছে, বিকেলেই পেয়ে যাবেন। তা মাপটাপগুলো কী হবে, একবার কথা বলা দরকার। অন্য খদ্দের-পাতির ভিড় হবে, আপনি বরং আমার দোকানের পিছনের দিকের ঐ খুপরিতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

—হাতুড়ি বাটালি চালিয়ে চালিয়ে তোমার মাথাটা দেখছি একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে ছুতোর। দেখছো না আমার এই জমকালো সাজ-পোশাক, তোমার ঐ ময়লা নোংরা খুপরিতে বসবো কোথায়। তার চেয়ে তুমি আমার বাড়িতে চলে এস। একটু রাত করে। তারপর সারারাত ধরে তোমাকে নিয়ে মাফ-জোকের হিসেব করবো 'খন। তবে হ্যাঁ আলমারীটা কিন্তু আজ বিকেলেই চাই। এবং তার মধ্যে পাঁচটা তাক থাকবে। এবং প্রত্যেকটা তাকের আলাদা আলাদা তালা থাকবে।

ছুতোর বলে, সে আপনি কিছু ভাববেন না মালকিন। আপনার ফরমাশ মতো বানিয়ে বিকেলের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব লোক দিয়ে।

সওদাগর-বিবি বলে, শুধু আলমারী পাঠিয়ে দিলেই চলবে না ছুতোর, তোমাকে নিয়ে আজ সারারাত ধরে মাফজোকের হিসেব করবো, মনে থাকে যেন। ঠিক রাত দশটায় যাবে আমার বাড়িতে। একটু কাগজ দোয়াত কলম দাও, ঠিকানাটা লিখে রেখে যাই—নইলে তুমি আবার ভুলে যেতে পার।

সূর্য ডোবার অনেক আগে দোকানের মুটেরা মাথায় করে নিয়ে এল সেই আলমারী। সওদাগর-বিবি লোকগুলোকে বড় ঘরের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিতে বললো।

তাকগুলো সব গুণে দেখলো সে। হ্যাঁ, পাঁচটাই আছে। তাকগুলো ভালো করে আর পরীক্ষা করে দেখার অবকাশ হলো না; দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

দরজা খুলে সওদাগর বিবি কোতোয়ালকে স্বাগত জানায়, আইয়ে—আইয়ে জনাব, বইঠিয়ে।

মেঝের ওপরে বিরাট গালিচা পাতা হয়েছে। তার ওপর কাপড় পেতে নানা রকম উপাদেয় খানাপিনা শরাব থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে সওদাগর-বিবি।

কোতোয়াল তো দেখে মহা খুশি। শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে দেয় মেয়েটি। কোতোয়াল মৌজ করে চুমুক দেয় পেয়ালায়। নেশা একটু ধরতেই দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে যায় সওদাগর-বিবিকে। কিন্তু মেয়েটি ভীষণ সেয়ানা, কায়দা করে পাশ কাটিয়ে সরে যায়।

—আহা, অত তাড়া কিসের, ছটফট করছেন কেন? আপনার ঐ সাজ-পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে যে। আমি আপনাকে পরার জন্য ছোটখাটো পোশাক এনে দিচ্ছি। ওটা পরুন। তারপর সারারাত ধরে যত ইচ্ছে ফুর্তি করুন।

একটা লাল ডুরে কাটা ফতুয়া আর একটা আঁটোসাঁটো ল্যাঙোট এনে সে

কোতোয়ালের হাতে দেয়।

—নিন, পরে ফেলুন। যখনকার যে-সাজ, তা না পরলে চলবে কেন।

কোতোয়াল ভাবে—মেয়েটা খানদানি বেবুশ্যা। কায়দাকেতায় একেবারে দুরস্ত। নিজের পোশাকটা খুলে ফেলে সে ঐ লাল ডুরেকাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট পরে পালোয়ান সেজে ফরাসে এসে বসে।

সবে আর এক পেয়ালা ভরে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়েছে, এমন সময় জোরে জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ আসে।

মেয়েটার চোখে মুখে কপট আতংক ফুটে ওঠে, সর্বনাশ। এ সময়ে তো তার ফেরার কথা নয়—

কোতোয়াল দাঁড়িয়ে পড়ে তিড়িং তিড়িং ঘরে লাফাতে থাকে, কে? কে? কে এসেছে?

মেয়েটি ভয়ার্ত কণ্ঠে ক'কিয়ে ওঠে, আমার স্বামী—

—তা হলে কী হবে? এখন উপায়?

মেয়েটি ঝটপট আলমারীটার নিচের তাক খুলে বলে, আর দেরি করবেন না, আসুন, এই তাকটায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ুন। আমি বন্ধ করে দেব।

কোতোয়াল আর একটি কথা বলে না, তাকটার মধ্যে কু'কড়ে শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে কুলুপ এ'টে দেয়।

এদিকে কাজী সাহেব ঘন ঘন কড়া নেড়েই চলছিল। মেয়েটা দরজা খুলে মাথা নুইয়ে সালাম জানায়, আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।

খানাপিনার এলাহী ব্যবস্থা দেখে কাজী খুব পুলকিত হয়। মেয়েটি সুরার পেয়ালা পূর্ণ করে কাজীর সামনে রাখে। অল্পক্ষণের মধ্যে ফুরফুরে গুলাবী নেশায় চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে কাজীর। ঈষৎ জড়ানো কণ্ঠে চে'চিয়ে ওঠে, কোন্ কুত্তার বাচ্চা কোতোয়াল তোমার ভাইকে আটক করে রেখেছে, আমি তাকে দেখে নেব। নাও, এখন কাগজ কলম নিয়ে এসো তো দেখি, আমি বেকসুর খালাসের ফরমান লিখে দিচ্ছি। এটা দেখালেই ওকে তক্ষুনি ছেড়ে দেবে।

মেয়েটি দোয়াত কলম আর কাগজ এনে দেয়। কাজী ফাটকের হাবিলদারকে হুকুমনামা লিখে দেয়। তারপর হাত বাড়ায় মেয়েটির দিকে, এবার তাহলে আমার বুকে এসো, মেরিজান।

মেয়েটি দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতভাবে বলে, দাঁড়াও বুড়ো, তোমার জান আজ আমি বের করে দিচ্ছি। মুখে মধু ঢেলে তেরছা নজর হেনে বলে, আহা, বয়স হলে মানুষের আর ধৈর্য-টৈর্য থাকে না। আমি কি এই সাঁঝ রাতেই ফুরিয়ে যাচ্ছি নাকি। দাঁড়ান, আগে আপনাকে সাজ পোশাক পরাই—তার পরে তো সুরত রঙ্গ জমবে।

কাজী অবাক হয়, সাজ-পোশাক? কেন, আমি তো বেড়ে সাজ-পোশাক পরে আছি—

কথাগুলো এবার বেশ জড়ানো। মেয়েটি বলে, ওসব আমিরি পোশাক

এখানে চলে না, জনাব। যেখানকার যা, তাই করতে হয়। এই নিন আপনার ফতুয়া আর ল্যাঙোট, প'রে পালোয়ান সাজুন। না হলে লড়বেন কী করে?

সবুজ রঙের ডুরেকাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট। নেশায় বুঁদ হয়ে ঢুলুঢুলু চোখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখতে থাকে।

—বাঃ, বহুৎ আচ্ছা চমৎকার দেখতে তো? তা এ পোশাক না পরলে বুঝি এখানে কাজ কাম করা যায় না?

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়োকে বক দেখায়, না কাজী সাহেব, আমাদের কাছে এলে এই পোশাকই পরতে হয়। এতটা বয়স হলো, কেন কখনও মহল্লায় কারো ঘরে কী রাত কাটাননি কখনও? জানেন না সব কেতা-কানুন?

ওই মদের নেশাতেও বুড়ো কাজী দু-কানে আঙুল গুঁজে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে—তোবা তোবা! ওসব কথা শোনাও পাপ।

এর পর সে নিজের সাজ-পোশাক খুলে ফেলে ঐ ফতুয়া আর ল্যাঙোটটা পরে নেয়।

এই সময় অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে কড়া নাড়ার আওয়াজ ওঠে। মুহূর্তে কাজী সাহেব সজাগ স্বাভাবিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রেখে তাকায়, কে, কে এসেছে? কড়া নাড়ছে, না?

মেয়েটিও ভীত চকিত ভাব দেখায়, সর্বনাশ হয়েছে। এতো আমার স্বামীর কড়া নাড়ার শব্দ। কিন্তু এসময়ে তো তার আসার কথা নয়?

কাজী লাফিয়ে ওঠে, ওরে বাব্বা, এখন কী উপায় হবে।

মেয়েটি ওকে শান্ত করে ধৈর্য ধরুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আঠারোতম রজনী ঃ
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলমারীর দ্বিতীয় তাকটা খুলে বলে, চটপট এটার ভিতরে ঢুকে হাত পা গুটিয়ে কোনরকমে শুয়ে পড়ুন।

কাজীকে তালা বন্ধ করে সে তৃতীয় অতিথি উজিরকে স্বাগত জানাতে দরজার কাছে যায়।

—আসুন হুজুর, আমার কী পরম সৌভাগ্যের দিন আজ। আসুন, আসন গ্রহণ করে ধন্য করুন আমাকে।

—বাঃ, এতো দেখছি বহুৎ খানদানী ব্যাপার। তা কতদিন ধরে এ কারবার?

—হুজুরের কী আমাকে দেখে খুব বয়স্কা বলে মনে হচ্ছে?

উজির নিজের ভুল বুঝতে পারে, আরে না না, আমি সে-সব ইঙ্গিত করিনি, কিছু মনে করো না। তুমি তো একেবারে ডাগর ডাঁসা। গুলাবের কুঁড়ি। তোমাকে বয়স্কা বলবে কে?

সওদাগর-বিবি পেয়ালা ভরে উজিরের মুখে তুলে ধরে, নিন, চুমুক দিন, হুজুর।

উজির ওর পেয়ালা শুদ্ধ নরম হাতখানা মুঠি করে চেপে ধরে, তা চুমুকটা কোথায় দেব—পেয়ালায়, না পানিতে।

বুড়ো উজির রসিক আছে বটে। মেয়েটি বলে, আমাকে পান করে কী সুরাপানের নেশা মিটাব হুজুরের।

উজির শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে, সুরায় কতটুকু নেশা, কতক্ষণই বা থাকে। কিন্তু তোমার নেশায় মাতাল হতে পারলে জীবনটা সুধায় সুধায় ভরে যেত, মেরি দিল!

মেয়েটি নীল রঙের ডুরে কাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট এনে বলে, নিন, হুজুর আপনার সাজ-পোশাক ছেড়ে এটা পরে নিন। আমাদের ঘরে এলে এই পোশাকই পরতে হয়—রেওয়াজ।

ফতুয়া আর ল্যাঙোটটা পরে সবে উজির সাহেব সওদাগর বিবিকে জড়িয়ে ধরতে যাবে এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে দু পা পিছিয়ে যায়, কে?

মেয়েটি বলে, বুঝতে পারছি না—এ সময় তো আমার স্বামীর ফেরার কথা নয়।

—তোমার স্বামী? সর্বনাশ তবে উপায়?

—দাঁড়ান, আমি ব্যবস্থা করছি।

আলমারিটার তৃতীয় তাকটা সে খোলে, মেহেরবানী করে এর মধ্যে আপনি ঢুকে পড়ুন। বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। এখুনি ওকে আমি বাজারে পাঠিয়ে দেব একটা সওদা কিনে আনার ছুতোয়।

উজির মুখ কাচুমাচু করে, এর মধ্যে আমার এই দশাসই শরীরটা ঢুকবে?

—খুব ঢুকবে। হাত পা গুটিয়ে একটু কষ্ট করে শুয়ে পড়ুন। আর দেরি করবেন না হুজুর, ওদিকে শুনছেন তো কেমন কড়া নাড়ছে সে।

উজিরকে তালা বন্ধ করে সে সুলতানকে বরণ করতে যায়। দরজা খুলেই আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়।

—আসতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা। আমি ভাগ্যবতী নারী। ধন্য হলাম।

সুলতান ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। মেয়েটি বলে, গরীবখানায় যখন এলেনই, একবার অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন, জাঁহাপনা।

সুলতান বলেন, আহা-হা অত ব্যস্ত হবার কী আছে। বসছি। এসেছি যখন নিশ্চয়ই বসবো, খাবো, পান মৌজ করবো। আর শোন, এটা প্রাসাদ দরবার নয়। এখানে শুধু তুমি আর আমি আছি। অত জাঁহাপনা টাঁহাপনা, কেতা কুর্নিশ করার দরকার নাই। তা হলে মজাটাই মাটি হয়ে যাবে, বুঝলে?

—বুঝেছি, জাঁহাপ…প…

হো হো করে হেসে ওঠেন সুলতান। হেসে ওঠে মেয়েটিও—খিল খিল করে। সেই হাসির ঝরনায় ঝরে ঝরে পড়তে থাকে আনন্দের মুক্তো।

মেয়েটি বলে, আপনি এত সহজ সাধারণ, ভাবতে পারিনি। বড় ভাল লাগছে।

—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, সুন্দরী—

—খু-উ-ব।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো কুড়িতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মদের পেয়ালা পূর্ণ করে দেয় মেয়েটি। সুলতান একচুমুকে শূন্য করে দেন। আবার সে ঢেলে দেয়, আবার শূন্য হয়। এইভাবে এক এক করে অনেক পেয়ালা উজাড় করে দেন সুলতান।

মেয়েটি তখন একটা হলুদ রঙের ডুরেকাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট এনে পরতে দেয় সুলতানকে। বলে, এই নিন, এটা পরুন, পরতে হয় এখানে।

সুলতান বলেন. বাঃ, বেড়ে বাহারী তো। ঠিক আছে এইটে পরেই তোমার সঙ্গে আজ মধুযামিনী যাপন করা যাবে, কেমন ?

নেশার ঘোরে টলে টলে পড়তে যায় সুলতান। কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে পোশাকটা পরতে পারেন।

এই সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা যায়! সুলতান চমকে ওঠেন। কে ?

মেয়েটি না বোঝার ভান করে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমার স্বামী তো এইমাত্র বাইরে গেলেন। এর মধ্যে এত সকাল সকাল তো তার ফেরার কথা নয়। কিন্তু এ কড়া-নাড়ার আওয়াজ তো তারই।

সুলতানের নেশা জল হয়ে যায় নিমেষে।

—এখন তাহলে কী হবে ?

—আপনি ভাববেন না, আমি একটা উপায় বের করছি।

আলমারীর চতুর্থ তাকটা সে খোলে।

এই তাকটায় উঠে কোনও রকমে গুটি শুটি মেরে শুয়ে পড়ুন, জাঁহাপনা। তাড়াতাড়ি করুন আর দেরি করবেন না।

সুলতানকে তালা বন্ধ করে সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ছুতোর দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে।

—বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন তো, মালকিন।

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কিন্তু তোমার কী আক্কেল, বলতো ?

—কেন, কী হলো ?

—এই কী তোমার তাক বানানো হয়েছে, একখানা থালা-বাসন ঢোকাতে পারছি না।

আলমারীর কাছে গিয়ে ওপরের তাকের পাল্লাটা খুলে ফেলে সে। ছুতোরটা বলে, এত বড় তাক, আমার মতো এই মোটকা শরীরটাও আস্ত ঢুকিয়ে দিতে পারি, আর সামান্য থালাবাসন ঢুকবে না বলছেন ?

মেয়েটি মুচকি হাসে, কী বললে, তোমার এই নাদুস-নুদুস দেহটা ওর মধ্যে এঁটে যাবে ? নাঃ, হাতুড়ি বাটালি পিটে পিটে তোমার মাথাটা একেবারে নিরেট

হয়ে গেছে। এক ফোঁটা মগজ যদি থেকে থাকে, আচ্ছা ঢুকে দেখাও দেখি, কেমন করে আঁটাতে পারো তোমার এই নধর বপুটা।

নিরেট ছুতোর হাঁদার মতো উঠে বলে, এই দ্যাখো।

অনায়াসেই সে ওপরের তাকে ঢুকে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কুলুপ এঁটে দেয়।

আর এক মুহূর্ত দেরি করে না সওদাগর-বিবি। কোতোয়ালের কয়েদখানায় চলে যায়। কাজীর চিঠিখানা দেখাতেই সঙ্গে সঙ্গে তার নাগরকে খালাস করে দেয় তারা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থকে।

ছয়শো একুশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

নাগরকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি আবার ফিরে আসে তরে নিজের ঘরে। কীভাবে ঐ পাঁচজন কামুককে আলমারীর ভিতরে পুরে ওদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছে, তার মজাদার কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে শোনাতে লাগলো তার নাগরকে।

—এই সব মাথা মোটা মানুষগুলো এমনই হাঁদা, কামের তাড়নায় একেবারে ভাদ্দর মাসের কুত্তার মতো ক্ষেপে উঠেছিল। এখন দেখ, বাছাধনরা কেমন লেজ গুটিয়ে সব শুয়ে আছে আলমারীটার মধ্যে।

ঘর ফাটিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে ওরা।

তারপর মৌজ করে খানা, পিনা রতিরঙ্গ করে দুজনে। সারারাত ধরে ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে নানারকম ব্যসন বিহারে মত্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে মেয়েটি ঘরের সব ভারি ভারি আসবাবপত্রগুলো বিক্রি করে দেয়। এবং দামী দামী বসন আভরণগুলো একটা প্যাঁটরায় বোঝাই করে ঐ সুলতানের মুলুক ছেড়ে অন্য এক সুলতানের মুলুকে রওনা হয়ে যায়।

আলমারীটা কিন্তু ঐ শূন্য ঘরের মধ্যেই একলা দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার ভিতরে পাঁচটি প্রাণী পচা গরমে সিদ্ধ হয়ে প্রায় আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকে।

দুই দিন দুই রাত্রি কাটার পর সওদাগর ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু তার বিবি বা ঘরের সমানপত্র কিছুই দেখতে না পেয়ে অবাক হয়। ভাবে, নিশ্চয়ই ডাকাতরা জিনিসপত্রের সঙ্গে তার বিবিকে লুঠ করে নিয়ে গেছে।

এমন সময় সওদাগর আলমারীর ভেতর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে। ওরে বাবা, এ আবার কী ভুতুড়ে কাণ্ড। হাঁক ডাক করে সে পাড়া-প্রতিবেশিদের সবাইকে জড় করে ফেলে।

—কী ব্যাপার ? কী হয়েছে সওদাগর সাহেব ?

সওদাগর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে, কোনও রকমে বলতে পারে, জিন—জিন ঢুকেছে আমার ঘরে।

—কোথায় ?

সে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ আলমারীটার ভেতর থেকে মানুষের গোঙানীর মতো আওয়াজ আসছে।

সকলে কান পেতে শুনলো, ঠিকই ভেতরে যেন অনেকগুলো লোক কাতরাচ্ছে।

পড়শীরা পরামর্শ দিল, এক কাজ কর, আগুন লাগিয়ে দাও। পুড়ে সাফ হয়ে যাবে—তা সে জিন আফ্রিদি যাই থাক।

এইবার উজির চিৎকার করে ওঠে, শোন ভাই সব, আমরা কেউ জিন দৈত্য নই, কোনও ভয় নাই। পাল্লাগুলো খুলে দাও। আমরা সকলেই মানুষ। দোহাই তোমাদের পুড়িয়ে মেরো না।

এর পরের ঘটনা কী—সবিস্তারে বলার কোনও প্রয়োজন আছে জাঁহাপনা? কোতোয়াল, কাজী, উজির, সুলতান, ছুতোর সবাই লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারে না কারো দিকে।

সওদাগর যুবকটি সুলতান উজিরের এই দশা দেখে নিজেও বিশেষ লজ্জিত হয়। পড়শীদের সবাইকে বিদায় করে দিয়ে সকলকে নিজের নিজের পোশাক এনে দেয় সে।

এরপর সুলতান সওদাগর-যুবককে তার দরবারের সহকারী উজিরের পদে পদে বহাল করেছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বাইশতম রজনী:

পরদিন শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে:

খলিফা হারুন অল রসিদের সময় বাগদাদ শহরে আবু অল হাসান নামে খাম-খেয়ালী প্রকৃতির একগুঁয়ে এক যুবক বাস করতো। এতটা বয়স হলো? শাদী নিকা করার দিকে তার কোনও খেয়াল নাই। পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে ক্বচিৎ মেলা-মেশা করে। সারাটা দিন একা একা সে ঘরের মধ্যে বসে বসে কাটায়। এবং বিকেল হতেই শহরের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে বড় রাস্তার ওপর যে সাঁকোটা আছে সেই সাঁকোর ওপরে গিয়ে বসে। সারাটা বিকেল সন্ধ্যা ওখানেই বসে বসে পথচারীদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করে। নতুন কোনও মুসাফির বাগদাদ শহরে ঢুকতে যাচ্ছে বুঝতে পারলেই সে সেধে তার সঙ্গে আলাপ করতো। এবং বলতো, আজকের রাতটা যদি মেহেরবানী করে আমার ঘরে মেহমান হন—কৃতার্থ হবো আমি।

তার প্রস্তাবে অনেকেই হয়তো রাজি হতো না, কিন্তু একজন না একজন

হতোই। আর এই একজনকেই তার দরকার প্রতি রাতের জন্য। এবং সারা রাত ধরে অতিথির আপ্যায়নে তিলমাত্র ত্রুটি করতো না সে। নানারকম উপাদেয় খানা, ভালো ভালো দামী মদ এবং তার ঘরোয়া মেজাজের সান্নিধ্য পেয়ে সকলেই মুগ্ধ হতো। কিন্তু সকাল না হতেই সে সেই গত রাতের মহামান্য অতিথিকে এক কথায় বিদায় করে দিত।

—দেখুন কিছু মনে করবেন না। আমি কোনও মেহেমানকেই এক রাতের বেশি সময় আপ্যায়ন করি না। এবার আপনি শহরের কোনও সরাইখানায় চলে যান।

গতকাল রাতে যাকে বাদশাহী কেতায় সম্মান দেখিয়েছে তাকেই সকাল বেলায় এইভাবে বিদায় করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না সে। লোকে বলে, ছেলেটার মাথার ছিট আছে।

এমন ঘটনাও হামেশাই ঘটে, সারারাত মহা সম্মানে রাখার পর যখন কোনও মুসাফির সরাইখানায় চলে যায় এবং ঘটনাক্রমে যদি পথে-ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তবে আবু অল হাসান মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। চিনেও তাকে চিনতে পারে না—চিনতে চায় না।

তার এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণের কোনও সদর্থ করতে পারতো না কেউ।

এইভাবে দিন কাটছিল। প্রতিদিন সে শহর-প্রত্যন্তে সেই সাঁকোর ওপর গিয়ে বসে। প্রতি রাতেই কোনও না কোনও মুসাফিরকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এবং যথারীতি সারারাত ধরে তার সেবা পরিচর্যা করে পরদিন সকালে বিদায় করে দেয়।

একদিন অবু অল হাসান ঘটনাক্রমে খলিফা হারুন অল রসিদকে মুসাফির ভ্রমে ঘরে নিয়ে আসে।

খলিফা মাঝে মাঝে শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে যেতেন তাঁর সালতানিয়তের হাল-চাল প্রত্যক্ষ করতে। সেদিন তিনি সেই রকম এক সফর শেষ করে সন্ধ্যাবেলা শহরে ফিরছিলেন। আপনারা জানেন, খলিফা যখন গোপনে বাইরে বেরুতেন, তিনি কোনও না কোনও ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতেন। যাতে তাঁকে অন্য কেউ চিনতে না পারে। কারণ, মনে করতেন, সাধারণ মানুষ খলিফাকে সশরীরে সামনে দেখলে সমীহ শ্রদ্ধা ভক্তি ভয় করে তাদের আসল অভাব অভিযোগের কথা গোপন রাখবে।

সেদিন খলিফা মশুলের এক সওদাগরের ছদ্মবেশে সেজে শহর সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে সন্ধ্যায় প্রাসাদে ফিরে আসছিলেন। প্রবেশ দ্বারের মুখে সেই সাঁকো পার হতে গিয়ে তিনি আবু অল হাসানের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

আবু অল হাসান নিজেই হাত জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ায়, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে মশুল থেকে আসছেন?

খলিফা মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলেন, ঠিকই ধরেছ। কিন্তু কেন, কী চাই তোমার?

—আপনি কী শহরেই কাটাবেন আজকের রাতটা ?

—সে তো অবশ্যই।

—এখানে কী আপনার নিজের কোনও বাড়ি-ঘর বা আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে, না সরাইখানায় উঠবেন বলে মনে করেছেন।

যুবকের এবম্বিধ অদ্ভুত প্রশ্নবাণে খলিফা কিছুটা বিরক্ত বোধ করেন। আবার কৌতূহলও জাগে। এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে কেন? ছেলেটির কী মতলব? উদ্দেশ্য যত খারাপই হোক, খলিফা কখনও কাউকে দেখে ভয় পান না, বা বিচলিত হন না। এমন অনেক কাহিনী আপনাদের শোনা আছে অবশ্যই, এইভাবে ছদ্মবেশে বেড়াতে বেড়াতে অনেক সময় তিনি প্রাণ সংশয় বিপদের গুহায় ঢুকে পড়েছেন। তারপর নিজের বুদ্ধির কৌশলে এবং আল্লাহর অপার করুণায় অবশেষে প্রাণে রক্ষা পেয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন।

এই যুবক কোনও ঠগ প্রতারক নয় তো? কী এর উদ্দেশ্য? এত হাঁড়ির খবরই বা জানার আগ্রহ কেন? যাই হোক, ওতে তাঁর কিছু যায় আসে না। খলিফা বলে, না—মানে নিজের বাড়ি-ঘর আমার মশুলে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে মাঝে মাঝে আসতে হয়। চেনা দু-একটা সরাইখানা আছে, সেখানেই উঠি। দু-একদিন থাকি, কাজকাম সমাধা করে আবার দেশে ফিরে যাই। কিন্তু এতো কথা জানতে চাইছ কেন, বাবা?

আবু অল হাসান বিনয় বিগলিত কণ্ঠে করজোড়ে মিনতি জানায়, যদি মেহেরবানী করে একটা রাতের জন্য এই গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দেন, ধন্য হবো আমি! এ বান্দা আজকের রাতটা আপনাকে সেবা করতে চান।

বড় অদ্ভুত মনে হয়। আজকালকার দিনে এই বয়সের ছেলের মনে এত ধর্মভাব বড় একটা দেখা যায় না। খলিফা সানন্দে সম্মত হয়ে যায়।

—ঠিক আছে, চল, তোমার দৌলতখানাতেই যাওয়া যাক। এই বিদেশে তোমার মতো একজন সঙ্গী পেয়ে রাতটা আমার কাটবে ভালো।

আবু অল হাসানের মা চমৎকার চমৎকার মুখরোচক খানা পাকাতে পারেন। সে রাতেও সে অতিথির জন্য অনেক নতুন নতুন খাবার তৈরি করলো। মোরগ মোসাল্লাম, ভেড়ার মাংসের কাবাব। হাঁসের দোপিঁয়াজি, পায়রার মাংসের ঝোল প্রভৃতি। খুব পরিতৃপ্তি করে আহারপর্ব সমাধা করলেন খলিফা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চব্বিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

মুখ হাত ধুয়ে এসে বসতে, হাসানের মা আঙ্গুর বেদানা আপেল প্রভৃতি নানারকম ফলের রেকাবী এনে সাজিয়ে দেয়। দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন।

এর পর দামি পেয়ালায় দুষ্প্রাপ্য মদ ঢেলে খলিফার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনি তো জানেন, মদ কখনও একা একা খেয়ে মজা পাওয়া যায় না। আপনাকে সঙ্গদান করার জন্যেও অন্ততঃ আমাকে এক পেয়ালা খেতে হবে, জনাব। শুধু একটি রাতের জন্য। মদ পেটে না পড়লে মানুষের ওপরের ভদ্রতা সৌজন্যের কঠিন আবরণটা সরিয়ে আসল চেহারা চরিত্র খুলে মেলে ধরা যায় না। আর তা যদি না পারা যায় জীবনে আনন্দের সন্ধানও সে পায় না কখনও।

খলিফা ভাবলেন, ছেলেটির পেটের কথা জানতে হলে ওর দোসর হতে হবে। মদ পেটে না পড়লে মনের লুকানো কথা টেনে বের করা যাবে না। শুধু এই কারণেই খলিফা বললেন, দাও খাবো।

ধীরে ধীরে সরাবের ফুরফুরে নেশা জমে ওঠে। খলিফা বললেন, আচ্ছা আবু অল হাসান, আমরা একসঙ্গে বসে নুন রুটি খেলাম, তাহলে আমি তোমার দোস্ত তা স্বীকার কর তো ?

হাসান বলে, আলবাত, আজ রাতে আপনি আমার মহামান্য অতিথি বন্ধু—পরমাত্মীয়।

—তা হলে তোমাকে একট কথা জিজ্ঞেস করি ?

—একশোবার, আমি আপনার গোলাম, জনাব। যা হুকুম করবেন, আমি জান কবুল করে তা করতে বাধ্য।

—আরে না না, ওসব কিছু করতে হবে না। তুমি আমার একটা ছোট্ট কথার জবাব দাও তো। তুমি বললে প্রত্যেক রাতে আমার মতো একজন মুসাফিরকে তুমি অতিথি করে ডেকে এনে প্রভূত আদর যত্ন সম্মান কর। এবং তা যে সত্যি সত্যিই কর তার প্রমাণ তো আমি নিজেই পেলাম। হয়তো শুনলে স্তাবকের মতো মনে হতে পারে আমাকে, তবু নির্দ্বিধায় বলছি, এত সৌজন্য, এত আদর আপ্যায়ন, এমন প্রাণ ঢালা দরদ, মিষ্টি ব্যবহার কখনও আমি পাইনি কোথাও। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন এইসব ? কী কারণে ? তোমার যা বয়স তাতে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যে কর, তা তো ভাবতে পারছি না। নিশ্চয়ই এর পিছনে অবাক করার মতো কোনও কাহিনী আছে। আর সেই কাহিনীটাই আমি শুনতে চাই। যদি আপত্তি না থাকে, বল হাসান।

হাসান বলে, কাহিনী একটা অবশ্যই আছে। তবে অবাক করার মতো নয়। বলতে পারেন—শিক্ষামূলক।

আপনি তো শুনেছেন আমার নাম আবু অল হাসান। আমার বাবা এই শহরের এক বিত্তবান বণিক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি যথেষ্ট ধন-দৌলত রেখে গিয়েছিলেন আমার জন্যে। আমার বাবা স্বপ্রতিষ্ঠিত সওদাগর ছিলেন। জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে উত্তরকালে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এই কারণে খুব ছোট থেকে কড়া শাসন এবং দারুণ কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে আমাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তিনি। বাবার জীবদ্দশায় ভোগ-বিলাস করতে কী বোঝায় আদৌ তার স্বাদ পাইনি। বিলাস-ব্যসন তাঁর চোখে বিষ ছিল। তা বলে তিনি যে আমাকে খেতে পরতে দিতেন না, তা নয়। প্রয়োজনের

সবটাই মেটাতেন, কিন্তু ভোগ-লালসার বস্তু থেকে শত হাত সরিয়ে রাখতেন আমাকে।

এই অতৃপ্ত বাসনা অস্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ করে, ছোটবেলা থেকে বঞ্চিত হওয়ার শোধ তুলেছিলাম। কিন্তু সে প্রতিশোধ আমার নিজের ওপরেই নেওয়া হয়েছিল, তখন বুঝিনি, পরে হাড় হাড়ে বুঝেছিলাম।

বাবা মারা যাওয়ার সল্পকালের মধ্যে আমার সমস্ত সম্পত্তিকে দুই রূপে রূপান্তরিত করে ফেললাম। কিছুটা সোনাদানা হীরে জহরৎ এবং বাকীটা নগদ মোহরে। হীরে চুনী পান্না এবং আভরণ অলঙ্কারাদি সযত্নে বাক্সবন্দী করে, নগদ টাকাটা হাতে নিয়ে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে করে দুহাতে দেদার ওড়াতে লাগলাম। দিনকে দিন খরচের বহরটা এমনই বাড়তে থাকলো যেন মনে হলো, কোন্ আমির বাদশাহর ছেলে আমি। আর এ তো জানেন, পয়সা ওড়াতে চাইলে বন্ধু সাগরেদ অঢেল জুটে যায়।

এইভাবে একটা বছর দারুণ সুখ-সম্ভোগের মধ্য দিয়ে কাটলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে আবিষ্কার করলাম আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। হাতে আর দুটো পয়সাও নাই। এবং দেখলাম এক সময়ের দিবারাত্রের বন্ধুরাও হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে। পথে ঘাটে দেখা হলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

কারো কাছে কিছু ধার চাইলে একটা পয়সা কেউ দেয় না। সেই থেকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, না যথেষ্ট হয়েছে, আর কোনও বন্ধু-বান্ধব নয়, কোনও আত্মীয়-স্বজন কারো সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবো না। একমাত্র অচেনা অজানা বিদেশী মুসাফির ছাড়া কাউকেই আমি ঘরে আশ্রয় দেব না, মনস্থ করলাম।

এরপর আর একটা শিক্ষালাভ করলাম। কোনও মানুষের সঙ্গে, তা সে বিদেশী মুসাফিরই হোক—বেশি মাখামাখি সম্পর্ক গড়ে তুলবো না। যে মুসাফিরকে ঘরে আনবো, তাকেও মাত্র একদিনের জন্য আশ্রয় দেব। কারণ তার বেশি সময় কোনও বিদেশীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা করার অনেক বিপদ আছে। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সখ্যের নিষ্ঠুর বন্ধন-জীবনে সব সুখ-শান্তি ধূলিসাৎ করে দেয়। এই কারণে আপনাকেও আমি কাল সকালে আর আমার বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারবো না। এমন কী এর পরে পথে-ঘাটেও যদি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, কিন্তু মনে করবেন না, আপনাকে আমি আর চিনতে পারবো না।

খলিফা অবাক হয়ে বললেন, তোমার এই অদ্ভুত আচরণ আমার কাছে বড় চমৎকার মনে হচ্ছে। তোমার মতো এই ধরনের একরোখা ছিটিয়াল মানুষ সত্যিই আমি আর দুটি দেখিনি।

যাই হোক, খলিফা বলতে থাকেন, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আশা করি তোমার সোনাদানা হীরে জহরতগুলো, আলাদা করে যা সরিয়ে রেখেছিলে, সেগুলো ইয়ার-দোস্তদের থাবা থেকে বাঁচাতে পেরেছ। এখন প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয়ে নতুন স্বাদের

সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু তুমি যে বললে, আগামীকাল সকালেই তোমার সংগে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, সে কথা শুনে আমি বড় ব্যথিত হলাম, হাসান। আমি যে তোমার এই সৌজন্যের জন্য কিছু প্রতিদান দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো বলছো, কাল সকালে বিদায় নেবার পর তুমি আর আমাকে চিনতেই চাইবে না। তা হলে কথাটা আজ এই রাতেই হয়ে যাক। এক কাজ কর, আমার অনেক আছে, যা তোমার প্রাণ চায়, আমার কাছে চেয়ে নাও তুমি। আমি অত্যন্ত খুশি মনে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করবো। মনে কোন দ্বিধা ক'রো না, হাসান। তোমার যা অভীপ্সা অসংকোচে আমার কাছে বল, আমি তা পূরণ করবো। আল্লাহর দোয়ায় আমি অনেক পয়সার মালিক, ভোগ করার তেমন কেউ নেই, তোমাকে যদি তার খানিকটা দিতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করবো, হাসান।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঁচিশতম রজনীতে ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

আবু অল হাসানের কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। ধীর শান্ত গলায় সে বললো, আজ রাতে আপনার সাহচর্য পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, জনাব। এর চেয়ে বেশি কি আর ধনদৌলত মেলে? আপনি হৃদয়বান ব্যক্তি। আল্লাহর দোয়াতে আপনার আছেও অনেক। এবং খুশি-মনেই আমাকে কিছু দান করতে চান—তাও বুঝলাম। কিন্তু জনাব, আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতা জানাচ্ছি। আমার যা অল্প স্বল্প আছে, তাই নিয়েই মাথা নিচু করে থাকতে চাই। আপনার দাক্ষিণ্য আমার প্রয়োজন হবে না, জনাব।

খলিফা বললেন, খোদার নাম নিয়ে বলছি, তুমি আমার একটা কথা রাখ, ফিরিয়ে দিয়ো না। তা হলে মনে বড়ো দুঃখ পাবো। আর তোমার ঘর থেকে তোমার মেহমান অপ্রসন্ন মনে বিদায় নিক, এটা কী তুমিও চাও?

হাসান দেখলো, মুসাফিরকে নিরস্ত করা যাবে না। ঘরের মেহমান অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে—এও তো হতে পারে না। এতদিন এত পরদেশী এসেছে তার ঘরে, প্রত্যেকেই আদর আপ্যায়নে যথেষ্ট আনন্দিত হয়ে খুশি মনে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু আজ এই বিদেশী বণিক তাকে বড় অসহায় অবস্থায় ফেলেছে। প্রতিজ্ঞা করেছিল, কারো কাছে সে হাত পাতবে না, কারো অনুগ্রহ সে নেবে না। কিন্তু ঘরে মুসাফির মেহমান এলে তাকে প্রাণ দিয়েও খুশি রাখতে হয়—এ-ও তো হাদিসের কথা।

মাথা গুঁজে একভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলো সে। কি যেন চিন্তা করলো। তারপর একসময় বললো, একটা জিনিসই আমার চাইবার আছে, কিন্তু সে কথা শুনলে আপনি হয়তো আমাকে পাগল ভাববেন। যদি কথা দেন, সব শোনার পর ভুল বুঝবেন না, তবেই সে কথা বলতে পারি আপনাকে।

খলিফা হাসেন, এ তো তুমি বড় অদ্ভুত কথা বললে? কথা কী, তা না

শুনে কী কোনও মন্তব্য কেউ করতে পারে। আগে বল শুনি। তারপর দেখা যাবে। তা ছাড়া তোমার সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে খারাপ ধারণা পোষণ করবো কেন? আমি একজন বিত্তশালী বণিক। তোমার আর্থিক চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা অবশ্যই আমার আছে। সেদিক থেকে অসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য রাখতে পার। কথা দিচ্ছি কোনও অসুবিধে হবে না।

হাসান বললো, আমার সমস্যার সুরাহা একমাত্র স্বয়ং খলিফাই করতে পারেন। আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার কাছে আমার নিবেদন, যদি কোনও উপায়ে একটা দিনের জন্য খলিফা হারুন অল রসিদকে আমার এই গরীবখানায় আপনি নিয়ে আসতে পারেন তা হলে চিরকাল আপনার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবো।

একটুক্ষণ চিন্তা করে খলিফা বললেন, খলিফা যদি একদিনের জন্য তোমার গৃহে আতিথ্য নেন, তবে তাঁকে নিয়ে কী করবে তুমি?

হাসান বলে, আপনি মুসাফির, আমাদের এই শহরের হালচাল সম্বন্ধে কতটুকু ওয়াকিবহাল, জানি না। তবে শুনুন, এই বাগদাদ শহরটা ভাড়াটে বাড়ির শহর। হাজার হাজার মানুষ জীবিকার অন্বেষণে এখানে এসে মাথা গুঁজেছে। এখানকার বাড়িওলা শেখগুলো ভাড়াটেদের সংগে কী রকম যে দুর্ব্যবহার করে তার তিক্ত ভুক্তভোগী আমি নিজে একজন। এক অসভ্য জংলী জানোয়ার জুটেছে আমার কপালে। লোকটার কুৎসিত কদাচার দেখে আমার সন্দেহ হয়, আদৌ সে মনুষ্য সন্তান নয়। মনে হয়, গাধা আর ঘোড়ার পালে ওর জন্ম হয়েছিল। সারা দিন রাত ধরে কী অসভ্য খিস্তি খেউড় যে সে চালায় —মনে হবে একটা পায়খানার ঝাঁঝরি। অনর্গল পূতিগন্ধময় নোংরা গালি-গালাজ তার মুখে ঝরেই চলেছে। কোনও সময় একটা ভালো কথা কানে আসে না। লোকটাকে দেখেও মনে হয় একটা জানোয়ার। মোষের মতো বিশাল লোমশ বপু। হায়নার মতো হাঁ। কুলোর মতো দুখানা কান লটপট করে। যখন সে কথা বলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, কার সাধ্য। থোকা থোকা থুথুর ছিটে এসে লাগে গায়ে। মুখখানা দেখতে একেবারে ঠিক বুড়ি বাঁদরীর পাছার মতো। দাঁতগুলো একটাও নাই। সারাটা দেহ যত রাজ্যের বিদঘুটে চর্মরোগে ছেয়ে গেছে তার। লোকটা রাক্ষসের মতো এককাঁড়ি খাবে আর হাসবে।

এই জন্তুটার দুটি সাগরেদ আছে। তারাও দুজনে দুই রত্ন। সব রকমের জাল জুয়াচুরি, বদমাইশি, লোচ্চামি তাদের নিত্যকর্মপদ্ধতির একটা অঙ্গ। দুনিয়াতে এমন কোনও পাপকর্ম নাই—যা তারা করে না। হঠাৎ দুম করে এমন সব মিথ্যা আজগুবি খবর রটিয়ে দিয়ে প্রতিবেশীদের অহেতুক আতঙ্কিত করে তোলে যে, তা আর কহতব্য নয়। সাদাসিধে নিরীহ ভালোমানুষ দেখলে আর তার রক্ষা নাই। যেন তেন প্রকারে তার অনিষ্ট কিছু করবেই। এই হচ্ছে ওদের শিক্ষাদীক্ষা রুচি-প্রকৃতির নমুনা।

ওদের একজন ভৃত্য—বয়সের গাছ পাথর নাই, কিন্তু অদ্যাবধি গোঁফদাড়ি গজায়নি—একেবারে খোজা-মাকুন্দ। লোকটার কী খরখরে বাজখাই গলা।

গাধার ডাকও কানে সওয়া যায়, কিন্তু উফ্, ওই ভোঁদড়ের সুমধুর বাণী আমি আর বরদাস্ত করতে পারি না। খুব সকালে সবাই যখন শেষ ঘুমের সুখাবহ খোয়াড়ীতে আচ্ছন্ন, সেই সময় লোকটা সারা মহল্লার নিথর নিস্তব্ধতা খান খান করে হ্রেষারবে চিৎকার তুলে মেথর মুদ্দোফরাসদের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করে দেয়। আমার তখন এমনও মনে হয়, হাতের কাছে পেলে বোধহয় আমি ওকে খুনই করে ফেলবো। এই নেড়ি কুত্তার বাচ্চাটা মুখে বড় ফট্টাই মারে, সে নাকি সাচ্চা আরব সন্তান। আমি বিশ্বাস করি না। লোকটা ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যে কথা বলে। ওর চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনও আরবের বাসিন্দা বা মুসলমান ছিল না। আসলে ও বেজম্মা বিধর্মী ম্লেচ্ছ—খ্রীস্টান। ওর আসল কারবার হলো হারেমের খোজাদের হাত করে তাদের মালকিনদের কাছে উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরা জোগান দেওয়া। এই রকম দালালী করে কিছু রোজগার-পাতি হলে এক পলকেই জুয়া খেলে তা উড়িয়ে দেয়।

আর এক মক্কেল—একটা ভাঁড়। ভোঁদড়ের মতো চেহারা। হোঁদলের মতো কুতকুতে চোখ। থপ থপ করে পা ফেলে হাঁটে। ওর কাজ কেবল বদখদ বাজে রসিকতা—কাতুকুতু দিয়ে লোক হাসানো। আর বস্তা পচা সস্তা যৌন সুড়সুড়ির কেচ্ছা বলে বিগত-যৌবন বুড়ো হাবড়াদের খানিকটা চাগিয়ে তোলা। ও যখন খুব হাল্কা-চালে এইসব ন্যক্কারজনক কথাবার্তা বলে বাজারের লোক জড়ো করে, আমার মনে হয় লোকটার ঐ তেল-চকচকে টাকটার ওপর একটা মাটির হাঁড়ি ফাটিয়ে দিই।

যদি আমি কখনো ধর্মাবতারের সঙ্গে দেখা করতে পারি এবং তিনি যদি সদয় হয়ে আমাকে কোনও বর প্রার্থনা করতে হুকুম করেন, তবে আপনাকে আমি কসম খেয়ে বলছি, ধন-দৌলত কিছুই চাইবো না তাঁর কাছে। শুধু বলবো, আপনি এই কুত্তার বাচ্চাগুলোর হাত থেকে আমাকে বাচান, আর কিছু আমার বাসনা নাই। আপনার বিচারে যার যা সাজা প্রাপ্য সেই সাজা দিয়ে ওদের বুঝিয়ে দিন, এ শহর শেরিফ আদমীর শহর, বেতমিজ বদমাইশ বেল্লিকদের এখানে জায়গা নাই। আমি বলবো, জাঁহাপনা, আপনি ওদের কেটে কুচি কুচি করে নর্দমায় ফেলে দিন। এ না হলে আমাদের পাড়ায় শান্তি আসবে না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতাশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

সব শুনে খলিফা বলেন, তা হলে তুমি বলতে চাইছো, এইসব অবাঞ্ছিত দুষ্ট লোকদের সমাজে বসবাস করার কোনও অধিকার নাই! কারণ এরা নিরীহ সৎ মানুষের চিত্ত কলুষিত করে। তোমার নালিশ অতি ন্যায়সঙ্গত। এবং খলিফা এইসব অনাচার সমাজ থেকে দূর করার জন্যই বদ্ধপরিকর। এই কারণেই তিনি মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের ঘন সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করেন।

তোমার এই অভিপ্রায় যদি জানতে পারেন, আমার মনে হয়,একদিনের জন্য তিনি তোমার আতিথ্য নিতে গররাজি হবেন না। আমি জানি এই ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তিনি সঞ্চয় করতে চান।

হাসান হো হো করে হেসে ওঠে, না না তার দরকার নাই। সত্যি সত্যিই গুরুগম্ভীরভাবে এসব কথা আপনাকে আমি বলিনি। হাল্কাভাবে সময় কাটানোর জন্য এমনি বললাম। আপনি আবার কাউকে যেন বলবেন না। খলিফার কানে গেলে আমাকে তিনি পাগলা-গারদে ভরে রাখবেন হয়তো। আপনি তো নামজাদা সওদাগর, প্রাসাদের আমির উজিরদের সঙ্গেও আপনার পেয়ার দোস্তি থাকা অসম্ভব নয়। দোহাই আপনার, মদের খেয়ালেও তাদের কাছে আমার এসব অলীক উচ্ছ্বাসের কোনও কথা বলবেন না যেন।

খলিফা বলেন, কথা দিচ্ছি, আমার মুখ থেকে কেউ কিছু শুনতে পাবে না। কিন্তু খলিফা স্বয়ং নিজেই যদি সন্ধান করতে করতে তোমার কাছে চলে আসেন একদিন, তখন ?

হো হো করে হেসে ওঠে হাসান। হেসে ওঠেন খলিফাও। তারপর সুরাপাত্র পূর্ণ করে হাসান। খলিফা এক চুমুকে নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখেন। হাসানও অতিথির তালে তাল রেখে চলে। এইভাবে একের পর এক মদের পেয়ালা উজাড় করে দিতে থাকে দুজনে।

নেশায় বুঁদ হয়ে আসছিল হাসানের চোখ। খলিফা বললেন, এবার তুমি রাখ, আমি ভরে দিচ্ছি পেয়ালা।

খলিফা এগিয়ে আসেন। শরাব ঢালার সময় হাসানের পেয়ালায় টুক করে এক ডেলা আফিঙ ফেলে দেন তিনি। হাসানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, কামনা করি আরো মধুর হোক আমাদের এই মৌতাত।

হাসান বলে, অনেক হয়েছে, এরপর আর চড়ালে, আমার ভয় হয়, কাল সকালে সময় মতো জেগে উঠে আপনাকে বিদায় জানাতে পারবো না। কিন্তু আপনি মহামান্য অতিথি, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করি সাধ্য কী, দিন।

খলিফা বলেন, কিচ্ছু হবে না। আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব।

আবু অল হাসান সে পেয়ালাও নিঃশেষ করে রেখে দেয়।

একটুক্ষণের মধ্যেই ওষুধের ক্রিয়া কাজ করতে শুরু করে। হাসানের দেহটা ঢলে পড়ে যায়। খলিফা হেসে ওঠেন।

বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল মাসরুর তার দেহরক্ষী এবং অন্য নফররা। জানলা দিয়ে ইশারা জানাতেই তারা এসে হাসানের অসাড় দেহটা কাঁধে তুলে নেয়। খলিফা বলেন, আমার পিছনে পিছনে এস তোমরা।

বাড়ি থেকে পথে নেমে খলিফা মাসরুরকে বললেন, এই বাড়িটা ভালো করে লক্ষ্য কর, পরে যখন বলবো আবার আসতে হতে পারে।

মাসরুর বললো, ঠিক আছে, জাঁহাপনা ভুল হবে না।

পথে বেরিয়ে আসার অনেক পরে খলিফার খেয়াল হয়, দরজাটা হাট করে খোলা পড়ে রইলো, বন্ধ করা হয়নি।

প্রাসাদের পিছন দিকের গুপ্তদ্বার দিয়ে হাসানকে অন্দরে নিয়ে আসেন খলিফা। তাঁর নিজের ঘরের পালঙ্ক-শয্যায় শুইয়ে দিতে বলেন। তারপর নফরদের হুকুম করলেন, ওর সাজ-পোশাক খুলে নিয়ে আমার রাতের পোশাক পরিয়ে দাও।

এরপর প্রাসাদের সব নফর চাকর খোজা দাসী বাঁদী প্রহরী সকলকে ডেকে তিনি বললেন, তোমরা সবাই খেয়াল করে শোন, কাল সকালে এই যুবকের যখন ঘুম ভাঙবে, তখন ওকে খলিফা জ্ঞানে শ্রদ্ধা সম্মান জানাবে। মনে রেখ, আমার জন্য যা যা তোমরা কর, ঠিক সেই সবই করবে এর জন্য। মনে করবে, এই তোমাদের সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদ। কোনও ভাবেই সে যেন বুঝতে না পারে—এটা তামাশা।

কাল সকালে তোমরা সকলে এই কামরার সামনে হাজির থাকবে! রোজ যেমন থাক। সে যা হুকুম করবে সঙ্গে সঙ্গে তামিল করবে। তা সে যত অসঙ্গতই হোক না কেন? মাথা পেতে মেনে নেবে সব। আমাকে যে ভাবে কুর্নিশ কর, সম্বোধন জানাও, ঠিক সেইভাবে সেই কায়দায় একেও কুর্নিশ কেতা জানাবে। যদি আমার এই হুকুমের কেউ অবাধ্য হও, তা সে আমার পুত্র হলেও রেহাই দেব না। এর একমাত্র সাজা—প্রাণদণ্ড এবং তাই তোমাদের ভাগ্যে জুটবে।

সমবেত সকলে মাথা নত করে জো হুকুম জাঁহাপনা বলে দাঁড়িয়ে রইলো।

খলিফা এবার উজিরকে বললেন, জাফর, আমার দরবারের সব আমির, সেনাপতি ও পারিষদদের আজ রাতেই খবর পাঠিয়ে দাও। কাল সকালে তারা যেন এই যুবক হাসানকে খলিফার মর্যাদায় মসনদে বরণ করে নেয়। সে যা হুকুম করবে তাই তোমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। যা যা দিতে বলে অকাতরে দান করে দেবে। তাতে যদি আমার সলতানিয়তের সমগ্র ধনভাণ্ডারও উজাড় হয়, সে ভি আচ্ছা। যদি কারো গর্দান নিতে চায় সঙ্গে সঙ্গে তা তামিল করবে। মনে রেখ আগামীকাল সেই তোমাদের সুলতান। তার ওপরে কথা বলার এক্তিয়ার কারো থাকবে না। এমন কি আমারও না। কোনও কিছুর জন্যেই আমার অনুমতি প্রার্থনা করার কোনও দরকার নাই। তার হুকুমই শেষ কথা। জাফর, যা বললাম তার যেন এদিক ওদিক না হয়।

মাসরুরকে বললেন, শোন, কাল সকালে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে আমার ঘরে যাবি। হাসান জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী কেতায় তাকে কুর্নিশ জানিয়ে তার হুকুমের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবি। মনে থাকে যেন প্রতিদিন সকালে আমাকে যা যা বলিস ওকেও বলবি সে সব কথা। এবং তার জবাবে সে যা বলবে ঘাড় হেঁট করে তা শুনবি। খবরদার, একটুও এদিক ওদিক হয় না যেন।

মাসরুর কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জো হুকুম, জাঁহাপনা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আটাশতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন সকালে মাসরুর প্রথমে খলিফাকে জাগায় তারপর চলে আসে খলিফার শোবার ঘরে। সেখানে হাসান তখনও নিদ্রামগ্ন।

খলিফা এসে বসলেন একটা পর্দার আড়ালে। সেখান থেকে পালঙ্ক-শায়িত হাসানকে তিনি পরিষ্কার দেখতে থাকলেন। অথচ হাসান বা ঘরের অন্য কেউ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।

জাফর এবং মাসরুর এসে হাসানের শয্যাপার্শ্বে করজোড়ে দাঁড়ায়। তাদের পরিধানে সাজ-পোশাক। ঘরের চার পাশে এসে অবনত মস্তকে দাঁড়ালো প্রাসাদের নফর চাকর বান্দা খোজা দাসী বাঁদী প্রভৃতি। কারো মুখে কোনও কথা নাই। সারা প্রাসাদটায় নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা। খলিফার ঘুম থেকে ওঠার আগে রোজ যেমন হয়।

একটু পরে একটি বাঁদী খানিকটা ভিনিগার তুলোয় ভিজিয়ে এনে হাসানের নাকে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ঘোরেই সে হেঁচে ওঠে। এক—দুই—তিন বার। এতে আফিঙের ঘোরটা কেটে যায়।

এরপর গোলাপজলের পাত্র এনে মেয়েটি হাসানের চোখমুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল।

এইবার হাসান চোখ মেলে। কিন্তু সে পলকের জন্য মাত্র। আবার সে চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শোয়। ঘুম তার ভেঙ্গে গেছে, নেশা তার কেটে গেছে। কিন্তু একি দেখলো সে? বাদশাহী পালঙ্ক-শয্যা, অগণিত দাসদাসী নফর চাকর—এসব কী? সে কী স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু না, স্বপ্নই বা হবে কেন? সে তো জেগেই রয়েছে।

আবার সে চোখ খোলে। কী আশ্চর্য, এরা সব তার ঘরে এল কী করে? আর এ ঘর তো তার নয়। এত বড় কামরায় তো সে কোনও দিন বাস করেনি। আর এমন জাঁকজমক, বাহারী আসবাবপত্র তার ঘরে আসবেই বা কোত্থেকে?

ধীরে ধীরে আবার সে চোখের পাতা বন্ধ করে, আবার খোলে। না, সেই একই দৃশ্য। তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে শহরের সব বিখ্যাত আমির উজির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তবে কী সে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে? হতেও পারে। কাল সেই মশুলের সওদাগরটার সঙ্গে অনেক রাত অবধি সে অনেক মদ গিলেছে। হয়তো এই খোয়াব, তারই কুফল।

জাফর আভূমি আনত হয়ে তিনবার কুর্ণিশ জানায়।

—বান্দা হাজির, ধর্মাবতার। শয্যা ত্যাগ করে উঠতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা। আপনার নামাজের সময় হয়ে গেছে।

দু হাত দিয়ে চোখ দুটো কচলায় হাসান। কী ব্যাপার? এ সব কী? ঘরের এদিক থেকে ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়।

—না, আমি তো স্বপ্ন দেখছি না! তবে কী করে রাতারাতি খলিফা হয়ে গেলাম। আর কে-ই বা আমাকে নিয়ে এল এখানে?

না না, আর ভাবতে পারে না হাসান। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে সে।

কিন্তু কী একটা অদৃশ্য শক্তি হনন করতে থাকে। চোখ বন্ধ করেও পড়ে থাকতে পারে না।

জাফর দ্বিতীয় বার আবেদন জানায়, ধর্মাবতার, আপনার সকাল বেলার নামাজের সময় বয়ে যায়। মেহেরবানী করে শয্যা ত্যাগ করতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা! আজ এতকাল আপনি তো কখনও নামাজ নষ্ট করেননি। কৃপা করে উঠুন।

এই সময় জাফর ইশারা করতে নটীরা নানারকম তারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ভৈরবীর তান তুলতে থাকলো।

আর হাসান ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, ঘরের এক প্রান্তে একটা মঞ্চের ওপরে বসেছে অনেকগুলো নটী নর্তকী। তাদের কারো হাতে বীণা, কারো হাতে সেতার, আবার কারো বা হাতে সরোদ। হাতের যাদুতে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছে তারা।

হাসান ভাবে, সে তো শোবার সময় এদের কাউকে দেখেনি। তবে এই একটা রাতের ব্যবধানে এমন পরিবর্তন, এত সব কাণ্ডকারখানা ঘটে গেল কী প্রকারে? ভাবতে থাকে সে। কিন্তু কোনও কূল কিনারা খুঁজে পায় না।

এবার সে উঠে বসলো। হাত দিয়ে বালিশ বাজু পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। না, সবই তো শক্ত শক্ত মনে হচ্ছে। পরিষ্কার সে অনুভব করতে পারছে। স্বপ্ন হলে কী অনুভব করা যায়? বলতে পারবে না সে।

দুনিয়াতে এর চেয়ে তাজ্জব কান্ড আর কী হতে পারে? তার নাম আবু অল হাসান। তার বাবা ছিল সওদাগর। অনেক ধন রত্ন রেখে গিয়েছিলেন তিনি। সেগুলো না উড়িয়ে জমিয়ে রাখলেও, এই রকম বাদশাহী খাট-পালঙ্ক, গালিচা পর্দা, নফর চাকর, দাসী বাঁদী, নটী নর্তকীর বিলাস প্রাচুর্যে দিন কাটাবার স্বপ্নও সে দেখতে পারতো না। সেই সব অসম্ভব অদ্ভুত কাণ্ড তো আজ সে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছে।

এই সময় বাজনা থেমে গেল। মাসরুর এগিয়ে এসে তিনবার আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার নামাজের বেলা বয়ে যায়। দরবারে যাবার সময় আগত হয়ে এল। শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করতে আজ্ঞা হোক।

আবু অল হাসান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে মাসরুরের দিকে তাকায়। লোকটা বলে কী! তাকে দরবারে গিয়ে মসনদে বসতে হবে?

ক্রোধে ফেটে পড়তে চায় হাসান।

—আমি জাঁহাপনার বান্দা মাসরুর। আর আপনি পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের পঞ্চতম পুরুষ মহামান্য ধর্মাবতার খলিফা হারুণ অল রসিদ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ত্রিশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

—তুমি একটা দোজকের পোকা—খানকির বাচ্চা।

মাসরুর মাথা নুইয়ে বলে, শাহেনশাহ যথার্থই বলেছেন। নিজেকে আমি গর্বিত মনে করছি। আমার মনে হয়, জাঁহাপনার কাল রাত্রে সুনিদ্রা হয়নি। কিছু দুঃস্বপ্ন দেখে থাকবেন. সেই কারণে তিনি আমার প্রতি কুপিত হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে সুস্থ করে তুলুন।

আবু অল হাসান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আবার শয্যায় ঢলে পড়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে পা দুটো ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে থাকে। পর্দার আড়ালে বসে হারুন অল রসিদ আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। তাঁর হাসির শব্দে সবাই চকিত হয়ে উঠতে পারে এই আশংকায়, রুমাল দিয়ে তিনি মুখ চাপা দিয়ে ধরেন।

আবু হাসান নিজের মনেই হো হো করে হাসতে থাকে। খলিফা হারুন অল রসিদ—হা হা হা, সে নাকি স্বয়ং খলিফা! কী সব আজগুবী কাণ্ড! আবার সে তড়াক করে শয্যার উপর উঠে বসে। সামনে দাঁড়িয়েছিল একটা ছোট্ট নিগ্রো বাঁদী। তার দিকে তাকিয়ে বলে, এ্যাই, এদিকে আয়। বলতো, আমি কে?

মেয়েটি ভীত চকিত হয়ে কাছে আসে, বলে, আপনি তো আমাদের খলিফা হারুন অল রসিদ।

—চোপ রও! হারুন অল রসিদ—মিথ্যুক কোথাকার।

এরপর আর একটা ফর্সা বাঁদীর দিকে বাঁ হাতের তর্জনীটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে, এ্যাই, আমার এই আঙ্গুলটা কামড়ে দে তো!

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে হাসানের আঙ্গুলটা কামড়ে ধরে।

—উঃ উঃ, ছাড় ছাড়—

হাসান হাতটা টেনে নেয়। না, স্বপ্ন হলে ব্যথা লাগবে কেন? এ তো স্বপ্ন নয়! মেয়েটিকে সে প্রশ্ন করে। আমাকে তুমি চেন? বল তো আমি কে?

মেয়েটি নির্বিকার ভাবে বলে, আপনি আমাদের মহানুভব সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদ।

হাসান আবার অট্টহাসিতে কেটে পড়ে। হো হো হো। হাসান, তুমি তা হলে দেখেছ, সত্যিই খলিফা বনে গেছ। এরা যে সবাই এক কথা বলছে, তুমি নাকি বাগদাদের সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদ!

এই সময় প্রধান খোজা তিনবার কুর্নিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিরর্থক। তবু বলছি, দরবারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এবার তো ধর্মাবতারকে মসনদে বসতে হবে। দরবারের আমির অমাত্যরা অধীর আগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

হাসান এক লাফ দিয়ে পালঙ্ক ছেড়ে নিচে নেমে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে একজন নফর ছুটে আসে খলিফার হীরে মুক্তোর চুমকি-বসানো সোনার জরিতে মোড়া টুকটুকে লাল চটি জোড়া নিয়ে। হাসানের পায়ের তলায় বসে পড়ে জুতো জোড়া বাড়িয়ে ধরে।

এমন অতি মূল্যবান শাহী জুতো সে চোখে দেখেনি কখনও। নির্বিবাদে পা দুখানা গলিয়ে দেয় সে চটির মধ্যে।

প্রধান খোজার কাঁধে ভর দিয়ে হাসান হামামে গিয়ে ঢোকে।

কিছুক্ষণ পরে হাসান ফিরে এসে দেখে, হারেমের সমস্ত বাঁদীরা দুই সারি হয়ে অবনত মস্তকে কুর্নিশ জানাবার ভংগী করে কোমর নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এইখানে রাত্রির সাজপোশাক খুলে ফেলে হাসানকে দরবারের বাদশাহী সাজে সজ্জিত করা হয়।

হাসান এবার সন্দেহাকুল হয়ে ভাবে, না, তা হলে আমি সত্যিই হাসান নই। এই তো আমি স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ। তবে বোধ হয় কাল রাতের স্বপ্নটাই আমাকে ভাবিয়েছিল, আমি এক তুচ্ছ বেকার বণিক সন্তান আবু অল হাসান! আরে ছোঃ যত সব আজগুবী খোয়ার। না না, আমি হাসান হতে যাবো কেন, আমি তো খলিফা। এই তো আমার উজির, এই তো আমার প্রাসাদ। এই তো আমার বেগম-বাঁদীরা। না, আমি আর ওসব হাসান ফাসানের কথা চিন্তা করে মাথা খারাপ করবো না। আমার ওসব বাজে কথা চিন্তা করার মতো সময় কোথায়? আমি খলিফা, ওরা আমাকে এখুনি দরবারে নিয়ে যাবে। মসনদে বসাবে। আমি বিচার করবো, হুকুম ফরমান জারি করবো। আমার কথায় সবাই ওঠ বোস করবে।

দরবারে চল, কদম বাড়াও।

হাসানের কণ্ঠে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। স্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ। কোনও দ্বিধা জড়তার লেশমাত্র নাই।

দারুন জাঁকজমক করে দরবারে নিয়ে এসে হাসানকে মসনদে বসানো হয়।

হাসান দেখলো সারা দরবারকক্ষ আমির উজির সেনাপতি সভাসদ পারিষদ বয়স্যে পরিপূর্ণ। সকলেই শ্রদ্ধাবনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো। নিয়ম হচ্ছে যতক্ষণ না খলিফা সকলকে আসন গ্রহণ করতে বলেন, ততক্ষণ কেউই বসতে পারে না। দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। হাসান তা বুঝতে পারে না। সুতরাং কেউই আর আসন গ্রহণ করতে পারে না। উজির ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে, ধর্মাবতার যদি অনুমতি করেন, আমরা আপনার চরণতলে বসতে পারি।

হাসান ইশারা করে। সবাই যে যার আসনে বসে পড়ে।

দরবারের অধিকাংশই তার অচেনা মুখ। শুধু উজির জাফর এবং কবি আবু নবাস, অল ইজলী, অল রাক্কাসী, ইবদান, অল সাকার, উমর অল টারতিস, আবু ইশাস ও জাদিমকে সে চেনে। নানা সভা-সমিতিতে অনেকবার সে দেখেছে তাদের।

জাফর একখানা বড় কাগজের লম্বা ফর্দ বাড়িয়ে দেয় হাসানের দিকে। সেদিন দরবারে কার কী আর্জি আছে, কোন মামলার বিচার-রায় দিতে হবে এবং কোন কোন ফরমান হুকুম জারি করতে হবে তারই লম্বা ফিরিস্তি।

এরপর জাফর প্রজাদের অভাব অভিযোগের দরখাস্তগুলো সভাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তে থাকে। পর্দার পিছনে খলিফা বসেছিলেন তামাশা উপভোগ করার জন্য। তিনি সব শুনতে থাকেন। এবং উজিরকে ইশারা করে তার 'হ্যাঁ' 'না' বক্তব্য জানিয়ে দিতে থাকেন।

হাসান কিন্তু এই সবের কিছুই বুঝতে পারে না। উজির নিজের মনে সব দলিল দস্তাবেজ হুকুম ফরমানের কাগজপত্র পাঠ শেষ করে। এর কোনটায় হাঁ বলতে হবে, কোনটা না করতে হবে হাসান বুঝবে কী করে? উজিরকে সে বলে, ওসব দেখার বা শোনার আমার সময় নাই। এখন থাক। পরে হবে। এখন হাবিলদার আহমদকে হাজির কর।

তৎক্ষণাৎ শহরের সিপাই অধিকর্তা আহমদ এসে তিনবার কুর্নিশ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। হাসান বললো, দশজন সিপাই সংগে নিয়ে এক্ষুনি তুমি মোস্তাফা পট্টির রমজান শেখ আর তার দুই সাগরেদকে পাকড়াও কর। এই তিনটি লোকই বেতমিজ বদমাইশ। শুধু লোক ঠকানো, ধাপ্পাবাজি, অন্যের মেয়েছেলের দিকে নজর দেওয়া, আর নিরীহ মানুষকে অহেতুক শশব্যস্ত করাই এদের পেশা। এরা সমাজের কীট। এদের ধরে আচ্ছা করে রশি দিয়ে বাঁধবে। তারপর গাধার পিছনে বেঁধে সারা মহল্লা ঘোরাবে। জনে জনে ডেকে বলবে, খলিফার হুকুমে শয়তানদের সাজা দেওয়া হচ্ছে। এরপর চৌমাথার মোড়ে নিয়ে এসে প্রকাশ্য দিবালোক সহস্র জনতার সামনে ওদের প্রত্যেককে চারশো ঘা করে চাবুক লাগাবে।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বত্রিশতম রজনী :

আবার সে গল্প শুরু করে :

তারপর লোহার ডাণ্ডা গরম করে ঐ শেখটার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। এই মুখ দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় লোককে গালিগালাজ করে সব সময়। এরপর ওর লাশটা কুত্তাদের মুখে ছুঁড়ে দেবে। তারপর ঐ সাগরেদ দুটোকে ধরে ওই পাড়ার এক পড়শী আবু অলহাসানের খাটা-পায়খানার হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দেবে।

আহমদ ফৌজি কায়দায় মাথায় ডান হাতখানা তুলে ধরে, পরে আর একবার কুর্নিশ জানিয়ে দরবারকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

পর্দার আড়ালে বসে খলিফা হাসানের কার্যবিধি সবই প্রত্যক্ষ করছিলেন। তার এই ধরনের শাহচিত হুকুমনামা শুনে বিশেষ প্রীত হলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে আহমদ ফিরে এল। হাসান জিজ্ঞেস করে, আমার হুকুম তামিল করেছ?

আহমদ বলে, ধর্মাবতার মহানুভব, এই তার প্রমাণ।

একখানা কাগজ সে উজিরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। উজির পড়ে শোনালো, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করে দিয়েছে—তাদের চোখের সামনে খলিফার এই হুকুম তামিল করেছে পুলিশের সর্বাধিনায়ক হাবিলদার আহমদ।

হাসান উল্লসিত হয়ে ওঠে, অতি উত্তম। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমার কাজে।

হাসান এবার প্রধান খাজাঞ্চীকে উদ্দেশ করে বলে, এক হাজার দিনার একটা থলেয় ভরে চাঁদনীচকের আবু অল হাসানের মার হাতে দিয়ে এস। হাবিলদার আহমদকে জিজ্ঞেস করলে সে হাসানের ঠিকানা বলে দিতে পারবে। থলেটা সাহেবের মাকে দিয়ে বলবে, আমাদের ধর্মাবতার খলিফা এই এক হাজার দিনার আপনাকে পাঠিয়েছে। আরও বেশি টাকা পাঠাবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু রাজা কোষে বেশি অর্থ নাই। তাই এই দিনারগুলোই আজকের মতো রাখুন, পরে আবার পাঠাবেন তিনি।

প্রধান খাজাঞ্চী দরবার থেকে বেরিয়ে একটা থলেয় এক হাজার দিনার ভরে হাসানের মা-এর কাছে চলে যায়।

হাসান উজিরকে জানালো, আজকের মতো দরবার শেষ। উজির সেকথা আমির অমাত্যদের জানিয়ে দিতে তারা সকলে খলিফাকে যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে দরবারকক্ষ ছেড়ে চলে গেল।

হাসান উজির এবং মাসরুরের কাঁধে ভর দিয়ে মসনদ থেকে নিচে নামে। তারপর ওরা হাসানকে নিয়ে হারেমে চলে আসে। সেখানে সেদিনের দুপুরের খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছিল। মেয়েরা সকলে এসে হাসানের পাশে বসে।

সুন্দরী মেয়েরা সুমধুর তালে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। হাসান ভাবতে থাকে, সে যে সত্যি সত্যিই খলিফা হারুন অল রসিদ সে বিষয়ে তার মনে আর কোনও সংশয়, দ্বিধা নাই। এই তো সে শুনতে পাচ্ছে মেয়েদের বাজনা, ফুল শুঁকে সে গন্ধ আঘ্রাণ করতে পারছে, দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে বেড়াতে পারছে। সে কথা বলছে, হুকুম করছে, তামিল হচ্ছে। একটু আগেই সে তিনজনের প্রাণদণ্ড দিয়ে এসেছে। সবাই তাকে খলিফা বলে মান্য করছে। সুতরাং সে তো আর স্বপ্ন দেখছে না। সে নিশ্চই খলিফা।

ভোর হয়ে আসছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো চৌত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বিশাল একখানা টেবিলে থরে থরে নানা স্বাদের বাদশাহী খানা সাজানো হয়েছে। কোনওটায় মাংসের কাবাব, কোন রেকাবীতে মোরগ মোসাল্লাম, কোনটায় আফগানী কোর্মা, আবার কোন রেকাবীতে পায়রার ঝোল। তন্দুরী রুটি প্রভৃতি। এছাড়া অনেক রকমের সব্জীর তরকারী।

গতকাল রাত-এর পর হাসান কিছু খায়নি। বেশ চনমনে খিদেও পেয়েছে তার। তাই বেশ উন্মুখ হয়ে ওঠেছিল খাওয়ার জন্য।

হাসান নানা ব্যঞ্জন সহকারে খানাপিনা করে। তার সামনে পিছনে পাশে দাঁড়িয়ে সাতটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে চামর দুলিয়ে হাওয়া করতে থাকে। হাসানের কেমন অস্বস্তি লাগে। এসব তো তার অভ্যেস নাই কোনও কালে।

শেষ গ্রাস মুখে নেবার সময় পর্যন্ত প্রতিটি মেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খাওয়া দেখে। হাসান ঘেমে ওঠে। তার খাওয়া কেউ দেখছে, এটা ভেবেই তার খিদের অর্ধেকটা উবে যায়। কিন্তু কি করবে, উপায় নাই। সে খলিফা হারুন অল রসিদ, তাকে তো প্রাসাদ হারেমের রীতিনীতি কেতা, মেনে চলতে হবে।

মেয়েদের ডেকে প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞেস করে হাসান, কী নাম তোমাদের? একজন বলে তার নাম চুমকী। আর একজন বলে, শোভা। আর একজনের নাম গুলাবী। অন্য একজনের নাম আনার। আর একটির নাম পলা। এবং বাকী দুজনের নাম চুনী ও পান্না।

—বাঃ, চমৎকার নাম তো তোমাদের!

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে খোজা গরম জলের গামলা নিয়ে আসে। মেয়েরা হাসানের হাত মুখ ধুইয়ে সুগন্ধ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেয়। তারপর হাত ধরে আর এক কামরায় নিয়ে চলে। দরজায় খোজা প্রহরী ছিল। সে শশব্যস্ত হয়ে পর্দা গুটিয়ে ধরে।

হাসানকে পালঙ্কে বসিয়ে খোজার জিম্মায় রেখে মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশের একটা দরজা দিয়ে পরপর অন্য সাতটি পরমাসুন্দরী মেয়ে সাতখানা ফলের বারকোষ হাতে নিয়ে প্রবেশ করে। এই সাতটি মেয়ে আগের সাতটির চেয়ে আরও বেশি সুন্দরী।

হাসান ওদের পাশে বসায়। এবং নিজের হাতে করে প্রত্যেককে নানারকম ফল খেতে দেয়। কাউকে দেয় আঙ্গুর, কাউকে তরমুজ, কাউকে বা কলা— এইভাবে এক একজনকে এক এক রকমের ফল তুলে দেয় সে।

সে নিজে প্রত্যেক ফল একটু একটু ক'রে আস্বাদ করে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ছত্রিশতম রজনী ঃ
আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

এরপর ঐ সপ্তকন্যা হাসানকে হাতে ধরে পাশের কামরায় নিয়ে যায়। সে ঘরেও পালঙ্ক-শয্যায় বসিয়ে খোজার হেপাজতে দিয়ে ওরা বিদায় নেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য সাতটি মেয়ে। তাদের প্রত্যেকের হাতে সোনার থালা। আর থালা ভর্তি এক এক রকমের মিষ্টি। পেস্তার বরফি, আলেপ্পের মণ্ডা, মশুলের জমানো খেজুর-ক্ষীর, আর বসরাহর

হালওয়া প্রভৃতি। হাসান এই বস্তুগুলো খেতে ভালবাসে না। অল্প একটু মুখে দিয়ে বলে, তোমরা খাও, আমি দেখি।

এবার মেয়েরা হাসানকে নিয়ে যায় পানঘরে। যথারীতি খোজার কাছে জমা দিয়ে দেয় তারা। এবং প্রায় সঙ্গেই সাতটি সুন্দর মেয়ে নানারকম মদের পাত্র মাথায় নিয়ে সংগীতের তালে তালে (পর্দার আড়াল থেকে যে সব মেয়েরা সমধুর সুরে গান গাইছিল তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছিল না) নাচতে নাচতে পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।

হাসানের চোখ নেচে ওঠে। বাঃ, তোফা। এতক্ষণ তো সে এই কথাই ভাবছিল।

মেয়েরা এক এক জনের পাত্র থেকে এক এক পেয়ালা ভরে হাসানের অধরে ধরে। এক এক চুমকে হাসান নিঃশেষ করতে থাকে। এইভাবে ছ'জনের হাত থেকে ছ' পেয়ালা মদ সে উদরস্থ করে। ধীরে ধীরে নেশাটা বেশ জমে ওঠে। এইবার সপ্তম কন্যার দেবার পালা। মদ ঢালার সময় সে কায়দা করে আফিঙের একটি ডেলা পেয়ালার মধ্যে ফেলে দেয়। উজির জাফর মেয়েটিকে আফিঙ বড়িটা দিয়ে বলেছিল, খলিফার শবারের শেষ পেয়ালায়, তাঁর অলক্ষ্যে, এই ডেলাটা মিশিয়ে দিয়ে তাঁর মুখে ধরবে।

পলকের মধ্যেই হাসান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে শয্যায় এলিয়ে পড়ে। খলিফা হারুন অল রসিদ মাসরুর আজ জাফরকে পাশে নিয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। এবার তিনি হো-হো করে হাসতে হাসতে পর্দা ঠেলে পালঙ্ক-শয্যার পাশে দাঁড়াল।

হাসানের দেহটা তখন অসাড় অচৈতন্য। খলিফা মাসরুরকে বলেন, ওর গা থেকে আমার সাজ-পোশাক সব খুলে ওর নিজের গুলো পরিয়ে দে।

মাসরুর বাদশাহী সাজ খুলে হাসানকে তার নিজের সাজ-পোশাক পরিয়ে দেয়। খলিফা বলেন, এবং যে দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছিলি প্রাসাদের সেই গুপ্ত দরজা দিয়ে আবার একে বাইরে নিয়ে যা। যে বাড়ি থেকে এনেছিলি সেই বাড়ির সেই ঘরে এর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে আসবি। সাবধান, কেউ যেন টের না পায়, বুঝলি ?

মাসরুর মাথা নেড়ে বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না জাঁহাপনা। কাক পক্ষীটিও জানতে পারবে না।

খলিফা বলেন, উফ, সকাল থেকে হাসতে হাসতে আমার পেটে ব্যথা ধরে গেছে। হাসান যদি আর বেশিক্ষণ এখানে থাকে, আমি হাসতে হাসতেই মারা পড়বো।

খলিফার নির্দেশমতো মাসরুর হাসানকে নিয়ে চাঁদনীচকে ওর বাড়িতে চলে যায়। তারপর সেই ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়ে।

পরদিন সকালে হাসানের ঘুম ভাঙে না। বেলা যখন দুপুর গড়িয়ে গেল, সেই সময় সে চোখ খোলে। কিন্তু কেমন সব গোলমাল মনে হয়। মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে।

—কোথায়, মেয়েরা সব, কোথায় গেলে, এদিকে এস।

হাসানের কণ্ঠে হুকুমের স্বর। কিন্তু কেউ আসে না ; কেউ কোনও সাড়া দেয় না। হাসান এবার কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দেয়, মেয়েরা সব কোথায় গেলে, আমি জেগে উঠেছি, দেখতে পাচ্ছ না ? এদিকে এস।

কিন্তু কে আসবে ? কে সাড়া দেবে ?

এবার হাসান ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, এ্যাই জাফর—জাফর ? এ্যাই—কুত্তার বাচ্চা ? মাসরুর—খানকির ছেলে, কোথায় গেলি সব। দাঁড়া, আজ তোদের সব্বাইকে শূলে চড়াবো। এত বড় আস্পদ্দা, আমি কখন থেকে ডাকছি, তা নবাবজাদাদের সাড়া দেবার নাম নাই।

ক্রোধে আরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তার পরই ভ্যাবাচেকা খেয়ে আবার সে বসে পড়ে খাটের ওপর। বিস্ময় বিস্ফারিত বড় বড় চোখ মেলে সে ঘরের এপ্রান্ত ওপ্রান্ত দেখতে থাকে। এ কোন্ ঘর ? এ তো তার প্রাসাদের শয়নকক্ষ নয় ! কিছুই বুঝতে পারে না হাসান। এ কোথায় সে বসে আছে ? এ তো একটা এঁদো স্যাঁতসেঁতে চুনবালীখসা ঘর। এখানে সে এল কী করে ? সে স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ। সে কেন এই দীন ভিখারীর ঘরে বসে থাকবে ? কে তাকে নিয়ে এল এখানে ? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে—এই কাণ্ড করেছে। এবার সে আরও জোরে বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, জা-ফ-র—

তবু জাফর সাড়া দেয় না ! ছুটে আসে তার বৃদ্ধা মা।

—কী বাবা, কী হয়েছে ? খারাপ স্বপ্ন-টপ্ন কিছু দেখেছিস নাকি ?

হাসান সন্দেহের চোখে তাকায়, কে তুমি ?

—সে কি বাবা, এখনও কী স্বপ্ন দেখছিস জেগে জেগে ?

—স্বপ্ন আমি দেখছি, না তুমি দেখছো, বুড়ি। জানো কার সামনে দাঁড়িয়ে কাকে কী কথা বলছো ? আমি স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ—পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ। খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে কী আদব কেতায় কথা বলতে হয়, তাও জান না ?

মা আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে, সে কি বাবা, তুই যে আমার একমাত্র চোখের মণি, আমি তোর মা।

—তুমি মাই হও আর যেই হও—আমি তো এই মুলুকের সুলতান। আমার সামনে যখন দাঁড়াবে, সবাই যেমন সালাম কুর্নিশ করে, তুমিও তেমনি করবে। সবাই যেমন আমাকে ধর্মাবতার বলে সম্বোধন করে, তোমাকেও তাই করতে হবে। এই-ই নিয়ম। মা হয়েছ বলে তুমি খলিফার তখতের অপমান করতে পার না। জান, আমার এক আঙ্গুলের ইশারায় কী কাণ্ড ঘটতে পারে ? এই তো কালই ঐ শয়তান শেখটা আর তার দুই সাগরেদকে এক হুকুমে খতম করে দিয়েছি। হুঁ হুঁ বাবা, আমি কি যে সে লোক নাকি। এই তো খাজাঞ্চীকে হুকুম করা মাত্র তোমাকে সে এক হাজার দিনারের একটা থলে দিয়ে গেছে। কী, দেয়নি ?

হাসানের মা বলে, হ্যাঁ, কাল দুপুরে প্রাসাদ থেকে একজন এসে আমাকে

একটা মোহরের তোড়া দিয়ে বললো, খলিফা এই এক হাজার দিনার পাঠিয়েছেন আপনাকে। আজ ধনাগারে বেশি অর্থ নাই, তাই এইটাই রাখুন আজকের মতো। পরে আবার পাঠিয়ে দেবেন তিনি।

হাসান ভারিক্কি চালে মাথা নাড়ে, তবেই বোঝ, আমার কী ক্ষমতা। আরে হবে না কেন, আমি যে স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ—সমগ্র ইরাক খুরাসনের প্রবল প্রতাপান্বিত মহামান্য সুলতান। আমার কথায় বাঘে গরুতে একঘাটে পানি খায়। আর এ তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

হাসানের মা বুঝতে পারে, ছেলের মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে, ও বাবা গো, আমার একি হলো গো? আমার একমাত্র বুকের কলিজাকে কে কি গুণ তুক্ করেছে গো? হায় হায়, এখন আমার উপায় কী হবে? কী করে সারাবো আমি? কে সারিয়ে দেবে আমার বাছাকে।

—এ্যাই—বুড়ি, চুপ কর। মাথা আমার খারাপ হয়নি, হয়েছে তোমার। তা না হলে, খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে এই রকম বেয়াদপি করে বে-শরম বাত বলতে পার? দূর হও—দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

হাসানের মা এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে, এসব কী বলছিস, বাবা। কে তোকে কী খাইয়েছে, বল? সেই মশুলের সওদাগরটাকে যখন অত রাত অবধি অত গলা-গলি করছিলি তখনই আমার ভয় লাগছিল। মশুলের লোকগুলো ভালো হয় না। ওরা অনেক রকম ঝাড়ফুঁক, গুনতুক করতে জানে। জড়ি বড়ি খাইয়ে ভালো মানুষকে পাগল করে দিতে পারে।

—থামো। পাগল করে দিতে পারে—

হাসান খেঁকিয়ে ওঠে ওর মাকে, আমি শাহেন শাহ্ খলিফা হারুন অল রসিদ। আমাকে সে পাগল করে দেবে? সারা মশুল আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব না?

—ও বাবা গো, মা গো, এ আমার কী হলো গো? কে আমার এই সব্বোনাশ করে গেল গো। হায় হায় হায়—আমার একমাত্র চোখের মণি—তাকে পাগল করে দিলে কে?

হাসান চিৎকার করে ডাকে, জাফর, জাফর? মাসরুর, মাসরুর? এই বেয়াদপ বুড়িটাকে প্রাসাদ থেকে বাইরে বের করে দাও।

কিন্তু জাফর বা মাসরুর কেউ-ই আসে না। হাসানের মা মুখে মধু ঢেলে বলে, জাফর মাসরুর আসবে কোত্থেকে, বাবা। আর এটা কী খলিফার প্রাসাদ। তাকিয়ে দেখ না, আমাদের সেই ঝরঝরে পুরনো বাড়ি—চুন বালী খসা ঘর। তুই কী এখনও বুঝতে পারছিস না, খারাপ স্বপ্ন টপ্ন দেখে এই রকম ভুল বকছিস। নে, চোখে মুখে পানি দে। একটু শরবত খা। দেখ সব ভুল ভেঙে যাবে। দাঁড়া, আমি নিয়ে আসি।

মা বেরিয়ে যায়। হাসান বসে বসে ভাবতে থাকে, তবে কী সে সত্যিই স্বপ্ন দেখছিল সারারাত ধরে? তবে কি সে আবু অল হাসান? খলিফা নয়? হয়তো মা-র কথাই ঠিক। আগাগোড়াটাই স্বপ্ন?

মা ফিরে এসে হাসানের চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেয়। এক গেলাস শরবত তুলে দেয় ওর হাতে। এক চুমুকে শরবতটুকু নিঃশেষ করে হাসান বলে, মা, তুমি ঠিকই বলছ, আমি অল হাসান। এই তো আমার সেই চির চেনা ঘর। কাল রাতে আমি বোধহয় স্বপ্নই দেখেছিলাম।

মা-এর মুখে হাসি ফোটে। যাক, ছেলে তবে পাগল হয়ে যায়নি।

—তোকে আমি তো বললাম, বাবা, অনেক সময় নানারকম আজগুবি স্বপ্ন দেখে সকালবেলায় কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। তুই একটু সুস্থ হয়ে বোস, আমি তোর জন্যে নাস্তা বানিয়ে নিয়ে আসি।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে রসুইখানায় যাবার উদ্যোগ করতেই হাসান আবার চিৎকার করে ওঠে, এ্যাই শয়তানী, শিগগির করে বল, কে আমাকে প্রাসাদ থেকে এখানে রেখে গেছে। আমার দরবার, আমার তখত্, আমার হারেম—কোথায় গেল? কে কারসাজী করে আমাকে সরিয়ে এনেছে এখানে? বল, শিগ্গির করে বল। নইলে মেরে শেষ করে দেব তোকে।

হাসান তেড়ে আসে মা-এর কাছে। চেপে ধরে তার চুলের মুঠি, এখনও বল, এসব কার ষড়যন্ত্র?

মা বলতে যায়, বাবা, শান্ত হয়ে বোস, কেন এরকম করছিস। আমি তোর গর্ভধারিণী মা। দশমাস দশদিন পেটে ধরেছি, বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি। এই কী তার পুরস্কার? তুই কী করে খলিফা হতে পারবি, বাবা। তুই তো আমার ছেলে—হাসান।

—হাসান! ওরে শয়তান বুড়ি, আমি হাসান? জানিস না, আমার হুকুমে সারা সলতানিয়ত কাঁপে।

এই বলে সে এক ধাক্কা মেরে মাকে মেঝেতে ফেলে দেয়। বৃদ্ধা হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। পুত্রস্নেহে অন্ধ মা চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে নাস্তা বানিয়ে আবার ফিরে আসে সে হাসানের ঘরে। হাসান তখন গুম মেরে বসে বসে কী সব ভাবছিল। ছেলের পাশে এসে হাত রাখে মা। বলে, নে বাবা, খেয়ে নে। তারপর যা, একটু খোলা হাওয়া থেকে ঘুরে আয়। দেখবি, ভাল লাগবে।

হাসান কোনও কথা বলে না। খেতে শুরু করে। মা বলে, জানিস বাবা, কাল হাবিলদার আহমদ এসেছিল, আমাদের মহল্লায়। পাশের ঐ শয়তান শেখটা আর তার দুই সাগরেদকে ধরে গাধার পিঠে চড়িয়ে সারা মহল্লাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো। আর ঢ্যাঁড়া পিটে লোকজনদের জানাতে লাগলো, এই যে চাঁদনীচকের বাসিন্দারা, শোন, এই বদমাইশ শেখ আর তার এই দুই বেল্লিক ল্যাঙবোটকে এবার চাবুক মারা হবে। যারা দেখতে চাও, চৌমাথায় জড়ো হও। কাতারে কাতারে ছেলে বুড়োরা জড়ো হলো সেখানে। আমি তো ঘরে বসে জানালার পর্দা সরিয়েই দেখতে পেলাম। ওঃ, কী মারটাই মারলো! এক এক জনকে চারশো ঘা চাবুক। তা অত মার কী আর শরীরে সয়?

তখনই প্রায় দলা পাকিয়ে গেছে। তার উপর একটা লোহার শিক তাঁতিয়ে এনে শেখটার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আহমদ। আর সঙ্গে সঙ্গে সব খতম। শেখের লাশটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল ঐ নর্দমার পানিভরা ডোবাটার মধ্যে। আর ওর সাগরেদ দুটোকে এনে ফেল দিল আমাদের খাটা পায়খানার ময়লার হাঁড়ির মধ্যে। ঠিক হয়েছে, উচিত সাজা দিয়েছেন ধর্মাবতার। পাড়াটার হাড় জুড়িয়েছে।

হাসান অনেকটা সামলে নিয়েছিল। কিন্তু মা-র এই কথা শোনার পর আবার তার ধারণা বদ্ধমূল হলো, সে নির্ঘাৎ খলিফা হারুন অল রসিদ। কারণ আহমদকে সে-ই তো এই হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছিল। আবার সে চিৎকার করে ওঠে, সেই ধর্মাবতারটি কে—জান? এই শর্মা। আমি—আমিই সেই খলিফা হারুন অল রসিদ—আমার সেই পূর্বপুরুষ আব্বাস—পয়গম্বর মহম্মদের আপন চাচা। আমার হুকুমেই আহমদ ওদের তিনজনকে খতম করেছে। আর তুই শয়তানী কিনা বলছিস, আমি হাসান? এত বড় স্পর্ধা তোর, স্বয়ং খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে এন্তার মিথ্যে কথা বলা? জানিস, এর সাজা কী? মৃত্যু—মৃত্যুদণ্ড। জল্লাদকে দিয়ে নয়, আজ তোকে আমি নিজের হাতে খুন করবো।

এই বলে ঘরের কোণে রাখা একখানা ছড়ি তুলে নিয়ে সে ছুটে আসে মা-এর দিকে। ঠাই ঠাই করে বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা। বৃদ্ধা আর্তনাদ করে ওঠে, ও বাবা গো, মা গো, মেরে ফেললো গো, তোমরা কে কোথায় আছ, বাঁচাও—বাঁচাও!

হাসানের মা-এর চেঁচামেচি চিৎকারে পাড়াপড়শীরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে।

—কী ব্যাপার, কী হয়েছে? একি! হাসান, বুড়ো মাকে ধরে মারছো? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা!

ওদের একজন ছুটে গিয়ে হাসানের হাতের উদ্যত ছড়িটা কেড়ে নেয়, তোমার মতো অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেকে আঁতুড়ঘরে জহর দিয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল। গর্ভধারিণী জননী, তার গায়ে তুমি হাত তোল? এত বড় তোমার স্পর্ধা। সাপের পাঁচ পা দেখেছ? জান না, আমরা পাড়ায় আছি—মেরে একেবারে হাড় মাস আলাদা করে দেব।

হাসান ক্রুদ্ধ নয়নে পড়শীদের দিকে তাকায়, তোমরা কে?

—আমরা? আমরা কে জান না বেশরম। আমরা তোমার মউত। মা-এর গায়ে হাত তোলার মজা এবার টের পাবে। আমরা কে এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। মোড়লের বাড়িতে আজ সভা ডাকা হচ্ছে। সেখানে তোমার বিচার হবে। আমরা কেউ আর তোমার সঙ্গে বসবাস করবো না। তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে এ দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে তোমাকে। তোমার ছিটিয়ালি এত কাল আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু মা-এর গায়ে হাত দিয়েছ যখন, তখন আর রেয়াত করবো না।

হাসান খুব শান্ত গলায় ভারিক্কি চালে বলে, কার সামনে দাঁড়িয়ে বেয়াদপ

বেশরমের মতো এইসব আলতু ফালতু বকে যাচ্ছো, জান ? চেন আমি কে ?

—খুব চিনি। চিনবো না কেন, তুমি হচ্ছো—টিকিখরা ছিটিয়াল আবু অল হাসান।

—না।

সিংহের মতো গর্জে ওঠে হাসান, আমি খলিফা হারুন অল রসিদ, তামাম আরব দুনিয়ার একচ্ছত্র শাহেন শাহ। আমার পূর্বপুরুষ আব্বাস—পয়গম্বর মহম্মদের নিজের চাচা। তোমাদের এই সব বেতমিজ বদমাইশির সাজা কী ভাবে দিতে হয় তা একটু পরেই দেখবে। সবগুলোর মুখ আমি চিনে রাখলাম। দরবারে গিয়েই আহমদকে হুকুম দেবো। সে তোমাদের সব্বাইকে ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাসাদের সদর ফটকের সামনে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেবে।

এবার প্রতিবেশীরা একেবারে চুপ হয়ে যায়। হাসানের মা-এর দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, মাথাটা দেখছি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম রাগের মাথায় আপনাকে মারধোর করছে। কিন্তু তা তো নয়। এ তো বদ্ধ উন্মাদের কাণ্ড। তা, কবে থেকে এরকম হলো ?

মা ওদের সকলকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, দিব্যি আমার ভাল ছেলে, রোজ যেমন সন্ধ্যেবেলা মুসাফির মেহমান সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরে, পরশুদিনও সেইরকম একজনকে সে নিয়ে এসেছিল। লোকটা মশুলের এক সওদাগর। তার সঙ্গে অনেক রাত অবধি খানাপিনা গল্প গুজব করলো। তারপর সকালবেলায় আমি ঘরে গিয়ে দেখি, দুজনের কেউই নাই। মুসাফির তো সকাল হলে চলে যাবে, সেই রকমই ওয়াদা করে মেহমানকে ঘরে আনা হয়, কিন্তু হাসান কোথায় গেল ? আমি ভাবলাম, লোকটাকে হয়তো কোনও সরাইখানায় পৌঁছে দিতে গেছে। অথবা, ভীষণ খেয়ালী ছেলে তো, কোথায় হয়তো একা একাই টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওসব নিয়ে আমি বেশি চিন্তা-ভাবনা করি না। কারণ, হাসানের ধাত আমার চেনা। কখন যে ওর কী খেয়াল চেপে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। যাই হোক, সন্ধ্যাবেলায় ওর এই ঘরে এসে দেখি, বাছা আমার অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এমন কিন্তু সাধারণতঃ হয় না। সকাল দুপুর যেখানে থাকুক, সন্ধ্যাবেলায় সে চাঙ্গা হয়ে একজন পরদেশীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

আমি ভাবলাম, হয়তো সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে শরীরটা ওর ভাল নাই। তাই ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। আমি আর ডাকলাম না। আজ সকালেও দুবার দেখে গেছি—একেবারে অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি আর ঘুম ভাঙ্গালাম না। কিন্তু ভাঙ্গালেই বুঝি ভাল ছিল।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর ওর ঘুম ভেঙ্গেছে। আর তার পর থেকেই এইসব আলতু ফালতু বকে যাচ্ছে। আমি যতই বলি, তুই স্বপ্ন দেখেছিস। ওসব সত্যি না, সত্যি হতে পারে না, ততই সে ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠে। দোষের মধ্যে, আমি ওকে বোঝাতে গিয়েছিলাম, তুই আমার ছেলে আবু অল হাসান—খলিফা নোস। ব্যস, আর যায় কোথা, লাঠি নিয়ে তেড়ে এসে ঠাই ঠাই করে

বসিয়ে দিল আমার পিঠে। এখন আমার কী উপায় হবে—কী করবো?

প্রতিবেশীরা বলে, কাঁদবেন না, কেঁদে কী করবেন। নসিবে যা লেখা আছে তা তো খণ্ডানো যায় না, হাসানের মা। কিন্তু ছেলে আপনার বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। ওকে ঘরে রাখা নিরাপদ নয়। কখন হয়তো আপনাকে ছুরিই বসিয়ে দেবে, বলা তো যায় না কিছু! তাই বলছি, আর দেরি করবেন না, এখুনি ওকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিন। সেখানে অনেক হেকিমবদ্যি আছে। তারা দাওয়াইপত্র দিয়ে সারিয়ে তুলতেও পারতে পারে। সারুক না সারুক, খুন জখমের ভয় তো থাকবে না। এবং চিকিৎসাও হবে। এখানে ঘরে থাকলে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা ছাড়া উপায় নাই। আর তাতে লাভ কী? চিকিৎসা-পত্র তো কিছু হবে না।

মা কাঁদতে কাঁদতে বললো, তোমরা যা ভাল বোঝ, কর।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চল্লিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

তখন প্রতিবেশীরা হাসানের হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে পাগলা-গারদের দিকে। মজা দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। কেউ বা এসে দুচারটে গোত্তা মারে, পাগল না হাতী! হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ—মাকে ধরে মারা হয়েছে? যাও এখন পাগলা-গারদে—ষাঁড়ের চামড়ার ফেটি দিয়ে ফাটিয়ে দেবে পিঠের খাল।

পাগলা-গারদের হেকিম হাসানকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, মাকে মেরেছিস কেন?

হাসান চুপ করে থাকে।

—চুপ করে থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না, বল্, কেন মেরেছিস?

হেকিম ইশারা করতেই একজন নিগ্রো এগিয়ে আসে ষাঁড়ের চামড়ার ফেটি হাতে নিয়ে। সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় হাসানের পিঠে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সে।

—বল, কেন মেরেছিস? তোমার পাগলামী আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

আবার কয়েক ঘা এসে পড়ে ওর পিঠে। এবার আর হাসান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। লুটিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। গোঁ গোঁ করে গোঙাতে থাকে। কিন্তু নিগ্রোটা এলোপাতাড়ি পিটিয়েই চলতে থাকে। সারা শরীর ফেটে দর দর করে রক্ত ঝরে। হেকিম বলে, যা এবার গারদে ভরে রাখ, পরে আবার চড়ানো যাবে।

অন্ধকার কয়েদখানার মধ্যে হাতে পায়ে বেড়ি পরানো অবস্থায় পড়ে থাকে মৃতপ্রায় হাসানের দেহটা। তিন দিন তিন রাত্রি তার আর চৈতন্য ফিরে আসে না।

চার দিনের দিন সে চোখ মেলে তাকায়। সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছে। উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নাই।

প্রহরী এসে টানতে টানতে হাসানকে বাইরে নিয়ে আসে।

—চল, তোমার মা এসেছে দেখা করতে!

ছেলের শরীরের হাল দেখে মা আর চোখের জল চাপতে পারে না, এ কী দশা হয়েছে বাবা, তোর?

হাসানও কাঁদে।

—মা, আমারই ভুল হয়েছিল। স্বপ্নকেই আমি সত্যি বলে ভ্রম করেছিলাম। ঝোঁকের মাথায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তোমাকে আঘাত করে অপরাধ করেছি। তুমি ক্ষমা কর, মা। এই দোজক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চল আমাকে। এখানে থাকলে ওরা আমাকে মারতে মারতেই মেরে ফেলে দেবে। আমি তো পাগল নই মা, তবে কেন, এখানে আমাকে রেখে যাবে? এখানে থাকবো না, হেকিমকে বলে আমার ছুটি করিয়ে বাড়ি নিয়ে চল। কথা দিচ্ছি, আর কখনও তোমাকে কটু কথা বলবো না। তোমার অবাধ্য হবো না। তুমি আমাকে ঘরে নিয়ে চল।

হাসানের মায়ের মুখে হাসি ফোটে। আনন্দে সে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

আল্লাহর দোয়াতেই তুই ভালো হয়ে গেছিস বাবা। চল, বাড়ি চল।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একচল্লিশতম রজনী:

আবার সে গল্প শুরু করে:

মা বললো, যা ঘটে গেছে ও-নিয়ে আর চিন্তা ভাবনা করিস নে, বাবা। আমার মনে হয় মশুলের ঐ সওদাগরটাই যত নাটের গুরু। ওর সঙ্গেই শয়তান এসেছিল সে রাতে। সেই শয়তানটাই ভর করেছিল তোর ঘাড়ে। যাই হোক, আল্লাহর অশেষ করুণা, খুব বেশি মারাত্মক ক্ষতি সে করে যেতে পারেনি।

হাসান বলে, তুমি ঠিকই বলেছ মা, শয়তানই ভর করেছিল আমার ওপর। যাই হোক, তুমি পাগলা-গারদের হেকিমকে বল, সে যেন আমাকে ছেড়ে দেয়।

হাসানের মা হেকিম সাহেবের কাছে গিয়ে বললো, আমার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই, হেকিম সাহেব। আপনি ওকে ছেড়ে দিন।

হেকিম বললো, এটা তো ছেলেখেলা করার জায়গা না। নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় নিয়ে যেতে পার।

কিন্তু পরে আবার যদি এখানে রাখার জন্য কান্নাকাটি কর, তখন কিন্তু আমি আর জায়গা দেব না।

হাসানের মা বলে, তার দরকার হবে না, হেকিম সাহেব। ছেলে আমার ভাল হয়ে গেছে।

—বাঃ, তুমিই তো হেকিম হয়ে গেছ, দেখছি! তা হলে আর আমার দরকার কী? ঠিক আছে, নিয়ে যাও, আমি আর রাখবো না ওকে।

মা-এর হাত ধরে কোনও রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে বাড়ি ফিরে আসতে পারে। সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছিল।

মা গরম জল করে হাসানের মারের ক্ষতস্থানে সেঁক দিয়ে মলম লাগিয়ে দেয়। প্রায় একমাস ধরে ওষুধপত্র লাগাতে লাগাতে ঘা-গুলো একদিন শুকিয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ষাঁড়ের চামড়ার ফেটির মারের কালসিটে পড়া দাগগুলো আর মিললো না।

এই এক মাসের মধ্যে হাসান বাড়ির বাইরে বেরুতে পারেনি। সুতরাং মুসাফির মেহমানও কেউ আসেনি ঘরে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনও কালেই সে মেশে না, তাই একা একা দিন আর তার কাটতে চায় না। মা বললো, যা না, সাঁকোটার ওপর গিয়ে বোস, নিশ্চয়ই আল্লাহ আজ রাতের জন্য কাউকে জুটিয়ে দেবেন।

একমাস পরে আবার এই প্রথম শহর প্রত্যন্তের সেই সাঁকোটার উপর এসে বসে হাসান। সারাদিন শহরের কাজ সেরে সবাই এখন যে যার ঘরে ফিরে যেতে ব্যস্ত। শহরমুখী মানুষ খুবই কম। যারা আসে - তাদের বেশির ভাগই এই বাগদাদ শহরের বাসিন্দা। ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে হয়তো গ্রামে গঞ্জে গিয়েছিল। দিনান্তে তারাই আবার ফিরে আসছে শহরে নিজের ডেরায়। তবে বিদেশী মুসাফির যে একেবারেই আসে না তা নয়। অনেকে হয়তো আরও দূর দেশের যাত্রী। পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা নেমে আসছে দেখে শহরে ঢুকে রাতের জন্য কোনও সরাইখানায় রাত কাটায়। আবার সকাল হলে বেরিয়ে পড়ে। এদেরই একজনকে হাসান তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সে-রাতের মতো সে-ই হয় তার মেহমান—সাথী, তার কথা বলার মানুষ।

বিকেল থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে হাসান। কিন্তু নাঃ, একটি পরদেশী মুসাফিরকেও সে পায় না। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেতে থাকে।

এমন সময় সে দেখলো, সেই মশুলের সওদাগরটা আবার আসছে। হাসান পাশের শস্যক্ষেত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। লোকটার সঙ্গে সে আর বাক্যালাপ করতে চায় না। তার জীবনের এই নিদারুণ বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ এই সওদাগরটা।

কিন্তু সওদাগর-ছদ্মবেশী খলিফা হাসানকে পাশ কাটিয়ে যান না। তিনি আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে হাসানের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যই এই পথে এসেছেন আজ।

—ও আবু অল হাসান ভাই।

খলিফা পাশে দাঁড়িয়ে হাসানকে সজাগ করতে চান। কিন্তু যে জেগে ঘুমাচ্ছে তাকে সজাগ করবে কে? হাসান কোনও সাড়াও দেয় না, মুখও ফেরায় না। এবার খলিফা ওর কাঁধে হাত রেখে ঈষৎ চাপ দিয়ে আবার ডাকেন, হাসান ভাইসাব?

হাসান ঝটকা মেরে কাঁধ থেকে খলিফার হাতখানা সরিয়ে দেয়। কিন্তু মুখে কথা বলে না বা ঘাড় ফেরায় না।

—এ কী রকম ব্যবহার হাসান ভাই, সে দিন রাতে এত গল্প কথা হলো। এত আদর যত্ন করলে আর এই ক'টা দিনের মধ্যেই সব ভুলে গেলে? একেবারে চিনতেই পারছো না?

হাসান মুখ না ফিরিয়েই বলে, চিনতে পারবো না কেন? খুব পাচ্ছি। হাড়ে হাড়ে পাচ্ছি। কিন্তু চিনতে আমি চাই না আপনাকে। আপনি যান।

—না, যাবো না, খলিফা হাসতে হাসতে বলেন, আজ রাতে আর একবার তোমার বাড়িতে আমি মেহমান হবো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

হাসান ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, আপনার মতো বেহুদা মানুষের সঙ্গে আমার কোনও কথা থাকতে পারে না। আপনি আমাকে ক্ষান্তি দিন। পথ দেখুন।

খলিফা বলেন, কিন্তু তাতো হবে না, হাসান ভাই। আজকের রাতটা আমি তোমার বাড়িতেই কাটাবো।

—জুলুম নাকি?

—হ্যা, জুলুমই। তবে মহব্বতের জুলুম। একটা রাতের আলাপেই তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

—ভালোবেসে ফেলেছেন? এই তার নমুনা?

হাসান কামিজ তুলে তার পিঠের কালসিটে দাগগুলো দেখায় খলিফাকে।

—ইস্, আহ-হা, এমন দশা কে করেছে তোমার?

—কে করেছে? বলতে লজ্জা করছে না আপনার? সেদিন আপনি শয়তানকে সঙ্গে করে আমার বাসায় ঢুকেছিলেন। সেই শয়তান আমার ঘাড়ে ভর করে বসেছিল। আর তারই জন্যে পাড়ার লোকে আমাকে পাগল ঠাওরে পাগলা-গারদে ভরে দিয়ে এসেছিল। এবং সেদিন পাগলা-গারদের জল্লাদ ষাঁড়ের চামড়ার ফেটি দিয়ে আমার পিঠের খাল খিঁচে নিয়েছিল—এ সেই দাগ। আবার আপনি যেতে চাইছেন আমার বাড়ি! না না, দোহাই আপনার, আপনি আজ অন্য কোথাও যান। আপনি গেলে আবার শয়তান আমার ঘাড়ে ভর করবে। আবার সেই পাগলা-গারদ, আবার সেই ষাঁড়ের চামড়ার চাবুকের ঘা —উফ্, না না, সে আমি ভাবতেও পারবো না। দোহাই আপনার, আপনি চলে যান। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো না।

খলিফা হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, আমার জন্য তোমার এত তখলিফ হয়েছে—ভাবতে পারছি না, হাসান ভাই। যাই হোক, আমি তোমার যত দুঃখ তাপেরই কারণ হয়ে থাকি, আর একবার আমাকে নিয়ে চল তোমার বাড়িতে। যে ক্ষতি সেদিন আমি করেছি তোমার, একটিবার আমাকে সুযোগ দাও, আমি তার খানিকটা পূরণ করে দেব।

হাসান বলে, ক্ষতিপূরণ কী দিয়ে করবেন? এ ক্ষতিপূরণের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আমার নসিবে যা লেখা ছিল, তাই ঘটেছে। এ নিয়ে আপনার কাছে আমার কোনও নালিশ নাই। শুধু এই অনুরোধ, আপনি আর আমার বাসায় যাবেন না। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

—এ সব তো রাগের কথা, ভাইসাব, না না, তুমি যদি রাগ করে থাক, তবে যে আমার দোজকেও জায়গা হবে না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ দাও। আমি কথা দিচ্ছি, এরপর আর কোনও দিন্ন তোমাকে বিরক্ত করবো না। শুধু আজকের রাতটা নিয়ে চল। তোমার পুরো কাহিনীটাও শুনবো। এবং আমার দ্বারা যা করা সম্ভব, তাও করবো।

খলিফা হাসানকে বুকের মধ্যেই জড়িয়ে ধরে থাকে।

—আগে বল, হ্যাঁ, নিয়ে যাবো। তবেই ছাড়বো, নইলে ছাড়বো না।

হাসানের মনটা ঈষৎ নরম হয়। না করতে পারে না। বলে, ঠিক আছে, চলুন। বাসায় গিয়ে আপনাকে বলবো সেই অদ্ভুত কাহিনী।

বাড়িতে আসার পর কিন্তু হাসান একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখলো না। নানারকমের খানা এক সঙ্গে বসে খেল দুজনে। তারপর নিজে হাতে শরাবের পাত্র পূর্ণ করে খলিফার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এবার আমার সেই কাহিনী শুনুন।

এই সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো তেতাল্লিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

হাসানের মুখ থেকে সব শোনার পর খলিফা বড় ব্যথিত হয়ে বলেন, সবই আমার দোষে ঘটেছে ভাইসাব। সেদিন যাবার সময় দরজাটা আমি বন্ধ করে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেই ফাঁকে শয়তানটা ঢুকে পড়েছিল তোমার ঘরে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে তো দুঃখ করে লাভ নাই। তবে আমি নিজেকে বড় অপরাধী মনে করছি। কী করে এর খেসারত দেওয়া যায় তাই ভাবছি।

হাসান বলে, ও-নিয়ে আপনি ভাববেন না। আর খেসারতের কথা তুলছেন কেন? পয়সা কড়ি দিয়ে এর ক্ষতি পূরণ করা যায়? এখন ওসব ভুলে যান তো, ভাল করে মৌজ করুন।

খলিফা জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, হাসান স্বপ্নের মধ্যে খলিফার প্রাসাদে যে মেয়েগুলোকে দেখেছিলে তার মধ্যে সব চেয়ে কোন্‌টি তোমার মনে ধরেছিল? মানে কাকে দেখে তোমার খুব ভাল লেগেছিল?

হাসান একটুক্ষণ চিন্তা করে বললো, চুমকী।

খলিফা আর কিছু বললেন না।

হাসানই বললো, মেয়েটির কী রূপ, কী যৌবন, আর কী সুন্দর মিষ্টি করে হাসতে জানে। এখনও ওর সেই হাসি হাসি মুখখানা আমার চোখের সামনে ভাসছে। এতটা বয়স হলো, শাদী করিনি কেন জানেন? কোনও মেয়েকেই বিবি করার যোগ্য মনে হয়নি। মায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনেক মেয়েকেই দেখেছি, কিন্তু কেউই মনের ওপর কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি।

কিন্তু চুমকীকে দেখা মাত্র আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হলে কী হবে, সে তো অলীক স্বপ্ন মাত্র। তবে এও ঠিক, শাদী যদি করতে হয় তবে ঐ মেয়েকেই। জানি না পাবো কিনা, কখনও যদি চুমকীর মতো কোনও মেয়ের দেখা পাই জীবনে, তবে যত টাকাই দেনমোহর দিতে হোক, দিয়ে'তাকে আমার বিবি করে আনবো।

পেয়ালা যত নিঃশেষ হয় নেশাও ততো জমতে থাকে। এবং সেই সঙ্গে গাম্ভীর্যের মুখোশও খুলে পড়ে যায়। হৃদয়ের কামনা বাসনার একান্ত গোপন কথাও অবলীলাক্রমে বলতে থাকে হাসান।

—মনে যে বড় সাধ ছিল, চুমকীকে নিয়ে ঘর বাঁধবো। সে হবে আমার মালিনী, আর আমি হবো তার মালঞ্চের মালাকার। কত সুন্দর সুখের হতে পারতো, ভাবুন তো ?

খলিফা ঘাড় নাড়েন, তা ঠিক। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার গরমিল আছে বলেই মানুষ অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে উল্কার মতো ছুটে চলে।

নেশায় হাসানের চোখ ছোট হয়ে আসে। কথা জড়িয়ে যেতে থাকে। এই উপযুক্ত সময়। হাসানের শরাবের পেয়ালায় এক ডেলা আফিঙ ফেলে দেন খলিফা।

পেয়ালাটা এক চুমুকে শেষ করে রেখে দেয় হাসান। এর কিছুক্ষণের মধ্যে সে অসাড় হয়ে নেতিয়ে পড়ে যায় গালিচায়।

খলিফার নফররা ইশারার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল বাড়ির পাশে। দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে হাসানকে কাঁধে তুলে তারা রাস্তায় নেমে পড়ে। এবার খলিফা বেরুবার আগে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চুয়াল্লিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

ঠিক আগের দিনের মতো হাসানের সাজ-পোশাক খুলে নিয়ে খলিফার নৈশ-বাস পরানো হয়। তারপর খলিফার নিজস্ব কামরায় পালঙ্ক-শয্যায় শুইয়ে দেয় নফররা।

খলিফা এর আগের দিন প্রাসাদের সকলকে ডেকে ডেকে যে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন আবার সেই নির্দেশ দেন।

—খবরদার, কোনও ভাবেই যেন সে বুঝতে না পারে, সে খলিফা নয়।

জাফর এবং মাসরুরকেও যথাযোগ্য তালিম দেন তিনি।

—সকাল হতেই তোরা সব হাসানের পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াবি। তার ঘুম ভাঙ্গতেই যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদায় তাকে সালাম কুর্নিশ করবি। মোটকথা মনে করবি, সেই তোদের খলিফা।

পরদিন ভোরে মাসরুর খলিফাকে জাগিয়ে দিয়েই হাসানের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার অনেক আগে থেকেই সে-ঘরে হাজির ছিল প্রাসাদের মেয়েরা। বিশেষ করে যে মেয়েগুলো খানাপিনা করিয়েছিল সেই মেয়েগুলো দাঁড়িয়েছিল হাসানের একেবারে চোখের সামনে। চোখ খুলতেই যাতে হাসান ওদের সকলকে এক জায়গায় দেখতে পায়। এদের সবার পুরোভাগে দাঁড় করানো হয়েছিল চুমকীকে।

ওপাশে মঞ্চের ওপর নানারকম তারের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছে আরও একদল সুন্দরী মেয়ে। চুমকী একটা রুমালে খানিকটা ভিনিগার ভিজিয়ে হাসানের নাকে ধরে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসান তিনবার হেঁচে ওঠে। সেই সঙ্গে তার আফিঙের নেশাটা কেটে জল হয়ে যায়।

এবং তখুনি, মেয়েরা বাজনা বাজাতে শুরু করে। বাজনার সুমধুর আওয়াজে খলিফার ঘুম ভাঙানো হয়—প্রতিদিন।

হাসান চোখ মেলে তাকায়। এবং খলিফার শয়নকক্ষের সেই জাঁকজমক প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কে একবার চিৎকার করেই সে থেমে যায়।

সেই সোনার পালঙ্ক, সেই মখমলের শয্যা, সেই আটাশটি সুন্দরী কন্যা, সেই নর্তকী নটীরা—অবিকল সব আবার তার দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে।

সারা ঘরময় এক অসহনীয় নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। হাসান শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে। সর্বনাশ। আবার তাকে পাগলা গারদে ভরবে। আবার সেই নিগ্রো জহ্লাদের চামড়ার চাবুকের কশাঘাত।

—উফ্, না না না, এ হবে না। আমাকে মুক্তি দাও, বাঁচাও বাঁচাও।

তার চিৎকার—আর্তনাদ প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে।

—ওরে শয়তান, মশুলের সওদাগর, তোর ছলনায় আবার আমি ভুললাম? একবারেও শিক্ষা হলো না আমার? হায় হায়, একি সর্বনাশ হলো। আমি তার কী ক্ষতি করেছিলাম? আল্লাহ যেন মশুলের সব সওদাগরকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। সারা মশুল একদিন ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ে যেন, আল্লাহ তোমার দরবারে এই আমার একমাত্র আর্জি।

হাসান পরপর অনেক বার চোখ দুটো খুললো এবং বন্ধ করলো। কিন্তু না, সে স্বপ্ন দেখছে না বা ঘুমিয়েও নাই। আবার সে চিৎকার করে ওঠে, ওহে হাসান, আবার ঘুমিয়ে পড়—সে ঘুম যেন তোমার আর না ভাঙে। শয়তানটা তোমার ঘাড়ে ভর করে আছে। সে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তুমি ঘুমিয়েই থাক।

এই বলে সে আবার দুহাতে মুখ ঢেকে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শোয়।

খলিফা পর্দার আড়ালে বসে হাসানের এই হা-হুতাশ দেখতে থাকলেন।

বেচারা আবু অল হাসান কিন্তু আদৌ ঘুমাতে পারে না। চুমকী ওর

শয্যার এক পাশে বসে মধুর করে ডাকে, ধর্মাবতার, নামাজের সময় হয়ে এল, এবার উঠতে আজ্ঞা হোক।

হাসান মুখের ঢাকা না খুলেই আবার চেঁচিয়ে ওঠে, আল্লাহ এর সাজা দেবেন, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা শয়তানীরা।

কিন্তু চুমকী নিরস্ত হয় না। বলতে থাকে, জাঁহাপনা বোধ করি গত রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে থাকবেন। আমি তো শয়তান নই, ধর্মাবতার। আমার নাম চুমকী। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে তুলুন, এই প্রার্থনা করি। আমাকে তো আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন জাঁহাপনা, আমি সেই চুমকী!

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঁয়তাল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

আবু অল হাসান হাতের ঢাকা সরিয়ে চোখ মেলে তাকায়। তার সামনে চুমকী—হ্যাঁ সেই চুমকীই তো বসে আছে। আর ওরা যারা ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও সকলে তার চেনা। শোভা চুনী পান্না, আরও অনেকে।

হাসান দুহাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ায়, কে বাবা, তোমরা? আর আমিই বা কে?

মেয়েগুলো সমস্বরে তাদের নিজের নাম উচ্চারণ করে। তারপর এক সঙ্গে সবাই বলে, আপনি আমাদের প্রভু—ধর্মাবতার খলিফা হারুন অল রসিদ, তামাম আরব দুনিয়ার মালিক।

—কী বললে? আমি সেই ছিটিয়াল আবু অল হাসান নই?

মেয়েরা এক সঙ্গে বলে ওঠে, আমাদের ধর্মাবতারের ওপর দুষ্ট শয়তান ভর করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, সে খতম হোক। আপনি আবু অল হাসান নন—আমাদের পরম পিতা।

হাসান বলে, ঠিক আছে, একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। এই চুমকী—তুমি তো চুমকী? এদিকে এগিয়ে এসে আমার এই কানটা কামড়ে ধর দেখি।

চুমকী হাসানের কানের কাছে মুখ এনে এ্যইসা জোরে এক কামড় বসিয়ে দেয় যে, হাসান যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে বলে, আঃ ছাড় ছাড়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি, আমি তোমাদের ধর্মাবতার খলিফা হারুন অল রসিদ।

এই সময়ে বাদ্যযন্ত্রে নাচের বোল বেজে ওঠে। এবং মেয়েরা রঙ্গ নাচানো গান গাইতে শুরু করে।

হাসান আর সহ্য করতে পারে না। সেই মখমলের কুসুমাদপি কোমল শয্যায় তার দেহটা পালঙ্কের এ পাশ থেকে ও পাশ অবধি গড়াগড়ি খেতে থাকে! এমন ভাবে সে হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করে যে, মাথার টুপীটা ছিটকে গিয়ে মেঝের গালিচার ওপর পড়ে। এরপর হাসান তার অঙ্গের মহামূল্যবান সাজ-পোশাক ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।

হঠাৎ সে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তখন, বলতে গেলে, সে একেবারে

উলঙ্গ। পাগলের মতো ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে গালিচার ওপর। সামনে যে আটাশটি পরমাসুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা হাসানের প্রায় উলঙ্গ শরীরটা না দেখার ভান করে পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আড়-চোখে দেখতে থাকে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই আবু অল হাসানের। এলোপাতাড়ী নেচে চলে। এবং হো হো হা হা হি হি করে হাসির বন্যায় হাবুডুবু খায়।

খলিফা আর পর্দার আড়ালে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাসতে হাসতে তাঁর পেটে খিল ধরে যাওয়ার দাখিল! পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি।

—আবু অল হাসান, আমার ভাই, তুমি আমার মরা মুখ দেখতে চাও? এই তোমার সামনে হাজির হয়েছি আমি মশুলের সওদাগর। এবার এস, তোমার প্রতিশোধ যা নেবার আছে নাও, আমি সানন্দে মাথা পেতে দিচ্ছি।

মুহূর্তের মধ্যে হাসানের তাণ্ডব-নৃত্য বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েরা নিজেদের গুটিয়ে নেয় একপাশে। সারা ঘরে নেমে আসে গভীর নিস্তব্ধতা। হাসান ঘাড় ফিরিয়ে খলিফাকে দেখে চিনতে পারে—এই তো সেই মশুলের সওদাগরটা। সঙ্গে সঙ্গে গত রাতের সব ঘটনা তার চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে। হাসান গর্জে ওঠে, হুমু, তা হলে এসব তোমারই কারসাজী! এতক্ষণে বুঝলাম। দাঁড়াও, হাতে যখন একবার পেয়েছি, কী করে শিক্ষা দিতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। বার বার ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও, এবার—এবার কোথায় যাবে?

খলিফা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

—তুমি আমার চির-জীবনের সাথী—আমার ভাই—আবু অল হাসান। আমার পবিত্র পূর্বপুরুষদের নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার মনের সব কামনা-বাসনা, সাধ আহ্লাদ আমি পূরণ করবো। আমার খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। ভাই বলে যখন বুকে টেনে নিয়েছি, আশা করি সেসব তুমি অতীতের মিথ্যা দুঃস্বপ্ন বলে ভুলে যাবে ভাই। আজ থেকে তুমি আমার পরিবারের একজন পরমাত্মীয় হয়ে এই প্রাসাদেই থাকবে, হাসান।

এই বলে খলিফা হাসানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন।

খলিফার নির্দেশে মেয়েরা নতুন জমকালো সাজ-পোশাক এনে হাসানকে পরালো। খলিফা বললেন, বাঃ সুন্দর মানিয়েছে। আচ্ছা এখন বল, হাসান, কি তোমার অভিপ্রায়। কী পেলে তুমি খুশি হও। আমি তোমাকে সব উজাড় করে দিতে প্রস্তুত, ভাই। বল। কোনও দ্বিধা সঙ্কোচ ক'রো না।

হাসান আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ করে বলে, আমি সারাজীবন জাঁহাপনার ছায়ানুগামী এক বান্দা হয়ে থাকতে চাই, ধর্মাবতার।

হাসানের রুচি প্রকৃতি সাধারণ থেকে অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা। খলিফা মুগ্ধ হয়ে বললেন, এই ধরনের নিঃস্বার্থ মহব্বত দোস্তী আমার খুব পছন্দ, হাসান। আজ থেকে তুমি যে শুধু আমার ভাই এবং এক গেলাসের ইয়ার হলে

তাই নয়, প্রাসাদের যত্রতত্র, যখন তখন তোমার অবাধ গতিবিধি রইলো। এর জন্য আর কোনও অনুমতির প্রয়োজন হবে না। রাত দুটোতেও যদি তুমি আমার হারেমের কোনও কামরায় ঢুকতে চাও তাতেও কেউ বাধা দেবে না।' দরবার চলাকালেও দরবার-মহলে তুমি ইচ্ছে করলেই ঢুকতে বা বেরুতে পারবে। তার জন্যও কোনও অনুমতির দরকার হবে না। আমার চাচার মেয়ে—আমার পেয়ারের খাস বেগম জুবেদার মহলে অন্য কারো প্রবেশ অধিকার নাই। কিন্তু তাকেও আমি জানিয়ে দেব, এখন থেকে তার মহলে আমি যখন থাকবো, অবাধে তুমি সেখানে যেতে পারবে, এবং তার সংগে আলাপ-সালাপ করতে পারবে। তোমার সামনে সে বোরখা পরে পর্দানশিন হয়ে চলবে না।

শুধু এই নয়, হাসানের বসবাসের জন্য সুন্দর সাজানো গোছানো প্রাসাদের একটি নিভৃত মহল নির্দিষ্ট করে দিলেন খলিফা। এবং তার অবসর-ভাতার প্রথম কিস্তি বাবদ দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ করে দিয়ে বললেন, তুমি আমার প্রাসাদে থাকবে আমার সমান মর্যাদায়। সুতরাং আহার বিহার বিন্যাস ব্যসন—কোনও ব্যাপারেই যাতে তোমার কোনও রকম অভাব অসুবিধা না ঘটে, সে সব দেখার দায় আমার রইলো।

এরপর খলিফা দরবারে যাওয়ার উদ্যোগ করতে থাকলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতচল্লিশতম রজনী:
আবার সে বলতে শুরু করে:

আবু অল হাসান মা-র কাছে ছুটে যায়।

—মা, মা, মাগো, আজ তোমাকে কী মজার কথা শোনাবো!

হাসানের আনন্দ আজ ধরে না।

মা অবাক হয়। ভাবে, এ আবার ছেলের কী খেয়াল। হাসান বলতে থাকে, জান মা, যাকে আমরা মশুলের সওদাগর ভেবেছিলাম, আসলে তিনি স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ। সওদাগরের ছদ্মবেশে আমার ঘরে এসেছিলেন। তিনিই আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই হুকুমে প্রাসাদের তাবৎ নারী পুরুষ আমাকে খলিফা বলে সালাম কুর্ণিশ করেছিল। উজির জাফর আর মাসরুর আমাকে দরবারে নিয়ে গিয়ে মহামান্য ধর্মাবতারের মসনদে খলিফার মর্যাদায় বসিয়ে শাসনদণ্ড হাতে তুলে দিয়েছিল সেদিন। তোমরা আমাকে সবাই মিলে পাগল বলে পাগলা-গারদে দিয়ে এলে। কিন্তু দেখ, আমি তো একটাও মিথ্যে বলিনি, মা। খলিফার খেয়াল হয়েছিল তাই তিনি আমাকে একদিন কা সুলতান বানিয়ে আড়ালে থেকে মজা লুটেছেন। যাই হোক, পাগলা-গারদে আমার মারধোর খাওয়ার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও আহত হয়েছেন। তবে দুঃখ করো না মা—দুঃখের দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। এবার সুলতানের অনুগ্রহে আমরা দারুণ আনন্দ বিলাসের মধ্যে দিন কাটাবো—সে ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন। আমার জন্য তিনি প্রাসাদের

একটা মহল বন্দোবস্ত করেছেন। আজ থেকে আমি প্রাসাদেই থাকবো। তুমি কোন চিন্তা করো না মা, প্রত্যেকদিন এসে তোমাকে আমি দেখে যাবো এখানে।

এই বলে মার কাছে বিদায় নিয়ে হাসান আবার প্রাসাদে ফিরে আসে।

হাসানের প্রতি খলিফার এই বদান্যতা এবং বন্ধুত্বের সমাচার স্বল্প সময়ের মধ্যে সারা সলতানিয়তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। এমন কি আশে পাশের মুলুকেও এই মজাদার মুখরোচক কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকলো।

এর পর খলিফার সহৃদয় সাহচর্য এবং নির্মল হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে হাসানের দিনগুলি মধুর হয়ে উঠতে থাকে। খলিফা আর তাকে নিয়ে উগ্র রসিকতায় মাতেন না কখনও। বলতে গেলে, হাসানই তখন তাঁর দিবারাত্রের একমাত্র সঙ্গী হয়ে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। জুবেদার মহলে, সেখানে খলিফার কোনও ইয়ার দোস্ত কারুরই প্রবেশ অধিকার নাই, হাসানকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা সেখানে নির্বিবাদে ঢুকে পড়েন। জুবেদাও আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখে না।

জুবেদা খেয়াল করে, এই হাসান ছেলেটি যখনই খলিফার সঙ্গে এ মহলে আসে, তার একান্ত অনুচর চুমকীবাঁদীর দিকেই সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। আর চুমকীও এত চঞ্চল ছটফটে মেয়ে—ঠায় বসে থাকে, এক পা নড়ে না। জুবেদার ভুরু কুঁচকে ওঠে, ব্যাপারটা কী, একবার দেখতে হয়।

একদিন জুবেদা খলিফাকে একান্তে পেয়ে বলে, ধর্মাবতার, একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন? আমার মনে হয়, চুমকী আর হাসান প্রেমে পড়েছে। আচ্ছা, ওদের দুটির শাদী দিয়ে দিলে হয় না।

খলিফা বলেন, অসম্ভব কিছুই না। চুমকী পরমাসুন্দরী, ডাগর মেয়ে। আর হাসান সেও তো সুঠামসুন্দর স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান। মহব্বত হতেই পারে—স্বাভাবিক। এবং আমার বিবেচনায়, এ শাদী দোষেরও কিছু হবে না। কিছুদিন ধরে আমি তোমাকে কথাটা বলবো বলবো করছিলাম, কিন্তু ঠিক মতো সময় পরিবেশ পাচ্ছিলাম না। যাক, আজ কথাটা তুলে ভালোই করেছ। আমার মনে হয়, আর দেরি না করে শুভ কাজ শীঘ্র সমাধা করাই শ্রেয়ঃ।

জুবেদা বললো, সে তো একশো বার। কিন্তু চুমকীকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি। আপনিও হাসানের মতামতটা একবার যাচাই করে দেখে নিন। যদিও জানি, ওরা পা বাড়িয়েই আছে, তবু এ কর্তব্য করা আমাদের উচিত।

খলিফা বলেন, বাঃ, চমৎকার বলেছ তো, চাচার মেয়ে।

তখুনি চুমকী আর হাসানকে ডাকা হলো সেখানে। জুবেদা চুমকীকে জিজ্ঞেস করে, কীরে, হাসানকে তোর পছন্দ? শাদী করবি ওকে?

মুহূর্তে চুমকীর সারা মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারে না। একটু পরে সে জুবেদার পা দুখানা জড়িয়ে ধরে।

জুবেদা হাসতে হাসতে বলেন, ধর্মাবতার, আমার চুমকী রাজি। এবার আপনি আপনার হাসানকে জিজ্ঞেস করুন।

আবু হাসান বলে, ধর্মাবতার, আপনার মহানুভবতার সায়রে আমি নিয়ত অমৃত সুধা পান করছি। কিন্তু এই পরমাসুন্দরী কন্যাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করে ঘরে নিয়ে যাওয়ার আগে, আমাদের মহামান্যা মালকিন বেগমসাহেবা অনুমতি করলে আমি তাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।

জুবেদা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেন, প্রশ্নটা কি শুনি।

—আমি জানতে চাই, আমার রুচি প্রকৃতির সংগে তার মিল হবে কিনা। আমার বলতে কোনও দ্বিধা নাই, মদ আমার বড় প্রিয়, মদে আমি আসক্ত। মাংস খেতে আমি ভীষণ ভালবাসি। সুমধুর সংগীত এবং কাব্যালোচনা করে পরমানন্দে দিন কাটাতে চাই। যদি চুমকীও এসব পছন্দ করে এবং সহধর্মিনী ও সহমর্মিনী হয়ে এই বিলাস ব্যসনের সমান ভাগীদার হতে পারে, তবে তাকে গ্রহণ করতে আমার কোনও অমত নাই। কিন্তু এসব যদি সে পছন্দ না করে তবে আমার এক কথা, সারাজীবন আমি চিরকুমার হয়েই কাটাবো।

জুবেদা খিলখিল করে হেসে চুমকীর দিকে তাকান, কী রে, রাজি? দেখ পারবি তো সামাল দিতে?

চুমকী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

খলিফা তখনি কাজী আর সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন। শাদীনামা লিখে দিন কাজী। সাক্ষীরা সইসাবুদ করে দিয়ে বিদায় নিল।

এরপর একমাস ধরে প্রাসাদে আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যেতে থাকলো। নাচ গান হৈ-হল্লায় মেতে উঠলো প্রাসাদ-পুরবাসীরা। খানা-পিনার মহোৎসব চলতে থাকলো নিত্য। সরাবের নেশায় মৌজ করে গাথা কাব্য সংগীতে মশগুল হয়ে রইলো চুমকী আর হাসান। দুহাতে দেদার খরচা করে ইয়ার বন্ধুদের তুষ্ট করতে লাগলো ওরা। প্রতিদিন পোলাও বিরিয়ানী মোরগ মোসাল্লাম, কাবাব কোর্মা কোপ্তা প্রভৃতি নানাবিধ দামী দামী খানা এবং মেঠাইমণ্ডা এবং দুষ্প্রাপ্য ফলমূল দিয়ে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করে চললো।

এইভাবে একদিন ওরা দেখলো, সব সঞ্চিত বিলাস সামগ্রী এবং অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেছে। এদিকে খলিফাও হুকুমতের কাজে নানা ব্যস্ততার মধ্যে থাকার দরুন যথাসময়ে ভাতাও পাঠাতে ভুলে গেছেন।

এইভাবে একসময় ওরা এমন এক দীন দশায় উপনীত হলো, যেদিন ওরা আর পাওনাদারদের সামান্যতম পাওনার টাকাও মেটাতে পারে না।

চুমকী বা হাসান কেউই লজ্জায় জুবেদা অথবা খলিফার কাছে তাদের অভাবের কথা জানাতে পারে না।

হাসান বলে, আমরা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সব পয়সা-কড়ি দুহাতে উড়িয়ে দিলাম। এটা কিন্তু মোটেই উচিত কাজ হয়নি চুমকী। এখন কোনও ক্রমেই পয়সার জন্য আমি খলিফার কাছে হাত পাততে পারবো না। এবং তুমি যে জুবেদা বেগমের কাছে বলবে, তাও আমি পছন্দ করতে পারছি না।

চুমকী বলে, কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে? খলিফা ভীষণ খেয়ালী মানুষ। তাছাড়া এখন তিনি দরবারের জটিল কাজে ফেঁসে আছেন। এ অবস্থায় ভাতার টাকা কবে দেবার হুকুম তিনি দেবেন, কে জানে।

হাসান বলে, আমার মাথায় একটা ফন্দী এসেছে।

—কী ফন্দী।

হাসান বলে, তোমাকে খানিকটা সাহায্য করতে হবে।

—একশো বার করবো, কিন্তু কারো কাছে কর্জ বা ভিক্ষে করতে ব'লো না। ওটি পারবো না।

—তোমার কী করে মনে হ'লো চুমকী, তোমাকে আমি অত ছোট হীন কাজে পাঠাবো। এই সমস্যা কাটাবার একটা সুন্দর মতলব আমি এঁটেছি।

—কী মতলব, বল না গো।

চুমকী বায়না ধরে।

হাসান বলে, আমরা মরে যাবো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আটচল্লিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চুমকী ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, মরে যাবো? মানে? না না, খোদা কসম, আমি মরতে-টরতে পারবো না। সে তুমি, মরতে হয়, একাই মরগে। ওরে বাবা, না না, আমি মরতে পারবো না। আমি কিছুতেই মরতে পারবো না।

হাসান রাগ করে না। বরং মৃদু হাসতে হাসতে বলে, সারাদিন আমি চিরকুমার থাকতে চেয়েছিলাম কেন, জান? রুচি প্রকৃতি এবং বুদ্ধিতে সমতুল না হলে কোনও মেয়েকে আমি জীবন-সঙ্গিনী করবো না, এই ছিল আমার পণ। তা তুমি যখন জানালে, আমার সঙ্গে সব দিক থেকেই তোমার মিল হবে, তখনই আমি এ শাদীতে সায় দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের সঙ্গে তোমার বিশেষ কোনই ফারাক নাই। আমার পুরো কথাটা না শুনেই তুমি লাফাতে ঝাঁপাতে শুরু করলে; এ কী ব্যাপার? তোমার কী করে ধারণা হলো, আমরা এই একটা অতি নগণ্য কারণে মৃত্যু বরণ করবো। গোড়াতেই তো বলেছিলাম, সমস্যাটার সুরাহা করার জন্য একটা ফন্দী এঁটেছি। কী সে ফন্দী, তা আগে ভালো করে শোন! তা না, তার আগেই তুমি তোমার রায় দিয়ে দিলে? আরে, আমি কী তোমাকে সত্যি সত্যিই মরতে বলতে পারি? মরার ঢং করতে হবে। বুঝলে, মরার অভিনয় করে পড়ে থাকতে হবে। ব্যস, আর দেখতে হবে না, তা হলেই দেখবে মোহরে ভরে যাবে ঘর।

চুমকী ভুরু কুঁচকায়। কিছুতেই সে আঁচ করতে পারে না। বলে, কী করে?

হাসান গম্ভীর হয়ে বলে, খুব ভাল করে মন দিয়ে শোন। আমি মরে পড়ে থাকবো। তুমি একখানা কালো কাপড় দিয়ে আমার সারা শরীর ঢেকে দেবে।

এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে আমাকে শুইয়ে রাখবে। আমার মুখ ঢাকা দেবে আমার মাথার টুপী দিয়ে। মনে থাকে যেন, মৃতদেহের পা পবিত্র কাবাহর দিকে করে রাখতে হয়। এর পর তুমি তোমার ঢংএ মরণ-কাঁদা কাঁদতে কাঁদতে কপাল বুক চাপড়াবে, মাথার চুল, অঙ্গের সাজ-পোশাক ছিঁড়তে উদ্যত হবে। তাই বলে সত্যি সত্যিই কিন্তু ছিঁড়ো না তোমার চুল।

তোমার কান্নাকাটির আওয়াজে সবাই ছুটে এসে সমবেদনা জানাবে। এবং তারাই জুবেদা বেগমকে খবর দেবে। তুমিও একটুক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে পাগলিনীর মতো ছুটে যাবে তার কাছে। জুবেদাকে দেখেই তুমি আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে তার পায়ের ওপর—ব্যস, তার পরেই মূর্ছা।

মনে থাকে যেন, যতক্ষণ না তোমার চোখ মুখ গোলাপ জলের ঝাপটা মেরে ধুইয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ দাঁত-কপাটি খুলবে না কিছুতেই।

অনেকক্ষণ পরে তুমি যখন একটু সুস্থ হবে সেই সময় জুবেদা বেগম তোমাকে সমবেদনা সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, শোক ক'রো না। মানুষ চিরকাল তো বেঁচে থাকে না। কবে কার দিন ফুরাবে, কে বলতে পারে।

এর পর দেখবে, আমাদের ঘরে টাকার পাহাড় জমে উঠবে!

চুমকী বলে, বাঃ চমৎকার! তা সত্যিই তো, মানুষের মৃত্যুর কথা কিছু বলা যায় না। যে-কোন কারণেই যে-কোনও মানুষের যখন তখন মৃত্যু হতে পারে। ঠিক আছে। তুমি তা হলে মর, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

চুমকী হাসানকে ন্যাংটো করে কার্পেটের ওপর শোয়ালো। পা দুখানা যাতে মক্কার দিকে থাকে তাও লক্ষ্য রাখলো। মুখখানা ঢেকে দিল মাথার টুপি দিয়ে।

তারপর কপাল বুক চাপড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা প্রাসাদে রটে গেল হাসান মারা গেছে। চুমকী চুল উস্কোখুস্কো করে আলু-থালু বেশে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল জুবেদার কাছে। জুবেদা তাকে বুকে জড়িয়ে অনেক আদর, করে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন।

কিন্তু চুমকীর কান্না থামে না, আমার আর বেঁচে থাকার সাধ নাই মালকিন, এ জীবন আমি আর রাখবো না।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নাই। স্বামী কারো চিরকাল থাকে না। তোমার এই ভরা যৌবন, জীবনের কোনও স্বাদ আহ্লাদই পূরণ হয়নি, এখনই মরবে কেন?

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করে না চুমকী। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদে আর কপাল বুক চাপড়ায়।

চুমকীর দঃখে হারেমের সব মেয়েরই চোখ জলে ভরে যায়। বেগম জুবেদা তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দশ হাজার দিনারের একটা তোড়া চুমকীর হাতে দিয়ে বলে, যাও, স্বামীর শেষ কাজটুকু ভাল করে সমাধা কর গে। তার আত্মার যেন মঙ্গল হয়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো উনপঞ্চাশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

মোহরের থলেটা বগলদাবা করে চুমকী ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাসানকে ঠেলা তোলে, এই, ওঠ ওঠ, বাজিমাত করে দিয়ে এসেছি. এই দ্যাখো !

হাসান থলেটা বুকে জড়িয়ে আনন্দের চোটে চিৎকার করে উঠতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চুমকী ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, চুপ। একেবারে কোনও আওয়াজ তুলবে না। ওরা জানতে পারলে সব মাটি হয়ে যাবে।

হাসান চুমকীকে একটা চুমু খেয়ে বলে, কে বলে তোমার বুদ্ধি কম। এই তো দিব্যি মাথাটা খুলে গেছে, দেখছি।

মোহরগুলো মেঝের ওপর ঢেলে স্তূপাকার করে ফেলে হাসান। আজ তার কী আনন্দ। উফ্ কত টাকা! কী মজা ফুর্তিই না করা যাবে!

এই বলে কোমরে আর থুতনিতে হাত রেখে পাছা দুলিয়ে মেয়েমানুষের মতো নাচতে থাকে হাসান। হাসির তোড় আর চেপে রাখতে পারে না চুমকী। মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে দেয়। গাল দুটো টুকটুকে রাঙা হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

হাসান কিন্তু একটানা নাচতেই থাকে। চুমকী বলে, তুমি একটা কী! লজ্জা শরমের বালাই নাই?

হাসান অবাক হয়, কেন? লজ্জা শরম হবে কেন?

একখানা মোহর তুলে চুমকী হাসানের নিবিবন্ধ তাক করে ছুঁড়ে মারে, বে-শরম কাহিনা।

হাসান নিঃশব্দে হেসে ওঠে, অ, এই কথা। তা ঘরে তো তুমি ছাড়া আর কেউ নাই, বিবিজান।

—তা হোক। তুমি ইজার পর।

এই কথায় হাসান ভীষণ উত্তেজিত বোধ করে। ছুটে গিয়ে সে চুমকীর পলকা দেহখানা দু হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরে গভীর আশ্লেষে এক দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দেয় ওর পাকা আঙুরের মতো টসটসে অধরে। চুমকীও দুহাতে জড়িয়ে ধরে থাকে হাসানের গলাটা।

হাসান অনেক অনেকক্ষণ ধরে আদর সোহাগ করতে থাকে চুমকীকে। চুমকীও এলিয়ে পড়ে থাকার পাত্রী নয়। সে যেমন নিতে জানে, তেমনি দিতেও জানে উজাড় করে। হাসান এক সময় বলে, কিন্তু প্রিয়তমা, এখানেই তো এ খেলার ইতি নয়। এবার তোমার পালা। তোমাকে মরতে হবে।

চুমকী বীরাঙ্গনার মতো দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কী দেখাও ভয়। ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়?

চুমকীর মুখে হাত চাপা দেয় হাসান, আস্তে। শুনতে পাবে।

চুমকী জিভ কাটে। হাসান বলে, শোন, তুমি জুবেদার কাছ থেকে যেমন দশ হাজার দিনার বাগিয়ে আনলে আমিও তেমনি, দেখে নিও, খলিফাকে বোকা

বানিয়ে কেমন মালকড়ি বের করে নিয়ে আসি। খলিফা ভাবেন, তিনিই সবচেয়ে চালাক এ দুনিয়ায়। কিন্তু দেখো, চালাকেরও বাবা আছে, তা আমি ধর্মাবতারকে এবার দেখিয়ে দিচ্ছি।

হাসান বলে, আচ্ছা আর আদর সোহাগ নিয়ে থাকলে চলবে না। তুমি এখন মর।

চুমকীকে একইভাবে বিবস্ত্র করে হাসান ওকে ঘরের ঠিক মাঝখানে মক্কার দিকে পা করে শুইয়ে কালো একখানা কাপড়ে ঢেকে দিল। বললো, খুব সাবধানে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে, ছাড়বে। যেন কেউ বুঝতে না পারে, বুঝলে?

মাথার টুপি খুলে ফেলে হাসান। চুল উস্কো খুস্কো করে। চোখে পেঁয়াজের রস লাগায়। গভীর দুঃখে কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে ছুটে যায় খলিফা হারুন অল রসিদের দরবারে। খলিফা তখন উজির, জাফর, আমির, অমাত্য এবং সভাসদদের নিয়ে দরবারে বসে হুকুমতের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

হাসানকে ঐভাবে ঢুকতে দেখে খলিফা আশঙ্কিত হয়ে মসনদ ছেড়ে ছুটে আসেন ওর কাছে।

—কী? কী হয়েছে হাসান? তোমার চেহারা এমন দেখছি কেন? কী হয়েছে, বল। তোমার চোখে পানি কেন?

কিন্তু হাসান খলিফার কথার জবাব দিতে পারে না। এবার সে চিৎকার করে কেঁদে আছাড় খেয়ে পড়ে খলিফার পায়ের উপর।

—চুমকী--আমার পেয়ারের চুমকী, কোথায় গেলে তুমি -

খলিফা কিছুই আঁচ করতে পারেন না, কী হয়েছে, হাসান? চুমকী কোথায় গেছে? সে প্রাসাদে নাই?

—আছে। আমার ঘরেই সে শুয়ে আছে। কিন্তু—কিন্তু—

আর বলতে পারে না হাসান। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে ওর কণ্ঠ।

খলিফা বুঝলেন, চুমকী দেহ রেখেছে। রুমালে চোখ মুছলেন তিনি।

—ওঠ ভাই, শোক করে কী করবে? খোদা যাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন, তার জন্যে শোক করতে নাই। নিজেকে শক্ত কর, হাসান। তার আত্মার কল্যাণ কামনা কর। চুমকী আমাদের সবচেয়ে আদরের বাঁদী ছিল। তাই তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সুখে থাকবে সে। এর চেয়ে বেশি সুখ আর কোথায় পাবে সে?

খলিফা আবার চোখের জল মুছলেন রুমালে। জাফর এবং অন্যান্য আমির, অমাত্যরাও চোখ মুছলো। খলিফা খাজাঞ্চীকে বললো, হাসানকে দশ হাজার দিনার দিয়ে দাও।

হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, চুমকীর শেষ কাজ খুব ভালো করে সমাধা ক'রো ভাই। আমরা বড় ভালোবাসতাম ওকে।

হাসান মোহরের থলে হাতে করে ঘরে ফিরে এসে চুমকীকে ডেকে তোলে। ওঠ ওঠ, শিগ্গির ওঠ। দেখো শুধু তুমিই না, আমিও খলিফাকে বোকা বানিয়ে কী মাল নিয়ে এসেছি।

থলেটা উপড়ে করে ফেলে দিল মেঝেয়। মোহরে মোহরে পাহাড় জমে উঠলো।

হাসান চুমকীকে আদর সোহাগ করতে করতে বলে, তা তো হলো, কিন্তু এর পরের ব্যাপারটা ভেবে দেখেছো? জুবেদা বেগম আর খলিফা দুজনে যখন জানবেন, আমরা তাদের ধোঁকা দিয়ে টাকা নিয়ে এসেছি, তখন অবস্থাটাই বা কী দাঁড়াবে একবার চিন্তা কর।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঞ্চাশতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

সেদিন খলিফা দরবারের কাজ কাম সংক্ষিপ্ত করে মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে জুবেদার কাছে চলে এলেন। চুমকীর শোকে তাঁর হৃদয় মথিত হচ্ছিল। তাই তিনি জুবেদার কাছে এলেন নিজেকে শান্ত করতে এবং জুবেদাকে সান্ত্বনা দিতে। বেগমসাহেবার ঘরে ঢুকতেই তিনি দেখলেন, জুবেদা অঝোর নয়নে জল ফেলছে। আর হারেমের বাঁদীরা তাকে ঘিরে বসে আছে। কেউ বা তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

বড়ই করুণ দৃশ্য!

খলিফা জুবেদার শয্যাপাশে এসে দাঁড়াল।

—চাচা'র মেয়ে, চুমকী তোমার কী যে আদরের ছিল তা তো আমি জানি। তার ইন্তেকালে তোমার চেয়ে আর বেশি করে কার বাজবে বল?

জুবেদা সবে হাসানের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে খলিফাকে সান্ত্বনা জানাতে যাবেন, সেই মুহূর্তে খলিফার মুখে একি কথা শুনলেন তিনি। নিজের কানকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারে না।

জুবেদা বলেন, চুমকী দীর্ঘজীবি হোক, ধর্মাবতার। আমি চোখের পানি ফেলছি, আপনার দুঃখে। হাসান আপনার প্রাণের বন্ধু, ভ্রাতৃপ্রতিম ছিল। ওর মতো ভালো ছেলে বড় একটা দেখি না। তার শোকে আপনি বড়ই কাতর হয়েছেন, বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করবেন বলুন, মানুষের আয়ু সদাই টলমল করে। কখন যে কে টুপ করে ঝরে পড়বে, কেউ বলতে পারে না।

এই নিদারুণ এক শোকাবহ মুহূর্তেও জুবেদা কেন রঙ্গ তামাশায় মশগুল হয়ে আছে, খলিফা কিছুই বুঝতে পারেন না। তবে কী বেগমসাহেবা এখনও হাসানের মৃত্যু সংবাদ জানে না? এত দুঃখেও খলিফা বেদনার হাসি হাসেন। মাসরুরকে ডেকে বলেন, মাসরুর, তোর মালকিনকে একবার বুঝিয়ে বল কী ঘটেছে। আমার মনে হচ্ছে ওর মেজাজটা ঠিক নাই, তাই চুমকীর মৃত্যুর সঙ্গে হাসানের মৃত্যু মিলিয়ে ফেলেছে। আমি এলাম তাকে সান্ত্বনা জানাতে। আর সে কিনা আমাকে একটা আজগুবি মিথ্যে খবর শুনিয়ে দুঃখ দিতে চাইছে। তুই নিজের চোখেই সব দেখেছিস? হাসান আমার কাছে কী ভাবে এল, এবং কী দুঃসংবাদ দিয়ে গেল, তোর মালকিনকে খুলে বল সব ঘটনা। আমার মনে

হয় এরপর আর সে আমাদের বোকা বানাতে চেষ্টা করবে না।

মাসরুর তখন জুবেদাকে উদ্দেশ্য করে বলে, বেগমসাহেবা, ধর্মাবতার যথার্থই কথা বলেছেন। আজ সকালে আবু হাসান কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে এলো। তার রুক্ষ চুল, বেশবাশ ছিন্নভিন্ন, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে তিনি ধর্মাবতারের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। খাবারের কি বিষক্রিয়ায় গত রাতে তার বিবি চুমকী দেহ রেখেছেন। তার দুঃখে ধর্মাবতার তো বিচলিত হলেনই, দরবারের কেউই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

এরপর ধর্মাবতার তার বিবির সৎকারের জন্য দশ হাজার দিনার দিয়ে দিতে বললেন খাজাঞ্চীকে।

মাসরুরের এই কথাতে কোনও ফল হলো না। বরং জুবেদা ভাবলেন খলিফার রঙ্গ রসিকতা করার হাজার ছলের এ-ও একটা ছল মাত্র। সুতরাং মাসরুরের বক্তব্যের একটি বর্ণও তিনি বিশ্বাস করলেন না। ভাবলেন, সবটাই খলিফার শেখানো বুলি।

জুবেদা ক্ষুব্ধ স্বরে নালিশ জানাল, আজকের দিনেও কী আপনি এই রকম রসিকতাগুলো মেহেরবানি করে বন্ধ রাখতে পারেন না, জাঁহাপনা! আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে আমার কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, হাসানের সৎকারের জন্য সে কত টাকা বের করে চুমকীর হাতে দিয়েছে। আমার মনে হয়, এখানে বসে এই রকম হৃদয়হীন নির্মম রঙ্গ রসিকতায় না মেতে আপনার প্রাণের বন্ধুর মৃতদেহর পাশে উপস্থিত থেকে তার শেষকৃত্য সম্পাদন করানোর কাজে ব্যাপৃত থাকলে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা হতো।

খলিফা এবার ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন, এসব কী যা তা বলছো, চাচার মেয়ে? খোদা হাফেজ, আমার আমার ··আমার মনে হচ্ছে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলছি—চুমকী মারা গেছে কাল রাতে। এর মধ্যে যুক্তি তর্কের আর কোনও অবকাশ নাই। এক্ষুনি হাতে নাতে তা প্রমাণ করে দিচ্ছি।

খলিফা সেখানেই 'দিবানের' ওপর বসে পড়ে মাসরুরকে বললেন, যা, এক্ষুনি আবু অল হাসানের কামরায় যা। নিজের চোখে দেখে আয়, যদিও তার কোনও দরকার নাই। দুজনের কে মারা গেছে?

মাসরুর চলে গেলে খলিফা জুবেদাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এক্ষুনি প্রমাণ হয়ে যাবে, কার কথা ঠিক। কিন্তু তুমি তোমার সেই বরাবরের গোঁ-টা ছাড়তে পারলে না। আমি নিশ্চিত জানি, তুমি ডাহা ভুল করেছ। এখনও যদি চাও আমি তোমার সঙ্গে বাজী লড়তে পারি।

—ঠিক আছে, বাজীই রইলো, জুবেদা কঠিন কণ্ঠে বলে, আমি যদি হারি তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় তসবির-মহলটা চিরকালের মতো দিয়ে দেব আপনাকে।

খলিফা বললো, প্রাণাধিক প্রিয় 'রঙমহল' প্রাসাদটি বাজি ধরলাম আমি। যদি আমি হারি, যা একেবারেই অসম্ভব, তবে তোমাকে বিনাশর্তে চিরকালের মতো ঐ রঙমহলের মালিকানা লিখে দিয়ে দেবো। এবং এটা তো মানো যে,

তোমার ঐ তসবির-মহলের চেয়ে অনেক অনেক বেশি দামি আমার ঐ রঙমহল।

জুবেদা বেশ বিরক্ত ভাবেই বললো, থাক থাক ধর্মাবতার, এ নিয়ে আর আপনার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে চাইনে। তসবির-মহলের প্রকৃত মূল্য এবং মর্ম যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, কী তার দাম এবং নাম। আপনার সামনে যারা বলে, আপনার রঙমহলই সবার সেরা—সব চেয়ে দামী, তারাই আবার আপনার আড়ালে গিয়ে অন্য জায়গায় আমার তসবির-মহলের গুণগান করে। বলে, এর চেয়ে মূল্যবান বস্তু তামাম দুনিয়ায় কিছু নাই। আপনি যদি প্রমাণ চান, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। তা হলে আসুন আমরা পবিত্র 'ফাতিয়াহ' পাঠ করে শপথ নিই।

খলিফা বললে, ঠিক আছে, এই তো কোরান সামনেই আছে, এস তাহলে পাঠ করি।

এরপর দুজনেই কোরান পাঠ করে শপথ করেন। তারপর মাসরুরের আশায় বসে থাকেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আবু অল হাসান জানলা দিয়ে দেখতে পেল মাসরুর আসছে। বুঝতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না, কেন তার এই আগমন? চুমকীকে বললো, বিবিজান, বিপদ আসন্ন। মাসরুর আসছে। আমার মনে হচ্ছে, বেগম আর খলিফার মধ্যে তর্ক বেধেছে—আমাদের 'মৃত্যু' নিয়ে। আগে আমি খলিফাকেই জেতাবো। সুতরাং আর দেরি নয়, যাও, মক্কার দিকে পা করে মড়ার মতো শুয়ে থাকো। আমি কালো কাপড়ে তোমাকে ঢেকে দিচ্ছি।

চুমকীর 'শব'দেহে কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে মাথার টুপী খুলে ফেলে হাসান। চোখে পেঁয়াজ ঘষে নেয়। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মাসরুর ঘরে ঢুকে চুমকীর মৃতদেহ দেখে মাথার টুপী খুলে হাতে নিয়ে শোকাহত হাসানের পাশে এগিয়ে যায়।

—সবই তাঁর ইচ্ছা মালিক। তার জিনিস তিনি ফেরত নিয়ে গেলেন। এ নিয়ে শোক করে আমরা কী করতে পারি। এখন একমাত্র তাঁকেই ভরসা করে সান্ত্বনা লাভ করুন, এ ছাড়া কী বা বলতে পারি আমরা। যাক্, শেষ কাজ করুন আমি চলি।

মাসরুর দ্রুত পায়ে জুবেদার মহলে ফিরে আসে।

—কী সংবাদ মাসরুর?

জুবেদা উন্মুখ হয়ে জিজ্ঞেস করে।

মাসরুর কুর্নিশ জানিয়ে বলে, বেগমসাহেবা, অপরাধ নেবেন না,

ধর্মাবতারের কথাই ঠিক। গতকাল রাতে হাসানের বিবি চুমকী মালকিনই মারা গেছেন।

খলিফার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিজয় গর্বের হাসি হেসে বলেন, কী, হলো তো? এবার? এবার তো তোমার তসবির-মহল হাতছাড়া হয়ে গেল, চাচার মেয়ে। তাহলে আর দেরি কেন, পেশকারকে ডেকে আমার নামে দান-পত্রটা লিখে দাও।

জুবেদা ক্রোধে ফেটে পড়েন, এই মিথ্যুকটার কথায় কী বিশ্বাস? আপনার মনোরঞ্জনের জন্য ও পারে না এমন কোনও কাজ দুনিয়ায় নাই। আমি ওকে বিশ্বাস করি না। এরপর থেকে ওকে আর আমার হারেমেই ঢুকতে দেব না, শয়তান কোথাকার! একেবারে চোখে মুখে মিথ্যের খই ফোটায়! যা ভাগ, আমার সামনে থেকে।

এই বলে জুবেদা তাঁর পায়ের চটি ছুঁড়ে মারলেন মাসরুরের দিকে।

মাসরুর থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে যায়। বেগমসাহেবা, এখন আগুন হয়েছেন। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক এ সময় আর কোনও কথা বোঝাতে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

জুবেদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, ধর্মাবতার, আপনার তাঁবেদার ঐ মাসরুরের কোনও কথা আমি বিশ্বাস করলাম না। এখন আমি আমার কোনও বাঁদীকে পাঠাচ্ছি। সে-ও যদি দেখে এসে একই কথা বলে, তবে আপনি যা বলবেন, আমি মেনে নেব।

- খলিফা দেখলেন জুবেদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি সংগে সংগে সম্মতি জানিয়ে বললেন, তাই হোক। তোমার লোককেই পাঠাও।

জুবেদা তার একান্ত অনুরক্ত এক বৃদ্ধা ধাইকে ডেকে বললো যাও তো ধাইমা, তুমি নিজের চোখে দেখে এস, হাসান, না চুমকী—কে মারা গেছে কাল রাতে।

বৃদ্ধা চলে গেল।

আবু হাসান আশংকা করেই অপেক্ষা করছিল। এর পরে আবার নিশ্চয়ই কেউ আসবে তদন্ত করতে। বৃদ্ধাকে আসতে দেখে সে চুমকীকে বললো, বিবি জান, সাবধান। দূত আসছে। এবার আমি মরলাম।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো বাহান্নতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

হাসান ঝটপট ঘরের মাঝখানে মক্কার দিকে পা করে শুয়ে পড়লো। চুমকী হাসানের মুখে টুপীটা রেখে দেহটা একখানা কালো কাপড়ে ঢেকে দিল। নিজের চুলগুলো পাগলীর মতো এলোমেলো করে কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলো।

বৃদ্ধা ধাই ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। তারপর চুমকীর পাশে এসে

দাঁড়ায়, কেঁদ না মা. কেঁদ না। কেঁদে আর কী করবে? হাসান আজ তোমাকে ছেড়ে চলে গেল, তোমার এই কচি বয়েস, এখন বিধবা জীবন কাটাবে কী করে, মা?

এরপর বৃদ্ধা ফিরে যাবার উদ্যোগ করে বলে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, মা। বেগম জুবেদাকে খবর দিতে হবে। কি কাণ্ড বল! ঐ মাসরুর মিথ্যুকটা এখান থেকে গিয়ে বলেছে, সে নাকি নিজের চোখে দেখে গেছে তুমি মরে গেছ।

চুমকী বলে, মাসরুর বোধহয় খুব মিথ্যে বলেনি, ধাইমা। কারণ কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছি। হয়তো মাসরুর যখন এসেছিল আমি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়েছিলাম।

এই বলে চুমকী আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। বৃদ্ধা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুমু খায়, সান্ত্বনা দেয়। দুঃখ করো না, মা। নসীবে যা আছে তা এড়াবে কী করে?

এরপর আর দাঁড়ালো না সে।

বৃদ্ধা এক এক করে সব ঘটনার বিবরণ দিল। এবং সে যে চুমকীর দুঃখে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েছে—সে কথাও জানালো বেগম জুবেদা এবং খলিফার সামনে।

এবার জুবেদা খলিফার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকান, কী তোমার সেই সত্যবাদী সাগরেদ মাসরুরটা গেল কোথায়? ডাকো তাকে। জবাব দিক এর। হাড়ে হাড়ে শয়তান, কুত্তার বাচ্চা!

খলিফা মাসরুরকে ডাকলেন।

—কী রে, হতভাগা, এত বড় মিথ্যে কথা বললি কেন? কী ব্যাপার? তোর জন্য আমিও মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম বেগম জুবেদার কাছে।

জুবেদা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, ধাইমা, এই কুত্তার বাচ্চাটাকে বল তো, কী তুমি দেখে এসেছো?

বৃদ্ধা যা দেখে এসেছে, তার বিবরণ আবার শোনালো তাকে।

মাসরুর তো রেগে কাঁই। জুবেদা বা খলিফা যে সামনে আছেন, সে কথা সে বিস্মৃত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, ফোকলামুখী বুড়ি, এত বড় ডাহা মিথ্যে কথাটা বলতে তোমার একটুও মুখে বাধলো না। তুমি কী বলতে চাও, সেই হতভাগী চুমকীর লাশটা আমি স্বচক্ষে দেখে আসিনি?

বৃদ্ধার চোখে এবার আগুন জ্বলে ওঠে। মনে হলো, তখুনি বুঝি ভস্ম করে দেবে মাসরুরকে।

—তোমার মতো মিথ্যেবাদী ত্রিভুবনে দুটি নাই। ফাঁসীতে ঝোলালেও যোগ্য সাজা হয় না, টুকরো টুকরো কেটে তোমার মাংস কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো উচিত।

—চুপ কর ডাইনী বুড়ি। ঐ সব গাঁজাখুরী গল্প তোমার লাজুক মেয়েদের গিয়ে শোনাও গে।

মাসরুরের এই ঔদ্ধত্যে জুবেদা নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে খলিফাকে বললেন,

আপনার এই মিথ্যের জাহাজ সাগরেদটিকে শায়েস্তা করুন। ধর্মাবতার, তা না হলে আমি হত্যে দেবো।

খলিফা বললেন, খোদা হাফেজ, মাসরুর একা মিথ্যেবাদী হতে যাবে কেন? তা হলে আমিও মিথ্যুক। তোমার ধাইও মিথ্যুক। এবং তুমিও মিথ্যে বাদী।

এরপর আর একটিও কথা বললেন না খলিফা। মাথা নিচু করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এক সময় মাথা তুলে বললেন, ব্যাপারটা জটিল বলে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে অন্য কারো ওপর আর ভরসা করা যায় না। চল, আমরা দুজনে গিয়ে নিজের চোখে যাচাই করে দেখে আসি।

জুবেদা বললো, সেই ভালো, চলুন আমরাই দেখে আসি।

খলিফা এবং জুবেদা মাসরুর, বৃদ্ধা ধাই ও হারেমের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে করে আবু অল হাসানের বাসার দিকে এগিয়ে চলেন।

আবু অল হাসান আগেই ভেবে রেখেছিল, ব্যাপারটা অত সহজে মিটবে না। আরও গুরুতর কিছুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল সে।

সুলতান এবং জুবেদার বিশাল বাহিনী তাদের কামরার দিকে ধাবমান দেখে চুমকী হাসানকে বলে, কতবার আর চালাকী করে পার পাবে, সোনা এবার? এবার কী করবে? ঐ ওঁরা দুজনেই আসছেন।

হাসান কিন্তু হাসে। বলে, এসো, এবার আমরা দুজনেই মরবো।

খলিফা এবং জুবেদা দুজনে হাসানের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। পাশাপাশি দুটি মৃতদেহ দেখে দুজনেই শিউরে ওঠেন। অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনও কথা সরে না।

এমন সময় আর একটি কাণ্ড ঘটে। এই নিদারুণ মর্মান্তিক শোকাবহ দৃশ্য দেখে বেগম জুবেদা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। মূর্ছিত হয়ে তাঁর এক বাঁদীর কাঁধে ঢলে পড়েন। অন্য মেয়েরা তাঁর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পান জুবেদা। হায় হায় করতে করতে বলেন, চুমকী, তোমার মহব্বতের নজির নাই। স্বামীর শোক সইতে না পেরে সতী-সাধ্বী চুমকী আমার, দেহত্যাগ করেছে। ও আমাকে তখনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, হাসান ছাড়া আমার জীবনে বাঁচার আর কোনও মানে নাই, বেগমসাহেবা। আমি আর বাঁচতে চাই না। তা মুখে যা বললো, কাজেও তাই করলো চুমকী? ইয়া আল্লাহ! এ তোমার কী নিষ্ঠুর লীলা!

খলিফা বাধা দিয়ে বলেন, তুমি ভুল করছো, চাচার মেয়ে। শোকে তাপে দগ্ধ হয়ে চুমকী মরেনি, মরেছে আমার পেয়ারের দোস্ত হাসান। চুমকীকে সে জান দিয়ে ভালবাসতো। নিজের জীবন দিয়ে সেই কথাই সে আজ প্রমাণ করে গেল। আল্লাহ ওর আত্মার মঙ্গল করুন। বেগমসাহেবা, তুমি ভাবছো, মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলে বলেই লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করবে? বলবে,

তোমার কথাই ঠিক ?

জুবেদা বলে, না। আপনার একটা মিথ্যের জাসুস নফর আছে বলেই আপনার সব মিথ্যে কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করবে তারা!

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো তিপান্নতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

—কিন্তু আবু অল হাসানের চাকররা সব গেল কোথায়?

জুবেদা জানতে চাইলেন।

—ওদের ডাকুন, ওরাই বলতে পারবে—আসল ঘটনা। কে আগে মরেছে, কে পরে মরেছে, ওরা ছাড়া এখন আর জানার উপায় কী?

তুমি ঠিক বলেছ, চাচার মেয়ে, খলিফা চেঁচিয়ে বলেন, কই, কে আছ, কে বলতে পারবে, কে আগে মরেছে। আর কে বা শোকে কাতর হয়ে পরে মারা গেছে? যে বলতে পারবে তাকে আমি এখুনি নগদ দশ হাজার দিনার বখশিশ দেব।

ঘরের অভ্যন্তর থেকে এক অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো, আমাকে দিন ঐ দশ হাজার। আমি বলে দেব সত্যি ঘটনা। আমি, ধর্মাবতার, আমি আবু অল হাসান চুমকীর শোকে কাতর হয়ে মরে গিয়েছিলাম।

এই কথা শোনামাত্র জুবেদা এবং তার মেয়েরা ভয়ে আর্তনাদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে। কিন্তু খলিফা বুঝতে পারেন এ সবই হাসানের অভিনব চাতুরী। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন তিনি।

—হো হো, হা হা, হি হি, ওরে বাবা, ও, হাসান ভাই, আমি যে হাসতে হাসতে মরে যাবো। একি মজাদার রঙ্গ তুমি বানিয়েছ! ওঃ হো হো, আর পারি না হাসতে। ওরে বাবারে!

হাসতে হাসতে খলিফার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। এতক্ষণে জুবেদা বুঝতে পারেন, আসলে পুরো ব্যাপারটাই তামাশা। ভয় আতঙ্ক কেটে যায়। হাসান এবং চুমকী উঠে দাঁড়ায়। তাদের এই অভিনব ফন্দীর কাহিনী সব খুলে বলে খলিফার পায়ে লুটিয়ে পড়ে হাসান। আর চুমকী জড়িয়ে ধরে জুবেদার পা।

খলিফা প্রসন্ন চিত্তে মার্জনা করে হাসানকে। জুবেদাও হাসতে হাসতে চুমকীকে বলেন, ভীষণ দুষ্টুমী করেছ। যাও, এবারের মতো মাফ করে দিলাম।

খলিফা খুশি হয়ে হাসানকে দশ হাজার এবং চুমকীকে দশ হাজার দিনার বখশিশ দিলেন। এবং জাফরকে বলে দিলেন, জাফর, আমার হয়তো সব সময় খেয়াল থাকে না। তুমি প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়ে এদের ভাতার টাকাটা পৌঁছে দিও হাসানের ঘরে।

এর পর ওরা দুজনে সেই প্রাসাদ পরিবেশে সুখ বিলাসের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছিল সারাটা জীবন।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ সুলতান শাহরিয়ারের দিকে তাকায়। শাহরিয়ার বলে, এর পর প্রেমের একটা ছোট কিস্‌সা শোনাও শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলে, তা হলে জাইন মাওয়াসিফের মহব্বতের কিস্‌সা শুনুন।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

অনেক কাল আগের কাহিনী।

এ কাহিনীর নায়ক এক সুঠাম সুন্দর প্রিয়দর্শন যুবক। তার নাম আনিস। উত্তরাধিকার সূত্রে সে ধনবান, দয়ালু নম্র স্বভাব শিক্ষিত, মার্জিত রুচি এবং সম্বংশ-জাত। তার মতো সদা-প্রফুল্ল নওজোয়ান সে সময়ে বিরল ছিল। দুনিয়ার কোনও কিছুর মধ্যেই সে অসুন্দর কিছু খুঁজে পেত না। যা দেখতো, যা শুনতো সবই তার কাছে অপরূপ মনে হতো। সঙ্গীত, কাব্য, সুগন্ধী প্রসাধন, নারীসঙ্গ, ইয়ার দোস্ত, হৈ-হল্লা, আনন্দ সবই তার কাছে খুব ভাল লাগতো। সবুজ ঘাস, কাশবন, জলকল্লোল—সবই তাকে দারুণ ভাবে মুগ্ধ করতো।

এইভাবে দিন কাটছিল।

একদিন সে এক বাগানে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় একা একা শুয়ে নিদ্রামগ্ন ছিল। এমন সময় সে স্বপ্নের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলো, চারটি সুন্দর রঙিন চিড়িয়া এবং একটি ঘুঘুর সঙ্গে সে খেলায় মেতেছে। ওদের সবাইকে নিয়ে খুব আদর সোহাগ করছে সে। কখনও বা বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। হঠাৎ সে দেখলো, একটা কালো কাক ছোঁ মেরে নেমে এসে তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঘুঘুটার ঘাড়টা খামচে ধরে শোঁ করে শূন্যে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। ঘটনাটা পলকের মধ্যে এমনই আচমকা ভাবে ঘটে গেল যে, আনিস ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো শুধু। কিছুই করতে পারলো না—করার কিছু সাধ্যও ছিল না।

দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ঘুম ভাঙ্গে ওর। সেই বাগানের মধ্যে গাছের তলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে থাকলো। কিন্তু স্বপ্নের কোনও যুক্তিবহ অর্থোদ্ধার করতে পারলো না। কিন্তু কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তখন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, —মানে তাকে জানতেই হবে।

গ্রামের পথ ধরে অনেক দূর চলে গেল। কিন্তু এমন কাউকেই পেল না, যে ওকে স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে পারে। হতাশ মনে ঘরে ফিরে আসছিল, এমন সময় সুন্দর একখানি চকমিলান বাড়ির সামনে পৌঁছতে নারী-কণ্ঠের সমধুর সঙ্গীত ভেসে এল ওর কানে।

সকালের নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে
পাখীরা ডানা মেলে উড়ে চলে দিক দিগন্তে
আর গলা ছেড়ে গান গায় ভালোবাসার।
কিন্তু আমি পারি না।
আমি এক বন্দিনী নারী।
কেমন করে সূর্য ওঠে,
কেমন করেই বা পাটে বসে সে.
আর কেমন কবে কুঁড়িরা ফুল হয়ে ফুটে,
সে তো আমার আর দেখা হলো না।

গান তো নয়, বেদনার ফুল ঝরে ঝরে পড়তে থাকে যেন। গানের করুণ মূর্ছনায় আনিসের কোমল হৃদয় বিদারিত হতে থাকে। সে ভাবে, জীবন তো মধুর সুন্দর। সেখানে এত বেদনা এত দুঃখ সন্তাপ কী করে আসে? কেন আসে?

কে এমন দুঃখের গান গায়—দেখার জন্য আনিস বাড়িটার আধ খোলা দরজার চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিতরে যতটা দৃষ্টি যায়, দেখতে পায় প্রাসাদ-তুল্য বাড়িটার সামনে বিশাল এক ফুলবাগিচা। তার ভেতরে কত না বহু বিচিত্র রঙের সুগন্ধী সব ফুলের গাছ। মালীর নিপুণ হাতে ঝকঝকে করে সাজানো গোছানো। কত রকমের পাখী! আর কী তাদের কিচির মিচির কাকলি।

এই অপরূপ মনোহর দৃশ্যাবলী দেখে নয়ন সার্থক করার লোভ সংবরণ করতে পারে না আনিস। পায়ে পায়ে সে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে।

ওধারে একটি আঙিনা। সেখানে এক দঙ্গল মেয়ে হুটোপুটি করে খেলায় মত্ত। বাগিচার মাঝে একটি সরু পথের ওপর তিনটি খিলান গাঁথা তোরণ। তারই আড়াল হওয়ায় মেয়েরা ওকে দেখতে পায় না।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঞ্চান্নতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে ঃ

প্রথম তোরণের সামনে এসে দাঁড়াতে আনিস দেখলো, সিঁদুর রঙে লেখা আছে ঃ

আমাদের ঘরের দরজা এতই ছোট,
সে দ্বার দিয়ে দুঃখ এবং কাল স্রোত-এর
বিশাল বপু ঐরাবত গলতে পারে না ;
কিন্তু মহব্বত এবং আনন্দ
ঝরণার মতো উচ্ছল তরল—
তাদের পথ রুদ্ধ হবে না কখনও।

এর পর দ্বিতীয় তোরণের সামনে আসে সে। তার ওপরে সোনার জলে লেখা আছে ঃ

যতদিন পাখীরা এই প্রস্ফুটিত কুসুমোদ্যানে
ফুলের আঘ্রাণ নিতে আসবে,
যতদিন বন্ধুত্ব সুবাস ছড়াবে প্রতি ঘরে ঘরে,
এবং ফুলেরা দল মেলে ফুটবে,
আর নিজের রূপেই দগ্ধ হয়ে ঝরে পড়বে একদিন ;
যতদিন বসন্ত ফিরে ফিরে আসবে,
চারিদিকে জেগে উঠবে সবুজ সুন্দর ঘাসের সমারোহ,
যতদিন এই বৃক্ষ তরুলতা গুল্ম জন্মাবে আর মরবে,
ততদিন আমার এই সুখের নীড় খুশির আনন্দে দুলবে হাওয়ায়।

এর পর তৃতীয় তোরণের সামনে এসে দেখলো, খিলানের মাথায় সবুজ রঙে লেখা আছে ঃ

আমার এ গৃহের
নয়নাভিরাম প্রতিটি বিলাস-কক্ষের
মাথার ওপর থেকে সময় ও সূর্য সরে সরে যায় নিয়ত।
কিন্তু ভালোবাসার ছায়া
ইঁদুরের মতো লুকিয়ে থাকে
এর নিরালা নিভৃত কোণে ;
সূর্য বা সময় কেউই সন্ধান পায় না তার।

তৃতীয় তোরণ পার হয়ে পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় আনিস। বাগিচার তল থেকে একটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে গৃহের অভ্যন্তরে।

পায়ে পায়ে উঠে আসে সে। সামনেই একখানা প্রশস্ত ঘর। মখমলের গালিচায় পাতা একখানা আসনে বসে আছে চৌদ্দ পনের বছরের এক তরুণী। তাকে ঘিরে চারজন সহচরী গা হাত পা টিপে দিচ্ছে। তরুণী সতনুকা, পরমা-সুন্দরী। চাঁদের আলোর মতো ধবধবে ফর্সা তার গায়ের রঙ। ক্ষীণ কটি, তন্বী। কাজল কালো টানা টানা চোখ। শিল্পীর তুলিতে আঁকা তার ভুরু।

আনিস অবনত মস্তকে অভিবাদন জানায়। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে, সুপ্রভাত, শাহজাদী।

কিন্তু মেয়েটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, এই নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করার দুঃসাহস তোমার কী করে হলো ?

আনিস বলে, এ জন্যে আমার কোনও দোষ নাই, মালকিন। দোষ আপনার নিজের, অথবা আপনার ঐ বাগিচার। দরজাটা আধখোলা ছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে

আমি যুঁই, চামেলী গুলাব-এর বাহার দেখে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারি নি। ফুল আর পাখীদের সঙ্গে মিতালী করার জন্য প্রাণ আমার আকুলি বিকুলি করে ওঠে।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসে, কী তোমার নাম?

—আপনার বান্দা—আনিস।

—বাঃ সুন্দর। তোমার কথায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি, আনিস। এস, আমার পাশে ব'স।

আনিস আসন গ্রহণ করে। মেয়েটি বলে, একটু চিত্ত-বিনোদন করতে চাই। তুমি দাবা জানো?

আনিস ঘাড় নেড়ে জানায়, সে জানে।

তখন মেয়েটি তার সখীদের খেলার ছক-ঘুঁটি আনতে বলে।

আবলুস কাঠ আর হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরি ছক। চারধারটা কারুকার্য করা সোনার পাতে মোড়া ঘুঁটিগুলো লাল আর সফেদ। লালগুলো পলার আর সাদাগুলো স্ফটিক পাথরের তৈরি।

—লাল না সফেদ—কোনটা নেবে তুমি?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে। আনিস বলে, খোদা হাফেজ আমি সাদাই নেব। লাল মানেই রঙঢঙ—ওটা আপনাকেই মানায়।

—তা মন্দ বলনি।

মেয়েটি ব'ড়েগুলো বসাতে থাকে ঘরে ঘরে।

খেলা শুরু হয়।

কিন্তু আনিসের খেলার চেয়ে খেলোয়াড়ের মোহিনী রূপের দিকেই নজর বেশি। মেয়েটির চাঁপার কলির মতো নিটোল মোলায়েম আঙ্গুলগুলোর সঙ্গে ওর আঙ্গুলের ঠেকাঠেকি হয়। সারা শরীরে শিহরণ খেলে যায়। আনিস চিৎকার করে ওঠে। এরকম আঙুলের সঙ্গে আমি লড়বো কী করে।

কিন্তু মেয়েটি বলে এবার তোমার বাদশাহকে সামলাও। তুমি গেলে—

শিয়রে সংক্রান্তি বুঝে আনিস খেলায় মনঃসংযোগ করে।

মেয়েটি বলে, নাঃ, এমনি এমনি জমছে না। এস আমরা একশো দিনার বাজি ধরি। তা হলে খেলায় মন বসবে।

—স্বচ্ছন্দে, আনিস বলে, আমার কোনও আপত্তি নাই। ঠিক আছে, রইলো বাজি—একশো দিনার।

আমাদের নায়িকার নাম জাইন মুস্তয়ামিফ। এবারে সে ঘুঁটি সাজিয়ে এঁটে সেঁটে বসলো। বাজি জিততে হবে। প্রথম কয়েকটি এমন চাল দিল আনিস, যা সামলাতে জাইন হিমসিম খেয়ে যায়। হঠাৎ সে তার পাতলা রেশমের বোরখাখানা খুলে পাশে রেখে দেয়।

এবার আনিসের সব তালগোল পাকিয়ে যায়। নিজের ঘুঁটি ছেড়ে সে লাল ঘুঁটি তুলেই চাল দিতে উদ্যত হয়। জাইন হা হা করে ওঠে, ও কি, ও কি করছো, ও যে আমার ঘুঁটি আনিস।

মাখনের মতো নরম একখানা হাত দিয়ে আনিসের পুরুষ কঠিন হাতের মণিবন্ধ চেপে ধরে জাইন। আনিস সরিয়ে নেয় না হাত। খুলতে চায় না ওর কোমল হাতের কঠিন বাঁধন! শুধু গভীর আয়ত চোখ মেলে জাইনের দিকে তাকায়। সে চোখের দৃষ্টিতে কী এক অব্যক্ত ভাষা মুখর হতে চায়। চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময় হতেই জাইন সচকিত হয়ে হাতখানা সরিয়ে নেয়।

—এইভাবে আমার ঘুঁটি নিয়ে তুমি চাল দেবে নাকি?

আনিস বলে, আমার আর তোমার বলে কী আছে। ঠিক আছে, আর ছেলে খেলা নয়, এ বাজির লড়াই, জান দিয়ে লড়তে হবে, আচ্ছা এই দিলাম আমার চাল, এবার এসো-ও-ও, ময়দানে আসুন।

জলতরঙ্গের ধ্বনি তুলে খিল খিল করে হেসে ওঠে জাইন, আপসে যা মুখে আসে তাকেই স্বাগত জানাও আনিস! ওসব আপনি-টাপনি থাক।

বাজির খেলা হলেও আনিস-এর চোখ মন ঘুঁটিতে বসে না! সর্বক্ষণ সে জাইনের রূপ-সুধা পান করে কাটায়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই হলো। পরপর পাঁচটা খেলায় শোচনীয় পরাজয়। গুণে গুণে পাঁচশোটি দিনার তুলে দিল সে জাইনের হাতে! অতি প্রসন্ন মনে।

জাইন মুচকী হেসে বলে, আহা এত টাকা হেরেছ বলে গোসা করছো কেন, আরও হয়ে যাক কয়েক হাত—

—না। আমার কাছে আর পয়সা নাই। যা সঙ্গে ছিল, সব হেরেছি।

—কেন সঙ্গে নগদ না থাকলে বুঝি বাজি লড়া যায় না? আসলে বল, তুমি ভয় পাচ্ছ।

আনিস বলে, খোদা কসম, নিশ্চয়ই না। খেলাতে হার-জিত আছেই। ও-নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নাই।

—তাহলে উঠছো কোথায়? বোস।

জাইন ওকে হাতে ধরে আবার বসিয়ে দেয়। বলে, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে খেলবে। দাবা ছেলে-খেলার জিনিস নয়। ঘুঁটি ছেড়ে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে কী হবে? আমার মুখে তো আর ঘুঁটির চাল লেখা নাই। খেলার সময় ওসব দিকে মন গেলে তো চলবে না। আর হ্যাঁ, এবার থেকে বাজির অঙ্ক একহাজার করা হলো। কী রাজি?

আনিস বলে, রাজি। বাজিতে আমি ভয় পাই না।

জাইনার বলে, বাড়ানো হলো—এই কারণে যে, মনটা একটু ছকের দিকে বসবে।

কিন্তু আনিস-এর চোখ দাবার ছকে নিবন্ধ থাকে না। সারাক্ষণ সে জাইনের রূপ-সায়রে সুধা পান করতে থাকে। ফলে এক এক করে টাকা পয়সা ধন-দৌলত যা কিছু সঞ্চিত ছিল সব হেরে হেরে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আনিস তবু নিরস্ত হয় না। জমি-জমা দোকান-পাট বাড়িঘর সব স্থাবর সম্পত্তিও হেরে ফতুর হয়ে যায়।

জাইন বলে আর একটা দান খেলবো, এই দানে যে হারবে, তাকে তার

অধিকারের সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি খোয়াতে হবে। '

আনিস বলে, আমার তাতে কিসের ভয় ? সবই তো তোমার কাছে হেরে গেছি, এর পরে আর নেবে কী ?

জাইন বলে, আমিও তো হারতে পারি ? তাহলে তোমার হারা সম্পত্তির সঙ্গে আমার মালিকানার সম্পত্তিও সব তোমার হতে পারবে।

আনিস বলে, কিন্তু আমি যে তোমাকে হারতে দেব না, জাইন।

জাইনের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। যাও, চলে যাও আর কখখনো এস না আমার এই বাগানবাড়িতে। তোমার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখতে চাই না আমি। যা তুমি হেরেছ, আমি সব ফেরত দিয়ে দিলাম তোমাকে। যাও, বিদায় হও।

আনিস কিন্তু ওঠে না। করজোড়ে মিনতি করে বলে, তুমি আমার ওপর এমন নির্দয় হয়ো না, জাইন। আমার ধন দৌলত বিষয় আশয় সব কিছু হেরেছি—তারজন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। সব আমি হাসিমুখে লিখে দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তু দোহাই তোমায় আমাকে চলে যেতে বলো না। তোমাকে না দেখতে পেলে আমি বাঁচবো না। যদি চাও, আমাকে কঠোরতম সাজা দিতে পার! কিন্তু তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না, শুধু এইটুকু দয়া কর।

জাইন বিরক্ত হয়ে ওঠে, ঠিক আছে, ফেরত যখন নেবে না তখন কাজীকে ডাক। দলিল বানিয়ে দাও আমার নামে।

আনিস কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে এনে তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি এবং নগদ ধনদৌলত সব জাইনের নামে দানপত্র করে দিল।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো ছাপ্পান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

জাইন মুচকি হেসে বলে, তাহলে আনিস তোমার সঙ্গে সব কাজ খতম। এবার পথ দেখ তুমি। এরপর তোমাকে আর আমি চিনি না। চিনবো না।

আনিস করুণ চোখে তাকায়, আমার সব কামনা বাসনা অতৃপ্ত, অপূর্ণ রেখেই আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও শাহজাদী ?

—আমারও ইচ্ছে, তোমাকে নিয়ে সুখ সম্ভোগ করি। কিন্তু খালি হাতে তো মজা লুটা যায় না, আনিস। ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর!

আনিস বলে, বেশ, আজ্ঞা কর, কী দিতে হবে ?

জাইন বলে, আমার জন্যে চার বোতল খাঁটি আতর, চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং চারটি সুসজ্জিত খচ্চর নিয়ে এস আগে। তারপর তোমার সব বাসনা পূর্ণ করবো আমি।

আনিস বলে, ঠিক আছে, তাই হবে।

—কিন্তু পাবে কোথা থেকে। দেবে কী করে ? তোমার বলতে তো আর কানাকড়িও নাই। সব সম্পত্তি এখন আমার।

—সে নিয়ে তুমি ভেবো না। আল্লাহ আমাকে জুটিয়ে দেবেন। বিষয়-আশয় সবই খুইয়েছি তোমার কাছে, ঠিক। কিন্তু আমার শুভানুধ্যায়ী ইয়ার বন্ধুরা তো আছে। তাদের কাছে ধার করবো।

—ধার করবে? ঠিক আছে, ধার করেই নিয়ে এস। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম।

আনিস পথে নেমে পড়ে। জাইন তার অন্যতম সহচরী হুবুবকে ডেকে বলে, যা তো, সাহেবের পিছনে পিছনে ধাওয়া কর। যেন বুঝতে না পারে। দ্যাখ, কার কার কাছে সে যায়। তারা কে কী বলে শোন। তারপর সবাই যখন এক এক করে ওকে শূন্য হাতে ফেরাবে তখন তার সামনে দেখা দিয়ে বলবি, 'আনিস সাহেব, আমার মালকিন এক্ষুনি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। এনে ঐ অতিথি মেহমানদের বড় ঘরটায় বসাবি ওকে। তারপর আমাকে খবর দিবি। এর পর যা বলাতে থাকে, হবে।

হুবুব অভিবাদন জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে অনুসরণ করে চলতে থাকে আনিসকে।

জাইন হামামে গিয়ে গোসল সেরে নিল। জমকালো বাহারী সাজে সাজিয়ে দিল ওর সহচরীরা। আতর ছিটিয়ে দিল সারা গায়ে। নানারকম মূল্যবান রত্নাভরণ পরিয়ে দিল ওর কানে গলায় হাতে পায়ে।

ইতিমধ্যে হুবুব আনিসকে অনুসরণ করতে বুঝতে পারে ওর কোনও বন্ধুই ওকে কিছু দিল না। আনিস ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কী করবে ভাবছে, এমন সময় হুবুব ওর সামনে দেখা দিয়ে বলে, আনিস সাহেব, আমাদের মালকিন জাইন মওয়াসিফ আপনার সঙ্গে এখনি একবার মোলাকাত করতে চান। মেহেরবানী করে চলুন।

আনিসকে সঙ্গে নিয়ে হুবুব ফিরে এসে বড় ঘরে প্রবেশ করে দেখে শাহজাদীর সাজে সজ্জিত হয়ে জাইন একটা উঁচু আসনে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জাইনকে দেখেই চমকে ওঠে আনিস। এ কোনও মানবী না বেহেস্তের ডানা কাটা হুরী। দয়িতের মন ভরেছে, বুঝতে পেরে জাইন অন্তরে রোমাঞ্চ অনুভব করে। ধীর পায়ে উঠে আসে সে আনিসের পাশে। ওর একখানা হাত ধরে। তারপর পাশের একখানা লম্বা অনুচ্চ 'দিবানে' নিয়ে গিয়ে বসায়। এবং নিজেও পাশে বসে।

সহচরীরা নানা রকম খানাপিনা এনে সাজিয়ে দেয়। দুজনে পরিতৃপ্তি সহকারে আহারাদি শেষ করে। মুখ হাত ধোওয়ার পর ওরা এক পেয়ালায় দুজনে মদ্যপান করতে থাকে। জাইন একসময় বলে, এক টেবিলে বসে যখন এক সঙ্গে নুন-রুটি খেলাম, তখন আজ থেকে তুমি আমার মেহমান হয়ে গেলে, আনিস। সুতরাং আমি তোমার কণামাত্র বস্তু গ্রহণ করতে পারবো না। তা তোমার পছন্দ হোক আর নাই হোক। তুমি যা লিখে পড়ে দিয়েছ তার সব তোমাকে ফেরত দিয়ে দিলাম।

জাইন-এর এই বদান্যতায় আনিস অধীর আনন্দে জাইনের পা জড়িয়ে ধরে। জাইন ওকে দুহাতে তুলে ধরে, ছিঃ ছিঃ, একি! তুমি না পুরুষ মানুষ! মেয়েমানুষের পায়ে ধরছো! আমার ব্যবহারে সত্যিই যদি তুমি খুশি হও, আমাকে আমার যোগ্য মর্যাদা দিতে চাও, তবে আমার পায়ে কেন, চল আমার পালঙ্কে, আমাকে নিয়ে লুটিয়ে পড়বে সেখানে। আমি দেখতে চাই সত্যিই তুমি এক সেরা দাবাড়ে। এবার কিন্তু কিস্তিমাত তোমাকেই করতে হবে, আনিস।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আটান্নতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

আনিস হাসতে হাসতে বলে, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব, জাইন, আমার সফেদ বাদশাহ তোমার সব লালবাহিনীকে কী ভাবে ঘায়েল করে ফেলে।

জাইনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে সে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

দরজায় দাঁড়িয়েছিল হুবুব। সাদর অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যায় সে দুজনকে।

এরপর শুরু হয় আবার নতুন দাবা খেলা! আনিসের সফেদ বাদশাহ বীরবিক্রমে লালবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ছত্রখান করে ফেলে। প্রথম দানে জাইন হারে। কিন্তু সদর্পে বলে, এবার তোমার সফেদ শাহকে আমি কয়েদ করবো আনিস, সাবধান।

কিন্তু আনিসের সফেদ বাদশাহকে ফাঁদে ফেলে, লালবাহিনীর কী সাধ্য। সেবারেও কিস্তিমাত। এইভাবে বার বার পাঁচবার জাইনের লালসেনা বিধ্বস্ত হয় সফেদ শাহর হাতে। লালসেনাদের সারা অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, ব্যথা-বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। না না আনিস, তোমার পায়ে ধরি, আর না। আমি হার মানছি। তোমারই জিত হয়েছে। বাব্বা, তোমার সফেদ বাদশাহর কী তাগদ! প্রাণ যায় যায় আর কী?

দুজনে গভীর আবেশে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। কতক্ষণ কে জানে। এক সময়ে জাইন উঠে বসে। আনিসকে জাগিয়ে তোলে। বলে, তোমার দেহ ক্লান্ত অবসন্ন, জানি। তবু ওঠ, একটু মৌজ মৌতাত করা যাক। গান আবৃত্তি চলুক, তাহলে আবার নতুন করে লড়ার তাগদ হবে।

শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে নেয় দুজনে। ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে গুলাবী নেশায় মদির হয়ে ওঠে মন প্রাণ। জাইন বলে, আজ যে সুখ দিলে আনিস, জীবনে তা ভুলবো না। এর পর তোমাকে ছাড়া—একটা দিন আমি বাঁচবো না। একটা রাত আমার কাটবে না।

সারাটা রাত ধরে ওরা পরস্পরে অনেক আদর সোহাগ, সহবাস চুম্বন করে কাটালো। পরদিনও তেমনি আহার বিহার ব্যসন রাগ অনুরাগ সুরত রঙ্গে কেটে গেল। তারও পরদিন একই আনন্দে কাটে। এইভাবে পুরো একটা মাস সুখ-সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে ওরা ভেসে চলতে থাকে।

জাইন বিবাহিতা। ওর স্বামী তখন বিদেশে ছিল। একদিন স্বামীর কাছ থেকে একখানি পত্র পেল। বিদেশের বাণিজ্য শেষ করে সে শীঘ্রই ঘরে ফিরে আসছে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে জাইন, আনিস, এখন কী উপায় হবে। তোমাকে ছাড়া তো আমি প্রাণে বাঁচবো না, সোনা। কিন্তু আমার স্বামী একটা নরখাদক বাঘ। সে যদি জানতে পারে, আমি তোমাকে নাগর করে রতিসুখে মেতে আছি, আমাকে তোমাকে এক কোপে দুখণ্ড করে ফেলবে। লোকটা ভীষণ হিংসুটে এবং সাংঘাতিক।' দুনিয়াতে সে কোনও নারীকেই বিশ্বাস করে না। তার চোখে সব মেয়েই চরিত্রহীনা—পরপুরুষে আসক্তা। এই অবস্থায় এ বাড়িতে তোমার প্রবেশ অধিকার কী করে বজায় থাকে, সে কথা ভেবে আমি সারা হচ্ছি।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে জাইন মনে মনে মতলব ভাঁজতে থাকে। তারপর এক সময় বলে, আনিস, পথ একটা পেয়েছি।

আনিস জিজ্ঞেস করে, কী ?

—তুমি আতর হিং মসলার বণিক হয়ে ফিরি করতে আসবে আমার স্বামীর দোকানে। তারপর সব আমি ব্যবস্থা করবো। কিন্তু খেয়াল রেখ, আমার স্বামী যে ভাবেই তোমাকে জেরা-জুলুম করুক, তুমি কিন্তু দু' রকম কথা বলো না তার কাছে। তা হলে সব গুবলেট হয়ে যাবে।

আনিস বলে, তবে তো এখন থেকেই আমাকে ঐ ব্যবসার তালিম নিতে হয়।

জাইন বলে, বেশক। আজ থেকেই তুমি খোঁজ-খবর নাও। কোনটার কী নাম, কোনটার কি দর দাম। কোথাকার মাল। ব্যবসার সব খুঁটিনাটি জেনে এস।

এইভাবে আনিসের সঙ্গে সাট করে জাইন যুক্তি আঁটতে থাকে—কী ভাবে তার স্বামীকে ঠকানো যায়।

জাইন-এর স্বামী ঘরে ফিরে এসে বিবির পাংশুবর্ণ চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, একী হাল হয়েছে, বিবিজান ? তোমার কী অসুখ-বিসুখ করেছিল ? সারা শরীর হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে !

এ-সব জাইন-এর চাতুরী। জাফরান-এর জল গায়ে মাখলে চেহারাটা রুগ্ন পাণ্ডুর মনে হয়। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমি বিমারে পড়েছিলাম। ভয়ে মরি, কবে তুমি দেশে ফিরবে। সেদিন তোমার খৎখানা পেয়ে তবু ধড়ে প্রাণ এসেছে। আমাকে যে এমন ফ্যাকাশে দেখছো, সে কিন্তু আমার অসুখের জন্য না। তোমার অদর্শনই আমাকে এমন পাণ্ডুর করে ফেলেছে। শুধু ভেবে মরেছি, বিদেশ বিভুঁই—একা মানুষ, না জানি কখন কী বিপদ-আপদ ঘটে। কিছু একটা হলে খবরও যে পাবো, তারও কোনও উপায় নাই। তাই বলছি, ওগো, এর পর যখন বিদেশে যাবে, আর কখনও একা একা যেও না বাপু, আমার বড্ড ভয় করে। সঙ্গে কেউ থাকলে সময়ে অসময়ে সে তো একটা খবর-টবরও দিতে পারে।

সওদাগর-স্বামী বিবির এই দরদ দেখে খুবই প্রসন্ন হয়। তুমি ঠিকই বলেছ,

বিবিজান। এর পর থেকে তোমার কথা ছাড়া আর এক পাও চলবো না। যাক, আমি তো ভালয় ভালয় বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছি। আর তো তোমার দুর্ভাবনার কোনও কারণ নাই। এবার তুমি হাসি গানে মেতে ওঠ। শরীরটাকে সুস্থ করে তোল।

এই বলে সে জাইনকে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। এই সওদাগর জাতে ইহুদী, এবং তার বিবিজানও এক ইহুদী কন্যা।

হিং-আতরের নয়া সওদাগর আনিস ইহুদী সওদাগরের দোকানের সামনেই ঘুর ঘুর করছিল। জাইন-স্বামী দোকানে আসতেই তার সঙ্গে সে আলাপ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তোলে আনিস। ইহুদী দর-দাম জিজ্ঞেস করে। বাজার থেকে সস্তা দরেই সে মাল দিতে রাজি দেখে এক কথাতেই সওদা করে নেয় সে। এবং আনিসের সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ওর নিয়মিত খরিদ্দার হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরে ইহুদী আনিসকে প্রস্তাব দেয়, তুমি আমার ব্যবসার অংশীদার হয়ে যাও। তাতে তোমারও সুবিধে হবে আমারও ব্যবসা বাড়বে।

আনিস বলে, আমি রাজি। কী টাকা দিতে হবে আমাকে?

ইহুদী বলে, বেশি না, হাজার দশেক নিয়ে এস, তাহলেই হবে।

আনিসের পক্ষে এ এমন বেশি কিছু নয়। পরদিনই সে টাকা নিয়ে হাজির হয়। দুজন নামজাদা সওদাগরকে সাক্ষী রেখে চুক্তির দলিল তৈরি করে দেয় ইহুদী।

সেদিন রাতে সে আনিসকে সঙ্গে নিয়ে আসে তার নিজের বাসায়।

—আজ থেকে তুমি আমার ব্যবসার নতুন অংশীদার হলে, আনিস। চল আজ রাতে আমার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন। একসঙ্গে বসে খানাপিনা করবো আমরা।

আনিস এইটাই চাইছিল। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে দুজনে ইহুদীর বাড়িতে এসে পৌঁছয়। আনিসকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ইহুদীটা অন্দরে চলে যায়। জাইনকে বলে, একটা সুন্দর ছেলেকে আজ থেকে আমার ব্যবসার অংশী করে নিলাম জাইন। কারণ বয়স হয়েছে, এখন আর একা একা খাটতে পারি না অত।

জাইন বলে, খুব ভাল করেছ। তা লোকটা কেমন?

—আমার তো খুব ভাল লেগেছে। খুব শান্তশিষ্ট নম্র বড় বংশের ছেলে, মালকড়িও অনেক আছে। তুমি আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আজ রাতে ও আমাদের সঙ্গেই খানাপিনা করবে। সেই সুযোগে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়ে যাবে।

জাইন চোখ কপালে তুলে বলে, এ তোমার কী রকম কথা, আমি তোমার ঘরের বিবি, আমাকে পরপুরুষের সামনে বেরুতে হবে?

—আহা, বুঝছো না কেন, এখন থেকে সে আর বাইরের লোক থাকছে না। সে আমার ব্যবসার সমান অংশীদার। তুমি আমার জীবনের অংশীদার, আর ও

আমার ব্যবসার। তা হলে সে বাইরের মানুষ থাকে কী করে? আর তা ছাড়া, বিরাট বড়লোক, অনেক পয়সার মালিক, ওকে হাতে রাখতে পারলে আখেরে ভাল হবে।

জাইন কপট রাগত স্বরে বলে, তা যাই বল বাপু, পরপুরুষের সামনে, আমি ঘরের বিবি বেরুবো—এ আমার ভাল ঠেকছে না।

ইহুদীটা বলে, তুমি দেখছি, সাচ্চা মুসলমানের মেয়ের মতো কথা বলছো! ওরা ঘরের মেয়েদের বাক্সে পুরে রাখে। ভাবে, বাইরে বেরুতে দিলেই বিবিজান হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তো আর মুসলমান নই। পয়গম্বর মুসা তো কোথাও বলেননি, ইহুদী মেয়েরা পর্দানশিন হয়ে ঘরে খাঁচার পাখীর মতো বন্দী হয়ে থাকবে? মানুষের সংগে মানুষ সহজ সরল ভাবে মিশবে, আলাপ করবে। দোস্তী বন্ধুত্ব করবে, এইতো স্বাভাবিক!

জাইন বলে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, ওর সংগে আলাপ পরিচয় করলে আমাদের সুবিধে হবে, আমি করবো।

সেদিন রাতে নানা উপচারে আহার পর্ব সমাধা হ'লো। মাথা গুঁজে আনিস খানাপিনা সারলো। ইহুদী বলে, তুমি তো আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গেলে আনিস, অত শরম করছো কেন? জাইন আমার বিবি—সেও আমার অংশীদার। সুতরাং ওর সংগে একটু প্রাণ খুলে কথাটথা বল, আলাপ পরিচয় কর!

আনিস কিন্তু বহুত সেয়ানা। আড়চোখেও একবার তাকিয়ে দেখে না জাইনকে। একেবারে লাজুক নিরীহ গোবেচারা মানুষ - যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ইহুদী যদিও মুখে বলছিল, জাইনের সংগে আলাপ-সালাপ কর, তবুও মনে মনে আনিসের এই সলজ্জ-বিনম্র মুখ স্বভাবতই তাকে মুগ্ধ করছিল।

পরদিন রাতেও ইহুদী আনিসকে সংগে নিয়ে আসে। আবার তিন জনে একত্রে বসে আহারাদি করে। জাইনের স্বামী ভাবে, এইভাবে নিত্য একসংগে ওঠা বসা এবং খানা করতে করতে আনিসের লাজুক ভাব এবং জড়তা একদিন কেটে যাবে। তখন সে তাদের এক অন্তরংগ শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠবে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো ষাটতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

ইহুদীর কথাই ঠিক, কয়েকদিনের মধ্যেই আনিস ওদের পরিবারের এক পোষমানা পাখী হয়ে ওঠে। সওদাগর ভাবে, ছেলেটার স্বভাব চরিত্র সাচ্চা—নিরাপদ। জাইন-এর কাছে ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে বাইরে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ইহুদীটা বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে পা রাখা মাত্র পাখী তার নিজের মূর্তি ধরে। জাইনকে আদর সোহাগ করে। হাসি তামাশা, নাচ গানে মেতে ওঠে।

এর পর একদিন ইহুদীটা ঘরে ফিরে এসে জাইন আর আনিসের মাখামাখি দেখে বিস্মিত এবং সন্দিগ্ধ হয়। এই কয়দিনের মধ্যে আনিস একেবারে অন্য

মানুষ হয়ে গেছে। কথায় কথায় সে জাইনকে নিয়ে হাসি মস্করা করে। জাইনও কারণে অকারণে আনিসের সঙ্গে কলকল করে কথা বলে। একেবারে বেহায়া বেশরম বাজারের মেয়েমানুষের মতো।

আনিসের স্বভাবে যে সলজ্জ-ভাব সে প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিল তার বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নাই। তার অনুজ-প্রতিম শ্রদ্ধা সমীহ সব কোথায় উবে গেছে। বরং এখন তার আচার আচরণে একটা অস্বাভাবিক ঔদ্ধত্য এবং বেপরোয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন কী করে সম্ভব? সওদাগর সন্দেহাকুল হয়ে ভাবে, নিশ্চয়ই এর পিছনে জাইন-এর কোনও ছলনা কাজ করছে।

রোজই সে তাকে-তাকে থাকে। হাতেনাতে ধরবে—এই তার বাসনা। কিন্তু সুযোগ আর মেলে না। অবশেষে একদিন সে ফাঁদ পাতলো।

সেদিন খুব সকাল সকাল আনিসকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। আগে থেকেই জাইনকে বলে রেখেছিল, কোতোয়ালকে নিমন্ত্রণ করেছে, আজ রাতে সে ওদের সঙ্গে খানাপিনা করবে।

ইহুদী বাড়ি ফিরে দেখে, জাইন নানাবিধ ব্যঞ্জন বানিয়ে রেখেছে।

— বাঃ, খাসা সব খানা পাকিয়েছ তো, বিবিজান।

— বানাবো না? আজ ঘরে কোতোয়াল সাহেব আসবে বলেছো, তার আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হলে চলবে কেন?

ইহুদী বলে, তা ঠিক। আচ্ছা, তোমরা বসে গল্প কর, আমি কোতোয়াল সাহেবকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে আসি।

জাইন বলে, কখন ফিরবে বল, সেইভাবে টেবিলে কাপড় পাতা হবে। খানাপিনা সাজানো হবে।

—তা ধর ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।

ইহুদী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে নয়। ফুল-বাগিচার ওপাশ দিয়ে ছাতের ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার ঘরে যায় সে। সেখান থেকে জাইনাবের শোবার ঘর পালঙ্ক-শয্যা পরিষ্কার নজর করা যায়।

চিলেকোঠার ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

একটুক্ষণের মধ্যে খেলা শুরু হয়ে যায়। জাইন জড়িয়ে ধরে আনিসকে। টানতে টানতে নিয়ে যায় পালঙ্ক-শয্যায়। বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আনিসের দেহের ওপর। তারপর চুষে কামড়ে ছিঁড়ে এক-সা করে দিতে থাকে আনিসকে। আনিসও কম বাহাদুর নয়। ইহুদী ভাবে—জোয়ান লেড়কীকে তাঁবে রাখতে গেলে তার এই ভাটা পড়া যৌবনে সম্ভব না। আনিসের মতো উদ্দাম পৌরুষ থাকা দরকার।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে বুকে। মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু নাঃ, এখনই নয়। ইহুদী ভাবে, ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। যথাসময়ে এর ব্যবস্থা করা যাবে।

সওদাগরের ফেরার সময় হয়ে এসেছে দেখে জাইন নিজের বেশবাস সংবৃত করে পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আনিসকে বলে, ভালো করে ইজার পাতলুন পরে নাও, মুখপোড়াটা এখুনি আবার এসে পড়বে।

ইহুদী হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে, না জাইনার, নসীব খারাপ। কোতোয়াল সাহেব একটা খুনের তদন্ত করতে শহরের বাইরে গেছেন। ফিরতে অনেক দেরি হবে। আজ আর আশা নাই। সুতরাং এস, আমরাই ভালো মন্দ যা বানিয়েছ উদরস্থ করি।

খানাপিনা শেষ হলে আনিস যথারীতি বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ি চলে যায়। ইহুদী জাইনকে সঙ্গে নিয়ে পালঙ্কে এসে শুয়ে পড়ে। জাইন এগিয়ে এসে স্বামীকে আদরের ভান দেখায়।

—তোমাকে আজ এত মনমরা দেখছি, কেন গো? আমি তখন থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি কী যেন ভাবছো, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছো। কেন, কিছু হয়েছে নাকি?

কোমর থেকে একখানা চিঠি বের করে ইহুদী। বলে, আমার এক দালাল লিখেছে অনেক দূর দেশ থেকে। আর একদিনও দেরী করা সম্ভব না। এখনি রওনা হতে হবে। না হলে ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

খুশিতে নেচে ওঠে জাইন-এর মন, কিন্তু মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ করে না, বরং দুঃখে কাতর হয়ে বলে, কিন্তু তোমার এই শরীর স্বাস্থ্য, অত দূর দেশে যাবে তুমি, আমি তো ভাবতেই পারছি না গো, কী করে থাকবো। আচ্ছা, কতদিন লাগবে? কবে ফিরবে?

—তা ধর, তিন থেকে চার বছর। তিন বছরের আগে ফেরা সম্ভব হবে না। তবে চার বছরের বেশিও থাকবো না।

জাইন কত সহজে চোখে জল আনতে পারে। টসটস করে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে ওর গাল বেয়ে।

—অতদিন আমি একা একা থাকবো কি করে? না না, সে আমি পারবো না, গো।

ইহুদী শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি সেই কথাই ভেবেছি, জাইন। তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে না। অল্প দিনের তো ব্যাপার নয়। তা ছাড়া আমার শরীর স্বাস্থ্যও তেমন সুবিধের নয়। কখন কী অসুখ-বিসুখ করে বলা তো যায় না। সে অবস্থায় তুমি কাছে না থাকলে আমারও ভালো লাগবে না। আমি ঠিক করেছি, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

—এ্যাঁ!

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে জাইন। নিজের অন্তরের অভিব্যক্তি আচমকা আসে মুখ দিয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ঘুরিয়ে নেয়।

—এ্যাঁ! কী মজা হবে বল তো? এতদিনে আমার মনের সাধ মিটবে। তোমার কাছে থাকবো, কত নতুন নতুন দেশ দেখবো—এ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। তা কবে রওনা হবে, গো?

ইহুদী বলে, না,আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে। আজ খুব ভোরে উঠে তুমি সব বাঁধা-ছাঁদা করে নেবে। দশটা উটের ব্যবস্থা করে এসেছি। উট নিয়ে সহিসরা খুব সকালেই হাজির হয়ে যাবে। আমার মনে হয় আমাদের দামী দামী সব সামানপত্রই ধরে যাবে দশটা উটে, কী বল ?

জাইন-এর তখন মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। স্বামীর কথার কী জবাব দেবে ?

ইহুদী বলে, কি গো, কী ভাবছো ?

জাইন ধাতস্থ হয়ে নিতে পারে। বলে, না, মানে—মানে কী মজা হবে বলতো ? কত নতুন নতুন দেশ দেখবো—

ইহুদী ছোট্ট করে জবাব দেয়, তা বটে।

সূর্য ওঠার আগেই মালপত্র সব বোঝাই হয়ে যায় উটের পিঠে। সহিস তাড়া লাগায়, তাড়াতাড়ি করুন মালিক, বেলা বেড়ে গেলে খরায় চলতে বড় কষ্ট পেতে হবে যে।

একটা বড় উটের পিঠে ডুলি বসানো হয়। সামনে ইহুদী, মাঝখানে জাইন ও পিছনে তার চার সহচরী হুবুব, খুতুব, সুকুর এবং রুকুর বসে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বাষট্টিতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

চলে যাওয়ার আগে সকলের অলক্ষ্যে সদর দরজার মাথায় লিখে রেখে যায় জাইন ঃ

তুমি আজ কত দূরে, সখা,
তবু তোমার বুকের ধকধকে তুফানের উত্তাপ
আমি অনুভব করতে পারি আমার কলিজায়।
আল্লাহ কসম, কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না,
যায় যদি বিশ্ব রেণু রেণু হয়ে যায়,
তবু তুমি আর আমি
একসাথে র'বো দুইজনে।

পরদিন সকালে আনিস দোকানে আসে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ইহুদীকে আসতে না দেখে চিন্তিত হয়। কি জানি কোনও অসুখ বিসুখ করলো নাকি, সন্ধ্যা হতে না হতে তাড়াতাড়ি সে জাইনের বাড়িতে চলে আসে। সদর দরজায় ঢুকতে গিয়েই হোঁচোট খায়। দরজার ওপরে জাইনের সেই কবিতাটা পড়ে বুঝতে আর অসুবিধা হয় না, তার চোখের মণি বুকের কলিজা আর এ

বাড়িতে নাই।

তাড়াতাড়ি সে অন্দরে প্রবেশ করে। সব ঘর শূন্য হাহাকার করছে। কেউ কোথাও নাই। পাড়া-পড়শীদের কাছে ছুটে যায় আনিস। তাদের কাছ থেকে জানতে পারে, সওদাগর তার বিবিকে নিয়ে বহু দূরদেশে রওনা হয়ে গেছে। কয়েক বছরের মধ্যে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নাই।

শোকে মুহ্যমান আনিস ফুলবাগিচায় বসে বসে চোখের জল ফেলতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘাসের শয্যাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে সে জাইনকে আপন করে পায়। জাইন ওকে আদর করে চুমু খেয়ে সান্ত্বনা দেয়। কেঁদ না সোনা, কেঁদ না। আমাদের এই বিচ্ছেদ চিরকালের নয়। আবার আমরা মিলবো, হাসবো নাচবো গাইবো—ভালোবাসা করবো।

আনিসের ঘুম ভেঙে যায়। আবার সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আহার নিদ্রা সব টুটে যায়। একমাত্র জাইন তার ধ্যান জ্ঞান—আর কিছুই তার ভাল লাগে না।

একটানা এক মাস পথ চলার পর ইহুদী সহিসদের বলে, সামনেই একটা বন্দর শহর আসছে। শহরে ঢোকার মুখে তাঁবু ফেলতে হবে। এখানে দু-এক-দিন জিরিয়ে আবার যাত্রা করা যাবে।

শহরের প্রত্যন্তে সমুদ্র উপকূলের এক নির্জন পরিবেশে তাঁবু ফেলা হলো।

জাইন-এর চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করায় ইহুদীটা।—এ্যাই খানকি, শিগ্গির জামা-কাপড় খোল, খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়া।

জাইন ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। কী করবে কিছুই বুঝতে পারে না। ইহুদী আবার গর্জে ওঠে, কী কথা কানে যাচ্ছে না। দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি। সে নিজেই জাইনের পরনের জমকালো সাজ-পোশাকটা ফড় ফড় করে ছিঁড়ে ফেঁড়ে ন্যাংটো করে ফেলে। তারপর একখানা লম্বা লকলকে বেতের চাবুক এনে সপাং সপাং করে চাবকাতে থাকে জাইনের পিঠে পাছায় বুকে। দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে। জাইনের ফুলের মতো নরম দেহখানা রক্তে মাখামাখি হয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে যায় নিচে। চাবুকখানা ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে যায় ইহুদীটা।

শহরের প্রবেশ মুখেই এক কামারশালায় গিয়ে বলে, আমার বিবির হাতে পায়ে লোহার হাল লাগিয়ে দিতে হবে।

—কামার অবাক হয়, লোহার হাল মানুষের জন্য ? সে আবার কী ? কেন ?

ইহুদী বলে, বাঁদীটা বজ্জাত মাগী, চরিত্রহীন খানকি। পরপুরুষ নিয়ে কেলি করে। আমরা ইহুদী, আমাদের শাস্ত্রমতে চরিত্রহীনা মেয়েদের এইটেই উচিত সাজা।

কামারটা ইহুদীর সঙ্গে তাঁবুতে আসে। জাইন তখন রক্তাক্ত দেহে কাতরাচ্ছিল। ইহুদীর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তুমি একটা জানোয়ার, এইরকম একটা ফুলের মতো মেয়ে, তাকে চাবুকের

ঘায়ে আধমরা করে ফেলেছো। এত বড় স্পর্ধা! দাঁড়াও আমি তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি।

কামারটি ছুটে গিয়ে কোতোয়ালকে খবর দেয়, হুজুর আপনি দেখে আসুন, ঐ সমুদ্রের ধারে একটা তাঁবুর ভেতরে পরীর মতো পরমাসুন্দরী একটা মেয়েকে প্রায় খুন করে রেখে দিয়েছে একটা ইহুদী শয়তান।

কোতোয়াল সিপাইদের হুকুম করে, জলদী যাও, ঐ ইহুদী, তার সুন্দরী বাঁদী আর অন্যান্য যারা আছে তাদের সব্বাইকে ধরে বেঁধে নিয়ে এস এখানে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সিপাইরা এসে ওদের ধরে নিয়ে গেল কোতোয়ালের কাছে। জাইন-এর চেহারা দেখে কোতোয়াল তো হতবাক। ভাবতে পারে না— এমন রূপ এমন যৌবন কোনও মেয়ের হয় নাকি!

— তোমার নাম কী বাছা?

জাইন বলে, আপনার বাঁদীর নাম জাইন, হুজুর।

—আর এই কদাকার জানেয়োরটা কে?

—একটা ইহুদী, হুজুর। লোকটা আমার মা বাবার হেপাজত থেকে ছিনিয়ে এনেছে আমাকে। সর্বক্ষণ নিষ্ঠুর অত্যাচার করে আমার ওপর। নানারকম উৎপীড়ন চালায়, বলে, ইসলাম ছাড়বি কিনা বল, না হলে চাবকে ছাল খুলে নেব।' কিন্তু আমার বাপ ঠাকুরদার স্বধর্ম, কী করে ত্যাগ করি, হুজুর? আমি রাজি হইনি। আর এই কারণেই সে আমার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে চলেছে।

এই বলে সে সলজ্জভাবে দেহের ওপরের কিছু অংশ অনাবৃত করে দেখায়। কোতোয়াল শিউরে ওঠে, থাক থাক, আমি বুঝতে পেরেছি।

জাইন বলে, হুজুর, আপনি এই কামার-ভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এই ঘাটের মড়াটা তার কাছে কী প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে পায়ে লোহার হাল গেঁথে দিতে চেয়েছিল সে। আল্লাহ মেহেরবান, কামার-ভাই রাজি হননি ওর এই নৃশংস প্রস্তাবে। তা না হলে এতক্ষণ আমার কী দশা হতো একবার ভাবুন, হুজুর!

জাইন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, আপনি আমার এই সখীদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওরা আপনাকে বলবে, আমি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে। আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে আমরা মানি না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ।

কোতোয়াল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী, সত্যি?

সবাই এক সঙ্গে জবাব দেয়, হ্যাঁ হুজুর, সত্যি।

তখন কোতোয়াল রোষ-কশায়িত চোখে ইহুদীর দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে, মনে হতে লাগলো, কোতোয়ালের রোষানলে বুঝি ভস্ম হয়ে যাবে ইহুদীটা।

—ওরে শয়তান, শঠ, আল্লাহর দুষমন এবার তোর মোউৎ সামনে। তার আগে জবাব দে, কেন এই মেয়েটিকে তার মা বাবার হেপাজত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিস? কেন তার উপর এই রকম অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়েছিস.

এতকাল ? কেন তাকে ইসলামের পবিত্র পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছিস ? কেন তাকে তোদের ঐ ভয়ঙ্কর ম্লেচ্ছ বিধর্মের পথে টেনে নিয়ে যাবার জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিস ? কেন ? কেন ? কেন ? জবাব দে।

ইহুদী বলে, মালিক, আমি আমাদের পবিত্র পয়গম্বর মুসা জ্যাকব এবং আবন-এর কসম খেয়ে বলছি, এই মেয়ে আমার ধর্মপত্নী।

কিন্তু কোতোয়াল সে কথায় কর্ণপাত না করে গর্জে ওঠে, চোপ রও, বেয়াদপ। এ্যাই—চাবুক লাগা শয়তানটাকে।

সিপাইরা ধাক্কা মেরে ইহুদীটাকে নিচে ফেলে দিয়ে এলোপাতাড়ি চাবুক চালাতে থাকে। একশোটা পায়ে, একশোটা পাছায় এবং একশো চাবুক ওর পিঠে মারা হয়।

কিন্তু তখনও লোকটা কাতরাতে কাতরাতে বলতে থাকে, ও আমার শাদী করা বিবি ধর্মপত্নী ?

—ধর্মপত্নী ? ধর্ম বলে তোদের কিছু আছে ? ধর্মপত্নী ! এই—যদি না স্বীকার করে ওর হাত আর পা কেটে ফেলে দে।

আতঙ্কে শিউরে ওঠে ইহুদী। তাকিয়ে দেখে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক উদ্যত-খড়্গ জহ্লাদ !

—না না, বাবা, কেটো না। কেটো না আমাকে। করছি—স্বীকার করছি —স্বীকার না করলে যখন রেহাই পাওয়া যাবে না তখন স্বীকার করছি : হ্যাঁ, এ আমার শাদী করা বিবি নয়। আমি এর মা-বাবার হেপাজত থেকে ছেনতাই করে এনে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য এর ওপর অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করেছি এতকাল।

—হুম্, এই তো বাপের সুপুত্তুরের মতো কথা। সোজা আঙ্গুলে ঘি কিছুতেই উঠতে চায় না। এ্যাই—জানোয়ারটাকে কয়েদখানায় ছুঁড়ে দে। যা, ওখানে থাকগে—জিন্দগীভর। দেখগে, কী মজা ! বিধর্মী ম্লেচ্ছ ইহুদীদের আমরা এই সাজাই দিই। আল্লাহর এই নির্দেশ। আমরা আল্লহ ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে স্বীকার করি না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ।

জাইন কোতোয়ালকে সালাম জানিয়ে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসে। সেইদিনই সে সহিসদের বলে, তাঁবু গুটিয়ে বেঁধে ছেঁদে নাও, আমি দেশে ফিরে যাবো।

তিন দিন চলার পর জাইন সদলবলে এক খ্রীষ্টান পাদরীর গির্জার মঠের কাছে এসে পোঁছয়। এই গীর্জা-মঠে জনার চল্লিশ পাদরী অবস্থান করে। এদের প্রধানের নাম দানিস।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সহিসরা জানালো এদিকটার পথ বড় দুর্গম। চোর ডাকাত এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভীষণ উপদ্রব। যদি রাতের মতো কোথাও আশ্রয় নেওয়া যায়, ভাল হয়।

জাইন ভাবছিল, কী করবে। এমন সময় ঐ গীর্জার মঠের সদরে দণ্ডায়মান এক বৃদ্ধ পাদরীর আহ্বান কানে এল। এই বিগত-যৌবন লোলচর্ম বৃদ্ধই

পাদরী-পিতা দানিস। দেহ অপারগ হলে কী হবে, অল্প বয়েসী ডবকা মেয়ে-ছেলে দেখলে এখনও সে খলবল করে ওঠে। চোখে মুখে ফুটে ওঠে নোংরা বিকৃত কামনার লালসা। সারাদিন সে ফটকের পাশে একখানা কুর্শি পেতে বসে থাকে—পথের দিকে চেয়ে। উটের পিঠে চেপে যাত্রীরা যাতায়াত করে। বৃদ্ধ লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সহিস সর্দার বললো, মালকিন, খ্রীষ্টান পাদরী সাহেব ডাকছেন! বলছেন, রাতের বেলা এ পথে চলা নিরাপদ নয়। তাঁর গির্জেতে রাতটা কাটাতে বলছেন তিনি। মালকিন, ওরা তো খ্রীষ্টান।

জাইন বলে, হোক খ্রীষ্টান। আমরা তো শুধু রাতটা থাকবো। ওদের খাবো না, ছোঁবো না। তাতে আর কী ক্ষতি হবে। চল, উনি যখন ডাকছেন, এখানেই থাকা যাক রাতের মতো।

সহিসরা মঠের প্রাঙ্গণে উটবাহিনীকে প্রবেশ করালো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো পঁয়ষট্টিতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

বৃদ্ধ পাদরী-পিতা বিকৃত কামনার ফাঁদে ছটফট করতে থাকে। জাইনকে সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। তার রূপ-যৌবন পাগল করে তুলেছে তাকে। অবশেষে আর স্থির থাকতে না পেরে, সে তার এক চেলাকে দূত করে পাঠালো জাইন-এর কাছে। কিন্তু লোকটা জাইন-এর সামনে এসে আর কথা বলতে পারে না—তো তো করতে থাকে। জাইন তো হেসেই খুন। আসল ব্যাপার সে আগেই আঁচ করতে পেরেছিল।

পাদরীটা কিছু না বলতে পেরে বৃদ্ধের কাছে ফিরে যায়। বৃদ্ধ আর একজনকে পাঠায়—জাইনকে রাজি করাতে। কিন্তু সেও জাইন-এর সামনে দাঁড়িয়ে তার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। জাইন তাকে অট্টহাসিতে বিদায় জানায়। এইভাবে এক এক করে চল্লিশজন পাদরীই ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউই প্রস্তাবটা পাড়তে পারে না। অবশেষে কাম-কাতর বৃদ্ধ নিজেই এসে দাঁড়ায় জাইনের দরজায়। জাইন স্বাগত জানায় তাকে, এই যে আসুন, আসুন ঠাকুর্দা, আসুন! তা নাতনীকে না দেখে বুঝি ঘুম আসছিল না।

বৃদ্ধা থতমত খেয়ে বলে, না মানে, হ্যাঁ, মানে—মানে—

খিল খিল করে হাসে জাইন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমার বিরহ আর সইতে পারছেন না, এই তো? তা আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে কাটান, কাল আপনার বাসনা পূরণ করে দেব, ঠাকুর্দা। পথের অনেক ধকল গেছে। আমার শরীরটা তেমন যুৎসই নাই। এ অবস্থায় তো মজা পাবেন না। সেইজন্যেই বলছি, কাল সকালে আসবেন, আমি আপনার বাঁদী হয়ে থাকবো। আজ তা

হলে আসুন।

হুবুব এবং অন্যান্য সখীদের সংগে আলোচনায় বসলো জাইন, দ্যাখ—আমার মনে হচ্ছে, ঐ পালের গোদা বুড়ো পাদরীটা সারারাত ঘুমাবে না। আবার এসে আমাদের দরজা ধাক্কাবে। ঐ ইতরটার সামনে দাঁড়াতে আমার গা ঘিন ঘিন করছে। তার চেয়ে মরি-বাঁচি চল, এখনি এই রাতেই, আবার রওনা হয়ে পড়ি।

সহচরীরাও সায় দিল, সেই ভালো, ঐ নখ-দাঁত-হীন ভালুকটার থাবায় না গিয়ে বরং পথের হিংস্র জানোয়ারদের হাতে প্রাণ খোয়ানো অনেক ভালো।

সেই রাতেই ওরা গীর্জা-মঠ ছেড়ে সকলের অজ্ঞাতসারে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে!

আল্লাহর অপার করুণা, একদিন ওরা নিরাপদেই স্বদেশে পৌঁছে যায়। ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হামামে গিয়ে ঘষে মেজে ভাল করে গোসল করে জাইন। হুবুবকে বলে, যা, আনিসকে ডেকে নিয়ে আয়।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

আনিস জাইনের শোকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে কেঁদে নিজেকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল। হুবুবকে দেখে সে অবাক হয়ে লাফিয়ে ওঠে, তোমার মালকিন?

হুবুব বলে, মালকিন ভাল আছেন। আজই আমরা ফিরে এসেছি। আপনি চলুন।

—তার স্বামী?

—সে নাই। কোতোয়াল তাকে কয়েদ করেছে—জীবন ভোর।

এরপর আনিস হাতে বেহেস্ত পায়। দৌড়ে নয়, বলা যায়—অপূর্ব ছন্দ তুলে নাচতে নাচতে এসে সে হাজির হয় জাইন-এর ঘরে।

জাইন তখন শাহজাদীর মতো জমকালো সাজ-পোশাক আর দামী রত্নাভরণে সেজেগুজে সামনে খানা সাজিয়ে বসেছিল। আনিসকে দেখা মাত্র সে ছুটে গিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

—ইয়া আল্লাহ, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার!

আনিস হাসে, ও কিছু নয়, দেখো, আবার দুদিনেই আগের মতো ঠিক হয়ে যাবো। মোক্ষম দাওয়াই যখন পেয়ে গেছি, তখন আর ওসব নিয়ে চিন্তা ক'রো না। এখন বল, কেমন ছিলে? তোমার স্বামীর খবর কী—

—সে খতম হয়ে গেছে।

জাইন আগাগোড়া সব খুলে বললো।

—এবার আমাদের পথের কাঁটা দূর হয়েছে, আনিস। এখন আর কেউ আমাদের ভালবাসায় বাধ সাধতে আসবে না। আমি তোমাকে শাদী করবো—এবং আজই রাতে।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজী এবং সাক্ষীদের ডাকা হলো। শাদীনামা তৈরি করে সই-সাবুদ করে দিয়ে গেল তারা।

এর পরের দৃশ্য বাসরঘর। সেখানে আর আজ যাবো না। গল্প এখানেই খতম।

শাহরাজাদ থামতেই দুনিয়াজাদ উঠে এসে গলা জড়িয়ে ধরে, কি সুন্দর কিস্সা দিদি, আর কী মিঠে করেই না তুমি বলতে জান।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন এর পর তোমাদের সেই 'কড়ের বাদশাহ' কিস্সা শোনাতে পারি।

সুলতান শাহরিয়ার বলে, স্বচ্ছন্দে। তাছাড়া গল্পটা আমার অজানা।

একদিন খলিফা হারুন অল রসিদ তার উজির আমির অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে দরবারে কর্ম-নিরত ছিলেন। এমন সময় মহামূল্যবান মণি-রত্ন-খচিত একটি সোনার কারুকার্য করা রক্তবর্ণের রত্নমুকুট হাতে নিয়ে হারেমের একটি ছোট্ট খোজা এসে দাঁড়ালো।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ, কে পাঠালো?

খুদে খোজাটা কুর্নিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার জুবেদা বেগমসাহেবা এটা পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে। এই মুকুটের মাথায় একটা খালি জায়গা দেখছেন —এখানে বসানো ছিল এক অমূল্য রত্ন। আকারে এত বড় রত্ন সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, রত্নটি খোয়া গেছে। কিন্তু কী ভাবে গেছে তা খোঁজখবর করেও হদিশ পাওয়া যায়নি। বেগমসাহেবা এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য শহরের তাবৎ জহুরীদের দোকানে খোঁজ করেছেন। কিন্তু তেমনটি পাওয়া যায়নি। তাই শেষে নিরুপায় হয়ে তিনি এটি আপনার কাছে পাঠালেন। আপনি যদি চেষ্টা করে এর জুড়ি কোনও মণি-রত্ন সংগ্রহ করে বসিয়ে দিতে পারেন, তিনি খুব খুশি হবেন।

খলিফা বললেন, সর্বনাশ, জুবেদার ঘরে চুরি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

উজির আমির ওমরাহদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, তোমরা মুকুটটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে যাও। দেখ, যদি তোমাদের কারো ঘরে থেকে থাকে এর জুড়ি কোনও রত্ন, তবে যে দামেই হোক আমি কিনে নিতে চাই।

আমির ওমরাহরা নিজেদের প্রাসাদে গিয়ে অনেক খুঁজে-পেতে দেখলো। কিন্তু না, কারো প্রাসাদেই ঐ ধরনের কোনও রত্নের সন্ধান পাওয়া গেল না।

খলিফা উজিরকে বললেন, শহরের সব ধনী সওদাগরদের বাড়ি তল্লাশ করে দেখ, যদি মেলানো যায়।

কিন্তু না, উজিরের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অত দামী এবং অত বড় রত্ন কারো কাছেই পাওয়া গেল না।

খলিফা চিন্তিত, ঈষৎ বিরক্ত হলেন, আমি তামাম দুনিয়ার মালিক, আর আমার বেগমের সামান্য এই সাধ পূরণ করতে পারবো না আমি ?

এমন সময় এক বণিক এসে বললো, ধর্মাবতার, এই রকম একখানা মহামূল্য রত্ন বসরাহর এক যুবকের কাছে আছে।

খলিফা জিজ্ঞেস করেন, তার নাম ?

—তার নাম কুড়ের বাদশা আবু মহম্মদ। লোকে তাকে শুধু কুড়ের বাদশা বলেই জানে। তবে অন্য কারো কাছে সে বিক্রী করবে না সে রত্ন। একমাত্র মহামান্য ধর্মাবতার চেষ্টা করলেই তা পেতে পারেন।

তখুনি খলিফা উজিরকে বললেন, তাহলে আর বিলম্ব নয়, জাফর। তুমি বসরাহর সুবাদারকে চিঠি পাঠাও। যে ভাবেই হোক, ঐ রত্নটি আমার চাই।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বসরাহর সুবাদার জুবাইদি। জাফর তাকে চিঠি লিখে মাসরুরের হাতে পাঠিয়ে দিল।

আমির অল জুবাইদি খলিফার আদেশ পাওয়া মাত্র মাসরুরের সঙ্গে একদল সিপাই সান্ত্রী দিয়ে আবু মহম্মদের প্রাসাদে পাঠিয়ে দিল।

আবু মহম্মদের প্রাসাদে পৌঁছে মাসরুর দ্বাররক্ষীকে বললো, তোমার মালিককে খবর দাও, বাগদাদ থেকে খলিফার দূত এসেছে। এখনি তাকে বাগদাদে যেতে হবে। খলিফা তাকে তলব করেছেন।

দ্বাররক্ষী অন্দরে চলে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলা যায়, স্বয়ং আবু মহম্মদ বাইরে বেরিয়ে এসে সালাম জানিয়ে স্বাগত অভ্যর্থনা করলো, মহামান্য ধর্মাবতারের দূত, আপনি মেহেরবানী করে এক পলকের জন্য ভেতরে এসে ধন্য করুন।

মাসরুর বলে, না না, সে সম্ভব নয়। আর এক মুহূর্ত দেরি করতে পারবো না, ধর্মাবতার আপনাকে তলব করেছেন। এখুনি যেতে হবে। তৈরি হয়ে নিন।

আবু মহম্মদ বিনয়াবনত হয়ে বলে, শাহেনশাহর আদেশ আমার শিরোধার্য। আমি এখুনি রওনা হবো। কিন্তু তার জন্যে তো কিছু গোছগাছ করে নিতে হবে আমাকে। সেইটুকু সময় আপনি আমার এই গরীবখানায় একটু পায়ের ধুলো দিন।

মাসরুর আর না করতে পারে না। সদলে অন্দরে প্রবেশ করে। বৈঠকখানায় ঢুকেই মাসরুরের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। একি কাণ্ড। এত জাঁকজমক, এমন মহামূল্যবান পর্দা গালিচা, আসবাবপত্র সে তার খলিফার প্রাসাদেও দেখিনি কখনও। চারদিকে সুন্দর সুন্দর শৌখিন জিনসপত্র ছবির মতো করে সাজানো

গোছানো। টেবিলের ওপরে রাখা ছিল দুষ্প্রাপ্য অমূল্য মণিরত্নের হার এবং অন্যান্য রত্নাভরণ।

আবু মহম্মদ বললো, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন হামামে চলুন। গোসলাদি করে শরীরটাকে একটু ঝরঝরে করে নিন।

মাসরুর ভাবে, কথাটা মন্দ বলেনি। সারা পথের ধুলোবালিতে গা-হাত-পা কিচ কিচ করছে। একটু গোসল করে নিলে মন্দ হয় না।

হামামে ঢুকে মাসরুরের তাক লেগে যায়। হামাম না বেহেস্ত, ঠিক বুঝতে পারে না সে। স্বপ্নেও এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। সব মিলে সুললিত কাব্যের মতো মনে হয় তার কাছে।

হামাম থেকে ফিরে মাসরুর দেখে, একখানা বড় টেবিলে খানাপিনা সাজানো হয়েছে। অসংখ্য অগণিত রেকাবী ভর্তি জানা-অজানা নানারকমের নানা স্বাদের খানা।

আবু মহম্মদ হাতজোড় করে বলে, মেহেরবানী করে যদি কিছু গ্রহণ করেন, আনন্দিত হবো।

মাসরুর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে করে পেটপুরে খেল।

এরপর পাঁচটি কিশোর পাঁচখানা সোনার থালায় করে নিয়ে এল পাঁচটি মোহরের তোড়া। প্রতিটি এক হাজারের। আবু মহম্মদ বলে, আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন, ধর্মাবতারের বান্দা।

এছাড়াও সূক্ষ্ম কারুকার্য করা নানা রত্নখচিত একটি সাজ-পোশাক তুলে দিল সে মাসরুরের হাতে।

—গরীবের এই সামান্য দানটুকু প্রত্যাখ্যান করবেন না, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

মাসরুর খুব খুশি মনে নিল।

এর পর ওরা বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে।

খলিফা সাদরে কাছে বসালেন আবু মহম্মদকে। বললেন, আমি শুনেছি, তামাম আরব দুনিয়ার আমির বাদশাহদের কাছে যে রত্ন মণি-মাণিক্য নাই, তা তোমার কাছে আছে।

মহম্মদ সবিনয়ে বলে, ধর্মাবতার ঠিকই শুনেছেন। যদিও আপনার দূত আমাকে কোনও আভাষ দেয়নি তবু আমি বুঝেছিলাম, কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হয়তো আপনি কোনও দুষ্প্রাপ্য রত্নের সন্ধান করছেন। কিন্তু আমার কাছে যে সব অমূল্য মণিরত্ন আছে, পয়সার বিনিময়ে তা আমি কোনও জহুরী বা ব্যবসাদারের কাছে বিক্রি করি না। তবে জাঁহাপনার যদি কোনও কাজে লাগে, সাগ্রহে আমি দিয়ে যাবো। এই কারণে, আমি নিজে থেকেই দুটি বাক্স করে কিছু মণিরত্ন নিয়ে এসেছি আপনার জন্য। আপনার পছন্দ মতো বেছে নিয়ে আমাকে ধন্য করুন ধর্মাবতার।

এই বলে আবু মহম্মদ একটি থলে থেকে সোনার একটি বাক্স বার করে

তার ডালা খুলে ধরলো।

খলিফা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, হীরে চুনী, পান্না মুক্তো, রক্তরাগমণি, পদ্মরাগমণি প্রভৃতি নানারকম বহু বিচিত্র বর্ণের মণি-মাণিক্য ঝকমক করছে। আবু মহম্মদ বললো, ধর্মাবতার এগুলোর আকার এবং প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করুন। এবং আপনার সংগ্রহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন সুলতান বাদশাহদের সংগৃহীত রত্নাবলীর সঙ্গে এর ফারাক কোথায়। আমি বাজি রেখে বলতে পারি জাঁহাপনা, এই বাক্সে যা দেখছেন তার সমতুল্য আর একটিও কোথাও খুঁজে পাবেন না। এবং সবিনয়ে বলছি, এ সবই আপনার জন্য এনেছি, গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

আবু মহম্মদ এর পর আর একটি বাক্স বের করে। সে বাক্সের ডালা তুলতেই দেখা গেল, একটি সোনার গাছ। তার কাণ্ড শাখা সব সোনার। পাতাগুলো পান্নার আর ফলগুলো সব হীরে রক্তরাগমণি নীলকান্তমণি বৈদুর্যমণি প্রভৃতি নানা অমূল্য রত্নের তৈরি। গাছের শাখায় অনেক পাখি। সবই সোনার। ঠোঁট এবং চোখগুলোয় রত্ন বসানো।

খলিফা এবং তাঁর পারিষদরা হাঁ হয়ে দেখতে থাকেন। এমন অদ্ভুত বস্তু তারা কেউ কখনও দেখেনি। আবু মহম্মদ বললো, ধর্মাবতার খুবই অবাক হচ্ছেন, মনে হচ্ছে। কিন্তু আরও অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার আছে।

এই বলে সে বাক্সটার মধ্যে হাত রেখে গাছটিকে মৃদু নাড়া দিতেই পাখিগুলো গান গেয়ে শিস দিয়ে নাচতে থাকলো। নাচতে নাচতে তারা এ ডাল থেকে সে ডাল, সে ডাল থেকে আবার অন্য ডালে হুটোপুটি করতে লাগলো।

খলিফা মন্ত্রমুগ্ধের মতো হতবাক হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। সভাসদরাও বিস্ময়ে স্তব্ধ। সারা দরবারকক্ষে নেমে আসে গভীর নিস্তব্ধতা। বাস্তবে ভাবা দূরে থাক, এযাবৎ কেউ কখনও এ বস্তু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

খলিফা বললেন, আচ্ছা আহম্মদ, তোমার সম্বন্ধে যা খোঁজখবর সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে তো পৈতৃক সূত্রে এসব তুমি পাওনি। তোমার বাবা বসরাহর এক হামামের অতি সাধারণ ভিস্তিওলা ছিল মাত্র। সে যা রোজগার করতে পারে তাতে পরিবার প্রতিপালন করে তেমন কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তোমার বাবার বাবাও নিতান্তই সাধারণ গরীব-সরীব মানুষ ছিল। সুতরাং এই অমূল্য সম্পদ বংশগতভাবে তুমি পাওনি, এ আমি সুনিশ্চিত। এর পর আরও মজার কথা, সারা বসরাহতে তুমি কুড়ের বাদশাহ নামে বিখ্যাত। ওখানকার মানুষ তোমাকে কখনও পথে ঘাটে বেরোতে বা কোন কাজ কাম কি ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও ধান্দা করতে দেখেনি কখনও। এমতাবস্থায় এই বিশাল ধনরত্নের মালিক তুমি হলে কী করে ?

আবু মহম্মদ বলে, আপনার সব জানাই সত্যি, ধর্মাবতার। আমরা বংশানুক্রমে ভীষণ গরীব ছিলাম। আমার বাবা হামামে জল দেবার কাজ করে যে, সামান্য পয়সা রোজগার করতো তাতে দুবেলায় নুন-রুটির সংস্থানও হতো

বসরাহর দিকে।

হঠাৎ মুজাফ্ফর সাহেবের খেয়াল হলো, আমার জন্যে কিছু কেনা হয়নি। রুমালের খুঁটে সেই পাঁচটা দিরহাম যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা পড়ে আছে। শেখ সাহেব কপাল চাপড়াতে লাগলেন, ইয়া আল্লাহ! একী করলাম! আমার এত কালের প্রাণের দোস্ত—তার ছেলে বৌকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। সেই কথার খেলাপ হয়ে যাবে। না না, সে হয় না। তোমরা জাহাজ ফেরাও। আমি আবার চীনের বন্দরে নামবো। মহম্মদের জন্যে সওদা আমাকে করতেই হবে।

সংগীরা অনেক বোঝালো, পাঁচটা তো মোটে দিরহাম, ওতে কী বা সওদা হবে, আর তা থেকে নাফাই বা কী হতে পারবে? এর জন্যে আপনি আবার এতটা পথ ফেরত যাবেন? কতদিন আমরা দেশ ছাড়া, মন আকুল হয়ে উঠেছে। এই সময় আরও দেরি হয়ে যাবে না?

শেখ বললেন, কিন্তু কী করা যাবে। আমি ওয়াদা করে এসেছি তাদের কাছে। তোমরা কী চাও, আমি মিথ্যেবাদী হই?

একজন বলে, মিথ্যেবাদী হওয়ার কথা উঠছে কেন? সে তো দিরহাম ক'টা দিয়েছিল, কিছু সওদা করে আনতে। এবং সে সওদা বসরাহয় বিক্রি করে দু পয়সা নাফা করতে। তা আমরা যদি ঐ পাঁচ দিরহামের বদলে ওকে পুরো পাঁচটা দিনারই দিয়ে দিই—তাতেও কি সে খুশি হবে না? আপনি কি বলতে চান শেখ সাহেব, পাঁচটা দিরহাম খাটিয়ে সে পাঁচ দিনার নাফা করতে পারবে কখনও?

শেখ বললেন, তা হয়তো পারবে না। কিন্তু আমি তো মিথ্যেবাদী হয়ে থাকবো। সওদা কিছু না করেই যদি তাকে লাভের পয়সা হিসাবে পাঁচটা মোহর গুণে দিই তবে কী ইনসাফের দিক থেকে তা ঠিক হবে?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আটষট্টিতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

এ কথার পর আর কেউ কথা বলতে পারে না। আবার জাহাজ ফিরে চলে চীন-বন্দরের দিকে।

কয়েকদিন পরে চীনের বন্দরে জাহাজখানা আবার গিয়ে ভিড়লো। শেখ মুজাফ্ফর বললো, তোমরা সকলে জাহাজেই অপেক্ষা কর। আমি সওদাটা সেরে আসি।

জাহাজ থেকে সবে শেখ সাহেব মাটিতে পা দিয়েছে, ঠিক সেই সময় এক থুর থুরে বুড়ি একটা বুড়ো হ্যাংলা বাঁদরকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে এল তার কাছে।

—হ্যাঁ-গা পরদেশি, কিনবে এই বাঁদরটা? একেবারে জলের দামে দিয়ে দেব?

বুড়িটার প্রস্তাব শুনে মুজাফ্ফর একটুক্ষণ চিন্তা করে বলে, কিন্তু মাত্র

পাঁচটা দিরহামের সওদা আমার বাকী। আর সব হয়ে গেছে। তা পাঁচ দিরহামে দেবে কী তোমার এই বাঁদর?

বুড়িটা গদ গদ হয়ে বলে, খুব দেব, খুব দেব। দাও, ঐ পাঁচ দিরহামই আমার লাভ। এই নাও বাঁদর।

ব্যস, আর বেশি দূরে যেতে হ'ল না। শেখ মুজাফ্‌ফর বাঁদরটাকে নিয়ে জাহাজে এসে উঠলো।

আবার জাহাজের মুখ ফেরানো হলো। এবারে আর কোথাও থামা নয়। সোজা বসরাহ।

কিন্তু এক জায়গায় এসে অল্পক্ষণের জন্যেও থামতে হলো।

একটা ছোট্ট দ্বীপ। চার পাশে সমুদ্র। সেই দ্বীপের কিনারে দাঁড়িয়ে একটা জেলে জাল ফেলছিল। এক সময়ে সে একবার মাছের সঙ্গে একটা মুখ বাঁধা থলে তুললো। থলেটার মুখ খুলে মাটির ওপরে উপুড় করে ঢালতেই দেখা গেল রাশি রাশি হরেক রকমের সব পাথর।

বাঁদরটা সব লক্ষ্য করলো। তারপর আকারে ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাতে চাইলো সে শেখ সাহেবকে। শেখ সাহেব ইঙ্গিত ইশারায় বলতে চাইলো—সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন বাঁদরটা বিরাট একটা লাফ দিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল নিচে।

শেখ ভাবল, বাঁদরটার মাথায় ছিট আছে। না হলে এই গহিন দরিয়ায় ঝাঁপ দেয় কখনও?

কিন্তু একটু পরেই সে উঠে এল। হাতে একটা মুখ-বাঁধা থলে। বাঁধন খুলে থলেটা উপুড় করে দিল। তাজ্জব ব্যাপার! নানারকম হীরে হজরতের একটা স্তূপ জমে উঠলো।

বাঁদরটা আবার ঝাঁপ দিল জলে। আবার সে তুলে আনল আর একটা থলে। সে থলেও হীরে চুনী পান্না মুক্তো এবং অমূল্য সব মণি-মাণিক্যে ভরা।

এইভাবে সে পর পর অনেকবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেকগুলো থলে তুলে নিয়ে আসে।

বসরাহর বন্দরে জাহাজ ভিড়লো। সারা সহরের লোক ভেঙ্গে পড়লো। চীন থেকে কি বাণিজ্য করে নিয়ে এসেছে শেখ মুজাফ্‌ফর, দেখার জন্য দলে দলে মানুষ এসে ভীড় করতে লাগলো বন্দরে।

কিন্তু আমি গেলাম না। মা বললো, খবর পেলাম, শেখ সাহেবের জাহাজ ভিড়েছে। তা যা না, বাবা। তার সঙ্গে দেখা করে আয়। দেখ গে, আমাদের জন্য কী সওদা সে এনেছে।

আমি বললাম, তোমার আর ধৈর্য মানছে না, মা। দিয়েছো তো ভারি পাঁচটা দিরহাম। তাতে কী এমন হাতী ঘোড়া আনবে সে? ঠিক আছে, নিজের কাজে যাও। যদি কিছু এনে থাকে, বহুত শেরিফ আদমী সে, নিশ্চয়ই তোমার ঘরেই পৌঁছে দেবে।

মা মুখ বেজার করে বক বক করতে করতে চলে যায়। একেবারে কুড়ের বাদশা—

একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। সর্বনাশ, মা বাড়িতে নাই। এখন কী উপায়? দরজা খুলে দেবে কে? আমি তো উঠতে পারবো না।

আরও জোরে জোরে নাড়তে থাকে কড়া। বাইরে থেকে কে যেন বেশ গলা চড়িয়েই হাঁকছে, কই গো, আবু আহম্মদ, শিগ্গির দরজা খোল, আমি মুজাফ্ফর—তোমার চাচা। দেখ, তোমার জন্যে কী এনেছি।

আমি কান পেতে উন্মুখ হয়ে শুনি! আরে চাচা মুজাফ্ফরের গলা, না? হঠাৎ আমার জড়তা কেটে যায়। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই। প্রায় ছুটে গিয়েই দরজা খুলে দিই।

চাচা মুখ ভরা হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলো, তা তোমরা সব ভাল আছ বাবা?

—ভালই আছি, চাচা। আপনি কেমন ছিলেন?

—ভাল—খুব ভাল। তা শোন, তোমার জন্যে এই বাঁদরটা এনেছি। পাঁচ দিরহাম দাম নিয়েছে।

মেজাজটা কেমন খিঁচড়ে গেল আমার। শেষ পর্যন্ত একটা বাঁদর! নিজেদের খেতে জোটে না—তার মধ্যে আর এক ভাগীদার? মনে মনে মা-এর উপর ভীষণ চটে উঠি।

এমন সময় জাহাজের খালাসীরা কতকগুলো মাল বোঝাই বস্তা এনে রাখলো আমার ঘরের মাঝখানে। মুজফ্ফর সাহেব আমার নির্বোধ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এসবও তোমার?

—আমার? তবে যে আপনি বললেন চাচা, বাঁদরটার দামই পাঁচ দিরহাম লেগেছে?

—হ্যাঁ বাবা, তা তো বলেছি। এবং সত্যিই পাঁচ দিরহাম দাম নিয়েছে ওর আগের মালকিন সেই চীনা বুড়িটা।

আমি আরও অবাক হই, তবে এই বস্তার মালগুলো কিনলেন কী দিয়ে?

—ওগুলো তো কিনিনি, বাবা!

—তবে?

—ওগুলো এই বাঁদর রোজগার করেছে বাবা।

—রোজগার করেছে? ঐ বাঁদরটা?

আমার আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

তখন মুজাফ্ফর চাচা সব বৃত্তান্ত আমাকে খুলে বললো।

—এ সবই তোমার হকের ধন। নাও ভাল করে যত্ন করে তুলে রাখ। জীবনে সৎপথে থেকে তোমার বাবা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে গেছে। তোমার মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে তোমাকে পালন করছে। অথচ কত লোক লোক-ঠকিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে।

তবে এও ঠিক বাবা, সৎপথে অবিচল থাকা বড় কঠিন, কিন্তু কষ্ট করে

চলতে পারলে আল্লাহ তার ইনাম দেন।

আমাদের দিন ফিরে গেল।

সামান্য দু-একখানা জহরত বিক্রি করে আমি প্রভূত অর্থ পেলাম। সেই অর্থে বসরাহর সম্ভ্রান্ত এলাকায় একখানা প্রাসাদ এবং অন্যান্য আসবাবপত্র কিনলাম। আমার প্রাসাদে যাঁরা পায়ের ধুলো দেন, তাঁরা সবাই অবাক হয়ে যান। অত দুষ্প্রাপ্য পর্দা গালিচা আসবাব এবং বিলাসের সামগ্রী নাকি কোনও সুলতান বাদশাহর প্রাসাদেও নাই। তবে বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, সে সব সংগ্রহ করতে এই ধরনের একটি দুটি মাত্র মণি-রত্ন আমাকে বিক্রি করতে হয়েছিল। তারপর থেকে ঠিক করেছি আর একটিও বেচবো না। সারা দুনিয়ার জহুরী বণিকরা আমার প্রাসাদে নিত্য ধর্ণা দেয়। এক একটা রত্নের জন্য এমন এমন সব দামের লোভ দেখায়—যে-কোনও লোকই প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে। কিন্তু আমার নগদ অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই। যারা আসে, এক কথায় তাদের বিদায় করে দিই—না বিক্রি করবো না।

কিন্তু ধর্মাবতার, আপনি আমাদের মালিক। আপনি যদি এগুলো গ্রহণ করেন, আমি ধন্য হবো। তবে সবিনয়ে বলছি, কোনও মূল্যের বিনিময়ে আমি এর একটিও বিক্রি করবো না। মেহেরবানী করে আমাকে কোনও ইনাম দিতে চাইবেন না।

খলিফা বললেন, বেশ, তাই হবে। কিন্তু সেই বাঁদরটা কোথায়, সে এখন তোমার কাছে আছে?

—না ধর্মাবতার। তাহলে বাকীটুকুও বলি, শুনুন। মুজাফ্‌ফর চাচা বাঁদরটা আমার হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিল, বেটা, এই জানোয়ারটা বড় পয়মন্ত—কোনও অনাদর বা অত্যাচার করো না একে।

আমি বললাম, আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মানবো চাচা। আমারও মনে হয়েছে, এ সাধারণ কোনও বাঁদর নয়।

পরের বাড়ির কাজ সেরে মা ফিরে এলে মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, মা, তুমি দিন রাত আমাকে কত গঞ্জনা দিয়েছো—কেন কাজ-কর্ম করি না, কেন কুড়ের বাদশা হয়ে শুয়ে শুয়ে দিন কাটাই। কিন্তু আমি তোমাকে কী কথা বলতাম, মা? বলতাম, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তবে একনিষ্ঠ মন নিয়ে সেই আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেই চলতে হবে। তা দেখ, আমার কথা তো ফলে গেল?

মা বললো, তুই ঠিক কথাই বলেছিলি বাবা, সত্যিই আল্লাহ যাকে দেন ছপ্পর ফুঁড়েই দেন। তা না হলে এই জিনিস আমরা পাই কখনও?

যাই হোক, দারুণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে দিন কাটতে লাগলো। বাঁদরটাকে আমি একটা সোনার সিংহাসনে বসিয়ে রাখি। তার চার পাশে চারজন বাঁদী সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে তার হুকুম তামিল করার জন্য।

আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, ধর্মাবতার, এই বাঁদরটা আসার পর থেকে আমার সব কুড়েমি এক নিমেষে কেটে গিয়েছিল। নতুন কর্মোদ্যমে মেতে

উঠলাম আমি। বসরাহর বাজারে দোকান কিনলাম। বাগ-বাগিচা জমিজমা যেখানে যা ভাল কিছু পেলাম সব এক এক করে কিনে নিতে থাকলাম। এখন আমি ব্যস্তবাগীশ মানুষ। এত কাজের চাপ, নাওয়া খাওয়ার সময় পাই না প্রায়।

যাই হোক, বাঁদরটার প্রতি আমার প্রখর দৃষ্টি ছিল সদা সর্বদা। যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গ ছাড়া করি না। আমি যা খাই ওকেও তাই খেতে দিই। এইভাবে দারুণ সখ্য গড়ে উঠেছিল ওর সঙ্গে। যদিও মুখে কথা বলতে পারতো না, কিন্তু কাগজ কলম দিলে সে তার মনের কথা লিখে জানাতে পারতো।

একদিন আমরা দুজনে প্রাসাদে বসে আছি, এমন সময় বাঁদরটা আমাকে ইশারায় জানালো কাগজ কলম দিতে। আমি কাগজ কলম ও দোয়াত এনে দিলাম। সে লিখলো, 'আবু মহম্মদ, বাজার থেকে একটা সফেদ রঙের মোরগ কিনে এনে দাও আমাকে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গেলাম। কী আশ্চর্য, সারা বাজার ঢুঁড়ে একটি মাত্রই সাদা মোরগ পেলাম। যে দাম চাইলো, সেই দামেই কিনে নিয়ে এলাম। ঐ সময় বাঁদরটা আমার ফুলবাগিচার মধ্যে বসেছিল। দেখলাম ওর থাবায় ধরা একটা সাপ।

আমার হাত থেকে মোরগটা নিয়ে সে সাপের সামনে ছেড়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে গেল তুমুল লড়াই। সে যে কী লড়াই, কেমন করে বোঝাই আপনাকে। সাপটা চেষ্টা করলো লেজে জড়িয়ে মোরগটাকে আছড়ে মেরে ফেলতে আর মোরগটা চেষ্টা করতে লাগলো ওর গলাটা খামচে ধরতে। শেষ পর্যন্ত মোরগেরই জিত হলো। এক সময় সাপের গলাটা খামচে ধরে ঘায়েল করে ফেললো সে।

সাপটা মরে গেল। কিন্তু মোরগরা সাপ খায় না।

এরপর বাঁদরটা মোরগটাকে দুহাতে ধরে ডানা দুখানা ছিঁড়ে ফেললো। পালকগুলো একটা একটা করে বাগানের চারপাশে পুঁতে দিল। এবং মোরগের ছাল ছাড়ানো দেহটা বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত খুঁড়ে কবর দিয়ে রাখলো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একাত্তরতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

এর পর বাঁদরটা বিরাট এক চিৎকার তুলে লাফ দিয়ে ওপরে ওঠে গিয়ে আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কখনও ফিরে আসেনি।

কিন্তু বাঁদরটা শূন্যপথে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানের চারপাশে পুঁতে রাখা সেই পালকগুলোর প্রত্যেকটি এক একটা এই রকম সোনার ডাল-পালাওলা গাছ হয়ে গেল। তাদের পাতাগুলো এই রকম পান্নার এবং ফল-

গুলো সব এই রকমই হীরে-মুক্তো মণি মাণিক্যের।

বাগানের মাঝখানে যেখানে মোরগের দেহটা কবর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে গজিয়ে উঠলো এক বিশাল মহীরুহ। এবং তারও কাণ্ড ডালপালা সোনার। পাতা পান্নার। ফলগুলো এইরকম হীরে জহরতের। কিন্তু সে তো অনেক বড় বৃক্ষ। সামান্য বাক্সে ভরে আনা সম্ভব নয়। ধর্মাবতার যদি ইচ্ছা করেন, ওটাও আপনাকে দিতে পারি আমি।

খলিফা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন। জাফরকে বললেন, জাফর এ কাহিনী আগামী দিনের মানুষের জন্য সোনার অক্ষরে লিখে রাখা দরকার।

জাফর বললো, ধর্মাবতারের যেরূপ অভিরুচি।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামে। সুলতান শাহরিয়ার বললো, এ কাহিনীর সার কথা বড় সুন্দর।

শাহরজাদ বললো, এর পর আপনাকে নওজোয়ান নূর এবং এক লড়াকু মেয়ের কিস্সা শোনাই :

কোন এক সময়ে মিশরে এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো। সে সময়ে তার মতো বিত্তবান আর কেউই ছিল না। এই সওদাগরের নাম শের।

প্রথম যৌবনে সে নানা দেশ ঘুরেছিল। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সমুদ্র অভিযান করেছিল। কত বিপদ-সঙ্কুল মুহূর্ত জীবনে এসেছে, কত ঝড় বয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সে-সবই অতীত স্মৃতি মাত্র আজ।

এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়েছে দেহ। চুল দাড়ি সব হাঁসের পালকের মত শুভ্র হয়ে গেছে। যৌবনের উদ্দামতা আজ শান্ত স্থির। সেদিন যে স্বাস্থ্য যৌবন উদ্দীপনা ছিল আজ তার কিছুই নাই।

কিন্তু একটা জিনিস আছে। অর্থ! অতুল বৈভবের সে মালিক আজ। সে দিন প্রথম যৌবনে, এই অর্থের কণামাত্র তার আয়ত্তে ছিল না।

সারাটা যৌবন অর্থের অন্বেষণেই কেটে গেছে। ভোগের ফুরসত মেলেনি। কিন্তু আজ অফুরন্ত অবকাশ। এবং অকল্পনীয় ঐশ্চর্যের সে মালিক। কিন্তু হায়! যৌবন, যে কখন চুপিসারে বিদায় নিয়েছে। ভোগের বাসনাটুকু শুধু জেগে আছে মনে, সাধ কিছু নাই।

এই অগণিত দাস দাসী বাঁদী খোজা নফর এবং অপরিমিত ধন-দৌলত সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহর অপার করুণা—একটি মাত্র পুত্র সন্তান তিনি তাঁকে দিয়েছেন।

ছেলেটির বয়স এখন সবে চৌদ্দ। দেখতে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর। শের সন্তানের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে মাঝে মাঝে। সারা জীবনের অতৃপ্ত বাসনার সমস্ত জ্বালা নিমেষে জল হয়ে যায়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বাহাত্তরতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একদিন বাবার দোকানে বসেছিল নূর। এমন সময় তার কয়েকজন ইয়ার দোস্ত এসে বললো, চল, এক মজার জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি তোমাকে।

নূর বলে, কোথায় ?

—আরে, চলই না ইয়ার। না গেলে বুঝবে কী করে ?

নূর তবু জানতে চায়, জানতো ভাই, বাবাকে না বলে কোথাও যেতে পারি না। কোথায় যাবো, কত দেরি হবে, সব বললে তবে মত পাওয়া যাবে।

ছেলেদের মধ্যে সবগুলোই নূর-এর চেয়ে বয়সে বড়। এবং বেশ বোঝা যায়, চৌকস সেয়ানা হয়ে উঠেছে সকলেই। ওদের একজন বললো, আমাদের একটা বাগানবাড়ি আছে জান তো ? সেই বাগানবাড়িতে আজ একটা মাইফেল বসবে সন্ধ্যে বেলা। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—মাইফেল ? সে আবার কী ?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে নূর। সবে সে কিছুদিন হলো বাড়ির বাইরে বেরুবার ছাড়পত্র পেয়েছে। তাও দোকান পর্যন্ত, মাত্র দুএক ঘন্টার জন্য। সুতরাং বাইরের জগতের বহু বিচিত্র রসের সন্ধান সে কী করে রাখবে ?

একজন বলে, হৈ হৈ। মাইফেল জান না ? তাহলে আর জীবনে জানলে কী ? চল চল, কী জিনিস, তা মুখে বলে তো বোঝানো যাবে না ? নিজের চোখে দেখতে হবে। দেখে মজা লুটতে হবে ! তবে মোদ্দা কথা জেনে রাখ, একটা গান-বাজনার আসর বসবে। খানাপিনা হবে—এই আর কি ?

নূর উৎসাহিত হয়। এই কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে সব তরুণেরই সহজাত কৌতূহল অদম্য হয়ে ওঠে। নূর বললো, তোমরা দাঁড়াও, আমি আব্বাজানের মত করিয়ে আসি।

ওরা যখন দল বেঁধে সেই বাগানবাড়ির ফটকে এসে দাঁড়াল তখন সূর্য পাটে বসি বসি করছে। আমরা যাকে বলি গোধূলি লগ্ন বা কনেদেখা আলো।

বাগানের মালী এক সদাশয় বৃদ্ধ মানুষ। ওদের সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ভেতরে। সবুজ ঘাসের শয্যায় এলিয়ে আয়াস করে বসলো সকলে। বড় মনোরম পরিবেশ। যে দিকে চোখ যায়—শুধু সবুজের মেলা। গাছে গাছে ফুল ফল পাখী।

মালী এসে বলে, বাতি জ্বালানো হয়েছে মালিক, আপনারা রঙমহলে গিয়ে বসুন।

ওরা সকলে পাশের হাবেলীতে প্রবেশ করে।

একখানা প্রশস্ত কক্ষ। দামী পর্দা গালিচায় মোড়া ঘরের দেয়ালে টাঙানো নামজাদা শিল্পীর রতি-বিলাসের নানাবিধ আসন প্রক্রিয়ার রক্ত-নাচানো যৌন-চিত্রাবলী।

নূর এসব কখনও চোখে দেখেনি।

একটু ক্ষণের মধ্যেই নফররা খানা সাজাতে থাকলো। হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি পাখি জাতীয় মাংসের ঝোল, মসাল্লাম ভেড়া দুম্বা খাসীর মাংসের কাবাব কোর্মা কোপ্তা। তন্দুরী রুটি, বিরিয়ানী এবং নানাবিধ মেঠাই মণ্ডা ও ফল।

খুব পরিতৃপ্তি করে আহার পর্ব শেষ করে ওরা। এর পর শরাবের পাত্র-পেয়ালা এনে বসিয়ে দেয় নফররা।

নূর অবাক হয়! শরাব।

একজন হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ শরাব—মৌজ করে পান করার বস্তু।

নূর বলে, না, ওসব আমি খাবো না।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে, আরে অত ভয় পাচ্ছো কেন, জহর নয়—অমৃত। একবার চুমুক দিয়েই দেখ। খাঁটি আঙ্গুরের রস।

—আঙ্গুরের রস? তবে যে বলছো, সরাব?

—ও সব মন্দ লোকে বলে। এর প্রতিটি ফোঁটা আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি। নাও, খেলেই বুঝতে পারবে। খারাপ লাগে খেও না।

সবাই এক সঙ্গে মদের পেয়ালা মুখে তুলে ধরে। নূর তখনও সংশয়াচ্ছন্ন। তুলবে কী তুলবে না ভাবছে। এমন সময় একজন হাতে করে তুলে ওর অধরে ধরে।

নূর একটা চুমুক দেয়। স্বাদটা নেহাত মন্দ নয়। এরপর সে নিজে হাতেই ধরে পেয়ালাটা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চুয়াত্তরতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয়ঃ

ধীরে ধীরে নেশাটা জমে ওঠে। সারা দেহের মধ্যে রক্তস্রোত দ্রুততর হয়। এ অনুভূতি নূরের জীবনে এই প্রথম। মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করতে থাকে। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। এই অপরূপ সুখানুভূতিতে সবকিছুই সুন্দর হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে এতক্ষণ সে সহজভাবে তাকাতে পারছিল না। এবার কিন্তু আর কোন লজ্জা-সঙ্কোচ হয় না—সোজাসুজি দৃষ্টি মেলে সব ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গিলতে থাকে নূর। এবং দেখতে বেশ ভালও লাগে। এতক্ষণ যা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল, সুরার ইন্দ্রজালে সবই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

বন্ধুরা বলে, কী হে দোস্ত, কবি হয়ে উঠলে নাকি?

এক ইয়ারের তীর্যক বাক্যবাণে সম্বিত ফিরে পায় নূর।

—না—মানে, ছবিগুলো দেখছিলাম—খুব সুন্দর।

বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠে।

একজন বলে, ওসব ছবি-টবি দেখে কী হবে, চাঁদ? দুধের সাধ কী ঘোলে মেটে। দাঁড়াও, আসল ক্ষীর তোমাকে খাওয়াচ্ছি।

নুর এ কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। দেখাদেখি বোকার মতো ওদের হাসির তরঙ্গে গা ঢেলে দেয়।

এর পর আর কোনও বাধা থাকে না। পেয়ালার পর পেয়ালা নিঃশেষ হয়ে যায়। নুরের তখন মদে চুর চুর অবস্থা। চোখ ঢুলু ঢুলু। গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে।

সবাই মিলে নুরকে টানাটানি শুরু করে দেয়, এই নুর, এখনি ঢলে পড়লে চলবে কেন, দোস্ত। আসল চিজই তো আস্বাদ করলে না? চোখ মেল—তাকাও?

নুর চোখ না খুলেই বিজড়িত কণ্ঠে বলে, এর চেয়েও আর কি চিজ থাকতে পারে, ইয়ার?

—পারে পারে। একবার চোখ মেলে দেখ না?

নুর কোনও রকমে মাথা তুলে চোখ তুলে তাকায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তড়িতাহতের মতো চমকে ওঠে। এক ভাবে তাকিয়ে থাকে। পলক পড়ে না।

একটি পরমাসুন্দরী নব-যৌবন উদ্ভিন্না যুবতী নারী! স্বর্ণচাঁপার মতো গায়ের রঙ। কাজল কালো টানা টানা চোখ। গুলাবের পাপড়ির মতো গাল। আর অধর? সে তো এক চিত্ত-চঞ্চলকারী অপরূপ মায়াময় যাদু।

নুর অবাক হয়ে দেখতে থাকে। এত সুন্দর মেয়ে সে তো আগে কখনও দেখেনি।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ছিয়াত্তরতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

মেয়েটির মুখে এক দুর্বোধ্য মধুর হাসি। নুরের গা ঘেঁষে সে বসে পড়ে। ঐ নেশার ঘোরেও সহজাত সম্ভ্রম বোধ তখনও তার একেবারে বিনষ্ট হয়নি। ফারাক রেখে একটু সরে যেতে চায় সে। মেয়েটি ডান বাহু দিয়ে ওর গলাটা বেষ্টন করে কাছে টেনে ধরে, উঁহু, দেব না সরতে। কেন আমি কী বাঘিনী? খেয়ে ফেলবো।

নুর অনুভব করে, ওর বাঁ হাতের বাহুতে মেয়েটির নিটোল স্তনের নিষ্পেষণ হয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ এক অজানা শিহরণে শিহরিত হয়ে ওঠে সে। সরে যেতে গিয়েও আর সরে যেতে পারে না। পরন্তু মেয়েটিরই বুকের কাছে খানিকটা সরে আসে সে।

এর পর এক সময় নুর দেখলো ঘরে অন্য সব ইয়ার বন্ধুরা আর কেউ নাই।

কোন ফাঁকে কখন যে তারা সটকে পড়েছে নূর বুঝতে পারেনি।

চোখে মুখে এক ভয় ভয় ভাব ফুটে ওঠে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসে :

—কী ভয় করছে বুঝি, খোকা?

—না না ভয় করবে কেন? কিন্তু মানে—ওরা সব গেল কোথায়?

—ওমা, তুমি কী অসভ্য গো, অতগুলো ইয়ার দোস্তের সামনে তুমি আমাকে বে-আব্রু করবে? তোমার শরম করবে না?

নূর এ কথার অর্থ বুঝতে পারলো না সেই মুহূর্তে। কিন্তু বুঝলো একটু পরেই। মেয়েটি এক এক করে তার অঙ্গবাস খুলে খুলে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। এইভাবে সে একসময় শুধুমাত্র একটি ফিনফিনে পাতলা গোলাপী সেমিজ পরে দাঁড়ায়। এক মুহূর্ত। তীর্যক দৃষ্টি হেনে তাকায় নূরের চোখে চোখ রেখে, কী কেমন লাগছে?

মুখে ওর মধুর হাসি। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। তারপর ঝুপ করে বসে পড়ে নূরের কোলের ওপর। এক হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেয় নূর-এর অধরের নিচে।

—কই, দাও?

নূর দুঃসাহসী হতে পারে না। মেয়েটিই কামড়ে ধরে নূরের টসটসে পাকা আঙ্গুরের মতো অধর।

সেই প্রথম বুঝতে পারে নূর, রক্তের স্বাদ নোনতা। বাঘ নাকি এই দুরন্ত স্বাদের নেশাতেই মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

মেয়েটি বলে, তুমি কী হাঁদা গো, শেমিজটাও কী আমি খুলবো নাকি!

নূর এই প্রথম শিখছে। এ ধমক শুনতে যেন আরও মধুর লাগে।

বাড়ি ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল। নূরের মা সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিল চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। নূর এই প্রথম রাত করে বাড়ি ফিরলো। মা বললো, কী রে নূর, তোর এত দেরি হ'ল কেন, বাবা।

নূর কোনও কথা বলতে পারে না। নেশায় সে তখন টলছে। মা চমকে ওঠে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, একি, তুই মদ খেয়েছিস?

নূর তবু কোনও কথা বলে না। মা-এর কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কোনও রকমে টাল সামলাতে সামলাতে ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতাত্তরতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হলো :

মা ভেবে আকুল হয়। নূরের বাবা যদি জানতে পারে, কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে।

হলোও তাই।

অনেক রাতে নূরের বাবা ছেলের ঘরে আসে। এবং সংগে সংগেই বুঝতে পারে, নূর মদ্যপান করে এসেছে। সংগে সংগে সে জ্বলে ওঠে।

আমার বাড়িতে এত অনাচার। ঘুমন্ত নূরের চুলের মুঠি ধরে সে তুলে ধরে, এ্যাই—ওঠ, বেতমিজ। তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার বাড়িতে মদ খেয়ে ঢুকেছিস্!

নূরকে বেধড়ক প্রহার করতে থাকে সে। কিন্তু একতরফা মার খাওয়ার ছেলে সে নয়। তার ওপরে মদের নেশায় চুর হয়েছিল। বাবাকেও সে দু ঘা বসিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বাবা জোয়ান ছেলের গোত্তা সহ্য করতে পারবে কেন? ঘুষি খেয়ে সে ছিটকে পড়ে যায়। নূর বাঘের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। একখানা ডান্ডা তুলে সে বাবার দিকে ধেয়ে আসে। প্রাণভয়ে শের ছুটে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তিন কসম খেয়ে বলে, তোর মতো ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ঢের ভাল। আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম। যে হাতে আমাকে মারলি সেই হাত কেটে নিয়ে তোকে যদি কাল সকালে বাড়ি থেকে না তাড়াই, আমি এক বাপের পুত্র নই।

মা হা-হা করে ছুটে আসে, এ তুমি কী কথা বললে নূরের বাপ। না না, ও কথা তুমি ফিরিয়ে নাও।

শের সিংহের মতো গর্জে ওঠে, আমার এক কথা, কাল ওকে আমি তাড়াবোই।

মা ভাবলেন, কাল সকালে একটা অঘটন ঘটবে। খুব ভোরে সে নূরকে ডেকে তোলে। বলে, তোর আর এ বাড়িতে থাকা হবে না, বাবা। তোর বাবা ক্ষেপে উঠেছে। এই নে, আমার কাছে এগারো শো দিনার ছিল—তোকে দিলাম। এটা নিয়ে তুই আলেকজান্দ্রিয়াতে চলে যা। পয়সা ফুরিয়ে গেলে আমার কাছে লোক পাঠাবি। আবার দেব। যা বাবা, আর দেরি করিসনে। হয়তো এখুনি তোর বাবা জেগে উঠবে।

নূর আর দেরি করলো না। মায়ের দেওয়া দিনারগুলো কোমরে বেঁধে সে নীল-এর ঘাটে গিয়ে নৌকায় চেপে বসলো।

আলেকজান্দ্রিয়া দুনিয়ার সেরা শহর। নতুন জায়গায় এসে নূর-এর মন ভরে যায়। যে দিকে তাকায় ঝকঝকে তকতকে—সুন্দর সাজানো গোছানো—একেবারে ছবির মতো।

শহরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। এক সময় সে বাঁদীবাজারে এসে হাজির হয়। দালালরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে জটলা করছে। বণিক সওদাগররাও এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। একটু পরেই নীলামের ডাক শুরু হবে।

নূর লক্ষ্য করে, একটা খচ্চরে চেপে এক বৃদ্ধ এবং তার পিছনে এক পঞ্চদশী তরুণী এগিয়ে আসছে হাটের দিকে। মেয়েটির স্বচ্ছ বোরখার তলায় তার দেহের রূপ-লাবণ্য পরিষ্কার নজরে পড়ে। নূর-এর মনে হলো সেই বাগান বাড়ির মেয়েটির চেয়েও এ মেয়েটি আরও সুন্দরী—লাস্যময়ী।

বৃদ্ধকে দেখে দালালরা ছুটে আসে। বণিকরা উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

একটা উঁচু বেদির ওপরে মেয়েটিকে দাঁড় করানো হয়। একজন দালাল তার পাশে দাঁড়িয়ে নীলাম শুরু করে।

—ইয়ে আসলি হীরা—বিকনে কে লিয়ে আয়া।

একজন দাম বললো, নয়শো দিনার।

আর একজন দর দেয়, নয়শো পঁচিশ।

কিন্তু বণিক-সভার শাহবানদার বলে, আমার দাম সাড়ে ন' শো রইলো।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ করে যায়। বণিক-সভার বৃদ্ধ সভাপতি যখন হাত বাড়িয়েছে তখন আর ওদিকে হাত বাড়াতে কেউ সাহস করে না। দালাল হাঁকে সাড়ে ন' শো—খালি সাড়ে ন' শো দিনার, পানিকা দাম। আউর কোই শেরিফ আদমী হ্যায়।

কিন্তু শাহবানদারের সঙ্গে লড়বে, কার হিম্মৎ আছে?

দালাল নীলাম শেষ করতে উদ্যত হয়, সাড়ে ন' শো এক, সাড়ে ন' শো দুই!

কিন্তু সকলে নিরুত্তর। এবার দালাল-প্রথানুযায়ী বাঁদীকে জিজ্ঞেস করে এই শাহবানদারের ঘরে যেতে তুমি রাজি আছ, মেয়ে?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলে, ঐ বুড়োর এত শখ কেন? ও তো আজ বাদে কাল কবরে যাবে। আমাকে নিয়ে গিয়ে কী করবে সে। ওর দাড়িতে কী মেহেদি মাখিয়ে দেবার জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে চায়? না, আমি রাজি নই।

দালাল বলে, ডাক বাতিল। আবার ডাক শুরু হবে। কে আছেন এগিয়ে আসুন।

অন্য একজন বুড়ো উঠে দাঁড়ায়। লোকটার চোখ কোটরে বসে গেছে। নাকটা সারস পাখীর ঠোঁটের মতো। মুখে একটাও দাঁত নাই। সারা শরীরে এক ছটাক মাংস নাই—হাড্ডিসার।

দালাল বলে, দেখ, এর ঘরে যেতে চাও?

মেয়েটি বলে, ঐ শকুনটা কী আমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে? তারও তো উপায় নাই। দাঁত কই ওর? একটাও তো দেখছি না। বুড়োগুলোর এত শখ কেন? না, আমি যাবো না ওর ঘরে।

তারপর আর একজন উঠে দাঁড়ালো। লোকটা অপেক্ষাকৃত শক্ত সমর্থ। কিন্তু দোষের মধ্যে ওর আজানুলম্বিত দাড়ি।

মেয়েটি বলে, বাঃ, দাড়িটা বেশ মজার। একেবারে ছাগলের ল্যাজের মতো।

অর্থাৎ এটিও বাতিল। দালাল আর ধৈর্য রাখতে পারে না। বাঁদীর মালিক বৃদ্ধকে বলে, না সাহেব, আমার দ্বারা হলো না—এ হাটে হবে না। আপনি অন্য হাটে চেষ্টা করুন। আপনার বাঁদীর অনেক রকম ফিরিস্তি।

বৃদ্ধ হতাশ হয়ে মেয়েটিকে নিয়ে খচ্চরে চাপতে যায়। নূর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে ওকে। সত্যিই সুন্দরী সে। এমন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে ঐ বুড়ো হাবড়াগুলো কী করতে চেয়েছিল?

মেয়েটি বৃদ্ধের পিছনে পিছনে যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকিয়ে নূরকে দেখে। তারপর বৃদ্ধকে বলে, আমার মনে হয় ঐ ছেলেটি আমাকে অপছন্দ

করবে না।

বৃদ্ধ বলে, তা হলে সে ডাকলো না কেন? খোলা বাজারের নীলাম, ডাকতে তো বাধা ছিল না?

মেয়েটি বলে জানি না. তবে আমার মনে হচ্ছে, আমাকে দেখে ওর পছন্দ হয়েছে।

—কিন্তু সেধে তো তার কাছে যাওয়া যায় না। তাহলে দর পাওয়া যাবে না।

মেয়েটি বলে, ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসে নূরের কাছে।

—কী? আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

নূর বলে, পছন্দ নয় মানে? তোমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি কোথাও।

—তবে নীলাম ডাকলে না কেন? তুমি ডাকলে আমি রাজি হয়ে যেতাম।

নূর বলে, আমি পরদেশী. মিশরে আমার বাড়ি। তুমি যদি আমাদের শহরে নীলামে উঠতে, বাড়ি ঘর বাঁধা দিয়েও তোমাকে আমি কিনে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এই বিদেশে তোমাকে নিয়ে আমি রাখবো কোথায়? খাওয়াবোই বা কী? আমার কাছে সাকুল্যে হাজারখানেক দিনার আছে।

মেয়েটি বলে, ঠিক আছে, ঐ হাজার দিনারই তুমি দর দাও। আমি তোমার হয়ে যাচ্ছি।

নূর কোমর থেকে হাজার দিনারের তোড়াটা খুলে পারসীটার হাতে তুলে দেয়।

কাজী আর সাক্ষীরা চুক্তিপত্র লিখে সই করে দেয়। মেয়েটি বলে এক হাজার দিনারের বদলে এই নওজোয়ানের কাছে স্বেচ্ছায় আমি যেতে রাজি হলাম।

উপস্থিত জনতা সাধু সাধু করে ওঠে, আল্লাহ ওদের দুজনকে দুজনের জন্য পয়দা করেছিলেন। খুব চমৎকার হলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ঊনআশিতম রজনীতে

আবার সে গল্প শুরু করে:

মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে শহরের একটা বড় সরাইখানায় এসে ওঠে নূর। একখানা ঘর ভাড়া করে। বলে, কী করবো, আমার কাছে পয়সা কড়ি নাই। তোমাকে একটু কষ্ট করেই থাকতে হবে। যদি আমার স্বদেশ কাইরো হতো, তবে তোমাকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তুলতাম। কিন্তু আমি পরদেশী তাই জাঁকজমক কিছুই করা গেল না।

মেয়েটি বলে, সে জন্যে তুমি অত মন খারাপ করছো কেন? আমার হাতের এই আংটিটা নিয়ে যাও। বাজারে বিক্রি করে কিছু ভাল খাবারদাবার আর একটু সরাব নিয়ে এস। আজ রাতটা আমরা ভাল করে খানাপিনা মৌজ মৌতাত করে কাটাবো। নাই বা হলো তোমার প্রাসাদ, এই সরাইখানাই আমাদের আজ মধুযামিনীর বাসর হয়ে উঠবে।

নুর আংটিটা নিয়ে বাজারে যায়। মোরগ মোসাল্লাম কাবাব কালিয়া কোর্মা বিরিয়ানী হালওয়া প্রভৃতি কিছু মুখরোচক খাবার এবং দামি খানিকটা মদ কিনে আনে। আর কেনে কিছু ফল ফুল এবং সুগন্ধী আতর গোলাপজল।

মেয়েটি ঘরটাকে পরিপাটি করে সাজিয়ে টেবিলে কাপড় বিছিয়ে বসেছিল। খুব তৃপ্তি করে ওরা খেল। তারপর একটা পেয়ালায় সরাব নিয়ে দুজনে চুমুক দিতে থাকলো।

আয়োজন অতি সামান্য, কিন্তু তাতে কোনও দুঃখ নাই। দুজনেই খুশির মেজাজে টৈটম্বুর হয়ে উঠতে পারলো।

সে রাতে মেয়েটি আর নুর অনেক আদর সোহাগ চুম্বনে দুজনে দুজনকে ভরে দিল। সারারাত ধরে নানা আসনে ওরা ভালবাসা করলো।

নুর এক সময় বললো, তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানি না, বিবিজান। কোথায় তোমার দেশ, কেনই বা এই হাটে বিকাতে এলে, বলবে না?

মেয়েটি হাসে, বলবো, নিশ্চয়ই বলবো। আমার নাম মিরিয়াম। কনস্টানটাইনের এক বিক্রমশালী সম্রাট আমার জন্মদাতা পিতা। ছোট থেকেই তিনি আমাকে পড়াশুনা, নাচ গান, সেলাইবোনা, শিল্পকর্ম প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছেন! নিজের প্রশংসা নিজের মুখে শোভা পায় না, তবু বলছি, আমার মতো সূচের সূক্ষ্ম কারুকাজ খুব কম মেয়েই জানে। পাতলা রেশমীর কাপড়ে আমি বাহারী নক্সা তুলতে পারি। খুব দামী গালিচা পর্দা বানাতে পারি। সোনালী রুপোলী জরির কাজে আমার জুড়ি নাই। এ সবই আত্ম-প্রশংসা, কিন্তু বিশ্বাস কর, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

বাবা আমাকে অসূর্যম্পশ্যা করে অন্তঃপুরেই আটক রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমার রূপের খ্যাতি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। অনেক সম্রাট বাদশাহর ছেলেরা আমাকে শাদী করার জন্য বাবার কাছে প্রস্তাব রেখেছিল। কিন্তু বাবা আমাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না, তাই সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার আরও অনেক ভাই ছিল, কিন্তু কন্যা বলতে আমি বাবার একমাত্র আদরের দুলালী। আমার ভাইদের চেয়েও আমাকেই তিনি বেশি ভালবাসতেন।

একসময় আমার কঠিন অসুখ করে। বাবা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, আমি যদি সেরে উঠি, তিনি আমাকে আমাদের সবচেয়ে বড় গীর্জামঠে তীর্থ করতে নিয়ে যাবেন।

বাবার এই আকুল আবেদন বুঝি ঈশ্বর শুনেছিলেন। তিনি আমাকে সুস্থ করে তুললেন। মানত রক্ষার জন্য বাবা আমার ধাইমাকে সঙ্গে দিয়ে সাগর-

পারের সেই গীর্জামঠে তীর্থ করতে পাঠালেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, মুসলমান জলদস্যুরা আমাদের জাহাজে হানা দিয়ে নির্মমভাবে খুন জখম লুটতরাজ করলো। ওদের ঐ গগনভেদী গর্জনে এবং উদ্যত অসির তর্জনে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ি। তারপর যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলাম আমি এক ডাকাত দলের হাতে বন্দী। আমার মতো আরও অনেক সুন্দরী মেয়েকে ওরা একটা খোঁয়াড়ে পুরে রেখেছিল। পরে শুনলাম, বাঁদী-হাটে আমাদের বিক্রি করা হবে। এর কয়েকদিন পরে ওরা আমাদের মিশরের বাজারে এনে বেচে দিয়ে গেল। ঐ বাজার থেকে এই বুড়ো পারসী বণিকটি আমাকে সওদা করে এনেছিল। মুসলমান ডাকাতগুলো কিন্তু আমাদের কারুবই অঙ্গ স্পর্শ করেনি। শুনেছিলাম, এটা ওদের পবিত্র ব্যবসা বলে মনে করে। জীবিকার বেশাতি নিয়ে ওরা ব্যভিচার করে না কখনও। আর ঐ পারসী বুড়োটা ধ্বজভঙ্গের রুগী। ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্যে কুলায়নি। এই পারসী লোকটির কিছুদিন আগে, বিমার হয়েছিল। আমি আমার সাধ্যমতো সেবা যত্ন করে ওকে সারিয়ে তুলি। তারই কৃতজ্ঞতায় সে আমাকে বলেছিল, তোমার জন্যে আমি সেরে উঠলাম। খুব খুশি হয়েছি। বল তুমি কী চাও?

আমি বললাম, চাই না কিছুই। আপনি আমাকে আমার পছন্দমতো খদ্দেরের কাছে বেচে দেবেন—এই একমাত্র ইচ্ছা। আমি কোনও বুড়ো-হাবড়ার ঘরে যেতে চাই না।

পারসী বললো, বেশ, তাই হবে। সেইজন্যেই দেখেছো, আমি যখন বাঁদী-হাটে তিন বুড়োকে নাকচ করলাম, পারসী কিন্তু একটুও গোসা করেনি।

নূর বলে, হ্যাঁ, তা আমি নজর করেছি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশোতম রজনীতে

আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

পরদিন থেকে মিরিয়ামের ইসলামের পাঠ গ্রহণ শুরু হয়। মিরিয়াম বলে, আমি খ্রীষ্টান-পরিবারে জন্মেছি। কিন্তু এখন আমি তোমার সহধর্মিণী। তোমার কর্মই আমার কর্ম, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। কিন্তু আমি তো ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানি না নূর, তুমি আমাকে সব শেখাও।

নূর বলে, ইসলাম খুব সহজ ধর্ম। কোনও ঘোর প্যাঁচ কিছু নাই। আজ হোক, কাল হোক, সারা দুনিয়ার মানুষ এর মহত্ত্ব একদিন উপলব্ধি করতে পারবেই। আজ যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে, ভবিষ্যতে ইসলামের আনুগত্যে এসে তারা আলোর মুখ দেখতে পাবে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদি তুমি ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান ধর্মের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি পেতে চাও, আমি তোমাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবো। তবে তার আগে তোমাকে মেনে নিতে হবে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। শুধু এই বিশ্বাস যদি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পার,

তাহলেই তুমি সাচ্চা মুসলমান হতে পারবে।

তৎক্ষণাৎ সম্রাট-কন্যা মিরিয়াম দুহাত জোড় করে উচ্চারণ করলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর আমি মানি না—বিশ্বাস করি না। আল্লাহই একমাত্র সর্বশক্তিমান। মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর।

নুর আনন্দে জড়িয়ে ধরে মিরিয়ামকে, মিরিয়াম, এই মুহূর্ত থেকে তুমি মুসলমান হয়ে গেলে!

এর পর ওরা গোসলাদি সেরে খানাপিনা করলো। নুর যতই বেশি করে দেখছে মিশছে, ততই সে অবাক হচ্ছে মিরিয়ামের আচার আচরণ জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা দীক্ষা রুচি প্রকৃতি দেখে।

সেদিন ছিল জুম্মাবার। নুর বললো, চল, আজ আমরা মসজিদে গিয়ে নামাজ করবো।

মিরিয়াম খুশিতে নেচে ওঠে। এই প্রথম সে মসজিদ দেখবে।

এদিকে কনস্টানটাইন সম্রাট খবর পেলেন তাঁর প্রাণাধিক কন্যাকে মুসলমানরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদল পাঠালেন।

—যেখান থেকে পার, যেমন করে পার আমার মিরিয়ামকে উদ্ধার করে আনা চাই-ই।

কিন্তু যারা সন্ধানে গেল একদিন তারা শূন্য হাতেই ফিরে এল সম্রাটের কাছে।

—নাঃ, কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না, মহামান্য সম্রাট।

সম্রাটের গুপ্তচর বাহিনীর বড়কর্তা বললো, আমি গোপনে গোপনে তলাশ করার ব্যবস্থা করছি। লোক-জানাজানি হয়ে গেলে শয়তানরা তাকে লুকিয়ে রাখবে।

চৌকস সেয়ানা অথচ খুব ছোট্ট বেঁটে খাটো একটি বৃদ্ধা তার বুদ্ধি এবং কৌশলের জন্য গুপ্তচর-বাহিনীর প্রধানের খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। বড়সাহেব তাকেই নির্বাচন করলো মিরিয়ামকে খুঁজে বের করার কাজে। ঠিক করা হলো এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুপ্তচরটিকে মুসলমান মুলুকে পাঠানো হবে।

সম্রাট তাকে বললেন, যদি তুমি কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসতে পার, মেয়ে, তবে আমি তোমাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেব। কিন্তু যদি না পার, তবে তোমাকে সাপের ইঁদারায় ফেলে দেওয়া হবে, মনে থাকে যেন।

বুড়ি মাথা নুইয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, তাই হবে মহামান্য সম্রাট, আপনার কন্যা রাজকুমারী মিরিয়ামকে যদি আমি ফিরিয়ে আনতে না পারি, তাতে যে সাজা আমাকে দেবেন, মাথা পেতে নেব।

বুড়িটা এক চোখে ফেটি বাঁধলো, পায়ে কাপড় জড়ালো। তারপর জনাকয়েক সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নানা দেশের নানা শহর বন্দর ঘুরতে ঘুরতে একদিন আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে হাজির হলো।

আলেকজান্দ্রিয়ার পম্পি মিনার বিশ্ববিখ্যাত। একদিকে এটা যেমন

মুসলমানদের তীর্থস্থান, আর একদিকে এর মনোহর পরিবেশ এবং মিনার-সৌধের অপরূপ কারুকলা দেশ-বিদেশের মুসাফিরদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

মিরিয়াম বিকাল বেলায় প্রায় প্রতিদিন এই পবিত্র পামপি মিনারের পাদদেশে এসে মুক্ত বায়ু সেবন করে। সেদিনও সে একা একাই বসে প্রকৃতির মনোরম শোভা প্রত্যক্ষ করে পুলকিত হচ্ছিল, এমন সময় সেই গুপ্তচর বুড়ি ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে মিরিয়মের দেখা পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

বুড়িটা কাছে এগিয়ে গিয়ে রাজকুমারীকে অভিবাদন জানিয়ে তার হাতে চুম্বন করে।

হঠাৎ এক অপরিচিত নারী খ্রীষ্ট-কেতায় তাকে অভিবাদন এবং চুম্বন করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মিরিয়াম।

—কে তুমি ম্লেচ্ছ, শয়তান, কুত্তার বাচ্চা। জান না, এ আমাদের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে তোমাকে কে ঢুকতে দিয়েছে? বেরিয়ে যাও বলছি।

বুড়িটা কিন্তু রাগ করে না। আরও বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, আপনি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না রাজকুমারী! আপনার পিতা আপনার অদর্শনে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। আপনার মাতা কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী। এ অবস্থায় আপনি যদি আপনার পিতার কাছে ফিরে না যান, হয়তো ঈশ্বর জানেন, কী ঘটবে।

মিরিয়াম ঝংকার দিয়ে ওঠে, যা ঘটে ঘটুক, আমি যাবো না। এখন এই আমার দেশ, এই আমার স্বজন-ভূমি। আমি ইসলামে দীক্ষা নিয়েছি। এখন আমার একমাত্র বিশ্বাস ইসলামই সত্য, আর সব মিথ্যা। আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি না আমরা। তুমি ফিরে যাও। সম্রাটকে গিয়ে বল, আমি খুব সুখে আছি। এবং ইসলামে দীক্ষা নিয়েছি। খ্রীষ্ট-সাম্রাজ্যে আর ফিরে যাবো না।

—কিন্তু ফিরে যে আপনাকে যেতেই হবে, রাজকুমারী। খালি হাতে ফিরে যেতে পারবো না আমি। ওয়াদা আছে, আপনাকে নিয়ে তবে দেশে ফিরতে পারবো। তা না হলে আমাকে সাপের ছোবলে মরতে হবে। কিন্তু একবার যখন আপনার সন্ধান পেয়েছি—কেন আর প্রাণটা খোয়াবো। আপনাকে না নিয়ে আমি ফিরবো না। এখনও মিনতি করছি, আমার কথা শুনুন, দেশে ফিরে চলুন।

মিরিয়াম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ওরে কুত্তার বাচ্চা, আমার সামনে থেকে যাবি কিনা বল, না হলে এখুনি চিৎকার করে লোক জড়ো করবো। কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মিরিয়াম চিৎকার করতে যাবে, এমন সময় বুড়ির ইশারায় তার সাংগ-পাংগরা এসে তাকে ঘিরে ধরে। খবরদার, একটুও শব্দ করবে না। তা হলে এই যে দেখছো ঝকঝকে ছুরি, একেবারে আমূল বসিয়ে দেব বুকে।

হঠাৎ এসবের জন্য প্রস্তুত ছিল না মিরিয়াম। হতচকিত হয়ে পড়ে সে।

সেই ফাঁকে সাঙ্গ-পাঙ্গরা মিরিয়ামের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে হন হন গতিতে বন্দরের দিকে ছুটে চলে।

জাহাজ প্রস্তুত ছিল। মিরিয়ামকে তোলামাত্র নোঙর তুলে ছেড়ে দিল কাপ্তান। জাহাজ ভেসে চললো কনসতানতাইন-এর দিকে।

নুর সরাইখানায় মিরিয়ামের ফেরার পথ চেয়ে বসেছিল। প্রতিদিন বিকেলে সে বেড়াতে যায় পমপি মিনারে। এবং ফিরে আসে সন্ধ্যার আগেই। কিন্তু আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? অন্ধকার নেমে এলে তো পমপিতে কাউকে থাকতে দেয় না? তবে?

মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে সে সরাইখানা ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। একে ওকে জিজ্ঞেস করে। একজন বলে, জনাকয়েক লোক একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে জাহাজঘাটের দিকে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

অজানা আশঙ্কায় নুর-এর বুক কেঁপে ওঠে। ছুটতে ছুটতে বন্দরে আসে। খবর পায় একটা খ্রীষ্টান জাহাজ এইমাত্র ছেড়ে চলে গেল। কতকগুলো লোক একটা মেয়েছেলেকে জোর-জবরদস্তি করে জাহাজে তুলেই ছেড়ে দিয়েছে। কেন, কী হয়েছে?

নুর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, বিধর্মী ম্লেচ্ছরা আমার বিবিকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

—ওই মেয়েটি তোমার বিবি?

—জী হ্যাঁ। জাহাজটা কোথায় যাবে বলেছে কিছু?

—না। তবে জাহাজের নিশান পতাকা দেখে তো আমার চিনতে কোনও অসুবিধে হয় না—ওটা কনসতানতাইনের জাহাজ।

—সর্বনাশ। ওরা তবে নির্ঘাৎ আমার বিবিকে নিয়েই পালিয়েছে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে নুর। লোকটি বলে, আহা কেঁদ না, বাছা! আমি তোমার বিবিকে উদ্ধার করে দেব। ঐ দেখছো, দাঁড়িয়ে আছে আমার জাহাজ—ওই জাহাজের কাপ্তান আমি। আমার সঙ্গে একশোজন সাচ্চা মুসলমান কর্মচারী আছে। ইসলাম বিপন্ন, সুতরাং আর তো মুখ বুজে সহ্য করা যায় না। চল, আমার জাহাজে ওঠ। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ধাওয়া করবো ওদের। ব্যাটারা পালাবে কোথায়? ধরবোই!

কাপ্তান তার একশোজন দাঁড়ি-মাল্লাদের বললো, খুব জোরসে চালাবে। সামনের ঐ কুত্তার বাচ্চাদের ধরতেই হবে।

নুরকে নিয়ে সে জাহাজ ছেড়ে দিল। কিন্তু দিনের পর দিন তাড়া করে চলার পরও কনসতানতাইন-সম্রাটের জাহাজখানা আর কিছুতেই ধরতে পারে না। নুর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। কাপ্তান ওকে ভরসা দেয়, ঘাবড়াবার কিছু নাই। সমুদ্রে না পারি ডাঙ্গাতেও ধরবো। আমরা একশোজন আছি। সাচ্চা মুসলমানের সন্তান। আমাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না কাফেররা।

একান্ন দিন পরে জাহাজ ভিড়লো কনসতানতাইনের বন্দরে। কিন্তু তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের সৈন্যবাহিনী ঘিরে ফেললো ওদের। নুরসহ বন্দী

হলো সবাই।

সম্রাট ওদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

এই ঘটনার আগের দিন মিরিয়ামকে এনে সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছে সেই গুপ্তচর।

মেয়েকে ফিরে পেয়ে সম্রাটের সে কি আনন্দ! সারা প্রাসাদ, সারা শহর আলোর মালায় সাজানো হয়েছিল। শহরের পথে পথে বসানো হয়েছিল বিজয়-তোরণ। আজ দেশবাসীর মহা আনন্দের দিন। অনেক দিন পরে সম্রাট প্রাণ খুলে হেসেছেন। তাই প্রজারাও বিশেষ পুলকিত।

মহারাণী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তোকে ঐ যবনরা কিছু করেনি তো।

মায়ের কথায় মিরিয়াম হাসে, তুমি কী যেন বল মা। মুসলমানরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কী শুধু মুখ দেখার জন্য? তুমি কী জান না, ইসলামে কোনও পরিণত-বয়স্কা নারী কুমারী থাকে না। মাসিক-ধর্ম শুরু হওয়ার পর মুসলমান মেয়েরা কুমারী থাকলে পাপ হয়। সুতরাং আমি ইসলামে দীক্ষা নেবার পর কী করে কুমারী থাকতে পারি, বল?

মা কেঁদে আকুল হয়, ও কী কথা বলছিস খুকী, আমরা তো খ্রীষ্টান।

—তোমরা তো নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান মা। যতদিন তোমাদের কাছে ছিলাম, আমি খ্রীষ্টানই ছিলাম। কিন্তু এখন আমি মুসলমান।

মহারাণী শিউরে ওঠেন, চুপ কর মা, ওকথা বলতে নাই। কেউ শুনতে পেলে কেলেঙ্কারী হবে।

কিন্তু মা, গোপন করতে চাইলেও এত বড় সত্যি কথাটা গোপন রইলো না। সারা শহর, দেশের প্রজাদের কানে কানে রটে গেল। সম্রাট-নন্দিনীকে মুসলমানরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশ করে দিয়েছে। যবনরা রাজকুমারীকে জোর করে মুসলমান-ধর্মের কলমা পড়িয়ে সহবাস সঙ্গম করেছে।

কথাটা সম্রাটও শুনলেন। মন্ত্রী যুক্তি দিল, আপনি বড় গীর্জার পাদরী-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করুন, ধর্মাবতার। তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই বিধান বলে দিতে পারবেন।

পাদরী-মাতা সব শুনে বললেন, হুঁ, বিধর্মীরা রাজকুমারীর সতীত্ব অপহরণ করেছে। ঠিক আছে, আমি ওকে পুনরায় খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দেব। তবে একটি কাজ করতে হবে?

সম্রাট করজোড়ে বললেন, আজ্ঞা করুন মাতা।

—দীক্ষার পূর্বে কন্যা মিরিয়ামকে একশোটি মুসলমানের রক্তে স্নান করিয়ে ওর সব অতীত পাপ ধুয়ে ফেলতে হবে।

সম্রাট বললো, সদ্য শতাধিক যবন বন্দী হয়েছে আমার সেনা-বাহিনীর হাতে। তারা আমার কারাগারেই আছে। আপনি আজ্ঞা করলে আজই আমি শত-যবনের রক্ত সংগ্রহ করতে পারি।

পাদরী-মাতার ইচ্ছায় এবং সম্রাটের আদেশে নুর-সহ জাহাজের একশো খালাসী কর্মচারীদের হাজির করা হলো। সম্রাটের পাশে বসেছিলেন বৃদ্ধা পাদরী-মাতা। ঘাতক সকল বন্দীদের সারি বন্দী করে দাঁড় করালো। হাতে শাণিত তলোয়ার। সম্রাটের সামনে একটা হাড়িকাঠ। তার নিচে পাতা ছিল একটা বিরাট গামলা। তিনি হুকুম দেওয়া মাত্র ঘাতক এক এক জনকে ধরে এনে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে এক এক কোপে সাবাড় করতে থাকলো। এইভাবে গামলাটা রক্তে পূর্ণ হতে থাকে। এক এক করে একশোটা নরবলি সংঘটিত হওয়ার পর একশো একতম কয়েদী নুরকে এনে দাঁড় করানো হয় হাড়ি কাঠের সামনে।

পাদরীমাতা সম্রাটকে বললো, সম্রাট, একশোটি যবনের রক্ত ধরা হয়ে গেছে। রাজকুমারীর শুদ্ধি-স্নানের জন্য এই রক্তই যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নাই। এই যুবকটিকে আমি আমার গীর্জার প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত করতে চাই।

সম্রাট বললেন, তাই তো, আমি অতটা খেয়াল করিনি। ঠিক আছে, আপনার যদি অভিরুচি হয় তবে নিয়ে যান ওকে। আমার কোনও আপত্তি নাই।

রাজকুমারীকে নতুন করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার পর পাদরী-মাতা প্রিয়দর্শন নুরকে সঙ্গে নিয়ে গীর্জায় ফিরে আসে।

নুর বুঝতে পারে না। কেনই বা তাকে হাড়িকাঠে হত্যা করা হলো না, কেনই বা তাকে মুসলমান জেনেও, গীর্জায় নিয়ে আসা হলো।

পাদরী-মাতা বললো, শোন যুবক, তোমার রূপ-যৌবন এবং ভাগ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নুর বলে, আমার রূপ আছে—অনেকেই বলে। যৌবন যে আছে তা আমিও অনুভব করতে পারি। কিন্তু ভাগ্য ? আমি যে ভাগ্যবান—সে কথা আমার অতি বড় আপনজনও বলবে না। কিন্তু আপনি আপনাকে ভাগ্যবান দেখলেন কী ভাবে ? সত্যিই যদি আমার সৌভাগ্য হবে, তবে কী আজ আমার চোখের মণি, বুকের কলিজাকে হারাতে হয় ? এবং তারই সন্ধানে এসে সম্রাটের রোষানলে পড়ে অন্ধকার কারায় পচে পচে মরতে হয় ?

পাদরী-মাতা বলে, জানি না কে তোমার চোখের মণি, বুকের কলিজা এবং কী করেই বা তাকে হারিয়েছ, তাও আমার অজানা। কিন্তু তুমি যে সম্রাটের কারাগারে একশো একতম মুসলমান বন্দী হতে পেরেছ সেই জন্যেই বলছি, তুমি পরম ভাগ্যবান। তা না হলে এতক্ষণে তোমার কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি যেত।

নুর বুঝতে পারে না। বলে, কারণ ?

—কারণ, সম্রাট-নন্দিনীকে মুসলমানরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে এখন উদ্ধার করে আনা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা তার ধর্ম এবং সতীত্ব দুইই কেড়ে নিয়েছিল। তাই আবার নতুন করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য আমি তাকে শত যবনের রক্তে স্নান করিয়ে পবিত্র হতে বিধান দিয়েছিলাম। সেই জন্যেই আজ একশোটি মুসলমানকে কেটে তাদের রক্ত

সংগ্রহ করা হলো। আমি আশ্চর্য হলাম। তুমি ঐ একশোজনের একজন হলে না। তাই আমার মনে হলো, তুমি পরম ভাগ্যবান। তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। এখন বলতো বেটা, তুমি কে! আর কেনই বা সম্রাটের কয়েদখানায় তুমি বন্দী হয়েছো? তোমাকে দেখে তো মনে হয় না, কোনও অপরাধ তুমি করতে পার?

নূর বলে, আপনি মহামান্যা মাতা, আমার সব দুঃখের কাহিনী বলতে কোনও বাধা নাই। সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়মকে তার স্ব ইচ্ছায় আমি শাদী করেছি। সে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তার ওপর কোনও বল-প্রয়োগ করা হয়নি, বিশ্বাস করুন। সে নিজে থেকেই মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সম্রাটের গুপ্তচর আমার বিবিকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে এখানে, তাকে উদ্ধার করতেই আমি এখানে এসে সম্রাটের সেনার হাতে বন্দী হয়েছি। এখন বলুন আমার অপরাধটা কোথায়? মিরিয়মকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। সে ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে চাই না। তাই আজ যদি ঘাতকের ঘায়ে মারা যেতাম, সেই বুঝি আমার ভালো হতো।

নূরের গাল বেয়ে দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

পাদরী-মাতা বিচলিত হয়ে পড়েন।

—আমি বুঝতে পারি, তোমার কী মর্মবেদনা। ভালোবাসা কোনও জাতি ধর্ম মানে না। মিরিয়াম যে তোমাকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল, সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। তাকে যে জোর করে ইসলামে দীক্ষা দাওনি, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, আজ রাতে মিরিয়াম গীর্জায় বাতি জ্বালাতে আসবে। সে-সময় তার সঙ্গে আমি তোমার দেখা করিয়ে দেব। দেখ, যদি এখনও সে তোমার প্রতি আসক্ত থাকে তবে আমি আর তাকে জোর করে এখানে আটকে রাখার পক্ষপাতী নই। নদীকে সহজ ভাবেই তার স্রোতে বয়ে যেতে দিতে হয়।

পাদরী-মাতা বলে, শোন তোমাকে আমি এখানে এনেছি গীর্জার পহরী করবো বলে। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য তা নয়। আমি তোমাকে পাদরীর বেশবাস এনে দিচ্ছি। তুমি এই মুসলমানী পোশাক ছেড়ে ফেলে ওগুলো পরে নাও। তাতে তোমার সুবিধে হবে।

সন্ধ্যাবেলায় মিরিয়াম আসে। গীর্জার বেদীতে মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে যেতে পা বাড়ায়। পথরোধ করে দাঁড়ায় নূর। সামান্য এক পাদরীর দুঃসাহস দেখে অবাক হয় মিরিয়াম। ক্রোধান্বিত হয়ে সে পাদরীর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে। অনেক কটু কথা বলবে ভেবেছিল, কিন্তু সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কিছুই বলতে পারে না। শুধু বলে, পথ ছাড়ুন।

নূর হাসে। মিরিয়াম অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এই হাসি তো তার চেনা। তা কী করে হয়? পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয় সে। নূর হাত বাড়ায়, পথ যখন রুখে দাঁড়িয়েছি, যেতে যদি হয়ই দলে যাও—পাশ কাটিয়ে যেও না

মিরিয়াম ?

—সে কি নূর, তুমি—?

মুহূর্তে বিশ্ব-সংসার সব তালগোল পাকিয়ে যায়। তারপর আর কিছুই মনে থাকে না। যখন সম্বিত ফিরে পায়, দেখে, নূরের কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

পাদরী-মাতা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব প্রত্যক্ষ করছিল। এবার কাছে এসে বললো, আমি সব বুঝতে পারলাম, নূর। তুমি এক বর্ণও বাড়িয়ে বলনি। এ অবস্থায় মিরিয়ামকে যদি জোর করে খৃষ্টান বানিয়ে আটকে রাখা হয়, যীশু আমাদের ক্ষমা করবেন না। তাই ঠিক করেছি, আমি তোমাদের সাহায্য করবো। মিরিয়ামকে সংগে নিয়ে তুমি আজই রাতে এদেশ থেকে পালিয়ে যাও। না হলে হয়তো সবই হারাতে হবে।

মিরিয়াম বলে, কিন্তু সম্রাটের এই কড়া পাহারা ভেদ করে নূর আমাকে নিয়ে পালাবে কী করে ?

পাদরী-মাতা বলে, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব। আমার এক ভক্ত অনুচর সম্রাটের নৌবাহিনীর একজন কাপ্তান। আমি তাকে বলে রাখছি, কাল খুব ভোরে তোমরা বন্দরে যাবে। কাপ্তান তার জাহাজে তোমাদের তুলে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে দেবে। কিন্তু খেয়াল রেখো, সে নিজে থেকেই তোমাদের নাম ধরে ডাকবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তিনতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পাদরী-মাতাকে অভিবাদন জানিয়ে মিরিয়াম প্রাসাদে চলে যায়। নূর রয়ে যায় গীর্জাতেই। পাদরী-মাতা তাকে পাথেয় হিসাবে কিছু খাবারদাবার এবং প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা এনে দেয়। বলে, এগুলো সংগে রাখ, অনেক দিনের পথ। প্রয়োজন হবে। এই ঘরেই তুমি শোবে। খুব ভোরে তোমাকে আমি ডেকে ফটকের বাইরে বের করে দেব।

গীর্জার সদর ফটক থেকে জাহাজঘাটা খুবই কাছে। পাদরী-মাতা নূরকে ফটক পার করে দেয়। নূর বন্দরে এসে দেখে, একখানা ছোট্ট জাহাজ ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজের পাটাতনে দশজন খালাসী এবং কাপ্তান। মনে হয় নূরেরই প্রতীক্ষা করছিল তারা। কাছে যেতেই কাপ্তান জিজ্ঞেস করে তোমার নাম ?

—আমার নাম নূর।

—উঠে এস।

খালাসীদের হুকুম দিল কাপ্তান, নোঙর তোল।

খালাসীরা অনেকেই বিস্ময়াহত। এ জাহাজে স্বয়ং মন্ত্রীর যাবার কথা

ছিল। কিন্তু এতো এক পাদরী, দেখছি।

কাপ্তান গর্জে ওঠে, জাহাজের কাপ্তান তোমরা, না আমি?

একজন সামনে এসে প্রতিবাদ জানাতে যায়, কিন্তু আপনিই বলেছিলেন, জাহাজ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হও, এখুনি মন্ত্রীমহাশয় আসছেন। তিনি মিশরের উদ্দেশে রওনা হবেন। আমাদের রাজকুমারীকে যেসব মুসলমান দস্যুরা অপহরণ করেছিল—তাদের মোকাবিলা করতে যাবেন তিনি।

কাপ্তান তরবারি উন্মুক্ত করে বলে, জাহাজের শৃঙ্খলাভঙ্গ করার অপরাধে এই তোমার সাজা।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই খালাসীটার মুণ্ডু পাটাতনে লুটিয়ে পড়ে। এতে বাকী নয়জন ক্রুদ্ধ হয়ে কাপ্তানকে ঘায়েল করার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু কাপ্তানের তরবারি এক এক কোপে এক এক জন পাটাতনশায়ী হয়ে পড়ে।

এর পর সে নিজেই নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দেয়। হাওয়ার গতি ছিল পালের অনুকূলে। ক্ষুদে জাহাজখানা তরতর করে বয়ে চলতে থাকে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে।

নূর তখন থর থর করে কাঁপছিল। একসঙ্গে এতগুলো খালাসীকে কেটে ফেলেও কিন্তু কাপ্তান সাহেবের মুখে কোনও উত্তেজনা অস্থিরতা নাই। ব্যাপারটা যেন কিছুই না—এই রকম ভাবখানা।

নূর ভয়ে ভয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না। কী জানি লোকটার কী মতলব! হয়তো মাঝ দরিয়ায় ছুঁড়েই ফেলে দেবে তাকে। কিংবা ঐ তলোয়ারের এক ঘায়ে—না না, সে কথা ভাবতে পারে না নূর, ভাবতে চায় না।

তবে সে একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কাপ্তানের কোনও সৎ উদ্দেশ্য নাই। তা না হলে, সে রাজকুমারী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই জাহাজখানা ছেড়ে দিল কেন? সম্রাটের গুপ্তচর নয় তো? মিরিয়ামের সঙ্গে যখন তার যে গোপন পরামর্শ হয়—জাহাজঘাটায় যাবে খুব ভোরে, ওখানে জাহাজ প্রস্তুত থাকবে—সে কথা কী সম্রাটের কানে পৌঁছে দিয়েছিল কেউ? হতে পারে। হয়তো ঐ বুড়ি পাদরী-মাতারই এই কারসাজী!

—এই যে পাদরী সাহেব, অমন মন-মরা হয়ে বসে বসে কী ভাবছো ওখানে? এদিকে আমার কাছে এস। একটু গল্প সল্প করি।

কাপ্তানের গলায় যেন কেমন ব্যঙ্গের সুর। নূর ঢোক গিলে বলে, না; মানে এমনিই পানির শোভা দেখছি।

—সে তো এখানে বসেও দেখতে পারবে পাদরী সাহেব। এস, এখানে এস।

নূর আর না করতে পারে না। কে জানে হয়তো এখুনি হুট করে রেগে উঠে গলাটা কুচ করে নামিয়ে দেবে।

নূর ওর কাছে গিয়ে বসে। কাপ্তান বলে, আমরা কোথায় যাচ্ছি জানো?

—না। তবে যাওয়ার কথা ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। এখন আপনার মর্জি

—যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যেতে হবে।

—কেন, তোমার মনে কোনও সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—না, মানে—রাজকুমারী মিরিয়ামের আসার কথা ছিল। সে কথা কি আপনি জানতেন না?

—কেন জানবো না? তার হুকুমেই তো তোমাকে নিয়ে চলেছি।

নূর বলে, কিন্তু তার আসা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করলেন না? এ জাহাজে আমার সঙ্গে তারও তো যাওয়ার কথা ছিল।

কাপ্তান চোখ পাকিয়ে ওঠে, কথা ছিল? রাজকন্যাকে চুরি করে পালাবে ভেবেছিলে? জান, তুমি কোথায়, আর কার সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে এইসব ষড়যন্ত্র এঁটেছিলে? সম্রাটের লাজুক কন্যাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মতলব করেছিলে?

—মোটেও না। আমি কাউকে ভাগাবার জন্য কোনও ফন্দী ফিকির করিনি। রাজকুমারী মিরিয়াম আমার শাদী করা বিবি। সম্রাটই ছল করে আমার বিবিকে চুরি করে এনেছে। আমি তাকে উদ্ধার করতে এসেছিলাম।

কাপ্তান বলে, কিন্তু রাজকুমারী তো তার ভুল বুঝতে পেরে আবার খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।

—মিথ্যে কথা। জোর করে তাকে খ্রীষ্টান করা হয়েছে। আমি জানি, ওতে কেউ খ্রীষ্টান হয় না। কারণ পয়গম্বর যীশু বলেছেন, কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খ্রীষ্টান করা পাপ।

কাপ্তান বলে, তা হলে এখন কী করবে? রাজকুমারী তো ধোঁকা দিয়ে তোমাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে।

নূর বললো, আমি মিরিয়াম ছাড়া জীবন ধারণ করবো না। আপনার পায়ে পড়ি, কাপ্তান সাহেব, আলেকজান্দ্রিয়ায় আমি একা ফিরে যাবো না। আপনি আমাকে কনসতানতাইনের বন্দরেই ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। সেখানে আমি সম্রাটের বন্দী হয়েই প্রাণ হারাতে চাই। তবু মিরিয়াম-বিহীন জীবন আমি রাখবো না।

কাপ্তান হাসে, সামান্য একটা ম্লেচ্ছ নারীর জন্য তুমি প্রাণ দেবে? তুমি না সাচ্চা মুসলমানের সন্তান?

নূর প্রতিবাদ করে, মিরিয়াম সামান্যা নারী নয়। এবং সে বিধর্মীও নয়, কাপ্তান সাহেব। সে আমার সহধর্মিণী। দোহাই আপনার, জাহাজ ফেরান। আমাকে কনসতানতাইনে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। না হলে, এই দরিয়ার পানিতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেব।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে নূর। সে আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে। সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তান ওকে ধরে ফেলে। জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে।

কিন্তু এ কি! নূর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলে কাপ্তানের মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে। কাপ্তান খিল খিল করে হেসে ওঠে। কী আশ্চর্য, হঠাৎ কাপ্তানের গলার আওয়াজ মধুর হয়ে গানের মতো বেজে ওঠে।

—মিরিয়াম তুমি ?

কাপ্তান নকল দাড়ি গোঁফ টেনে খুলে ফেলে দেয়। মাথার পাগড়ী নামিয়ে রাখে।

সেই মিরিয়াম—তার চোখের মণি বুকের কলিজা। খিল খিল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে সে। নূরের গালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে বলে, খুব যাতনা দিয়েছি, না, সোনা ?

নূর-এর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে, তামাশারও একটা সীমা থাকা দরকার, মিরিয়াম। তুমি কী জান না, আমার মনের অবস্থা কী। আমি যদি এই দরিয়াতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতী হতাম—

—আমি হতে দিলে তো ?

এবারে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে নূরের অধরে দীর্ঘ চুম্বন করে মিরিয়াম।

নূর জিজ্ঞেস করে, কিন্তু পাদরী-মাতা তো আমাকে বলেছিলেন, তাঁর এক শিষ্য কাপ্তান একখানা ছোট জাহাজ নিয়ে বন্দরে অপেক্ষা করবে ? তুমি কী করে এলে এই বেশে।

মিরিয়াম বলে, এ সবই পাদরী-মাতার দৌলতেই সম্ভব হয়েছে, নূর। তাকে আমার শতকোটি সালাম। তিনি সাহায্য না করলে আমার বাবার শ্যেন দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে এভাবে পালানো একেবারেই সম্ভব ছিল না।

বাবাকে বলে তিনিই আমাকে গত রাতে গীর্জায় নিয়ে এসেছিলেন। প্রভু যীশুর কাছে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারা রাত ধরে আমাকে দীপ জ্বালাতে এবং উপাসনা করতে হবে—এই রকম বলে তিনি আমাকে প্রাসাদ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

মিরিয়াম বলতে থাকে ঃ এই জাহাজের আসল কাপ্তান সত্যিই পাদরী-মাতার একান্ত অনুরক্ত শিষ্য। এখন সে ঐ গীর্জারই একটা ঘরে আত্মগোপন করে আছে। আমাকে তার সাজ-পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন মাতা। এবং এই যে গোঁফ দাড়ি দেখছো—এও তিনি লাগিয়ে দিয়েছিলেন আমার মুখে। এমন নিখুঁতভাবে ছদ্মবেশে সাজিয়ে দিয়েছিলেন যে, খালাসীরা দেখে নকল কাপ্তান বলে চিনতে পারেনি কেউ। তুমি ভাবছো, এমন অসি-বিদ্যা এবং জাহাজ চালাবার কৌশল আমি শিখলাম কোথায় ? আমাদের রাজবংশের নিয়ম, প্রত্যেক সম্রাট-সন্তান—তা সে পুত্রই হোক, বা কন্যাই হোক, প্রত্যেককে যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ হতে হবে। আমাদের সমুদ্র সন্নিহিত সাম্রাজ্য ; সেই কারণে নৌ-বিদ্যাতেও দক্ষ হতে হয়। এজন্য খুব ছোট থেকে আমার ভাইদের সঙ্গে আমিও যুদ্ধবিদ্যা শিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভাগ্যে বাধ্য হয়েছিলাম—তা না হলে আজ কী করে তোমাকে ফিরে পেতাম, বল ?

নূর মিরিয়ামের বুকে মাথা গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো পাঁচতম রজনী :
আবার সে বলতে শুরু করে :

মিরিয়াম বললো, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অপার করুণায় আমরা আবার মিলিত হতে পেরেছি, নূর। আর কেউ আমাদের ছাড়াছাড়ি করতে পারবে না।

সমুদ্র যাত্রা দীর্ঘ একান্ন দিনের পথ। একটি ছোট্ট জাহাজের পাটাতনে গা এলিয়ে শুয়ে বসে মধুর ভাবে দিবস-রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। ওপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, আর নিচে নীল জলধি। তার ওপর দিয়ে হাওয়ার টানে ভেসে চলেছে ছোট জাহাজখানা। নূর আর মিরিয়াম ছাড়া সে দুনিয়ায় তৃতীয় কোনও প্রাণী নাই। দিনের বেলায় বিবস্ত্র হয়ে দুজনে জাহাজের পাটাতনে পাশাপাশি শুয়ে রৌদ্র-স্নাত হয়। আর রাত্রি বেলায় শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুজনে দুজনের বুকের ওমে উত্তাপ আহরণ করে।

নাচ গান আদর সোহাগ চুম্বন এবং সহবাসে প্রতিটি মুহূর্ত মধুরতর হতে থাকে।

এইভাবে একদিন ওরা আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে এসে জাহাজ ভেড়াতে পারে। নূর বলে, তুমি যে তীরে নামবে, কিন্তু বোরখা কোথায় ?

মিরিয়াম বলে, তাই তো, বোরখা না পরে নামবোই বা কী করে ?

নূর বললো, ঠিক আছে, এখন তোমাকে নামতে হবে না। তুমি জাহাজেই অপেক্ষা কর। আমি বাজার থেকে তোমার জন্যে বোরখা আর নাগরা চটি কিনে নিয়ে আসি।

মিরিয়াম বলে, কিন্তু বেশি দেরি ক'রো না, সোনা। আমার একা একা থাকতে আর মন চায় না।

নূর আদর করে ছোট্ট একটা চুমু এঁকে দেয় মিরিয়ামের গালে, আর ভয় কী! আমি যাবো আর আসবো। তুমি একটুখানি একা একা থাক।

নূর নেমে বাজারের উদ্দেশ্যে চলে যায়।

এদিকে কনসতানতাইন সম্রাটের প্রাসাদে হৈ হৈ ওঠে। গতকাল রাতে মিরিয়াম গীর্জায় উপাসনা করতে গেছে, সকালেই তার ফেরার কথা, কিন্তু সকাল গড়িয়ে যায়, এখনও মিরিয়াম ফিরে আসেনি।

গীর্জায় লোক পাঠালেন সম্রাট। কিন্তু পাদরী-মাতা বললো, সে তো অনেক সকালে—খুব ভোরেই ফিরে গেছে।

সম্রাট চিন্তিত হয়ে চারিদিকে চর পাঠালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল : রাজকুমারী নূরকে নিয়ে একখানা জাহাজে উঠে পালিয়েছে।

সম্রাট তার সেনাপতিদের ডেকে বললেন, যাও, এক্ষুনি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ধাওয়া কর ওদের। জীবিত অথবা মৃত মিরিয়ামকে আমি ফেরত চাই।

তৎক্ষণাৎ রণতরী ছুটে চললো সমুদ্রের বুক চিরে। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে আসার আগে পর্যন্ত কোনও জাহাজের সন্ধান করতে পারলো না।

সম্রাটের রণতরীর কাপ্তান আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে ঢুকতেই দেখতে পেল,

তাদেরই ছোট একখানা জাহাজ বন্দরে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে।

পলকের মধ্যে ওরা মিরিয়ামকে জাহাজে তুলে নিয়ে আবার কনসতানতাইনের অভিমুখে যাত্রা করলো।

সম্রাট ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে মিরিয়ামকে বললেন, এর শাস্তি কী জান? কেন পালিয়েছিলে? ভেবেছিলে, পালিয়ে তুমি আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে? তোমার মতো নষ্ট-চরিত্রা ব্যভিচারিণীর স্থান নাই আমার প্রাসাদে। মৃত্যুই একমাত্র তোমার সাজা। এবং সেই শাস্তিই আমি তোমাকে দেব।

মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজই একে প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিন। আর আমাদের প্রজাদের জানিয়ে দিন, সম্রাটের আদেশে তার প্রাণাধিক কন্যার ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। যারা স্বচক্ষে দেখতে চায়, দেখে, যাক।

সম্রাটের এই মন্ত্রী অশীতিপর বিরূপ দর্শন এক বৃদ্ধ। তার গায়ের চামড়া লোল, চোখ কোটরে বসে গেছে, মাথা-ভরা টাক। একটাও দাঁত নাই। নাকটা ব্যাঙের মতো। প্রথম দর্শনে যে কেউ শিউরে উঠবে।

এই মন্ত্রীমহোদয় বললো, মহামান্য সম্রাট, আমার একটি নিবেদন আছে।

—বলুন।

সম্রাট মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। মন্ত্রী বললো, রাজকুমারীকে আপনি ফাঁসি দেবেন না। বরং তার চেয়েও কঠিন সাজা দিন ওকে।

—মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে বড় সাজা আর কী হতে পারে, মন্ত্রিবর?

—হতে পারে। আপনি ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। আমার মতো এক কদাকার কুৎসিত লোলচর্ম বৃদ্ধকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিতে হবে—এই যন্ত্রণা মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও ভয়াবহ। ফাঁসির দড়িতে লটকে দিলে ওর এক পলকের জন্য কষ্ট হবে মাত্র। তারপর সব শেষ। কিন্তু এতে সে তিল তিল করে দগ্ধ হয়ে মরবে। আমার মনে হয় রাজকুমারী সম্রাটের আনুগত্য উপেক্ষা এবং খ্রীষ্টধর্মের অমর্যাদা করে যে পাপের ভাগী হয়েছে, এই হবে তার যোগ্যতম দণ্ড।

সম্রাট বললেন, উত্তম। তাই হোক, আপনি ওকে বিয়ে করুন। আপনি একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান। এই ভ্রষ্টা ব্যভিচারিণীকে নিয়ে আপনি কী করবেন? তা ছাড়া ওকে চোখে চোখে আগলে রাখা কী আপনার পক্ষে সম্ভব হবে? যে মেয়ে একবার বাঁধন ছিঁড়েছে, তাকে শিকলে বেঁধে রাখলেও আটকে রাখা যায় না।

মন্ত্রিবর বলে, সেজন্য আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, মহামান্য সম্রাট। আমার স্ত্রীকে কী করে বশে রাখতে হয়, সে ওষুধ আমার জানা আছে।

সম্রাট বলেন, কিন্তু কাজটা খুব সহজ-সাধ্য হবে না, মন্ত্রীমশাই। যাই হোক, আপনার কথায় আমি আজ ওকে ফাঁসিতে ঝুলালাম না। বিশ্বাস করে আপনার হেপাজতে দিচ্ছি। কিন্তু যে কারণেই হোক, বা যে ভাবেই হোক, ছলচাতুরী করে সে যদি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যায়, তবে এর সমুচিত শাস্তি আপনাকে মাথা পেতে নিতে হবে। তখন আপনি মন্ত্রী বলে আমি আপনাকে

রেয়াত করবো না। এই শর্তে যদি রাজী থাকেন, তবেই ওকে বিয়ে করতে পারেন। নচেৎ বিরত হোন।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বলে, আমি মহামান্য সম্রাটের সতর্কবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছি। আপনি আশঙ্কা করবেন না। আমি এমন কিছু অপরাধ করবো না যাতে প্রাণটা খোয়া যায় আমার।

সারা প্রাসাদে ও শহরে মহা ধুম পড়ে গেল। রাজকুমারীর বিয়ে হবে। খানাপিনা দান-ধ্যান-এর জন্য প্রাসাদ দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। দেশ-বিদেশ থেকে গণ্যমান্য রাজা মহারাজা নানারকম উপহার উপঢৌকন পাঠাতে লাগলো।

এবং এক শুভক্ষণ দেখে গীর্জার পাদরী-মাতা বিয়ের শপথ বাক্য পাঠ করালো বৃদ্ধ উজিরকে।

এদিকে নূর বোরখা আর এক জোড়া চটি কিনে নিয়ে বন্দরে এসে দেখে মিরিয়াম নাই। কপাল বুক চাপড়াতে থাকলো সে। তার কান্নায় ছুটে এল আশে পাশের লোকজন। সকলেই নূরের দুঃখে সমবেদনা জানাতে থাকলো। কেউ বলে, বিবিকে এইভাবে একা ফেলে কেউ বাজারে যায়! কী দরকার ছিল বাপু, ছেড়ে যাবার?

নূর বলে, উপায় ছিল না। জাহাজে আমরা দুজনে ছিলাম। বোরখার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এখন এই বন্দরে বোরখা ছাড়া মেয়েছেলে নামে কী করে?

নূর যে সরাইখানায় থাকে সেই সরাইখানারই এক বৃদ্ধ শেখ নূরের কাছে এসে কাঁধে হাত রাখলো, চোখের জল ফেলে আর কী করবে, বেটা। বিধর্মীদের কাণ্ডই ঐ রকম। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, চল এখন সরাইখানায় ফিরে যাই।

রোরুদ্যমান নূরকে প্রায় জোর করেই সে সরাইখানায় নিয়ে আসে। ওকে পাশে বসিয়ে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, দেখ বাবা, নারী শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু। ভালোবাসাই বল, আর প্রেম মহব্বতই বল, ওগুলো মেয়েদের কাছে কিছু নয়। ওরা রূপ-যৌবনের যাদুকরী—দেহ এবং কাম সর্বস্ব। সুতরাং শোক ক'রো না। আজ তোমার মনে হচ্ছে, কনসতানতাইন সম্রাটের কন্যা ছাড়া তুমি প্রাণে বাঁচবে না। কিন্তু দুদিন সবুর কর, দেখবে সব সয়ে গেছে। তখন দেখবে, এই ফুল লতা পাতা পাখী—সব আবার ভাল লাগছে। তখন দেখবে, তুমি আবার কথায় মুখর হয়েছ, হাসছ গাইছ। তখন দেখবে, অন্য আর এক রূপসী নারী তোমার মন কেড়ে নিচ্ছে। এই-ই হয়—এই-ই নিয়ম। সুতরাং শোক ক'রো না। শান্ত হও।

নূর কিন্তু সে কথায় আদৌ সান্ত্বনা পায় না। বলে, না, চাচা, আমি আমার বিবি মিরিয়াম ছাড়া এ জীবন রাখবো না। ওকে আমি চাই-ই।

শেখ বলে, কিন্তু কনসতানতাইনের বিক্রম এবং ইসলাম-বিদ্বেষ কী তোমার জানা নাই, বাবা। ঐ ম্লেচ্ছ বিধর্মী খ্রীস্টান সম্রাটের সারা মুলুকে একটাও

তুমি মুসলমান খুঁজে পাবে? না, নাই—সারা দেশে একটা মুসলমান সে রাখেনি। অথচ ছিল—হাজার হাজার ইসলামে বিশ্বাসী মুসলমানের বাস ছিল তার সাম্রাজ্যে। সম্রাট তাদের সবাইকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টান হতে হুকুম করেছিল। কিন্তু একটা মুসলমান তার হুমকীতে মাথা নত করেনি। এবং এই কারণে—ঐ বিধর্মী ম্লেচ্ছটা আমাদের প্রতিটি ভাইবোনদের শূলে চাপিয়ে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, কারণে অকারণে কতবার সে ইসলাম রাষ্ট্রগুলোর ওপর সৈন্যদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবং লুঠতরাজ হত্যা করে আবার সরে পড়েছে।

নূর বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু এবারে তো আমরা মুসলমানরাই তার কন্যাকে অপহরণ করে বাঁদী-হাটে বেচে দিয়েছিলাম, চাচা।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন, তা-হতে পারে। এবং সে যে খুব একটা অপরাধ, তাও আমি মনে করি না বাবা। খোঁজ নিয়ে দেখ, যারা সম্রাট-নন্দিনীকে অপহরণ করে বাঁদী-বাজারে বেচে দিয়েছিল, তাদের কী সর্বনাশ করে গেছে সম্রাটের সেনারা? নিশ্চয়ই কোনও সাংঘাতিক ক্ষতি অনিষ্ট তাদের হয়েছে। না হলে শুধু শুধু তারা রাজকুমারীকে হরণ করতো না। খোঁজ নিলে হয়তো শুনবে, সম্রাটের নৃশংস অত্যাচারে তাদের বিবি বাচ্চারা নিহত হয়েছে—অথবা সৈন্যরা মজা দেখার জন্য গভীর রাতে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

বৃদ্ধের এই রক্ত-নাচানো বক্তৃতা শুনতে হাজারো লোক জড়ো হয় সেখানে।

শেখ আবার বলতে থাকেঃ যা বলছিলাম, তুমি সামান্য এক মুসলমান সন্তান। সম্রাটের সৈন্যবল অসীম। এবং তার হিংস্রতা-নিষ্ঠুরতারও তুলনা নাই। সে ক্ষেত্রে তোমার বিবিকে কীভাবে তুমি উদ্ধার করে আনবে, বাবা। একবার তো একশো জনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে। সবাইকে হাড়িকাঠে ফেলে সে কোতল করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়ে আওয়াজ ওঠে, আল্লাহ হো আকবর। আমরা ওকে ভয় খাই না। ইসলাম যেখানে বিপন্ন আমরা জানকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। চল, নওজোয়ান, আমরা তোমার সঙ্গে যাবো।

প্রায় শ'খানেক মুসলমান রাজি হয়ে গেল। তখনই একখানা জাহাজ ঠিক করে নূরকে সঙ্গে নিয়ে চেপে বসলো তারা।

একটানা একান্ন দিন পরে জাহাজ এসে ভিড়লো কনসতানতাইনের বন্দরে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই নূর-রা সকলেই বন্দী হলো সম্রাটের সেনাবাহিনীর হাতে।

প্রাসাদের সামনে সবাইকে সারবন্দী করে দাঁড় করানো হলো। সম্রাট হুকুম দিলেন, শূলে চড়াও।

এক এক করে সবাইকে শূলে গেঁথে হত্যা করা হলো। সব শেষে আনা হলো নূরকে। সম্রাট দেখে বিস্মিত হলেন, এ কি! এই যুবককে সেবার তো আমি পাদরী-মাতার অনুরোধে রেহাই দিয়ে গীর্জার প্রহরী করে পাঠিয়েছিলাম। সেখান থেকে পালিয়ে আবার আমারই জালে ধরা পড়েছে। যীশুর কী অপার মহিমা। ঠিক আছে, এবার একে দু' দুবার শূলে গেঁথে বধ করতে হবে।

এই সময় সেই বৃদ্ধ উজির বললো, মহামান্য সম্রাট, আমার প্রাসাদের দ্বার-রক্ষীর জন্য তিনজন যবনকে নিযুক্ত করবো বলে আমি পণ করেছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে তিনটি যবনকে আমার হাতে দিন।

সম্রাট বললেন, আপনার প্রতিজ্ঞা আমি কী করে জানবো, মন্ত্রীমশাই। আগে যদি বলতেন তিন কেন, তিরিশটা দিতে পারতাম। কিন্তু এখন তো সব খতম হয়ে গেছে। বাকী রয়েছে মাত্র এই একটি, তা যদি চান, এটিকে নিয়ে যেতে পারেন।

নুরকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী তার নিজের প্রাসাদে আসে। তার ধারণা তিনটি যবনের রক্ত দিয়ে দরজার চৌকাঠ ধুয়ে দিলে আর কোন অশুভ শক্তি ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। যাই হোক, তিনটিকে যখন একসঙ্গে সংগ্রহ করা গেল না, তখন বাকী দুটির জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। আবার নিশ্চয়ই মুসলমানরা সম্রাট-সেনার হাতে বন্দী হবে। তখন আর দুটি চেয়ে নিয়ে একসঙ্গে তিনটিকে বলি দিতে হবে। ততদিন এইটিকে জিইয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু কোথায় রাখা যায় এই ম্লেচ্ছ অপবিত্র জীবটিকে। প্রাসাদের কোন কক্ষে রাখলে সে কক্ষ অপবিত্র হবে।

ভেবে ভেবে সে স্থির করলো, ঘোড়ার আস্তাবলে ওকে হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে ফেলে রাখবে।

সম্রাটের একটি আস্তাবলে দুটি জগৎ বিখ্যাত আরবী, ঘোড়া ছিল। একটির নাম সাবিক, আর একটির নাম লাহিক। সাবিকের গায়ের রঙ পায়রার মতো সাদা, আর লাহিক ঘোরতর কৃষ্ণ বর্ণের। তাবৎ মুসলমান এবং খ্রীস্টান মুলুকে এই সাবিক-লাহিকের দারুণ প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ে ওদের সমকক্ষ দুরন্ত দুর্বার এবং নানা যুদ্ধ-কৌশলে ওস্তাদ ঘোড়া আর একটিও ছিল না কোনও দেশে।

নুরকে সঙ্গে নিয়ে আস্তাবলে আসে উজির। বলে, আপাততঃ এইখানেই তোমাকে থাকতে হবে। যতদিন না তোমার মতো আর দুই বিধর্মী যবনকে সংগ্রহ করতে পারি, ততদিন এই আস্তাবল তোমার বেহেস্ত। এখানে বসে ঈশ্বরের উপাসনা কর। তারপর যথাসময়ে তিনজনকে এক সঙ্গে বলি দিয়ে তোমাদের পাপ মুক্ত করবো।

উজির ভেবেছিল, আতঙ্কে আঁৎকে উঠবে সে। কিন্তু একি! ছেলেটা মিটি-মিটি হাসছে।

অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কী, আমার কথার মানে বুঝতে পারনি? তোমাদের কোতল করা হবে—যথাসময়ে!

—জী হ্যাঁ, তা খুব বুঝেছি!

—তবে হাসছো কেন?

নুর বলে, আপনার আস্তাবলের হেকিম বেচারী কিছুই জানে না। না হলে, এই রকম সেরা তাজি ঘোড়াটার চোখে পিচুটি পড়েছে, দেখছেন সে সারাতে পারছে না? চোখটা তো কানা হয়ে যাবে।

উজির শিউরে ওঠে, বল কী ? কানা হয়ে যাবে ? তামাম দুনিয়ায় এ ঘোড়ার জুড়ি নাই, জান ?

—জানবো না কেন, সেইজন্যেই তো বলছি, ভাল করে চিকিৎসা করান, তা না হলে পস্তাবেন। এমন অমূল্য জানোয়ার পয়সা ছড়ালেও তো জোগাড় করতে পারবেন না।

উজির বলে হেকিমটাকে তো আমি রোজই ধমকাচ্ছি। কিন্তু সে বলে, কালই সেরে যাবে। কিন্তু, তুমি ঠিকই বলেছ, আসলে ও রোগই ধরতে পারেনি। ওর কোনও দাওয়াই-ই কাজে লাগছে না।

এ রোগের দাওয়াই সবাই জানে না। আমি সারিয়ে দিতে পারি আপনার ঘোড়ার অসুখ। কিন্তু তার বদলে আপনি আমাকে কী দেবেন ?

উজির আশান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে, পার তুমি সারাতে ? তুমি কী হেকিম ?

তারপর বলে, যদি সারাতে পার, সম্রাটের সমস্ত আস্তাবলের বড়কর্তা করে দেব তোমাকে। আর দেব যেখানে খুশি চলা-ফেরার অবাধস্বাধীনতা।

—আমি রাজি। আপনি এক কাজ করুন মন্ত্রীমশাই। আমাকে খানিকটা রসুন, চুন, মোম এবং বাছুরের যকৃত এনে দিন। আমি ওষুধ বানিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি, কালই সেরে যাবে অসুখ। তার আগে আমার হাতে পায়ের কড়াগুলো খুলে মুক্ত করে দিন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো সাততম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন সকালে উজির এসে বললো, কই চোখের বাঁধনটা খোল, দেখি তোমার ওষুধে কী কাজ হয়েছে ?

নুর খুলে দেখালো। ঘোড়াটার চোখ হরিণের মত ডাঁসা এবং স্বচ্ছ হয়ে গেছে। পিচুটির লেশ মাত্র নাই।

মন্ত্রী তারিফ করে নুরের পিঠ চাপড়ায়, বাঃ বহুত, ধন্বন্তরী হেকিম তো তুমি। শিখলে কোথায় ?

আসলে নুর হেকিমীর কিছুই জানে না। ওদের বাড়িতে একটা ঘোড়ার একবার এই অসুখ হয়েছিল। তখন পাড়ার এক হাতুড়ে এই ওষুধটা বানিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিল এবং একদিনেই সেরে গিয়েছিল ঘোড়াটার চোখ। ওষুধটা কী ভাবে, কী কী দিয়ে বানিয়ে দিয়েছিল সে, নুরের পরিষ্কার মনে ছিল সব। এছাড়া অন্য কোনও কেরামতি তার নাই। নুর বললো, জী, আমি তো এই বিদ্যাই শিখেছি।

উজির খুব খুশি হয়। বলে, আজ থেকে সব আস্তাবলের কর্তা নিযুক্ত করা হলো তোমাকে। তোমার হুকুমে সব সহিসরা ওঠা বসা করবে। যখন খুশি, যে-কোনও জানোয়ারকে পরীক্ষা করতে পারবে, দাওয়াই দিতে পারবে। কোনও জানোয়ারকে বাইরে নিয়ে যেতে হলে তোমার ছাড়পত্র লাগবে।

এ ছাড়া যে-কোনও জানোয়ার নিয়ে তুমি যত্র তত্র অবাধভাবে চলা-ফেরা করতে পারবে।

মিরিয়াম উজিরের ঘরে বন্দীদশায় দিন কাটায়। দিন রাত সে চোখের জল ফেলতে থাকে। বুড়ো উজিরটা নানাভাবে ওর মনোরঞ্জন করতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু মিরিয়াম তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

এই সময় এক দরদী সহচরী মিরিয়ামকে জানালো, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে একখানা জাহাজে করে শ'খানেক মুসলমান এসে নেমেছিল বন্দরে। সম্রাট তাদের একজনকে বাদে সবাইকে শূলে দিয়েছে।

মিরিয়াম শিউরে ওঠে, বলিস কী?

বাঁদীটা বলে, হ্যাঁ মালকিন, নুর নামে এক খুবসুরত নওজোয়ান শুধু রেহাই পেয়েছে।

মিরিয়াম মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে, তুই ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ মালকিন, সেই নুর সাহেব তো এখন সম্রাটের আস্তাবলের বড় সাহেব হয়েছেন?

—তুই তাকে দেখেছিস?

—দেখবো না কেন? কী সুন্দর দেখতে, মালকিন—যেন রাজপুত্তুর।

মিরিয়াম বলে, আমার একটা কাজ করতে পারবি?

—কেন পারবো না?

—তাকে একবার এই জানলার ধারে বাগানে নিয়ে আসতে পারবি?

বাঁদীটা বলে, এ আর এমন শক্ত কী? আমি এখুনি খবর দিচ্ছি তাকে।

মিরিয়াম ওর হাত চেপে ধরে, কিন্তু সাবধান, কেউ যেন টের না পায়?

মেয়েটি বলে, বুঝতে পেরেছি মালকিন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ জানতে পারবে না।

পরদিন সকালে মিরিয়াম জানলার ধারে বসে বাগানের দিকে তাকিয়েছিল। এই সময় নুর এসে এ-গাছ ও-গাছ থেকে দু একটা ফুল তোলার অছিলায় জানলার দিকে তাকায়।

মিরিয়াম-এর সারা শরীরে শিহরণ খেলে যায়। তাড়াতাড়ি সে কাগজ কলম নিয়ে একটা চিরকুট লেখে ঃ

সোনা, তোমার আশাতেই দিন গুণছি। আজ সন্ধ্যায় শহরের শেষ প্রান্তের সুলতান ফটকের সামনে দুটো ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা ক'রো। বাঁদী হাজির হবে —মিরিয়াম।

একখানা রেশমী রুমালের খুঁটে বেঁধে বাগিচার ভেতরে ছুঁড়ে দেয় মিরিয়াম। নুর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে রুমালখানা তুলে নিয়ে চলে যায়। একটু পরে আবার ফিরে এসে ইশারা করে জানিয়ে যায় —ঠিক আছে।

বিকেল বেলায় সহিসদের ডেকে বলে সাবিক আর লাহিকের পিঠে জিন লাগাম চাপিয়ে বাইরে বের কর।

অনেক দিন বাদে সাবিক লাহিককে বাইরে বের করে জিন লাগাম পরানো হচ্ছে দেখে উজির নূরকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কী তোমার জানোয়াররা কেমন আছে? আজ যে বড় সাজগোজ দেখছি। কোথাও যাওয়া হবে নাকি।

নূর বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, অনেক দিন এরা বাইরে বেরোয় না। এভাবে একটানা আস্তাবলে বন্দী করে রাখলে পায়ে বাত ধরে যাবে। তাই ঠিক, করেছি আজ থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ওদের একটু দৌড় ঝাঁপ করাবো। তাতে শরীর ঠিক থাকবে।

উজির বলে, বাঃ চমৎকার, তাই তো দিনের পর দিন ওদের একভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলে জরা চেপে বসবে। আমাদের আগের হেকিমটার মাথায় গোবর-পোকা ছিল। ব্যাটাচ্ছেলে সারাদিন শুধু ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতো। এতগুলো জানোয়ার, কেউ মরলো কি বাঁচলো—খোঁজই রাখতো না সে।

উজির চলে গেল। নূর ঘোড়ার পিঠে চাপলো না। ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো সুলতান-ফটকের দিকে।

সন্ধ্যা হতে না হতে উজির এসে মিরিয়ামের পাশে বসে। অনেক মিঠে মিঠে বাত শোনায়। আদর সোহাগ করতে যায়। অন্যদিন মিরিয়াম কোনও পাত্তা দেয় না। কিন্তু সেদিন সে নিজে থেকেই বুড়োটার গা ঘেঁষে বসে। ন্যাকিস্বরে অনেক আব্দারের কথা বলে। বুড়ো বিগলিত হয়ে যায়।

মিরিয়াম বলে, আজ দুপুরে ভাল করে খানা খেতে পারিনি। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। খেতে দিতে বল না, গো?

উজির বলে, খিদে পেয়েছে, তা এতক্ষণ বলনি কেন? এ্যাই—কে আছিস—খানা সাজিয়ে দে।

অন্যদিন উজির তাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও খাওয়াতে পারে না, কিন্তু আজ সে খাবার টেবিলে নিজেই প্রধান ভূমিকা নেয়।

—আহা, ঐ পায়রার দো-পিঁয়াজিটা তুমি একদম খেলে না। ওটা এই বয়সে একটু বেশি করে খাওয়া দরকার। ওতে বীর্য বাড়ে। নাও, আর একটা টুকরো খেয়ে নাও। গায়ে তাগদ বাড়াতে হবে না?

একটুকরো পায়রার মাংস দু' আঙুলে ধরে আলতো করে বুড়োর মুখে গুঁজে দেয় মিরিয়াম।

মিরিয়াম যে তাকে আপন করে নিতে পেরেছে এই ভেবে উজির আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

তা হলে কাল থেকে পায়রার মাংস বেশি করে দিতে বলবো, কী বল? ওটা খেলে শরীর খুব গরম হয়, না?

মিরিয়াম বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে হবে তো? এক দিনেই এক বাটি খেলে হজম করতে পারবে না।

—তা যা বলেছো। ধীরে ধীরে যৌবনকে ফেরাতে হবে। তা—তুমি যখন আমার হৃদয়ের রাণী হয়ে এসেছ—তোমার ছোঁয়াতেই যৌবন আমার ফিরে আসবে।

—থাক। অত আর মন ভুলিয়ে কথা বলতে হবে না। এমনিতেই আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকবো চিরকাল। নাও, এই বাচ্চা মুরগীর এই সুরুয়াটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতো! এটাও তোমাকে নিয়ম করে ওষুধের মতো খেতে হবে, বুঝলে? মেয়েমানুষের মান রাখতে গেলে এই সুরুয়াই কিন্তু আসল দাওয়াই। দু' বেলা দু' বাটি যদি খাও, দেহে মনে ফুর্তি জাগবে। শরীর চন মন করে উঠবে।

এই সব বক্তৃতার ফাঁকে কায়দা করে এক ডেলা মরোক্কোর আফিঙ মিশিয়ে দিল সে মুরগীর ঝোলে। বাটিটা বুড়োর মুখে তুলে ধরে বলে, নাও এক চুমুকে খেয়ে ফেল। আজ প্রথম তোমার সংগে আমার লড়াই হবে। দেখবো তোমার বুড়ো হাড়ে কেমন ভেল্কি দেখাতে পার?

বুড়ো দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, আমি আর পারছি না মিরিয়াম। আজ সাতদিন আমাদের শাদী হয়েছে, এই সাতদিনের মধ্যে একটা দিনের তরে আমার আদর সোহাগ পাওনি তুমি।

মিরিয়াম বলে, আহা, কী যে বল, পুরোনো ঘা-টা শুকোতে সময় লাগবে না? আজ তো আমি পুরো সেরে উঠেছি। দেখো, আজ কত আদর সোহাগ খাবো তোমার। আচ্ছা এখন চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতো সুরুয়াটা। তারপর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো। শাদী আমাদের যেদিনই হোক, আজই তো হবে প্রথম বাসর রাত্রি—কী বল?

উজির ঝোলটা চুমুক দিয়ে খেয়ে শুধু বলতে পারে, তা যা বলেছো—

ব্যস, এর পরই সে ঢলে পড়ে গালিচায়।

আগে থেকেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছিল মিরিয়াম। দুটো থলেয় ভরে নিয়েছিল উজিরের সঞ্চিত সব মূল্যবান ধনরত্নগুলো। থলে দুটো আর একখানা শাণিত তলোয়ার বেঁধে নিল সে কোমরে। তারপর একখানা মোটা কাপড়ের কালো বোরখা দিয়ে ঢেকে নিল সারা শরীর। জানলার চৌকাঠে রশি বেঁধে নিচে ঝুলে পড়লো মিরিয়াম। তারপর অতি সহজ স্বাভাবিক অথচ দ্রুতগতিতে হেঁটে চললো সুলতানী ফটকের দিকে।

নূর ঘোড়া দুটো সংগে নিয়ে মিরিয়ামেরই প্রতীক্ষা করছিল। মিরিয়াম এসে লাফিয়ে উঠে বসে লাহিকের পিঠে। বলে, জলদি ওঠ সাবিকের পিঠে। জোর কদমে আমার পিছনে পিছনে ছুটে এস। আমি ছুটলাম।

তীরবেগে দুই ঘোড়া ছুটে চলে গ্রাম গঞ্জ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে,সারারাত ধরে। সকাল বেলা ওরা প্রায় হাজার যোজন পথ পার হয়ে শস্য-শ্যামল প্রান্তর সীমায় এক স্রোতস্বিনী নদীর কিনারে এসে থামে।

মিরিয়াম আর নূর নেমে পড়ে। ঘোড়া দুটোকে মাঠে চরতে ছেড়ে দেয়। নিজেরা নদীতে নেমে হাত মুখ ধুয়ে রুজু করে নামাজ সারে। গাছের ফল পেড়ে আনে নূর। দুজনে তৃপ্তি করে খায়। তারপর নদীর জল পান করে নদীর ধারে ঘাসের শয্যায় গা এলিয়ে দেয়।

—বাব্বা, সারাটা রাত কী দুরন্ত বেগে ছুটেছি।

নূর জিজ্ঞেস করে, আমরা কতদূর এসেছি মিরিয়াম ?

—অনেক দূর। আমার বাবার সাম্রাজ্যর একেবারে শেষপ্রান্তে বলতে পার। এখন আর ওরা আমাদের পাত্তা করতে পারবে না। সারারাত ঘুমটুম তো হয়নি। এস, একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার চলবো।

অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। দুজনেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল গড়িয়ে দুপুর আসে। দুপুরও বিকেল হতে চায়। কিন্তু ওদের আর ঘুম ভাঙ্গে না।

হঠাৎ হাজার হাজার অশ্বক্ষুর ধ্বনিতে চমকে উঠে বসে মিরিয়াম। নূরকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে, এই—শিগ্গির উঠে বসে।

—ও কীসের শব্দ, মিরিয়াম ? চারদিক এমন ধুলোর ঝড়ের মতো আঁধার হয়ে আসছে কেন ?

—চুপ। সম্রাটের সেনারা ধাওয়া করে আসছে এইদিকে।

নূর আতঙ্কিত হয়ে বলে, তা হলে উপায় ? ওরা তো সংখ্যায় অনেক মনে হচ্ছে।

মিরিয়াম গম্ভীর হয়ে বলে, হুঁ, হাজার দশেক হবে ?

—দশ হাজার ? তা হলে কী হবে, মিরিয়াম ?

—তুমি পিছনে সরে থাক। আমি একাই লড়বো। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা কোনও পাপ করিনি, নূর। হার হবে না।

নূর শঙ্কিত হয়ে বলে, তা বলে তুমি ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একা কী করে লড়বে, মিরিয়াম।

—ধৈর্য ধর নূর। দেখ আমি কী করি।

সকালে যখন যথাসময়ে উজির দরবারে এল না, সম্রাট খোঁজ করতে পাঠালেন তাঁর প্রাসাদে। অবিলম্বে দূত এসে জানালো, উজির অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। রাজকুমারী ঘরে নাই।

সম্রাট ক্ষিপ্ত সিংহের মতো ছুটে এলেন উজিরের প্রাসাদে। উজিরটা তখন গালিচার ওপরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। সম্রাট গর্জে উঠলেন, এই কুত্তার বাচ্চা, মিরিয়াম কোথায় ?

উজিরের একখানা হাত ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকানি দিলেন তিনি, কিন্তু কোনও সাড়া নাই। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, কয়েকটা গরাদ ভাঙ্গা। একখানা দড়ি নেমে গেছে নিচে। বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই দড়ি বেয়েই সে নেমে গেছে। আস্তাবলের সহিসরা এসে খবর দিল ; কাল সন্ধ্যায় নূর সাহেব সাবিক আর লাহিককে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

এবার তিনি নিশ্চিত হলেন, ঐ ছোকরাটার সঙ্গেই সে পালিয়েছে। সম্রাটের মাথায় খুন চেপে গেল, তরবারীর এক কোপে উজিরের ধড় মুণ্ডু আলাদা করে দিলেন তিনি।

তারপর সেনাপতিদের তিনজনকে ডেকে এনে হুকুম করলেন। আর এক তিল দেরি নয়, তোমাদের তিনজনের পুরো বাহিনী নিয়ে সুলতান-ফটক দিয়ে বেরিয়ে পড়। বায়ুবেগে ছুটে চলতে হবে। যে ভাবেই হোক, মিরিয়ামকে জ্যান্ত অথবা মৃত অবস্থায় আমার চাই-ই।

তৎক্ষণাৎ তিন সেনাপতির নয় হাজার অশ্বারোহীর তিনটি বিশাল সৈন্য-বাহিনী আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নগর প্রান্তর ধূলি ও ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করে উল্কার বেগে ছুটে চললো। সম্রাট স্বয়ং প্রধান সেনাপতি হয়ে তাদের পুরো-ভাগে ছুটতে থাকলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো নয়তম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

লাফিয়ে উঠে লাহিকের পিঠে চেপে বসে মিরিয়াম। নূরকে বলে, সাবিকে চেপে তুমি অনেকটা পিছনে সরে থাকো। আমি সম্মুখ সমরে লড়বো।

এই বলে সম্রাটের ধাবমান বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে ঘোড়া ছুটালো।

দূর থেকে সম্রাটের দেখতে ভুল হলো না, উদ্যত তরবারি হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে মরিয়াম। সম্রাট ভাবলেন, মেয়েটা কী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। তা না হলে আত্মসমর্পণ না করে একি তার স্পর্ধা! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। সম্রাট তার সেনাপতিদের হুকুম দিলেন, সৈন্যবাহিনীর গতি স্তব্ধ কর। আমি একাই যাবো তার সামনে।

কন্যার মুখোমুখি এসে তিনি গর্জে ওঠেন, তোমার কী মাথার বিকৃতি ঘটেছে মিরিয়াম। খ্রীষ্টান সম্রাটের এই বিশাল বাহিনীর সামনে তুমি তরবারি উঁচিয়ে ছুটে আসছো? এখন তোমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে—তা আমার কাছে করুণা ভিক্ষা করা। না হলে মৃত্যু তোমার অবধারিত। কেউ রোধ করতে পারবে না।

মিরিয়াম বলে, আমি পিছনের দিকে তাকাতে জানি না, বাবা। যা ঘটে সামনাসামনিই ঘটুক। আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন। এবং এও ঠিক, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এবং মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর। যদিও আমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তবুও আমি আমার ধর্ম এবং ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত হতে পারি না।

এই বলে সে ঘোড়ার লাগামে ঝাঁকি দিয়ে আরও কয়েক কদম সামনে এগিয়ে যায়। হাতের তলোয়ার রৌদ্রকিরণে ঝকমক করে ওঠে।

লাহিকের পাছায় আদর করে দুটি চাপড় মারে মিরিয়াম। এবং তৎক্ষণাৎ লাহিক চিঁহিঁহিঁ আওয়াজ তুলে তীরবেগে ছুটে যায় সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে। বাঁই বাঁই করে কয়েকবার ঘুরে আসে মিরিয়ামের তরবারী। এবং প্রায় জনা-কুড়ি অশ্বারোহী লুটিয়ে পড়ে যায় নিচে। এবং সঙ্গে সঙ্গে লাহিক কয়েক কদম পিছিয়ে আবার ছুটে যায় ডানদিকের অশ্ববাহিনীর

সামনে। মিরিয়ামের একটা মারও কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। ঝুপ ঝুপ করে সব খসে পড়ে যেতে থাকে।

সম্রাট আকাশ ফাটিয়ে ডাকলেন বারটাউট।

বারটাউট সম্রাটের সেনাপতিদের প্রধান। তার অসীম শৌর্য-বীর্যের নানা কাহিনী দেশ বিদেশের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তার অমিত বিক্রমে ও দুর্জয় দুঃসাহস সর্বজন-বিদিত।

বারটাউট একটি সুন্দর তেজি ঘোড়ায় চেপেছে আজ। তার সারা চোখে দীপ্ত বিজয়ের হাসি। সম্রাটের সামনে এসে সে অভিবাদন জানায়।—মহামান্য সম্রাট, বারটাউট হাজির, হুকুম করুন অধীশ্বর।

সম্রাট বললেন, বারটাউট, আজ এক ক্ষিপ্ত নারীর সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তোমার মতো দুর্জয় বীর সেনাপতির পক্ষে হয়তো এটা অসম্মানজনক। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই উম্মাদিনী আমার শতাধিক সৈন্য ধরাশায়ী করে ফেলেছে। এবং এও তো ঠিক, আমার প্রতিটি সৈন্য দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা এক একজন শত সৈন্যের প্রাণ সংহার করেছে। কিন্তু আজ একি হলো! ঐ একটি তরুণীর তরবারির সামনে তারা কেউ এক পলকও টিকে থাকতে পারলো না?

তাই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছি, বারটাউট। এইভাবে যদি আমার বুকের বল সৈন্যরা অসহায় পতঙ্গের মতো মৃত্যু বরণ করতে থাকে, তবে কি উপায় হবে? আমার মনে হয়, এখনি তাকে হত্যা করে আশংকা নির্মূল করা দরকার! কিন্তু তুমি সেনাপতি-প্রধান। তোমার নাম খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। এই সামান্য একটা বিদ্রোহিনীকে দমন করার জন্য তোমাকে ডাকতে আমার সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু এখন সমূহ বিপদকাল। এ সময় ওসব চিন্তার সময় নাই।

বারটাউট অভিবাদন জানিয়ে বললো, যথা আজ্ঞা সম্রাট। তারপর সে হুঙ্কার ছেড়ে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিরিয়ামের ওপর, মনে হলো আমাদের সকল বিশ্বাস, সকল অহংকার বুঝি সে নিমেষে ধূলিসাৎ করে দেবে। তার সেই বিকট আওয়াজে গগনমণ্ডল বিদারিত হয়ে যেতে থাকলো।

তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড অসিযুদ্ধ। একদিকে মিরিয়াম, অপর দিকে বারটাউট। যেন দুই সিংহে সিংহে লড়াই।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকলো সে যুদ্ধ। ক্ষণে ক্ষণে তরবারির আঘাতে আঘাতে আগুনের ফুলকি ছুটে বেরুতে লাগলো। কিন্তু কেউই কাউকে পরাস্ত করতে পারে না।

অবশেষে একসময় বারটাউটের হাতের ধমনী শিথিল হয়ে আসে, বুঝতে পারে ডানহাতে সে আর অসি ধরে রাখতে পারবে না। তাই হাত বদল করে বাঁ-হাতে নিয়ে নেয় অসিখানা। আর ডানহাত দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করে একখানা বর্শা। কিন্তু মিরিয়াম আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তরবারির আঘাতেই সে বর্শা মাটিতে ফেলে দেয়। বারটাউট চমকে ওঠে, সর্বনাশ তার বর্শার অব্যর্থ নিশানা এবং বিদ্যুতের গতিবেগ রোধ করবার সাধ্য তো কোনও যোদ্ধারই

নাই। কিন্তু একি হলো। আহত সিংহের মতো গর্জে উঠে আর একখানা বর্শা টেনে নেয় সে।—এইবার তোমার মৌৎ কে রক্ষা করবে? কিন্তু সে বর্শাও পাশে ফেলে দেয় মিরিয়াম। এইবার আরও একখানা। কিন্তু মিরিয়ামের বেগ পেতে হয় না। অনায়াসে তার চারখানা বর্শা মাটিতে ফেলে দিতে পারে সে।

বারটাউট উন্মত্ত হয়ে ওঠে। লজ্জায় তার চোখ মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। সামান্য এক নারীর সঙ্গে সে যুঝতে পারছে না? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা! আবার সে অসিখানা ডানহাতে ফিরিয়ে নেয়। এবং শত সিংহের বিক্রমে গর্জে ওঠে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই তরবারিই ছুঁড়ে দেয় মিরিয়ামের দিকে। বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসে তা মিরিয়ামের বুকের কাছে। সে অসির গতি যদি রোধ করতে না পারতো তবে এক পলকে মিরিয়ামের দেহ শত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়'তা চারপাশে। কিন্তু আল্লাহর অপার করুণায় সে গতিও রুদ্ধ হলো। মিরিয়ামের এক আঘাতে খান-খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেল বারটাউটের সেই বিজয়ী তরবারি।

এরপর মিরিয়াম ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে বারটাউটের চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড শক্তিতে আছাড় মেরে নিচে ফেলে দিয়ে বললো, এই তুমি বিশ্ব-বন্দিত যোদ্ধা—বীর? তরবারির মর্যাদা জান না? থু!

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো দশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

বারটাউট মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে একবার মিরিয়ামকে দেখে নেয়। ভাবে, এইবার বুঝি তার ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে গেঁথে দেব অসিখানা। কিন্তু মিরিয়াম হাসে, ভয় নাই তুমি নিরস্ত, তোমাকে আঘাত করবো না। কিন্তু একটা কথা, পালাবার চেষ্টা করো না। তার পরিণাম ভালো হবে না। শুনেছিলাম, তুমি নাকি দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা। কিন্তু এই কী মহারথী-প্রথা? বর্শার বদলাই একমাত্র বর্শা হতে পারে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে অসি ছুঁড়ে আঘাত করে কে? সে কী মহারথী, না মরকট?

বারটাউটের মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। তাই সে দিশাহারা হয়ে প্রাণ-ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করে। মিরিয়ামের চোখে আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে, কাপুরুষ—গিদধড়। এই তোমার যোগ্য পুরস্কার।

ঘোড়াকে এক কদমও সে আগে বাড়ায় না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে হাতের অসিখানা প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারে। লক্ষ্য অব্যর্থ। তরবারি-খানা চক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে বারটাউটের মুণ্ডুটা নামিয়ে দেয় মাটিতে।

চারদিকে ছিটিয়ে পড়েছিল অগণিত তরবারি। তারই একখানা তুলে নিয়ে মিরিয়াম এবার ছুটে যায় সম্রাটের খাস-বাহিনীর দিকে।

সম্রাট দেখলেন, তাঁর প্রধান সেনাপতির বুকের পাঁজর বারটাউট ধরাশায়ী হয়েছে। এবার তিনি দ্বিতীয় সেনাপতি বারতাসকে আহ্বান করলেন। বারতাস বারটাউটের ছোট ভাই, এরও শৌর্য-খ্যাতি অসীম। বীর যোদ্ধা হিসাবে তারও সমকক্ষ খুব বেশি কেউ নাই।

বারতাস এসে অভিবাদন জানাতে সম্রাট বললেন, তোমার দাদা তো প্রাণ হারালো, দেখছি আমার দারুণ দুঃসময়। ঐ নারীকে পরাস্ত না করতে পারলে তো মান থাকে না বারতাস। তুমি পারবে?

বারতাস বলে, পারা না পারা সে সম্মুখ সমরে ফয়সলা হবে, সম্রাট। কিন্তু তা বলে বারতাস কখনও লড়তে ভয় পায় না। আমি প্রস্তুত।

—তা হলে যাও। ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার দাদার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

বারতাস তলোয়ার বাগিয়ে রে রে করে ছুটে আসে মিরিয়ামের দিকে। কিন্তু মিরিয়াম অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বারতাসের প্রথম আঘাত-এর লক্ষ্য ছিল মিরিয়ামের শির। কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থ হয়। অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় পলকের মধ্যে সে আঘাত প্রতিহত করে মিরিয়াম। এর পর অসিতে অসিতে যুদ্ধ শুরু হয়। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুত চমকে চমকে ওঠে। আশ্চর্য, মিরিয়াম যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে তরবারির যাদু দেখাতে থাকে। বারতাস তাকে কাবু করার জন্য তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করে চলে। মাঝে মাঝে সিংহনিনাদ করে ওঠে সে, এইবার—এইবার তোর ইন্তেকাল এসে গেছে। ওরে বিধর্মী যবন, তোর আল্লাহর নাম জপ কর।

মিরিয়াম কোনও জবাব দেয় না। নির্বিকার চিত্তে তরবারির খেলায় মেতে ওঠে সে। বারতাস বুঝতে পারে, এ মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়। না হলে, তার অসির তান্ডবের সামনে এতক্ষণ টিকে থাকার সাধ্য কী করে হয় তার?

বারতাসের আরও কয়েকটা মোক্ষম মার যখন তাচ্ছিল্যভরে প্রতিহত করে মিরিয়াম, তখন সম্রাটের সেনাবাহিনীর বীর যোদ্ধারা উদগ্রীব হয়ে আরও কয়েক কদম এগিয়ে আসে। কে এই বীরাঙ্গনা, দেখার খুব কৌতূহল হয় তাদের। বুঝতে আর দেরি হয় না। শুধু বারতাস যথেষ্ট নয়। তাকে রুখতে গেলে গোটা সেনাবাহিনীর শক্তিই কাজে লাগাতে হবে।

বারতাস এবার বর্শা ছুঁড়ে মারে। তীক্ষ্ণ-তীর সমতার গতি। সে বেগ ও লক্ষ্য কাটাবার দক্ষতা একমাত্র মিরিয়ামেরই ছিল! ওরা তো কখনও কেউ জানতো না, এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে ত্রিভুবন বিজয়ের আশীর্বাদ লাভ করেছে সে তার গুরুর কাছ থেকে। আশৈশব আকৈশোরের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে যে সিদ্ধিলাভ সে করেছিল, আজ যুদ্ধক্ষেত্রে তারই মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করছে এরা সকলে।

বারতাস আর একখানা বর্শা নিক্ষেপ করে মিরিয়ামের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে। এখানা সে বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলে। এবং সেই হাত দিয়েই তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে মারে বারতাসের নাভিস্থল লক্ষ্য করে। অব্যর্থ আঘাত।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিশাল এক দানবের মতো বিকট চিৎকার তুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায় বারতাস। যেন একটা মিনারের শীর্ষদেশ ধ্বসে পড়লো ঊর্ধ্বাকাশ থেকে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো এগারতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মিরিয়াম এবার লাহিককে ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। দৃপ্তকণ্ঠে গর্জে ওঠে, কোথায় খ্রীস্টানের বীরপুরুষরা, এদিকে সামনে এগিয়ে এস, তোমাদের সুরতগুলো দেখি। কোথায় আমার বুড়ো-হাবড়া সাধের স্বামী—পিছনে লুকিয়ে রইলে কেন? একবার সামনে এসে দাঁড়াও। তোমরা কী সবাই সামান্যা এক দুর্বল নারীর ভয়ে ভীতা হয়ে পুচ্ছ গুটিয়ে পলায়নোদ্যোগ করছো? ছিঃ, ছিঃ, মরি, একি লজ্জা।

সম্রাট হাতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। তৃতীয় সেনাপতি তরুণ যোদ্ধা ফাসিয়ানকে আহ্বান করলেন তিনি।

—ফাসিয়ান, তুমিই শেষ ভরসা, তবে এও জানি, তোমার তরবারি দোর্দণ্ড। সবাই প্রাণভয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায় না। আমি আশা করবো, তোমার এই প্রদীপ্ত যৌবনের বিদ্যুৎ ঝলকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারবে ঐ উদ্ধত নারীর দুঃসাহস আর দম্ভ। যাও সিংহের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড় তার ওপর। আমি তার ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই তোমার তরবারির ডগায়।

ফাসিয়ান যথারীতি অভিবাদন করে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে মিরিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার সারা চোখে-মুখে প্রতিহিংসার আগুন ধকধক করছে। কিন্তু মিরিয়ামের অসির স্পষ্ট মার ঠেকাতে না পেরে লাগাম টেনে কয়েক কদম সে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তবে সে মুহূর্তমাত্র। ফাসিয়ান ছুটে এসে প্রচণ্ড এক আঘাত হানে মিরিয়ামের শির লক্ষ্য করে। ফাসিয়ানের সতীর্থরা ভাবে, এইবার বুঝি সব খতম হয়ে গেল। ফাসিয়ানের এ প্যাঁচ কাটিয়ে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা হবে না রাজকন্যার। কিন্তু না, ওদের ধারণা ভ্রান্ত। মিরিয়াম এমন তাক করে ফাসিয়ানের তরবারিতে আঘাত করলো যে ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এবার ফাসিয়ান ভয়ার্ত কণ্ঠে পিছনের যোদ্ধাদের ডাকে, তোমরা কে আছ, ছুটে এসে রক্ষা কর, হত্যা কর এই নারীকে। প্রাণভয়ে সে পালাবার চেষ্টা করতেই মিরিয়ামের তরবারি আমূল বিদ্ধ হয়ে যায় তার পিঠের ভিতরে। আর্তনাদ করে সে ছিটকে পড়ে যায়।

সিংহের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে মৃগদল যেমন প্রাণপণে ছুটে পালায় তাদের তিন মহারথীর এই বিস্ময়কর পতনে সমগ্র সৈন্যবাহিনী সেইভাবে ভীত চকিত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। সম্রাটের কোনও আবেদন, নিবেদন, আদেশ-নির্দেশ হুঙ্কার আর গ্রাহ্য করে না তারা। পলায়মান সমগ্র সৈন্যদলের মধ্যে পলকে ছড়িয়ে যায়, ওরে বাবা, পালাও। এ মেয়ে, মেয়ে নয়।

নিশ্চয়ই স্বর্গের দনুজদলনী কোন এক দেবী মূর্তি। সৈন্যদলের বিভাগীয় সহ-সেনাপতিরা দেশদ্রোহীতার ভয় দেখায়। স্থির হও, কেউ এক পা পিছু হটবে না। আমরা লড়বো। শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়বো। কিন্তু পিছু হটবো না। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করলে রাজদ্রোহের দন্ড পেতে হবে তাকে, সুতরাং সাবধান।

কিন্তু কেউ পরোয়া করে না জাঁদরেলদের এই সতর্কবাণী। যে যেদিকে পারে ছত্রখান হয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটা সম্ভব, তা-ই ঘটতে থাকে। জাঁদরেলদের সঙ্গে সাধারণ সৈনিকদের সম্মুখ সমর শুরু হয়ে যায়। নিজেরাই কাটাকাটি করে এক এক করে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

মিরিয়াম এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করলো। তরবারির এক এক কোপে এক একজন জাঁদরেলকে ভূপাতিত করতে থাকলো সে। কেউ-ই তার সামনে পলকের বেশি সময় টিকে থাকতে পারলো না। বিদ্রোহীরা, সৈন্যরা অনেকেই নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা অশ্ব ছুটিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু যারা মিরিয়ামকে প্রতিহত করার সাধ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তারা আর কেউ জীবিত রইল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই যুদ্ধে ইতি হয়ে গেল। বিশাল প্রান্তরের বুকে নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা আর রাত্রির কালো যবনিকা।

এইবার সে নদীর কিনারে ছুটে এসে নুরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন এঁকে দেয়।

—শুধু তোমার ভালবাসার জোরে আর আল্লাহর দোয়ায় আমি এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি, সোনা। আমার গুরুর আশীর্বাদ আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। তিনি আজ কোথায় জানি না, যেখানেই থাকুন, হাজার সেলাম জানাই তাঁর চরণে।

সে রাতে সেই নদী তীরের তৃণশয্যায় সুখ-সহবাস করলো দুজনে। এবং পরদিন সকালে উঠে দামাসকাসের পথে রওনা হয়ে গেল।

এদিকে পরাজিত সম্রাট ক্রোধানলে জ্বলতে জ্বলতে সিংহের থাবা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া নেকড়ের মতো গা ঢাকা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়েন। প্রাসাদে ফিরে এসে অমাত্য পারিষদ এবং গীর্জার পাদরী-পিতা-মাতাদের ডেকে এক সভা করলেন।

আমার কুলের কলঙ্কিনী কন্যা মিরিয়াম আমার তিন প্রধান স্তম্ভ বারটাউট, বারতাস এবং ফাসিয়ানকে হত্যা করেছে। এ বড়ই শোকের বিষয়।

সভায় সকলে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে মৌন হয়ে লোকান্তরিত সেনাপতিদের আত্মার শান্তি কামনা করে। তারপর সম্রাট আবার বলতে থাকেন। এরা তিন-জন ছিল আমার বুকের এক একখানা অস্থি। আজ আমি আর আপনাদের সেই প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট নই। সৈন্যবল আমার সীমিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও আমি কিছুতেই অনুধাবন করতে পারছি না, এ অলৌকিক কান্ড কী করে সংঘটিত করতে পারলো।

জাঁদরেল একজন দাঁড়িয়ে বললো, মহামান্য সম্রাট যদি অনুমতি করেন, আমি একটা কথা বলবো।

—বল, বল ?

রাজকুমারী মিরিয়াম ধর্মচ্যুত হয়ে সে অসুর শক্তির উপাসনা করে শয়তানের বর লাভ করেছে। সেই কারণেই আমরা তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারিনি।

গীর্জার পাদরীও সে কথায় সায় দিয়ে বলে, হুম্। তাই সত্য বলে মনে হয় আমাদের। কোনও অশুভ শক্তির সহায়তা ছাড়া এই দুঃসাহস কারো হতে পারে না। বিধর্মী ম্লেচ্ছ মুসলমানরা অনেক তুকতাক গুণগান জানে শুনেছি। এবং তার ফলে এমন সব যাদু বা ভেল্কি তারা দেখাতে পারে যা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু এ সবই ধ্বংসাত্মক। কোনও শুভ কাজে, সে-সব যাদুবিদ্যা কোনও সুফল দেয় না, বা পৃথিবীর মঙ্গলে আসে না।

আমরা খৃষ্টান। যীশু আমাদের সহায় আছেন। সুতরাং কোনও অশুভ শক্তিই আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না। আপনি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন সম্রাট। সময়ের সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকুন, দেখবেন জয় আপনার সুনিশ্চিত।

সম্রাট, মহামান্য প্রধান পাদরী-পিতার এই বাণী শিরোধার্য করে বলেন, কিন্তু পরম পিতা, আপনার বাক্য কী করে ফলবতী হতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না। কারণ এই যুদ্ধে আপনাকে এই মাত্র জানালাম আমার সৈন্যবল সীমিত হয়ে গেছে। আমি যে তিন বীর-যোদ্ধাকে আজ হারিয়েছি, কোনও মূল্যের বিনিময়েই তাদের সমকক্ষ অন্য কোনও যোদ্ধা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করে তাদের এখানে বন্দী করে আনতে পারবো, সে আশাও দুরাশা।

পাদরী-পিতা বললো, না। সে পথ নয়। যেখানে দেহবল কাজে আসে না, সেখানে প্রয়োজন বুদ্ধির কৌশল। ছলে বলে কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে আপনাকে।

—কী ছল, কি বল, কী কৌশল পিতা ?

—আপনি খলিফা হারুন অল রসিদের কাছে দূত পাঠান। শুনেছি, লোকটা নাকি ভণ্ড-তপস্বী। তবে যাই হোক, বাইরের ভড়ংটা ষোল আনা বজায় রেখে চলে সে। মুখে অন্ততঃ অনেক বড় বড় ভালো ভালো বুলি আওড়ায়—প্রজাদের ধোঁকা ধাপ্পা দিয়ে দিব্যি অনাচার ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই খলিফাটাকে টোপ দিতে হবে।

সম্রাট বলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না পিতা। টোপ মানে ? সে আরবের শাহেনশাহ, কোন ধন-দৌলতের লোভ দেখিয়ে তো তাকে ভোলানো যাবে না।

পাদরী সাহেব বলে, না ওসব নয়। ওসব তো আনুষঙ্গিক। উপহারে আছিলা করে কিছু পাঠাতেই হবে। কিন্তু আসল টোপ অন্য। আপনি ওকে একখানা চিঠিতে লিখে পাঠান, আপনার কন্যা উদ্ধত অবিনয়ী অবাধ্য হয়ে প্রাসাদ থেকে পালিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সে এখন মিশরে এক যুবকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত আছে। খলিফা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি যেন তাকে

কনসতানতাইনে পাঠিয়ে সখ্য-বন্ধন সুদৃঢ় করেন।

সম্রাট বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু খলিফা হারুন অল রসিদ কেন মাথা ঘামাতে যাবেন। তার সঙ্গে তো আমার আগের কোনও দোস্তি নাই।

পাদরী-পিতা বলে, আসল টোপটার কথাই বলছি। এর পর লিখে দিন, তিনি যদি আপনার এই উপকারটুকু করেন, তবে আপনি আপনার এই খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যে মুসলমানদের সুবিধার জন্য একটি সুবিশাল মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। এবং সে মসজিদটি তাঁরই পরিকল্পনা মতো তাঁরই নির্দিষ্ট স্থানে নির্মিত হবে।

সভাস্থ সকলে সাধু সাধু করে ওঠে। এ একেবারে মোক্ষম অস্ত্র। বিধর্মী খলিফা এক ঢিলেই কুপোকাত হয়ে যাবে। আর আমরাও বাজীমাত করে ফেলবো।

সম্রাট তখনই সে সভাস্থলে বসেই খলিফাকে এক পত্র লিখলেন।

মহামান্য ধর্মাবতার, সমগ্র আরব দুনিয়ার একচ্ছত্রাধিপতি আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ খলিফা হারুন অল রসিদ।

মহামান্যবরেষু—

অত্র পত্রে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার সঙ্গে সখ্য-বন্ধন আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ করতে আগ্রহী আমি। যদিও আপনি ইসলামের ধারক, তবু আপনার মহিমা ও সৎ গুণে আমি বিশেষ বিমুগ্ধ।

আমার কন্যা মিরিয়াম, আমার ভাগ্যদোষে, আজ অবাধ্য অবিনয়ী উদ্ধত এবং ব্যভিচারিণী। প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেছে সে। খবর পেয়েছি, এখন সে মিশরের এক সওদাগর-পুত্রের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত আছে। আপনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আপনার সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান কন্যার এই কদাচার কখনও বরদাস্ত করবেন না, এই আমি আশা করি। পবিত্র মুসলমান ভূমি তার পদস্পর্শে কলুষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, আমাকে সহৃদয় বন্ধু বলে গ্রহণ করে আমার ঐ কলঙ্কিনী কন্যাকে এই উজিরের হাতে প্রত্যর্পণ করে আপনার নিগূঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে চিরকালের মতো আবদ্ধ করে রাখবেন আমাকে।

আপনার সঙ্গে আমার এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্প্রীতির ব্যবহার চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাই আমার এবং আমার প্রজাসাধারণের অন্তরে। প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আপনার পরিকল্পনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী আমি আমার সাম্রাজ্যে মুসলমান প্রজাসাধারণের হিতার্থে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করে দেব। এর ফলে ইসলাম-ধর্মীরা তাদের ঈশ্বরের উপাসনার এবং স্বজাতি-মিলনের এক পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র পেতে পারবেন। আপনাব সম্মতি পেলেই আমার কারিগররা এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করে মসজিদের নক্সা ইত্যাদির কাজ পাকা করে আনতে পারে।

পরিশেষে লিখি, আমার কন্যাকে উদ্ধার করে যদি আপনি সরাসরি এখানে

পাঠিয়ে দেন, তবে আরও ভাল হয়। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার লোকজনের হাতে আমার উপহার উপঢৌকনের যৎসামান্য উপচারও পাঠাতে পারবো। আপনার হারেমের জন্য আমি দশটি গ্রীক-সুন্দরী বাঁদী সংগ্রহ করে রেখেছি। এ ছাড়া দাস দাসী নফর চাকরও অনেক থাকবে তাদের সঙ্গে। এই পরমা-সুন্দরী বাঁদীদের দেহাভরণ অঙ্গ সাজ-সজ্জার জমকালো পোশাকাদির মূল্যও কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হতে পারবে। অবশ্য মূল্য দিয়ে উপহারের মান বিচার করা সম্ভব নয়। আপনি যদি আমাকে এক দিনার মূল্যের কোন ভালোবাসার উপহার নিদর্শন পাঠান—তা হবে আমার মুকুট-মণির সমতুল্য।

আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। নিবেদন ইতি—

আপনাদের একান্ত বশংবদ—
সিজার
কনসতানতাইনের সম্রাট

লেখা শেষ করে চিঠিখানা পড়ে শোনালেন সম্রাট। পাদরী-পিতা বললেন, দারুণ হয়েছে। ঐ মাথা-মোটা মুসলমান সুলতানটা এ টোপ গপ্ করে গিলবে, দেখে নেবেন। আপনার কন্যাকে যখন ওর লোকজনরা নিয়ে এসে নামবে—এই বন্দরে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ যবনদের শূলে চাপিয়ে খতম করে দেবেন। কারণ শত্রুর শেষ রাখতে নাই। ওরা হচ্ছে সর্বনাশার ঝাড়। আধমরা করে ফেলে রেখে দিলেও ওরা আবার বেঁচে উঠে সর্বনাশ করবে। ওদের প্রাণ বড় শক্ত। লোহার ডাণ্ডায় পিটলেও ব্যাটারা মরে না। একমাত্র শাস্তি ওদের, শূলে গেঁথে মারা।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো বারতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

চিঠিখানা মোহর করে নতুন উজিরের হাতে দিয়ে সম্রাট বললেন, তুমি আমার দূত হয়ে বাগদাদ খলিফা হারুন অল রসিদের দরবারে যাবে। ভাল করে শোন, প্রথমে তিনবার কুর্নিশ করবে তাকে। কুর্নিশ কী করে করতে হয় জান? যদি না জেনে থাক—মুসলমানী আদব-কায়দা যারা জানে তাদের কারো কাছ থেকে জেনে নিও। মোট কথা সম্মান জানানোর ভড়ংটা যেন ঠিক থাকে। তারপর আমার চিঠিখানা তুলে দেবে তার হাতে। বলবে, আপনি যদি অনুমতি করেন ; ধর্মাবতার—তবে কিছুদিন আমি এখানেই অবস্থান করি। রাজকুমারীকে যদি আমার সঙ্গেই দিয়ে দেন তবে আমিই তাকে নিয়ে যেতে পারি। খলিফা যদি বলে, থাকুন, আমি তার সন্ধান করে দেখছি—তবে ঐখানেই তুমি থেকে যাবে। সেক্ষেত্রে একজন দূতকে পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ে দেবে। আর যদি বলে, না, তার প্রয়োজন নাই, খোঁজখবর করে তাকে আমিই পাঠাবো আমার লোকজন দিয়ে, তা হলে আর অপেক্ষা করবে না সেখানে। সটান চলে

আসবে।

সম্রাটের মন্ত্রী এসে হাজির হলো বাগদাদে খলিফার দরবারে। যথাবিহিত কুর্নিশাদি করে সে বললো, আমি এসেছি কনসতানতাইন সম্রাটের দূত হয়ে। মহামান্য ধর্মাবতারকে আমাদের সম্রাট একখানি পত্র প্রেরণ করেছেন।

উজির জাফর চিঠিখানা পড়ে শোনালো হারুন অল রসিদকে। খলিফা বললেন, ঠিক আছে, আপনি আমার প্রাসাদে অবস্থান করুন। আমি আমার সারা মুলুকের সর্বত্র চর পাঠাচ্ছি। সম্রাট-নন্দিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তাকে এনে এখানে হাজির করা হবে।

উজিরমশাই বিশেষ পুলকিত হয়ে ওঠে।

—শাহেনশাহর অসীম করুণা।

খলিফা জাফরকে বললেন, জাফর মেহমানের আদর-যত্নে যেন কোনও ত্রুটি না হয়, দেখো। আর আজই সমস্ত শহর গঞ্জে চর পাঠাও। কনসতানতাইন সম্রাট-কন্যা মিরিয়ামকে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে আমার কাছে হাজির করতে নির্দেশ দেবে।

উজির জাফর জো হুকুম জাঁহাপনা, বলে মন্ত্রীবরকে নিয়ে অতিথিশালার দিকে পা বাড়ালো।

এদিকে মিরিয়াম তার ভালোবাসার পাত্র নুরকে নিয়ে দামাস্কাসের মনোরম পরিবেশে হেসে খেলে বেড়িয়ে মজাসে দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সুলতানের পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে গেল তাদের। কোতোয়াল জিজ্ঞেস করে তোমার নাম ধাম কী?

নুর এবং মিরিয়াম গোড়া থেকে তাদের নাম ভাঁড়ায়নি। তার প্রয়োজনও বোধ করেনি। কারণ এখন তো তারা খৃীষ্টান অধিকার থেকে মুসলমান সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদের মুলুকে এসে বসবাস করছে।

নুর বললো, আমার নাম নুর আর আমার বিবির নাম মিরিয়াম।

—মিরিয়াম? মানে কনসতাননাইন-সম্রাটের কন্যা?

—জী হ্যাঁ।

ঠিক আছে। খলিফা হারুন অল রসিদের হুকুমে তোমরা এখন তাঁর বন্দী। আজ তোমাদের বাগদাদে পাঠানো হবে।

অজানা আশংকায় দুলে ওঠে নুর।—এ আবার নতুন কী ফ্যাসাদ হলো? আবার কী কয়েদ হতে হবে? ইয়া আল্লাহ, এই কী তোমার বিচার। ধরণীর এক কোণে আপন মনে আমরা দুজনে সুন্দর ভাবে জীবন কাটাবো —তাও তুমি হতে দিলে না?

মিরিয়াম ওকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখের দিনে বিচলিত হতে নাই, নুর। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। তিনিই ঠিক পথে নিয়ে যাবেন আমাদের।

যথাসময়ে খলিফার দরবারে হাজির করা হলো ওদের। মিরিয়াম ও নুর দুজনে আভূমি আনত হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ করে অবনত মস্তকে দাঁড়ায়।

দামাসকাসের সুবাদারের প্রধান সচিব বলে, ধর্মাবতার এই সেই মিরিয়াম,

যাকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা আপনি পাঠিয়েছিলেন সুবাদার সাহেবের কাছে। আর এ হচ্ছে নূর—কাইরোর এক সম্ভ্রান্ত সওদাগরপুত্র। এরই সঙ্গে মিরিয়াম বসবাস করছিল সেখানে।

খলিফা দৃষ্টিপাত করলেন। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু বিধর্মী ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান বলে মনেই হয় না।

—তা হলে তুমিই সেই মিরিয়াম—কনসতানতাইন সম্রাট-নন্দিনী?

খলিফার কণ্ঠস্বরে কিছুটা বুঝি বিদ্রুপের সুর। মিরিয়াম মাথাটা আরও খানিকটা অবনত করে বলে, ধর্মাবতারের বাঁদী হাজির জাঁহাপনা। আপনি আমাদের পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ—ইসলামের রক্ষাকর্তা। আমরা আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য।

এই স্তুতিবাক্যে খলিফা মুগ্ধ হলেন। এবার তিনি নূরের দিকে দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করেন, আর তুমি বুঝি নূর—মিশরের সেই সওদাগরপুত্র?

নূর মাথা নুইয়ে বলে, আপনার বান্দার নাম নূর ধর্মাবতার এবং আমার বাবা কাইরোর এক সওদাগর।

হঠাৎ খলিফা গর্জে ওঠে বেতমিজ বেশরম, তুমি মুসলমানের সন্তান হয়ে এক ম্লেচ্ছ বিধর্মী খ্রীষ্টান কন্যার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ? তুমি জান ইসলামের বিধানে এর কী সাজা?

নূর আরও বিনীত হয়ে বলে, জানি ধর্মাবতার। কিন্তু আমি বা আমরা ইসলামের কোনও বিধান লঙ্ঘন করিনি। আপনি যদি আমাকে বলার সুযোগ দেন আমি আমাদের আগাগোড়া কাহিনী কোনও রকম বিকৃত না করে আপনার সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

—বেশ বল।

খলিফা আদেশ করলেন। তখন নূর তাদের সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে শোনালো। এখানে আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই।

সব শুনে খলিফা মিরিয়ামকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার বাবা একজন দূতকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তিনি আমাকে একখানা চিঠিও দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, আমি যদি তোমাকে তাঁর কাছে ফেরত পাঠাই তবে তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি তাঁর দেশে মুসলানদের নামাজের জন্য একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করে দেবেন। এবং সে মসজিদের পরিকল্পনার ভার আমাকে নিতে হবে। এখন এ বিষয়ে তোমার কী বক্তব্য?

এই কথা শোনামাত্র মিরিয়াম ফণিনীর মতো মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকলো, ধর্মাবতার আপনি আল্লাহর বরপুত্র—ইসলামের ধারক। পয়-গম্বরের বাণীর যাতে কোনও অসম্মান অপমান বা অমর্যাদা না ঘটে সেই পবিত্র কর্তব্য আপনার ওপরে ন্যস্ত আছে। আমি এখন সাচ্চা মুসলমানী। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। মহম্মদ আমাদের পয়গম্বর। এখন আপনি বলুন, কোন নীতিতে আপনি আমাকে বিধর্মী

নাস্তিকের হাতে তুলে দিয়ে আমার ধর্ম ইজ্জত মান সব নষ্ট করতে অভিলাষী। যারা মনে করে তাদের মানব-সুত যীশুও আমাদের আল্লাহর সমতুল্য, এবং যারা মূর্তিপূজা এবং ক্রুশকে ভক্তি করে, সেই ম্লেচ্ছ নাস্তিক বিধর্মী খ্রীস্টানদের হাতে আমাকে তুলে দেবার অপরাধে আপনাকে আমি আল্লাহর দরবারে অভিযুক্ত করবো? এখানে তার বিচার হবার হয়তো কোনও সুযোগ নাই, কিন্তু আপনি জানবেন আপনার বিচার হবে শেষ বিচারের দিন তার দরবারে।

মিরিয়ামের এই দৃপ্তবাণী শুনে খলিফা বিচলিত হয়ে ওঠেন, দু চোখ জলে ভরে যায়।

—কে তুমি কন্যা, তুমি আমার জ্ঞানের চোখ খুলে দিলে? তুমি যথার্থই বলেছ, কোনও সাচ্চা মুসলমানকে আমি বিধর্মী নাস্তিকের হাতে তুলে দিতে পারি না। আমি আল্লাহর তল্পিবাহক দাসানুদাস—ইসলামের রক্ষক। আমাকে এই মহা-পাতকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন, কন্যা। তোমার এই সৎ-সাহস এবং স্পষ্টবাদীতার জন্য আমি তোমাকে তোমার অভিরুচি মতো ইনাম দিতে চাই। তাতে যদি তুমি আমার সমগ্র মুলুকের অর্ধেকও চেয়ে বসো, সানন্দে দেব তোমাকে।

সুলতান বললো, মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়তা কাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ভাবো, তারপর বল, আর একটা কথা আমাকে বলতো মিরিয়াম, তুমি রাজার দুলালী। তোমার বংশমর্যাদা, আভিজাত্য অহঙ্কার এবং আত্মমর্যাদাবোধ সাধারণ মানুষ থেকে অনেকটা ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে, কোনও এক সময়ে ঝোঁকের মাথায় ভাল লাগলেও লাগতে পারে, নুরের মতো এক অতি সাধারণ সওদাগর-তনয়কে জীবন-সঙ্গী করে কী সুখী হতে পারবে?

মিরিয়াম বলে, আমার খেয়াল ও ঝোঁকের কথা বাদ দিন, ধর্মাবতার। আমি যদি তাকে আর নাও চাই সে কী আমাকে ছাড়বে? আর ছাড়বেই বা কেন? সে তো আমাকে উচিত মূল্য দিয়ে বাঁদী-বাজার থেকে সওদা করে নিয়েছে? এখন আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাই তো শেষ কথা নয়। আর তা ছাড়া, আপনাকে একান্তে বলি, আমি নুরকে প্রাণাধিক ভালবাসি। সে আমার জন্যে কী ভাবে দু' দুবার নিজের জীবন তুচ্ছ করতে পেরেছিল—সে দিকটা একবার ভাবুন? আজ আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে এই যে কথা বলছি, এবং আমার ধর্মবিশ্বাসে অটল থাকতে পেরেছি—সে তো শুধু এই নুরেরই কল্যাণে। না হলে এতদিনে আমাকে কনসতানতাইন-সম্রাটের সেই ঘাটের মড়া বুড়ো উজিরটার অঙ্কশায়িনী হয়ে স্বধর্ম ভ্রষ্ট হতে হতো।

খলিফা প্রীত হলেন। আর এক মুহূর্তও তিনি অপেক্ষা করতে চাইলেন না। বললেন, কাজী, সাক্ষীদের ডাকো, এখনি এই দরবারকক্ষেই আমি এদের শাদী দিয়ে দেব। শুভ কাজে বিলম্ব করতে নাই।

এরপর সম্রাটের মন্ত্রী-দূতকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, সব তো নিজের কানেই শুনলেন। এই অবস্থায় আমি তো আপনার প্রভুর কাছে ফেরত

পাঠাতে পারছি না তাকে। রাজকুমারী এখন মনে-প্রাণে মুসলমান। ইসলাম তাঁর একমাত্র ধর্ম। আমি তো কোনও মুসলমানকে বিধর্মীর হাতে তুলে দিতে পারি না। ইসলামে তা মহাপাপের কাজ। আমি আল্লাহর তল্পিবাহক—ইসলামের রক্ষক হয়ে আমি নিজেই কী করে এই অনাচার করতে পারি। আপনি যা শুনলেন এখানে, সম্রাটের কাছে গিয়ে সব খুলে বলুন। হাত পা আমার বাঁধা, কিছুই করার নাই এ ব্যাপারে। আর আমি যদি আজ মহাপাতক হয়ে মিরিয়ামকে আপনার সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিই তবে ইহজগতে আমিই হয়তো খলিফা বলে কোনও সাজা পাবো না, কিন্তু সেই শেষ বিচারের দিন, সে দিন? সে দিন তো খলিফা হারুন অল রসিদ আর ওরা নুর মিরিয়াম বলে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। সে দিন আমাকে কে রক্ষা করবে? আপনি বরং তাঁর কাছে গিয়ে আমার অক্ষমতার কথা জানান।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চৌদ্দতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

সম্রাটের দূত যখন পরিষ্কার বুঝতে পারলো, মিরিয়ামকে তিনি ফেরত পাঠাবেন না, তখন অস্বাভাবিক অভব্য ক্রোধে ফেটে পড়লো সে। সে সম্রাটের সামান্য এক মন্ত্রী, আর তার সামনে তামাম আরব দুনিয়ার অধিপতি আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ ইসলামের রক্ষক ধর্মাবতার খলিফা হারুন অল রসিদ মসনদে আসীন, সে কথা সে বেমালুম ভুলে গেল।

—যীশুর নামে শপথ করে বলছি, হাজার বার সে ইসলামে দীক্ষা নিতে পারে, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাকে তার বাবার কাছে ফিরে যেতেই হবে। তাতে যদি আপনি বাধা দেন, তবে ইউফ্রিট থেকে ইয়ামান পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত আপনার যে রাজ্যপাট, আমাদের সেনাবাহিনীর দোর্দন্ড প্রতাপে আপনাকে তা খোয়াতে হবে।

খলিফা গর্জে ওঠেন, কী এতবড় স্পর্ধা! এই কুত্তার বাচ্চা খ্রীষ্টানটা আমাকে শাসাচ্ছে? এখুনি ওর মুন্ডুটা কেটে আমার প্রাসাদ-ফটকের সামনে ঝুলিয়ে দাও। আর ওর দেহটা ক্রুশে গেঁথে নর্দমায় ফেলে দিয়ে এস। ঘোষণা করে দিও, খলিফার হুকুমে দূতকে এই সাজা দেওয়া হয়েছে।

সারা সভাস্থল ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে মিরিয়াম কথা বলে, মহামান্য ধর্মাবতারের পবিত্র তরবারি এই কুত্তার রক্তে কলুষিত করবেন না, জাঁহাপনা। আমি নিজে হাতে ওর সমুচিত সাজা দিচ্ছি। এই বলে মিরিয়াম ছুটে এসে মন্ত্রীটার কোমর থেকে তারই অসি খুলে নিয়ে প্রচন্ড এক কোপে তার মুন্ডটা কেটে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর ওর ধড়টা পা দিয়ে লাথি মারতে মারতে দরবারের বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

এই তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হয়ে খলিফা তাঁর নিজের মুকুট পরিয়ে

দিলেন মিরিয়ামের মাথায়। এবং নূরকে ভূষিত করলেন এক মহামূল্যবান বাদশাহী সাজ-পোশাকে।

এক বিশাল উট-বাহিনীর পিঠে নানা অমূল্য উপহার উপঢৌকন সামগ্রী বোঝাই করে মিরিয়াম ও নূরকে তাদের স্বদেশ কাইরোয় পাঠিয়ে দিলেন খলিফা।

এইভাবে নূর মিরিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে অনেক দিন বাদে আবার ফিরে এল তার বাবার কাছে। বহুদিন পুত্রের অদর্শনে বাবা সব রাগ রোষ ভুলে গিয়েছিল। আবার সে ছেলে এবং তার বৌকে ফিরে পেয়ে আপন করে বুকে টেনে নিল।

নূরের প্রত্যাবর্তন ও শাদী উপলক্ষে কাইরোর সম্ভ্রান্ত বণিক ও আত্মীয় ইয়ার বন্ধুদের ভোজ-সভায় আমন্ত্রণ জানালো ওর বাবা। নূরের বিবি মিরিয়ামকে দেখে পঞ্চমুখে প্রশংসা করে গেল সবাই।

এরপর দীর্ঘকাল তারা একত্রে সুখে সচ্ছন্দে হেসে গেয়ে নেচে এবং আদর সোহাগ সহবাস করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছিল।

গল্প শেষ হলো। শাহরিয়ার বললো, তোমার এই লড়াকু মেয়ের কিস্সাটা খুব মজার লেগেছে, শাহরাজাদ। যাই হোক, আমার মনে হয়, তোমার গল্পের থলি প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কী বল? এবার তো তাহলে আমার সেই প্রতিজ্ঞা তোমার মুণ্ডচ্ছেদ—পালন করতে হয়—?

শাহরাজাদ ভাবে, আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা বোধ হয় সংগত নয়। মৃদু কণ্ঠে বললো, এই দুঃসাহসিক লড়াই-এর কাহিনীর পর আরও চমৎকার দু একটা কাহিনী আপনাকে শোনাবো, জাঁহাপনা।

শাহরিয়ার বলে, তাই নাকি, আরও গল্প আছে তোমার ঝুলিতে? আচ্ছা, কি কিস্সা শোনাবে, বল?

শাহরাজাদ বলে, খুব বড় গল্প আরম্ভ করার আগে একটা ছোট কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

সে বলতে শুরু করে:

কোন এক সময়ে বসরাহর এক দরাজ-দিল উদার স্বভাবের এক সুলতান বাস করতেন। তার নাম সুলতান জাইন। বয়সে সে নবীন নওজোয়ান। স্বভাবতই সমবয়সী ইয়ার বন্ধু এবং স্তাবকের অভাব ছিল না।

অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি সইতে পারতেন না। কারণে অকারণে অকাতরে মুক্তহস্তে দানধ্যান করতেন। তাঁর মত সদাশয় বন্ধুবৎসল মহৎ

উদার সুলতান খুব কমই দেখা যেত।

এত সব সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বড্ড বেপরোয়া এবং কিছু খামখেয়ালীও ছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং আপনজনরা এর সুযোগ নিতে কসুর করতো না। নানা ছল ছুতোয় তারা এসে হাত পাততো। এবং সুলতানের সামনে কেউ হাত পেতে ব্যর্থ-মনোরথে হয়ে ফিরে যায় না, সে কথাও তারা খুব ভাল করেই জানতো।

এইভাবে তারা একদিন সুলতানের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার শূন্য করে ফেললো। ইয়ার বন্ধুরা নিত্য নতুন বাঁদী মেয়েমানুষের সন্ধান আনতে লাগলো, আর সুলতান তাদের পিছনে লক্ষ লক্ষ দিনার ওড়াতে থাকলো। এভাবে চলতে থাকলে কুবেরের ভাঁড়ারও একদিন নিঃশেষ হতে পারে, জাইন তো কোন ছার। বসরাহর একটা ছোট অঞ্চলের সুবাদার মাত্র। বাৎসরিক আয়ের একটা মোটা অঙ্ক ফি বছর বাগদাদে খলিফার কাছে নজরানা পাঠাতে হয় তাকে।

একদিন উজির এসে কুর্নিশ করে বলল, জাঁহাপনা, বড়ই দুঃসংবাদ, কোষাগারে কোনও অর্থ নাই। এমন সংকট অবস্থা কখনও ঘটেনি। কাল কী হবে, তার কোনও সংস্থান নাই। এখন কী উপায় হবে জাঁহাপনা?

সুলতান জাইন ভাবিত হলেন। তাই তো, তাঁরই খামখেয়ালীর জন্য সব ধন নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন প্রাসাদ দরবারের কর্মচারীদের বেতন এবং আহারাদির সংস্থান হবে কী করে?

ভেবে কোন কূলকিনারা পান না তিনি। এখন মৃত্যু ছাড়া আর সম্মান-জনক কোনও পথই খোলা নাই। তার হারেমের সব প্রিয় বাঁদীদেরই বিদায় করে দিতে হবে। বিদায় দিতে হবে খোজা নফর চাকর সবাইকে। শূন্য প্রাসাদে একা একা বসে কী সে হাহাকার করে মরবে? না ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পথে নামবে?

প্রবাদ আছে ঃ দারিদ্র্যের চেয়ে কবর অনেক শ্রেয়।

এই কথা স্মরণ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছদ্মবেশ ধারণ করে পথে বেরিয়ে পড়েন। হঠাৎ খেয়াল হয়, বাবা মৃত্যুর পূর্বে কিছু উপদেশবাণী রেখে ছিলেন তাঁর জন্য। কিন্তু কী সেই উপদেশ? কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর মনে করতে পারেন তিনি।

বৃদ্ধ পিতা সন্তানের প্রতি উপদেশ রেখে গিয়েছিলেন ঃ যত সুখ-সম্ভোগ আর বিলাস-ব্যসনেই দিন কাটাতে থাক না কেন বাবা, সবার ওপর একটা কথা অন্তরে গেঁথে রাখবে। তাহলো সুদিন কারো চিরকাল থাকে না। সৌভাগ্যের একটা বিবর্তন ঘটতে পারে। এই কারণে আমি আমার মহাফেজখানায় এমন এক সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেলাম, যা তোমার দুঃসময়ে সকল দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-কষ্টের লাঘব করতে পারবে।

সুলতান জাইন বাবার এই উপদেশ-বাণী এতদিন বিস্মৃত হয়েছিলেন। আজ এই মুহূর্তে সে-কথা মনে পড়ায় তিনি দ্রুত পায়ে প্রাসাদে ফিরে এসে মহাফেজখানায় প্রবেশ করলেন।

চারপাশে থরে থরে সাজানো কত কলা-কথার পান্ডুলিপি, কত মূল্যবান উপদেশাবলীর মহামূল্য গ্রন্থরাজি। সব তন্নতন্ন করে খুঁজে-পেতে দেখলেন তিনি। কিন্তু না, কোথাও একটুকরো সোনা রূপাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু কাগজের ওপরে কালীর আঁচড়ে লেখা হাজার হাজার কাব্য, গাঁথা কিস্সা কাহিনী; সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান কোরান প্রভৃতি।

এছাড়া আরও আছে কত মূল্যবান দলিল পাট্টা, কবুলিয়ৎ নানা খতিয়ান পর্চা রসিদ ইত্যাদি।

সবই তিনি আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেন। কিন্তু নাঃ, কোথাও কিছু হদিশ করতে পারলেন না।

তবু কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না সুলতান জাইন। তার বদ্ধমূল ধারণা, বাবা ভাবাবেগের মানুষ ছিলেন না। হঠাৎ খেয়ালের বশে কোনও বাজে কথা বলে যাননি। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু রেখে গেছেন।

প্রায় উন্মাদের মতো হাতড়াতে থাকেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখে উৎসাহিত হতে পারেন না। হতাশায় খাঁ-খাঁ করে ওঠে মন।

হঠাৎ তার চোখে পড়ে, একটা ছোট্ট বাক্স। তালাবন্ধ। এর মধ্যে আর তেমন কী ঐশ্বর্য আঁটতে পারে? তবু সে নেহাতই কৌতূহলের বশে কুলুপটা ভেঙ্গে ফেলে। বাক্সটার মধ্যে কোনও রত্নমণি কিছুই নাই। ছিল একখন্ড কাগজ মাত্র। সুলতান জাইন চিরকুটটা মেলে ধরেন। একখানা সাবল নিয়ে প্রাসাদের পশ্চিম প্রান্তে চলে যাও। সেখানে একখানা ছোট্ট নহবতখানা আছে। সেই নহবতখানার মেঝের ঠিক মাঝখানে একখানা বৃত্তাকার শ্বেত পাথর আছে। ঐ পাথরখানা তুলে সাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকবে। তারপর আল্লাহ ভরসা।

জাইন কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাবেন, এদ্বারা বাবা তাকে কী বোঝাতে চেয়েছেন? মনে হয়, তিনি প্রকারান্তরে উপদেশ দিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রম কর। কোনও অভাব হবে না। ভিক্ষার চেয়ে মোট বওয়াও অনেক ভাল।

যাই হোক, পিতৃ আদেশ শিরোধার্য। জাইন ভাবলেন, তিনি জায়গা মত সাবল চালিয়ে দেখবেন, কী হয়।

ফুলবাগিচা থেকে একখানা সাবল নিয়ে নহবতখানায় প্রবেশ করেন সুলতান। ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা বৃত্তাকার শ্বেত পাথরও দেখতে পান তিনি।

রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছোট দুনিয়াজাদ গালিচা থেকে উঠে এসে বলে, তোমার গল্প বলার কী মিষ্টি কায়দা দিদি। শাহরাজাদ বলে, আগে যে সব কাহিনী শুনেছো এটা তার থেকে কিছু আলাদা, বোন। একটু ধৈর্য ধরে শোন, তবেই বুঝতে পারবে।

সাতশো একুশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

নহবতখানা ছোট্ট ঘর। সব দরজা জানালা বহুকাল ধরে বন্ধ। প্রায়ান্ধকার বলা যায়। একটা চিরাগবাতি নিয়ে আসেন জাইন।

সাবলখানা দিয়ে চাড় দিতেই পাথরখানা উঠে আসে। তারপর মাটি। খানিকটা গর্ত খুঁড়তেই খং খং করে ফাঁপা আওয়াজ ওঠে।

মাটি সরাতেই চোখে পড়ে, একখানা পাথরের চাঁই। অনেক কষ্ট করে পাথরখানা টেনে তুলতে চোখে পড়ে, একখানা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। আলো আর সাবলখানা হাতে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকেন।

নিচে নেমে যেতে চোখে পড়ে, একখানা সুন্দর প্রশস্ত কক্ষ। চারদিকের দেওয়াল চীনা স্ফটিক পাথরে নির্মিত। মাথার ওপরের ছাতটা নীল রঙের। নানা কারুকার্য করা। ঘরের একপাশে পর পর চারখানা লম্বা লম্বা টেবিল। সেই টেবিলে সাজানো দশটি সোনার জালা। তার গায়ে কী সব বিচিত্র কারুকার্য। চোখ জুড়িয়ে যায়।

জাইন ভেবে পান না, জালাগুলোয় কী আছে। জালার আকৃতি না হলেও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, ওগুলো দামী মদের পাত্র সব। তাই যদি হয়, ক্ষতি কী? প্রাণ ভরে পান করা যাবে তো। এই ভেবে তিনি কাছে এগিয়ে আসেন। একখানা টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা জালার ঢাকনা খুলে ফেলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, জালাটা সোনার গুঁড়োতে কানায় কানায় ভরা! জাইন হাত ঢুকিয়ে দেন জালার ভিতরে। সারা হাতটায় সোনার গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে যায়। এরপর আর একটা জালার ঢাকনা খুলে ফেলেন। সেটায় মোহর-ভরা। এইভাবে তিনি প্রতিটি জালার মুখ খুলে ধরেন। প্রতিটিই, হয় সোনার গুঁড়ো, নয় সোনার মোহরে পরিপূর্ণ।

জাইন শিহরিত হয়ে ওঠেন। আনন্দে নেচে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠেন। একটা জালা টেনে মাথায় তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সোনার গুঁড়োর খানিকটা তাঁর মাথায় ঘাড়ে পিঠে মুখে বুকে ছড়িয়ে পড়ে যায়। মুহূর্তে জাইনের সর্বাঙ্গ সোনার বর্ণ ধারণ করে।

ঘরের পাশে এক মনোহর হামাম। সেই হামামের ফোয়ারায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গোসল করে গায়ের স্বর্ণরেণু ধুয়ে ফেলেন। গোসল করতে করতে নিজের খেয়ালেই তিনি বলতে থাকেন, জাইন, তুমি তো ভিক্ষার পাত্র হাতে ধরতে গিয়েছিলে? এত ঐশ্বর্য নিয়ে এখন কী করবে?

জাইন ভাবেন, প্রাণ খুলে মানুষকে দান করার বুঝি এই পুরস্কার। একদিন যখন ছিল, যে যা চেয়েছে, উজাড় করে দিয়েছেন, এ তারই সুফল। একটা কথা আল্লাহ তাকে বুঝিয়ে দিলেন, যে প্রাণ খুলে দান করতে চায়, তার সামগ্রীর কোনও অভাব হয় না।

জাইন সব হাঁড়িগুলো মেঝের ওপর উপুড় করে ঢালতে থাকে। আর দেখে অবাক হতে থাকেন, কত সোনা এবং সোনার মোহর। সারা মেঝেটায়

সোনার পাহাড় জমে ওঠে।

জাইন নাবালক শিশুর মতো স্বর্ণস্তূপের সামনে বসে পড়ে দুহাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে খেলা করতে থাকেন। কখনও বা মোহরগুলো আর সোনার গুঁড়োগুলো আঁজলা ভরে তুলে মাথার ওপর দিয়ে সারা অঙ্গে গড়িয়ে দেন। ভারি মজা লাগে। এত অর্থ নিয়ে তিনি কী করবেন, কীই বা এর মূল্য।

জাইন কী করবেন ঠিক বুঝতে পারেন না। সেই নির্জন কক্ষে কুবেরের ধন সামনে নিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন। সোনার গুঁড়োর মধ্যে গড়াগড়ি খান। মোহরের বিছানা করে শুয়ে পড়েন। নাঃ, এ শয্যা তো তেমন সুখাবহ কোমল কুসুমাস্তীর্ণ নয়? এমন স্বর্ণশয্যায় শুয়ে পিঠে তার ব্যথা লাগে কেন?

আবার তার সর্বাঙ্গ সোনায় সোনায় সোনালী বর্ণ হয়ে ওঠে। দেওয়ালের আয়নায় নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। একটা সোনার তৈরি পুতুল হয়ে গেছেন তিনি।

জাইন নিজের মনেই ভাবেন আর হো হো করে হাসেন। এই সন্ধ্যাবেলাতেই তিনি দৈন্যের লজ্জা ঢাকবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ করে দেবেন বলে পথে বেরিয়েছিলেন, আর এখন কতই বা রাত্রি হবে—তার মধ্যে তিনি বোধ হয় তামাম দুনিয়ার সেরা ধনবানদের একজন হয়ে উঠেছেন। আল্লাহর কী মহিমা।

জাইন ভেবে পান না, তার বাবা জনাকীর্ণ প্রাসাদের এই কক্ষতলে কী করে এমন সুন্দর একখানি হর্ম্যকক্ষ বানাতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি সকলের অলক্ষ্যেই করেছিলেন এ কাজ। এই যে জালা জালা মোহর আর সোনার গুঁড়ো এ সবই বা তিনি লোকচক্ষুর অগোচর করে এখানে এসে জমা করতে পেরেছিলেন কী করে?

ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। এত ঐশ্বর্যই বা তিনি সংগ্রহ করলেন কী করে। তাঁর সলতানিয়তের যা আয় তা থেকে তো এ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব নয়।

এইসব নানারকম ভাবছিলেন এবং মোহর আর সোনার গুঁড়োগুলো নিয়ে আপন মনে খেলা করে চলেছিলেন জাইন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ছোট্ট একটি কৌটো। সোনার তৈরি। খুব কারুকার্য করা।

এই রকম একটা ক্ষুদ্র কৌটো এখানে কেন? কী এমন ধন-রত্নই বা থাকতে পারে এর ভিতরে। একটু এদিক ওদিক চাপ দিতে দিতে কৌটোটা খুলে ফেললেন জাইন। না, কোনও মণি-রত্ন কিছু নয়, একটুকরো কাগজ এবং একটা চাবী মাত্র।

কাগজখানায় ঘরের নক্সা আঁকা ছিল। জাইন একটু মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারেন, এই মহলেরই পুরো নক্সা করা আছে ঐ কাগজে।

জাইন ভাবে, চাবীটা যখন এত সযত্নে রাখা আছে, মনে হয় এই ঘরের আশে-পাশে আরও কোনও ঘর আছে।

নক্সাটা মিলিয়ে মিলিয়ে তিনি দেওয়ালের এক ধারে কী যেন সন্ধান

করতে থাকেন। এবং পেয়েও যান একটা চিহ্ন। হাত দিয়ে একটু নাড়া চাড়া করতেই দেওয়ালের ঐ জায়গা থেকে খুলে আসে ছোট্ট একখানা স্ফটিক পাথর। জাইন দেখতে পান চাবি লাগানোর মতো একটা ছোট্ট ফুটো। চাবীটা ঢুকিয়ে এদিক ওদিক দু একবার ঘোরাতেই হঠাৎ দেওয়ালটা একদিকে সরে ফাঁক হয়ে যায়।

ওপাশে আর একখানা ঘর। এবং আরও সুন্দর দেখতে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বাইশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সারা ঘরখানা পান্না রঙে রঙ করা, এবং সোনার জলে নানারকম নক্সার কাজ করা ছিল। মাথার ওপরের বৃত্তাকার গোলকে ছয়টি পরমাসুন্দরী মেয়ে। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সোনার সিংহাসনে সমাসীন। কিন্তু তারা কেউ জীয়ন্ত নয়—এক এক খণ্ড হীরে কেটে এক একটি গড়া।

জাইন হতবাক হয়ে ভাবেন, ইয়া আল্লাহ তাঁর বাবা এত সম্পদের মালিক হয়েছিলেন কী করে? এ দৌলত তো উপার্জন করা সম্ভব নয় কোনও মানুষের পক্ষে।

জাইন ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারেন, আরও একটি সিংহাসন সেখানে রয়েছে। কিন্তু সেটায় কোনও পুতুল নাই। খালিই পড়ে আছে মনে হলো তাঁর। কিন্তু একটু ওপরে উঠে দেখতে পেলেন, না, একেবারে শূন্য সিংহাসন নয়। একখণ্ড রেশমীর কাপড় রাখা আছে তার ওপর। জাইন কাপড়খানা নামিয়ে নিয়ে আসেন। কাপড়টায় সোনার অক্ষরে লেখা:

'বাবা, এই হীরক-কন্যাদের সংগ্রহ করতে আমাকে বহু দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করতে হয়েছে। এই পুতুলগুলো প্রত্যেকটিই এক একটা আস্ত হীরে কেটে বসানো। তুমি ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে কী নিপুণ শিল্পীর হাতে এগুলো গড়া। প্রতিটি মেয়ে যেন প্রাণবন্ত বেহেস্তের হুরীর মতো পরমাসুন্দরী। কিন্তু তাই বলে ভেব না এদের চেয়ে আরও বেশি সুন্দরী কোনও নারী হতে পারে না। পারে। এখানে ছ' জনকে দেখছো, কিন্তু সপ্তম কন্যার সিংহাসন শূন্যই পড়ে আছে, সে নাই। সে এখানে নাই, কিন্তু আছে। আছে সে মিশরে—কাইরোয়। সেখানে যদি যাও, আমার এক অতি বৃদ্ধ নফর মুবারকের খোঁজ ক'রো তুমি। সেখানকার প্রায় প্রতিটি মানুষই তাকে চেনে। সে-ই তোমাকে বলে দিতে পারবে—এই সপ্তম কন্যার সন্ধান। নিজের চোখে যদি কখনও সে কন্যার অলোকসামান্য রূপ প্রত্যক্ষ করতে পার, তবে বুঝবে, সে এই ছয় কন্যার চেয়েও কত বেশি সুন্দরী রমণী। যদি পার তাকে সংগ্রহ করে এনে এই শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দিও, জাইন। এই আমার শেষ বাসনা। আল্লাহ তোমায় রক্ষা করুন।'

জাইন ঠিক করেন, তিনি কাইরোয় যাবেন। এবং কালই। সপ্তম কন্যাকে দেখতেই হবে।

জাইন আর অপেক্ষা করেন না সেখানে। একটা বাক্সে করে কিছু মোহর ভরে নিয়ে যথানিয়মে তালা চাবি বন্ধ করে ওপরে উঠে এসে আবার ঘরের মেঝেয় পাথরখানা বসিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে আসেন।

পরদিন সকালে তিনি উজির আমির এবং সভাসদদের ডেকে বললেন, আমি অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। কিছুদিন একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবো ভেবেছি। আমার প্রধান উজিরকে হুকুমতের পুরো দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা তার আনুগত্য নিয়ে আপন আপন কর্তব্য করবেন, আশা করি।

প্রধান উজির বুঝতে পারলো, সুলতানের মনোকষ্টের কারণ কী?

—জাঁহাপনা কোথায় যাবেন মনস্থ করেছেন?

বৃদ্ধ উজির কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করে। জাইন বলেন, কায়রো। কাইরোর মনোহর প্রাকৃতিক শোভা মনের সব দুঃখ যন্ত্রণা লাঘব করে দিতে পারে। আপনি আমার যাবার ব্যবস্থা করুন, উজির সাহেব। বিশেষ কোনও আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, বাছাই করা দ'চার জন নফর চাকর সঙ্গে দিলেই চলবে।

উজির জো হুকুম—বলে কুর্ণিশ করে সুলতানের কাইরো সফরের উদ্যোগ আয়োজন করতে প্রাসাদের ভিতরে চলে যায়।

যথাসময়ে কাইরোয় পৌঁছে জাইন এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা শেখ সাহেব, মুবারক নামে এক বৃদ্ধ, শুনেছি এখানকার প্রায় সব মানুষই তাকে এক ডাকে চেনে, কোথায় থাকে বলতে পারেন।

লোকটি জাইনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলে, তুমি বুঝি মুসাফির?

—জী হ্যাঁ।

—শাহ বাদশার মুবারক সাহেবের প্রাসাদ কে না চেনে? তিনি এখন বলতে গেলে কাইরোর মালিক। তার মতো বিত্তবান এ শহরে আর কেউই নাই। এমন কি এখানকার সুলতানও ধন-দৌলতে তার সমকক্ষ নন। তুমি এক কাজ কর, বাবা, এই পথ দিয়ে সোজা চলে যাও। যেতে যেতে দেখবে পথটা ডাইনে বেঁকে গেছে। সেইখানে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে তার বিশাল প্রাসাদ।

জাইন বিনীত হয়ে বলে, বহুত সুক্রিয়া।

যথা-নির্দেশিত স্থানে এসে প্রাসাদখানার আকার এবং কারুকার্য দেখে অবাক হয়ে যান। বাবার কথাগুলো মনে পড়ে, মুবারক তাঁর একজন সামান্য নফর ছিল। আজ সে এই বিশাল প্রাসাদের মালিক। ভাবতে অবাক লাগে।

বিরাট একখানা বসার ঘর। দেওয়ালে দেওয়ালে নানা প্রাচীন কারু-শিল্পের নিদর্শন। মেঝেয় দামি গালিচা পাতা। ঘরের আসবাবপত্রও অনেক খানদানী আভিজাত্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, এক নজরেই বোঝা যায়।

ঘরের ভিতরে একটা মখমলের আসন পাতা উঁচু বেদীতে বসে আছেন শুভ্র-শ্মশ্রু-পলিতকেশ এক সদাশয় বৃদ্ধ। সারা মুখে চোখে তার নির্লিপ্ত প্রশান্তি।

জাইনকে দরজায় দেখে স্বাগত জানান তিনি।

—আসুন ভিতরে আসুন, মনে হচ্ছে আপনি পরদেশী মুসাফির, মেহেরবানী করে আসন গ্রহণ করুন।

অতি অমায়িক ব্যবহার। জাইন কোনও কথা বলতে পারেন না। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে একটা জায়গায় বসে পড়েন।

বৃদ্ধ এবার সবিনয়ে জানতে চান, সাহেবের আগমনের উদ্দেশ্য ?

জাইন বলেন, আমি মুবারকের সংগে দেখা করতে এসেছি।

একটি অল্পবয়সী নওজোয়ানের মুখে তার অলঙ্কার-বর্জিত শুধু নামটা শুনে একটু বা আহত হয় সে। কিন্তু মুখের ভাবে তা প্রকাশ পায় না। কায়রোর প্রতিটি মানুষ তাকে দারুণ শ্রদ্ধা সম্মান করে। শুধু মুবারক বলে, ডাকার মতো লোক এখন আর কাইরোয় কেউ বেঁচে নাই। বৃদ্ধ ঈষৎ হেসে বলে, আমিই মুবারক। বলুন কী চাই আপনার ?

জাইন বলে, আমার নাম জাইন, বসরাহ থেকে আসছি। আমি সেখানকার বর্তমান সুলতান। আমার বাবা গত হয়েছেন—

আরও কী সব বলতে যাচ্ছিলেন জাইনের কিন্তু বলা হলো না। বৃদ্ধ মুবারক তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন নিজের আসন ছেড়ে। এক মুহূর্ত। জাইনের সামনে ছুটে এসে জাইনের পায়ের পরে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে, মালিক—

ঘরে বসেছিল শহরের সম্ভ্রান্ত সব সওদাগররা। তারা তো বিস্ময়ে বিমূঢ় ! জাইনও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। দুহাতে মুবারককে টেনে তোলে, আহা এ কি করছেন আপনি ?

মুবারকের চোখে জল।

—আপনার বাবা গত হয়েছেন। কিন্তু পুণ্যবান মানুষের কখনও মৃত্যু হয় না। আপনি আমার মালিক। আপনার বাবা আমার মালিকের মালিক। আজ এতকাল পরে এই শেষ বয়সে মালিকে-নফরে আবার মিলন হলো ! আজ আমার এ গরীবখানা পবিত্র পুণ্যতীর্থ হয়ে গেল, জাঁহাপনা !

মুবারকের এই কথায় ঘরের উপস্থিত সকলেই সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো জাইনকে। তারপর নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সকলে।

মুবারক বলে, এখন হুকুম করুন, জাঁহাপনা।

হুকুম নয়, 'জাঁহাপনা'ও আর নয়—বন্ধু বলে কাছে টেনে নিন। আমি আপনার কাছে এসেছি সপ্তম হীরক-কন্যাকে দেখবো বলে। বাবার লেখা থেকে জানতে পারলাম, আপনিই তার হদিশ জানাতে পারবেন।

—ঠিকই জেনেছেন, মালিক। আমি একদিন আপনাদের যে নফর ছিলাম আজও ঠিক সেই নফর মুবারকই আছি। এই যা ধন-দৌলত প্রাসাদ ইমারত দেখছেন, এ সবই আপনার, মালিক।

একটু থেমে আবার সে বলতে থাকে। হীরক-কন্যার সন্ধানে আপনাকে আমি নিয়ে যাবো অবশ্যই। তার আগে এখানে দু' একদিন জিরিয়ে নিন।

শরীর মন দুই-ই চাঙ্গা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আপনার সম্মানে আমি এক ভোজসভার আয়োজন করবো ঠিক করেছি। আমার আমন্ত্রণে শহরের তাবড় তাবড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সবাই আসবেন আপনাকে সম্বর্ধনা জানাতে। তাদের সকলের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় করাবো, এই আমার ইচ্ছা। আপনি মালিক, বান্দার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন জাঁহাপনা।

রজনী শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তেইশতম রজনীঃ

আবার সে গল্প শুরু করেঃ

জাইন বলে, একথা সত্য, আপনি আমার বাবার কেনা গোলাম ছিলেন। জানি না আপনি যখন বসরাহ ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনি আপনাকে মুক্তি-নামা দিয়েছিলেন কিনা। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি এখনও আমার বান্দা হয়েই আটক আছেন। মুক্ত হননি। যাই হোক, আজ আমি আপনাকে আমাদের সব গোলামী থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিনাশর্তে মুক্ত করে দিলাম।

একটু থেমে জাইন বলেন, আমি বসরাহ থেকে এতটা পথ এসেছি, পথশ্রমে ক্লান্ত—অবশ্যই। কিন্তু সপ্তম হীরক-কন্যাকে দেখার জন্য মন আমার ছটফট করছে। তাই আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের আড়ম্বর এখন থাক। আপনি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

মুবারক বুঝলো, মালিক বিশেষ উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করাই সঙ্গত। বললো, ঠিক আছে, মালিক, কালই রওনা হবো আমরা। কিন্তু একটা কথা কী ভেবেছেন মালিক, পথে যে সব বাধা-বিপত্তি আসবে তা কাটাতে হবে। সপ্তম হীরক-কন্যা এখন ত্রিভুজ দ্বীপের এক বৃদ্ধের হেপাজতে আছে। বড় দুর্ভেদ্য দুর্গম পথ; দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে হবে। যারা ঘাঁৎ ঘোঁৎ জানে না, তারা কিছুতেই এই ত্রিভুজ দ্বীপের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারে না। যে দু একজন এই বিপদ বাধা কাটিয়ে সেখানে পৌঁছতে পেরেছিল আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন। সেইজন্যই জানি, কত মারাত্মক কত বিপদ-সঙ্কুল এর যাত্রাপথ।

জাইন বলে, সে যাই হোক, আমি সবকিছুর জন্যে তৈরি। আপনি আর ভয় দেখাবেন না, চলুন বেরিয়ে পড়ি। আমার বুকে দুর্জয় সাহস আছে, মৃত্যুকে আমি ডরাই না।

মুবারক তার নফরদের বললো, সব বাঁধা-ছাঁদা করে ফেল, কালই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

পরদিন খুব ভোরে মুখ হাত ধুয়ে রুজু নামাজ সেরে ওরা পথে বেরিয়ে পড়লো।

দিনের পর দিন তারা কত নদী মরুপ্রান্তর পার হয়ে চলে। পার হয় কত সবুজ শস্য ক্ষেত, গিরি পর্বতমালা, কী করে তার পরিমাপ করা যাবে। চলতে

চলতে রাত্রি নেমে আসে। রাত্রি শেষ হলে আবার ওঠে দিনের সূর্য। আবার সূর্যও এক সময় ঢলে পড়ে। কিন্তু জাইন আর মুবারক ক্লান্তিবিহীন চলতেই থাকে। যখন একেবারেই আর শরীর সইতে পারে না তখন খানিকটা জিরিয়ে নেয়। খানাপিনা সারে। তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা।

এইভাবে ওরা একদিন সমুদ্র উপকূলে এসে একখানা নৌকায় চেপে আবার চলতে থাকে। চারদিকে জল, শুধু জল। জাইন কিছুই নিশানা বুঝতে পারে না।

এক সময় মুবারক বলে, এই সামনেই ত্রিভুজ দ্বীপ দেখতে পাবেন এবার।

সত্যিই একটু পরে দেখা গেল একটা দ্বীপ। গাছপালা, তরুলতা গুল্মে ভরা সুন্দর সবুজের হাট।

নৌকাখানা কুলে ভিড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধলো মুবারক। তারপর জাইনকে বললো, আপনি এখানে নৌকাতেই থাকুন, আমি আসছি।

জাইন বললেন, না, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

মুবারক হাসে, আমি আগে পথঘাট দেখে আসতে চেয়েছিলাম। পরে তো আপনাকে নিয়ে যাবোই। না হলে, সেই হীরক-কন্যাকে দেখবেন কী করে আপনি। তা এখন যদি যেতে চান চলুন, তবে বড়ই বিপদসঙ্কুল পথ— তাই বলছিলাম আগে আমি দেখে আসি।

জাইন বলেন, তা হোক। বিপদে আমি ভয় করি না।

চলতে চলতে বৃদ্ধ বলে, সে তো একশোবার, মালিক। আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন কেউ তাকে মারতে পারে না। আবার কথা আছে খোদার মার, দুনিয়ার বার। তিনি যদি মারেন, কেউ বাঁচাতেও পারবে না। সুতরাং ভয় আতঙ্ক সব মিছে। যা ঘটবার তা ঘটবেই। আমরা নিমিত্ত মাত্র।

চলতে চলতে এক সময় বৃদ্ধ আবার বলে, আমরা কিন্তু এবার হীরক-কন্যার সেই নিষিদ্ধ এলাকার দোরগোড়ায় এসে পড়েছি প্রায়। বুকে সাহস সঞ্চয় করুন মালিক, এবার আমাদের ভেতরে ঢুকতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা রিক্তহস্ত। আমাদের কাছে আত্মরক্ষারও কোন অস্ত্র নাই কিছু।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর ওরা একটা পাহাড় দেখতে পায়। উচ্চতায় পাহাড়টা নেহাত খাটো নয়। মুবারক বলে, ঐ চূড়ায় উঠতে হবে আমাদের।

জাইন বলে, কিন্তু আমাদের তো ডানা নাই, মুবারক। ওপরে যাবো কী করে। হাঁটা পথ বলতে তো কিছু দেখছি না।

মুবারক বলে, আমাদের ওড়ারও দরকার নাই, ওঠারও দরকার নাই।

এই বলে সে কুর্তার জেব থেকে একখানা ছোট্ট পুরোনো কিতাব বের করে। একেবারে জরাজীর্ণ। পাতাগুলো ঝুর-ঝুরে হয়ে গেছে। মৃদুমন্দ হাওয়াতেই খসে যেতে পারে। কোথাও কোথাও উই-এ কেটেছে।

বৃদ্ধ ওই বইখানার পাতা খুলে একটা জায়গা পড়তে থাকলো। জাইন বুঝতে পারলেন, কয়েকটি ছত্রের একটি কবিতা সে পাঠ করে চলেছে। কিন্তু তার ভাষা বা উচ্চারণ কিছুই বোধগম্য হবে না তার।

মুবারক নিবিষ্ট মনে কবিতা অথবা মন্ত্রের ছত্রগুলো বিড় বিড় করে আওড়াতে আওড়াতে পাহাড়ের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, আকাশ থেকে সমতল পর্যন্ত সব দিক নিরীক্ষণ করতে থাকলো।

হঠাৎ দেখা গেল পাহাড়টা সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রথমে ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা ফাটল দেখা দিল। তারপর সেই ফাটল ক্রমশঃ একটি সরু পথের সৃষ্টি করলো, অংশ দুটির মধ্যে।

কোন রকমে একটি মাত্র মানুষ প্রবেশ করতে পারে সে পথ দিয়ে।

মুবারক আগে এবং তার পরে পিছনে পিছনে প্রবেশ করলেন জাইন। একটানা এক ঘন্টা ধরে ওরা হেঁটে চললো সেই দুর্গম পথ বেয়ে। অবশেষে এক সময় পাহাড় পথ অতিক্রম করে ওপারে বের হতে পারলো। কি আশ্চর্য, বেরুবার সংগে সংগে পাহাড়ের ফাটলটা আবার জোড়া লেগে গেল। একটা সরু চুলের মতো দাগও আর চোখে পড়লো না।

সামনেই এক বিশাল হ্রদ। হ্রদ না বলে সমুদ্র বলাই সঙ্গত। তার ওপারে বহুদূরে এক সবুজ গাছপালার বন-জঙ্গল চোখে পড়ে। হ্রদের প্রাকৃতিক শোভা বড় সুন্দর। নীচে নীল নিথর স্বচ্ছ জলরাশি। মাথার ওপরেও নীল আকাশ—নির্মেঘ। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে।

জাইনকে পাশে নিয়ে মুবারক জলের ধারে পা ছড়িয়ে বসলো। ওপারে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ যে দেখছেন, ওপারের যে গাছগালা শস্য-শ্যামল প্রান্তর, ঐখানে আমাদের যেতে হবে, মালিক।

জাইন-এর চোখে জিজ্ঞাসা, কিন্তু ওপারে আমরা যাবো কী করে?

মুবারক বলে, ও-নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, জনাব। এখুনি একখানা ছোট নৌকা এসে আমাদের নিয়ে যাবে। ঐ সুন্দর স্বপ্নের দেশে কোনও কিছুরই অভাব নাই। শুধু আপনার কাছে একটা আর্জি জাঁহাপনা, যা কিছু দেখবেন, সহজভাবে দেখবেন। কোনও কিছু দেখে বিচলিত বা অবাক হবেন না যেন। আর একটা কথা, ভয় পেয়ে ভুলেও কখনও ফিরে যাওয়ার নামটি মুখে আনবেন না। তা সে যদি ঐ নৌকার মাঝি আমাদের কোনও বিপদের মধ্যে নিয়ে যায় তবুও না। ধৈর্য ধরে মুখ বুজে সব সয়ে যাবেন। আপনি ভয় পেয়েছেন—এটা বুঝতে পারলে, খুব খারাপ হবে। যতই বেকায়দায় সে ফেলুক, কোনও কথা বলবেন না। যদি বলেন, সংগে সংগে একেবারে পানির নিচে ডুবিয়ে দেবে সে।

জাইন বলে, এই আমি মুখে কুলুপ এঁটে দিলাম। আর একটি কথাও বেরুবে না। আপনার কথাবার্তা শুনে বেশ রোমাঞ্চ লাগছে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আগে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চব্বিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

ওরা যখন এই সব আলোচনায় রত সেই সময় একখানা ডিঙি নৌকা এসে

ভিড়লো ওদের সামনে। জাইন অবাক হয়ে ভাবেন, কি আশ্চর্য, সে তো এতক্ষণ সামনে তাকিয়েছিল। যতদূর দৃষ্টি যায়, কই, কোথাও তো কোনও নৌকা-টৌকার আভাষ সে বুঝতে পারেনি এতক্ষণ। তবে হঠাৎ এই ডিঙিখানার অবির্ভাব ঘটলো কী করে? আকাশ থেকে নেমে আসল, না জলের তলা থেকে উঠে আসল, কিছুই বুঝতে পারেন না জাইন।

ডিঙিখানা আগা গোড়া রক্তচন্দন-কাঠে তৈরি। দাঁড় কাছিগুলো রেশমের। সুন্দর সুগন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত হয়ে উঠলো।

ডিঙির মাঝিটার নিম্নাংগ দেখতে মানুষের মতো। কিন্তু তার মাথাটা হাতীর। কান দুখানা বিরাট বিরাট কুলোর মতো লটরপটর করছিল।

ডিঙিখানা একেবারে কূলে এসে ভিড়ালো না সে। তার থেকে কয়েক হাত দূরে রেখে এক লাফ দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো। তারপর দুজনকে দুহাতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে আবার এক লাফে ডিঙিতে গিয়ে উঠলো।

জাইন আর মুবারককে ডিঙির খোলের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে সে গলুই-এর ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বিরাট বিরাট কান দুখানা টানটান করে মেলে ধরে। একেবারে পালের মতো করে।

শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছিল। মাঝিটার কানের পালে হাওয়া লাগতে নৌকাখানা তর তর করে চলতে থাকলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে সেই দ্বীপ নিকটবর্তী হয়ে এল। তখন মাঝিটা আবার ওদের দুজনকে দু হাতে তুলে এক লাফ দিয়ে দ্বীপের কূলে নামিয়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

জাইনকে হাতে ধরে মুবারক দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সুন্দর একটি সান-বাঁধানো পথ দিয়ে ওরা হেঁটে চলে। পথের দুপাশে আমরা যেমন পাথরের খোয়া দিয়ে আল করে দিই, সেই রকমই আল করা ছিল পাথরের নুড়ি দিয়ে। কিন্তু সে নুড়িগুলো কোনও সাধারণ পাথর নয়। বহু বর্ণের চুনী পান্না পলা মুক্তো সব। জাইন ভাবতে পারেন না, কত লক্ষ কোটি দিনার তার মূল্য হতে পারে। আশ্চর্য, এতটা পথ তাঁরা হাঁটলেন, অথচ কোথাও একটি জন-প্রাণীর সাড়া পেলেন না।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে এক বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। মুবারক বললো, এই সেই প্রাসাদ। এর মধ্যেই থাকে ঐ বৃদ্ধ।

জাইন বলে, কিন্তু এর তো দরজা কপাট সব ভিতর থেকে বন্ধ। কোনও পাহারা পেয়াদাও দেখছি না?

মুবারক বলে, তার কোনও দরকারও নাই।

—তবে ভিতরে ঢুকবেন কী করে, খবরই বা দেবেন কী করে?

মুবারক বলে, খবর-টবর কিছু দিতে হবে না, যা করতে হবে আমি করছি।

জাইন দেখলেন, আগাগোড়া প্রাসাদটা একখানা মাত্র পান্নার পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। কোথাও জোড়া-টোড়া কিছু নাই। এত বড় পান্না

পাথর কোথা থেকেই বা জোগাড় করেছে, আর কী করেই বা এখানেই এনে বসিয়েছে, কিছুই বোধগম্য হয় না তার। প্রাসাদের চারপাশ ঘিরে দুর্গ পরিখা। বাইরের কোনও অবাঞ্ছিত কেউ যাতে প্রাসাদ-সান্নিধ্যে যেতে না পারে তার জন্যই এই কড়া ব্যবস্থা। পরিখার এপাশের পাড়ে সারবন্দী করে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ বসানো। যার ফলে বাইরে থেকে ঠিকমত নজর না করতে পারলে বোঝারই উপায় নাই, ভিতরে অত বিরাট একখানা প্রাসাদ সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

প্রাসাদের সব দরজাই রুদ্ধ। তার মধ্যে সবচেয়ে যে দরজাটা বড়, তার চৌকাঠ থেকে শুরু করে পাল্লা সব আগাগোড়া সোনায় তৈরি। দূর থেকে দেখে মনে হয়, পাল্লা দুখানা কুমীরের চামড়ায় গড়া।

মুবারক তার কামিজের তলা থেকে চারখানা রেশমী ফিতে বের করে দুখানা জাইনের হাতে দেয়, আর দুখানা নিজে রাখে। তারপর একখানা ফিতে সে নিজের কোমরে এবং একখানা পিছনে বাঁধে। জাইনকে বলে, ঠিক আমি যেমনটি করে বাঁধলাম, আপনিও দেখে এই রকম করে বাঁধুন, মালিক।

মুবারকের অনুকরণ করে জাইনও তার নিজের কোমরে বাঁধে একখানা, অন্যখানা ঝুলিয়ে দেয় পিছনে।

এরপর মুবারক তার কামিজের তলা থেকে নমাজে বসার উপযোগী দুখানা বড় আকারের রেশমী কাপড় বের করে মাটিতে পাশাপাশি পাতে। একটার ওপরে সে নিজে বসে। জাইনকে বলে, আপনিও বসুন আমার মতো করে।

মুবারক আতরের শিশি বের করে জাইন এবং নিজের গায়ে ছড়িয়ে দেয়। ভুর ভুর করে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আর একটা শিশি থেকে গোলাপ জল বের করে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করতে করতে চারপাশে ছড়াতে থাকে।

মুবারক বলে, ব্যস। এবার আমি বৃদ্ধকে আহ্বান করবো! জানি না সে কী মূর্তি ধরে দেখা দেবে। যে ভাবেই আসুক, যে মূর্তিতেই দেখা দিক, আগেই বলেছি, বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করবেন না বা আঁৎকে উঠবেন না। তা হলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

জাইন বলে আমার মনে আছে।

মুবারক বলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, সে যেন কুপিত না হয়ে আসে। আমাদের আগমন যদি অবাঞ্ছিত মনে করে, তবে বিকট বীভৎস এক দৈত্য দানবের রূপ ধরে দেখা দেবে। এবং তার সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয়ে প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই আরও একবার সাবধান করে দিচ্ছি, মালিক, কিছুতেই ভয় পাবেন না। আর যদি খুশ-মেজাজে থাকে সে, তবে আর কথা নাই, এক সাদাশয় মিষ্টভাষী বৃদ্ধের মূর্তিতে আবির্ভূত হবে। কিন্তু একটা কথা, যে রূপ ধরেই সে আসুক, আপনি তাকে শ্রদ্ধা সম্মান জানাবেন বেশ ভাল করে। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলবেন, 'আপনি মহা শক্তিধর—সম্রাটের সম্রাট। আমরা আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে আপনার সাম্রাজ্যে হাজির হয়েছি। আপনি আমাদের রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা জানাই,

আমি আপনার একান্ত অনুগত এক ভৃত্য। অধমের নাম জাইন—বসরাহর বর্তমান সুলতান। আমার বাবা মহামান্য সম্রাটের অনুগ্রহে ছয় ছয় বার এখানে এসে ছয়টি হীরকের পুতুল পেয়েছিলেন। আমি এসেছি আমার বাবারই নির্দেশে। তিনি আজ ইহলোকে নাই। কিন্তু আমাকে আদেশ করে গেছেন, এখানে এসে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে। তাঁর জীবদ্দশাতে সপ্তম হীরক-কন্যাটি তিনি আর আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করে যেতে পারেননি। তাই আমার ওপরে দায়িত্ব আরোপ করে গেছেন, আমি যেন আপনার কাছে এসে সেই সপ্তম হীরক-কন্যাটি প্রার্থনা করি। আমি আমার প্রস্তাব রাখলাম। এখন আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে প্রদান করেন, তবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তবে একথাও ঠিক, আপনি যদি আমাকে নাও দেন, ঐ সপ্তম কন্যা, তবু আমার পিতৃদেবের মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি অম্লান এবং অবিচল থাকবে আপনার প্রতি। কোনও দিন তা বিন্দুমাত্র নষ্ট হবে না।' এর পর বৃদ্ধ যদি জিজ্ঞেস করে, 'ঐ সপ্তম হীরক-কন্যা নিয়ে তুমি কী করবে, তখন আপনি বলবেন, 'আপনার অনুগ্রহে দৌলতের কোনও অভাব নাই আমার। এ শুধু পিতৃ আজ্ঞা পালন। তিনি বলে গেছেন, তাঁর গুপ্তধনাগারে সাতটি কন্যার জন্য সাতটি সোনার সিংহাসন আছে। তার মধ্যে ছয়টিতে ছয় কন্যা অধিষ্ঠিত, কিন্তু সপ্তম আসনটি শূন্য পড়ে আছে। ওটি নিয়ে গিয়ে ওখানে বসাতে পারলে ষোলকলা পূর্ণ হয়।'

এর পর মুবারক জপ তপ, মন্ত্রপাঠ এবং অনেক রকম তুকতাক এবং নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে ডাকাডাকি করতে থাকে। এমন সময় চারদিক আঁধার হয়ে আসে। সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনীভূত হতে হতে এমন অবস্থা হয়, জাইন আর মুবারক কেউ কাউকে দেখতে পায় না। হঠাৎ সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার চিরে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকায়। এবং তখনি গগন-মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জাইন দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পলিত-কেশ বৃদ্ধ। মুখে তার মধুর হাসি। প্রশ্ন করলেন, কে তুমি বাবা?

—মহামান্য ত্রিলোকেশ্বর, আমি আপনার বান্দা জাইন, বর্তমানে বসরাহর সুলতান।

তখন মুবারক যা যা শিখিয়েছিল, হুবহু সেইসব কথাগুলো বলে গেলেন জাইন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো পঁচিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সব শুনে বৃদ্ধ প্রীত হয়ে বললো, তোমরা এই দুর্গম দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছ, সেজন্য খুব খুশি হয়েছি বাবা। কিন্তু সপ্তম হীরক-কন্যাটি পাওয়ার পথে একটি কঠিন অন্তরায় আছে। তোমার বাবাকে আমি পর পর ছয়টি শর্ত পালনের জন্য ছয়টি হীরক-কন্যা দান করেছিলাম। সপ্তমটিও

তাকেই দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার শেষের শর্তটি সে পূরণ করতে পারেনি। অবশ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি সে করেনি। তার মৃত্যুর পর তার যোগ্য সন্তান তুমি এসেছো ঐ সপ্তমটিকে নিতে। অবশ্যই আমি দেব—দিতেও চাই। তার কারণ, ওরা একসঙ্গে সাতজন ছিল, তার মধ্যে ছ'টি এখন তোমার ধনাগারে, আর এই সপ্তম বেচারী একা একা পড়ে হাহাকার করছে। তাই ঠিক করেছি, দিতে হলে তোমার কাছেই দেব। কিন্তু সেই শর্তটি তোমাকে পূরণ করতে হবে যে, বেটা!

জাইন এক পলকও চিন্তা না করে বলে, আপনার যে-কোনও শর্তে আমি রাজি আছি, ত্রিভুবন অধিপতি। আদেশ করুন।

বৃদ্ধ হাসে, কিন্তু বাবা, তুমি কী পারবে তা পূরণ করতে?

—অবশ্যই পারবো। আপনি হুকুম করুন। ওই সপ্তম কন্যার বিনিময়ে আপনি যদি আমার গোটা সলতানিয়তটাও চান, আমার কোনও দুঃখ থাকবে না—দিয়ে দেব আপনাকে। আমার গুপ্ত ধনাগারে অগাধ ঐশ্বর্য আছে, যদি চান, তাও সব দিতে পারি। বলুন, কী চান?

বৃদ্ধ হো হো করে হাসে, না, না, ওসবে আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

—না, না, সে তুমি পারবে না। তোমার পিতা বহু বৎসর চেষ্টা করেছিল। সে-ও পারেনি।

—বাবা পারেননি বলে ছেলে পারবে না, তা তো হয় না। আপনি বলুন, দেখি, পারি কিনা। একি কোনও অপার্থিব বস্তু, সম্রাট?

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বলে, না। তুমি সাধারণ এক মনুষ্য-সন্তান। তোমার কাছে অলৌকিক বা অপার্থিব বস্তু চাইবো কেন? এ বস্তু অত্যন্ত পার্থিব। কিন্তু মেলানো ভার।

জাইন বলে, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই পাওয়া যাক, আর যত দুর্গমই হোক সে পথ, আমি এনে দেব আপনাকে, আপনি মেহেরবানী করে আজ্ঞা করুন।

বৃদ্ধ বলে, আমি একটি পরমাসুন্দরী পঞ্চদশী প্রকৃত কুমারী কন্যা চাই।

জাইন ভাবতে পারেনি, এত সাধারণ বস্তু তার কাম্য। বলেন, এ আপনি কী বললেন, সম্রাট। আমার হারেমেই অন্ততঃ বিশটা পঞ্চদশী পরমাসুন্দরী কুমারী পালিতা হচ্ছে। এখনও ওরা আমার ভোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আপনি আদেশ করুন, তাদের সবাইকে আপনার সামনে হাজির করছি। তাদের মধ্যে এমন অলোক-সামান্যা সুন্দরীও আছে, তামাম দুনিয়ায় যার জুড়ি মেলা ভার।

এবার বৃদ্ধ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তুমি অবোধ শিশু। কুমারীত্ব কাকে বলে তাই জানো না। আমি শুধু রূপবতী নারী চাই না। আমার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে, সে হবে অপাপ-বিদ্ধ কুমারী।

জাইন বলে, তাই দেব আপনাকে। আমি জানি আমার হারেমের যা সুরক্ষা, তাতে কোন বাঁদী বেগম ব্যভিচার করার কোনও সুযোগ পেতে পারে না।

—তা সত্ত্বেও আমি বলছি, তারা কেউই প্রকৃত কুমারী নয়। তা হলে

তোমাকে খুলেই বলি, প্রকৃত কুমারী কন্যার সতীচ্ছদ অটুট থাকবে। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, যাদের তুমি অসূর্যম্পশ্যা করে অন্দরে পুরে রেখেছ, তারাও কেউ পূত-পবিত্র নাই।

জাইন বলে, ঠিক আছে, আমি তাদের এনে হাজির করছি। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন, তারা কুমারী কিনা।

—এখানে এনে পরীক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পার। তাতেই হবে।

জাইন বলে, কিন্তু পিতা, সহবাস ছাড়া পরীক্ষার তো দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। এবং সহবাস করে পরীক্ষা কার্য সমাধা করতে গেলে তারপর তো সে আর কুমারী থাকবে না!

—তুমি যথার্থই বলেছ। সহবাসের পর প্রকৃত কুমারীরও আর কুমারীত্ব বজায় থাকে না।

জাইন বলে, তা হলে? আপনার সন্দেহ মোচন হবে কী করে? আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে আমি শতাধিক কুমারী কন্যা এনে দিতে পারি! এখানে আপনি নিজে তাদের সঙ্গে সহবাস করতে করতে জানতে পারবেন, কোন্‌টি প্রকৃত কুমারী। তাকেই আপনি গ্রহণ করে বাকীগুলোকে ফেরত দিয়ে দেবেন?

—কিন্তু বৎস, তোমার এ প্রস্তাব একেবারেই অবাস্তব।

—কেন?

—কারণ, একশো কেন, একশো হাজার পঞ্চদশীর মধ্যেও একটি প্রকৃত কুমারী পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি কত মেয়ে জোগাড় করতে পার? যদি পারও, তাদের প্রত্যেককে ঐ পদ্ধতিতে পরীক্ষা তো একেবারেই অসম্ভব।

জাইন নিরুৎসাহ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, আপনি বলছেন, একশো হাজারেও একটি প্রকৃত কুমারী মেয়ে পাওয়া শক্ত?

বৃদ্ধ বলে, বুঝেছি, তোমার মনে সন্দেহ জমছে। ঠিক আছে, তোমাকে পরীক্ষার এক নতুন উপায় বাৎলে দিচ্ছি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।

বৃদ্ধ প্রাসাদের ভিতর চলে গেল।

একটু পরে সে ফিরে এল একখানা আয়না হাতে করে।

—এই যে দেখছো, আর্শিখানা—এই আর্শির সামনে কোনও কুমারী মেয়েকে দাঁড় করালে তার নিরাবরণ দেহখানা দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়, সে মেয়ে যদি পাপবিদ্ধ হয়ে কুমারীত্ব খুইয়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাও ধরা পড়বে এই আয়নায়।

জাইন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী ভাবে?

—আয়নার কাঁচখানা আস্তে আস্তে ঘোলাটে হয়ে যাবে। তখন আর কিছুই দেখা যাবে না।

—আশ্চর্য তো!

—হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। এ কষ্টিপাথর আর দুটি কোথাও খুঁজে পাবে না। এটা তোমাকে দিলাম। সযত্নে রক্ষা করবে। সাবধান, যদি ভেঙে বা হারিয়ে যায়, তোমার দারুণ দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে।

জাইন হাত পেতে নিল আয়নাখানা। বৃদ্ধ আবার বলে, তোমার যাকে যাকে মনে হবে পঞ্চদশী পরমাসুন্দরী এবং প্রকৃত কুমারী, কেবল তাদেরই পরীক্ষা করে দেখবে। অহেতুক ব্যবহার বিধেয় নয়। তারপর যদি কখনও সন্ধান পাও তেমন মেয়ের এবং তাকে যদি সংগ্রহ করে আনতে পার এখানে, তবেই আমি তোমাকে দেব ঐ সপ্তম হীরক-কন্যা। এবং আমি স্বয়ং তোমার প্রাসাদের গুপ্ত ধনাগারে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তার কারণ, এই সব মহামূল্যবান সামগ্রী উটের পিঠে নিয়ে এত বিপদ-সঙ্কুল দূরদেশ পাড়ি দিয়ে নিরাপদে ঘরে তুলতে পারবে না। পথের মধ্যে অনেক চোর ডাকাত দুর্বৃত্ত ওৎ পেতে থাকে। সুযোগ পেলেই তারা ডাকাতি ছিনতাই করে কেড়ে নিতে পারে, এই আশঙ্কায় ঐ ছ'টি হীরক পুতুল আমি তোমার বাবার হাতেও দিইনি। আমি নিজে তোমাদের প্রাসাদে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। আর এই সপ্তম পুতুলটি পৃথিবীর পরমাশ্চর্য বস্তু। ঐ রকম হাজারটি পুতুলের চেয়েও এর দাম অনেক বেশি। সুতরাং এ বস্তুর কেউ সন্ধান পেলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই আমি নিজেই তোমার প্রাসাদে দিয়ে আসবো। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। তার আগে আমার ওয়াদা পূরণ কর, তবে তো সে প্রশ্ন উঠবে।

জাইন অভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ করে বলে, আপনি আশীর্বাদ করুন সম্রাট, আমি যেন কৃতকার্য হই। ইরান, ইরাক, পারস্য—তামাম আরবের, দরকার হলে প্রতিটি সুন্দরী পঞ্চদশীকে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো। এবং যদি ইপ্সিত বস্তুর সন্ধান করতে পারি, তারপর যে মূল্যেই পারি, কিনে এনে আপনার চরণে নিবেদন করবো।

বৃদ্ধ ডানহাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বলে, তোমাদের জয় হোক।

আবার চারদিক ঘন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। জাইন দেখলেন, গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এবং কী আশ্চর্য, বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেছে কখন।

মুবারক বললো, আপাততঃ প্রথম পর্ব শেষ। চলুন মালিক, এবার দেশে ফিরে যেতে হবে। তারপর শুরু হবে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের কাজ।

আবার ওরা হাঁটতে হাঁটতে সেই হ্রদের তীরে আসে। একটু পরে নৌকাখানা এসে ওপারে পার করে দেয়। সেই পাহাড়। মন্ত্রবলে পাহাড়ও দ্বিখণ্ডিত হয়ে পথ করে দেয়। তারপর সমুদ্রের কূলে অপেক্ষমান সেই নৌকায় চড়ে এপারে এসে আবার দীর্ঘ যাত্রা শেষে একদিন কাইরোয় এসে পৌঁছয়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছাব্বিশতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয় :

মুবারকের একান্ত অনুরোধে জাইন কয়েকটা দিন তার প্রাসাদে বিলাস বিশ্রামের মধ্যে কাটাতে রাজি হলেন।

জাইন ভাবে, না। যতটা ভয় পেয়েছিলাম ততটা কিছু ঘটেনি। ত্রিভুজ দ্বীপের বৃদ্ধটি লোক খুব ভালো। ঐ রকম একটা অমূল্য সম্পদ—সপ্তম হীরক-কন্যা সে সামান্য এক মর্তের কুমারী-কন্যার বদলে দিতে রাজী হয়ে গেল। এ তো হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরা! তার কী ধারণা সারা দুনিয়ায় একটিও কুমারী কন্যা নাই?

অবসর বিনোদনের মধ্যে এক সময় জাইন মুবারককে বলেন, এবার তাহলে আমরা বাগদাদেই যাত্রা করি? সেখানে আখচার পরমাসুন্দরী কন্যা পাওয়া যায়। এবং খুঁজে-পেতে দেখলে, তার মধ্যে কী একটা কুমারী কন্যা মিলবে না? বাগদাদে গেলে, অনেক সুন্দরী মেয়ের মধ্যে পছন্দসই কুমারীদের বেছে বেছে পরীক্ষা করে দেখতে পারবো।

মুবারক বাধা দিয়ে বলে, কেন আপনি অত ভাবনা করছেন, মালিক? কাইরোই বা কী কম যায়! মিশরের মেয়েরা জগৎ-বিখ্যাত। তা ছাড়া এখানে দুনিয়ার সব দেশ থেকেই সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে আসা হয়। আমার বিশ্বাস অন্য কোথাও যাওয়ার দরকারই হবে না। এখানেই পেয়ে যাবেন।

জাইন বলে, বেশ, পেলে তো ভালই হয়। নানাদেশের ঘোরাঘুরির হয়রানি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

মুবারক বলে, আসল মেয়ে আমি খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিচ্ছি মালিক।

—কী ভাবে খুঁজবেন?

—আমি একটি বুড়িকে জানি, তার কাজই এই। ভালো ভালো মেয়েদের ভাল ভাল পাত্র জুটিয়ে দেওয়া।

জাইন জিজ্ঞেস করে, কী ভাবে সে এত সব মেয়ের সন্ধান রাখে?

—সন্ধান কি সে বাড়ি বাড়ি খোঁজ করে রাখতে যায়? সন্ধান তার কাছে আপসে আসে। দু তরফ থেকেই—ছেলে এবং মেয়ে।

—অর্থাৎ।

—ধরুন আপনার যেমন একটি পঞ্চদশী পরমাসুন্দরী কন্যা দরকার—আপনি তাকে আপনার নাম ঠিকানা জানিয়ে বলে এলেন, তেমনি কোনও পরমাসুন্দরী পঞ্চদশীর বাবা-মাও তো উপযুক্ত পাত্র খুঁজছে। তারাও তার কাছে নাম ঠিকানা জানিয়ে তার চাহিদা জানিয়ে আসছে। বুড়ি শুধু ঘটকের কাজ করছে। মেয়ের চেহারা চরিত্র বয়স আপনাকে জানিয়ে আপনার চেহারা চরিত্র বয়স এবং ধনদৌলত-এর খবর নিয়ে তাদের জানিয়ে আসছে। তারপর আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে শাদী-নিকা হতে আর কতক্ষণ।

জাইন বলে, বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা তো। এতে তো বুড়ির দু তরফা লাভ, তাই না?

মুবারক বলে, আলবত। এই ভাবে অনেক অনাথ মেয়েছেলে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে।

জাইন বলে, ঠিক আছে, আপনি তাহলে, সেইরকম কাউকেই ডাকুন।

মুবারক বলে, ঠিক আছে আজই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আপনার সামনেই তাকে বলবো, সারা মিশরের সেরা সুন্দরী চাই, আমাদের এই বসরাহর সুলতান জাইন শাদী করবেন। তোমার যা দালালী তার চাইতে কিছু বেশিই পাবে। অবশ্য যদি পছন্দ হয়। বাঁদী-বাজারের মেয়ে হলেও আপত্তি নাই, তবে হ্যাঁ, বাড়িয়া খুব-সুরত হওয়া চাই। বয়স পনের হতে হবে। অবশ্যই অন্যের হাত ফেরা মেয়ে চলবে না। একেবারে গোলাপ-কুঁড়ি হওয়া চাই।

আমার মনে হয়, বুড়ি প্রাণ দিয়ে খাটবে। সুলতান বাদশাহ বলে কথা! সে তো বুঝতে পারবে, সুলতানের মনে ধরলে তার সারা-জীবনের মতো একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

জাইন বলে, আপনার ফিকির খুবই ভাল মনে হয়, ভাল কাজ হবে। কিন্তু একটি কথা—বাঁদী-বাজারের মেয়ে পছন্দ হলে, না হয়, দাম দিয়ে কিনে নিলেন কিন্তু পছন্দ যদি কোনও খানদানী ঘরের মেয়েকে করি, সে ক্ষেত্রে কী উপায় হবে। সেখানে তো শুধু পাত্রপক্ষই সব নয়। মেয়ের মতামতই সব আগে দরকার! তারপরে তার মা বাবা আছে। তাদের যদি একজন রাজি না হয়, তবে তো সব ভেস্তে যাবে।

মুবারক বলে, সে ব্যাপার, আমি থাকতে, সারা মিশরে কোথায়ও ঘটবে না। প্রথমে আপনাকে দেখবে—যে সে পরিচয় তো নয়। একেবারে সুলতান! দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। তারপর আমার প্রতাপ প্রতিপত্তি আছে। সারা মিশরে এমন কোনও সম্ভ্রান্ত আমির বাদশা সওদাগর বা অন্য কোনও খানদানী পরিবার নাই, যারা আমাকে খাতির সম্মান করে না। ওসব আপনি আদৌ চিন্তা করবেন না, মালিক। মেয়ে যদি পছন্দ হয়, হাতে আমাদের আসবেই।

মুবারক আরও বলে, আর একটা কথা, হুজুর, যদি দেখেন একেবারে ডানা কাটা পরী মিলছে না, যা পাওয়া যাচ্ছে—মোটামুটি সেরা, সে মেয়েকেও হাত ছাড়া করবেন না। শাদী করে নেবেন। সারা মিশরে বাছাই করে, ধরুন, পাঁচটা সুন্দরী মেয়ে মনে ধরলো। কাউকেই হাত ছাড়া করবেন না, মালিক। সব-গুলোকেই শাদী করে রেখে দেবেন।

এর পর আমরা দামাসকাসে যাবো। সেখানকার সেরা মেয়েগুলোকে শাদী করে নেবেন। ঠিক একইভাবে বাছাই করে। তারপর যাবো আমরা বসরাহ এবং বাগদাদে। একই কায়দায় ছাকনী করে সেরা মেয়েদের বাছাই করে তারপর সবগুলো এক জায়গায় এনে তাদের মধ্যে থেকে সবার সেরা সুন্দরী ঠিক করা যাবে। আমার মনে হয়, এইভাবে যদি আমরা এগোই, কাজটা অনেক সহজ হতে পারবে। আমার তো মনে হয়, অল্প সময়ের মধ্যে এখানেই আমরা ডানা-কাটা পরী পেয়ে যাবো!

জাইন বলে, শুধু ডানা-কাটা পরী পেলে তো হবে না, মুবারক ভাই। সব

আগে তাকে প্রকৃত কুমারী হতে হবে।

মুবারক বলে, সে তো একশোবার। প্রথম বাছাই-এর সময় সব আগে তো আমরা আয়না দিয়ে তার কুমারীত্বই পরীক্ষা করবো। সে পরীক্ষা পাশ করলে তবে তো রূপ-যৌবনের কথা উঠবে।

জাইন বললে, আপনার পরিকল্পনা অভিনব। এখন দেখা যাক, কতদূর কী হয়। আপনি আগে সেই বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠাবেন। সে কী রকম মেয়ের সন্ধান দিতে পারে দেখা যাক।

কিছুক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধা এল। দূতিয়ালী করাই তার একমাত্র কাজ। মুবারক বললো, কি গো বুড়ি মা, তেমন কোন বেহেস্তের ডানা-কাটা পরী-টরির কোনও সন্ধান আছে?

বুড়ি ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বলে, তা আর নাই? খুব আছে। কত চাই?

—দু চারটে দেখাও দেখি। তবে হ্যাঁ, বয়স পনেরর বেশি হলে চলবে না এবং হাতফেরা মেয়ে চলবে না। তোমার দালালী এবং বখশিশের কথা চিন্তা করো না। পছন্দ হলে অনেক পাবে। যা আশা করতে পার না, তাও পাবে।

বুড়ি বললো, আজই দেখাবো গোটা-পাঁচেক।

মুবারক বলে, বেশ, দেখাও।

বুড়িটা বলে, আমি কোনও হেঁজি-পেঁজি মেয়ে নিয়ে কারবার করি না, মালিক। সবই খানদানী ঘরের খুবসুরত কন্যা। মাহামান্য সুলতানের পছন্দ না হয়েই পারবে না। একেবারে আসমান থেকে ধরায় নেমে এসেছে—ফুটফুটে চাঁদ। ওদের যখন নিয়ে আসবো, আপনারা দেখে তাজ্জব বনে যাবেন। ভাববেন, কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে নিই। আচ্ছা, এখন আমি চলি, সন্ধ্যের আগেই সবাইকে নিয়ে হাজির হবো।

সন্ধ্যে হতে না হতেই সে গুটি-পাঁচ মেয়েকে নিয়ে এল।

—এই নিন, এনে দিলাম। উল্টেপাল্টে দেখে নিন। হলফ করে বলতে পারি, এ মেয়েদের কেউই এর আগে কোনও পুরুষের ছায়া মাড়ায়নি। একেবারে আনকোরা—পবিত্র কুমারী। আর নষ্ট হবেই বা কী করে বলুন? বড় বড় আমিরের হারেমের মেয়ে এরা। সেখানে তো খোজা নফরের চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনও আস্ত পুরুষ দূরে থাক, দুধের বালকও ঢুকতে পায় না।

মুবারক বুড়ির এবং মেয়েদের অলক্ষ্যে আয়নাখানা এমনভাবে কায়দা করে ঘরের এক পাশে স্থাপন করে—যেখান থেকে মুবারক এবং জাইন ছাড়া অন্য কারুরই চোখে পড়া সম্ভব নয়।

এক এক করে এক একটি মেয়েকে এনে দাঁড় করানো হয় ওদের সামনে। মেয়েগুলোর সকলেই সত্যিই পরমাসুন্দরী কিন্তু আয়নার পরীক্ষায় কেউই পাশ করতে পারলো না। প্রত্যেকটি মেয়ের ছায়া পড়তেই দেখা যেতে লাগলো তাদের নগ্ন দেহবল্লরী। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাচখানা ঝাপসা হয়ে গেল।

মুবারক আফশোশ করে ওঠে, শোভান আল্লাহ, একি কাণ্ড! এই-ই কী

আমির বাদশাহর হারেম ?

মুবারক আর আসল কথা ফাঁস করলো না। শুধু বললো, বুড়ি মা, তোমার মেয়েরা সবাই ভাল, কিন্তু আমাদের সুলতান একটু অন্য ধাঁচের মেয়ে চাইছেন। সুতরাং তোমার মেয়েদের তুমি ফেরত নিয়ে যাও।

বুড়ি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললো, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি মহামান্য সুলতান অনেক উঁচুদরের সমঝদার। আমি এর পর কাল নিয়ে আসবো আরও সুন্দরী কন্যা—বিদেশী কন্যা।

মুবারক অবাক হয়, বিদেশী কন্যা!

বুড়ি বলে, হ্যাঁ, আমার খোঁজে সুদানী, বাদাবী, আরবী, মরোক্কো আর আবসিনিয়া প্রভৃতি অনেক জাতের, অনেক দেশের মেয়ে—পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে।

মুবারক বলে, ঠিক আছে, নিয়ে এস, দেখবো ?

বুড়ি বিদায় নিতে, জাইন বলে, এই যদি নমুনা হয়, তবে কোথায় পাওয়া যাবে সেই মেয়ে ? আমি তো ভীষণ চিন্তায় পড়লাম।

মুবারক বলে, আজ পাওয়া গেল না বলে কাল পাওয়া যাবে না, তেমন নাও হতে পারে, জাঁহাপনা।

জাইন, প্রায় হতাশ হয়ে বলে, দেখুন।

পরদিনও একই ফল দেখা গেল। বুড়ি যাদের নিয়ে এল, দেখতে তাদের প্রায় সকলেই পরমাসুন্দরী, কিন্তু আয়নার পরীক্ষায় দেখা গেল, কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অতএব বাতিল।

বুড়ি হতাশ হয়। বসরাহর সুলতান মস্ত বড় মক্কেল, আশা করেছিল, ভাল দাঁও মারবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ফক্কা হয়ে গেল।

এর পর নিরাশ হয়ে জাইন আর মুবারক সিরিয়ার পথে যাত্রা করেন। মুবারক শুনেছিল, সেখানে কিছু অসাধারণ রূপবতী কন্যা আছে এক সওদাগরের হেপাজতে। মেয়ে কেনা-বেচাই তার ব্যবসা। কিন্তু সাধারণ বাঁদী নিয়ে সে কারবার করে না। নবাব বাদশাহর রক্ষিতাদের পরিত্যক্ত কন্যা আতুড় থেকেই কিনে নিয়ে এসে লালন পালন করে। তারপর যখন ডাগর ডাঁসা হয়ে ওঠে, মোটা দামে বেচে দেয়।

দামাসকাসে এসে একখানা সুন্দর চকমিলান বাড়ি ভাড়া করে মুবারক, সারা শহরে রটিয়ে দিল, বসরাহর মহামান্য সুলতান অবসর বিনোদনের জন্য এখানে এসেছেন। তবে মনের মতো সুন্দরী মেয়ে পেলে তিনি হারেমের বাঁদী বেগম করেও নিয়ে যেতে পারেন।

এই খবর রটে যাওয়া মাত্র নানা দিক থেকে নানা মেয়ের সন্ধান আসতে লাগলো। দামাসকাস পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, [এই তথ্য ভুল। যতদূর মনে হয়, ভারতের কাশীই সবচেয়ে প্রাচীন] নানা দেশের নানা জাতের বাহারী সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সুন্দরী নারীই প্রধান। বহু দূর থেকে সুলতান বাদশাহর দালালরা এখানকার বাঁদী-বাজারে আসে মেয়ে সংগ্রহ

করতে। দুর্ধর্ষ বাদাবী দস্যুরা ডাকাতি রাহাজানী করে যে সব সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসে, তারও ভীষণ চাহিদা।

মুবারক সব রকমই দেখতে লাগলো। কিন্তু না, কোনও মেয়েই ধোপে টেঁকে না। দেখতে অনেক পরীর মতো মেয়ে তারা পায়, কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড় করানো মাত্র সব বাতিল হয়ে যায়।

জাইন হতাশায় ভেঙে পড়ে, ইয়া আল্লাহ, শেষ পর্যন্ত কী সেই ত্রিভুজ দ্বীপের বৃদ্ধের কথাই ঠিক হবে? সারা দেশে কী একটাও সতী নারী নাই? এমন ব্যভিচার ঢুকে গেছে আমাদের শোবার ঘরে?

মুবারক বললো, তা হলে এবার চলুন বসরাহতেই যাই। অন্য কোথাও না থাক, আপনার নিজের হারেমের মেয়েরা তো অসতী হতে পারবে না! আমি তো জানি, আপনার বাবা—আমার মালিক, কড়া মানুষ ছিলেন। এমনভাবে হারেমগুলো তৈরি যে, বাইরের মাছি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না সেখানে।

—কিন্তু মুবারক ভাই, জাইন বলে, যতই দেখছি আমার চোখের পর্দা সরে যাচ্ছে। আমরা তো অনেক আমির বাদশাহর মেয়েও দেখলাম, আপনার কী ধারণা, তাদের হামেরগুলো সবই অরক্ষিত? আসল কথা, খারাপ হতে চাইলে, তাকে সিন্দুকে ভরে রাখলেও খারাপ সে হবেই। আপনি বলছেন বসরাহয় যেতে। আপনার ধারণা আমার হারেমের মেয়েরা একদম সাচ্চা আছে। আপনার কথা মানাই উচিত। কারণ আমার বাবা এবং আমি যে ভাবে হারেম-গুলো বানিয়েছি, তাতে একটা সূচও গলে ভিতরে যেতে পারে না আমি জানি। কিন্তু আমার মনে দারুণ ভয় ঢুকেছে, মুবারক ভাই। সেই কারণেই আমি বসরাহ যেতে চাইছি না।

মুবারক অবাক হয়, ভয়? ভয় কেন, জাঁহাপনা? ভয় কাকে?

জাইন বলে, আরে না না—সে সব ভয় নয়। ভয় আমার নিজেকে। আপনি তো জানেন, মুবারক ভাই, আমার বাবা ভীষণ গোঁড়া মানুষ ছিলেন। সেই কারণে তিনি বাছাই করে কোলের বাচ্চাকে কিনে নিয়ে আসতেন। এবং হারেমে লালন পালন করতেন ধাই পরিচারিকা দিয়ে। তারপর সে যখন ডাগর হয়ে উঠতো তখন তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করতেন। প্রতি বছরই তিনি নতুন নতুন শিশুকন্যাদের কিনে আনতেন এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন আনকোরা মেয়ের সঙ্গে সহবাস করতেন। বাবার মৃত্যুর পরও আমার হারেমের এই সুন্দর ব্যবস্থাটি চালু আছে। এখনও নিয়ম করে শিশুকন্যা কিনে আনা হয়। এবং নিয়ম করে কিশোরী কন্যার নথ খোলা হয়।

কিন্তু সব দেখে শুনে আমার আর কোনও ভরসা হচ্ছে না। ধরুন যদি বসরাহয় যাই, এবং হারেমের একেবারে আনকোরা কুঁড়ি যাদের নথ এখনও আমি খুলিনি, তাদের পরীক্ষা করে যদি দেখি আয়না ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—তাহলে? তাহলে তো আমার মাথায় খুন চেপে যাবে। জানি না, রাগের মাথায় হয়তো তামাম হারেমের দরজা পাট বন্ধ করে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেব। না না—মুবারক ভাই, ঐ ভয়ঙ্কর সত্যকে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চাই না। তার

চেয়ে ওরা যেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছে কাটাক। আমি অন্ততঃ এই সান্ত্বনা নিয়ে কাটাতে পারবো যে, আমার মেয়েরা সতীই আছে। ঐ নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি আমি দাঁড়াতে পারব না। তার চেয়ে চলুন, আমরা সোজা বাগদাদেই চলে যাই। শহরও বড়, খানাদানী লোকের বাসও বেশী। সুতরাং খুব-সুরত মেয়েও অনেক মিলবে। তারপর বরাতে যদি থাকে, আসলি চীজ হয়তো পেলেও পেয়ে যেতে পারি।

জাইন-এর কথাবার্তায় আর তেমন কোনও উৎসাহ উদ্দীপনার আমেজ নাই। তাঁর সারা জীবনের বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, সাচ্চা মুসলমান মেয়েরা কখনও অসতী হয় না। আর তাদের এই যে পর্দা বোরখা এবং হারেমের কঠিন কড়া প্রহরার ব্যবস্থা—তামাম দুনিয়ার মধ্যে সেরা। এখানকার মেয়েরা খৃষ্টানদের মতো বেহায়া অসতী হতেই পারে না। কিন্তু এই আয়নাটা হাতে আসার পর থেকে তাঁর সে-সব বিশ্বাস একেবারে মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে। কত শত মেয়েকে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু হায়, একটি মেয়েও অক্ষত পাওয়া গেল না!

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। জাইন বললে, মুবারক ভাই, আর কাল-বিলম্ব না করে চলুন, আমরা আজই বাগদাদে রওনা হয়ে যাই।

মুবারক সেইদিনই বাগদাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো আটাশতম রজনীতে ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

আল্লাহর কৃপায় কয়েকদিনের মধ্যে ও'রা বাগদাদে এসে উপস্থিত হলেন। দামাস্কাসের মতো বাগদাদেও একখানা সুন্দর সাজানো গোছনো ইমারত ভাড়া করা হলো। টাইগ্রিসের উপকূলে একখানা বাগান বাড়ি। একদিকে স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহিতা এবং অপর দিকে প্রকৃতির অপূর্ব শ্যামল শোভা। বড় মনোরম পরিবেশ।

মুবারক প্রচার করে দিল, বসরাহর পরম দয়ালু সুলতান এসেছেন দীন-দুঃখীদের দান ধ্যান করতে।

প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অগণিত দীন ভিখারী এসে সুলতানের খয়রাতি নিতে হাজির হয়।

ওদের বাসার কাছেই এক গরীব ইমামের বাসা। লোকটা নিজে দরিদ্র। বোধ হয় সে কারণেই, ধনীর ঐশ্বর্যে খুব ঈর্ষাকাতর ছিল। বড় লোকদের এই সব দান খয়রাতি দু চোখে দেখতে পারতো না সে। মনে প্রাণে সে সর্বদিক থেকে দীন এবং ভীষণ কৃপণ। জাইনের এই ঢালাও দানসত্রের ব্যাপারটা সে আদৌ সহ্য করতে পারে না।

মসজিদে নামাজ শেষে উপস্থিত ধর্মানুরাগীদের সে অনেক ভালো ভালো উপদেশের বাণী ছাড়ে নিয়ত। একদিন ইমাম সাহেব বললো, দেখ ভাইসাহেবরা,

আমার বাড়ির পাশে জানি না কোন এক পরদেশী আমির এসে উঠেছে, সারাদিন ধরে শুধু লোকজনদের টাকা পয়সাই বিলিয়ে যাচ্ছে—দেদার। আচ্ছা বলতে পার, এই পয়সা সে পাচ্ছে কোথায়? আমার তো মনে হয়, কোনও ডাকাতের সর্দার পালিয়ে এসে পীর সেজে দান খয়রাতি করছে। ব্যাপারটা পরখ করে দেখা দরকার। তোমরা সকলে একটু সজাগ থাকবে। কদাচ তার ঐ খয়রাতির অর্থ গ্রহণ করবে না। শুধু তাই নয়, ধর্মের পীঠস্থান এই বাগদাদ শহরের বুকে বসে অসাধু চোর ডাকাত বদমাইশ যা খুশি তাই অনাচার চালিয়ে যাবে, তা তো হতে পারে না। পূর্বাহ্নেই ব্যাপারটা ধর্মাবতারের কর্ণগোচর করা সমীচীন মনে করি। তা না হলে পরে, কোনও গণ্ডগোল হলে আমাদের আর জবাবদিহি করার মুখ থাকবে না। খলিফা আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলবেন, তোমার বাড়ির সামনে, তোমার নাকের ডগা দিয়ে এই ঘটনা ঘটে গেল —নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিল নাকি?

তখন আমি কী বলবো? সুতরাং আর দেরি না করে সমস্ত ব্যাপারটা খলিফার গোচরে আনা দরকার। তারপর তিনি যা ভাল বোঝেন, করবেন, আমাদের আর কোন ঝুঁকি থাকবে না।

ইমাম আবু বক্‌র-এর কথা শুনে উপস্থিত সকলে সমস্বরে জানালো, ইমাম সাহেব যথার্থ উপদেশই দিয়েছেন। এই রকম একটা গুরুতর ব্যাপার অবশ্যই খলিফাকে জানানো দরকার।

সেই সভাতেই সাব্যস্ত হলো, তারা সকলে মিলে খলিফার দরবারে গিয়ে ঐ পরদেশীদের সন্দেহজনক কার্যবিধি সম্পর্কে নালিশ জানাবে।

এ-সব কথা মুবারকের কানে পৌঁছতে বেশি দেরি হলো না। জাইনকে সে বললো, মালিক, এই ইমাম আবু বক্‌র লোকটা ভীষণ ঈর্ষাকাতর। সে তার দলবল নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। খলিফা হারুন অল রসিদের কাছে আমাদের নামে নাকি মিথ্যে লাগানি ভাঙ্গানি করতে যাবে।

জাইন বললে, এসব লোকের মুখ বন্ধ করার একটা সহজ উপায় আছে। আপনি শ' পাঁচেক দিনারের তোড়া নিয়ে ওর বাড়িতে যান। তাহলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় মুবারক পাঁচশো দিনারের একটা তোড়া হাতে করে ইমাম আবু বক্‌র-এর বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লো।

ইমাম দরজা খুলে মুবারককে দেখে না চেনার ভান করে বলে, কী চাই? কোত্থেকে আসছেন?

মুবারক যথাবিহিত সালাম শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, আমার নাম মুবারক, আমার মালিক বসরাহর আমির জাইন এখন আপনার বাড়ির পাশে ঐ প্রাসাদে অবস্থান করছেন। খুব ধার্মিক মানুষ। সব সময় ধর্ম-কর্ম নিয়েই দিন কাটান। তিনি জেনেছেন, আপনি এখানকার মসজিদের ইমাম সাহেব। তাই কুণ্ঠিত চিত্তে এই পাঁচশো দিনারের একটা তোড়া আপনার চরণে নিবেদন করার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি মেহেরবানী করে গ্রহণ

করেন, তিনি কৃতার্থ হবেন। আপনার মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি সহবত করতে সদাই ব্যাকুল।

আবু বকর দিনারের থলেটা হাতে নিয়ে ওজনটা অনুভব করে বোঝার চেষ্টা করে। তা শ' পাঁচেক হতে পারে।

এতক্ষণে ইমাম সাহেবের খেয়াল হয়, দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে মুবারককে।

—আরে কী কাণ্ড, এই রকম বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন নাকি! আসুন, ভেতরে এসে বসুন, মেহেরবানী করে।

হঠাৎ আতিথেয়তার ধুম পড়ে যায়। মুবারক ভিতরে গিয়ে বসে। চাকর এসে সরবতের গেলাস রেখে যায়। ইমাম বলে, নিন, একটু খেয়ে নিন।

সরবতের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে মুবারক বলে, আমার মালিকের সঙ্গে মোলাকাত হলে আপনি বুঝবেন, তিনি কত ধর্মপ্রাণ উদার মহৎ মানুষ গরীবের দুঃখে সদা তার প্রাণ কাঁদে। আর ধার্মিক মানুষের সন্ধান পেলে তো আর কথাই নাই। নাওয়া খাওয়া ভুলে তার কাছে ছুটে যান উপদেশ বাণী শুনতে। আজকেও তিনি নিজেই আসতে চাইছিলেন, আমিই বললাম, আমি আগে তার কাছে যাই। অনেক কাজের মানুষ। তার সময় সুযোগ বুঝে আপনাকে নিয়ে যাবো।

ইমাম বলে, তাতে কী? নিয়ে এলেই পারতেন? এর পরে যখন খুশি নিয়ে আসবেন তাঁকে। মহামান্য আমিরের জন্য আমার গরীবখানা সব সময়ই খোলা আছে।

মুবারক বলে, ইমাম সাহেব কী আমাদের সুলতানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন?

ইমাম বলে, কেন, একথা বলছেন কেন?

—না, মানে এই পাড়াপড়শীরা বলাবলি করছিল আর কি?

—ও হো হো, বুঝেছি—বুঝেছি, দুষ্টলোকে লাগিয়েছে। বলেছে বুঝি যে, খলিফার কাছে আমরা খবর দেব? মানে—সে-সব কিছু না। আসল কথা কি জানেন, বাগদাদে এসেছেন, আপনারা মহামান্য ব্যক্তি, আপনাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটাও খলিফার দেখা কর্তব্য। তাই ভেবেছিলাম, তাকে একবার জানাবো। কিন্তু এখন তো আর তার দরকার নাই। আপনার মুখ থেকেই তো সব শুনলাম। ওসব নিয়ে আপনারা কোনও ভাবনা করবেন না।

মুবারক বললো, তাহলে কালই আমরা আবার ইমাম সাহেবের কাছে আসছি?

—নিশ্চয়ই। যখন খুশি আসবেন। মহামান্য আমির যদি মেহেরবানী করে আমার দরজায় পায়ের ধুলো দেয় কৃতার্থ হবো।

মুবারক চলে গেল!

পরদিন আবু বকর মসজিদে অন্য বক্তৃতা দিল।

—ভাই সাহেবরা, গতকাল আমি তোমাদের বলেছিলাম, ঐ পরদেশীরা

হয়তো কোনও ডাকাতের দলের সর্দার হতে পারে। কিন্তু কালই আমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওরা খুব শেরীফ মানুষ। বসরাহর সুলতান। অনেক ধন-দৌলত সঙ্গে এনেছেন। দু'হাতে বিলিয়ে দান ধ্যান করে পুণ্য অর্জন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। ছিঃ ছিঃ, না জেনেশুনে এই রকম ধর্মপ্রাণ মানুষের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে আমি খুব অন্যায় করেছি। যাক, কাল যা বলেছিলাম, আপনারা ভুলে যান।

মসজিদের সামনেই দাঁড়িয়েছিল মুবারক। ইমাম আবু বকর বেরিয়ে আসতেই সে সালাম জানিয়ে বললো, আমার মালিক আপনার দর্শনপ্রার্থী। মেহেরবানী করে বাড়ি ফেরার পথে একবার যদি আমাদেব প্রাসাদে পায়ের ধুলো দেন—খুব আনন্দিত হবেন তিনি। আপনার দক্ষিণা বাবদ আর একটা তোড়া তিনি অলাদা করে রেখেছেন।

তোড়ার কথা শুনে ইমামের চোখ চক্‌চক করে ওঠে। তা বেশ তো, চলুন না। দেখাটা করেই যাই।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ঊনত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

ইমাম প্রাসাদে প্রবেশ করে জাইনকে কুর্নিশ করে। জাইনও যথারীতি প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বলেন।

খানাপিনা সাজানো হয়। জাইন বলেন, মেহেরবানী করে কিছু গ্রহণ করুন।

তিনজনেই খেতে বসে। ধীরে ধীরে আলাপ-সালাপ জমে ওঠে।

ইমাম জিজ্ঞেস করে, মহামান্য আমির কী আমাদের শহরে কিছুকাল অবস্থান করবেন?

জাইন বলে, হ্যাঁ, মানে আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি এখানে। যতদিন না কাজ সমাধা করতে পারছি ততদিন তো থাকতেই হবে।

ইমাম বলে, আপনার উদ্দেশ্যটা কী জানতে পারি? যদি আমাকে দিয়ে কোনও কাজ হয় আপনার, সানন্দে আমি করে দিতে পারি।

জাইন বলে, আমার উদ্দেশ্য একটাই—শাদী করা। আপনি হয়তো বলবেন, আমি সুলতান, এ আর এমন কঠিন কী কাজ! হাত বাড়ালেই হাজারো মেয়ে পেতে পারি! তা পারি। এবং পরমাসুন্দরী মেয়েও পেতে পারি অনেক। কিন্তু আমার ইচ্ছা একটু অন্যরূপ।

ইমাম ঠিক বুঝতে পারে না, কী রকম?

জাইন জানান, আমি যাকে শাদী করবো নিশ্চয়ই সে পরমাসুন্দরী হবে। তার বয়স হবে পনের। এবং সব থেকে প্রথম কথা—প্রকৃত কুমারী হতে হবে তাকে। আচ্ছা এমন কোনও মেয়ের সন্ধান দিতে পারেন? আমি সারা মিশর-সিরিয়ার প্রতিটি শহর ঘুরে এসেছি। কিন্তু এই তিনটি গুণের সমন্বয় কোন

কন্যার ভেতরে পাইনি। তাই বড় আশা নিয়ে এই বাগদাদে এসেছি। জানি না, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে কিনা।

ইমাম বলে, হ্যাঁ। এ রকম মেয়ে পাওয়া খুবই শক্ত। হয়তো আপনি বুড়িগুলোকে ঘটকালীর জন্য বাড়িতে বাড়িতে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু আমার ধারণা তাতে কোনও সুবিধে হবে না। ঐ মেয়েছেলেগুলো যে-সব পাত্রীর সন্ধান দেবে তারা কেউই আনকোরা হবে না। তবে আমি আপনাকে একটি মেয়ের হদিশ দিতে পারি। যদি আপনি অনুমতি করেন, তাকে দেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারি।

মুবারক বলে, ইমাম সাহেব, আপনি কী সে মেয়ের সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ? কিন্তু কী করেই-বা নিঃসন্দেহ আপনি হতে পারবেন? আপনি কী করে বুঝবেন, সে মেয়ের সতীচ্ছদ এখনও অটুট অক্ষত আছে? তা যদি না থাকে, অসূর্যম্পশ্যা হয়ে আজন্ম হারেমে বন্দী থাকলেও, প্রকৃত কুমারী থাকতে পারে না সে।

ইমাম বলে, না আমি তাকে চোখে দেখিনি কখনও। আমি কেন, সারা বাগদাদের কোনও মানুষই তাকে দেখেনি। জন্মের পর থেকে সে হারেমের বাইরে আসেনি কখনও। এবং যে-ঘরের মেয়ে সে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কোনও রকম অসৎ প্রবৃত্তি তার মনে জাগতে পারে না। আমার এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আমি হলফ করছি, আমার এই ডান হাতখানা আমি কেটে ফেলবো। এখন আপনারা যদি গা-জোয়ারী করে বলেন, না সে কুমারী নয়—সে এঁড়ে তর্কের মধ্যে আমি যাবো না। একথা তো ঠিক, শাদীর প্রথম রাত ছাড়া কুমারীত্বের পরীক্ষা করা সম্ভব না। আমার কথায় ভরসা করে আপনাকে শাদী করতে হবে। তারপর শাদীর পরদিন সকালে আমাকে বলবেন, তখন যদি বলেন, মেয়ে কুমারী ছিল না। আমি আমার এই হাত তখুনি কেটে ফেলবো।

আশ্চর্য আয়নার কথা তো কাউকে বলা যাবে না, জাইন মনে মনে ভাবেন, খুব সহজ ভাবেই তো পরীক্ষা করে নিতে পারবো। ঠিক আছে আগে সে দেখাক না। ইমামকে বলেন, আপনার কথা একশোবার খাঁটি। শাদীর প্রথম রাত ছাড়া সত্যিই তাকে কী করে পরীক্ষা করা যাবে? যাই হোক, আপনি একবার দেখাবার ব্যবস্থা করুন পাত্রীকে। যদি তার রূপ দেখে পছন্দ হয়ে যায় তখন আপনার সঙ্গে বাজি লড়া যাবে। আমিও বাজি ধরছি, যদি সে মেয়ে সত্যিই প্রকৃত কুমারী হয়, দশ হাজার দিনারের একটা তোড়া আপনাকে ইনাম দেব। অবশ্য ইমাম সাহেব, আমি বাজিতে হারতেই চাই। কারণ বাজি জেতার চেয়ে একটি কুমারী-কন্যা পাওয়ার দিকেই আমার নজর বেশি।

ইমাম বললো, ঠিক আছে আজই সন্ধ্যায় পাত্রীকে দেখাচ্ছি। তা হলে এখন আমি উঠি?

বাগদাদের প্রধান ইমামের একটি পরমাসুন্দরী পঞ্চদশী কন্যা আছে। মেয়েটি রূপে-গুণে অতুলনীয়া। স্বভাবতই ইমাম-বাড়ির খানদান বহুজন-

বিদিত। সে বংশের ছেলেমেয়ে জন্মাবধি নম্র বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী। তাদের আদব-কায়দা আচার ব্যবহার আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। প্রধান ইমাম সাহেব নিষ্ঠবান আল্লাহর উপাসক। তাঁর মতো সত্যভাষী ধর্মজ্ঞ বাগদাদে আর দুটি নাই। এই সব সদ্‌গুণের অধিকারী তার সন্তানরাও।

ইমাম আবু বক্‌র-এর সঙ্গে প্রধান ইমামের খুব ভাব ছিল। প্রায়ই সে বলতো, আবু মেয়েটা লায়েক হয়ে উঠলো, এবার তো একটা পাত্র-টাত্র দেখতে হয়। কিন্তু কে আমার মেয়েকে শাদী করবে? আমরা তো পয়সাওলা মানুষ নই।

আবু বক্‌র বলেছিল, আমি কোশিস করবো, মালিক। তবে মা জননীকে যে সে ফালতু লোকের হাতে দিলে হবে না। ও যে শাহজাদার বেগম হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রধান ইমাম বলে যোগ্যতা থাকলেই তো হবে না আবু, ভাগ্য থাকা দরকার। নসীবে যা লেখা আছে, তার বাইরে তো কিছু হবে না।

আবু বক্‌র সোজা প্রধান সাহেবের বাড়িতে চলে আসে। এই অসময়ে আবু বক্‌রকে তার বাড়িতে আসতে দেখে ইমাম সাহেব একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী খবর আবু, কোনও দুঃসংবাদ আছে নাকি?

—জী না, মালিক। আজ শুভ সংবাদ এনেছি। মা জননীর জন্য একটি বহুত খানদানি আমির পাত্র দেখে এসেছি। আপনার মেয়ের রূপ-গুণের কথা শুনে তিনি পাত্রী দেখতে চেয়েছেন। আমার তো মনে হয়, মাকে দেখে সুলতানের অপছন্দ হবে না।

—তা কোথাকার সুলতান?

—বসরাহর। [illegible]। খুব সুন্দর নওজোয়ান যুবক। শুধু পয়সা দৌলত আছে তা নয়, [illegible] আদর্শ চরিত্রের মানুষ তিনি। ধর্মে মতি আছে খুব। মানাবে ভাল। আপনি যা দেন-মোহর চাইবেন দিতে তার কোনও অসুবিধা হবে না। সুলতান জানিয়েছেন, মেয়েকে তিনি একটিবার স্বচক্ষে দেখবেন। তা তাকে অসভ্য সাজ-পোশাক পরে দাঁড়াতে হবে না, খুব মার্জিত রুচির ইজার বোরখা পরে সে দাঁড়াবে। আপনি যদি মত করেন আজই দেখাতে পারি তাকে।

প্রধান ইমাম সাহেব ভাবতে থাকেন, তার খানদানের মেয়ে কখনও পর-পুরুষের সামনে দাঁড়ায়নি। শাদীর আগে কেউ দেখতেও চায়নি। কিন্তু আজ অন্য প্রশ্ন। এ পাত্র সাধারণ মানুষ নন—স্বয়ং সুলতান। সুতরাং তার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নই বড় কথা। যাই হোক, অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে ইমাম সাহেব মত দিলেন, ঠিক আছে, আমার আপত্তি নাই। দেখাও তাকে।

বিবিকে ডেকে তিনি বললেন, আবু বক্‌র একটি সুপাত্রের সন্ধান এনেছে। স্বয়ং সুলতান। এমন পাত্র হাতছাড়া করা যায় না। তুমি লতিফাকে নিয়ে আবু বক্‌র-এর সঙ্গে চলে যাও, পাত্রর প্রাসাদে দেখিয়ে এস তাকে। পছন্দ

হবে। মেয়েটার বেগম হয়ে সুখে কাটাবে। জানি না ওর নসীবে কী লিখেছেন তিনি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ত্রিশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে পড়ে জাইন। রূপে সে হুরী, সেকথা খুব ... চেষ্টা চরিত্র করলে অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে কিছু পাওয়া যায়। ...খলেনও অনেক, কিন্তু সারা মুখে চোখে এমন নিষ্পাপ নির্মল ... অন্য কোনও মেয়ের মধ্যে এ যাবৎ তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেননি।

যাই হোক, মুবারক আগে থেকেই আয়নাটা যথাস্থানে আড়াল করে বসিয়ে রেখেছিল এক জায়গায়। মেয়েটিকে যেখানে দাঁড় করানো হবে সেখান থেকে ... তার পুরো দেহের ছবি প্রতিবিম্বিত হতে পারবে—অথচ তারা দুজনে ... অন্য কেউ দেখতে পাবে না।

লতিফা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। জাইন দেখেন, মেয়েটির বোরখা ... সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। অপূর্ব নিখুঁত হুবহুরী। নিখাদ নিভাঁজ। এমন সুচারু দেহ সৌন্দর্য জাইন কখনও ...নও বাঁদী বেগমের দেহে দেখেনি।

বেশ অনেকক্ষণ আড়চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে জাইন। ...আয়না তো ঝাপসা হয়ে ওঠে না। একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! স্থানকাল ... গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে ওঠে জাইন, মুবারক ভাই!

...আসল মেয়ে পাওয়া গেছে। একেবারে নিখাদ ... সুন্দরী!

... যথারীতি শাদী করলেন জাইন। লতিফা জাইন-এর বেগম ...

...লে মুবারক প্রধান ইমামকে বললেন, মহামান্য সুলতান স্বদেশে ...ল হয়ে উঠেছেন। আজই আমরা রওনা হতে চাই।

...র মেয়ে শ্বশুরের ঘরেই যাবে।

...াম সাহেব সালাম হাসলেন।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ...ইদিনই মুবারক ও জাইন লতিফাকে সঙ্গে আবার ত্রিভুজ দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। এবং অনেক দিনের যাত্রাপথ অতিক্রম করে অবশেষে ...

...।

...খ পরীক্ষা করে দেখে বললেন, ঠিক আছে তোমার ও... পূরণ করেছ! ওয়াদাও পূরণ অবশ্যই করবো। যাও, নিজের দেশে প্রাসাদে ফিরে ... আমি শূন্যপথে তোমাদের অনেক আগেই পৌঁছে দেব সপ্তম হীরক-

মুবারক ও জাইন বিদায় নিয়ে চলে যায়। লতিফা কাঁদতে থাকে এইভাবে তাকে নির্বাসন দেবার জন্যই কী সুলতান তাকে শাদী করেছিল সেদিন

বসরাহর প্রাসাদ।

অনেকদিন একটানা পথ চলার পর একদিন জাইন পৌঁছে গেলেন নিজের প্রাসাদে। পৌঁছে দ্রুত পায়ে তিনি গুপ্ত ধনাগারে নেমে যান। বৃদ্ধ বলেছিল, সপ্তম হীরক-কন্যাকে ছয় পুতুলের পাশে রেখে যাবে।

কিন্তু এ কী। দরজা খুলতেই দেখলেন জাইন, বৃদ্ধের পাশে লতিফা। হাসতে হাসতে বৃদ্ধ বললেন, এই সেই সপ্তম হীরক-কন্যা, জাইন। এ হীরক-কন্যার চেয়েও পরম মূল্যবান রত্ন। একে জীবন-সঙ্গিনী করে সুখী হও এই আশীর্বাদ করে আমি বিদায় নিচ্ছি।